আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বৈশাখ সন ১২৮৫। [প্রথম সংখ্যা

প্রেম-পরিণাম।

(গদ্য কাব্য)

শ—আশা—নায়ক ও কোকিল।

গীত আবার গাও দেখি। আ-
াই মধুর তানে এ দগ্ধ হৃদয়ে
সঞ্চার কর দেখি। আর এক-
াই ভীষণ ধরণীতে সেইস্বপ্ন
আবির্ভাব করাও দেখি। বি-
পে পুনরায় রূপের প্রসূন
শি। আবার সেই

সে গীতত্ব কই? আমার গাত
ধ্বনিতে বিশ্ব সংসার ...এত করিত,
কোকিল তোমার গীতে সে মাধুর্য্য কই?
দেখিলাম সে মাধুর্য্য তোমার গীতে
নাই। বুঝিলাম সে মাধুর্য্য আবি-
র্ভাব করাইবার ক্ষমতা আর কাহারও
নাই। সে মাধুর্য্য সে ভিন্ন আর কা
তবে

সুন্দরী, সেই ভুবনমোহিনী, । গাইত তেমন গীত আর না। জগতে তেমন অপূর্ব্ব আর কাহারও কণ্ঠ হইতে বিনির্গত । কিন্তু সে গাইত তাহাতে কি? সে আমার কে? তাহার চন্তা আমায় ত্যাগ করে না কেন? সে সুমধুর সংগীত-ধ্বনি এ মানব-বি হীন ঘোরারণ্য মধ্যেও আমার অন্তর ভুলে না কেন? সে পাপস্মৃতি আজিও পোড়ায় কেন? যে ব্যক্তি বাসনা বিহীন, সংসার-ত্যাগী, পুণ্যাশ্রম-বাসী, কি পাপে, হ ভগবন্! তাহার হৃদয়কে এ অনন্ত গলানলে দগ্ধ করিতেছ? সব ত্যাগ রিয়াছি, বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি ছি, সংসারের কোন সুখেই তো নাই, তবে ভগবন্! এ স্মৃতি াগ করিতে পারি না? এই ভার, এই বল্কল, এই ভস্ম, এহ এই সব অচিন্তিত পূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—ও কি সেই মত্ত স্মৃতির বেগ ফিরাইতে পারে না? ঐ প্রস্রবনের জলে যে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে শিখিয়াছে, ঐ বৃক্ষ-লতা-প্রসূত ফল মূলে যে উদর-জ্বালা খর্ব্ব করিতে অভ্যাস করিয়াছে, ঐ বিস্তৃত শীতল ছা- যে

কেন এ পাপ-স্মৃতি ত্যাগ ক না? সেই গীত। সেই শুনিব এ আশা প্রাণান্তে দিতে পারি না। সেই মধু স্রুত অমৃতময় সংগীত-ধ্বনি ভুলিতে পারিব না। করিলাম, ভুলিতে পারি এখনও সেই গীত কর্ণে তেছে, সে গীত-ধ্বনি ভুলি কিন্তু কোকিল! ভাল। ভাল কেন বলি তোমার সরল প্রাণ দ্রুত। তোমার গানে শঠতা নাই। তোমার মাতাইবার নহে। তো আর সেই যে গান কোকি নক!—হায়! অমৃতে বি কে ভাবিয়াছে? কুসুম গিয়া কীটের নিবাস কে মনে করিয়াছে? কে জানে কু নন কণ্টকাকীর্ণ? কে জানে অমন মোহন সৌন্দর্য্য নিদারুণ ক আকর?—ওঃ তার সেই যে গা ছিল, তার সেই যে অতুলনীয় আঃ! আর কি এ পাপ শ্রবণে এ জীবনারণ্যে সে সুখ-মাক ব না। এ পাপ সরোবর

সে গীত শুনিয়া সুখ কি? সে পাপ গান শুনিয়া কাজ কি? হায়! যাহাতে হৃদয় নাই, যাহাতে সরলতা নাই, যাহাতে ভাবের বিকাশ নাই, যাহাতে আবেশ নাই, যাহার স্বীয় গতি নাই, তাহা পাপ। তাহা পাপ হইতেও পাপ। আমি কি পুনরায় সেই পাপের জন্য কাঁদিতেছি। ধিক্ আমায়! তাহা সর্ব্বথা পরিবর্জনীয়।

কিন্তু সে কেন অমন হইল? সে কেন "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" হইল? সে ভূলোক-দুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য-সাগরে কেন পাপ-কীটের নিবাস হইল? সে মধুমাখা কথার সঙ্গে কেন সরলতার সিঞ্চন থাকিল না! সে কেন অমন হইল? এই যে আমি তাহার জন্য সংসার-ত্যাগী ঘোরারণ্য-বাসী হইয়াছি, এই যে আমি তাহার জন্য এই জন-সমাগম শূন্য অরণ্যে বসিয়া অলক্ষিত ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি, সে কি তাহা ভাবিতেছে? সে পাপীয়সী, সে হয়ত এখন সুখে ও ভোগবিলাসে প্রমত্ত আছে। হয়ত পাপীয়সী এখন তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত অধর চাপিয়া প্রবর্দ্ধমান হাস্যের বেগ মন্দীভূত করিতেছে। আমার অবস্থা সে পাপীয়সী ভ্রমেও ভাবিতেছে কি? তাহার হৃদয় কলুষ-রাশিতে আপ্লাবিত। সে কেন আমার হইল?

মানবহৃদয় এত জঘন্যতার আধার তাহা ভ্রমেও মনে ভাবিতে ইচ্ছা হয় না।
ম ... র পরীষ-রাশি...

এ সিদ্ধান্ত যখন মনে উদয় হয়, তখন স্বতঃ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু একের পাপে সাধারণের প্রতি দণ্ড বিধান ন্যায় ও নীতির বহির্ভূত। সেই মন্দ, তাহার আত্মা বিষে পরিপূর্ণ, তাহার অন্তর পাপের আলয়, তাহার জীবন জঘন্যতার জন্মভূমি, কিন্তু সে জন্য আজি আমি জন-সাধারণকে দোষী করি কেন? একের পাপে অন্যের প্রতি কটূক্তি সুরুচি ও সদ্‌বিবেচনার কার্য্য নহে। কি জানি আমার একি ভ্রম। কি জানি আমায় কি ঘোর দুর্নিবার ছন্নমতিতে গ্রাস করিল! আজি তাহার যত কথা আলোচনা করিতেছি, তাহার সে... যাতনা-প্রদ ব্যবহার যত মনে করিতে... তাহার সেই ভ্রান্তি-সম্ভাবনা-বির... কার্য্যকলাপ যত মনে ভাবিতেছি, ত... যেন মানব সাধারণের প্রতি আম... চিরদিনের শ্রদ্ধা অন্তরিত হইয়া যাইতেছে, ততই যেন বোধ হইতেছে—এ সংসার পাপ, তাপ ও ক্লেশের আধার। ততই যেন বোধ হইতেছে মানব মাত্রই ঘোর নারকী। ততই যেন বোধ হইতেছে, এ জগতে সহানুভূতি নাই, প্রীতি নাই, প্রেম নাই। ভালবাসা মুখের কথা। প্রণয় সে কেবল কবির কল্পনা, নিদ্রিতাবস্থার নিষ্ফল স্বপ্ন, মরুভূমির মরীচিকা, মিছাকথা। হায়! যখনই তাহার কথা মনে হয়—কখনই বা মনে না হয়—খনই বা সে কথা ভুলিতে ...
ই তাহা...

জগতে মানব সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টার কি লাভ হইল, এ সম্বন্ধে ঘোর তর্ক মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। এ পাপ, তাপ ও ক্লেশ ভুগিতে জগতে মানব নামক জঘন্য জীব-সৃষ্টির প্রয়োজন কি? এ সংসার কেন একাদনে অনন্ত সাগর-গর্ভে বিলীন হউক না; দারুণ মহামারী উপস্থিত হইয়া কেন একদিনে সমস্ত মানব-বংশ ধ্বংস করুক না; একদিনে কেন আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হউক না। মানব হৃদয়হীন, মানব পশু অপেক্ষাও অধম জীব—এ ভারতে মানব থাকিয়া কাজ নাই।

কিন্তু কোকিল! তাহার যে এত সা তোমার কাছে বলিতেছি, বলিতে কি জানি কেন এখনও তাহার জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে, এখনও অন্তর তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে হু হু শব্দে জ্বলিতেছে। যাই বল কোকিল! তাহার নিন্দা করিতে আমার যে কষ্ট হইতেছে তাহা আমিই জানিতেছি। আর কে জানিবে? কে এ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তথায় শান্তিবারি সিঞ্চন করিবে? যে শান্তি দিবে, যে তাহা দিলে দিতে পারে, সে তথায় যন্ত্রণার জ্বলন্ত শিখা এত প্রবর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছে যে, চিতার অনলে ভিন্ন আর শান্তির আশা নাই। তবে কে আর শান্তি দিবে? আর কা-র নিকট হইতেই বা আমি তাহার ... জগতে আমার এম

ব্যাধির কি ঔষধ আছে? আমার এমন যন্ত্রণার শান্তি জ্বলন্ত চিতায়, আমার এ দারুণ ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ মৃত্যুমুখে।

এ অপরিমিত যাতনা-রাশি ভুগিতে ভুগিতে, দিনে দিনে, তিল তিল করিয়া মৃত্যু অপেক্ষা একদিনে মরা ভাল নয় কি? এ কষ্ট অপেক্ষা মরাই ভাল। এ কষ্ট আর সহিতে পারি না। এ ভার ভূত জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা শীঘ্র ইহার বিনাশ সাধন করায় দোষ কি? এক শ্রেণীর লোক আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া মনে করেন। নিশ্চয়ই এ নিদারুণ ক্লেশ তাঁহাদের এক দিনও ভুগিতে হয় নাই, এ সংসারে এ যম-যন্ত্রণা তাঁহারা এক দিনও জানিতে পারেন নাই। যদি এই অপরিমিত দুঃখরাশি দিনেকের নিমিত্তও সহিয়া তাঁহারা আত্মহত্যার বিরোধী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়ের প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহারা দারুণ হৃদয়হীন। নচেৎ তাঁহারা যাতনা-ক্লিষ্ট মানবের এই মহা-শান্তির বিরোধী কেন? তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া কাজ নাই। আমার পক্ষে মরণই মঙ্গল। আমি আমার এই ঘোর যাতনা-সঙ্কুল জীবনের এই স্থানেই উপসংহার করিব। আমি আত্মহত্যা করিব। তুমি দার্শনিক! এ অবস্থা যদি তুমি মহাপাপ বলিয়া মনে কর, তুমি আমার অন্যরূপ শান্তির ...। আমার যাতনা ... শান্তি

ব্যবস্থা নাই। আমার পক্ষে আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ। যদি তাহাতে পাপ থাকে —হ্মাত নাই, সে পাপের ভয়ে আমি কাতর নহি। যিনি জীবন দিয়াছেন, তিনি আমার পক্ষে করুণাময় নহেন। আমার জীবন সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় মঙ্গলময় নহে। যে নিরীহ প্রাণী দুর্ব্বহ দুঃখ-ভারে উৎপীড়িত, জীবন যাহার পক্ষে যন্ত্রণার আলয়, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার হৃদয়ে অসহ্য অনন্ত গরলরাশি ঢালিয়া অত্যন্ত যাতনা দিতেছে, স্রষ্টা তাহার পক্ষে করুণাহীন। সে স্রষ্টার বিচারের প্রশংসা করিতে পারে না। বিচার-বিহীন পক্ষপাতী স্রষ্টার ভয়ে সে ভীত নহে। আমার এ অবস্থায় মরণে যদি পাপ থাকে, আমি সে পাপে প্রস্তুত। পাপে আমার কি হইবে? পাপ পুণ্যের কি বিচার আছে? যদি পাপ পুণ্যের ‍চার থাকিত, যদি জগতে ন্যায়ের ‍সন থাকিত, তাহা হইলে অভাগার এ রূপ দুর্দ্দশা হইত না, তাহা হইলে এ ভভাগা মৃত্যুর প্রর্থনায় এত ব্যগ্র হইত ।, তাহা হইলে মানব সমাজে এত ষম্য লক্ষিত হইত না। এ জগতে ‍তাহিত, ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই। জগৎ পাপের পুরী। এখানে পুণ্যা- ‍পক্ষা পাপের জয় দেখিতে পাই, এখানে ‍্যায় অপেক্ষা অন্যায়ের আদর দেখিতে ‍াই, এখানে ভাল অপেক্ষা মন্দের সুখ ‍খিতে পাই। কে বলে ঈশ্বর ‍স‍র্ব‍ ‍জ্ঞ‍ ‍? কে বলে ঈশ্বর সুক্ষ্মদর্শী, যে বলে সে ভ্রান্ত। পাপময় জগতে কাহার নিকট বিচার প্রার্থনা করিব—কাহার কাছে দুঃখ জানাইব? এখান হইতে যত শীঘ্র অবসর লওয়া যায় ততই মঙ্গল। মৃত্যুই একমাত্র প্রার্থনা। আমি এ জীবন আত্মহত্যা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিব।

মরিব বটে, মরিলে যাতনা যাই বটে, কিন্তু কোকিল! মরিলে তাহা সহিত আর কখন বারেকের নিমিত্তও সাক্ষাতের আশা থাকিল না। সে সহস্রবার মন্দ হউক তথাপি তাহাকে দেখিলে যে সুখ পাই, তাহা কাহায় বুঝাইব? সেই যে হাসি হাসি মধুরিমাময় মনোহর মুখ খানি, তাহা আর একবার দেখিবার আশা এ জীবনে ত্যাগ করিতে পারিব না। সেই যে বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বরে অমৃতবৎ এক একটী ভুবন-দুর্ল্লভ কথা—তাহা যদি আর একবার শুনিতে পাই, তাহা হইলে তাহার সহিত সংসারের সমস্ত সুখ বিনিময় করিতে স্বীকৃত আছি। তাহাকে দেখিবার আশা ত্যাগ করিয়া মরিতেও পারিব না। না—এ যাতনা সহিব সেও ভাল, তথাপি সে আশা ত্যাগ করিয়া মরিব না। মরিয়া বাঁচা আমার অদৃষ্টে নাই, মরণের বিনিময়ে চির শান্তি ক্রয় করা আমার কপালে নাই—এ যম-যন্ত্রণা আমার নিয়তি।

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে ... সুখ কি তাহা ...

না। হৃদয় তো তাহাকে একবারও লে না। কল্পনা তো একবারও তা-ার চিত্র অন্তর হইতে অপনীত করে না। আমি এত কথা কহিতেছি, এত দুঃখের কান্না কাঁদিতেছি, এত প্রলাপ বকিতেছি, তাহার এত নিন্দা করি-ছি, তথাপি কই দুষ্ট কল্পনা তো এক-ও তাহায় ভুলিল না। সে তো ামার সম্মুখে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, সেই পাপীয়সীর বহুবিধ মূর্ত্তি সুরঞ্জিত করিয়া সমানীত করিতেছে। ঐ যেন দেখিতেছি পাষাণী স্বর্ণ হীরকাদি-বিনির্ম্মিত অলঙ্কারে স্বীয় পাপ অবয়ব বিশোভিত করিয়া, উজ্জ্বল মূল্যবান্ পরি-চ্ছদ পরিধান করিয়া, সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত দর্পণে স্বীয় ঘৃণিত অবয়বের পূর্ণায়ত প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে বিম্বোষ্ঠের প্রান্ত দিয়া ভুবনমোহন হাস্যের তরঙ্গ একটু একটু করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। ঐ যেন দেখিতেছি—হৃদয়হীনা আগুল্ফ-বিলম্বিত বিশৃঙ্খল চিকুরদাম দুলাইতে দুলাইতে প্রসাদ-সংলগ্ন মনোহর পুষ্পো-দ্যানে ভ্রমণ করিতেছে এবং সময়ে সময়ে হস্তস্থিত প্রিয় পাপিয়া পক্ষীর চঞ্চুপুট চুম্বন করিতেছে।—ঐ যেন দেখিতেছি, পাষাণী বনদেবীর ন্যায় পুষ্প-লতিকা দ্বারা মোহিনী সজ্জা করিয়া বৃক্ষ-বাটি-কার বকুলমূলে বসিয়া "কপালকুণ্ডলা" ...ন করিতেছে। ঐ যেন দেখিতেছি-...শালে প্রাসাদে.

কাশ প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, এবং হাসিতে হাসিতে সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ বালককে জিজ্ঞাসিতেছে "বল দেখি মেঘ আগে যাবে কি চাঁদ আগে যাবে?" কতরূপে তাহায় সতত যে মানস-নেত্রে সন্দর্শন করিতেছি তাহা আর কত ব-লিব? কি ভয়ানক! অসহ্য! এ পাপ-স্মৃতি কেন যায় না? কবি যথার্থই বলিয়াছেন।

"ভুলিব ভুলিব করি ভোলা নাহি যায়,
যে দিকে ফিরাই আঁখি দেখিবারে
পাই।" ইত্যাদি।

এ পাপ স্মৃতি—এ দুষ্ট আশা—এই দুই গেলেই আমার এ ঘোর যাতনারও তো অবসান হয়। স্মৃতি যায় না—আশা যাবে কেন?

আশার দৌরাত্ম্যে মরিয়া শান্তিলাভ ক-রাও অভাগার অদৃষ্টে ঘটিল না। আশার পরামর্শেই আমার সর্ব্বনাশ সাধিত করিল। বিশেষ বুঝিতেছি যে, ভ্রান্ত আশা রোপণ করিতেছি, অবশেষ জানিতেছি যে পা-ষাণে অশ্রুপাত করা সহজ নহে। চিরকাল জানি লৌহ সহজে বিগলিত হয় না, চিরদিন জানি স্রোতের বেগ ফিরান অনায়াস-সাধ্য নহে, তথাপি কি জানি কেন এ পাপ আশাকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারিতেছি না। এত ভাবিতেছি যে, ভ্রান্ত আশার উন্মত্ত প্রলাপে আর কর্ণপাত করিব না, এত ...ছি যে প্রমত্ত কল্পনার মন্ত্রণা দিবে না, এত ভাবিতেছি

স্মৃতির অস্বাভাবিক বর্ণনায় আর কর্ণপাত করিব না, তথাপি কি জানি আমার এদি দুর্ব্বলতা, আমি পুনঃ পুনঃ প্রতিনিয়ত তাহাদেরই অধীনতায় বদ্ধ হইতেছি। আশার কি অসাধারণ মন্ত্রবিদ্যা। আশা সতত এই যাতনাক্লিষ্ট হতভাগাকে স্বর্গের সুখ দিতে প্রস্তুত। স্বপ্নেও যাহা পাইবার জন্য চিত্ত ভাবে নাই, আশা তাহাও সতত দিতে স্বীকৃত। যাহা ঘটিবে না বলিয়া সবিশেষ বিশ্বা আছে; আশা আমার যাতনা বাড়াইবা নিমিত্ত তাহাও ঘটাইতে উদ্যত। কিন্তু কই তথাপি তাহার মনোরথ সফল হয় না তো। আমার প্রমত্ত আশার নিষ্ফলতা নিত্য সহচর। তবু আশা ছাড়ে কই? নিরুদ্যম হইয়া পশ্চাদ্‌পদ হয় কই? ক্লান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দেয় কই? এ পাপ, নির্ব্বোধ, উন্মত্ত আশা ছাড়ে কই? এই দেখ—দুষ্ট আশা আমার মানস-নেত্রের সম্মুখে কি মনোহর চিত্র উপস্থিত করিতেছে। ঐ দেখিতেছি—এতদিনে পাষাণীর গর্ব্ব গিয়াছে—এতদিনে মন্দভাগিনী বুঝিয়াছে এ জগতে আমার প্রণয় অতুলনীয় সম্পত্তি। এখন নিদারুণ অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে—যুবতী এখন বৃদ্ধার ন্যায় হইয়া গিয়াছে—তাহার সে রূপরাশি অন্তরিত হইয়াছে—দারুণ ক্ষীণতা তাহার অপূর্ব্ব সৌকুমার্য্যের স্থানাধিকার করিয়াছে—তাহার প্রতপ্ত স্বর্ণবৎ মনোহর বর্ণ মলিন হইয়াছে—উজ্জ্বল, সতেজ, আয়ত লোচনের আর সে ভঙ্গী নাই, তাহা কোটর-মধ্যগত হইয়া সমস্ত সংসারের প্রতি ক্ষীণ ও বিষণ্ণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সে বেশ ভূষা নাই, সে পক্ষী নাই, উদ্যানের সে রমণীয়তা নাই। আমারই চিন্তায় তাহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ওঃ কি শোচনীয়! ঐ যেন আবার দেখিতেছি—মলিনা শয়ন করিয়া উপাধানে বদন লুকাইয়া কেবল আমারই জন্য কাঁদি[illegible] এ চিন্তাও সহে না যে। তাহার মনে হইলে বুক ফাটে যে। চক্ষে জল ভাবিলে বড় যাতনা হয় তাহার কোমল প্রাণ এত যাতনা স[illegible] কেন? ও কি কথা? কাঁদিতে কাঁ[illegible]তে সুন্দরী ও কি বলিতেছে? "দা[illegible] চরম কাল উপস্থিত, অন্তিম সম[illegible] অপরাধ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া একবা শ্রীচরণ দেখিতে দেও নাথ!" এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আমি শত সহস্র বর্ষ ক্রমান্বয়ে অবক্তব্য যাতনা ভুগিব সেও ভাল, কিন্তু তাহার যেন নিমেষের নিমিত্ত কষ্ট না হয়। বাস্তবিকই কি তাহার এতাদৃশ মতি-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? আশ্চর্য্য কি? সে বালিকা বুঝিতে পারিত না কি ভাল কি মন্দ, এই জন্যই সে আমার পবিত্র প্রণয় উপেক্ষা করিয়াছিল। এক্ষণে উপায় কি? কি করিলে তাহার এই যাতনার অবসান হয়। তাহার অপরা ধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হ[illegible]

হায়! দেখ কোকিল! আমার আশার কি ভ্রম! আমি আশার কুহকে পড়িয়া কি সুখ-স্বপ্নই দেখিতেছি দেখ। হায়! কোথায় বা সে, আর কোথায় বা আমি— কোথায় বা অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, আর কোথায় বা আমার ভ্রান্ত আশা ও সুখ! আমার অদৃষ্ট-পত্রে সুলিপি লিখিত নাই। এ সংসার সুখের স্থান নহে— অন্যের হইলেও আমার পক্ষে নহে। ... ম, তাহার ধ্যানে রত থাকিয়া, ... এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার ... পর্য্যবসিত হইবে।

... কোকিল! তোমায় একটী ... মর্শ জিজ্ঞাসা করি। এ অরণ্যে আ- ... আর কে আছে? কোকিল! ... ম যদি পার আমাকে সৎপরামর্শ দেও।—আমি আর একবার তাহাকে ... খিব মনে করিতেছি। ইহাতে তোমার কি মত? কৈ তুমি মত ব্যক্ত করিলে না? তোমার মত যাহাই হউক, আমি আর একবার তাহায় দেখিব। আর একবার দেখিব কেন? হৃদয়হীন পাষাণ-খণ্ড আবার দেখিবার প্রয়োজন? যাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ, তাহাকে আবার দেখিবার আবশ্যক? কথা সত্য বটে। সে মানব-রূপিণী পাষাণখণ্ড, তাহাকে আর না দেখাই মঙ্গল তাহা আমি জানি, তোমার কেন সকলেরই—তাহাই মত, তাহাও বুঝি-... তথাপি কোকিল! আমি তা-... না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বিশেষ জানিতেছি. তাহাকে দেখিলে যাতনা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না, তবু কোকিল! তাহাকে আর একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আর একবার দেখিব— হয়ত পাষাণ গলিবে, হয়ত স্রোতের বেগ ফিরিবে, হয়ত অসময়ে বসন্তের আবির্ভাব হইবে, হয়ত সহসা ভাগ্য পাদপে শুভফল জন্মিবে, হয়ত আমার চিরসঞ্চিত দুরাশা ফলবতী হইতেও ...ব, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নহে কিছুই অবিশ্বাস্য নহে। মানব মনের কখন কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা কে বলিতে পারে? আমি কল্যই আবার তদুদ্দেশে যাত্রা করিব। কল্যই বা কেন, আমার এখানে কি বা আছে, আমি অদ্যই—এখনই—যাই না কেন?

ও কি কোকিল! তুমি এতক্ষণ আমার দুঃখের কথা শুনিয়া এখন উড়িয়া গেলে কেন? কথা তোমার ভাল লাগিল না?—তা যাও আমি আমার সংকল্প ত্যাগ করিব না। আমি জানি এ সংসারে কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাতে নিশ্চয়ই. আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি হয়ত আমারই সেই শুভ সম্ভাবনায় হিংসা-পরবশ হইয়া প্রস্থান করিলে। তুমি যাও—আমি আর তোমার মুখাপেক্ষা করিব না। আমিও চলিলাম। ভগবন্! দুঃসহ যাতনা হেতু চিত্তের স্থৈর্য্য থাকে না। এই জন্য

হে অনাথনাথ! আমি তোমার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিয়াছি। দয়াময়! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। বিপদ্ কালে হে জগদীশ! তুমিই শরণ্য তুমিই সহায়। হে ঈশ্বর আমার সহায় ও সঙ্গী হও, আমার আশা চরিতার্থ কর।

ইতি প্রথমাংশ সমাপ্ত।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

রমণী-হৃদয় ও বিড়ালশাবক।

এ সংসারে রমণীর হৃদয় কয় জন চেনে ও কয় জন জানে? রমণীর হৃদয়ে অনন্ত প্রেম, অনন্ত স্নেহ, অনন্ত মমতা। কে বলিবে এ সংসারে যাহা কিছু কোমল, যাহা কিছু সুখকর, যাহা কিছু দুঃখের স্মৃতি লোপ করিতে পারে, চিত্তের বিভ্রম জন্মাইতে পারে, তাহারই অন্তঃসার লইয়া রমণী-হৃদয় গঠিত হয় নাই? রমণীর মত ভালবাসিতে কে জানে? রমণীর প্রেমের অন্ত কে কবে পাইয়াছে? জীবন-ব্যবসায়ে ভালবাসাই রমণীর একমাত্র মূলধন। রমণী এই মূলধনে বঞ্চিত হইলেন, অমনি তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিল, তাঁহার ব্যবসায় ফুরাইল। তুমি পুরুষ, তোমার ব্যবসায় করিবার কত উপায় রহিয়াছে, তোমার মূল ধনের অন্ত নাই। তুমি একটি অবলম্বন করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না, আর একটি অবলম্বন করিলে; তাহাতেও যদি সুফল ফলাইতে না পার, তুমি তৃতীয় উপায়ের অনুসরণ করিবে। তুমি কিছুতেই ভগ্নাশ হইবে না, তোমার হৃদয় সহজে ভগ্ন হইবার নহে; কারণ আশ্রয় ভ্রষ্ট হইলে তোমার অন্য আশ্রয় বিদ্যমান রহিয়াছে। আশ্রয় থাকিতে কে কবে ডুবিয়া মরে? সংসার সমুদ্রে জীবনব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি এক অবলম্ব হারাইলে, দেখিলে সম্মুখে অন্য অবলম্ব রহিয়াছে; তুমি ডুবিলে না, সেই অবলম্বে নির্ভর করিয়া আবার পূর্ব্ব মত তরণী চালাইতে লাগিলে। কেনই বা চালাইবে না? আশ্রয় থাকিতে কে কবে ইচ্ছা করিয়া সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে, এত সুখের জীবন-বাসনা পরিত্যাগ করে? যশোলিপ্সা তোমার এক মূলধন, এই মূলধন তুমি কত মত ব্যবসায়ে চালাইতে চেষ্টা করিবে। যশো লাভ হইবে বলিয়া দেশের হিতের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইলে, দেখিলে যে সে দিকে সুবিধা নাই। দুর্গম প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া, অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত ভাগ আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীতে নাম রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে, তাহারও সঙ্গতি হইয়া উঠিল না। বক্তার মঞ্চে উঠিয়া তেজঃপূর্ণ মনোমুগ্ধকর হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা যশের উচ্চ

করিয়া, দেখিলে প্রকৃতি তোমাকে বক্তার গুণ দেন নাই। তুমি অন্তরে অন্তরে তোমার বক্তব্য বিষয় তেজঃপূর্ণ করিলে, যে গুণে শ্রোতৃবর্গকে চমকিত করিতে পার, যাহাতে শ্রোতা মাত্রই আনন্দে করতালি দিয়া বিস্ময়ে মুখ-ব্যাদান করিবা তোমার মস্তকোপরে অজস্র প্রশংসাবাদ বর্ষণ করে, মনে মনে সেই গুণে বক্তব্যের মনোহারিত্ব সম্পাদন করিলে; কিন্তু সাধারণ সমক্ষে বলিতে দাঁড়াইয়া দেখিলে তোমার বক্তৃতায় কাহারও মন মুগ্ধ হইল না, কেহ তোমাকে আশানুরূপ প্রশংসা করিল না। তুমি সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য পথে চলিলে; বক্তৃতার যশ লাভ করিতে পারিলে না, কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিলে। কতবার লিখিলে কত কি লিখিলে, একবারও একটিও মনঃপূত হইল না। ছিঁড়িয়া ফেলিলে, আবার লিখিলে, আবার ছিঁড়িলে। ও পথেও যশোলাভ হইল না। অতঃপর ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলে গদ্যেই যেরূপ পার নিজ হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সকলকে দেখাইবে, দেখিবে তাহাতে ও লোকে তোমাকে প্রশংসা করে কি না। এই বার তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; অল্প হউক অধিক হউক, জীবন-ব্যবসায়ে তোমার লাভ হইল, তোমাকে ভগ্ন হৃদয়ে [illegible] হইল না। জ্ঞান-স্পৃহা লোকের প্রশংসা চাও না, ভালবাসা চাও না। লোকে তোমার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহা ভাবুক না কেন, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুক না কেন, তাহাতে তোমার দৃক্পাত নাই; সংসার ডুবিয়া যাউক তাহাতে তুমি ক্ষতি বোধ করিবে না, তোমার জ্ঞান-লাভের ব্যাঘাত কেহ না জন্মাইলেই হইল। পৃথিবী খুঁজিয়া খুঁজিয়া জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি যেখানে যাহা পাইলে, সংগ্রহ করিয়া আনিলে, আনিয়া তাহাতে মগ্ন হইয়াই জীবন শেষ করিলে; তোমার অন্য মূলধনের প্রয়োজন হইল না। এইরূপ তোমার কত কি মূলধন রহিয়াছে যদি ইহার কোনটিও তুমি ব্যবহার করিতে না জান; অর্জ্জন-স্পৃহা অন্যতম মূলধন রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল পুরুষই এ মূলধন লইয়া ব্যবসায় করিয়া থাকেন। যাঁহার অন্য কোন মূলধনই নাই তিনিও এ মূলধনে বঞ্চিত নহেন। এ সংসার-সমুদ্রে প্রবেশ করিলেই জীবিকা-সংস্থানের প্রয়োজন হইয়া উঠে; উদরান্নের জন্য সকলকেই অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। সুতরাং এ সংসারে পুরুষ মধ্যে প্রায় কেহই অর্জ্জন-স্পৃহা-বিরহিত নহেন। ঐ যে দরিদ্র কৃষক বৈশাখের এই প্রচণ্ড রৌদ্রে শরীর দগ্ধ করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতেছে, উহাও অর্জ্জন-স্পৃহায়; আর তুমি যে এই সুস্নিগ্ধ পুষ্পবাসিত প্রাসাদে বসিয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতেছ, তোমার শরীরপরে অনবরত

সলিলস্নিগ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, ইহার মধ্যেও অর্জ্জন-স্পৃহা কিছু কিছু পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু রমণীর? ভালবাসা ভিন্ন রমণীর জীবন-ব্যবসায়ের মূলধন আর এ পৃথিবীতে কি আছে? একমাত্র মূলধন লইয়া রমণীর ব্যবসায়, তাহার আবার কত প্রতিবন্ধক। নিষ্ঠুর নীচমন সমাজ তাহায় আবার কত কি বাধা না ঘটাইয়া থাকে? বলিয়াছি, এ স্বার্থময় সংসারে কয় জন বুঝিতে পারে রমণীর জীবন—রমণীর সুখ, ভালবাসার উপর কতদূর নির্ভর করে; ভালবাসা রমণীর প্রত্যেক কাজের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। তুমি সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় পুড়িয়া এলে, দাসত্বের দুর্ব্বিষহ ক্লেশ ভোগ করিয়া এলে, আসিয়া বিশ্রাম করিলে, তোমার শরীরের গ্লানি অপনীত হইল। কিন্তু মনের জালা প্রশমিত করিতে পারিলে না। তুমি আদেশ করিলে, ভৃত্যগণ তোমার লালমোন হিরামোন কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখী আনিয়া একে একে তোমার চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া রাখিল; তুমি কোনটিকে কিছু খাইতে দিলে, কোনটির সহিত দুটি আলাপ করিলে, কোনটিকে লইয়া কিছু কৌতুক করিলে; এইরূপে কিছু কোমলতার আবির্ভাব করিয়া সংসার-কাঠিন্যের সংঘর্ষে যেরূপ ক্লিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলে, সেই ক্লেশের কিঞ্চিৎ উপশম করিলে, অথবা তুমি যদি বঙ্গের ধনিপুত্র হও, তবে নিরবচ্ছিন্ন অলসতার জন্য সময়ে সময়ে সময়াতিপাত করা তোমার পক্ষে যেরূপ কষ্টকর হইয়া উঠে, সেই কষ্টের কিছু লাঘব করিলে। কিন্তু কোন রমণীকে পাখী লইয়া খেলা করিতে দেখিয়া, 'মর মর' আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য কোন পাখীর লেজ ধরিয়া টানিতে দেখিয়া, সন্তানের বাঁদি-নামে অভিহিত হইবার জন্য লাল পাখীকে বাঁদি বলিয়া গালি দিতে শুনিয়া যদি তুমি মনে কর রমণীর পাখীর সোহাগ তোমার পাখীর সোহাগের ন্যায় স্বল্পার্থবোধক ও ক্ষুদ্রভাবব্যঞ্জক, তবে তুমি রমণীর হৃদয় এখনও চিনিতে পার নাই, রমণীর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে তুমি এখনও অসমর্থ। তোমার পাখীর সোহাগ তোমার অন্তর্জ্জালা নিবারণ-জন্য বাহির হইতে কিঞ্চিৎ কোমলতার সমাবেশমাত্র; রমণীর পাখীর ভালবাসা, রমণীর হৃদয় যে অনন্ত ভালবাসার সমুদ্র, সেই সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্রোর্ম্মি, সেই গভীর সমুদ্রের একটি মন্দান্দোলন।

কে কবে জানিতে পারে এ সংসারে কে কাহাকে ভালবাসে? তুমি মনে করিতেছ এ পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে তোমাকে ভালবাসে; অথচ হইতে পারে তুমি যে অনন্ত ভালবাসার অধিকারী, জগতে সেরূপ ভালবাসা কাহারও অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। আমি ও জানিতাম না যে আমি অনন্ত ... অধিকারী।

চিনিতাম না। এখন চিনিয়াছি; এখন বুঝিয়াছি এ সংসারের সার বস্তু রমণী-হৃদয়; তাই আজ রমণী-হৃদয়ের এ চিত্র অঙ্কিত করিতে আমি প্রবৃত্ত। আমি যে রমণীর ভালবাসার জন্য লালায়িত ছিলাম, মনে করিতাম তাহার হৃদয়ে আমার প্রতি প্রেমানুরাগ জন্মিলে তাহার বাহ্যিক বিকাশ অবশ্যই দেখিতে পাইব, সে রমণী অবশ্যই তাহার প্রণয়ানুরাগ প্রকাশ করিবে। বৎসরের পর বৎসর বিগত হইল, সে রমণীকে কখনও ভালবাসা দেখাইতে দেখিলাম না, নৈরাশ্য দিন দিন আমার হৃদয়ে স্থানাধিকার করিতে লাগিল। ভাবিলাম রমণী হৃদয়শূন্য; নতুবা এত যত্ন করিয়াও তাহার মন পাইলাম না কেন, ও ভাবিলাম রমণী আমাকে ভালবাসিলে অবশ্যই সে বাহিরে ভালবাসা জানাইত। এখন বুঝিয়াছি আমি ভ্রমান্ধ হইয়াছিলাম; আমি রমণী হৃদয় সম্পূর্ণ চিনিতে পারি নাই: আমি বুঝিতে পারি নাই যে রমণী হৃদয় আর ভালবাসা একই কথা। এখন বুঝিয়াছি নির্ঝরিণীই কল কল করিয়া থাকে, স্বল্পতোয়-নদী হৃদয়েই চাঞ্চল্য দেখিতে পাওয়া যায়; চাঞ্চল্য গভীর সমুদ্রের স্বভাব নহে, গম্ভীর সমুদ্রে কখনও কল কল শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। অবস্থাবিশেষে সমু-[illegible]র্দ্দিত থাকে বটে, কিন্তু সে [illegible] তাহা নির্ঝরিণীর কল কল শব্দ নহে; সে শব্দ প্রতাপ-সমক্ষে শৈবলিনীর প্রণয়-প্রকাশের গভীর-নিনাদ তুল্য। তাহা লক্ষ্মণ সমক্ষে লঙ্কেশ-ভগিনীর চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশের ন্যায় গভীরতাশূন্য নহে। তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও আমার ন্যায় ভ্রমান্ধতা জন্মিয়া থাকে, তবে সাবধান হও। দেখিও যেন অতল সমুদ্রের অধিপতি হইয়া শুষ্ক মরুভূমে পড়িয়া রহিয়াছ ভাবিয়া আপনার সুখ আপনি নষ্ট না কর, দেখিও যেন রমণী হৃদয়ের অবমাননা করা না হয়। রমণী-প্রেমের গভীরতা বুঝিতে না পারিয়া আমরা অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। এই ভ্রমান্ধতা কত জনের সুখ নষ্ট করিয়াছে; কত জনের প্রাণনাশক হইয়াছে। এই ভ্রমেই এড্‌উইন বনবাসী হইয়াছিলেন; এই ভ্রমেই নগেন্দ্র দুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর প্রাণ-সংহারক হইয়াছিলেন।

আমি জানিতাম যেখানে প্রেমানুরাগ, সেখানে লজ্জা থাকিতে পারে না। আপনার নিকটে কে কবে লজ্জা করিয়া থাকে; লোকে লজ্জা করে অন্যের নিকটে। আত্মপরজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলোপের নামই প্রকৃত ভালবাসা—যথার্থ প্রেমানুরাগ। এরূপ স্থলে প্রণয়ী-যুগলের মধ্যে লজ্জা সম্ভবে কি প্রকারে? যে হৃদয়-মিথুন প্রভেদশূন্য, তাহাদের আবার এরূপ আত্মপরজ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? এখন বুঝিয়াছি, প্রণয়-

স্থলে লজ্জা অসঙ্গত নহে; এখন বুঝিয়াছি, লজ্জা না থাকিলে রমণী হৃদয় এত রমণীয় হইত না। বহিশ্চাপল্য-বিহীনতা যেমন রমণী-হৃদয়ের গাম্ভীর্য্য প্রতিপাদক, লজ্জা তেমনই রমণী হৃদয়ের সৌন্দর্য্য-পরিবর্দ্ধক। লজ্জা রমণী-হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের নূতনত্ব হ্রাস হইতে দেয় না। সৌদামিনী চমকিয়া চমকিয়া কাল মেঘের কোলে লুকায় বলিয়াই দেখিতে বড় সুন্দর; কাল মেঘের কোলে লুকায় বলিয়াই লোকের সৌদামিনী দেখিবার সাধ ইহকালে মিটিল না। চন্দ্রও ত দেখিতে সুন্দর, কিন্তু কয় জন চাঁদ দেখিবার জন্য চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকে?

যে রমণীর হৃদয় আদর্শ করিয়া আজ আমি রমণী-হৃদয় চিত্রিত করিতে বসিয়াছি, আমার সহিত বিদেশ বাস সময়ে সেই রমণী একটি বিড়াল-শাবক পুষিয়াছিল। ঘটনাক্রমে আমাদিগকে স্থানান্তরিত হইতে হইল। বিড়াল-শাবককে সঙ্গে আনিতে পারিলাম না। তাহাকে আনিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, সে আসিল না? আসিল না, বুঝিল না বলিয়া। তাহাকে ধরিবার জন্য কত যত্ন করিলাম, তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিলাম না; ধরিতে পারিলাম না, সে ভীত হইয়াছিল বলিয়া। রমণী যেরূপ ক্ষীণাঙ্গী ক্রীড়াময় এবং মধুর-প্রকৃতি. বিড়াল-শাবকও সেইরূপ ক্ষীণাঙ্গ ক্রীড়াময় এবং মধুর-প্রকৃতি হইয়াছিল। ক্ষীণাঙ্গ তাহার প্রকৃতি-প্রদত্ত; ক্রীড়াময়তা এবং মধুর প্রকৃতি, এই রমণীর স্বভাব অনুকরণ করিয়া হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। বিড়াল-শাবকে অনুকরণ করিতে পারে, ইহা কখনও শুনি নাই। রমণী বিড়াল-শাবককে পুঁটী বলিয়া ডাকিত। এই পুঁটী নাম রমণীর স্বকপোলকল্পিত কি মানুষে বিড়ালকে পুঁটী বলিয়া ডাকিয়া থাকে তাহা আমি জানি না। রমণী বিড়াল শাবককে বড় ভালবাসিত। আমিও তাহাকে ভাল বাসিতাম, আমি কত ভাল বাসিতাম তাহা বুঝিতাম না। এখন বুঝিতেছি সেই বিড়াল-শাবকের প্রতি আমার সামান্য ভালবাসা ছিল না। খাইতে বসিলে সেই বিড়াল-শাবকের কথা মনে পড়ে, আবার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে আনিতে পারিলাম না বলিয়া বড় দুঃখ হয়। রমণীর সাধের বিড়াল বলিয়াই আমি তাহাকে এত ভাল বাসিতাম, না আমার এ বিড়াল-ভালবাসায় অন্য কোন কারণ আছে তাহা আমি বলিতে পারি না। তোমরা আমার এ বিড়াল-ভালবাসা দেখিয়া হাসিও না। আমি জানি মানুষকে ভালবাসা যত কঠিন, বিড়াল—কুকুরকে ভালবাসা তত কঠিন নহে। তুমি পরনিন্দুক বলিয়া তোমাকে আমি ভাল বাসিতে পারিলাম না; স্বার্থপর বলিয়া সে

কতী-

আমার চক্ষু-শূল; অসরল বলিয়া চতুর্থ একজন আমার প্রীতির পাত্র নহে। কিন্তু বিড়াল কুকুরকে ভালবাসার পথে কোন বাধা প্রতিবন্ধক নাই? এক দিন সেই রমণীকে একটি উপন্যাস পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। রমণী উপন্যাস শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, তুমিও কেন একটি উপন্যাস লেখ না; লেখ 'পুঁটী নামে এক বিড়াল আছে, সে মাছ না হইলে খায় না, বিছানা নাহইলে শোয় না, কোল না হইলে ঘুমায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।" সত্য সত্যই যে সেই বিড়াল-শাবকের উপন্যাস আমায় লিখিতে হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। আজ আমায় সেই বিড়াল-শাবকের স্মৃতি-চিহ্ন রাখিতে হইল; তাহার সম্বন্ধে এই উপন্যাস আমায় লিখিতে হইল। এই বিড়াল-শাবক কখন গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিত, কখন প্রাচীরে উঠিয়া বেড়াইয়া বেড়াইত, আবার সময়ে সময়ে কোথায় লুকাইয়া থাকিত, আমরা খুঁজিয়া পাইতাম না। রমণী যখন "পুঁটী আয়" বলিয়া ডাকিত, তখন সে তীরবেগে ছুটিয়া আসিত; ছুটিয়া আসিয়া রমণীর পদপ্রান্তে গড়াইত, পায়ের চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করিত, আবার থাকিয়া থাকিয়া রমণীর মুখের দিকে তাকাইত। রমণী তাহাকে খেলা দিবার জন্য কখন কখন কিছু শূন্যে ধরিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া ধরিতে না দিত, সে রাগ করিয়া রমণীর গা কামড়াইত। রমণী ঈষৎ কুপিত হইয়া—সে কোপ অনেক সময়েই কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইত—ঈষৎ কুপিত হইয়া, "মর" বলিয়া আস্তে তাহাকে পদাঘাত করিত, সে রমণীর পদাঘাতে কিছু দূরে গিয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিত না। আবার ফিরিয়া আসিয়া রমণীর পায়ে লেজ ভাঙ্গিত, লেজ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পায়ের চারিদিকে আবার ঘুরিয়া বেড়াইত, রমণী বসিয়া থাকিলে সম্মুখে গিয়া এক পায়ে মাতা রাখিয়া অন্য পায়ে লেজ জড়াইয়া পার্শ্বপরে শুইয়া থাকিত; রমণী আপনার কাজ করিত, আর এক এক বার তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। রমণী—বোধ হয় লাথীর দুঃখ ভুলাইবার জন্য—কখন ফিরিয়া আসিলে তাহাকে কোলে লইত, কোলে লইয়া গালে গাল লাগাইয়া সোহাগ করিত, সে আহ্লাদে লেজ নাড়িত। কখন রমণী তাহাকে কোলে লইয়া মুখামুখী হইয়া 'পুঁটু' বলিয়া সোহাগ করিয়া কত কি বলিত, কত কি জিজ্ঞাসা করিত, সে লেজ নাড়িয়া "ম্যাও" করিয়া তাহার উত্তর দিত। এইরূপে রমণী সেই বিড়াল-শাবককে লইয়া খেলা করিত। সেই বিড়াল শাবকও রমণীকে লইয়া কত খেলা খেলিত; কখন সে রমণীর গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইবার সময় দৌড়িয়া গিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিত, রমণীকে যাইতে দিত

না, কখন চুপে চুপে যাইয়া ছোট কবিয়া পায়ে একটি কামড় মারিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া যাইত। কত দিন দেখিয়াছি, আহারান্তে শয্যায় শুইয়া রমণী তন্দ্রাভিভূত, বাহিরে বিড়ালে বিড়ালে ঝক্ড়া বাঁধাইয়াছে; হঠাৎ রমণীর তন্দ্রা ভাঙ্গিল। রমণী চমকিয়া উঠিয়া, 'আমার পুঁটীকে বুঝি মারিয়া ফেলিল" বলিয়া বাহিরে দৌড়িয়া গেল, পুঁটীকে অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইল শয়ন-গৃহেরই এক নিভৃত স্থানে পুঁটী ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তথাপি রমণীর বিশ্বাস হইল না যে সে স্থানে পুঁটীর কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। বোধ হয় বিপদ আশঙ্কার পরে স্নেহশালি মনের গতি এইরূপই হইয়া থাকে। রমণী পুঁটীকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া লইল, উঠাইয়া বক্ষে রাখিয়া আবার শয়ন করিল, শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া রহিল, বিড়াল-শাবক তাহার বক্ষেই ঘুমাইয়া পড়িল। রমণী বাস্তবিক এই বিড়াল শাবককে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, তাহাকে আনিতে পারিল না বলিয়া রমণী কাঁদিতে লাগিল। আমিও—আমি কিছু গোপন করিব না, সকল কথা সরল হৃ[illegible] তোমাদিগকে বলিব—আমিও রম[illegible] রোদন দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ কা[illegible] পারিলাম না; আমিও তাহার [illegible] সঙ্গে সেই বিড়াল-শাবকের জন্য কাঁদিতে লাগিলাম। তোমরা আমাকে রমণী স্বভাব বলিতে হয় বলিও, আমি আমার যেরূপ হইয়াছে, তাহাই [illegible] দিগকে বলিলাম, আমি গোপন [illegible] জানি না। আমার নিকট সেই [illegible] প্রেমময়ীর এই বিড়াল-ভালবাসার দৃশ্য বড় সুন্দর লাগিয়াছিল, আমি বাস্তবিক রমণীহৃদয়ের কোমলতার এই বহির্বিকাশ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। এই দৃশ্যের অবিকল চিত্র যদি তোমাদিগকে দেখাইতে পারিতাম, তোমরাও মোহিত হইতে। কিন্তু তাহা পারিলাম না; পারিলাম না বলিয়া মনে করিলাম এ চিত্র তোমাদিগকে দেখাইব না; পরে ভাবিলাম আপনার জিনিস মন্দ বলিয়া এ-সংসারে কে কবে ব্যবসায় করিতে ছাড়িয়া থাকে; আমি কেন ব্যবসায় করিব না?

জনৈক বঙ্গীয় যুবক।

পলাশির যুদ্ধ।

বৈশাখের প্রথম মার্ত্তণ্ডতাপে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া মার্ব্বেল-প্রস্তর-[illegible]তল দ্বিতল গৃহে দুগ্ধফেণনিভ কুসুম-সুকোমল শয্যায় শয়ান হইয়া মলয়ানিল সেবন করিলে যেরূপ মনোমধ্যে একরূপ অভূতপূর্ব্ব সন্তোষের

য় হয়, তদ্রূপ সমস্ত দিন পার্থিব র্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পৃথিবীর প্রতারণায় তাড়িত হইয়া বাত্যাহত তরণীর ন্যায় পদে গত্যন্তর না পাইয়া একবার এ উপায় পরক্ষণে অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া কষ্টে সৃষ্টে দিন যাপন করিয়া নী-মুখে একখানি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ পাওয়া যায়, তবে সেইরূপ অথবা হইতেও অধিক সুখ প্রাপ্ত হওয়া । যদি সেই গ্রন্থখানি একখানি সরল সুরুচি-ব্যঞ্জক কাব্য হয়, তবে সুখের ার ইয়ত্তা থাকে না। ইংলণ্ডের এক ময়ের সচিব মহাত্মা ফক্স সমস্ত দিবস রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দিন-শেষে আপনার পুস্তকাগারে বসিয়া মিল্টনের (Paradise Lost) নামক মহা-কাব্য অধ্যয়ন করিতেন। একদা তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ক-রিতে আসেন। তিনি উক্ত গৃহে প্র-বিষ্ট হইয়া মুক্তকণ্ঠে বারম্বার আহ্বান করিয়াও ফক্সের কোন উত্তর পান নাই। ঐ মহাত্মা মিল্টনে এতদূর নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন—শয়তানের জ্বলন্ত বক্তৃ-তায় তাঁহাকে এতদূর অভিভূত করিয়া-ছিল; অথবা তিনি সেই নরককুণ্ডের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অনৈ-সর্গিক ব্যাপারের সেই ভীষণতর প্রভাব দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন—যে তাঁহার বন্ধুর সেই গৃহে প্রবেশ পর্য্যন্তও তাঁহার উপলব্ধি হয় নাই। তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান-শক্তিও একেবারে সে সময়ে হ্রাস হইয়াছিল। কথিত আছে মহাবীর সেক-ন্দর সাহ সর্ব্বদা এইরূপ নিমগ্ন চিত্তে য়ুনানী কবিকৃত ইলিয়দ কাব্য পাঠ করিতেন।

যদি নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে চাহ, তবে কাব্য ব্যতীত আর কোথায় ইহা প্রত্যাশা করিতে পার? সে সময়ে তোমার মন হইতে পৃথিবীর পঙ্কিল ভাব ক্ষণকালের জন্য তিরোহিত হইবে। তুমি নির্জ্জনে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া প-রের জন্য দুই এক বিন্দু অশ্রুবিন্দু দিতে সক্ষম হইবে। অত্যাচারীর অত্যাচার দেখিয়া তোমার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইবে, নয়ন হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে, ধমনীতে শোণিত-নদী খরস্রোতে বহিবে। তুমি কখনও মানসে নদীতটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গিণীবক্ষে একটী সামান্য কুসুম দেখিয়া যে শিক্ষালাভ করিবে, সহস্র ভীষ্মে উপদেশ দিয়াও তাহার কণামাত্র তোমার মনে প্রবেশ করাইতে পারিবে না। স্বভা-বের শোভা একেবারে তোমার মন মোহিত করিয়া দিবে। প্রসারিত প্রান্তর, সুনি-র্ম্মল নদীর তীর, অথবা স্নিগ্ধ সৌরভে আমোদিত কুসুমবন—একে একে তো-মার সম্মুখে উদয় হইবে। কখনও তুমি মরুভূমির দুঃসহ গ্রীষ্মে অস্থির হইবে, কখনও হিমানি-বর্ষের তুষার-স্পর্শে তোমার শরীর জড়ীভূত হইবে। কখনও নরককুণ্ডে পাপীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার শরীর কণ্টকিত হইবে ভয়ে ও বিস্ময়ে সিহরিয়া উঠিবে

পরক্ষণেই অমরাবতীর নন্দনকানন তোমার মানসাকাশে উদয় হইবে। গন্ধবহ পারিজাতের সৌরভ বহনে তোমার শরীর ও মনকে পুলকে পূর্ণ করিবে, সুরবালাগণের সুধাময় কণ্ঠস্বরে তোমার মোহ উপস্থিত হইবে। সংক্ষেপে কবি তোমাকে 'তোমার থাকিতে' দিবেননা। তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে কোন দৈব শক্তি যেন তোমার নয়ন ধাঁধিয়া দিতেছে।

মহাকাব্য এবং খণ্ড কাব্য সচরাচর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বা ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া লিখিত হয়। অর্থাৎ প্রায় সর্ব্বদেশীয় কবিগণ এই প্রথাই অবলম্বন করিয়া থাকেন। উদাহরণ দিয়া একথা বুঝাইতে হইবে না। আমাদের দেশে পূর্ব্বোক্ত রীতিটীর অসদ্ভাব নাই। আজি কালি য়ুরোপীয় কাব্যকারগণ ইতিহাস হইতে আপনাদের মনোমত বিষয় বাছিয়া লেন। টেনিসন এবিষয়ে অনেকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রথার সম্যক্ প্রচলন দেখা যায় না। একথা সত্য বটে যে আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ের ইতিহাস হইতে ঘটনা লইয়া কাব্য লিখিলে চরিত্রগুলিকে আমাদের যেন একরূপ পরিচিত পরিচিত বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহাতে একরূপ কতকাংশে ভক্তির হ্রাস হওয়াতে ভাবের তারতম্য ঘটে। কিন্তু এই ভারটী সম্পূর্ণ লেখকের পরই নির্ভর করে। ভাবের বৈলক্ষণ্য ...া সম্বন্ধে যাহা নির্দ্দেশ করা গেল তাহা লেখকের দোষেই ঘটিবার সম্ভাবনা। নতুবা ভাল করিয়া বলিতে পারিলে পিতামহীর নিকটে প্রত্যহ 'এক রাজা তাহার দুই মহিষীর' যে উপন্যাসটি শ্রবণ করা গিয়াছে, তাহাতেও কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত ক... দের কোন কাব্য-লেখক এ পথে প্রকাশ্য ভাবে অনুসরণ করেন নাই। পলাশির যুদ্ধ-প্রণেতা সেই পথ প্রথম প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি 'ডন জুয়ান' ও 'মড' কে মিশ্রিত করিয়া এক ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

* * * * * *

'পলাশির যুদ্ধ' কিরূপ সময়ের ঘটনা তাহা দেখাযাউক। অভিনয়-কার্য্য শেষ হইবামাত্র নাট্যশালার যে অবস্থা ভাবতের তখন সেই অবস্থা। শিখি সিংহাসন-বিহারী মোগল সম্রাট্‌গণ তখন দক্ষবাজীর অভিনেতৃগণ-সুলাভিষিক্ত হইয়াছেন। সংক্ষেপে, তখন ভারতবর্ষ একরূপ 'স্বাধীন'। সেই সময়ের ইতিহাস যাঁহারা মনোনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা অচিরাৎ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। শিবজীর বংশধরগণ তখন দক্ষিণে—সমস্ত ভারতে বলিলে অত্যুক্তি হয় না—সর্ব্বে সর্ব্বা। দেশ তখন 'বর্গির হাঙ্গামায়' জর্জ্জরীভূত। বর্ষীয়সীর মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে 'বর্গি' আসিতেছে শুনিলে লোকে আপনাদের সম্পত্তি ভূমিসাৎ করিয়া আপনাদের সমভিব্যাহারে

করিয়া বিজন অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে গিয়া আশ্রয় লইত। দুরাত্মারা আসিয়া লোকের ধন, প্রাণ, মান, সকলই নষ্ট করিত। লোকের জীবন নাশ করিতে অথবা সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতে তাহাদের কিছুমাত্র বা থাকিত না। গ্রাম সকল জনশূন্য অরণ্যের ভাব ধারণ করিত। এমন কি অনেকে সর্ব্বাঙ্গ জলে ডুবাইয়া কাল হাঁড়ির ভিতর মস্তক রক্ষা করিত। মহারাষ্ট্রীয়গণ নবাব আলীবর্দ্দির নিকট হইতে 'চৌথ' আদায় করিতে আসিয়া লোক-বিগর্হিত এই সকল দস্যু-ব্যবহার করিত। ভাস্কর পণ্ডিত প্রভৃতি তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামায় ইহাই বোধ হয় যে পলাশির যুদ্ধ না হইলে ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগেরই কর-কবলিত হইত। * * আজিও আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা শিশুকে নিদ্রিত করাইবার জন্য তাহাদের দোহাই দিয়া থাকে।

ভারত তখন দুইশত বা ততোধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। আলীবর্দ্দি বুঝিয়াছিলেন যে ভারত তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রীয়গণের অথবা ইংরেজদিগের হস্তে পতিত হইবে। পূর্ব্বে বলা হই- যে ভারত তখন একরূপ 'স্বাধীন'। তাহা প্রতিপন্ন করিতে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। ইহাও বক্তব্য যে ––নবা তখন নাম মাত্র শাসন ––ই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ইতিহাস তাহা প্রতিপন্ন করিবে

পলাশির যুদ্ধের অতি অল্পকাল পূর্ব্বে ভারতের এই অবস্থা। আলীবর্দ্দির মৃত্যুতে সিরাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ঘটনা-প্রবাহের স্রোত এক-দিক্-বাহি। অত্যাচারের উপর অত্যাচার, প্রজারা ধন মান লইয়া সর্ব্বদা সশঙ্কিত। সিরাজ অথবা তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাহার উপর আরও ভার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। মস্তক ভার-বহনে অক্ষম, ভার-সমেত বাহক ধরণী-পৃষ্ঠ আলিঙ্গন করিলেন। তখন ক্লাইব, সম্রান্ত হিন্দুরাজগণের আহ্বানে নিজের স্বার্থ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইলেন। ভার তাহাই রহিল বরং আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল; কিন্তু এবার তাহাকে পড়িয়া যাইতে না দিয়া, পাঁচ জনে ধারণ করিয়া রহিল।

কবি আপনার কাব্যে এই সময়ের চিত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। – জন সামান্য লেখকে এ চিত্র লইয়া কিছুই করিতে পারিতেন না। বলিতে পারেন বাল্মীকি যে রামায়ণে লঙ্কা-সমরের, অথবা হোমর ইলিয়দে ট্রয় নগর সমরের চিত্র দিয়াছেন, তাহা কি বিগ্রহের চিত্র নহে। আমরা বলি, এ সমর কাব্যে চিত্রিত হওয়া সুকঠিন তবে কেবল পলাশির সমরটিই একটি উত্তম কাব্যের আদর্শ-বিষয় হইতে পারে। কেননা যে সমস্ত গুণ থাকিলে কো- বস্তু মানবের হৃদয়-তন্ত্রী আঘাত করিতে পারে—পলাশির যুদ্ধে তাহা আছে

তি অল্প আয়াসেই কবি অসাধারণ কণ রসের অবতারণা করাইতে পারে। পাঠককে কাঁদাইতে তাঁহাকে প্রয়াস াইতে হইবে না। বিলাতি কবি টেনি- াও রাজা ষ্টিফেনের সময়ের বৈরূব্য, াহার কাব্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। বীন বাবু বোধ হয় এ সকল দেখিয়া াহসপূর্ব্বক এ পথে বিচরণ করিতে াসিয়াছেন। এবং যে পরিমাণে কৃত- ' হইয়াছেন তাহা আমাদেরই বাক্যের কতা করিতেছে। কারণ পলাশির বসানে যখন দিনমণি অস্তাচলাবলম্বী ত চলিলেন তখন বলিলেন

কাথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র-কিরণ!
রেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি!"
াথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ!"

তে অশ্রু-প্রবাহে আমাদের াসিয়া গিয়াছে। তিনি যদ্যপি পদে কবিতা না লিখিয়া ঐ একটী ছত্র লিখিয়া রাখিতেন, তাহা লেও আমরা কাঁদিয়া ভাসাইয়া তাম। বলিতে কি, কেবল পলাশির এই কথা আমাদের মনে জাগরূক কাতেই আমরা কাঁদিয়া ফেলিলাম। তুবা মনে করুন্ কয়েকজন বন্ধু সমা- ত হইয়া প্রান্তরে সূর্য্যাস্ত দেখিতে য়াছেন। পশ্চিমের মেঘ-কদম্বকে সিন্দূর- ঞ্জিত করিয়া তপন অস্তা লে চলি- তাঁহার হেমাভ নারি- হয়াছে, ও মণ্ড- লের অধোদেশস্থিত গাঢ় অ... নিমগ্ন হইবেন। একজন ভাবুক ব... সাহে ভাববিস্ফারিত-লোচনে বলি...

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি!"

আপনারা বিস্মিত হইবেন, শরীরে রোমাঞ্চ হইলেও হইতে পারে (কিন্তু তাহা বন্ধুর স্নেহে ও তাঁহার ভাব-বিকম্পিত নয়ন দেখিয়া) কিন্তু এক বিন্দুও উষ্ণ বাষ্প আপনার নয়ন-কোণ অতিক্রম করিবে না। আর পলাশির যুদ্ধ কাব্য পড়িতেছেন—

"ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি বৃটিশ বাজনা,
কাঁপাইয়া বণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্ত-কায়,
অস্ত গেলা রবি হায়,
অস্ত গেলা যবনের গৌরব ভাস্কর।"

পাঠ করিয়া বলিলেন,

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র-কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি!"

বলিবামাত্র দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু-প্রবাহ গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিয়া বক্ষস্থল অতিক্রম করিয়া, মেদিনী—বঙ্গভূমি—চুম্বন করিবে, তাহাকে কাঁদাইবে, তাহাকে আর্দ্র করিবে। ঘন ঘন উষ্ণ-শ্বাসে আপনার নাসাযন্ত্র কম্পিত হইবে। এখন বলুন দেখি কেন এমন হয়! তাহাই আমরা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম

...াত্র পলাশির যুদ্ধ একখানি ...-ব্যঞ্জক উত্তম কাব্য হইতে ।। জগৎশেঠের মন্ত্রভবন, কর্ণধা-...রের সঙ্গীত বা মিরণের অহিফেণ-...ঞ্জিত অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ঢুলু ঢুলু নয়নের স্তিমিত দৃষ্টি আবশ্যক রাখে না। বাইজির কাশ্মীরী ঠুংরি ও তৎসঙ্গে হাব ভাব কটাক্ষের প্রয়োজন হয় না। * * সুতরাং এখন যে ভাবে পলাশির যুদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছে সেভাবে লিখিতে সাহস করিয়া কবি ভাল করেন নাই। স্বীকার করি. "Fortune is a woman & therefore favorable to the young, because they with audacity command her" কিন্তু নিরাপদ পথেই ভ্রমণ করাই যুক্তি-সিদ্ধ। আমরা নবীন বাবুকে অন্তরের সহিত ভালবাসি ও তাঁহার কবিতা পড়িতে ভালবাসি বলিয়াই এ কথা বলিলাম।

পলাশির যুদ্ধ কাব্য না লিখিয়া নাটক লিখিলে বোধ হয় অনেকাংশে ভাল হইত। কারণ নাটক-চরিত্রে যে সমস্ত গুণ থাকা উচিত, সিরাজ ক্লাইব ও মীরজাফরের চরিত্রে তাহা অনেকাংশে আছে; তদ্ভিন্ন লবণব্যবসায়ী উমিচাঁদেরও চরিত্র কোন অংশে ন্যূন নহে।

ইতিহাস-লেখকেরা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে সিরাজকে রঞ্জিত করিয়াছেন। কাব্য-লেখকেরও রীতি তাহাই। রামায়ণে দেখিবেন যে রাবণের নামে আবাল বৃদ্ধ বণিতা ক্রুদ্ধ হইবেন। সেইরূপ মহাভারতে দুর্য্যোধনের নামে সব লেই খড়্গহস্ত হইবেন। কিন্তু অভি... নিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারি... বেন যে রাবণের অপেক্ষা মহানুভব চরি... বাল্মীকির তুলিকায় আর চিত্রিত হয় নাই মিল্টন এক শয়তানের চরিত্র চিত্রি... করিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন; কি... বাল্মীকির রাবণের চিত্র দেখুন ও মেঘ... নাদের চিত্র দেখুন। এক জেদ রক্ষা... রাখিয়া শয়তানের চরিত্র রক্ষা হইয়া... স্বর্গ হইতে নরকে যাইতেছি তবু প্রতি... ছাড়িব না এই টুকুই শয়তানের চরি... উজ্জ্বল অংশ, ঐ খানেই কবির ক... আর এ পক্ষে দেখুন রাবণ রামের সী... হরণ করিয়া আনিয়াছেন, "আ... অবধি স্বভবনে অমঙ্গল ঘটিতে... হার উপর পিতৃব্যের উপদেশ... পর নাই এমন মাতা আসিয়া কাঁ... পদ ধরিলেন—তাহাতেও মন টলি... না। বিভীষণ উপদেশ প্রদান করিতে আসিয়া প্রতিফল স্বরূপ পদাঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে রক্ষঃসুন্দরী মন্দোদরী আসিয়া কত বুঝাইলেন, তাহাও ভ... সিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে এক লক্ষ পুত্র এবং সওয়া লক্ষ নাতির বিনাশ সং... সাধিত হইল। মাতার প্রতি ভক্তি, ভ্রাতা প্রতি স্নে..., পুত্রের প্রতি বাৎসল্য প্রণয়িনীর ...ত প্রণয় সব বিসর্জ্জি... পাষাণ ম... শক্তি

বর, মেঘনাদ হেন পুত্র, কুম্ভকর্ণ হেন ভ্রাতা যাহার দোষে প্রাণ হারাইয়াছে, সেই মহাতেজা রাবণ রাজা শেষে স্বয়ং সমরে সাজিয়া আসিয়া অরি-হস্তে মৃত্যু শ্রেয়ঃ করিলেন। চরিত্রের স্ফূর্ত্তি আর কোথায় দেখিতে চাহেন?

মহাভারতে অনুসন্ধান করুন দেখিবেন দুর্য্যোধনের চরিত্রের কতদূর গাঁথনি। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একই ভাব—বীরত্ব, অভিমান, হিংসা দুর্য্যোধনের শরীরে জাজ্জ্বল্যমান। পাণ্ডবের ধ্বংস সাধন করিব—তাহারা আমার উপকারী, তবু তাহাদিগের ধ্বংস করিব। অর্জ্জুন আমাকে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে একথা শুনিতে চাহিনা—বর দিতে স্বীকার পাইয়াছি দিব প্রাণ যায় তবু সেই বর দিব—কিন্তু যদিও শ্রীকৃষ্ণ বধ্যবর্ত্তিতা করিয়া আসিয়াছেন, তবু সূচ্যগ্র ভূমি দিব না—বিনা যুদ্ধে দিব না। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে—আমার আর কেহই নাই। পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া একেবারে অন্ধকার দেখিতেছি, তবু মন দৃঢ় আছে। দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে দাঁড়াইয়া—প্রবল শত্রু! ভাল কথার আমি কেহ নহি। অপমান করিলে, আইস গদা যুদ্ধ করিব। যুদ্ধে উরু-ভঙ্গে পড়িয়াছি, এখনও গুরুপুত্র অশ্বত্থামা আছ, এস তোমাকে সেনা-পতিত্বে বরণ করি। এখনও বৈর-নির্য্যাতন আশা আমার মনে জ্বলিতেছে। পাঠক দেখিবেন যে ইহার উপর আর চরিত্রের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। সংক্ষেপে দুর্য্যোধনই মহাভারতের নায়ক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ইতিহাস-লেখকেরা সিরাজকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন। কেনই বা না করিবেন? ক্লাইব যখন নায়ক, মার্শম্যান্ যখন নজির, তখন আর ইহার আশ্চর্য্যতা কি? সিংহ যদি চিত্রকর হয় তবে পাঠকবর্গ কি হন বলুন দেখি? তবে কি সিরাজকে যুধিষ্ঠির বলিয়া প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য। তাহা যদি বুঝিয়া থাকেন তবে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। স্বীকার করি সিরাজ প্রজাপীড়ন করিতেন। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহার দোষ, না তাঁহার রাজস্বসচিবগণের দোষ? এখনকার সভ্যতানুমোদনীয় কর গ্রহণ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে রাজস্ব আদায়ে যে গোলযোগ ঘটিবে তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ঐ সিরাজ রাজ্য-চ্যুত হইলে, মীরজাফরেরই সময়ে, বান্সিটার্ট সাহেবের আমলে এবং তৎসময় ও নেজাম উদ্দৌলা ও মহম্মদ রেজা খাঁর সময়েও যে সকল ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছে, তাহা ধর্ত্তব্য নহে কেন? ধরিলাম সিরাজ অত্যাচারী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বতন সুবেদারেরাই বা কি ন্যূন ছিলেন? ঐ মুরশিদাবাদে এক সিংহাসনে বসিয়া মুর্শিদকুলি খাঁ কি না করিয়াছেন? মল মূত্রে কুণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহার নাম বৈকুণ্ঠ রাখা হয়। এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা কর দিতে অপারগ হইতেন অর্থাৎ যাঁহারা

কোরাণের নিত্যতা স্বীকার করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগকে সেই বৈকুণ্ঠে নিমজ্জিত করিয়া বৈকুণ্ঠ ভোগ করান হইত। ইহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচার আর কি হইতে পারে? আরঙ্গেব ও তৎসেনাপতি মীরজুম্লাই বা কি না করিয়াছেন? বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। সরফরাজ খাঁ, সিরাজ, মিরণ আরঙ্গেব—ইহাঁরা এক শ্রেণীর লোক। কিন্তু যত দোষ সিরাজউদ্দৌলার। তাহার কারণ ক্লাইবের সঙ্গে সংশ্রব আছে বলিয়া, এবং পলাশির যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া। কবি আমাদের কথা সম্যক্ রূপ বুঝিয়াছেন তিনি বলেন

"সন্দেহ হইত কি না রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়াতে যদি না হতো চিত্রিত।"

কিন্তু তিনিও সিরাজকে বাঁচাইতে চেষ্টা করেন নাই, অথবা করিলে তাঁহার কাব্যের রসহানি হয়। সুতরাং সিরাজ একেবারে মন্দতম সাষ্টাঙ্গ বরফ কুণ্ডের অন্তস্তম প্রদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছেন। সিরাজ একজন প্রবল অত্যাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু যতদূর অত্যাচারী বলিয়া বর্ণিত হয়েন তাহা সত্য নহে। অন্ধকূপহত্যাজনিত দোষ সিরাজকে সংস্পর্শে না। তাহা মাণিক চাঁদের। যাঁহারা এই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা টরেন্‌স-প্রণীত "Our Empire in India, A book of confessions" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিবেন। মার্শম্যানে অন্ধকূপ-হত্যার বিষয় ও পলাশির যুদ্ধ বিষয়ে যাহা বর্ণিত আছে তাহা দেখিবেন, আর টরেন্স দেখিবেন তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন মাণিক চাঁদের দোষেই অন্ধকূপ হত্যা হয়। কিন্তু পলাশির যুদ্ধরূপ অলৌকিক সামরিক ইতিহাসপাঠক মাত্রেই বলিবেন যে সিরাজ আপনার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-দোষে দূষিত, অতএব সে পাষণ্ড।

এ কথা স্বীকার করিয়া আমরা আমাদের ধর্ম্মনীতির প্রখরতা প্রদর্শনে অগ্রসর হইতাম, কিন্তু পাছে তাহাতে পাঠকের মনে মার্শম্যান-স্বীকৃত রক্ত-শ্বেত-লিপির কথা মনে পড়ে, এবং মহাবীর ক্লাইব চরিত্রে দোষ পড়ে, এই আশঙ্কায় আমরা সে কথা বলিতে পারিলাম না; বরং সেরাজদ্দৌলা ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হউক, তথাপি ভারতের পরিত্রাণ-কর্ত্তা লর্ড ক্লাইবকে আমরা কখন প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-পাপে পাপী বলিতে পারিব না। যে মহাত্মাকে দৈবশক্তি স্বয়ং দুইবার আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করেন, যিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিনা যুদ্ধে এই বিপুল বঙ্গ অধিকার করত বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ এখন আর প্রাচীরে প্রান্তরে খোদিত বা গঠিত করিবার প্রয়োজন নাই, মান্দ্রাজ বোম্বাই, বরদা বেরার বঙ্গ বিহার—যে কীর্ত্তি এখন সর্ব্বত্র উচ্চরবে ঘোষণা

লইয়াছেন। নবাব শিবিরে বাইজীর নাচ পড়ুন আর 'ডন জুয়ান' স্মরণ করুন্ তবেই বুঝিতে পারিবেন।

"ঢাল সুরা স্বর্ণপাত্রে, ঢাল পুনর্ব্বার,
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান।
খাও ঢাল, ঢাল খাও, প্রেম-পারাবার
উথলিবে, লজ্জাদীপ হইবে নির্ব্বাণ,
বিবসনা লো সুন্দরি সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে? নবাবের
কাছে?
ও তবে সুধাহাসি মাখি বিম্বাধরে,
জঙ্গিনী-সম বেণী দুলিতেছে পাছে;
ক চলুক নাচ, টলুক করুণ,
কামের ধ্বজা—কালি হবে রণ।"

শির যুদ্ধ হইতে কবিতা উদ্ধার বীন বাবুকে কবি বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। তিনি যে একজন র কবি তাহা বঙ্গ-সাহিত্য-সংসার স্বীকার করিয়াছেন।

বীন বাবু সৌখীন শ্রেণীর কাব্য-ক। পলাশির যুদ্ধ লেখাতে একটী পকার হইয়াছে। তাঁহাকে অনেকাংশে সৌখীনত্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। তবু তিনি সুযোগ পাইয়াই সৌখীনত্বের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি যদি ঢল ঢল ভাব, সরিয়া সরিয়া গলিয়া গলিয়া যাইতেছে, সৌখীন কবিতার স্থলে একটু গাঢ় করুণরস-প্রবণ বীরপুরুষের মত কবিতা লাগাইতে পারেন, তবে একটী উপকার সংসাধিত হয়। সে যাহা হউক পলাশির যুদ্ধ কাব্যে নবীন বাবু ভাষার লালিত্যাদিতে দৃষ্টি রাখেন নাই। যেখানে 'যাতনা' বেশ শুনায়, সেখানে তিনি 'যন্ত্রণা' ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

রসরচন বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইবার জন্য স্থল-বিশেষ উদ্ধৃত করিবার মানস ছিল, কিন্তু প্রস্তাবের অবয়ব বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া ক্ষান্ত হইলাম। পাঠকবর্গ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

কবির শেষচিত্র দেখুন।

"গভীর নিশীথ, নৈশ প্রকৃতি গভীর,
স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্ব চরাচর;
কৃষ্ণপক্ষ রজনীর রবণ তিমির
ক্রমেক্রমে হইয়াছে আরো গাঢ়তর।"

এমন সময় ক্ষীণালোকে মহম্মদি বেগ সিরাজের কারাগারে প্রবেশ করিল। সিরাজের স্তুতি মিনতি তাহার প্রতিহিংসা-দগ্ধ হৃদয়ে স্থান পাইল না।

'উঠিল উজ্জ্বল অসি করি ঝলমল,
দুর্ব্বল প্রদীপালোকে, নামিল যখন
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন,
সেই শোণিতের স্রোতে, হইল তখন,
বঙ্গ-স্বাধীনতা-শেষ-আশা-বিসর্জ্জন।

অতি ভয়ানক অতি শোকাবহ চিত্র! অতিবড় পাষণ্ড, অতিবড় নরাধমও সিরাজের সেই সময়ের কাতরোক্তি শুনিয়া ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারেন না। নবীন বাবু যে ক্ষমা করিতে বলিবেন তাহা আশ্চর্য্য কি?

পলাশির যুদ্ধ-কাব্য শোক দুঃখে শেষ হইবার কথা, তাহাই হইয়াছে। কবি যেমন সচ্ছন্দ ভাবে বঙ্গভূমিতে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ সচ্ছন্দে—কিন্তু কম্পিত পদে—গলদশ্রুলোচনে—বঙ্গস্বাধীনতা-শেষ আশা বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের হৃদয়, সহজেই দ্রব হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর এই শোণিত-প্রবাহের বীভৎস বিকার দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। যে দিবস এই মোহ ভঙ্গ হইবে, তখনই আমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে; তখনই উচ্চৈঃস্বরে বলিব

"বসুমতি! বঙ্গভূমি! যাও রসাতল,
রেখ না মা! এই পাপ পাতি বক্ষঃস্থল।"

শ্রীবিঃ

সঙ্কর বর্ণ।

জাতিমালার নিয়মানুসারে ছত্রিশজাতি বর্ণ-সঙ্করের বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

বর্ণ সঙ্করগণের উৎপত্তির কারণ ও সময়াদি এখানে বর্ণিত হইবে না। এখানে কেবল প্রত্যেক জাতির সামাজিক অবস্থা লিখিত হইবে।

অম্বষ্ঠ, গণক, ভাট ও রাজপুত্র (রজপুত্র) এই পাঁচ জাতি বর্ণ-সঙ্করগণের শ্রেষ্ঠ ও জাতি সঙ্কর নামে প্রসিদ্ধ।

ব্রাহ্মণের বীর্য্যে ও বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তানগণের নাম অম্বষ্ঠ, অথবা বৈদ্য।

অম্বষ্ঠ-বীর্য্যে ও বৈশ্যাগর্ভে জাত সন্তান বর্ণ গণক নামে খ্যাত হন। ইহাঁদিগের সাধারণ উপাধি দৈবজ্ঞ বা গণক। ইহাঁরা জ্যোতিস্তত্ত্বের ও গ্রহগণের গতি প্রভৃতির বিষয় লইয়া ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করিতেন বলিয়াই ইহাঁদিগের নাম গণক হয়। কালক্রমে কতকগুলি পতিত ব্রাহ্মণও ঐ ব্যবসায় অবল[illegible] তাঁহাদিগের কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক ই[illegible] সমাজে মিশ্রিত হয়েন। তদবধি [illegible]ত্তরা [illegible]লোকের নিকট দৈবজ্ঞ বলিয়া পার[illegible] [illegible] আসি[illegible] বস্তুতঃ ইহাঁরা প্রকৃত বিপ্র নহে[illegible]

ক্ষত্রিয়ার ঔরসে বিপ্রকন্যা[illegible] সন্তানগণ ভট্ট বা ভাট নামে খ্যা[illegible] ভাটগণ সূত-পুত্রগণের ন্যায় লোক-সম[illegible] ব্যক্তি-বিশেষের গুণ কীর্ত্তন করি[illegible] থাকেন। ইহাঁরা লোকের বংশাবলী বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইতেন। রাজ-সমীপে প্রভাত কালে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষের গুণানুবাদ দ্বারা তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিতেন। বিবাহ সভায় কন্যা ও বর পক্ষের বংশাবলীর আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেন। অধুনা বঙ্গদেশীয় ভাটদিগের সেরূপ নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তবে কোন কোন স্থলে

ইহাঁরা পূর্ব্ব পুরুষের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়া থাকেন। ইহাঁরা লোকসমাজে ভাট বামন বা (ভট্ট ব্র.) বলিয়া পরিচয় দেন।

শূদ্র-কন্যার গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে জাত পুত্রের নাম কায়স্থ। ইহারা শূদ্র ও মসিজীবী।

বৈশ্যকন্যার গর্ভে ও কায়স্থের ঔরসে জাত পুত্রের নাম রাজপুত্র বা (রজপুত)।

পশ্চাল্লিখিত পাঁচ জাতি বণিক্ নামে খ্যাত। যথা গন্ধবণিক্, শঙ্খবণিক্, মণিকার ও কংস-বণিক্ বা কাংসারি ও সুবর্ণবণিক্।

রজপুত-কন্যায় ও অম্বষ্ঠ-বীর্য্যে জাত গন্ধবণিক্ বলিয়া খ্যাত। ইহারা গন্ধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এরূপ প্রমাণ আছে যে ঐ গন্ধ বণিকের কোন ব্যক্তি কোন মুনি-পত্নীকে শঙ্খ দিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহাকে শঙ্খ-বণিক্ নামে আখ্যা দেন।

শাঁখারীর ঔরসে গন্ধবণিক্-কন্যার গর্ভে জাত সন্তানের নাম কংস-বণিক্। ইহারা কাংস্য ও তাম্রাদি ধাতুর পাত্র গঠন ও বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

শাঁখারী-কন্যার গর্ভে ও কাঁশারীর ঔরসে জাত সন্তান মণিকার নামে খ্যাত। ইহারা মুক্তা প্রবাল ও হীরকাদির ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাই ইহাদিগের জাতীয় বৃত্তি।

কাংস্যকারের ঔরসে ও মণিকারের গর্ভে যে সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, সে স্বর্ণবণিক্ নামে খ্যাত হয়।

এই পঞ্চবিধজাতি বৈশ্যদিগের বৃত্তির একতম বাণিজ্য, তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত বলিয়াই ইহারা বণিক্ নামে খ্যাত হয়। কিন্তু বৈশ্যদিগের ন্যায় ইহাদিগের যে উপনয়ন হইত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহারা সৎশূদ্রের মধ্যে পরিগণিত হয়। কালক্রমে বল্লাল সেন দ্বারা সুবর্ণবণিক্গণ অপদস্থ ও জল অব্যবহার্য্য শূদ্রের অন্তর্নিবিষ্ট হয়েন। এই কয়েক জাতি বহুকাল শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ও মাসাশৌচ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

দ্বিজাতি-সেবাই শূদ্রদিগের প্রধান বৃত্তি। জীবিকার্থে অন্য বৃত্তি যাহা আছে তাহা তাঁবা সামাজিক প্রভেদ মাত্র। নবশায়ক কোন মতে নবসপ্ত কোন মতে নবশাখ সম্প্রদায় জানা যায়। ইহারাই এদেশের আদিম নিবাসী। যৎকালে দাস, গোপাল, কুলমিত্র ও অর্দ্ধভাগী লাঙ্গুলের গৃহে ব্রাহ্মণাদির ভোজনে পাপ জন্মিত না, তৎপূর্ব্বে ইহারা দ্বিজাতিত্রয়ের নিকট আপনারা পরাভব স্বীকার করে। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া যাহার যে বৃত্তি ছিল তাহাকে সেই ব্যবসায়ী নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর সখ্যতা বন্ধন করিয়া দেন, সেই সময় হইতে তাহারা সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইল। পরস্পর এক পুরোহিত দ্বারা ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তদনুসারে তাহারা নবসপ্ত

বলিয়া পরিগণিত হয়। কেহ কেহ বলেন ইহারা নয়টী পৃথক্ জাতি, সুতরাং শূদ্রজাতির নয়টী শাখামাত্র, তদনুসারে ইহাদিগের নাম নবশাখ।

বস্তুতঃ ইহারা—পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করণ কালে এই কয় জাতি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল অর্থাৎ শায়কস্বরূপ হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে দেখাইয়াছিল বলিয়াই—পরশুরামের শায়ক স্বরূপ। তদনুসারে জাতিমালার বচনানুসারে ইহারা শায়ক বাণ বা নবশায়ক পদ বাচ্য।

কাংস্য-কন্যার গর্ভে বণিকের ঔরসে জাত সন্তান গোপ জাতি বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা চাসী।

কাংস বণিকের কন্যায় গোপ হইতে জাত পুত্রের নাম তৈলী ও তাম্বুলী। ইহারা কুসীদজীবী।

মণিকারের ঔরসে তৈলী-কন্যার গর্ভে জাত সন্তানের উপাধি তন্তুবায়। বস্ত্রবয়ন ইহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়।

তন্তুবায়ের ঔরসে তৈলী-কন্যার গর্ভে জাত সন্তান মালাকার নামে খ্যাত। পুষ্পচয়ন ও মালা গ্রন্থনাদি ইহাদিগের উপজীব্য। গন্ধবণিক্-কন্যার গর্ভে মালাকারের ঔরসজাত সন্তান মোদক আখ্যা পায়। লড্ডুকাদি প্রস্তুত করা ইহাদিগের ব্যবসায়।

তৈলী-কন্যার গর্ভে মোদকের ঔরসে জাত সন্তান পট্টিক বা বারুজী সংজ্ঞা পায়। তাম্বুল প্রস্তুত ও বিক্রয় করা ইহাদিগের বৃত্তি।

গোপ-কন্যার গর্ভে বারুজীর ঔরসে জাত সন্তান কুলাল বা কুম্ভকার আখ্যা পায়।

কুম্ভকারের ঔরসে ও তন্তুবায় কন্যার গর্ভে জাত সন্তান কর্ম্মকার আখ্যা পায়। ইহারা লৌহময় দ্রব্য প্রস্তুত করে।

মোদক-কন্যার গর্ভে কুম্ভকার সহযোগে যে পুত্র জন্মে তাহারা নাপিত সংজ্ঞা পায়। ক্ষৌর কার্য্য ইহাদের জাতীয় বৃত্তি।

এই কয়েক জাতির উৎপত্তি বিবরণে ইহাদিগকে এই কয়েক জাতির শাখা প্রশাখা মাত্র বিবেচনা করা যাইতে পারে।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি

মনকথা তোরে গোপনে কই।

চল বিধুমুখী,
চল হই সুখী,
যথায় ভাসিছে চাঁদের আলো।
নিকুঞ্জকাননে,
সন্ধ্যা-সমীরণে,
ঝিকি মিকি পাতা নাচিছে ভালো।
বনের মাঝারে,
আধ অন্ধকারে,

বলিব তোমারে মরম-ব্যথা।
লাজের জ্বালায়,
দিনের বেলায়,
পারিনে বলিতে মনের কথা।

বলিব তোমারে,
মনের মাঝারে,
আমার যে হয়,——মিনতি রাখ।
যবে প্রাণধন,
মাতাইয়া মন,
কাছে এসে তুমি বসিয়া থাক।
চল বিধুমুখী,
চল হই সুখী,
যথায় ভাসিছে চাঁদের আলো।
তারকা যেমন
আকাশে, তেমন,
তুমিলো তথায় শোভিবে ভালো।
কানন-মাঝারে,
কিম্বা নদীধারে,
যবেলো জোছানা ঘুমায়ে রয়।
তবে লো তোমায়,
এ হেন শোভায়,
দেখিতে কেমন মনে মনে হয়।
চল বিধুমুখী,
চল হই সুখী,
যথায় ভাসিছে চাঁদের আলো।
দেখিব তোমায়,
এ হেন শোভায়,
চাঁদের কিরণে শোভিবে ভালো।

—

চল ধীরে ধীরে,
পর্ব্বতের শিরে,
দেখিবে কেমন সাগর বেলা।
কেমন ভীষণ,
তরঙ্গ গর্জ্জন,
বারিরাশি কিবা করিছে খেলা।
কখন লাফায়ে
কখন ঝাঁপায়ে,
কখন উঠিছে গগণে যেন।
কখন পড়িছে,
জলধি নড়িছে,
রসাতলে ধরা যাইছে হেন।
তরঙ্গ তুফান,
বায়ু হানে হান,
বহিছে সমান ভীষণ তাহে।
ইহার মতন,
বল প্রাণ ধন,
কিবা আছে আর তুলনা যাহে।
ইহারো মতন,
আমার ভীষণ,
মনেতে তরঙ্গতুফান বহে।
তোমারে হেরিয়ে,
বহুকাল প্রিয়ে,
রহেছি মাতিয়ে হৃদয় দহে।

—

চল ধীরে ধীরে,
পর্ব্বতের শিরে,
দেখিবে কেমন হৃদয় মম।
কেমন মাতিছে,
কেমন নাচিছে,
কেমন উঠিছে পড়িছে ক্রমঃ।
কানন-মাঝারে,

কিবা সিন্ধু ধারে,
আধ অন্ধকারে চললো সই।
কিবা চন্দ্রভাতি,
কি শোভার রাত্তি,
মনকথা তোরে গোপনে কই।

শ্রীপূ—

গল্পরচনা।

চত্বারিংশ বৎসরে দ্বিতীয় পক্ষের সংসার করিয়া, নবীনা, রসিকা, শিক্ষিতা প্রেয়সীর অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে পাবেন, এমন বিজ্ঞানপ্রবীণ, স্বাধীনচেতা, উন্নতমনা বীরপুরুষ আজিও এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সুতবাং আমি—হীনমতি ক্ষুদ্রজীব!—একদিনের তবেও মনের দুঃখ মুখে না ফুটিয়া এই বিড়ম্বনাতুষ্ট চিত্তে সহ্য করিতেছি, ইহা বিস্ময়ের কথা নহে। কিন্তু এই বার পিঠে ভাতের কাঠি চাপিয়াছে, আব পারি না। গত কল্য বিধুমুখী আমার উপর প্রণয়বীজ গল্প শুনাইবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

গল্প! সর্ব্বনাশ! যে কখন গল্প রচনা করে নাই, অথচ রচিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই জানে যে রামের কথার সঙ্গে শ্যামের কথা গাঁথিয়া সেই দুই কথায় আবার বামী— কথা জড়াইতে ইলে, মাঘ মাসের শীতে বরফের —ম বসিয়া থাকিলেও কেমন গলদ্ঘর্ম্ম হয়। তাহার পরে, যদি বা দাঁড়ায়, তবে কপালকুণ্ডলা জলে আর উঠিল না কেন, ভ্রমর মবিল আর বাঁচিল না কেন, এই কৈফিয়ৎ দিতে প্রাণান্ত। আবার এই বিপদের সময়ে অদূরে একটী দামোদর রোষকষায়িত নেত্র বিস্ফারিত ক— তোমাকে শাসাইতেছেন—চিত্রটা একব— হৃদয়ঙ্গম কবিবার চেষ্টা কর, তাহ— পবে ভাবিয়া দেখ দেখি গল্প রচন— কি প্রকার ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কত বিপদ্ সঙ্কুল!

বিধুমুখীর আদেশ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র আমার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। তথাপি — — ভব করিয়া ব— লাম—"আমার এবয়সে আবার গল্প — আমার আবাব প্রণয়!"

উত্তরে যাহা শুনিলাম, তাহাতে শোণিতাধার শুষ্ক হইয়া উঠিল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম;—উত্তর হইল—"বয়স তোমার হইয়াছে, আমার কি? যদি ভাল বাসিতে জান না, তবে বিবাহ করিয়াছ কেন?" স্বর্ণকারের ভস্ত্রাচালনার ন্যায় অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইলাম, যথাসম্ভব আত্ম সংযমন করিয়া, চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, প্রেয়সী করুণ রসের

শবণ লইয়াছেন, নয়নে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতেছেন, বা কান্নাব অভিনয় করিতেছেন।

সান্ত্বনাব জন্য দুই কথা তাড়াতাড়ি বলিলাম, বলিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম;——

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় হয়, বৃহৎ প্রান্তর, প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতেছে, এমন সময়ে একজন যুবা পুরুষ অশ্বারোহণে একাকী যাইতেছেন। সম্মুখে দেব-মন্দিবেব ন্যায় এক অট্টালিকা দেখিয়া সেই থানে আশ্রয় লইবার মানসে——

আর বলিতে পাইলাম না। প্রেয়সী বাধা দিয়া বলিলেন, " ও যে 'দুর্গেশ নন্দিনী,' আমি কতবার পড়িয়াছি। তোমাকে বুঝি ইহাই বলিতে বলিলাম ?"

বিধুমুখী বিদুষী। অপ্রতিভ হইলাম, ভয়ও হইল। কিন্তু বিধুমুখীর পূর্ব্বাশ্রুর পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা তাহা হইতেও প্রবল। তখন বলিলাম, যে [illegible]তি আমি রচিতে জানি না, একটা প্রকৃত ঘটনার কথা বলি, তোমার ভাল লাগিলেও লাগিতে পারে। যাহার কথা, তাহার মুখে আমি শুনিয়াছি। এই ভূমিকায় তিনি পরিতুষ্ট হইলেন, আমিও ভাবিয়া ভাবিয়া, ইতিহাস ভূগোলের মুণ্ডপাত করিয়া, সমাজচিত্র ও মানব-প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া আষাঢ়-সুলভ বর্ণিতব্য উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিলাম।——

লাহোব হইতে শ্রীনগর যাইবার পথের মধ্যভাগ হইতে আব একটী শাখাপথ পর্ব্বত প্রদেশেব উপর দিয়া বাম দিকে চলিয়া গিয়াছে। প্রায় ছয় ক্রোশ শেষোক্ত পথ ধবিয়া গেলে মনোহর দেবদুর্গ নগব দেখিতে পাওয়া যায়। দেবদুর্গের সৌন্দর্য্যেব সীমা নাই; নগরে প্রবেশ করিতে হইলে সর্পগতিতে ক্রমারোহণ করিয়া তত্রত্য শৈল শ্রেণীর উচ্চতম শিখবে উঠিতে হয়। দীর্ঘে ও প্রস্থে প্রায় এক ক্রোশ ব্যাপিয়া সমতল ভূমি; এবং তাহাব উপরেই নগর সংস্থাপিত। নগব অতিক্রম কবিলে সমুদয়ই পার্ব্বত্য ভূমি। যে পথ দিয়া নগব প্রবেশ কবিতে হয় বলিয়াছি, তাহা স্থানে স্থানে এরূপ শৈলপ্রান্ত সংস্পর্শ করিয়াছে, যে দৈবাৎ পদস্খলন হইলে একেবারে দুই তিন শত হস্ত নিম্নে পড়িয়া যাইতে হয়। তদ্ভিন্ন প্রাকৃতিক ক্রিয়া বলে এই সকল স্থলে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড আপনা আপনি স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়। এই প্রকাব তিনটী ভিন্ন পথ আছে, তিনটীই নিসর্গ-শোভায় সমতুল, তিনটীই উক্তবিধ-বিঘ্ন-সঙ্কুল। দেবদুর্গের দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বের পথে প্রায় সর্ব্বদাই লোক-যাতায়ত আছে; কিন্তু উত্তর দিকে যে পথ আছে তাহা অধিকতর বিঘ্নময় বলিয়াই হউক, বা সে দিক দিয়া কতিপয় ক্ষুদ্র জনপদের লোক ক্রয় বিক্রয়াদির জন্য দেবদুর্গে আইসে, অন্যথা বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলি-

যাই হউক, নগরের উত্তরাংশে লোক-সমাগম অতি অল্প হইয়া থাকে।

নগরের বহির্ভাগে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে, দুই জন যুবক উত্তরদিকের পথের ধারে বিকালে বসিয়া আছেন, উভয়ে নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, যেন কোন গভীর মন্ত্রণায় উভয়েই লিপ্ত, অথচ অগ্রে মনের কথা প্রকাশ করিতে উভয়েই সঙ্কুচিত। যুবকদ্বয় প্রায় সমবয়স্ক, দুই জনেই সুশ্রী। যিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, অপেক্ষাকৃত কৃশাঙ্গ অথচ বলবান্, তাহার মুখমণ্ডল অধিকতর গম্ভীর, নয়ন-পল্লব যেন চিন্তা-ভারাবনত। ইহাঁর নাম সুরনাথ, বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়। অন্য যুবা দিব্য গৌর-বর্ণ, মল্লের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট এবং সেইরূপ বলিষ্ঠ বলিয়াও বোধ হয়। বয়সে সঙ্গী অপেক্ষা বৎসরদ্বয়ে জ্যেষ্ঠ হইবেন। মুখমণ্ডল গম্ভীর, কিন্তু তাহারই সঙ্গে প্রফুল্লতা এবং ঈষৎ চঞ্চলতা যেন মিশ্রিত রহিয়াছে। নাম সর্ব্বেশ্বর।

অনেকক্ষণ সেইরূপে মৌনী থাকিয়া সর্ব্বেশ্বর প্রথমে কথা কহিলেন; বলিলেন "ভাই, আমি তোমায় অনুরোধ করি নাই; তবে এই দুই মাসের আলাপে তোমাকে ভাল বাসিয়াছি, না জানিলেও তোমার গূঢ় ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছি। আমার কৌতূহল হইয়াছে সত্য; তথাপি যদি সে কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইলে তোমার অন্তরে কষ্ট হয়, চল, গৃহে ফিরিয়া যাই; কিম্বা সৎপথচ্যুত না হইয়া অন্যপ্রকারে যদি তোমার মনস্তুষ্টি সাধন সম্ভব হয়, আদেশ কর, এ শরীর দিয়াও তোমার সেবা করি।"

সুরনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কোন কথা কহিলেন না; ক্ষণপরে যখন নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন বন্ধুর স্কন্ধে মুখ আরোপণ করিয়া রমণীর ন্যায় কাঁদিলেন। তাহাতে কথঞ্চিৎ শান্তি হইল।

অবসর বুঝিয়া সর্ব্বেশ্বর অন্ধকারে একটী ঢিল ছুড়িলেন; বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হতাশ প্রণয় বা বিরহ-প্রণয়ের সহিত চিত্ত বেগের সম্পর্ক আছে কি না? . ত্যবর্গ

সুরনাথের মুখ অধিকতর গম্ভীর হইল, একটু বিবর্ণও হইল। সর্ব্বেশ্বর কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, কিছু বলি[illegible]টী না। সুরনাথ এতক্ষণে কথা ক[illegible]লেন; বলিলেন—"তোমাকে বন্ধু লাভ[illegible]মি করিয়া আমি যে সুখ পাইয়াছি, এ জন্মে[illegible]ত আর তেমন সুখ আমার ভাগ্যে ঘটে[illegible]া নাই। অনেক দিন অবধি তোমাকে[illegible]ন্ত মনের কথা বলিব বলিয়া মনে করি-এ য়াছি, কিন্তু বলিতে পারি নাই। সেই য় কথা বলিবার জন্যই আজি তোমাকে এখানে আনিয়াছি। আমার অভিভূত হইবার কারণ আছে কি না, আমার ক কাহিনী শুনিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে। হ শুনিয়া বিচার কর, কিন্তু আমার দুঃখ ত,

এ জন্মে যাইবে না।” বলিতে বলিতে আবার চক্ষে জল আসিল; অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ভুবনাথ বলিতে লাগিলেন;——

“হুগলী জেলার অন্তর্গত বিজন গ্রামে আমাদের বাস। গ্রামের মধ্যে আমরাই সমৃদ্ধিশালী ছিলাম। আমার পিতা কুলীন-শিরোমণি, কিন্তু অল্প বয়সে তিনি পিতৃহীন হওয়া প্রযুক্ত বাল্য কালে কেহ তাঁহাকে বিবাহ করাইতে পারে নাই, এবং নিরতিশয় বিদ্যানুরাগী ও পরোপকারনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পিতা ও ধনের বাকুলের কুহকে ভুলেন নাই। এইরূপে ব্রাত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম প র্যা পাবি নি অনূঢ় থাকেন।

পিত বি মুখোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ বংশজ ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামে বাস করিতেন। বৃদ্ধের এক মাত্র কন্যা ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। কন্যা অসামান্য রূপবতী, নাম জাহ্নবী। রামহরি নিতান্ত দরিদ্র; নিজের এবং কন্যার ভরণ-পোষণ করাও ক্রমে তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিল; তখন পিতা তাঁহাদের অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু রামহরি তদীয় কন্যাকে সংস্কৃত পড়াইবার অনুমতি পিতাকে দিবেন, পিতা এই অঙ্গীকার বৃদ্ধের নিকট করাইয়া লইলেন। বিদ্যাশিক্ষা করিলে কন্যা বিধবা হয়, অসচ্চরিত্রা হয়, দরিদ্রা হয়, রামহরির এইরূপ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু জঠরের জ্বালায় তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। পিতা রীতিমত বিদ্যাদান এবং অর্থদান করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোককে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য পিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল; কিন্তু রামহরির কন্যা ভিন্ন তাঁহার সাধ পুরাইবার স্থান আর মিলিল না। সুতরাং এই একমাত্র স্থলেই তাঁহার সমস্ত যত্ন প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে একজন দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান জমীদার ছিল। রামহরিকে সে এক দিন ডাকিয়া পাঠায় এবং কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্য রামহরির আত্মীয় কেহ আছে কি না জিজ্ঞাসা করে। কেহ নাই জানিয়া রামহরিকে তাহাদের গ্রামে গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করে, এবং সেখানে বাস করিলে রামহরির ধন মানের উপায় হইবে এই কথা তাঁহাকে জানায়। রামহরি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, এবং “বুঝিয়া বলিব” বলিয়া চলিয়া আসিলেন। বিদায় কালে মুসলমান তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে চাহিল; যবনের দান গ্রহণীয় নহে বলিয়া রামহরি সে দিন চলিয়া আসিলেন।

আবার এক দিন, তাহার পর আর এক দিন, এইরূপে দশ পনর দিন মুসলমান রামহরিকে ডাকাইল। পরিশেষে এক দিন রামহরিকে মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিল; বিধর্ম্মীর ইচ্ছা যে ব্রাহ্মণ মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন

এবং স্বীয় কন্যাকে যবনের অন্তঃপুর-চারিণী করিয়া দেন। রামহরির মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল, তিনি অজ্ঞানের ন্যায় ক্রোধে অন্ধ হইয়া পাষণ্ড মুসলমানকে তাহার বাটীতে বসিয়া, তাহার পথের উপর গালি দিলেন। জাহ্নবীকে বল-পূর্ব্বক লইবার জন্য মুসলমান অনুচর-বর্গের প্রতি আদেশ করিল; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তখন সেইখানে বসাইয়া রাখিল। তিনি ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বিকালে রামহরি গিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল তথাপি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না দেখিয়া জাহ্নবী চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন; রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় তাঁহার ব্যাকুলতার পরিণাম হইল—দুই জন যবন-দূত আসিয়া জাহ্নবীকে ধরিয়া লইয়া গেল। প্রতিবেশী দুই চারিজন জাহ্নবীর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া দেখিতে আসিল, কিন্তু ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। জাহ্নবী তখন একাদশ-বর্ষীয়া বালিকা। রামহরির কটূক্তিতে বোধ হয় মুসলমান ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, নহিলে হয় ত সহসা বল-প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইত না।

ক্ষণকাল পরেই আমার পিতার কাণে এ কথা উঠিল। তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া তিনি থানায় একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন, এবং স্বয়ং ঊর্দ্ধশ্বাসে মুসলমানের বাটী অভিমুখে দৌড়িলেন। সেখানে পৌছিঁয়া দেখেন রামহরি দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চীৎকার করিতেছেন এবং যবনকে যথেচ্ছা গালি দিতেছেন; যবন তাঁহার বুকের উপর বসিয়া উপবীত খুলিয়া লইবার উপক্রম করিতেছে, বৃদ্ধ যথাশক্তি তাহার দুই হাত একত্র ধরিয়া রাখিয়াছেন। নিকটে একজন যবনভৃত্য দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে, এবং ঈষৎ হাসিতেছে। একটীও বাক্যব্যয় না করিয়া পিতা সবলে যবনের বক্ষে পদাঘাত করিলেন, পাপিষ্ঠ চিত হইয়া পড়িয়া গেল; সুযোগ বুঝিয়া—পিতার ভাব দেখিয়া—নিকটস্থ ভৃত্য স্থানান্তরে পলাইয়া গেল। মুসলমান পুনরায় উঠিল, এবং পিতার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল পরেই ভৃত্যবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল, পিতাকে ধরিল, এবং রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বন্ধন করিল। এমন সময়ে থানাদার আসিয়া উপস্থিত।

দারোগা হিন্দুসন্তান; সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে উৎকোচের প্রলোভন মানিল না, বিনা পক্ষপাতে অনুসন্ধান করিয়া, দুরাচার যবন এবং তাহার দুই জন ভৃত্যকে ধৃত করিয়া বিচার জন্য পাঠাইয়া দিল। বিচার হইল; রামহরি, জাহ্নবী, পিতা ঠাকুর এবং অন্যান্য লোকের সাক্ষ্য দিলেন, অপরাধিত্রয়ের কারাবাসের আদেশ হইল। তখন আমার পিতার বয়ঃক্রম উনিশ বৎসর।

সে গোলযোগ মিটিয়া গেল; দিন যাইতে লাগিল; কিন্তু রামহরি দুঃখে-

সহিত বুঝিতে লাগিলেন যে যবন স্পৃষ্টা বালিকার পাণিগ্রহণ করিবার পাত্র পাওয়া দুষ্কর। রামহরি যুগপৎ রোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া পিতাকে এক দিন স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার বিড়ম্বনার কথা বলিলেন। পিতা অপ্রতিভ হইলেন, কিছু বলিলেন না। তিন বৎসর এই ভাবে গেল, জাহ্নবীর বিবাহ আর হয় না।

তখন পিতাঠাকুর আপনি জাহ্নবীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া রামহরির নিকট প্রস্তাব করিলেন। জাহ্নবী একে বংশজ-কন্যা, তাহাতে যবন-স্পৃষ্টা। রামহরি প্রথমে বিবাহের কথায় বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না, অবাক্ হইয়া রহিলেন। পিতা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে বহুপূর্ব্বেই তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিতেন, কিন্তু পাছে জাহ্নবী তাঁহাকে ভবিষ্যতে কখনও স্বার্থপর মনে করিবেন, এই জন্য তিনি এত কাল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের নিঃস্বার্থ প্রণয়বেগ সম্বরণ করিয়া অন্য পাত্রের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন দেখিলেন যে জাহ্নবীর মনের ভাব তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং জাহ্নবীও তাঁহার পরিচয় পাইয়াছেন, তখন আর বিবাহ না করিবেন কেন? পিতা কুল-ভঙ্গের ভয় করিলেন না। রামহরি আহ্লাদে অধীর হইলেন। জাহ্নবীর সহিত পিতার পরিণয় সম্বন্ধ হইল। জাহ্নবী আমার জননী। রামহরির মৃত্যু হইয়াছে।

আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন পিতৃমুখে আমি এই কাহিনী শুনিয়াছিলাম। তিন-বৎসর-বয়স্কা আমার একটী সহোদরা দৌড়িয়া দৌড়িয়া খেলা করিতেছিল; আমি উপকথা শুনিতে বড় ভাল বাসিতাম, পিতাকে উপকথা বলিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম; তাহাতেই তিনি উপকথার পরিবর্ত্তে আমার জননীর ইতিকথা বলিতেছিলেন। মাও শুনিতেছিলেন, আর আহ্লাদের, সুখের, গৌরবের হাসি হাসিতেছিলেন। সে চিত্র আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে; সে কাহিনী ভুলিবার নহে, তাই মনে আছে। কিন্তু পিতা নাই, মা নাই, ভগিনী নাই।" সুরনাথের অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল; সর্ব্বেশ্বর সে জল মুছাইবেন, মনে করিলেন, কিন্তু পারিলেন না; আপনি গলদশ্রুলোচনে মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুরনাথ কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরপি বলিতে লাগিলেন।

"রমাপতি নামে পিতার এক গুরুপুত্র ছিলেন; উদ্ধত-স্বভাব, মূর্খ, ব্যবহার-দোষে নিজ পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেরই বিরাগ-ভাজন হইতে লাগিল। শেষে আত্মীয় স্থলে একদা এমন দুষ্কি্য়ার পরিচয় দিল যে ক্রোধে ঘৃণায় এবং লজ্জায় তাহার পিতা তাহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিল। গুরুগোষ্ঠী গ্রামবাসী।

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় আমার পিতা তা-

হাকে নিজগৃহে স্থান দিলেন; বিদ্যা ও নীতি শিখাইতে লাগিলেন। রমাপতিও পূর্ব্ব দুস্কৃতি এবং বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া সাধুতার গুণ বুঝিতে লাগিল। ক্রমে তাহার আত্মীয়বর্গের রাগ পড়িয়া গেল; রমাপতি নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। কৃতজ্ঞতা ভুলিল না, নিয়ত আমাদের বাটীতে আসিত, আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিত। পিতা অপেক্ষা রমাপতি বয়সে ছোট, পিতাকে দাদা বলিত; পিতাও তাহাকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত দেখিতেন। আমার একটু জ্ঞান হওয়া অবধি রমাপতি অতি যত্নের সহিত আমার অধ্যাপনা করিত।

পিতার মুখে যে দিন তাঁহাদের বিবাহের কথা শুনিলাম, তাহার প্রায় তিন মাস পর এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে রমাপতিকে পিতা ঠাকুর ডাকিয়া আনিলেন; এবং স্থানান্তরে যাইতে হইবে বলিয়া আমাদিগকে, আমাদের জননীকে ও গৃহস্থলীর সমুদয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে ও দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রমাপতি জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে গঙ্গানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার জন্য কাশী যাইতে হইবে, এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চারি পাঁচ মাস হইবার সম্ভাবনা। পরমাহ্লাদের সহিত রমাপতি এ ভার গ্রহণ করিল, ইহা বলাই বাহুল্য। গঙ্গানন্দ স্বামী কে, তাহা জানিতাম না।

পরদিন জননীর নিকট পিতা বিদায় লইলেন; জননী কাঁদিলেন, পিতার চক্ষে জল পড়িল। পিতা বলিয়া গেলেন প্রত্যহ পত্র লিখিবেন, এবং প্রতিদিন, যেখানেই থাকুন, জননীর পত্রের প্রতীক্ষা করিবেন।

দুই মাস অতিবাহিত হইল। সহসা একদিন জননীর মুখ অসম্ভব মলিন দেখিলাম; শুনিলাম পিতার পত্র আইসে নাই। সেই দিন অবধি আর পত্র আসিল না। আর একদিন সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিয়া দেখিলাম গৃহ-মধ্যে মা কাঁদিতেছেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু মা বলিলেন না; কেবল আমার মুখ চুম্বন করিলেন, আরও কাঁদিলেন। আমিও কাঁদিলাম। কাঁদিতে কাঁদাইতে আমি জন্মিয়াছি।

কয়েক দিবস পরে—পনর ষোল দিন হইবে—জননী অপরাহ্নে শয্যার শুশ্রূষা করিতেছিলেন; এ কয় দিন গৃহ কার্য্যে মন দেন নাই। বিছানার ভিতর হইতে তিনি একখানি পত্র বাহির করিলেন; বোধ হইল পত্রখানি যেন হঠাৎ পাইয়াছেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে মাতার মুখ বিশুষ্ক হইল, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল। কারণ বুঝিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসাও করিলাম না।

হঠাৎ গৃহমধ্যে পিতা আসিয়া উপস্থিত, তাঁহার মুখে কালিমা পড়ি-

য়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ। দেখিয়া আমার একটু ভয় হইল। আমার কনিষ্ঠা ভগিনী "বাবা" বলিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য দৌড়িয়া গেল; কতকদূর তুলিয়া পিতা তাহাকে সবলে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। বালিকা কাঁদিতে লাগিল। জননীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— "কাহার পত্র?"

জননী উত্তর দিলেন না। পিতা পত্র কাড়িয়া লইলেন, পাঠ করিলেন, এবং একটী কথাও না কহিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে দাসী আসিয়া মাকে বলিল যে বাহিরে পিতা তাঁহাকে ডাকিতেছেন! তৎক্ষণাৎ পুত্তলীর ন্যায় মাতা চলিলেন; ভগিনী তাঁহার ক্রোড়ে, আমি সঙ্গে।

বহির্ব্বাটীতে অনেক লোকের সমা-[illegible]রিচয় [illegible]য়া মাতা সঙ্কুচিত হইলেন; ক[illegible]া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

[illegible] বলিলেন, "তুমি যেমন বংশে [illegible]ছ, তাহার পরিচয় দিলে; [illegible]এবা শুনিয়া আমি নিজ কুলে কলঙ্ক [illegible]ছি, তাহার ফল আমারই ভোগ [illegible] উচিত। সেই জন্য তোমার প্রতি [illegible]ন্য শাস্তি বিধান করিলাম না। এই [illegible]থ, আমার হস্তে দান পত্র রহিয়াছে। [illegible]মার যথা সর্ব্বস্ব আমি গুরুকে অর্পণ [illegible]রিলাম। আজি হইতে আমি ভিক্ষুক; [illegible]মিও যে প্রকারে পার জীবন-যাত্রা [illegible]র্ব্বাহ কর গিয়া। এ গৃহ এই মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ কর।"

সংজ্ঞাহীনার ন্যায় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া জননী বলিলেন—"তোমার পুত্র কন্যা?"

পিতা উত্তর করিলেন—"আমার নহে।" ধীরে ধীরে মাতা সেই খানে বসিয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে পিতার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"স্বামিন্ গুরুদেব!———"

কথা শেষ হইল না; পিতা ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠিয়া মাতার বক্ষে পদাঘাত করিলেন; বলিলেন, "পূর্ব্বে এই পদাঘাতের গুণে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম; আজি সেই পদাঘাতেই দূর হ। পাপীয়সি! কুলটা হইয়া যদি পুনর্ব্বার আমাকে স্বামী বলিবি তবে স্ত্রীহত্যায় সংকোচ করিব না।"

আমরা ভাই ভগিনী কাঁদিলাম; মা কাঁদিলেন না! মা যখন ফিরিয়া চাহিলেন, তখন পিতা সেখানে নাই।

সন্ধ্যার সময়ে আমাদিগকে লইয়া জননী গৃহত্যাগ করিলেন; কাহারও বাটীতে গেলেন না। গ্রামের বহির্ভাগে এক বটবৃক্ষ-মূলে রাত্রিতে আমাদিগকে শোয়াইলেন। ভাই ভগিনী ঘুমাইলাম।

"পিত্রালয়ে এ মুখ দেখাইব না। পিতা মাতা, ভাই ভগিনী,—স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব। সেই স্বামী বলিলেন, কুলটা! এ কলঙ্ক লইয়া কোথায় যাইব?" এই শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তখন প্রভাত হইয়াছে।

জননী আমাদিগকে লইয়া গ্রামে আবার গেলেন; সকল লোক তখনও উঠে নাই। যাহারা উঠিয়াছিল তাহারা জননীকে ডাকিল না, আমাদিগকে ডাকিল না। মা আমাদের বাটীতে গেলেন, দেখিলেন—শূন্য পুরী; জনমানব নাই তৈজস সামগ্রী নাই, কিছুই নাই। আবার সেখান হইতে চলিলেন।

অনেক দূর গিয়া দাককেশ্বর নদের তীরে আমরা উপস্থিত হইলাম। ঢল নামিতেছে; প্রথম বন্যার ভয়ঙ্কর প্রকোপ, গৈরিক বর্ণ জল কল কল শব্দে চলিয়াছে। সেখানে পারাপারের ঘাট, কিন্তু নৌকা লইয়া মাঝি বিব্রত। অনেক লোক পারের ভাবনা ভাবিতেছে।

আমার ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, কাঁদিতে লাগিলাম। মা বলিলেন, "চল, পারে গিয়া খাবার দিব।"

আরও লোক যুটিলে মাঝি একবার নৌকা লইয়া যাইতে সম্মত হইল। জননী আমাদিগকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন; অনেক লোক উঠিল। মাঝি সকলকে বলিল "সাবধান।"

জননী আমাদিগকে লইয়া নৌকার পার্শ্বে বসিলেন। একজন আরোহী তাঁহাকে মধ্যস্থলে বসিতে বলিল। মা হাসিয়া বলিলেন-"ভয় নাই।"

অতি সাবধানে খর স্রোতে নৌকা চালিত হইতে লাগিল। নৌকা যখন ঠিক মধ্যস্থলে, মা বলিলেন——"পাপিষ্ঠাকে স্থান দাও।" আমায় হাতে ধরিয়া আমার ভগিনীকে ক্রোড়ে করিয়া মা জলে ঝাঁপ দিলেন। "ধর ধর" শব্দ হইল; আর কিছু জানিতে পারিলাম না।

যখন আমার চেতনা হইল, তখন আমি অজ্ঞাতপূর্ব্ব স্থানে, অপরিচিত লোকের মধ্যে; যখন চেতনা হইল, তখন মাতার জন্য, ভগিনীর জন্য কত কাঁদিলাম। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; যাহাদের বাটীতে ছিলাম তাহারাও কাহার কথা বলিল না। কিন্তু সান্ত্বনা দিবার লোকের অভাব ছিল না। ক্রমে ক্রমে আদরে যত্নে, সেবা শুশ্রূষায় সকল দুঃখ সকল শোক ভুলিতে লাগিলাম। যেখানে ছিলাম, আমি তাহাদেরই একজন হইয়া গেলাম। সেই বাটীর একজন বিধবা রমণী আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, আমি তাঁহাকে মা বলিতাম। এক দিন তাঁহার মুখে শুনিলাম যে পাটনায় তাঁহার এক শিশু পুত্র হারাইয়া গিয়াছিল।

দশ বৎসর এই ভাবে গেল। আ[illegible] যে কেবল যত্নের সহিত প্রতিপালি[illegible] হইলাম তাহা নহে, রীতিমত বি[illegible] শিক্ষা করিলাম। যে গ্রামে এই স[illegible] হইতেছিল, তাহার নাম সুবর্ণপুর। [illegible] স্থান হইতে আমাদের বাসভূমি প্র[illegible] দেড় দিনের পথ।

এই সময়ে সুবর্ণপুরের বাটী[illegible] গৈরিক-বসন-পরিধান, জটাশ্মশ্রুধারী এ[illegible] জন সন্ন্যাসী আসিলেন। বোধ[illegible] হইল বাটীর সকলেরই তিনি সুপরিচি[illegible]

তাঁহাকে দেখিয়া সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল, আমিও করিলাম। আমার সম্মুখে সন্ন্যাসী আমার পরিচয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না, হয় ত বাটীর বালক বিবেচনা করিলেন। আমাকে নিকটে বসাইয়া সন্ন্যাসী অনেক কথা কহিলেন অনেক নীতিগর্ভ উপদেশ দিলেন। তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি হইল। পর দিবস তিনি চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া দশবার বুঝাইয়া আমাকে একটী উপদেশ দিয়া গেলেন; বলিলেন "সহসা কাহারও কথায় বিশ্বাস করিও না।" এই উপদেশ শুনিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম, আমার ভক্তি একটু কমিয়া গেল। সন্ন্যাসী যতক্ষণ ছিলেন সকলেই তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার নামের পরিচয় পাইলাম না।

কয়েক মাস পরে সন্ন্যাসী আর এক দিন আসিলেন; আবার পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। এবারে একটু বিরক্তি বোধ হইল।

তৃতীয় বার সন্ন্যাসী সুবর্ণপুরের বাটীতে আসিলেন। সমস্ত দিন আমি পাশ কাটিয়া ফিরিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার পর দায়ে পড়িয়া, বহির্ব্বাটীতে তাঁহার নিকটে গিয়া আমাকে বসিতে হইল; দায়ে পড়িয়া কেন না বারংবার তিনি আমাকে আহ্বান করিতেছিলেন। বিশ্বাসের উপদেশই বিরক্তিজনক, কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত তিনি নানা মনোহর কথা শুনাইতেন; এবারেও শুনাইলেন। সন্ন্যাসী যে বহু দেশ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইত। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক শোভা পথের বিবরণ ইত্যাদি মনোহর রূপে তিনি বর্ণন করিতেন।

কথায় কথায় রাত্রি হইয়া পড়িল। আমি ভোজন করিতে যাইব, এমত সময়ে শতগ্রন্থি মলিন চীরে কটিদেশ আবৃত, শীর্ণ-কলেবর, কৃষ্ণবর্ণ, অকালবৃদ্ধ এক ব্যক্তি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় কোটরে প্রবিষ্ট, কিন্তু অসাধারণ জ্যোতির্বিশিষ্ট। তাহার উপর শ্বাস কাশ। তাহাকে দেখিবা মাত্র সন্ন্যাসী যেন ঈষৎ বিরক্ত, ঈষৎ অসুস্থ হইলেন। বলিলেন——

"তুমি আবার এখানেও আসিয়াছ?"

আমার কৌতূহল হইল দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "এ পাগল; অনেক আমোদজনক কথা বলে। তুমি আহার করিয়া আইস, তাহার পর রঙ্গ দেখিবে।" আমি আহারের নিমিত্ত অন্তঃপুরে গমন করিলাম।

যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন সন্ন্যাসী সেখানে নাই; পাগল শুইয়া রহিয়াছে। আরও দুই চারিজন যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিলাম যে আমি ভোজন করিতে গেলে সন্ন্যাসী পাগলকে লইয়া বাহিরে গিয়াছিলেন; এবং বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা

কহিয়াছিলেন। তাহার পর সন্ন্যাসী আর আইসেন নাই; পাগল একাকী আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল।

একে একে সকলে শয়ন করিতে চলিয়া গেল। পাগলকে সেই অবস্থায় একাকী রাখিয়া যাওয়া উচিত কি না, আমি ইহাই ভাবিতেছিলাম। শেষে তাহার নিদ্রা আসিয়াছে মনে করিয়া, তাহাকে আর বিরক্ত করিলাম না; আমিও উঠিলাম।

দুই পা গিয়াছি এমন সময়ে শুনিলাম——"সুবনাথ!"

ফিরিয়া দেখিলাম, পাগল উঠিয়া বসিয়াছে, আমার দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিতেছে। প্রথমতঃ একটু ভয় হইল, কিন্তু সে ক্ষণিকমাত্র।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমায় ডাকিতেছ"। পাগল উত্তর দিল—"আর ঘরে কে আছে?" আমি। "এ ঘরে কেহই নাই। তুমি আমার নাম জানিলে কি প্রকারে?"

পাগল। "সমস্ত বলিব। তুমি আমার নিকটে বইস। অনেক কথা আছে।"

আমার সন্দেহ হইল, কৌতূহলও হইল। আবার ভাবিলাম, পাগলের কি খেয়াল উঠিয়াছে, বন্ধু বান্ধবের নিকট আমার নাম শুনিয়া থাকিবে, কি একটা পাগলামি করিবে। অতি কষ্টে পাগল কথা কহিতেছিল, আমি সেই জন্য বলিলাম—"তুমি এখন ঘুমাও, কল্য তোমার কথা শুনিব। কিছু খাইবে?"

পাগল বলিল,—"না। আমার শেষ আহার গিয়াছে; কেবল শেষ কথা বলিতে বাকী আছে। তুমি শুন।"

আমি শুনিতে বসিলাম; পাগল বলিতে আরম্ভ করিল। পাগলের প্রতি কথায় আমার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল; নিরুদ্ধশ্বাস হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম।

"তোমার বাল্যকালের কথা কিছু মনে পড়ে? তোমার পিতার গুরু-পুত্রকে তোমার মনে আছে? তোমার উপশিক্ষক রমাপতিকে স্মরণ হয়? আমি সেই রমাপতি। বিষয় বিভব সব গিয়াছে; আমি এই মরিতে আসিয়াছি। তুমি আমার কথা শুনিলেই আমার মনের ভার যাইবে; জীবনে যে সুখ পাই নাই, মরণে তাহা পাইব।

আমি অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তোমাদের সর্ব্বনাশও আমিই করিয়াছি; তুমি যে পিতৃ-মাতৃ-হীনের মত পরান্নে প্রতিপালিত হইতেছ, সে আমারই জন্য। (উঃ! আর বসিতে পারি না, আমি শুইয়া বলি।) কি বলিলাম? পরান্নে প্রতিপালিত? না, নিতান্ত পর নয়। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক। তোমার মাতার চরিত্র বিশুদ্ধ; তোমার পিতার ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু সকল কথা মুখে আনিতে পারিব না; অন্তিম কালে আমার এ লজ্জা হইতেছে। আমি সকল কথাই লিখিয়া রাখিলাম; তোমার পিতা গৃহত্যাগের সময় আমাদিগকে

সর্ব্বস্ব দিয়া গিয়াছিলেন; সে সমস্তই প্রত্যর্পণ করিলাম; সেই পত্রে লেখা আছে। তোমাকে সে পত্র দিতে আসিয়াছিলাম। গঙ্গানন্দ সকল কথা জানে, সেই সে পত্র কাড়িয়া লইয়াছে; গঙ্গানন্দের স্বার্থ আছে। কি স্বার্থ, জানি না। গঙ্গানন্দের অনুসন্ধান কর, সকল বিবরণ জানিতে পারিবে। তোমার মাতা জীবিত আছেন; কিছু দিনের সংবাদ জানি না, কিন্তু মন্দ সমাচার হইলে জানিতাম। গঙ্গানন্দ জানে। তোমার পিতার কাছে, তোমার মাতার দোষক্ষালণ করিবে, আমার প্রায়শ্চিত্ত তাহাতেই হইবে। প্রমাণ, গঙ্গানন্দের নিকট আছে।

আর এক কথা। তোমার খুল্লতাত—। না, তাহাও লেখা আছে; বলিব না, বলিতে পারিব না। গঙ্গানন্দ বলিবে। গঙ্গানন্দ সত্যবাদী, কিন্তু চক্রী।

শেষ অনুরোধ—সন্তানের কার্য্য—।"

রমাপতির কথা এমন নিমগ্নচিত্তে শুনিতেছিলাম, যে গৃহস্থিত ক্ষুদ্র প্রদীপের ক্ষীণ আলোক প্রায় নির্ব্বাণ-দশাপন্ন হইয়াছিল, তাহা এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। উঠিয়া আলোক উজ্জ্বল করিতে গিয়া দেখিলাম, প্রদীপে তৈল নাই; তৈল আনিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম; কতকদূর গিয়া রমাপতিকে একাকী ফেলিয়া যাওয়া উচিত বোধ করিলাম না, ফিরিয়া আসিলাম। ঘরেও আর অল্প আলোক ছিল। রমাপতিকে নীরব, নিস্পন্দ দেখিয়া নিকটে গেলাম। সন্দেহ হইল; তাহাকে ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না। গায়ে হাত দিলাম——শীতল, আড়ষ্ট! বুঝিলাম রমাপতির জীবনলীলা ফুরাইয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই খানে বসিয়া চিন্তা করিলাম, তাহার পর রমাপতির মৃতদেহ সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়া আমি সুবর্ণপুরের বাটী পরিত্যাগ করিলাম, কাহাকেও বলিলাম না, কেহ জানিল না।

যে সন্ন্যাসীকে "প্রভু" বলিতাম, সেই গঙ্গানন্দ স্বামী তাহা জানিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি তাহার সন্ধান পাইলাম না; পিতা মাতার কোন বার্ত্তাই জানি না। কখন কি জানিতে পারিব?

সুবর্ণপুর পরিত্যাগ করিয়া কাশীধাম আসিয়াছিলাম। পথে বিশেষ কোনও ঘটনাই হয় নাই। কেবল এক দিন চণ্ডালের মত বিকটাকৃতি এক জন নীচ লোক পথে আমার সঙ্গ ধরিয়াছিল, অনেক দূর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল; আমার সহিত আলাপ করিতে যত্ন করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে কিছুই বলি নাই; শেষে বিরক্ত হইয়া আমাকে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় শাসাইয়া আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল। কাশীধামে পৌঁছিয়া আর এক দিন তাহাকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার নিকটে আইসে নাই, বোধ হয় আমাকে দেখে নাই।

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি অবগত আছ।”

সুরনাথের কথা শেষ হইল; সুরনাথ বসনাঞ্চলে মুখ লুকাইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। যখন চিত্তবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, তখন মুখ তুলিয়া সুরনাথ দেখিলেন সর্ব্বেশ্বর নিকটে নাই। উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বেশ্বরের নাম ধরিয়া ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না।

তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, কিন্তু উপত্যকা প্রদেশের প্রতি রবিকরের অধিকতর মমত্ব; সুতরাং এখনও আলোকের অভাব হয় নাই।

অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে সেই পার্ব্বত্য পথে সুরনাথ অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। কতকদূর যাইতে যাইতে রমণীর আর্ত্তনাদ সুরনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। মুখ বাড়াইয়া বহুদূর নিম্নে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলেন;—এক জন পুরুষ একটী স্ত্রীলোকের উপর আক্রমণ করিয়াছে! সর্পসরণি ধরিয়া সুরনাথ যথাসাধ্য দ্রুতপদে সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

* * * *

দেবদুর্গের দুই ক্রোশ পশ্চিমে অধিত্যকা ভূমিতে এক মনোহর উপবন আছে। উপবনের মধ্যস্থলে দেবমন্দির, তাহাতে শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে পর্ব্বত-নির্ঝর-ক্ষরিত জলাশয়; সেই জলাশয়ের দক্ষিণ কূলে যে স্থলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমি দিয়া অতিরিক্ত জল উপচিত হইয়া রজতধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার সান্নিধ্যে যোগীর আশ্রম। সে থানে লতাপত্রাদি-বিনির্ম্মিত কুটীর নাই; কিন্তু নৈসর্গিক ক্রিয়া বলে সুন্দর-প্রস্তর-খোদিত গৃহে তাপসেরা বাস করিতে পারিতেন। নিকটে লোকালয় নাই; স্থান অতিশয় নিভৃত।

আপাততঃ সে আশ্রমে তাপস কেহ নাই; দুইটী স্ত্রীলোক প্রস্তর-গৃহের দ্বারে বসিয়া সন্ধ্যার পরে কথোপকথন করিতেছিলেন। ইঁহাদের এক জনকে প্রৌঢ় বলা যায়; বয়ঃক্রম ৩৪।৩৫ বৎসর; মুখমণ্ডল শান্তি, গাম্ভীর্য্য এবং বৈরাগ্যের আধার। অন্য রমণীর এই-প্রথম যৌবন। এখনও তিনি ষোড়শী হইতে পারেন নাই। উভয়েই অপূর্ব্ব-রূপলাবণ্যবতী; তবে, এক জনের সৌন্দর্য্য—সাগরের; অন্যের—বর্দ্ধমান কলেবর স্রোতস্বতীর। পরিচ্ছদের পারিপাট্য দুইজনেরই নাই।

প্রৌঢ়া বলিলেন,—“নির্ম্মলা, কয়েক দিন অবধি তোমাকে যেন অন্যমনা দেখিতেছি। কেহ কি তোমায় কি বলিয়াছে?”

নির্ম্মলা বলিলেন—“কে কি বলিবে মা?” কিন্তু এই সহজ কথা বলিবার সময়ে নির্ম্মলার নয়ন-পল্লব সন্নমিত হইল, কপোলদ্বয় ঈষৎ রঞ্জিত হইল।

প্রৌঢ়া প্রথমতঃ অপ্রতিভ হইলেন। অসাবধানে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রথমে তাহার মর্ম্ম তিনি আপনা আ

নিই বুঝিতে পারেন নাই। নির্ম্মলার পূর্ণ বৃত্তান্ত পাছে কেহ নির্ম্মলাকে বলিয়াছে এই আশঙ্কায় তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আবার প্রৌঢ়ার মুখে সে কথা প্রকাশ হইলে প্রৌঢ়ার বিষম বিপদের সম্ভাবনা। যাহা হউক নবীনার ভাব লক্ষিত করিয়া প্রৌঢ়া সারিয়া লইলেন; অনুমান করিলেন যে সরলার হৃদয়-সরোবরে প্রণয়ের উপলখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; তাহাতেই এ চঞ্চলতা। সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পুনরপি বলিলেন——

"না নির্ম্মলা, সে বলার কথা বলিতেছি না। মনে করিয়া দেখ সে দিবস শিবালয়ে ধূপ দীপ দিয়া যখন তুমি ফিরিয়া আসিলে, তখন তুমি বড়ই অস্থিরতা দেখাইয়াছিলে, তাহার পরে আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বার্ত্তা কও নাই। সে দিনের সেই ভয়ঙ্কর বজ্রপাতে তুমি ভয় পাইয়াছিলে বিবেচনায় আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু আজিও তোমার সে ভাব গেল না; তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কাহারও সহিত তোমার কি দেখা হইয়াছিল? কেহ কি কিছু বলিয়াছিল? যদি বলিতে তোমার সঙ্কোচ হয়, কিম্বা গোপনীয় কথা কিছু থাকে, তবে আমি শুনিতে চাহি না।

লজ্জা যেন নির্ম্মলার বদনমণ্ডলে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নির্ম্মলা বলিলেন,—

"না মা তোমাকে লুকাইবার আমার কি কথা থাকিবে। তুমি বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা কর নাই বলিয়া আমিও বলি নাই; আর এমন কিছুই নয়, যে তোমার নিকট তাহা বলিব। সেই জন্য বলি নাই।"

প্রৌঢ়া। "বিশেষ না হউক কথা আছে। কি সে কথা মা?"

নির্ম্মলা। "যখন সে দিন অতিশয় মেঘ হইল, তখন আমি মন্দিরের ভিতরে ছিলাম। ক্রমে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আর ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন। তখন অন্ধকার হইয়াছে। সেই সময়ে দূরে যেন একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম,—মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি বলিয়া বোধ হইল; বৃষ্টিও বেগে আসিল। কতক্ষণে মেঘ পরিষ্কৃত হয় দেখিবার জন্য যেমন দ্বার খুলিলাম, অমনি তেজোময়ী বিদ্যুৎ চমকিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই পর্ব্বত-বিদারি গর্জ্জন। আমার মনে হইল যেন আমারই পাদমূলে বজ্রপাত হইল——"

প্রৌঢ়া। "এ কথা ত জানি, তাহার পর কি হইল তাহাই জানিতে আমার কৌতূহল।"

নির্ম্মলা থামিয়া থামিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বলিলেন—"সেই আলোকে দেখিলাম একজন—এক ব্যক্তি—আশ্রয়ের জন্য দৌড়িয়া আসিতেছেন, কিন্তু বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মন্দিরের মূলে পড়িয়া গেলেন। আমার ভয় হইল; বিশ্

হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, তিনি মূর্চ্ছিত। কি করি, যতক্ষণ সংজ্ঞা না হইল, ততক্ষণ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম———”

প্রৌঢ়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-“সেই বৃষ্টিতে ?”

নির্ম্মলা। “না, তখন জল ধরিয়াছিল, খুব অল্প অল্প পড়িতেছিল; আমার চুল তাহাতে ভিজে নাই। দেবতার কৃপায় তাঁহার শীঘ্রই জ্ঞান হইল। তখন আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে ?”

প্রৌ। “তুমি তাহাতে কি উত্তর দিলে ?”

নি। “আমি কিছুই বলিলাম না; কেবল বলিলাম আশ্রমে থাকি। আর কে থাকে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম ‘ব্রহ্মচারী আর মা’।”

প্রৌঢ়ার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু সঞ্চার হইল; নির্ম্মলা তাহা দেখিতে পাইলেন না, অথবা দেখিলেন না; বলিলেন———“ব্রহ্মচারীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নাম বলিলাম।”

প্রৌ। “তাঁহাকে এখানে আনিলে না কেন ?”

নি। “আসিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, আর এক দিন আসিব।” নির্ম্মল আরও কিছু যেন বলিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

প্রৌ। “কবে আসিবেন, তাহা কিছু বলিয়াছিলেন ?”

নির্ম্মলা বলিলেন———“অদ্যই।”

প্রৌঢ়া একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—“আজি যদি দেখা হয়, তবে সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিও।”

নির্ম্মলা উত্তর দিলেন না। সন্ধ্যার ধূপদীপ লইয়া দেবমন্দিরে গেলেন, অভীপ্সিত ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তিনি যে সর্ব্বেশ্বর, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মচারী আশ্রমে নাই জানিয়া সর্ব্বেশ্বর নির্ম্মলার সঙ্গে গেলেন, কিন্তু আত্ম-পরিচয়, এমন কি আপনার নাম পর্য্যন্ত বলিলেন না। না বলিবার বিশিষ্ট কারণ ছিল। অনেক কথাবার্ত্তা হইল; শেষে পুনরায় আসিতে অনুরুদ্ধ হইয়া সর্ব্বেশ্বর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সর্ব্বেশ্বর চলিয়া গেলে, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা দুই রমণীতে কহিলেন, নির্ম্মলা সূত্র ধরিয়া দিতে লাগিলেন, প্রৌঢ়া কথার বিস্তার ও চালনা করিলেন। ক্রমে ব্রহ্মচারীর কথা উঠিল, প্রৌঢ়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন——

“আর কত দিন যে বিধাতা এই ভাবে রাখিবেন, তিনিই জানেন। ব্রহ্মচারী অনেক দিন হইল গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। ব্রহ্মচারীর মনের কথা কি তাহাও বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু এ পর্ব্বত-প্রদেশে আর লুকাইয়া থাকিতে পারি না।”

নির্ম্মলা কি ভাবিতেছিলেন, সেই জন্য কেবল শেষের কয়টী কথা মাত্র শুনিতে পাইলেন; পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন——

"কেন মা? এখানে কি আমাদের কষ্ট হইতেছে?" লুকাইয়া থাকা কাহাকে বলে, নির্ম্মলা তাহা বুঝিত না। প্রৌঢ়া তাহার কথার উত্তর দিলেন না, নির্ম্মলার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আশ্রমগৃহে বিশ্রাম জন্য প্রবেশ করিলেন।

সর্ব্বেশ্বর কি জন্য আশ্রমের নিকটে গ্রামে আইসেন, তাহা বলা হয় নাই; কিন্তু বিস্তর কথা, এখন বলিবার সময়ও নহে। পশ্চাৎ সকল কথাই প্রকাশ পাইবে।

* * * * * *

যে রাত্রিতে রমাপতির মৃত্যু হইল এবং সুরনাথ সুবর্ণপুর পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পর দিন প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার সেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাটীতে কোলাহল হইতেছে; প্রথমতঃ রমাপতির মৃতদেহ লইয়া কি করিতে হইবে, কতকগুলি লোক তাহারই বিতণ্ডা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ সুরনাথ কোথায় গেল, স্ত্রীলোকেরা সেই বিচার করিতেছেন। গ্রামের বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সুরনাথের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। যে বিধবা রমণীকে সুরনাথ, "মা" বলিতেন তিনি তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসীর চরণ-প্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীর নেত্রদ্বয়ও আর্দ্র হইয়া উঠিল। বিধবাকে তিনি তখন ধীরে ধীরে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তখন বিধবা বলিলেন, "প্রভু! আর কত প্রকারে এ হতভাগিনী দুঃখ ভোগ করিবে? আপনি দয়া করিয়া আমার সর্ব্বস্ব ধনের পরিবর্ত্তে একটী রত্ন দিয়াছিলেন; আবার কেন বিনা মেঘে এ বজ্রাঘাত হইল? আর যে সহিতে পারি না।"

সন্ন্যাসী একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"আমায় কেন লিপ্ত করিতেছ? এ সমুদয়ের হেতু,—সেই জটাধর। হয় ত এবারও জটাধরই সুরনাথকে লইয়া গিয়াছে। রোদনে কিছু ফল হইবে না, ব্যাকুল হইলে হয় ত সকল দিক্ নষ্ট হইবে। আমার কথা শুন, শীঘ্র আমার আহ্নিকের আয়োজন করিয়া দাও, তাহার পর আমি গণনায় নিযুক্ত হইব। এতকাল যে বাঁধ বাঁধিয়া আসিলাম, তাহার রক্ষার উপায় করিতে হইবে। দুর্দ্দিনের পর সুদিন অবশ্যই হইবে, ভগবান্ অবশ্যই দয়া করিবেন।"

বিধবা উঠিলেন, মৃতব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। সন্ন্যাসী তাঁহাকে গৌণ করিতে নিষেধ করিলেন, মৃতদেহ দেখিতে বারণ করিলেন। বিধবা কথা শুনিলেন না; রমাপতিকে দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে সন্ন্যাসীর মুখের

দিকে চাহিয়া বলিলেন—“এত রমাপতি! তবে ত সর্ব্বনাশ হইল!” বলিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন “সেই জন্যই নিষেধ করিয়াছিলাম। যাহা হউক চিনিয়াছ, ক্ষতি নাই; এখনও সর্ব্বনাশ না হইতে পারে। তুমি আর রমাপতির কথা মুখে আনিও না। আমার গণনা স্থির হইলে, যাহা ভাল বুঝ করিও।”

বিধবা স্থির হইলেন, সন্ন্যাসীর আহ্নিকের সমুদয় আয়োজন করিতে গেলেন।

এ দিকে সন্ন্যাসী সকলকে “রমাপতি আমার সুপরিচিত ব্রাহ্মণ” বলিয়া নিঃসংশয় করিলেন, এবং মৃতদেহের সৎকার করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। সৎকারের জন্য রমাপতির দেহ স্থানান্তরিত হইল।

সন্ন্যাসী স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া রুদ্ধদ্বার গৃহে গণনা আরম্ভ করিলেন। রমাপতি সুরনাথকে কতদূর বলিয়াছে, তাহা দেখিলেন; সুরনাথ কোন্ পথ অনুসরণ করিয়াছে তাহা দেখিলেন; তাহার পর সন্ন্যাসীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। গণনার ফল, অশুভ।

সন্ন্যাসী গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইলেন; ব্যস্ত, ব্যগ্র হইয়া বিধবা গণনার ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—“পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম রমাপতির সহিত সুরনাথের দেখা হইলে সঙ্কট হইবে; তাহা ঘটিয়াছে। রমাপতির মৃত্যুতে আরও বিঘ্ন হইল। যাহা হউক এখনও নিরাশ হইবার কারণ নাই। কিন্তু তোমাকে আরও ছয় মাস পূর্ব্ববৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। জটাধরের সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অদ্যই আমি যাত্রা করিব; এখন এক এক মুহূর্ত্ত এক এক যুগ-তুল্য মূল্যবান্। আবার বলি তোমার ধৈর্য্যাবলম্বন সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়।”

বিধবা বলিলেন,—“প্রভু আমি স্ত্রীলোক, আর কত সহ্য করিব? এতকাল পরে অদ্য একবার জাতি-সুলভ কোমলতার পরিচয় দিয়াছি; নিতান্ত ভীত, নিতান্ত উদ্বিগ্ন, নিতান্ত অভিভূত হওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছে। [illegible] আপনার আজ্ঞা আবার শিরোধার্য্য করিব, আমি যে পাষাণী ছিলাম, সেই পাষাণী হইয়াই এ ছয় মাস রহিব। কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি, তৃতীয় বার আর পারিব না।”

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন না; সে স্থান হইতে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন।

* * *

রমণী কণ্ঠ নিঃসৃত কাতর শব্দ শুনিয়া সুরনাথ সেই পর্ব্বত-পথে অবরোহণ করিতেছিলেন, এই কথার উল্লেখ করিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছিলাম। এখন সেই কথায় ফিরিয়া যাইবার সময় হইয়াছে।

সুরনাথ যখন সমতল ভূমিতে আসিলেন, তখন পূর্ব্ব-লক্ষিত স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন যে অন্ধকারের ছায়াতে এক ব্যক্তি তথা হইতে গুপ্তভাবে অপসৃত

হইতেছে। নিকটস্থ হইযা দেখিলেন চতুর্দ্দশবর্ষীয়া এক রূপীয়সী মূর্চ্ছিত অবস্থায় শয়ানা রহিয়াছে; তাহার মস্তকের বাম পার্শ্বে, আঘাত লাগিয়াছে; এবং স্পষ্টতঃ সেই আঘাত-নিসৃত রুধির-ধারা জলসিঞ্চন দ্বারা কথঞ্চিৎ নিবারিত হইয়াছে। অনতিদূরে এক বিকটাকার পুরুষ পর্ব্বত-দেহ-স্খলিত শিলাঘাতে ভূপতিত; তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, এক চক্ষু উৎপাটিত, এবং মস্তকের কিয়দংশ এ[illegible]রে পেষিত; সুরনাথ যখন তাহার সমীপস্থ হইলেন, তখন তাহার শেষ দশা উপস্থিত, দুইবার মুখব্যাদন করিয়া সে নিষ্পন্দ হইল। সে ব্যক্তি কে সুরনাথ তাহা স্থির করিতে
৭২ হইল। ত
[illegible] অবস্থা, [illegible]
কাশী আসিবার পথে যে ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গ ধরিয়াছিল তাহার সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া সুরনাথের সন্দেহ হইল। তখন সন্দেহ ভঞ্জন কে করিবে?

কামিনীকে মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া সুরনাথের হৃদয় কাতর হইল; কি প্রকারে তাহার চেতনা সফল হয়, অথবা অন্য কি প্রকারে তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন সুরনাথ ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। কামিনীর মস্তকের আঘাত গুরুতর নহে বটে, কিন্তু সত্বর শুশ্রূষা না হইলে বিপ্র হইতে পারে। যে ব্যক্তিকে সুরনাথ দেখিয়াছিলেন, সেও তথায় নাই, এখন উপায় কি?

সুরনাথও চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন নিকটে জন মানব নাই, শেষে "তুমি যে হও, একটী স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষার জন্য আমার সাহায্য কর" এই বলিয়া সুরনাথ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কেহ আসিল না, সুরনাথ ব্যস্ত এবং বিব্রত হইলেন। কামিনীকে সে অবস্থায় সেই জন-শূন্য প্রদেশে ফেলিয়া যাইতে তাঁহার মন সরিল না। তখন আর ইতস্ততঃ না করিয়া সেই কোমল দেহ ধীরে ধীরে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তখন সুরনাথের বোধ হইল যে তাঁহার দেহে অযুত হস্তীর বল আছে, অথবা কামিনী-দেহ কুসুম-কলিকা অপেক্ষাও লঘু। সুরনাথ তাহাকে দেবদুর্গে নিজ আবাসে লইয়া আসিলেন। তখন তাহার
[illegible]না হয় নাই।

সুরনাথের এক মাত্র ভৃত্য এক ব্রাহ্মণ-তনয় ছিল। তাহার নাম শম্ভু। সুরনাথকে রমণী-ভারাক্রান্ত দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু তাহা বুঝিতে পারেন সুরনাথের মনে এত অবসর ছিল না। যাহা হউক সুরনাথ সেই সুন্দরীকে শয্যায় শোয়াইয়া স্বয়ং সাধ্যানুসারে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসক আনিবার জন্য শম্ভুকে পাঠাইয়া দিলেন। শম্ভু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। বহুবিলম্ব হইল, তথাপি শম্ভু ফিরিল না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আপনা আপনি সুন্দরীর জ্ঞান-সঞ্চার হইল।

রজততন্ত্রে ক্রীড়াশীল শিশুর কোমল অঙ্গুলীর ক্ষীণ সংস্পর্শ হইল, সুন্দরী

যুবতীর কণ্ঠ-স্বরে মৃদুমোহন প্রশ্ন হইল —"আমি কোথায় ?" সুরনাথ বলিলেন— "তুমি চিনিতে পারিবে না ; কিছু চিন্তা নাই।"

পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল "তুমি কে ?" সুরনাথ পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তরের অবিকল পুনরাবৃত্তি করিলেন। সুরনাথ বলিলেন বটে চিন্তা নাই, সুরনাথের মুখাকৃতি বলিল বটে শঙ্কা নাই, কি সন্দেহ নাই; কিন্তু যুবতীর চিত্ত-সংকোচ ও সন্দেহ উদ্বেল হইতে লাগিল।

সুরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি পর্ব্বততলে কিরূপে আসিয়াছিলে? যে তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে পুরুষই বা কে ?"

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মাত্র যুবতীর মুখ যেন পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল, ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল; দেখিয়া সুরনাথ ভয় পাইলেন; বলিলেন—"তোমায় কোনও কথা এখন বলিয়া কাজ নাই; যদি ইচ্ছা হয় পশ্চাৎ বলিও, না হয় বলিও না। আমি একক, অপরিচিত, সুতরাং আপাততঃ তোমার মনে নানাপ্রকার শঙ্কা বা সন্দেহ হইতে পারে; আমি সে কষ্ট তোমায় দিতে চাহি না। দুগ্ধ ও মিষ্টফল কিঞ্চিৎ এই গৃহে রাখিয়া চলিলাম, আমার অনুরোধ—ব্রাহ্মণের অনুরোধ—তুমি একটু সুস্থ বোধ করিলেই কিছু খাইবে, এ ঘরে অদ্য রাত্রিতে কেহ আসিবে না; দ্বার রুদ্ধ থাকিবে। আমি বাহিরে প্রহরীর কার্য্য করিব; প্রয়োজন হইলে আমাকে ডাকিবে। আমার নাম সুরনাথ। কল্য প্রাতে তুমি যেখানে বলিবে, তোমাকে সেই খানে পৌছাঁইয়া দিয়া আসিব।"

সুন্দরী কেবল বলিলেন—"এখানে স্ত্রীলোক কেহ নাই ?"

"না।"

"তবে আমার কি হইবে ?"--বলিয়া সুন্দরী সুরনাথের পানে ব্যাকুল দৃষ্টি করিলেন; সুরনাথ উত্তর দিতে পারিলেন না; রমণীকে একা রাখিয়া [illegible] গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রাত্রি অধিক হইল, তথাপি শম্ভু ফিরিল না। শম্ভু না ফিরিলে সুরনাথের নাব আজ্ঞা আবার সুর হ; তবে সৌভাগ্য ক্রমে যে কারণেই হউক, সুরনাথের অদ্য ক্ষুধা বোধ হইল না, সুতরাং আহারের কথা মনে হইল না। সুরনাথ উন্মনার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া বাহির বাটীর অঙ্গনে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। বহু বিলম্বে একজনের পায়ের শব্দ শুনা গেল; সুরনাথ চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"শম্ভু ?"

"না—আমি।" বলিয়া সর্ব্বেশ্বর আসিয়া সুরনাথের সম্মুখীন হইলেন। "সহসা তখন তোমার নিকট হইতে উঠিয়া গিয়াছিলাম, তুমি তাহাতে কি মনে করিয়াছিলে বলিতে পারি না, কিন্তু সমস্ত বৃত্তান্ত তোমায় না বলিলে আমার নিদ্রা আসিবে না; সেই জন্য অদ্যই আসিলাম। যখন তুমি একান্ত

চিত্তে তোমার কাহিনীর উপসংহার করিতেছিলাম, সেই সময়ে উত্তর দিক্ হইতে এক ব্যক্তি আমাদের দিকে উঠিয়া আসিতেছিল, বলিয়া আমার বোধ হইল; যখন সে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইল, তখন আমরা তাহার দৃষ্টিপথে পড়িলাম; সঙ্গে সঙ্গে সে আবার দ্রুতগতি নামিয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না। সে ব্যক্তি আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল,—যদি সেই হয়, তবে তোমারও পরিচিত—গঙ্গানন্দ স্বামী। এরূপে তাহার আসিবার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না, আনন্দ-বৃষ্টি-প্রত্যূহময় হইল। তৎকালে তোমার মনের যে প্রকার অবস্থা, তোমাকে বলিয়া যাইতে হইলে বিলম্ব হইত; এই জন্য তোমাকে কিছুই না বলিয়া আমি সে ব্যক্তির অনুসরণ উদ্দেশে উঠিয়া গেলাম। অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিলাম, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। এ স্থান হইতে কিছু দূরে এক আশ্রম আছে, গঙ্গানন্দ মধ্যে মধ্যে তথায় আসিয়া থাকেন; আমি তত্দূর গিয়াছিলাম; কিন্তু গঙ্গানন্দের আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিলাম না। ক্ষুব্ধ হইয়া এতক্ষণে ফিরিয়া আসিতেছি; হয় ত গঙ্গানন্দ না হইবেন।

গঙ্গানন্দস্বামী যে আমার পরিচিত, পূর্ব্বে তোমাকে এ কথা বলি নাই, বলিবার স্থলও উপস্থিত হয় নাই। গঙ্গানন্দ আমাকে বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, বলিতে গেলে আমার এ দেহ তাঁহারই; তাঁহার কৃপাগুণেই আমি প্রতিপালিত। আমার পিতা মাতা কেহ নাই তাহা তুমি জান।

গঙ্গানন্দস্বামী যে এ প্রদেশে আসিয়াছেন, বা কখন আসিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে আমি জানিতাম না। দৈবাৎ আমি এক দিন ইহা জানিতে পারি। কিন্তু আজি সে কথা বলিতে আসি নাই; সময়ান্তরে, তোমার ইচ্ছা হয় শুনিবে।”

সুরনাথ ভাবনায় নিমগ্ন; সর্ব্বেশ্বরের কথা শুনিতে পাইলেন না, অথবা বুঝিতে পারিলেন না।

সর্ব্বেশ্বর বলিলেন—“এত রাত্রি হইয়াছে, তুমি এখনও শয়ন কর নাই কেন?”

“রাত্রি কি অধিক হইয়াছে? শম্ভু এখনও ফিরিল না কেন?”

“শম্ভু কোথায়?”

“চিকিৎসক আনিতে গিয়াছে; সৌভাগ্যের বিষয় যে চিকিৎসক না আসিলেও আশঙ্কা নাই।”

সর্ব্বেশ্বর বিস্মিত হইলেন। “চিকিৎক কেন?”

সুরনাথের মনে ছিল না সর্ব্বেশ্বর যুবতীর সংবাদ কিছুই জানেন না। ক্রমে ক্রমে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সর্ব্বেশ্বর আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত জানিলেন।

সুরনাথ বলিলেন—“তোমাদের বাটীতে ইহার স্থান হইতে পারে না?”

সর্ব্বেশ্বর এই প্রশ্নে বুঝিলেন যে তাঁহার

কোনও কথা সুরনাথের কর্ণগোচর হয় নাই। কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন কল্য সকালে যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করা যাইবে। সর্ব্বেশ্বর বিনা বিদায়ে চলিয়া গেলেন।

পাদচারণাতে রাত্রি প্রভাত হইল। সুরনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সুন্দরী নিদ্রা যান নাই সহজেই ইহা বুঝিতে পারিলেন; সুন্দরী কাঁদিতেছেন, সমস্ত রজনীই কাঁদিতেছেন, সুরনাথ তাহা দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—কি করিব?"

"যেখানে স্ত্রীলোক থাকে সেই খানে যদি লইয়া যান" সুন্দরী কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথা বলিলেন। সুরনাথ বাহিরে আসিলেন। সর্ব্বেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শম্ভু কোথায়?" সর্ব্বেশ্বর তাহা কি প্রকারে জানিবেন?

রমণীকে কোথায় লইয়া যাইতে হইবে, দুই বন্ধুতে সেই পরামর্শ হইল। আশ্রমে লইয়া যাইবার কথা হইল। সুরনাথ যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর হইল—"সেখানে স্ত্রীলোক আছেন?"

তৎক্ষণাৎ সর্ব্বেশ্বর আশ্রমে গেলেন, আশ্রম বাসিনীদের সম্মতি পাইয়া সানন্দে ফিরিয়া আসিলেন। বিকালে ইহাঁরা তিন জনে আশ্রমে গেলেন।

* * * * * *

মশারিতে একটা ছিদ্র হইয়াছিল; সেই রন্ধ্র পথে দুষ্ট মশক চৌরবৎ প্রবেশ করিয়া প্রেয়সীকে দংশন করিল; প্রেয়সী উঃ! আঃ! করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন; তাহার পর পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তখন আমার ঘটের বুদ্ধি ঘটে আসিল, দেখিলাম যে বিধুমুখী নিদ্রাগতা। গল্পের বাঁধুনি করিতে আমার সমস্ত বুদ্ধিটুকু নিয়োজিত না থাকিলে পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিতাম যে আমার মনোহর গল্পে শয্যাকণ্টকে নিদ্রার আবির্ভাব হয়। এখন তাহা বুঝিলাম, বুঝিয়া আমার স্বর্ণ কৌশলকে ধন্যবাদ দিলাম। বিধুমুখীর গাত্রে আমার নিশ্বাস লাগিলে, তাঁহার কষ্ট হইতে পারে মনে করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া আমিও নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আর গল্প গড়িতে হইল না, এই আহ্লাদে প্রথম প্রথম ঘুমটা আসিল না। তাহার পরে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু।"

কল্য ত এক প্রকার উদ্ধার পাইয়াছি, কিন্তু যদি পুনশ্চ ফরমাএশ হয়, তবেই ——। তবেই কি? পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোককে ভয় করিব? কখনই না। আজি যদি তিনি কিছু বলেন, স্পষ্ট বলিয়া দিব—ডাইবোর্স্। গল্পে আমি নাই।

পঞ্চমুণ্ডী সাধন।

আয় রে তান্ত্রিক হ'ল যুগান্তর!
কবে আর হবে মন্ত্রের সাধন?
আজি কালি করে ঘুমায়োনা আর,
কর একবার চক্ষুরুন্মীলন।

তন্ত্র-বিধিমতে শৃগাল সর্পাদি
ধৃত পঞ্চ জীবে করি অপহত,
আহরিয়া মুণ্ড পঞ্চ-মুণ্ডী-বেদি,
নিভৃতে স্থাপন কর মনোমত।

বসি সে আসনে কর রে সংকল্প,
শক্তি-বীজমন্ত্র সাধনের তরে,
বজ্র-মুষ্টি-পুটে মহাশঙ্খ-মা-
কর জপ ধরি সুধা-পূত করে।

মহাশঙ্খমালা-রূপিণী শক্তির
মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত তৃপ্তির লাগিয়া,
রাখরে সম্মুখে নৃকপাল পূরি,
নানা পশু-রক্ত যতনে স্থাপিয়া——

ধর বাহু-মূলে রুদ্রাক্ষ কবচ,
রক্ত-ত্রিপুণ্ড্রক ললাট-ফলকে;
পূর্ণ সমাধিতে জপ মহামন্ত্র,
ঘুরাও সে মালা পলকে পলকে!

আছে আছে বটে সে কার্য্যে ব্যাঘাত,
আসুর পৈশাচ তীব্র বিভীষিকা!
তার প্রতীকার সোঢ়া মন্ত্র-ধ্যানে
করিবে সমাধি রোধিয়া নাসিকা!

আসুরিক মায়া অতি ভয়ানক
নানা রূপে তারা দেখাইবে ভয়!

'শরীর পতন মন্ত্রের সাধন'
এক তব মনে রাখিবে নিশ্চয়।

কপট পিশাচ বিকট মূরতি
ধরিয়া আসিবে সৈনিকের বেশে
খুঁজিয়ে বরম,—শিরে খড়্গাঘাত
করিবে,—বিঁধিবে শূল বক্ষ-দেশে!

প্রচণ্ড-প্রকৃতি প্রেত দত্তি-দানা
আসি থাকে থাকে সম্মুখে নাচিবে,
খুলি দীর্ঘ দন্ত খিলিখিলি হেসে,
কদাচিৎ আসি উপরে পড়িবে!

রক্তজবা সম চক্ষু ঘুরাইয়া,
দন্ত কড়মড়ি করিবে শাসন;
হীন শীর্ষ দুষ্ট কবন্ধ আসিয়া,
পদাঘাতে ভগ্ন করিবে আসন!

পচামাংস খণ্ড খাবে চিবাইয়া,
লোলিবে রসনা লক লক লকে;
সজল রুধির পড়িবে টোষিয়া,
তাই লয়ে পুনঃ খাবে চক চকে!

কভু আম মাংস লালার ত
দিবে উগরিয়া শরীরে তোমার,
ক্রিমি কিলি বিলি করিবে তাহাতে,
তাহাই লেহন করিবে আবার!

আরো কত শত পাতি মায়া-জাল,
সমাধি ভাঙ্গিতে করিবে যতন;
আঁধারে করিবে আলোক সঞ্চার,
আলোকে আঁধার করিবে ঘটন।

ভয়াল বিভৎস কুদৃশ্য সকলে
তব মন যেন না হয় চঞ্চল,
দৃঢ়চিত্তে ডেক "মাভই মাভই"
পিশাচের ভয়ে হয়োনা বিহ্বল—

কর প্রাণ-পণে মন্ত্রের সাধন
অচল অটল কররে হৃদয়—
চির-লক্ষ্য-ফলে লভিবে যদ্যপি
রাখিওনা তুচ্ছ জীবনের ভয়।

তুমি খ্যাতনামা হিন্দু-বংশধর,
শিব-বাক্য সত্য তন্ত্রের লিখন;
ভুলনা ভুলনা সেই মন্ত্র কভু,
সংকল্পিত ব্রত কর সমাপন।

শক্তি-মন্ত্র-কল্প কল্প বৃক্ষসম
তাহার সাধনে সকলি সফল,
অসাধ্য থাকে কি তাতে কিছু আর?
(ভাব একবার তব লক্ষ্যস্থল!)

সাধিতে সাধিতে তবলক্ষ্য স্থলে
হে সাধক! যবে হবে উপনীত,
দেখিবে সেদিন অপূর্ব্ব ব্যাপার,
বিনা কারণেতে হবে হরষিত!

কে বুঝিবে ভাই সে আনন্দ তব?
তোমার আনন্দ তুমিই বুঝিবে।
সাধ্য-বস্তু যবে পাবে কর-তলে.
সে দিন কি আর এ দিন রহিবে?

নব-নীল-কান্ত জলদ-বক্ষেতে
নবীন-বিদ্যুৎ চমক দেখিয়া,
আলোক-ঝলক-পুলকে মাতিবে,
চকিতে উঠিবে স্বত সিহরিয়া!

বিদ্যুতের সনে তুমিও নাচিবে,
তোমারো হৃদয়ে নাচিবে চপলা;
ঘোর অমা-রাত্রে নিবিড়ান্ধকারে
উদিবে চন্দ্রমা খুলি পূর্ণ-কলা!

তুমিও উঠিবে অনন্ত আকাশে,
উড়িয়া উড়িয়া বিদ্যুতগ্নিসনে;
নিমেষে দেখিবে সপ্তস্বর্গ-পুরি,
আরো উর্দ্ধে উঠি দেখিবে নয়নে

মন-বুদ্ধি স্মৃতি-জ্ঞানের অতীত
জ্বালাময়ী এক মূর্ত্তির প্রকাশ!
অথচ আতপে শীতল কিরণ
লভিবে অপূর্ব্ব সুধা সহবাস!

চাকি চিধি ও তড়িত-আলোক
জ্বালা-রূপে মিশি হইবে বিলয়;
সে মূর্ত্তি নিরখি অমরত্ব পাবে
ত্যজিবে নরত্ব হইবে অক্ষয়।

সাধনের সিদ্ধি লভিবে সে দিন,
জপ-বিঘ্ন-কারী পিশাচ অসুরে
বিনাশের পাবে মন্ত্র-উপদেশ;
'মাভৈই মাভই' ভয় যাবে দূরে।

মারণোচাটন বশীকরণাদি
তন্ত্রোক্ত কুহক কাপালিক রীতি
যতনে শিখিবে ধরিবে খড়গ,
হবে শক্তি-কার্য্য সাধনেতে ব্রতী।

শক্তি-দত্ত অসি ধরি কর-পুটে,
অসুরের মুণ্ড দিবে বলিদান—
বলির রুধিরে আহুতি করিয়া,
ছিন্ন-মস্তা হোম হবে সমাধান!

তবে প্রসন্নতা লভিবে দেবীর,
তবে সাধনেতে হবে সিদ্ধ-কাম,
তবে কার্য্য-ফলে জনম সফল!
তবে সে ধরিবে হিন্দু-পুত্র নাম।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মিশ্র।

আর্য্য ও হিন্দু উপাধি।

আমরা আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিই—হিন্দু বলিয়াও পরিচয় দিই। উভয় উপাধির মধ্যে আর্য্য উপাধিটী যেন আমাদের স্বোপার্জিত বস্তু; কর্ণপ্রিয় ও গৌরবের ধন। যখন মনে হয় "আমরা আর্য্য"—তখন এমন এক অপরিস্ফুট অভিমান সুখের উদয় হয়, যাহার মূল্য উপলব্ধি হয় না? কিন্তু হিন্দু মনে হইলে সেরূপ ভাবের উদয় না। কেন হয় না? তাহা জানি না।

আচণ্ডাল সকল জাতিই হিন্দু বলিয়া জোর করিতে পারেন, কিন্তু আর্য্য বলিয়া জোর করিতে পারেন না। আর্য্য বলিয়া জোর করিবার অধিকার যেন কেবল ব্রাহ্মণাদি তিন জাতিরই আছে আর কাহারও নাই।

হিন্দু বলিলে যেন কোন এক বিজাতীয় শ্রেণীর বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায় বুঝায়, আর আর্য্য বলিলে যেন এক উচ্চতম গৌরবান্বিত জাতি বুঝায়। আমরা ত এইরূপ বুঝি, কেন বুঝি তাহা বলিতে পারি না।

শীর্ষক-স্থিত উপাধিদ্বয় যে এ দেশের পুরাতন তাহা কে বলিতে পারিবে? বরং হিন্দু উপাধির একটা সামান্যাকারের কাল কল্পনা করা যায়; কিন্তু আর্য্য উপাধিটি যেন কাল-কল্পনার অতীত। যেন কোন এক সুদূরবর্ত্তী কাল অথবা অনাদি অনন্তকাল হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। ভারতের কাব্যে, ভারতের ইতিহাসে, ভারতের পুরাণে, স্মৃতিতে, বেদেতে, সর্ব্বত্র আর্য্য শব্দ। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন যে ঋগ্বেদ, তাহাতেও আর্য্যশব্দ *। ভারতে যেন সকল অঙ্গই আর্য্য শব্দে অঙ্কিত রহিয়াছে। যদি ঋগ্বেদ অপেক্ষা পুরাতন কিছু থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় তাহাতেও আর্য্য নাম অঙ্কিত থাকিত। "আর্য্য" ভারতীয় জাতির উপাধি বা উপনাম। কিন্তু কি উপলক্ষে এই উপাধি, তাহা বলা সুকঠিন। নামই হউক, আর উপনামই হউক, নিরুপলক্ষে হয় না, কোন না কোন উপলক্ষ করিয়াই হয়। শব্দ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে নাম প্রচারের প্রতি চতুর্বিধ

* "নার্য্যা ম্লেচ্ছন্তি" [মহাভারত]। "আর্য্য-বাচো ম্লেচ্ছবাচঃ" [মনুস্মৃতি]। "বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবঃ।। [ঋগ্বেদ]।

নিমিত্ত আছে। "শব্দানাং চতুষ্টয়ী প্রবৃত্তিঃ। জাতি-গুণ-ক্রিয়া-নিমিত্তা যাদৃচ্ছিকীচ।" কোন এক জাতি-ভাব, কোন এক গুণ, কোন এক ক্রিয়া ভাব অবলম্বন করিয়াই বস্তুর নাম-করণ হইয়া থাকে। আবার কখন কখন যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ গুণাদির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সঙ্কেত কর্ত্তা কেবল ইচ্ছা অনুসারেও নাম প্রচার করিয়া থাকেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় নামের সহিত বস্তুর কোন সম্পর্ক থাকে না। এই জাতীয় নামের নাম যাদৃচ্ছিক শব্দ। অবশিষ্ট জাতি-শব্দ, গুণ-শব্দ, এবং ক্রিয়া শব্দ নামে ব্যবহৃত হয়। এই চতুর্ব্বিধ শ্রেণী ভিন্ন শব্দের পঞ্চবিধ শ্রেণী নাই।

জাতি, গুণ, কি কোন ক্রিয়া উপলক্ষে যে সকল নাম প্রচার হইয়াছে আমরা সেই সকল নামেরই মূল বাহির করিতে পারি। যাদৃচ্ছিক নামের মূল দুরন্বেষ। সংস্কৃত ভাষায় "ডিত্থ" "ডবিত্থ" প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে। এই সকল শব্দ প্রকৃত যাদৃচ্ছিক শব্দ। শত সহস্র ঔপমিক ভাষাতত্বজ্ঞ একত্র হইলেও তাহার মূল বাহির করিতে পারিবেন না। এমন কি "ডিত্থঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী, ডবিত্থ স্তন্ময়োমৃগঃ।" এই সঙ্কেত জানা না থাকিলে অর্থ পর্য্যন্ত গ্রহ হইবে না। কাঠের হাতীর নাম 'ডিত্থ', আর কাঠের ঘোড়ার নাম 'ডবিত্থ' যে কেন হইল তাহা কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারেন? এক ব্যক্তি কাণ-পুত্রের নাম পদ্মলোচন রাখিয়াছে। অন্যে সেই পদ্মলোচন নাম শুনিয়া যদি মনে করে, পদ্মলোচনের উত্তম চক্ষু, তবে কি তাহার সেই মনে করা ভুল হইবে না? অতএব যাদৃচ্ছিক শব্দের উপর কি ব্যাকরণ কি সাদৃশ্যমূলক ভাষাবিজ্ঞান কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। যদি তাহা না থাকিল তবে আমরা এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে "আর্য্য" শব্দটি কোন্ শ্রেণীর শব্দ? যদি ইহা যাদৃচ্ছিক শব্দ না হয় তবে আমরা অবশ্যই জানিতে পারিব যে আমাদের কুল-পুরুষেরা এই কারণে আর্য্য নামের অধিকারী হইয়াছিলেন।

শাব্দিক পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত যদি মান্য করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা গুণ-শব্দ হয়। তাঁহারা বলেন, যাদৃচ্ছিক শব্দের পরিবর্ত্ত হয় না। কাঠের ঘোড়া আজও ডবিত্থ, কালও ড বিত্থ। চিত্রিত ও সজ্জিত অবস্থায়ও ডবিত্থ, অচিত্রিত অসজ্জিত অবস্থাতেও ডবিত্থ। কিন্তু আর্য্য শব্দটি সেরূপ নহে। আজ যিনি আর্য্য আছেন, হয় ত কাল তিনি অনার্য্য হইতে পারেন। এবং প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থে আর্য্যের জাতিকে অনার্য্য এবং অনার্য্যের জাতিকে আর্য্য বলিয়া সম্বোধন করিতে দেখা যায়। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, আর্য্য উপাধিটি যাদৃচ্ছিক, অথবা জাতি অর্থ বা ক্রিয়া-সম্পর্কীয় উপাধি নহে ইহা গুণ-সম্পর্কীয় উপাধি।

কি গুণে "আর্য্য" এই গৌরবান্বিত নাম প্রচার হইয়াছিল? এ আলোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে, এ বিষয়ে ম্যাক্স-মূলার সাহেব যাহা অনুমান করিয়াছেন, অগ্রে তাহারই সমালোচন করা যাইতেছে।

ম্যাক্সমূলার সাহেব "আপনার লেক্চার অন্ দি সায়ান্স অব্ ল্যাঙ্গোএজ্" নামক গ্রন্থের সপ্তম প্রস্তাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'ভারতীয় জাতিদিগের "আর্য্য" এই উপাধিটি ভূমি বিদারণ কার্য্য হইতে উত্থিত। ভারতবর্ষীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সর্ব্বাগ্রে ভূমি বিদারণ অর্থাৎ কৃষিকার্য্য করিতে শিখিয়াছিল, সেই জন্য তাহারা বাসস্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এই উপাধি আপনারাই মনোনীত করিয়া লইয়াছিল। বর্ত্তমান বিশেষ বিশেষ কএকটি পুরাতন জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা অতি পুরাকালে এক স্থানে বাস করিত এবং একরূপ ভাষাই ছিল, তাহাদের বংশ পরম্পরা দেশ দেশান্তরে গিয়া বাস করিলেও তন্নিবন্ধন ভাষার অনৈক্য ঘটিলেও সেই মূল ভাষার সাদৃশ্য লোপ হয় নাই। যেমন এক মূল পুরুষ হইতে অনেক বংশের উৎপত্তি হইয়াছে সেইরূপ এক মূল ভাষা হইতে এক্ষণে অনেক ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্যই আমরা লাটিন্ গ্রীক্ ও সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার মূল-গত ঐক্য দেখিতে পাই।

"অন্যান্য ভাষায় যেমন "আর্থ্" প্রভৃতি পৃথিবী-বোধক শব্দের মূলে ঋ-ধাতুর বিকার "আর্" বা "অর্" এতদ্রূপ উচ্চারণের শব্দ আছে, আর্য্য শব্দের মূলেও সেইরূপ "আর্" আছে। যাহার দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করিত সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম গোদারণ ছিল, এক্ষণে তাহাই লাঙ্গল নামে বিখ্যাত। চষা জমীকে "আর্" বা "অর্" বলিত, এক্ষণে উহা সাধারণতঃ পৃথিবীবোধক হইয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে আর্য্য নামটি চষা জমী ঘটিত নাম।"

ম্যাক্সমূলারের এই সিদ্ধান্ত দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে তাঁহার মতে আর্য্য শব্দটি ক্রিয়া শব্দ—সেক্রিয়া ভূমিকর্ষণ অর্থাৎ কৃষি। কৃষিকার্য্য করিতেন বলিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কার্য্যের অনুরূপ আর্য্য উপাধি লইয়াছিলেন! আমাদের এখন এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, আর্য্য জাতি অর্থাৎ আদিম কৃষকের জাতি।

লোকের চক্ষুরুন্মীলনের জন্য মহাত্মা ম্যাক্সমূলার যাহা বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাতে আমাদের সন্দেহ চ্ছেদ হইতেছে না। "আর্য্য" এই নাম দ্বারা প্রাচীন কালের কৃষি-কার্য্য বুঝিবার পক্ষে, যে সকল প্রতি-বন্ধক আছে তাহা একটি করিয়া প্রদর্শন করিতেছি, বিবেচনা করিয়া দেখুন, সিদ্ধান্তটি কিরূপ দাঁড়ায়।

১ম। যখন আমরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করি নাই, জ্ঞাতি-মণ্ডলীর সহিত একত্র বাস করিতাম, তখন আমরা

পৃথিবীকে কি সামান্য ভূমিখণ্ডকে ঋ কিংবা তাহার ব্যতিক্রমে আর্ অথবা অর্ বলিয়া ব্যবহার করিতাম, তাহার কোন প্রমাণ দেন নাই, আমরা খুঁজিয়া পাই না।

২য়। যদি তৎকালে তাঁহারা কথিত প্রকারের শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে ডাকিতেন এমন নির্ণয় হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাদের উচ্চারণে ভারত প্রবেশের পরও ঐরূপ উচ্চারণের সন্নিবেশ থাকিত; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, ভারতে আসিয়া তাঁহারা যে কিছু পৃথিবী বোধক শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার একটিতেও ঋ, কি অর্, কিংবা আর নাই।

৩য়। অর্থের সমানতা পক্ষে দৃষ্টি না করিয়া, কেবল মাত্র বাহ্য উচ্চারণের সাদৃশ্যে তিনি আর্ শব্দের পৃথিবীবোধকতা ছিল এবং তাহা হইতে আর্য্য উপাধিটি কৃষি ঘটিত উপাধি বলিয়াছেন; ন্যায়বেত্তারা অন্ধানুমান বুঝাইবার জন্য এইরূপ দৃষ্টান্তই দিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা অভ্রান্ত মনে করিতে পারিলাম না।

৪র্থ। সাদৃশ্য-মূলক ভাষা-বিজ্ঞান নামক তর্ক প্রণালীকে আমরা অকাট্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সাদৃশ্যের দ্বারা বস্তু-গ্রহ হয় সত্য, কিন্তু তাহার কোন এক অংশে ব্যতিক্রম থাকিলেই তাহা অসত্যগ্রহের হেতু হইয়া উঠে। অতএব কেবল মাত্র বাহ্য উচ্চারণের সাদৃশ্য লইয়া দুই বা ততোধিক শব্দের এক-মূলতার কল্পনা বলিয়া মনে করা আর ভ্রমকে আদর পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থান দেওয়া তুল্য। লাটিন ভাষায় "টেরা" শব্দ আছে, এবং বঙ্গ ভাষায়ও "টের" [টেরের ঘর] শব্দ আছে। ইংলিস্ ভাষায় "নেম" শব্দ আছে, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতেও "নেম" শব্দ আছে। ইংরাজী নামের মধ্যে ক্রাইষ্ট প্রভৃতি, আর সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণ, কার্ত্তবীর্য, কার্ষ্ণি প্রভৃতি বহুতর উচ্চারণের নাম আছে। কিন্তু তন্নামের অর্থ পরস্পর এতদূর নিঃসম্পর্ক যে তুল্য কোন কল্পনার দ্বারা কোনরূপ সম্বন্ধের বিন্দু-বিসর্গও রক্ষা করা যায় না। কোনরূপ অর্থ-সম্পর্ক নাই অথচ বাহ্য আকারের সাদৃশ্য আছে এরূপ বিজাতীয় শব্দের এক মূলতা কল্পনা করিলে তাহাতে লেশ মাত্রও যুক্তি থাকে না।

৫ম। পৃথিবীর সকল মনুষ্যই এক ব্যক্তির (ব্রহ্মার) সন্তান সত্য এবং যখন অল্প লোক তখন এক স্থানেই ছিল সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাও সত্য যে যত মনুষ্য বৃদ্ধি হয়, ব্যবহারের তত বৃদ্ধি হয়, ততই ভাষার বৃদ্ধি হয়। পুরাতন সঙ্কেত লুপ্ত হয়, নূতন নূতন সঙ্কেতের আবির্ভাব হয়। অতএব প্রদর্শিত উচ্চারণ গুলি যে পরস্পরের স্থান ত্যাগের পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন একত্র বাস ছিল তখনই যে সঙ্কেতিত হইয়াছিল

স্থান ত্যাগের পরে হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? আমরা ভারতে প্রবেশ করিয়া এবং অন্যেরা অন্য দেশে গমন করিয়া যদি তদ্রূপ নূতন উচ্চারণ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে তাহা হইলে সে মৌলিকতা পক্ষে স্বীকার সম্মত হয়?

৬ষ্ঠ। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, আদিম কাল হইতে এপর্য্যন্ত যেকিছু পৃথিবীবোধক শব্দ আর্য্য জাতির মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে তন্মধ্যে একমাত্র ঋ, অর্, কি আর্, কিছুই নাই। পৃথিবীর বৈদিক নাম এই——

গো, গমা, জ্মা,ক্ষা, ক্ষোণী, ক্ষিতি, অবনি, উর্ব্বী, পৃথ্বী, মহী, রিপ, অদিতি, ইরা, ইলা, ইড়া, নির্ঋতি, ভূ, ভূমি, পূষা, গাতু এবং গোত্রা, প্রভৃতি ২১ একুশ নাম।

বৈদিক সময়ের পৃথিবী বাচক নাম এই। এতদ্ভিন্ন আর নাম তৎকালে ছিল না। এতন্মধ্যে "উর্ব্বী" ও "ইলা" বা "ইরা" শব্দ আছে, তাহার একটিও ঋধাতু হইতে উৎপন্ন নহে। একটি উর, আর একটি ইর্।

তৎপরে যাহা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা এই——

ভূমী, ক্ষৌণী, বসুন্ধরা, বিশ্বম্ভরা, বসুমতী, বসুধা, মর্ত্যবাসা, মহী, মেদিনী, অচলা, অব্ধিমেখলা, অবনী, অনন্তা, স্থিরা, সর্ব্বংসহা, সাগরাম্বরা, ধরণী, ধরিত্রী, ধরা, জ্যা, জ্যা-মৌর্ব্বী, কু, কাশ্যপী, পৃথিবী, পৃথ্বা, রসা, ভূর্; রত্নগর্ভা, ভূতধাত্রী, রত্নাবলী, দোহিনী, পারা, বিপুলা, মধ্যমলোকবর্ত্মা, ধারণী, জগদ্বহা, গন্ধবতী, খণ্ডনী, গিরিকর্ণিকা, পবিত্রী, সাগরমেখলা, সহা, অচলকীলা, অব্ধিদ্বীপা, দ্বিরা, ইড়িকা, ইলিকা, উদধিবস্ত্রা, ইরা, আদিমা, উর্ব্বরা, আদ্যা, জগতী, পৃথু, ভুবনমাতা, নিশ্চলা, বীজপ্রসূ, শ্যামা, ক্রোড়কীলা, ভগবতী, অদিতি।

ইহার মধ্যে আর্ কি অর্ শব্দ নাই এবং এই সকলের কোনটির প্রকৃতি ঋ কি তদুৎপন্ন অর্ বা আর্ নহে।

এত গুলি ভূমিবোধক নামের মধ্যে যখন একটীও ঋ, অর্, আর্, নাই, তখন নিশ্চয়ই পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে আর্য্য শব্দের মূল দর্শনে সাদৃশ্যমূলক ভাষা বিজ্ঞান অন্ধ। ✓

আমরা যে বহু শত বৎসর কান্যকুব্জ ত্যাগ করিয়াছি তাহা আমরা ভিন্ন অন্যে জানে না। পূর্ব্বে আমাদের দোবে, চোবে, মিশ্র, তেয়ারি উপাধি ছিল, এখন আমরা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য, রায়, মজুমদার, ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি। এ সকলের মূল আমরা জানি, অন্যে জানে না। অন্যে যাহা জানে, তাহা আমাদের নিকট শিক্ষা করিয়াছে বা শুনিয়াছে বলিয়া জানে। সাদৃশ্য তত্ত্বের দ্বারা জানে না। অতএব আমাদের গোত্র বা কুলপুরুষের বৃত্তান্ত জানিতে হইলে আমাদের উপর

নির্ভর করিতে হইবে, আমাদের ... লইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই ইংরাজ জাতির কোন বিষয় ... নিতে হইলে আমাদের ইংরাজ জাতির উপরই নির্ভর করিতে হইবেক নচেৎ পণ্ডশ্রম সার হইবেক।

এই গৌরবান্বিত উপাধিটি যাহাদের স্বোপার্জিত ধন, তাহারা কি তাহাদের উত্তরাধিকারীরা কেহই কোথাও বলেন নাই যে আমরা সর্ব্বাগ্রে কৃষি-কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়া আমরা আর্য্য। ববং তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, জগতের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান্ হইয়াছিলেন, নূতন প্রিয় হয়েন্না পৈতৃক আচার ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই ও দেশত্যাগীও হয় নাই তাঁহারাই আর্য্য। এ বিষয়ে অতি আদিম কালের মনু বাক্য যথা——

"কর্ত্তব্যমাচরন্ কাম-মকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বৈ আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥"

"তস্মাদার্য্য ইতি স্মৃতঃ" এরূপ পাঠও দেখা যায়। প্রকৃত আচার ব্যবহার থাকিয়া যিনি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্য বর্জন করিতেন, তিনি "আর্য্য" এই প্রসিদ্ধ উপনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। "তস্মাৎ" পাঠ বিকল হইলে এই সত্য আরও বিশদ রূপে প্রকাশ পায়। কেননা পূর্ব্বোক্ত গুণ গুলিই আর্য্য নাম প্রচারের হেতু, এইরূপ অর্থই হয়।

এই মনু-বাক্য, আর্য্য শব্দের ধাতু, শব্দবিজ্ঞান বিৎ পাণিনি মুনির নির্ব্বচন একত্র করিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আর্য্য শব্দটি গুণ-শব্দ এবং সে গুণটি জ্ঞান-গুণ। যে জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান-গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আর্য্য। "তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে" এই মনুবাক্যের সহিত এই জাতির প্রকৃতির পরিষ্কার রূপে মিল আছে। ইহারা নূতন-প্রিয় নহে, দেশ ত্যাগ করিতে ভাল বাসে না, সহজে পৈতৃক আচার বিসর্জন দিতে চাহে না। এই সকল কারণে ইহাদের মধ্যে অদ্যাবধি পঞ্চ সহস্রাধিক বৎসরের আচার অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রবর্ত্তিত আছে। এই জন্যই এই জাতিরা এই দুরবস্থা কাটিয়া উঠিতে পারে না।

আর্য্য শব্দের মূল 'ঋ', কিন্তু তাহার অর্থ গতি (১) প্রাপণ (২) ও জ্ঞান (৩)। এই জ্ঞানার্থ লক্ষ্য করিয়াই ঋ + যৎ আর্য্য। পূর্ব্বকালের ঋষিরা এই জ্ঞান গুণকে এত গৌরব করিতেন যে, জ্ঞান হওয়া আর জন্ম হওয়া তুল্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এই কারণেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির দ্বিজ অর্থাৎ ইহাদের দুই বার জন্ম। "মাতুঃ সকাশাৎ জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জী-বন্ধনাৎ।" একবার মাতৃ-গর্ভে জন্ম আবার উপনয়ন অর্থাৎ জ্ঞানশিক্ষার আরম্ভ করেন বলিয়া তাহাও জন্ম। এই দুই জন্ম হয় বলিয়া ইহারা দ্বিজাতি,

দ্বিজন্মা ইত্যাদি। এইরূপ, যাঁহারা এক্ষণে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের পুরুষেরাই সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানী হইয়াছিলেন। জ্ঞান যে কি পদার্থ তাহা তাঁহারাই পৃথিবীর সকল মনুষ্যের অগ্রে জানিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্যই ব্রাহ্মণজাতি অগ্রজন্মা, মুখ্যজাতি ও জ্যেষ্ঠবর্ণ নামের অধিকারী হইয়া আছেন। অতএব আর্য্য নামটি গুণ হইতে উৎপন্ন, কৃষি হইতে নহে।

ম্যাক্সমূলার যে অনুমান করিয়াছেন, "ভারতবর্ষীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সর্ব্বাগ্রে কৃষি কৌশল অবগত হইয়াছিল"—ইহাও সত্য। কৃষি, বাণিজ্য, পাশুপাল্য প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহার বিজ্ঞানও এই জাতির মধ্যেই সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। প্রথমে যাহারা কৃষির সৃষ্টি করে, বাণিজ্যের সৃষ্টি করে, তাহারা আর্য্য নহে, তাহারা "অর্য্য"। আর্য্য সম্প্রদায়ের একদল ইহা ভোগ করিয়া থাকেন। এখন যাঁহারা বৈশ্য, তাঁহারাই পূর্ব্বকালের অর্য্য। এই অর্য্য শব্দটিও ঋ-ধাতু হইতে উৎপন্ন, কিন্তু জ্ঞানার্থ তাহার প্রকৃতি নহে, প্রাপণ অর্থই ইহার মূল। যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে পাওয়ান অর্থাৎ বিনিময় বা বাণিজ্য প্রথার সৃষ্টি কি তাদৃশ কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা "অর্য্য" নামে খ্যাত হইলেন। মনুষ্য-হৃদয়ে অগ্রে জ্ঞানের উদয়, পরে বাণিজ্যের সৃষ্টি, তৎপরে কৃষির সৃষ্টি। জ্ঞান না হইলে কোন বিষয়ই প্রকাশ পায় না। লোকের অভাব না হইলে বিনিময় বা বাণিজ্যের আবশ্যকতা হয় না। আবশ্যক ও বিনিময়ের কাল উপস্থিত না হইলে লোকে অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া কি করিবে? এই পূর্ব্ব পুরুষেরা সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান রূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া আর্য্য, যাঁহারা তাহাদের পীড়নকারী ও ন্যায়ান্যায়-বোধ-শূন্য তাহারা অনার্য্য, ক্রমে সেই আর্য্যেরা পৃথক্ পৃথক্ ভার গ্রহণ করিয়া এক দল ক্ষত্রিয়, একদল অর্য্য, হইয়াছিলেন। বাণিজ্য কার্য্য হইতে অর্য্য উপাধি, তৎপরে তাঁহারা "ভূমিস্পৃক্।"

মহামুনি পাণিনিও এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"অর্য্যঃ স্বামি বৈশ্যয়োঃ।" "আর্য্যো ব্রাহ্মণ-কুমারয়োঃ।"

অর্য্য ও আর্য্য এই দুইটি নিপাত শব্দ। যাহারা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিয়া বেদ ব্যখ্যা কালে মহর্ষি যাস্কের সম্মুখে উপস্থিত হইল, অথচ তিনি তাহাদিগকে নির্ব্বাচনের বাচ্য করিতে পারিলেন না। "উচ্চাবয়বেষর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ"। যাহারা এক এক নির্দ্দিষ্ট অর্থে রূঢ় তাহারা নিপাত শব্দ। এই দুই শব্দ যেমন যাস্কের বাধ্য হয় নাই, সেইরূপ পাণিনিরও বাধ্য হয় নাই। পাণিনিও "অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ" "আর্য্যো ব্রাহ্মণ-কুমারয়োঃ" বলিয়া নিপাত নাম বজায় রাখিয়া গিয়াছেন।

অতএব আর্য্য শব্দ বহু-দূরবর্ত্তী কাল হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে রূঢ় হইয়া আসিতেছে এবং অর্য্য শব্দও বৈশ্যে রূঢ় হইয়া আসিতেছে। শূদ্রেরা আর্য্য উপাধির অধিকারী কি না তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিবেচ্য। ফল। ক্রবি ঘটিত 'অর্য্য নামটির প্রতি বোধ হয় দৃষ্টিপাত নাই, সেই জন্যই তিনি আর্য্যের বিচার অর্য্যের উপর আরোপ করিয়াছেন।

হিন্দু উপাধি লইয়াও এইরূপ গোলযোগ আছে তাহা আগামী মাসে আর্য্যদর্শনে ব্যক্ত করিব।

কালীবর বেদান্তবাগীশ।

মসলমান রাজত্ব।

মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতে সেরসাহের রাজত্ব পর্য্যন্ত।

ভারতীয় যে গৌরবসূর্য্য অদ্ধজগৎ এতকাল প্রকাশিত, প্রদীপ্ত এবং আলোকিত করিয়াছিল, কালমাহাত্ম্যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রারম্ভ ভাগে তাহা অস্তাচলশিখরশায়ী হইল। দশম অবতার অবতীর্ণ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব। পুণ্যভূমি ভারত ঘোর পর্ব্বতস্থ দৈত্যদল দ্বারা আক্রান্ত, এবং দাসানুদাস কুতুবুদ্দিন ভারত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। যবনভয়ে ভীতাভারত-রাজলক্ষ্মী ধীরে ধীরে সাশ্রুনয়নে যমুনার জলে অবতরণ পূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, পাষণ্ড সন্তানগণ একবার ফিরিয়াও তাকাইয়া দেখে নাই!

কুতুবুদ্দিনের ভারতরাজসিংহাসনে আরোহণ হইতে ইংরেজ কর্তৃক ভারতাধিকার পর্য্যন্ত, সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর মুসলমান রাজত্বের স্থিতিকাল। এই দীর্ঘকাল যদিও এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের শাসনে শাসিত, কিন্তু একবংশ বা একজাতি ধারাবাহিক রূপে রাজত্ব করিতে পায় নাই। উপর্য্যুপরি তুর্কী, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানাজাতি যখন যে প্রবল হইয়াছে, তখনই সেই পূর্ব্ববংশকে সস্থানচ্যুত করিয়া ভারতসিংহাসন অধিকার করিয়া আসিয়াছে। এই সমগ্র মহম্মদীয় রাজত্ব কালের মধ্যে মোগলবংশীয়দিগের রাজত্বকাল অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, প্রভাবশীল এবং প্রজারঞ্জক। অপরাপর জাতীয় রাজত্বকাল প্রায় এক প্রকৃতির এবং অত্যাচার-বহুল। বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন বংশ সত্বেও রাজাচার সম্বন্ধে বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এ নিমিত্ত ঐতিহাসিক কালবিভাগে ভারতীয় মুসলমান রাজত্বকাল দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম কাল ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রারম্ভ হইতে

ষোড়শ শতাব্দির মধ্যভাগে শূববংশীয়দিগের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত; এবং দ্বিতীয় কাল হুমায়ুন বাদসাহের দ্বিতীয়বার সিংহাসনারোহণ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে মহম্মদ সাহের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত, গণনা করা গেল। এই প্রথম-কালীয় মুসলমান রাজত্ব এবং রাজনীতি কি প্রকার তাহাই যথাযথ আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কেবল ভারতীয় মুসলমান রাজত্বের প্রতি নহে, মুসলমান জাতিসাধারণের রাজত্বের উপর অপরাপর সকল জাতীয় লোকের কিছু না কিছু পরিমাণে বিদ্বেষ। যখন মুসলমান রাজত্বের উপর এত লোকেরই বিদ্বেষ, তখন অবশ্যই তাহা কারণ-শূন্য না হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে মুসলমানদিগের দোষভাগই সর্ব্বস্ব, গুণভাগ কিছু মাত্র নাই। একাধারে সমগ্র দোষ বা সমগ্র গুণযুক্ত কোন পদার্থ এ পৃথিবীতে নাই। ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত। প্রকৃতি স্বয়ং যখন দোষে গুণে নির্ম্মিত, তখন প্রাকৃতিক বস্তু নিচয় যে তদ্ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইবে ইহা অসম্ভব। তবে আমরা ভাল বা মন্দ বলি কাহাকে?—যথায় গুণের আধিক্য, তথায় ভাল; এবং যেখানে দোষের আধিক্য সেখানে মন্দ। পুনশ্চ যাহা এক স্থানে ভাল কি মন্দ বলিয়া বিবেচিত, গৃহীত এবং প্রতিপালিত, তাহা সর্ব্বত্রই যে তদ্রূপ হইবে তাহা নহে। ইহা কি জাতীয় জীবন কি মানবচিত্ত উভয়েরই উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপর নির্ভর করে। দেখা গিয়াছে যে সুবোধে যাহাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করে, নির্ব্বোধে তাহাকে মন্দ বলিয়া পরিহার করিয়া থাকে; এবং নির্ব্বোধের বোধে যাহা ভাল, সুবোধের পক্ষে তাহা পরিহার্য্য। পরন্তু দেখা যাইতেছে যে যাহা সুবোধের পক্ষে ভাল, তাহা যদি নির্ব্বোধের বোধ ও গ্রহণ শক্তির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার উপর প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইতে আশানুরূপ সুফল আমরাও প্রাপ্ত হই না, অথচ যাহার উপর প্রয়োগ করিলাম, সেই পদে পদে তাঁহাকে অসুখ বোধ করিয়া ম্রিয়মাণ হইতে থাকে। অথবা সেই ভাল পদার্থকে আপনার সমতায় অপকর্ষ প্রাপ্ত করাইয়া আত্ম-প্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং ফলে ভালর ভালত্ব লোপ পাইল। আমরা জানি যে রাজতন্ত্র শাসন অপেক্ষা সাধারণ-তন্ত্র শাসন শ্রেষ্ঠ এবং মঙ্গলকর, কিন্তু তাই বলিয়া যদি এই সময়ে ইউনাইটেড ষ্টেটের রাজশাসন ভারতে প্রচলিত করা যায়, তাহা হইলে কি উহা ভারতে শুভ প্রসব করে?—আমার বোধ হয় তাহা হইলে ভারত দুই দিনে উচ্ছিন্ন যায়। পুনশ্চ ফরাসিস রাজ্য দেখ, এথানে

অনেকবার সাধারণতন্ত্র রাজশাসন প্রচলিত হইল, কিন্তু ফলে উহা শেষে এরূপে পরিণত হয়, যে অযনা রাজ-তন্ত্রও তাহা অপেক্ষা ভাল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ সকলের কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক দূর যাইত হইবে না, লোকচিত্তের পরিমাপক শক্তি এবং ভাব-গ্রাহিতাই ইহার মূল দেশে নিহিত। ফলতঃ আত্ম অপেক্ষা উন্নত বস্তুর প্রার্থনা, এবং তাহার গ্রহণে কিরূপ কুফল ফলিয়া থাকে, ফরাসিস দিগের সাধারণতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তনা তাহার সুন্দর উদাহরণ স্থল। অতএব বস্তুতঃ ধরিতে গেলে দেশ কাল পাত্র অনুসারে যাহা সম্যক ভাবে প্রযুক্ত এবং শুভ প্রদায়ক তাহাই ভাল, তদ্বি পরীতে ভাল পদার্থও মন্দ মধ্যে পরি গণিত। এক্ষণে যদি এই বিবেচনা অনুসারে দেখা যায়, এবং তৎকালীন ভারতীয় অবস্থা যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে সে সময়ের পক্ষে, বহুবিধ অত্যাচারি স্বভাব সত্ত্বেও, এই মুসলমান রাজত্ব যে নিতান্ত অন্যায় প্রয়োগ, এরূপ বোধ হয় না। প্রত্যুত ন্যায় প্রয়োগ বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে।

মুসলমানদিগের রাজশাসন রাজতন্ত্র এবং শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচারি। মুসলমান ধর্ম্মের শিক্ষা অনুসারে নীতি (Law) রাজা প্রভৃতি সর্ব্বোপরি বলবৎ। রাজার স্বয়ং সেই নীতিমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে তাহার অনুসরণই করিতে হইবে। মুসলমান ধর্ম্মরক্ষক খলিফা-গণও এ নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারিবেন না এরূপ বিধান। এই নীতি-মার্গ কোরাণের বিধান এবং মহম্মদের ক্রিয়া কাণ্ডের উদাহরণ দ্বারা নির্ম্মিত। এই নীতি সমূহের মধ্যে নৃশংসাচরণ এবং বিধর্ম্মিদিগের প্রতি অত্যাচারের বিধান যদিও অনেক অনেক আছে, কিন্তু সুবিধা নও এই আছে, যে যদি রাজন্যবর্গ এই নীতি সমূহের কি সৎ কি অসৎ উভয়ই সমভাবে প্রতিপালন করিতেন, তাহা হইলেও প্রজাবর্গের প্রাপ্যাংশে মঙ্গলের ভাগ অধিক হইত। কিন্তু সৎ নীতি অপেক্ষা অসৎ নীতি প্রতি পালন করা অতি সহজ, এবং মনুষ্য প্রকৃতি-সাধারণতঃ সহজ সাধ্য বিষয়ের প্রতি কিছু পক্ষপাতি। বিলাসপ্রিয় মুসলমান রাজবর্গ যে এই সাধারণ মনুষ্য প্রকৃতির প্রতিই অধিক আগ্রহ যুক্ত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক এই কথাটি মনে রাখিলে মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক যে প্রজার প্রতি অত্যাচার, তাহার অনেক কারণ পরি-স্ফুট হইয়া আসিবে।

মুসলমান রাজাদিগের রাজকীয় ক্ষমতার বিষয় সমগ্র ভাবে পর্য্যালোচনা করিতে গেলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে কার্য্যতঃ সে ক্ষমতার আর সীমা নাই। রাজা সর্ব্বে সর্ব্বা, যাহা তাঁহার

ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু এই রাজকীয় ক্ষমতার পরিচালন-ক্রিয়ার তারতম্যতা প্রায় সর্ব্ব সময়েই রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি-বিশেষের মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করিত। রাজা যখন দৃঢ়চেতা, তখন তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা, অথবা "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা।" সকলেই তাঁহার আজ্ঞাকারী দাসবৎ আজ্ঞা প্রতিপালনরত। কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে রাজা লঘুচেতা হইলেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, বাতুলালয়ের বাতুল অপেক্ষা নিঃসহায়। পুত্তলিকা-পোয়ক্রিয়া শূন্য, এবং ইচ্ছা সত্বেও অক্ষম। তখন হয় সেনাপতি নতুবা মন্ত্রী, অথবা বেগমের পাল বা নাচওয়ালিনী, কিম্বা খোজাগণ। এই দৃশ্য পুত্তলের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রকৃত পক্ষে রাজত্ব করিত। রাজা তাহাদের আজ্ঞার অধীন, ওঠ বলিলে উঠিতে হইত, সকল সময়ে রাজাই যে রাজা ছিলেন, তাহা নহে। অনেক সময়ে এই সকল নীচজাতীয় লোকও ভারত ভাগ্য নিরাকরণ করিয়া আসিয়াছে।

রাজার প্রধান অমাত্য উজির। ইনি সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী। উজির ভিন্ন সামান্য সামান্য কার্য্যসাধন পক্ষে আরও বহুবিধ মন্ত্রিবর্গ ছিল। কিন্তু উজির ইহাদের সর্ব্বপ্রধান। রাজার অভিপ্রায় অনুসারে সমগ্র রাজ্য শাসন ইহাঁদের কার্য্য। সুতরাং ক্ষমতা একরূপ অপরিমিত বলিতে হইবে। উজিরের ক্ষমতা কোন সময়েই কোন বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ ছিল না। এই ক্ষমতা রাজসিংহাসনস্থ ব্যক্তি বিশেষের স্বভাবের উপর নির্ভর করিত। রাজা ক্ষমতাপন্ন হইলে মন্ত্রীর ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইত, আরঙ্গিব স্বয়ং এত কার্য্য সমাধা করিতেন যে, উজির তখন নামে মাত্র উজির ছিলেন, সাধারণ মহুরীর ন্যায় বলিলে হয়। আবার রাজা যখন অপদার্থ হইতেন তখন উজিরই রাজা। মহম্মদ সাহ শূর আদিলের সময়, হিমু নামক জনৈক হিন্দু উজিরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত পক্ষে রাজত্ব করিয়াছিল বলিতে হয়। যে মোবারক খিলিজি নর্ত্তকী সাজিয়া, গৃহে গৃহে নর্ত্তকীবর্গের সহ নৃত্য গীত করিয়া ফিরিত, তাহার রাজত্ব কাহারা করিত তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদ্ভিন্ন অপরাপর কার্য্যবিভাগের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রীবর্গ এবং অপরাপর কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। রাজকীয় ক্ষমতার মূলেই যখন কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মের অভাব, তখন ইহাদেরও কার্য্য-প্রণালী যে বহুলাংশে বিশৃঙ্খল হইবে তাহা সহজেই অনুমিত। ইহারা উপর হইতে যেরূপ অনিয়ম ও রাজার যদৃচ্ছা ব্যবহারে জ্বালাতন হইত, ইহাদিগের অধীনস্থদিগের প্রতি ব্যবহারে তাহার শোধ লইতে ত্রুটি করিত না। রাজপার্শ্বে এতদ্রূপ কর্ম্মচারিগণের অবস্থান মাত্র অবলক্ষিত হয়। কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে মন্ত্রণা

পূর্ব্বক একটা কাজ করিলে যে শুভ-ফলের উৎপত্তি সম্ভব হয়, এ বিবেচনা যে মুসলমান রাজাদের বড় একটা হৃদয়ঙ্গম ছিল, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণার্থে মন্ত্রণা সভার অস্তিত্ব বড় একটা লক্ষিত হয় না। অনেক রাজাই, অথবা প্রকৃত পক্ষে রাজতলাভিষিক্ত মন্ত্রিরা মনে করিতেন, যে বুদ্ধি পূর্ব্বক তাঁহারা যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই অভ্রান্ত এবং অকাট্য, ইহাতে আর প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা সাধারণতঃ প্রভুত্বতে এত দূরই আকৃষ্ট ছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত আত্ম-নির্ভরতা, আত্মগরিমা এত দূরই অযথা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং অধীনস্থদিগের নিকট হইতে এতদূরই দাসবৎ ব্যবহার প্রত্যাশা করিতেন, যে যথার্থ পক্ষেও কেহ তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করিলে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিতেন না। এবং এ নিমিত্ত অধীনস্থেরাও সকল সময়ে রাজমতের বিপরীতগামী কোন সদুপদেশ প্রদানে সাহসী হইতেন না। যদিও বা কখন রাজা পার্শ্বস্থ পারিষদ-বর্গকে কোন বিষয়ের হিতাহিত জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত অবনত হইয়া অধীনস্থবর্গকে চরিতার্থ করিলেন মনে করিতেন, কিন্তু অধীনস্থবর্গ বুঝিত যে কিরূপ মত প্রকাশ করিলে বাদসাহ সন্তুষ্ট হইবেন। সুতরাং ফলে জিজ্ঞাসা করা না করায় সমান ফল ফলিত। কখন কখন সুমন বিশিষ্ট রাজারা এতদ্রূপ পথে সাধ্যানুসারে গমনে বিরত হইতেন বটে, কিন্তু যে পারিষদ্‌বর্গের চরিত্র এবং স্বভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অত্যাচারীর সভায় গঠিত হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে যে আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হইবেন, এরূপ সম্ভব বড় ছিল না। প্রথমতঃ এক ব্যক্তির বিবেচনা বহু ব্যক্তির বিবেচনা সমষ্টি অপেক্ষা অনেক ভ্রান্তি সঙ্কুল হওয়াই সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই সকল পারিষদ্‌বর্গের, যাহাদের স্বভাব এরূপ ভাবে নির্ম্মিত, তাহাদের প্রধান চেষ্টাই এই যে কিরূপে রাজার চক্ষে ধূলা দিয়া আত্ম-স্বার্থ সাধন করিবে। এ কারণে রাজা ভাল হউন আর মন্দই হউন, রাজকার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর বিবেচনায় অল্পই ইতর বিশেষ হইত। যে রাজসভা এরূপে সংগঠিত, সেখানে যে উচ্চাধমের মধ্যে নিয়মাধীন কোন বাধ্য বাধকতা অধিক থাকিবে, অথবা প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থানের সীমা মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যথাদিষ্ট ভাবে নিয়োজিত কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। এজন্য এরূপ রাজ্য রাজা এবং রাজ-পরিষদের সংস্থান ছিন্ন-সূত্রা চ্যুতা মালিকামালার ন্যায়, কতক মালিকা বা সুতায় গাঁথা আছে, কোনটা বা বিচ্ছিন্ন ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, এ দিকে ছিন্ন সুতার মুখ বাতাসের ভরে এদিক্ ও ওদিক্ দুলিয়া বেড়াইতেছে।

মুসলমানদিগের শান্তিবিভাগ যদ্রূপ বিশৃঙ্খল, সৈনিক-বিভাগ তদপেক্ষা উন্নত নহে। সেনা-নিয়োগ পক্ষে কোন বিশেষ নিয়মের অস্তিত্ব ছিল না। রাজা স্বয়ং কথন কথন কোন লোককে নিযুক্ত করিয়া আত্ম-ব্যয়ে অস্ত্র শস্ত্র ও ঘোটকাদি দিয়া সজ্জিত করিতেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ এক দল লোক দলবদ্ধ হইয়া, আপন আপন দল-পতির সহ উপস্থিত হইয়া রাজ-অনুমতিক্রমে সৈনিক শ্রেণীতে যদৃচ্ছা প্রবেশ করিত। ইহারা আপনাপন ব্যয়ে সুসজ্জিত হইত। প্রত্যেক দলের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে দলপতির উপর জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হইত বটে, কিন্তু তাহা প্রায় সম্যগ্‌ভাবে দলপতিরই ভোগ দখলে থাকিত, অধীনস্থ সৈনিকেরা তৎপ্রতি তত ভ্রূক্ষেপ করিত না, এবং করিবার আবশ্যকও ছিল না। কারণ ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য যুদ্ধ বিগ্রহের গন্ধ পাইলেই লুণ্ঠন দ্বারা আত্ম পোষণ করা, তাহারা জানিত যে বেতন মাত্র ভোগ অপেক্ষা এরূপ আত্ম-পোষণ অধিক লাভের বিষয়। সকলেই স্ব স্ব উদর পূর্ত্তির চেষ্টায় রত, সুতরাং উপরস্থ সেনানায়কেরা ইহাদিগের এ লুণ্ঠন-বৃত্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি করিতেন না। এই সকল সৈনিকেরা যথন যুদ্ধ বিগ্রহ না হইত, তখন চুরি, ডাকাইতি, দাঙ্গা ফসাদ ব্যতীত কদাচিৎ সৎভাবে ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।—কিন্তু মুসলমান রাজত্বে যুদ্ধ বিগ্রহ বিপ্লব ও বিদ্রোহের প্রায়ই বড় একটা অভাব হইত না।

বাদসাহি সৈন্যগণের অধিকাংশই, হয় যুদ্ধ স্থলে নতুবা রাজাধানীতেই অবস্থান করিত, কথন কথন বা কিয়দংশ সুবাদারের অধীনে কোন কোন সুবায় রক্ষিত হইত। সুবাদারেরা একপ সৈন্যদল ব্যতীত আপনাপন এলাকার মধ্যে বাদসাহদিগের প্রণালী ক্রমে আরও বিভিন্ন সেনাদল নিযুক্ত করিতেন। এই সকল সেনারা প্রায় সুবার শান্তি রক্ষায় নিযুক্ত থাকিত। এই শান্তি রক্ষার নিমিত্ত সময় কালে আবশ্যক হইলে বাদসাহের অতিরিক্ত রাজ-সৈন্যও সাহায্যার্থে আসিত। তদ্ভিন্ন জমিদারদিগের নিকট হইতেও সৈন্য সাহায্য পাওয়া যাইত। আবার যখন সুবায় পূর্ণভাবে শান্তি স্থাপিত হইত, তখন প্রয়োজন অনুসারে বাদসাহের সাহায্যার্থেও সুবা হইতে বহুল সৈন্য প্রেরিত হইত।

এই সকল সৈন্যের সেনানায়ক প্রায় প্রত্যেক দলের দলপতি, জমিদারি সৈন্যের সেনানায়ক জমিদার স্বয়ং, অথবা তাহার কোন প্রতিনিধি। কিন্তু ইহাদের কাহারই উপর উচ্চ নায়কত্ব ভার ন্যস্ত হইত না। তদ্রূপ সেনানায়ক রাজসরকার হইতে সাক্ষ্যাৎ সম্বন্ধে নিযুক্ত হইত। অপরাপর সকলকে ইহাঁরই আদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইত। এই সকল সেনানায়কেরা অনেক সময়ে সৈনিক পুরুষের ন্যায় কেবল সেনাদিগকেই

রণস্থলে নীত করিতেন না, বিলাসোদ্দীপক আহার বিহার বেশভূষা ভোগ্যা স্ত্রী এবং নর্ত্তকীবৃন্দও ইহাদিগকে রণস্থল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিত।

সৈনিকেরা রাজসরকার হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন কদাচিৎ প্রাপ্ত হইত। নতুবা প্রত্যেক দলের কত হইলে ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ একটি হিসাব করিয়া তদ্রূপ লাভবান্ এক এক জায়গীর প্রত্যেক দল পতির প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইত। সময়ে সময়ে এইরূপ জায়গীর দানে বাদসাহ এত নিঃস্ব হইয়া যাইতেন, যে ছলে কৌশলে তাহা পুনঃ গ্রহণের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতেন। আলাউদ্দীন এতদর্থে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু যখন তাহাতে ব্যয় নির্ব্বাহের অনেক অনটন হইবে বলিয়া নজর আপত্তি হইল, তখন বাদসাহ জায়গীরও পুনঃগ্রহণ করিতে পারেন, অথচ সৈনিকদেরও ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, এতদ্ উভয় কার্য্য সাধনার্থে, যাহা ব্যবহার শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এতদ্রূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া বাজারের প্রত্যেক দ্রব্যের অতি ন্যূন মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। ব্যবসাদার দোকান বন্ধ করিল, দোকান পুনর্ব্বার খুলিবার নিমিত্ত তাহারা বারম্বার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল, অবশেষে দুর্ভিক্ষের তরঙ্গে দেশ আকুলিত হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব! ফলতঃ এরূপ চিত্র মুসলমান ইতিহাসের মধ্যে নিতান্ত বিরল নহে। বহুকাল পরে সেরসাহ জায়গীর দানে কুপ্রথা একবারে দূর করিবার নিমিত্ত, সমস্ত জায়গীর পুনর্ব্বার গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রত্যেক সৈনিকের প্রতি যথোপযুক্ত বেতন নির্দ্দিষ্ট করেন। সৈন্যগণের যখন শান্তি মধ্যে অবস্থান হইত, তখন ত আপনাপন আহার্য্যের বন্দোবস্ত [illegible] হলেও প্রায় [illegible] এই হইত। তদ্ব্যতীত রণ[illegible] ভাল সেনা-[illegible] একরূপ সে রূপ বন্দোব[illegible]রূপ হইতে [illegible] চেষ্টাই নায়ক হইলে [illegible] ধূলা দিয়া পাইত না। যথায় [illegible] এ কারসৈন্য গমনাগমন করিত, তথায় তত্রত্য জমিদার চৌধুরী বা মণ্ডলেরা রসদের সংস্থান করিয়া রাখিত। ইহা তাহাদের স্ব স্ব পদের সর্ত্ত অনুসারে বিনা মূল্যে যোগাইতে হইত। কিন্তু ব্যয়-বাহুল্য হইলে পরে কারণ দর্শাইয়া দেয় দ্রব্যের মূল্যও পাইতে পারিত।

মুসলমানদিগের রাজ্য বিভিন্ন সুবা বা গবর্ণরীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সুবা এক একজন সুবাদার বা গবর্ণরের দ্বারা শাসিত হইত। সুবাদারগণ রাজপারিষদের মধ্য হইতে বাদসাহের দ্বারা নিযুক্ত হইত, কিন্তু আবার সময়ে সময়ে সুবাদারী, নিয়োগের অপেক্ষা না করিয়া, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে চলিয়া আসিত। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সুবাদারীতে আপনা হইতে অভিষিক্ত হইয়া পরে

নজরানা প্রভৃতি দ্বারা সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া আপন পদে দৃঢ় হইতেন। সুবাদারদিগের হস্তে ক্ষমতা অপরিমিত থাকায় তাঁহারা সময়ে সময়ে এতই বিক্রমশালী হইতেন, যে বাদসাহকে তুচ্ছ করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন। বাঙ্গালার অনেকগুলি সুবাদার কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত এতদূর প্রবল হইয়াছিলেন যে বাদসাহের সমকক্ষ হইয়া, 'স্বাধীন' নাম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

সুবাদারেরা যখন সম্যক্‌ভাবে বাদসাহের শাস্তা স্বীকার পূর্ব্বক কার্য্য করিতেন, তখন তাঁহাদের ক্ষমতা নিম্নলিখিত মত ভাবে নির্ণীত হইত।—ওমরা অপেক্ষা ন্যূন যে কোন খেতাব প্রদান,—বাদসাহের মঞ্জুরের অপেক্ষায় কোন জায়গীর বা জমীদারী প্রদান,—কয়েকটী ব্যতীত, শান্তি ও সৈনিক এতদুভয় বিভাগীয় সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ,—শান্তি এবং সৈনিক বিভাগীয় যে কএকটী কর্ম্মচারী, যাহা কেবল বাদসাহের দ্বারা নিযুক্ত হয়, তাহাদের ক্রটির নিমিত্ত বাদসাহের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত কর্ম্ম হইতে স্থগিত রাখন,—দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ পূর্ব্বক জমির জমা দেওন,—দেওয়ান এবং অপরাপর কর-সংগ্রাহকদিগকে কর সংগ্রহে সাহায্য করণ,—ক্রটির জন্য বাদসাহের চূড়ান্ত আদেশ পর্য্যন্ত সেনানায়ক ওমরাদিগের জায়গীর পুনঃগ্রহণ,—কাজির বিচারের বিরুদ্ধে আপিল শ্রবণ,—যে সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আইন ও ব্যবহারের বহির্ভূত, তাহার মীমাংসা করণ, এতদ্রূপ ক্ষমতার পরিচালনে সক্ষম থাকিতেন। কিন্তু জমির স্বত্ব হইতে প্রজা ও রেয়তদিগকে বিদূরিত করণ, বাসস্থান পরিভ্রষ্ট করণ, এবং যে যে বিষয় পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে চ্যুত করণ সুবাদারের ক্ষমতার অতীত। যখন যখন সুবাদারেরা এই ক্ষমতার সীমার অন্তবর্ত্তি হইয়া কার্য্য করিতেন, তখন যে দেশ মধ্যে বহুপরিমাণে শান্তি এবং মঙ্গল বিরাজ করিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সুবার মধ্যে, সুবাদারের নিম্নেই প্রধান মর্য্যাদার পদ দেওয়ানের। ইনি স্বয়ং বাদসাহের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া, সুবাদারের পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়া কার্য্য করিতেন। কর-সংগ্রহ সম্বন্ধে যত কিছু কার্য্য, তাহা ইঁহার অধীন, এবং সমস্তই ইঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইবে। ইহার কার্য্য, করের হার নিরাকরণ ও করগ্রহণ প্রণালী নিরূপণ,—করসংক্রান্ত হিসাবপত্রের সমগ্র নিরাকরণ,—কএকটী ব্যতীত সমগ্র কর-সংগ্রাহক কর্ম্মচারীর নিয়োগ করণ। সুবাদার কোন অন্যায় ব্যয় করিলে, বা অযথা সৈন্য সংগ্রহ করিলে, তাহার ব্যয় সঙ্কুলানার্থে অস্বীকার হইয়া অর্থদান বন্ধ করিতে পারিতেন। ইহার কাছারীর নাম দপ্তর আলি। ইনি একাইক বাদসাহের প্রধান মন্ত্রীর সহ পত্রাপত্র চালাইতেন; এতদ্রূপ বন্দোবস্ত হেতু, দেওয়ান

সুবাদারের যথেচ্ছাচারের পক্ষে একরূপ প্রতি-বন্ধক স্বরূপ ছিলেন। অর্থের নিমিত্ত সুবাদারকে অনেক সময়ে আপন অভিপ্রায়কে খর্ব্ব করিতে হইত।

দেওয়ানের নিম্নে করসম্বন্ধীয় বিভাগে ক্রোরী অতি উচ্চ পদ। প্রত্যেক ক্রোরী আপন আপন চাকলায় কর সংগ্রহ সম্বন্ধে সর্ব্বোপরি কর্ত্তা। ইনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাদসাহের দ্বারা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু কার্য্য-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দেওয়ানের অধীন। দেওয়ানের নিকট ইহাঁকে নিকাশ দিতে হইত। ইনি প্রত্যেক পরগণার তহসিলদারের নিকট হইতে তাহাদের সংগৃহীত খাজানা সংগ্রহ করিয়া, ফোতাদার অর্থাৎ চাকলার প্রধান তহবিলদারের নিকট জমা করিয়া দিয়া তাহার রসিদ গ্রহণ পূর্ব্বক দেওয়ানের নিকট পাঠাইলে তবে নিস্কৃতি পাইতেন।

ক্রোরীর নিম্নে তহসিলদার। ইনি প্রত্যেক পরগণায় অবিকল ক্রোরীর ন্যায় কার্য্য করিতেন। ইহার সংগৃহীত কর ও হিসাব ক্রোরীর নিকট পাঠাইতে হইত।

ফোতাদারেরা প্রত্যেক চাকলার তহসিলদার। ইহারা ক্রোরীর নিকট হইতে খাজানা গ্রহণ পূর্ব্বক চাকলার ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা সুবার রাজধানীস্থ প্রধান তহবিলে জমা করিয়া নিষ্কৃতি পাইতেন।

মৎসুদ্দিরা স্ব স্ব স্থানীয় প্রধান কর্ম্মচারীর অধীনে থাকিয়া দপ্তরে যে সকল হিসাব পত্র আসিত, তাহার নিরাকরণ করিতেন।

ইহা ব্যতীত কাননগো নামে আর একশ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাঁরা চাকলা বা পরগণা, যেখানে যিনি অবস্থান করিতেন, তথাকার কর-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের তালিকা রাখিতেন। কোন চাকলা বা পরগণায় কত জমি আছে, কত আবাদী, কত গর আবাদী, কাহার জিম্মা; কে মণ্ডল বা চৌধুরী, করের হার কত, ইত্যাদী যে কোন বিষয়ের নিরাকরণ তাঁহার দপ্তরে হইত। এই দপ্তর হইতে যাবতীয় সংগ্রাহকেরা স্বীয় স্বীয় আবশ্যক অনুযায়ী তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেন।

উপরে যে সকল কর্ম্মচারীর বিষয় বিবৃত হইল, তাহারা উচ্চাধ ক্রমে ধারাবাহিক রূপে নিয়োজিত স্ব স্ব কর্ম্ম-বিভাগের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। ইহাদিগের ছাড়া করসংগ্রহ বিষয়ে আর এক প্রকার স্বতন্ত্র প্রকৃতির কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত, তাহাদিগের নাম কারকুন। কারকুনরা বরাবর বাদসাহের দ্বারা নিযুক্ত হইত। ইহারা দেওয়ানের নিম্ন হইতে কর-সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম্মচারীর কার্য্য গুপ্ত-চরের স্বরূপ গোপনে পর্য্যবেক্ষণ, এবং কোন বিষয়ে কাহার ত্রুটি কি শিথিলতা বা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে দেখিলে, তাহার প্রতিকারার্থে তত্ তৎ বিষয় উপর উপর কর্ম্মচারীর নিকট জ্ঞাপন করিতেন। প্রজা এবং করসংগ্রাহক দিগের মধ্যে

কোন বিষয়ের মত-বৈলক্ষণ্য হইলে ইনি তাহার মীমাংসা করিতেন, এবং প্রজাদিগের যথার্থ সত্ত্ব যাহাতে লোপ না পায় তৎপক্ষে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। তদ্ব্যতীত ইনি সকলের হিসাব পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক একটি সাধারণ হিসাব প্রস্তুত করিয়া তাহাব সত্যার্থ প্রমাণার্থে স্থানীয় কর্ম্মচারী ও চৌধুরী প্রভৃতির স্বাক্ষর সহ সম্রাজ্যের রাজধানীস্থ উজীরের নিকট প্রেরণ করিতেন। সুবাস্থ দেওয়ানি হইতে সমস্ত বিষয় নিষ্পত্তি হইয়া হিসাব প্রস্তুত ও প্রেরণে কিছু বিলম্ব হইত, এনিমিত্ত দেওয়ানিব হিসাব আসিবার পূর্ব্বেই বাদসাহকে করসংগ্রহ-বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত, উজিব কারকুনেব প্রেরিত হিসাব আপনার হিসাব বহিতে জমা করিয়া বাদসাহের সম্মুখে উপস্থিত কবিতেন। এইরূপে কবসংগ্রহ বিষয়ে দ্বিবিধ শাসন প্রচলিত ছিল।

অতঃপর কিরূপ প্রণালীতে কর সাব্যস্ত ও নিরাকৃত হইত, রেয়তদিগের সঙ্গে কিরূপ বন্দোবস্ত এবং কোন্ কোন্ সর্ত্তে জমীসকল বিলি করা হইত, তাহার বিশেষ প্রবোধনার্থে অগ্রে গ্রাম্য প্রথাব বিষয় আলোচনা করা যাউক। গ্রাম্য প্রথা হিন্দুদিগের সাময়িক। মনুতে উক্ত গ্রামপতি, পুরপতি, দশপতি প্রভৃতি গ্রাম্য শাসন কর্ত্তৃবর্গের নাম, তাহাদের কার্য্য যথাযথ উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বাপর হিন্দু-সময় হইতে মুসলমানদিগের ভারতে আগমনের দিন পর্য্যন্ত সেই প্রথা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। মুসলমানেরা রাজ্যাধিকার করিলেও, যদিও তাহাতে কিছু কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহা একরূপ পূর্ব্বমত সবল ভাবেই প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অতি উৎকৃষ্ট এবং মানবচিত্তেব উৎসাহবর্দ্ধক, ইহার ইদানীন্তন লোপ একরূপ খেদের বিষয় বলিতে হয়। বৃটীব্-রাজ্যস্থ গ্রাম্য মিউনিসিপাল শাসনেব সহ ইহার কতক সাদৃশ্য আছে।

ভাবতীয় পূর্ব্ব প্রদেশ ব্যতীত প্রায় আর সর্ব্বত্রই নগব ও গ্রাম সকল নানাবিধ উৎপাত হইতে আত্মবক্ষার্থে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। এখনও উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ নগর মাত্রই প্রায় প্রাচীব-বেষ্টিত দৃষ্ট হয়। পঞ্জাব প্রদেশে আজিপর্য্যন্ত সব গ্রামের সীমা নিরাপদে রক্ষাব ইচ্ছা এতই প্রবল, যে অনেক অর্থশূন্য গ্রামেব লোকেবা প্রাচীরের অভাবে অন্ততঃ কাঁটাব বেড়াদিয়াও গ্রামের সীমা আবদ্ধ করিয়া থাকে। যাহা হউক পুবাকালে এইরূপ সীমান্তবর্ত্তী একটি একটি গ্রাম আত্মসীমানায় সকলে মিলিয়া যথাসম্ভব সৌভ্রাত্র্য ভাবে জীবন-কার্য্য নির্ব্বাহ কবিত। এক একটি ক্ষুদ্র সাধাবণতন্ত্র স্বরূপ; প্রতিগ্রামে গ্রাম্যগণ সংমিলিত হইয়া করস্থাপন, করসংগ্রহণ, শান্তিরক্ষণ, সামান্য সামান্য বিবাদিত বিষয়ের নিরাকরণ ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিত। এক এক গ্রাম গ্রাম্যগণের নিকট এক একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী

স্বরূপ। গ্রামের যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রায় গ্রামের মধ্যেই পাওয়া যাইত, তদ্ভিন্ন পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতি কোন বিষয়েরই জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইতনা। ইহা বড় সুন্দর দৃশ্য।

গ্রামশাসন-প্রণালী বিশিষ্ট গ্রাম সমূহে যদৃচ্ছা যাহার তাহার মতলব অনুসারে হইতনা। আপনাপনি মধ্যে নিয়োজিত কর্ম্মচারী সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্য সমাধানার্থে নিযুক্ত থাকিত। শাসনকর্ত্তৃবর্গ এবং গ্রাম্যগণ, উভয়ের দ্বারাই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া যে কোন একব্যক্তি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বোপরি প্রধান নিযুক্ত হইতেন। ইহাকে সাধারণতঃ মকদ্দম বলে। বাঙ্গালায় এই প্রধানেরা মণ্ডল বলিয়া খ্যাত। দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য ভারতবর্ষে ইহাদিগকে পেটেল বলিত। গ্রামের মধ্যে যাবতীয় কর আদায় ও শান্তিরক্ষণ প্রভৃতির নিমিত্ত মকদ্দম রাজসরকারে দায়ী থাকিতেন, এবং সামান্য বিবাদিত বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন। মকদ্দমের নিম্নস্থ কর্ম্মচারীর নাম পাটোয়ারী। এই ব্যক্তি গ্রাম স্থআবাদী, গর আবাদি, জঙ্গল, খাদ প্রভৃতি সমস্ত ভূমির তালিকা রক্ষা এবং করসংগ্রহ সম্বন্ধে ও অপরাপর কার্য্য বিষয়ে মকদ্দমকে সাহায্য করিত। তন্নিম্নে গৌড়াইত, ইহাকে স্থানভেদে পেসবন, গোড়াইত, পাইক বা চৌকিদার বলিত। ইহারা গ্রামের সীমারক্ষণ, গ্রামের মধ্যে কে আসে যায় তাহার পর্য্যবেক্ষণ, রাত্রে চৌকিদারী ইত্যাদি কার্য্য সমাধা করিত। তৎপরে হরকরা, ইহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সংবাদাদি বহন এবং যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয় তাহার পাইক গিরি করণ, ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। মকদ্দম হইতে হরকরা পর্য্যন্ত সকলেরই স্ব স্ব কার্য্যের বেতন স্বরূপ কোথাও গ্রামমধ্যে জমি বিলি করা থাকিত, কোথায় বা তাহারা সংগৃহীত সরকারি খাজানার উপর কমিসনের দ্বারা পরিপোষিত হইত। পাটোয়ারীগণ ইচ্ছা হইলে উপযুক্ত মূল্যে আপন আপন জমি ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তি গ্রামাবর্গের সঙ্গতি ক্রমে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া স্বীয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইতে পারিত। কিন্তু মণ্ডল প্রভৃতি অপরাপর কেহ তাহা পারিত না। মণ্ডল স্বীয় কার্য্য হইতে অবসৃত হইলে, ঐ কার্য্যসংলগ্ন যে কিছু সম্পত্তি, তাহা যে ব্যক্তি তৎপদে নূতন মণ্ডল নিযুক্ত হইত, তাহাতে বর্ত্তিত। সময়ে সময়ে মণ্ডলের কার্য্য পুরুষ-পরম্পরায় একবংশেই চলিয়া আসিত। যেখানে এরূপ হইত, সেখানে নাবালকত্ব প্রভৃতি কোন কারণ বশতঃ যদি কোন সময় সে বংশ মণ্ডলী করিতে অপারগ হইত, সেখানে সেই বংশের পূর্ব্বাপর কার্য্যকারিতা স্মরণ পূর্ব্বক সম্পত্তি বিষয়ে একেবারে বঞ্চিত করা হইত না। উপযুক্ত কর নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সে সম্পত্তি সেই বংশে বাদসাহ বা সুবাদারের অনুগ্রহ কাল পর্য্যন্ত অর্পিত

হইত। বাদসাহ বা সুবাদার ইচ্ছা করিলেই উহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিতেন। গোড়াইত, হরকরা প্রভৃতি নিম্নতম গ্রাম্য চাকরবর্গ সম্বন্ধে এতদ্রূপ কোন অনুকূল নিয়ম ছিলনা। উহারাও প্রায় নির্দ্দিষ্ট ভূমির উপস্বত্ব হইতে প্রতিপালিত হইত সত্য, কিন্তু তাহাদের কর্ম্ম হইতে অবসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয় হইতে অবসর হইতে হইত। ইহারা গ্রাম্য লোকের সম্মতিক্রমে মণ্ডল দ্বারা নিযুক্ত হইত। সুতরাং ইহাদের কার্য্য একবংশে কদাচিৎ পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিতে পাইত।

সৈনিক কার্য্যের বেতন-স্বরূপ বা যে কোন কারণে. ব্যক্তি-বিশেষকে বাদসাহ সময়ে সময়ে কতকগুলি গ্রামসমষ্টি, কখন বা পরগণাকে পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিতেন। এই সময়ে যে সকল গ্রাম এই জায়গীরভুক্ত হইত, জায়গীর সকলের কর আদায়ের প্রণালী অনুসারে তাহাদিগের শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে কখন কখন কিছু কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়া যাইত।

জায়গীরের কর আদায় সম্বন্ধে দেখাযায় যে সময় ভেদে দ্বিবিধ নিয়ম অনুসৃত হইত। কখন বা জায়গীরদার স্বয়ং আপন কর্ম্মচারীবর্গ নিয়োগ পূর্ব্বক কর আদায় করিতেন; কখনবা দেওয়ানী দ্বারা আদায় হইয়া আদায়ের খরচ খরচা বাদ টাকাটি দেওয়ানিতে রসিদ দিয়া লইতেন। যে সময়ে শেষোক্ত নিয়মে জায়গীরদার আপন জায়গীরের উপস্বত্ব ভোগ করিতেন, সে সময়ে গ্রাম্যশাসনের মধ্যে কোন রূপান্তর ঘটিত না, কারণ এরূপ কর আদায়ের প্রণালীতে গ্রাম্যশাসনকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাদসাহের অধীনে থাকা অথবা জায়গীরভুক্ত হওয়া উভয়ই এক। কিন্তু যখন জায়গীরদার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপন কর্ম্মচারীর দ্বারা কর আদায় করিতেন, তখন অনেক অনর্থ ঘটিত। কর আদায় সম্বন্ধে বাদসাহের কর্ম্মচারিবর্গের শাসন জন্য যে সকল নিয়ম অনুসৃত হইত, জায়গীরদারের কর্ম্মচারির পক্ষে তাহা একরূপ না থাকায়, কর্ম্মচারীরা যৎপরোনাস্তি দৌরাত্ম্য ও প্রজাপীড়ন করিত, যেহেতু কোন প্রকারেই হউক প্রজার রক্ত শোষণ পূর্ব্বক ধন-সংগ্রহই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহারা কেবল আপন মনিবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে এরূপ করিত তাহা নহে. ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য আগে আপনার উদর পরিপূরণ, পরে প্রভুর কার্য্যাদর্শন। সুতরাং এই দ্বিবিধ কারণ হেতু প্রজারা ন্যায্য দেয় বিষয়ের চতুর্গুণ দিতে বাধ্য হইত। গ্রাম্য মণ্ডল ইহার জন্য যৎপরোনাস্তি প্রপীড়িত হইত, অবশেষে প্রজার গৃহে অগ্নি লাগিত এবং সর্ব্বস্ব হৃত হইত। প্রজারা এত দৌরাত্ম্য সময়ে সময়ে অসহ্য জ্ঞানে গ্রামকে গ্রাম শূন্য করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক জঙ্গলে আশ্রয় লইত। সময়ে সময়ে তাহাতে নিষ্কৃতি না পাইয়া বন্য জন্তুর ন্যায় অনুসৃত হইত বাদসাহের গুপ্তচর রূপে কারকুনেরা এই

সকল অত্যাচার সুবাদার'ও বাদসাহের কর্ণগোচর করিত। তখন জায়গীরদারের উপর কিছু কিছু পীড়াপীড়ি হইত বটে, কিন্তু রাজদরবার প্রায়ই এরূপ দূষিত ছিল যে জায়গীরদার সহজেই কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া নিষ্কৃতি পাইত; এবং পুনর্ব্বার আপন জায়গীরে আসিয়া, সেই ব্যয়িত অর্থ পূর্ব্বমত প্রণালী কিয়দংশ অনুসরণ পূর্ব্বক আদায়ের চেষ্টায় রত হইত। এরূপ অত্যাচারের ভাগ মোগল বংশের আমলে অনেক লাঘব হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তৎ-পূর্ব্ব-পূর্ব্ব শাসন কালে ইহা প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিত। পাঠানবংশীয় কোন কোন ভাল বাদসাহে এবং সুরবংশীয়েরা এই অত্যাচার জ্ঞাত হইয়া অনেক সময়ে অনেক জায়গীর আপন হস্তে পুনঃগ্রহণ করিয়া অত্যাচারের নিরাকরণ করিয়াছিলেন।

প্রতি গ্রামের সীমান্তবর্ত্তী যে সকল ভূসম্পত্তি, তাহা প্রায়ই সরকারে কর নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বক কোন কোন ব্যক্তির অধিকারে বরাবর রক্ষিত হইত, অবশিষ্ট যাহা থাকিত সরকারের খাসে থাকিত। ব্যক্তি-বিশেষের অধিকার যে সকল ভূমি, তাহা অধিকারী আপনিই অধিকারস্থ রেয়তবর্গকে বিলি করিতেন, এবং কর প্রদানের সময় উপস্থিত হইলে আপনার দেয় কর গ্রাম্য মণ্ডলের নিকট জমা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। যে সকল খাসের জমী, তাহা মণ্ডল স্বয়ং পাটোয়ারীর সাহায্যে বিলি করিতেন। যেখানে ভূম্যাধিকারীর হস্তেই সমস্ত ভূমি, খাসের ভাগ অতি সামান্য, সেখানে মণ্ডলেরা এবং অপরাপর গ্রাম্য কর্ম্মচারিরা প্রায় দস্তুরীর উপর আপনাপন নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন। গ্রাম্য মণ্ডল অনেক সময় গ্রামের প্রধান ভূম্যাধিকারীই হইতেন।

মনুর সময়ে যদ্রূপ পুরপতি, গ্রামপতিগণ গ্রামের শাসন কর্ত্তৃত্ব করিতেন, এবং দশপতি বা শতপতির নিকট আবশ্যক মত আপন কর্ম্মের নিকাস প্রদান করিতেন, এ সময়েও তাহার ছায়া অবলক্ষিত হইবে। এসময়ে শতপতির ন্যায় এক এক পরগণার মালিক চৌধুরীগণের নিকট মণ্ডল বর্গকে আপন আপন গ্রামের খাজানা দাখিল ও তাহার হিসাব প্রদান করিতে হইত, চৌধুরীরা বস্তুতঃ এক এক পরগণার তহসিলদার স্বরূপ ছিলেন, ইহারা ইহাদের অধীনস্থ সমস্ত গ্রামের খাজানা সংগ্রহ পূর্ব্বক নিকটস্থ নির্দ্দিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট দাখিল করিতেন। এই চৌধুরীবর্গ বেতন স্বরূপ কখন কখন নির্দ্দিষ্ট ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেন, নতুবা অধিকাংশ সময়েতেই সংগৃহীত করের উপর দস্তুরী প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা আত্ম ও পরিবার পোষণ করিতেন। প্রথমকালে প্রায় এক এক শত গ্রামে এক এক পরগণা নির্দ্দিষ্ট হইত, কালক্রমে সে নিয়ম সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই, গ্রামসংখ্যার একত্ব লোপ পাইয়া ছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরগণার চৌধুরীগিরির ছায়া ধরিয়াই বর্ত্তমানের জমিদার শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে। সে সময়েও এই চৌধুরীবর্গ

জমিদার বলিয়া আখ্যাত হইত। ইহাদের বিষয় যথাস্থানে সবিস্তারে বলা যাইবে।

ভারতীয় এই গ্রাম্যশাসন যদিও ফিউডার্ল সামরিক ইউরোপীয় নাগরিক শাসন-প্রণালী বা ইংলণ্ডীয় মিউনিসিপাল শাসন হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তথাপি নাগরিক বা মিউনিসিপাল শাসন অপেক্ষা ভারতীয়েরা গ্রাম্য শাসনের অধীনে নিতান্ত অল্প-সুখ ভোগ করে নাই। এতৎসম্বন্ধে একজন ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষ এরূপ লিখিয়াছেন—"ভারতীয় গ্রাম্য শাসন গুলি কার্য্যত যেন একটি একটি ক্ষুদ্র সাধারণ-তন্ত্র স্বরূপ পরিদৃশ্যমান হয়। ইহাদের আভ্যন্তরিক সমাজের নিমিত্ত যে কোন বিষয়ের আবশ্যক, গ্রাম মধ্যে সেই সকলই একরূপ সুলভ থাকায়, বহিঃ সম্পর্ক ইহাদিগকে বড় একটা রাখিতে হয় না। ফলতঃ অধিবাসীরা আপনাপন গ্রাম্য শাসনে ও তাহার সুখসৌকর্য্যে এতই সুখী এবং তৎপ্রতি এতই অনুরক্ত, যে বোধ হয় যে ইহাদের আর আর সকল সামাজিক বন্ধন যদিও কোনকালে ধ্বংস হইয়া যায়, তথাপি এ গ্রাম্য শাসন কখনও ধ্বংস হইবার নহে। ফলতঃ তাহাই অবলক্ষিত হয়। ইহার উপর দিয়া কত কত রাজবিপ্লব, কত কত সামাজিক বিপ্লব গত হইল, ক্রমান্বয়ে হিন্দু, পাঠান, মোগল, মহারাষ্ট্রীয়, শিখ প্রভৃতি কত কত রাজবংশ উন্নতি অবনতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইল, তথাপি আজি পর্য্যন্ত দেখ গ্রাম্য শাসন যেমন তেমনিই রহিয়াছে। যুদ্ধ বিগ্রহকালীন গ্রাম্যবর্গ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইয়া গ্রাম মধ্য দিয়া সৈন্য গতায়াতের আবশ্যক হইলে সৈন্য-মুখ হইতে সুরক্ষণের জন্য আপন আপন ধন ধান্য প্রাঙ্গন মধ্যে সাবধান করিয়া স্বচ্ছন্দ এবং নির্ব্বিবাদে সৈন্য গতায়াত পক্ষে প্রস্তুত হয়। যদি কখন অসম্বল বিপক্ষবর্গ দ্বারা তাড়িত এবং লুণ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পায়, তাহা হইলে আপনাপন মূল্যবান্ দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক নিকটস্থ কোন অনুকূল গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিপৎকাল অন্তে প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় অবস্থান করিয়া থাকে, এবং সুসময় পাইলেই সকলে স্বগ্রামে পুনরাগমন পূর্ব্বক আপন আপন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ জীবন নির্ব্বাহে নিরত হয়। যদি কখন এরূপ প্রতীক্ষায় পুরুষান্তরও গত হইয়া যায়, তথাপি পরবর্ত্তী পুরুষেরা সুযোগ পাইলেই প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পূর্ব্ব স্মৃতির অনুসরণ ক্রমে সেই পৈতৃক ভিটায় পুনর্ব্বার বাসস্থান নির্ম্মাণ, সেই পিতৃ-নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পুনর্ব্বার অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ গ্রাম্যমূর্ত্তি পুনর্জ্জীবিত করিয়া থাকে। শত শত বিপ্লব অতিক্রম করিয়াও যে ভারতীয়দিগের সামাজিক বন্ধন এরূপ অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছে, এবং বিবিধ প্রতিকূল ঘটনা সত্বেও যে ইহারা অপেক্ষাকৃত সুখ স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইয়া আসিয়াছে, সে পক্ষে আর আর সকল কারণ অপেক্ষা, গ্রাম্য শাসন ও সমাজের

প্রতি তাহাদের যে এই অনুরক্তি এবং তজ্জনিত তাহাদের মধ্যে যে ঐক্য তাহাই প্রধান কার্য্যকরী বলিয়া বোধ হয়।" ১৮৩২ শালে, মেটকাফ সাহেব যে গ্রামাশাসনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে কহিয়াছিলেন যে আর সকল প্রকার সামাজিক বন্ধন ধ্বংস হইলেও ইহা ধ্বংস হইবার নহে, সে গ্রাম্য সমাজ এখন কোথায়? যে কারণেই হউক তাহা এখন স্বচ্ছন্দ ভাবে বিলীন হইয়াছে। গ্রাম্যবর্গের এখন আর সে জীবনীশক্তি নাই, সমস্ত লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর সে সাহস নাই। যাহারা পূর্ব্বে অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বাদসাহের সৈন্যের বিপক্ষেও আত্মরক্ষার্থে দণ্ডায়মান হইত, এখন তাহারাই একজন সামান্য লাল পাকড়িওয়ালা পেয়াদা দেখিলে ভয়ে আকুলিত হইয়া গৃহের অন্ধতম কোণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে! যে সমাজিক শাসন দ্বারা আগে সমস্ত দুষ্ক্রিয়াই নিরাকৃত হইত, সেই সমাজে এখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জ্যেষ্ঠত্ব পদে অধিষ্ঠিত। যে স্থানে ভারতীয়েরা ঐক্য গুণে, নানা বিপ্লবেও, এতকাল হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, সে স্থলে এক্ষণে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। সমস্তই গত হইয়াছে, কিছুরই আর চিহ্নমাত্র নাই। কেন এমন হইল কে বলিতে পারে?

ভারতে মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ হইতে সূরবংশীয়দিগের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত

করাদান সম্বন্ধে কিরূপ প্রণালী অনুসৃত হইত, এক্ষণে তাহার পর্য্যালোচনা করা যাউক।

করাদান সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে গেলে অগ্রেই জমিদারবর্গের কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। জমিদার কাহারা, এই কথার আলোচনা করিতে গেলেই, এক্ষণকার চিরন্তন-সত্ব-ভোগী প্রজার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা যাঁহারা, তাঁহাদিগের প্রকৃতি মনোমধ্যে অগ্রে উদয় হয়। কিন্তু যে জমিদারদিগের কথা এখানে বলা যাইতেছে, তাহাদিগের প্রকৃতি বর্ত্তমান-কালীয় জমিদার হইতে স্বতন্ত্র। মুসলমান রাজত্বে প্রত্যেক সুবা বিভিন্ন চাকলা অর্থাৎ জেলায় বিভক্ত হইত, এবং চাকলা সকল আবার পরগণা নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে পুনর্ব্বিভক্ত হইত। প্রত্যেক পরগণায়, কখন কখন বা প্রত্যেক চাকলায়, যত গ্রাম থাকিত, প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডলের নিকট হইতে কর সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজসরকারে জমা দিবার নিমিত্ত, সেই সেই পরগণা বা সুবার উপর এক এক জন করিয়া গমস্তা নিযুক্ত হইত।

এই গমস্তা দিগকে কখন বা চৌধুরী, কখন বা জমিদার, বলিত। এই সকল চৌধুরী বা জমিদারেরা সংগৃহীত করের উপর দস্তুরী দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। চৌধুরীরা কেবল মাত্র এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন। বৎসরান্তে শেষ ফিরিস্ত সময় আপন দেয় সমস্ত কর দাখিল করিয়া আপনার জবাবদিহি হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন এবং কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইতেন। তৎপরে নূতন বন্দোবস্ত হইত। এই বন্দোবস্ত সময়ে, হয় কোন অপর মাতব্বর লোক, নতুবা পূর্ব্বসনের চৌধুরী পূর্ব্ব বৎসরে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করায়, চৌধুরী গিরিতে পুনর্নিযুক্ত হইত। যে ব্যক্তিই নিযুক্ত হউক, সর্ত্ত এক বৎসর মাত্র, তাহার অধিক নহে। এই কারণ, এক ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত হইলেও, সে কার্য্যে তাহার কোন সত্ত্ব বর্ত্তিতে পারিত না। পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত হওন পক্ষে কখন কখন এমনও দেখা গিয়াছে যে কোন কোন ব্যক্তি উৎকট দান অথবা অপরাপর উপায়ে ধারাবাহিক রূপে আজীবন একই স্থানে নিযুক্ত থাকিয়া, শেষে উত্তরাধিকারে পুত্রকে পর্য্যন্ত তৎপদ এবং অধিকার প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাহা হউক ইহা সত্ত্বেও তাহাতে তাহাদের কিছু মাত্র স্থায়ী স্বত্ব জন্মিতে পায় নাই।

চৌধুরী অর্থাৎ জমিদারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজ সরকার হইতে নিযুক্ত করিতেন। নিযুক্ত হওন কালে, চৌধুরী দিগকে নজরানা স্বরূপ অনেক টাকা দিতে হইত। এই নজরানা নির্দ্দিষ্ট অংশমত কর্ম্মচারি-বর্গের মধ্যে পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া, অবশিষ্ট অংশ রাজসরকারে জমা হইত। চৌধুরীরা এক বৎসরের সর্ত্তে যদিও নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু প্রজা পীড়ন বা অপরাপর কোন দোষ করিলে, বাদসাহী কর্ম্মচারিবর্গ বৎসর পুরিবার অগ্রেও তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারিতেন। চৌধুরীরা আপন আপন এলাকার মধ্যে সমস্ত মণ্ডল, অথবা মণ্ডলের অনধীনে যে সকল স্বাধীন প্রজা তাহাদিগের নিকট হইতে কর-সংগ্রহ পূর্ব্বক, নিকটস্থ তহসিলদারের নিকট জমা করিয়া দিতেন। আবশ্যক হইলে, একাইক ক্রোড়ির নিকটেও দাখিল করিতে পরিতেন।

করসংগ্রহ কার্য্যের আনুসঙ্গিক যে কিছু ক্ষমতা, তাহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ক্ষমতা প্রজার উপর চালাইতে জমিদার সক্ষম হইতেন না। বর্ত্তমান জমিদারবর্গের ন্যায়, প্রজার হর্ত্তা ভাবে প্রজার উপর উৎপীড়ন, বা তাহাদিগের উপর অযথা প্রভুত্ব গ্রহণ করিতে পাইতেন না, প্রজার প্রজাই সত্ত্বে হস্তক্ষেপ, বা কোনরূপে কোন ভূমির করের হার বৃদ্ধি করা, জমিদারের ক্ষমতার অতীত। সরকারি দপ্তরে যে ভূমি যাহার নামে, এবং তাহার উপর যেরূপ করের হার নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রজাদিগের নিকট হইতে সেই অনুসারেই করসংগ্রহ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন কর বলিয়া অপর এক কপর্দ্দকও সংগ্রহ করিবার যো ছিলনা। জমিদারের কার্য্যকলাপ

সম্বন্ধে, কর-সংগ্রাহক কর্ম্মচারীগণ, এবং গোপনে গোপনে কারকুন পর্য্যন্তও, তত্ত্বা নুসন্ধান করিতেন। সুতরাং জমিদার যে কোন বিষয়ে অত্যাচার আরম্ভ করিলে, সত্বরেই তাহার প্রতিকার হইবার কথা।

জমিদারীর জমি ব্যতীত অপরাপর অনেক শ্রেণীর জমি ছিল, তাহার মধ্যে জায়গীরই সর্ব্ব প্রধান। জায়গীরের স্বত্ব-ভোগীদিগের নাম জায়গীরদার। জায়গীর সম্বন্ধে পূর্ব্বেই যথাযথ কিঞ্চিৎ বলা গিয়াছে। উহা দ্বিবিধ ভাবে স্বয়ং বাদসাহের স্বাক্ষরিত সনন্দের দ্বারা প্রদত্ত হইত। প্রথমতঃ কোন কোন সেনানায়ককে স্ব-সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অনুরূপ লাভবান্ ভূখণ্ড, রাজসরকারে যত কাল কার্য্য করিবে, ততদিনের জন্য তাহাদিগকে নিষ্কর ভাবে প্রদত্ত হইত। কিন্তু জায়গীর দানকালে বাদসাহ এরূপ সর্ত্ত হাতে রাখিতেন, যে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেতন দান দ্বারা, বা যে কোন রাজা ইচ্ছার অনুসরণে হউক, সেই সকল জায়গীর পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় প্রকারের জায়গীর বাদসাহ যখন যাহার উপর তাহার বিশেষ কার্য্য বশতঃ সন্তুষ্ট হইতেন তখন তাহাকে প্রদান করিতেন। ইহাও বাদসাহ ইচ্ছা করিলে পুনঃগ্রহণ করিতে পারিতেন। যাহা হউক সেরূপ পুনঃগ্রহণ এশ্রেণির জায়গীর সম্বন্ধে সর্ব্বদা ঘটিত না। এরূপ জায়গীর প্রথমতঃ ব্যক্তি-বিশেষের জীবন কালের ভোগের নিমিত্ত প্রদত্ত হইত বটে; কিন্তু ফলে বাদসাহদের দয়ার গুণে এরূপ দাঁড়াইয়াছিল, যে একজনকে প্রদত্ত জায়গীর উত্তরাধিকার স্বরূপ তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে চলিয়া আসিত। সুতরাং ইহাতে জায়গীরদারের একরূপ চিরন্তন স্বত্ব বর্ত্তিয়া যাইত। কিন্তু যতই হউক, পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে যখনই জায়গীর বর্ত্তিত, তখনই একবার নজরানা দান দ্বারা জায়গীর ভোগের জন্য বাদসাহী সনন্দ না লইলে হইত না। জায়গীর সকলের দান বিক্রেয়ের অধিকার জায়গীর দার দিগের হস্তে দেওয়া হইত না। কিন্তু ভোগের নির্দ্দিষ্ট কালের অনতিরিক্ত সময়ের জন্য বন্দক দিতে পারিত। প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর জায়গীরের নিয়মানুসারে আর শ্রেণির জায়গীর স্থানীয় রাজাদিগকে প্রদত্ত হইত। ইহাঁরা তন্নিমিত্ত যুদ্ধ বিগ্রহ কালীন সৈন্য বা রসদের দ্বারা সরকারের সাহায্য করিতেন। এ শ্রেণীর জায়গীর পুরুষ-পরম্পরা উত্তরাধিকারে চলিয়া আসিত। কিন্তু প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকারে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে রাজসরকারে অত্যন্ত অধিক নজরানা দিতে হইত। কিন্তু এ শ্রেণীর জায়গীরদারদিগের বিশেষ ক্ষমতা এই যে, ইহাঁরা আপন জায়গীর মধ্যে কর আদায় সম্বন্ধে আপনাপন বন্দোবস্ত বাদসাহি-সম্মতির অনপেক্ষায় করিতে পাইতেন. এবং অনেকটা রাজকীয় ক্ষমতাও চালাইতে পারিতেন। জায়গীর মধ্যে আইন আদালত ইহাদের আপনার, এবং তথায় প্রজাবর্গের সামান্য সামান্য যাবতীয়

বিসম্বাদের নিরাকরণ হইত। অনেক অনেক গুরুতর বিষয়েরও ইহাঁরা মীমাংসা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের হুকুমের বিপক্ষে বাদসাহী সরকারে আপিল চলিতে পারিত।

পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ জায়গীরের করাদায় সম্বন্ধে, এবং জায়গীরের উপস্বত্ব জায়গীরদারকে প্রদানের জন্য দ্বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত। এক এই যে জায়গীরের কর পূর্ব্বমত বাদসাহী কর্ম্মচারিবর্গ দ্বারা আদায় হইত, জায়গীরদার তাহাদিগের নিকট কেবল রসিদ দিয়া, আপনার নির্দ্দিষ্ট-উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। দ্বিতীয় এই যে আপন সদ্ব্যবহারের পরিচয় দিতে পারিলে, সরকার হইতে তাহার প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ আপন বন্দোবস্তে কর আদায়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত। পরে অসৎ ব্যবহার করিলে, সে ক্ষমতা, সরকারের ইচ্ছা অনুসারে পুনর্ব্বার লোপ হইতে পারিত। সাময়িক নির্দ্দিষ্ট আয় অনুসারে জায়গীর সকল প্রথমে প্রদত্ত হইত বটে, কিন্তু পরে কোন কারণে যদি তাহার বৃদ্ধি হইত তবে তাহার ফলভাগী জায়গীরদার হইতেন না, তাহা সরকারে দাখিল হইত, যে সকল জায়গীরের কর সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা আদায় হইত, সেখানে এবৃদ্ধি নিরূপিত হইতে কোন কষ্টই হইত না। কিন্তু যে সকল জায়গীরদার আপন বন্দোবস্তে কর আদায় করিতেন, তাহাদিগের বৃদ্ধি আর প্রথমোক্তদিগের ন্যায় রাজসরকারে সহজে পরিজ্ঞাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্তে বাদসাহের কর্ম্মচারী দ্বারা সেই সকল জায়গীরের আয় পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইত। যে অংশটুকু বৃদ্ধি বলিয়া সাব্যস্ত হইত, তাহার আদায়ের জন্য খরচ খরচা বাদে, অবশিষ্ট অংশ জায়গীরদারের উপর রাজসরকারে দেয় করের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপে যতবার চর্চ্চিত হইত, ততবারই বৃদ্ধি হইলে, তদ্রূপ নিয়ম অনুসারে জায়গীরদারের উপর করের ভার বৃদ্ধি হইত। রাজসরকারের দান প্রতিগ্রহ হেতু জায়গীর সকল যতই হস্ত হইতে হস্তান্তরে যাউক না কেন, তাহাতে গ্রাম্য প্রথা বা ভূসম্পত্তি, প্রজাই স্বত্ব প্রভৃতির পক্ষে রাজ-নিয়ম অনুসারে কোন রূপান্তর ঘটিতে পাইত না। কিন্তু কার্য্যতঃ যে তাহা সকল সময়ে ঘটিয়া উঠিত না, এবং প্রজারা যে সময়ে সময়ে তজ্জন্য অনেক উৎপীড়িত হইত, তাহা পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে।

জায়গীর হইতে স্বতন্ত্র আর এক শ্রেণীর ভূসম্পত্তি ছিল। উহা হয় ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান পক্ষে, নতুবা কোন বিশেষ গুণশালী ব্যক্তিকে তাহার গুণের পুরস্কার স্বরূপে, চিরন্তন স্বত্ব সহ নিষ্কর রূপে প্রদত্ত হইত, বিদ্যালয় ও সরাই সমস্তও এইরূপ নিয়মে পালিত হইত। এই নিষ্কর ভূসম্পত্তির উপর তাহাদের স্বত্বভোগীরা অদ্বিতীয়। ইহারা কেবল ভূমির কর নহে, যে কোন প্রকারের রাজকর হউক, সকল বিষয় হইতে

অব্যাহতি পাইত এবং আপন জমির আয় কম হউক বা বৃদ্ধি হউক তজ্জন্য কখন কাহার কাছে হিসাব দিতে হইত না। ভারত-সিংহাসনে সময়ে২ অর্থলোলুপ পাপাচার বাদসাহ অনেক হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ সৎ-কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপে যে সকল ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা পুনঃ গ্রহণ করিতে প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না। সৎ অসৎ সকল বাদসাহই যত্ন পূর্ব্বক এরূপ ঘৃণিত কার্য্য পরিহার করিতে চেষ্টা করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকারের ভূসম্পত্তি ব্যতীত, রাজসরকারে যে সকল কর্ম্মচারী থাকিত, তাহাদের অনেককেই নগদ বেতন না দিয়া তাহাদের পরিপোষণার্থে বিশেষ বিশেষ ভূসম্পত্তি নিষ্কর ভাবে প্রদত্ত হইত। এ সকল ভূসম্পত্তি বাদসাহ ইচ্ছা করিলেই পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিতেন, এবং তদ্রূপ পুনঃ গ্রহণের ঘটনাও নিতান্ত বিরল নহে। ব্যক্তি বিশেষ সরকারী কর্ম্মে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইলে, তাহার প্রাপ্ত ভূসম্পত্তি চিরন্তন স্বত্ব সহ পুরুষ-পরম্পরা ভোগ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু এ শ্রেণীর ভূসম্পত্তির অধিকারী যেমনই হউন, তিনি কেবল ভূমির কর হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন এই মাত্র, নতুবা তাঁহাকে আর আর সকল প্রকার রাজকরই বহন করিতে হইত।

উপরে যত প্রকার ভূসম্পত্তির বিষয় কথিত হইল, সেই সকল ব্যতীত, অপরাপর সকল ভূসম্পত্তি খণ্ড খণ্ড ভাবে নির্দ্দিষ্ট হারে প্রজাবিলি করা হইত। এই করের হার চিরন্তন ভাবে একই রূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিত না, যখন জমি যেরূপ লাভবান্ হইত সেই অনুসারে কর বৃদ্ধি কি কম হইত। যখন যখন এরূপ করের ন্যূনাতিরেক করণ আবশ্যক হইত, গ্রামস্থ মণ্ডলের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক স্থানীয় তহসিলদারেরা তাহা সম্পাদন করিতেন। তহসিলদারের দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট হার নিরূপণ কোন প্রজার মনঃপুত না হইলে, পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত তহসিলদারের উপরিস্থ কর্ম্মচারিদিগের নিকট উপস্থিত হইতে প্রজার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। যাহা হউক করের এই অস্থায়িত্ব ব্যতীত, ভূসম্পত্তির উপর স্বামিত্ব সম্বন্ধে প্রজাকে বড় একটা গোলযোগ করিতে হইত না। এইরূপ সম্পত্তির দখল সম্বন্ধে তাহারা চিরন্তন স্বত্ব প্রাপ্ত হইত, এবং সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে পুরুষ-পরম্পরায় উত্তরাধিকারে চলিয়া আসিত। শাসন-কর্ত্তৃগণ ইহাদের এই স্বত্ব এতদূর মান্য করিতেন যে, ক্রমান্বয়ে খাজনা দাখিল করিতে অপারগ বা অন্যান্য যে কোন উপযুক্ত কারণে যদি কোন ব্যক্তি একবার সত্ব হারাইত, তাহা হইলে সেই স্বত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে সময় দেওয়া যাইত। ইহার মধ্যে তাহার যে কোন উত্তর পুরুষ আপন বংশে বিষয়টির পুনরুদ্ধার করিতে

পারিত। এরূপ-ভূসম্পত্তি-ভোগী প্রজারা আপন ভূসম্পত্তি স্বচ্ছন্দে বন্ধক দেওয়া বা বিক্রয় করিতে পারিত, তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না।

উপরি-উক্ত স্বত্ববান্ প্রজাদিগের নিকট হইতে প্রধানতঃ দ্বিবিধ প্রকার রেয়তেরা জমি গ্রহণ করিত। প্রথম খোদকস্ত, দ্বিতীয় পাইকস্ত। পাইকস্ত রেয়তেরা ওঠবন্দি হিসাবে একবৎসরের জন্য জমি গ্রহণ করিয়া চাস করিত, এ নিমিত্ত কোন জমির উপর তাহাদের স্বত্ব জন্মিতে পাইত না। কিন্তু খোদকস্ত রেয়তেরা সেরূপ ছিল না, ইহারা চিরস্থায়ী পাটা লইয়া জমি করিত এবং তাহাতে তাহারা দখলি স্বত্ব পাইয়া পুরুষান্তরে উত্তরাধিকারে অর্পণ করিতে পারিত। কিন্তু ইহাদের দান বিক্রয় বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না।

* * *

প্রত্যেক জমি চর্চ্চিত হইয়া, সরকারি দপ্তরে তাহার যেরূপ করের হার নির্দ্দিষ্ট হইত, মণ্ডল এবং জমিদারকে অবিকল সেই টাকাটি আদায় করিতে হইত। তদতিরিক্ত আদায় করিলে বিশেষ শাস্তি পাইতেন। সরকার হইতে প্রজাদিগের উপর আর এক প্রকারের কর আদায় করিবার অনুমতি ছিল। প্রজারা যখন অত্যন্ত স্বচ্ছলতা-যুক্ত হইত, সেই সময়ে মণ্ডল এবং জমিদারগণ যে যেরূপ কর দিতে সক্ষম, সেইরূপ হারে সকলের নিকট চাঁদা স্বরূপ এক প্রকার কর সংগ্রহ করিতেন। এই সংগৃহীত কর রাজসরকারে যাইত না। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি কল্পে, কূপ খনন, বা বাঁধ দেওন, ইত্যাদি কার্য্যে তাহা ব্যয়িত করিতে হইত। যদি এরূপ ব্যয়ে জমিদারের পক্ষে কোন তঞ্চকতা প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে তাহাকে আর কখন জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত না। এবং এপক্ষে যদি অপরাধ কিছু গুরুতর হইত, তাহা হইলে এমন কি, বৎসর না পুরিতে পুরিতেই, তাহার হাত হইতে জমিদারী পদ কাড়িয়া লওয়া হইত। মুসলমানেরা যখন ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন সাধারণতঃ প্রজাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ কর প্রদান করিতে হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে, কখন কখন সেই করভার এত বৃদ্ধি হইত, যে প্রজাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধাংশও কর দিতে হইয়াছে।

এক্ষণে আইন আদালত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাউক। মহম্মদীয় কোরাণে যেরূপ নীতিশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, পুরাকালে মুসলমান জাতির পক্ষে তাহাই চূড়ান্ত আইন বলিয়া পরিগণিত ছিল, এবং মুসলমানদিগের আইন-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য তদনুসারে সম্পন্ন হইত। কালে যখন ইহাঁরা দিগ্বিজয়ের অনুসরণ ক্রমে বিভিন্ন জাতি-সমূহকে পরাজয় করিয়া আপন রাজত্বাধীন করেন, তখন দেখিলেন যে, বিভিন্ন জাতীয় জীবনের বিভিন্ন গতি হেতু, কোরাণের নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিতে পারে না, এবং খাটাইতে গেলেও বিষম

বিশৃঙ্খলতা ও বিপ্লব ঘটিয়া উঠে। এই নিমিত্ত কালে ইহাদের নিকট দ্বিবিধ আইনের উৎপত্তি হয়, এক মুসলমানদিগের বিবাদ মীমাংসার নিমিত্ত কোরাণের লিখিত আইনের অনুসরণে একরূপ আইন, অপর জাতি সাধারণের শাসনের নিমিত্ত তদুপযুক্ত অপরবিধ আইন। এই দ্বিতীয় প্রকৃতির আইনই ভারতবর্ষে প্রধান কার্য্যকরী হয়, এবং প্রজাপুঞ্জ ইহারই প্রভাবে যাহা কিছু সাংসারিক শুভাশুভ লাভ করিত। আইন যে নিতান্ত মন্দ ছিল, এমন নহে। জনৈক ইউরোপীয় ইতিহাস-বেত্তা মুসলমানদিগের আইনের সঙ্গে রোমীয় এবং নরমানদিগের আইনের সহিত তুলনা করিয়া কহেন যে "মুসলমানেরা ভারতবর্ষ অধিকার কালে যে আইন লইয়া তথায় প্রবেশ করে, তাহার প্রতি যাহারা কেবল রোমীয় বা নরমান-জাতীয় আইন প্রসঙ্গ মাত্র অভ্যাস করিয়া কটাক্ষ করিয়া থাকে, গুণ ভাগ সম্বন্ধে সেই আইন, সেই সকল ব্যক্তির প্রকৃতির ন্যায়, ততদূর হীনতা-যুক্ত ছিল না।" ফলতঃ এ আইন প্রজার পক্ষে বহু-মঙ্গল-কর ছিল, এবং ইহার নিকট জিত বা জেতা এ প্রভেদ ছিল না। সকলের পক্ষে একইবিধ আইন, এবং বিচারাসনে যিনিই থাকুন না কেন, জেতা বা জিতের উপর সমান ভাবে বিচার করিতে পাইতেন। সে যাহা হউক, একটি দোষ বিশেষ এই ছিল যে, আইন যতই ভাল হউক, তাহা লইয়া কার্য্য করিবার জন্য সাধারণতঃ তেমন বিজ্ঞ লোক মিলিত না। মুসলমানদিগের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা তেমন ভাল না থাকাতে, নৈতিক উন্নতি এবং বিচার-শক্তি তাহাদের ততদূর প্রগাঢ় হইত না। সুতরাং অনেকে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অসৎপথগামী হওয়ায়, বিচার নিরপেক্ষ হওন পক্ষে বহুল ব্যাঘাত ঘটিত। হিন্দুরাও এরূপ বিচারক পদে মুসলমানদিগের সহিত সমকক্ষ ভাবে নিযুক্ত হইতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদেরও জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে এই সময়টি দুরন্ত তমসাচ্ছন্ন রাত্রি। সুতরাং যে দোষে মুসলমানেরা দোষী, ইহারাও তাহাই। যাহা হউক, এই অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কার্য্যকলাপ পরিত্যাগ করিয়া যদি আইনের এবং তৎপ্রকটন-প্রণালীর মূলদেশস্থ অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে জেতা ও জিত সম্বন্ধে মুসলমান রাজারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। ফলতঃ এই নিরপেক্ষতার পরিচয় শাসনকর্ত্তৃবর্গ সময়ে সময়ে আত্ম দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। ইহারা দেশস্থ প্রজাদিগের প্রতি সরল ব্যবহার দেখাইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। ইহাঁরা রাজপুত রাজাদিগের সহিত সর্ব্বদা সখ্য-ভাবে ব্যবহার করিতেন, এবং অধীনতা-শৃঙ্খল অনুভূত হইয়া যাহাতে তাহাদের মনে ক্লেশদায়ক না হইতে পারে, তৎপক্ষে যত্নবান্ থাকিতেন।

মুসলমান রাজত্বে বিচার-কার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ আদালত বাদসাহ বা স্থানীয় সুবা স্বয়ং। ইহাঁদের নিম্নে প্রধান স্থানীয় কর্ম্মচারিবর্গ বিচার কার্য্য সংসাধন করিতেন। আইন-সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত হইলে স্থানীয় কাজির নিকট তাহা মীমাংসা করিয়া লইতে হইত। এতদ্ভিন্ন চৌধুরী মণ্ডল প্রভৃতি গ্রাম্য কর্ম্মচারিবর্গ শান্তিরক্ষকের সমস্ত কার্য্য এবং সামান্য সামান্য বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিতেন। তৎপরে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ, এখানে সরকারের সঙ্গে সংস্রবশূন্য যাবতীয় সামান্য সামান্য বিবাদিত বিষয় প্রায় মীমাংসা হইয়া যাইত। চৌধুরী, মণ্ডল, গ্রাম্য কর্ম্মচারিবর্গ বা পঞ্চায়েতের দ্বারা যে সকল বিচার-কার্য্য হইত, তাহাতে বাদী প্রতিবাদী কোন পক্ষ অসন্তুষ্ট হইলে কাজির নিকট আপিল করিতে পাইত। গুটিকত গুরুতর বিচার্য্য বিষয় ব্যতীত, যে কোন প্রকারে হউক, কাজি অন্যান্য সকল বিচার কার্য্যেই কোন না কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। ফলতঃ বিচার-কার্য্য সম্বন্ধে কাজি একজন উচ্চ ও অতি প্রধান গণনীয় বিচারক ছিলেন। অতএব কাজির ক্ষমতা কিরূপ ছিল, তাহা বলিলেই, অপরাপর বিচারকের ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রায় প্রত্যেক চাকলা এবং প্রত্যেক বহু-জনাকীর্ণ নগর সমূহে এক এক জন করিয়া কাজি নিযুক্ত থাকিতেন। ইহাঁরা একরূপ সাধারণের সুনীতি বিষয়ে পরিরক্ষক স্বরূপ ছিলেন, এবং লোকে যাহাতে কুপথগামী হইয়া সমাজ ও সরকারের শান্তি ভঙ্গ করিতে না পায়, তৎপক্ষে তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ইনি অধিকাংশই কোরাণের আইন অনুসারে বিবাদিত বিষয়, তৎপরে দেওয়ানী মকর্দ্দমা, এবং আবশ্যক মতে গুরুতর ফৌজদারী মকর্দ্দমা সমস্তও করিতেন। ইনি নিম্নস্থ সমস্ত আদালতের বিচারের বিপক্ষে আপিল শুনিতে পারিতেন। এবং যে পদের বা যে অবস্থার লোক হউক, আবশ্যক হইলে সকলকেই আদালতে সমন দিয়া হাজির করাইতে পারিতেন। ইনি প্রাণদণ্ড শাস্তি পর্য্যন্তের হুকুম [illegible] পারিতেন, কিন্তু তদ্রূপ প্রাণদণ্ড হইবার পূর্ব্বে তাঁহার হুকুম স্থানীয় সুবার দ্বারা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক হইত। কাজিরা সরাসরি ভাবেই প্রায় সমস্ত বিচার-কার্য্য নিষ্পাদন করিতেন।

মুসলমানদিগের আমলে ফৌজদারী প্রভৃতি মকর্দ্দমার নিমিত্ত বাদী প্রতিবাদী কোন পক্ষকেই কোন ফি দিতে হইত না। কেবল দেওয়ানী মকর্দ্দমায় দিতে হইত। কিন্তু ফি, অত্যন্ত অধিক, তাহার উদ্দেশ্য এই যে ফি এরূপ উচ্চ হইলে জাল ও ফেরেবি মকর্দ্দমা বহুলাংশে নিবারিত হইবে। দেওয়ানিতে বিবাদিত বিষয়ের দাওয়ার যত টাকা, তাহার এক-চতুর্থাংশ ফি স্বরূপ কাজিকে দিতে হইত।

বিচারকেরা উৎকোচ গ্রহণ করেন কি না, এবং ইচ্ছা-পূর্ব্বক বিচার-কার্য্যে কোন হেলা করেন কি না, ইত্যাদি ত্রুটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর সকল নিযুক্ত থাকিত। তাহারা যেরূপ দেখিত, স্থানীয় সুবার নিকট তাহা জ্ঞাপন করিত, এবং সুবা তদনুসারে যথাবিহিত কার্য্য করিতেন। সের সাহের পূর্ব্বগামী বিচারকেরা অপরাপর আদালতের নিষ্পাদিত বিষয়ের নজিরের অপেক্ষা রাখিতেন না, যদৃচ্ছা আত্ম-বুদ্ধিতে কার্য্য করিতেন। কিন্তু সের সাহের সময় হইতে যে কোন বিষয় যে কোন স্থানে বহুযত্নে ও পরিশ্রমে মীমাংসিত হইত, নজির স্বরূপ তাহা অপরাপর সমস্ত বিচারককে সরক্যুলরের দ্বারা জ্ঞাত করা হইত।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন পড়ি?

আমার স্মরণ হয়, কোন লেখক এক স্থলে (?) লিখিয়া বলিয়াছেন, যে ইংরাজগণ যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তখন তাঁহাদিগের চিহ্নস্বরূপ ভারতে আর কিছুই থাকিবে না, কেবল রাশি রাশি বোতল ভারতের সর্ব্বত্র পড়িয়া থাকিবে। এই বোতল ব্যতীত ইংরাজগণ কি ভারতে আর কিছুই আনেন নাই? ইংরাজগণ ভারত হইতে রাশি রাশি ধনসম্পত্তি পাইয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহারা ভারতকে যে একটি মহার্ঘ রত্ন প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমুদায় ভারতবর্ষের রত্নের সহিত তুল্য-মূল্য হয় না। সে রত্ন পাশ্চাত্য বিদ্যা পাশ্চাত্য ভাব এবং পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব। এই বিদ্যাদানে তাঁহারা সমুদায় মৃতপ্রায় ভারতবর্ষকে নবজীবনে জীবিত করিয়াছেন। কতকাল ধরিয়া, কত যুগ ধরিয়া, ভারতবর্ষ সুষুপ্ত ও মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। মুসলমানদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ভারতকে জাগরিত করিতে পারে নাই। কারণ সে বিদ্যা বুদ্ধি আমাদিগের প্রাচ্য ভাবে পরিপূর্ণ। তাহাতে এমত কিছুই নাই যাহাতে অচেতনকে চেতন করিতে পারে। তাহাতে এমত কিছুই ছিলনা যাহা ভারতবাসিগণ নূতন বলিয়া শিখিতে পারেন। পরীর গল্প, সামান্য২ নীতিপূর্ণ সুন্দর২ উপন্যাস ভিন্ন মুসলমানগণের বিদ্যায় আর কিছুই ছিলনা। বিলাসী ভারত মুসলমানগণের সঙ্গীত বিদ্যায় অধিকতর বিলাসী হইয়াছে।* মুসলমানগণের বিদ্যা ও বুদ্ধিতে এমত কিছুই ছিলনা যাহাতে তাহারা সকল

* ভারতবাসী হিন্দুরা সঙ্গীতশাস্ত্রে মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, মুসলমানদিগের নিকট শিক্ষা করেন নাই। স।

বিষয় তলিয়া বুঝিতে পারে। পাশ্চাত্য বিদ্যায় সেই ভাব আছে। তাহাতে আত্মচিন্তা আছে, সকলদিক্ বুঝিয়া বিবেচনা আছে, পরের অবস্থার সহিত আপনার অবস্থার তুলনা করিবার শক্তি আছে। তুলনা ও আত্মচিন্তা করিয়া, উচিতমত ব্যবস্থা এবং নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার শক্তি আছে। এ বিদ্যার যে আন্তরিক বল আছে, তাহা প্রাচ্য প্রভাব অতিক্রম করিতে বিলক্ষণ সমর্থ; ববং সেই বল ভারতে এক নূতন শক্তি প্রদান করিয়াছে। ভারত তৎপ্রভাবে নীয়মান হইতেছে। বিলাসী ভারত ইংরাজগণকে ভারতীয় করিতে পারেন নাই, ববং নিজেই ইংরাজী হইয়া যাইতেছেন।

এই বিদ্যা শিক্ষায় আমরাও আত্মচিন্তা শিক্ষা করিতেছি। আমাদিগের এক্ষণকার অবস্থা কি, ভাবিয়া দেখিতেছি কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। কি কি প্রভাবে আমরা অধঃপাতে গিয়াছি, দুর্ব্বল হইয়াছি বুঝিতে পারিতেছি। দেখিতেছি, আমাদিগের দুর্ব্বলতা এত অধিক যে তাহা বিমোচন করিবার আমাদিগের সামর্থ্য নাই। সামাজিক হীনতার এত নীচ গর্ত্তে পড়িয়া রহিয়াছি, যে উচ্চদিকে চাহিতেও ভয় হয়, নিরাশ হইতে হয়। এখন সন্তাপ হয়, কেন এ আত্মদৃষ্টি জন্মিয়াছিল। আবার আহ্লাদ হয়, আমাদিগের এই আত্মদৃষ্টি জন্মিতেছে। আহ্লাদ হয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাদিগের দুর্ব্বলতা, ও নির্ব্বীর্য্যতা ভাবিয়া নিতান্ত নিরুদ্যম এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি। ভাবি পড়িয়াছিত, বিলক্ষণ পড়িয়াছি, উঠিব কি প্রকারে? উঠিবার ইচ্ছা মাত্র হয়, একবার এদিক্ ও দিক্ চাহিয়া দেখি, চাহিয়া একবার শিরোত্তলন করিতে যাই, আবার কোথা হইতে কোন্ প্রভাব আসিয়া নিস্তেজ ও দুর্ব্বল শিরোদেশকে বসাইয়া দেয়। পুনরায়, সেই অধস্তলেই মুহ্যমান হইয়া পড়ি। এইরূপ শোচনীয় আমাদিগের অবস্থা! শোচনীয় আমাদিগের দুর্ব্বলতা! শোচনীয় আমাদিগের অধঃপতন!

এই অধঃপতন হইতে কি নিস্তার নাই? তবে আমাদিগের এ অবস্থা জন্মিবার ফল কি? পাশ্চাত্য বিদ্যা ও ভাবের প্রভাব ত এরূপ নয়? তাহা সমুদায় শরীরকে উৎসাহিত করে, শিরে শিরে উৎসাহ-শক্তি প্রদান করে, নব বলে সমুদয় স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। বারম্বার কি চেষ্টা করিতে বলে, সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলে, কি কি কারণে বিফল হইতেছি তাহা অনুসন্ধান করিতে বলে, এবং অনুসন্ধান করিয়া সমুদায় প্রতিবন্ধকতার প্রতিবিধান করিতে বলে। চিন্তাতে উৎসাহ দেয়, কার্য্যে উৎসাহ দেয়, এবং নিরুৎসাহিতাকেও একদা উৎসাহিত করিয়া তুলে। এই প্রভাব ভারতবাসিগণের অন্তরে যতকাল অবস্থান করিবে, নিরাশ হইবার ততকাল কোন কারণ নাই। আমাদিগের অধঃপতন নিতান্ত গভীর,

শক্তি নিতান্ত অল্প, সুতরাং সকল চেষ্টাই বিফল হয়। হয় ত কি কি কারণে আমরা বিফল হইতেছি তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। নির্ণীত হয় নাই বলিয়া তৎ-প্রতিকারোপযোগী উপায়ও অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে। অতএব আমাদিগের এই হীনাবস্থার উন্নতি সাধন করিতে উদ্যত হইবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখা উ-চিত, কি কি কারণে আমরা বারম্বার বিফল হইতেছি। কেন আমাদিগের সকল চেষ্টা ও যত্ন শিথিল হইয়া যাইতেছে?

আমাদিগের দাসত্ব কি এক প্রকার? আমরা কি শুদ্ধ রাজনৈতিক দাসত্বের অধীন? সত্য বটে এ দাসত্ব উন্মোচনের এক্ষণে উপায় নাই; বরং ইহার বশীভূত হইয়া থাকা আপাততঃ কল্যাণ-কর। কিন্তু যে সমস্ত দাসত্ব উন্মোচন করিবার উপায় আছে, [illegible] দিগেরই হস্তে সমর্পিত আছে, সে সমু-দয় দাসত্ব উন্মোচন করিতে আমরা উদ্যত হই না কেন? কেন [illegible] সামাজিক ও পারিবারিক দাসত্বের চিরকাল অধীন থাকি? এই অধীনতায় কি আমাদিগের কার্য্যশক্তি পরিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই? আমরা দেখিতেছি আমাদিগের অনেক প্রচলিত আচার ব্যবহার দূষিত, আত্ম-স্বাধীনতার অন্তরায়, প্রকৃত মঙ্গলের ঘোর প্রতিবন্ধক সে সকল আচার ব্যব-হারের দাসত্বে কেন আমরা চিরদিন বশী-ভূত হইয়া রহিয়াছি? তাহার কারণ এই, এই অধীনতায় থাকিয়া আমাদিগের প্রকৃতিও এতদূর মৃদু ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, যে সেই অধীনতার প্রভাব অতিক্রম করা, আর আমাদিগের আয়-ত্তির মধ্যে নাই।

আমরা সেই গোপনীয় প্রভাবে অজ্ঞা-তসারে এরূপ বশীভূত হইয়া আছি, যে সে প্রভাব অনুভব ও বুঝিবার আমাদি-গের শক্তি নাই। মনে করিতেছি, অন্য কারণে নিষ্ফল হইতেছি। মনে করি-তেছি, হয়ত উপযুক্ত ধন নাই, মান নাই, ক্ষমতা নাই, বুদ্ধি নাই, সেই জন্য দাঁড়া-ইতে পারি না। কিন্তু যে অধীনতা-শৃঙ্খল আমাদিগের হস্ত পদ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই, সেই অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে না পারিলে যে আমাদিগের তিলার্দ্ধ উন্নতি সাধন হইবে না তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। ইহা রাজনৈতিক অধীনতা নহে, ইহা পারি-বারিক ও সমাজের আচার ব্যবহারের অধীনতা। ইহাদিগের প্রভাব অল্প লোকেই বুঝিতে পারে, কারণ ইহাদিগের প্রভাব অদৃশ্যভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদিগের দূষিত আচার ব্যবহারের অন্যান্য অনিষ্ট অতি সামান্য, কিন্তু এই সমস্ত আচার ব্যবহার আমাদিগের প্রকৃ-তিকে যেরূপ নিস্তেজ, দুর্ব্বল ও জড়-ভাবাপন্ন করিরা রাখিয়াছে, ততদূর অধীনতার প্রভাবই মহা অনিষ্টকর। আমরা জানিনা, আমরা সেই প্রভাবে কত

দূর দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছি; এই অজ্ঞানতাই মহা অনিষ্টকর। এই প্রস্তাবে আমরা শুদ্ধ পারিবারিক ব্যবহারের অধীনতা কিরূপ অনিষ্টকর তাহাই প্রদর্শন করিতেছি।

১। অধিক বয়স পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তি পরিবার-মণ্ডলের জনক জননী অথবা অপর কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে থাকিলে সেই অধীনতা কেমন অল্পে অল্পে শান্ত প্রভাবে, এবং অজ্ঞাতসারে মনের তেজস্বিতা হরণ করে তাহা আমরা "একে একে" নামক প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি! সেই অধীনতায় আমাদিগের প্রকৃতি কিরূপ মৃদু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া আইসে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার সামাজিক ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা একটি বিষম নিশ্চেষ্ট জাতিরূপে পরিণত হইয়াছি। আমাদিগের প্রকৃতি জড়প্রায় হইয়া গিয়াছে। শুদ্ধ ইচ্ছায় আমাদিগের কার্য্য হয় না।. কার্য্যের জন্য যে প্রতিজ্ঞা, যে সাহস, যে উৎসাহ, যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা অনুমাত্র আমাদিগের শরীরে নাই। তেজস্বিতা কিরূপ বাঙ্গালী তাহা জানে না। কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত কার্য্য করায় যে বল আবশ্যক করে তাহা আমাদিগের নাই। এই বল বিহনে আমাদিগের ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কখন কার্য্যকারিতায় পরিণত হইতে পারে না। পারিবারিক শাসন ও প্রভুত্ব সে কার্য্যকারিতা ক্রমশঃ হরণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর সাধ্য নাই, বাধা ও বিপত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, সুতরাং সকল সামাজিক সদনুষ্ঠান ও সংস্কার, কল্পনা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কারণ সকল সংস্কারেই বিস্তর বাধা ও বিপত্তি আছে। স্বাধীনভাবে আপনার প্রতিজ্ঞাবলে দণ্ডায়মান হওয়া বাঙ্গালির কার্য্য নহে; কারণ পারিবারিক একাধিপত্য সে স্বাধীনতা ও প্রতিজ্ঞাবল একে একে সম্পূর্ণ হরণ করিয়াছে। সুতরাং যে সমাজসংস্কারে এই প্রতিজ্ঞাবলের আদৌ আবশ্যক তাহা বৃথায় হইয়া যায়। এই পারিবারিক একাধিপত্যের সামাজিক ফল কিরূপ অনিষ্টকর তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইল।

২। এইরূপ একাধিপত্যে যাহাদিগের অবস্থান করিতে হয় না, অন্যান্য কারণে তাহাদিগের তেজস্বিতা বিনষ্ট হইয়া যায়। বাল্যবিবাহ একটি প্রধান কারণ। বাল্যবিবাহ নিবন্ধন অল্পবয়সেই আমরা স্ত্রীপুত্র কন্যায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ি। নানাবিধ ভাবনা চিন্তা আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলে। পরিবারের ভরণপোষণ, পুত্রকন্যার শিক্ষা ও বিবাহ দান প্রভৃতি কিরূপে সম্পন্ন হইবে এই ভাবনায় আমরা নিয়ত অল্পবয়সেই নিতান্ত অধীর ও ব্যাকুলিত হইয়া পড়ি। ইহাতে আমাদিগের নিজের স্বাধীনতা অতি অল্প বয়স হইতে একেবারে বিনষ্ট হয়। সেই স্ত্রীপুত্র কন্যাই আমাদিগের উপাস্য দেবতা হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করা নিতান্ত অসম্ভব ও অন্যায়। অল্পবয়সেই এই পারিবারিক অধীনতা-শৃঙ্খল আমরা আপনাপনিই ধারণ করি।

অজ্ঞানাবস্থায়, পিতা মাতা আমাদিগকে এই শৃঙ্খল পরাইয়া দেন। পরাইয়া দিয়া চিরদিনের জন্য আমাদিগকে অধঃপাতে দেন।

এই পারিবারিক অধীনতার প্রভাব অতি শান্ত ও অজ্ঞাতভাবে আমাদিগকে শাসন করে। ইহার শাসন আমাদিগের হৃদয়-রাজ্যে। স্নেহ, মমতা ইহার প্রধান শাসন-রজ্জু। আমাদিগের উপর পরিবারের সম্পূর্ণ নির্ভর ও অধীনতা থাকাতে আমরা অতি দৃঢ় বন্ধনে তাহাদিগের অধীনতায় বশীভূত হই। আত্মোন্নতিকে তাহাদিগের অধীনতায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। স্বাধীনতাকে অগ্রে বলি দিয়া তবে বাল্যবিবাহ করি। প্রতিজ্ঞাবল তাহাদিগের ভাবনা চিন্তায় কোথায় উড়িয়া যায়। যে পরিবারের সুখের জন্য ব্যতিব্যস্ত হই, এবং আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিই, তাহাদিগের সেই সুখসাধনের উপায় সকলও স্বাধীনভাবে অবলম্বিত হইতে পারে না। যে সময়ে আপনাদিগকে কে ভরণপোষণ করে তাহার ঠিকানা নাই, সেই সময় হয়তো পাঁচজন পরিবার আমাদিগের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছে। তুমি তাহাদিগের ভাবনা ভাবিবে, না আত্মোন্নতির জন্য দেশ দেশান্তরে ফিরিয়া বেড়াইবে। তোমার সাধ্য নাই, সেই পরিবারগণকে ফেলিয়া তুমি এক পদও সঞ্চালন কর। যতদিন তোমার বিবাহ না হয়, ততদিন তুমি স্ত্রীস্বাধীনতার উপর, বালিকা বিবাহের উপর, বেস বক্তৃতা করিবে; কিন্তু যেই মাত্র তোমার বিবাহ হইল, অমনি তোমার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে। তুমি অবশেষে সামাজিকতার ঘোর দাস হইয়া যাও। ইহার কারণ কি? তুমি সেই পরিবারের দুঃখ দেখিতে পারিবে না বলিয়া সমাজের সঙ্গে মিশিয়া যতদূর সাধ্য তাহাদিগের সুখের চেষ্টা করিয়া বেড়াও। পারিবারিক সুখ তোমার হৃদয়কে হরণ করিয়া রাখে, পাছে কোনমতে তাহার বিঘ্ন ঘটে; এইজন্য তুমি আপাততঃ ক্লেশকর সামাজিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে পার না। কিন্তু পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ না হইলে অগ্রে আত্মোন্নতি সাধন করিয়া, সমাজে স্বাধীন ভাবে অগ্রে দাড়াইবার শক্তি ধরিয়া,পরে বিবাহজনিত পরিবার-মণ্ডলে বেষ্টিত হইলে, তাহাদিগের সুখের জন্য কিছু উৎসর্গ ও ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না। তখন স্বাধীনভাবে দাঁড়াইয়া বিলক্ষণ পারিবারিক সুখ সাধন করা যাইতে পারে। এই পারিবারিক সুখের জন্য তুমি দেশাচারের বশবর্ত্তী হও। দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া যে দ্বারে আপনি দিনরাত্র কাঁদিতেছ, সেই দ্বারে আবার আপনারই পুত্র কন্যাকে অনায়াসেই নিক্ষেপ কর। তাহাদিগের ও বাল্য বিবাহ দাও। তাহার কারণ এই যতদিনে তাহারা বিবাহাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ততদিনে তোমার অন্তর হইতে সকল তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি জানিতে পার নাই, যে ধীরে ধীরে তুমি

কেমন সমাজের দাস হইয়া পড়িয়াছ। কিন্তু বরাবর তুমি যদি তেজস্বিতা বজায় রাখিতে পারিতে, বরাবর যদি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিতে, এরূপ কখনই ঘটিত না। তাহা ত হয় নাই, সুতরাং অভ্যাসের প্রভাব তোমাতে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি সকল কার্য্য অভ্যাস বশতঃ যেমন দ্বিরুক্তি না করিয়া অনায়াসে সাধন করিয়া আসিয়াছ; এই ঘোর অন্যায় কার্য্যে ও যে তদ্রূপ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছ। পুত্র কন্যার বাল্য বিবাহ দিয়া তুমি তাহাদিগকেও অধঃপাতে দিলে। তোমার ন্যায় শিক্ষিত জনকের হস্তে পড়িয়াও তাহাদিগের কি দুর্দ্দশা ঘটিল? জানিয়া শুনিয়া ও তুমি যে অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার পাতক তোমার। না জানিয়া শুনিয়া তোমার জনক জননী যে অনিষ্ট করিয়াছেন, তুমি জানিয়া শুনিয়াও সেই অনিষ্ট করিলে। তবে তোমায় জানাতে এবং না জানাতে কি ফল ঘটিল। বরং না জানিয়া এরূপ করিলে তোমার ততদূর দোষ ছিল না। কিন্তু কি করিবে? তুমি কি এখন আর তোমার আছ? তোমার যে কিছু সারবত্তা ছিল, তাহা সমুদায় বিসর্জ্জিত হইয়াছে। তুমি এখন পরিবারের দাস, দেশাচারের দাস, সমাজের দাস। তুমি এই দাসানুদাস হইয়া অতি নীচ ও অবজ্ঞেয় হইয়াছ।

৩। আর এক কারণে আমাদিগের পারিবারিক অধীনতার বৃদ্ধি হইয়াছে। এদেশে স্ত্রীজাতির যেমন অধীনতা, অন্য দেশে ততদূর নহে। আমরা স্ত্রীজাতির উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করিয়াছি, কিন্তু এতন্নিবন্ধন যে সমস্ত সামাজিক অনিষ্টাপাত হইয়াছে, তাহাতে সেই পাতকের বিলক্ষণ প্রতিশোধ হইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া রাখিয়াছি, তাহারাও আমাদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমাদিগের স্বাধীনতা বিলক্ষণ হরণ করিয়াছে। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা যাহা, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে, অনিষ্ট কেবল এক পক্ষে ঘটে না। আমরা স্ত্রীজাতির যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছি, সেই অনিষ্ট ঘুরিয়া আমাদিগের উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের প্রভুত্ব জোর; তাহাদিগের গোপনীয় শাসন জোর নহে, কিন্তু জোর অপেক্ষা আর কিছু অধিক। স্বেচ্ছামত আমরা স্ত্রীজাতিকে পবিত্র রাখিতে যাই। অধীন স্ত্রীজাতি তাহাই রহিল। বিধবার বিবাহ নাই। কিন্তু তাহার ফল এই দাঁড়াইল, যত বিধবা পুরুষের গলগ্রহ ও মহা ভাবনার বিষয় হইল। প্রায় এমত গৃহ নাই যেখানে এই ভাবনার বিষয় নাই। বঙ্গ সমাজে সধবা যত, বিধবার সংখ্যা তদপেক্ষা ন্যূন নহে। এই বিধবাগণ সমাজের মহাভাবনার বিষয়। পুত্র কলত্র অপেক্ষাও তাহাদিগের জন্য অধিক ভাবিত থাকিতে হয়। তাহাদিগকে ছাড়িয়া

কোথায়ও যাইবার যো নাই। তোমার পুত্রকলত্রকে দেখিবার বরং অন্য লোক আছে, কিন্তু তোমার বিধবা ভগ্নী, কি ভাগিনেয়ী, কি পিসি, মাসী, কি জননীকে তুমি ভিন্ন দেখিবার আর কেহই নাই। ইহারা তোমার সম্পূর্ণ অধীন। কারণ, তুমি ভিন্ন এজগতে তাহাদিগের আর কেহই নাই। তাহারা তোমার উপর নির্ভর করিয়া দিবা নিশি অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। তোমার সান্ত্বনা বাক্য শুনিলে তাহাদিগের হৃদয়-ব্যথা বরং কথঞ্চিৎ অপনীত হয়। তোমার মুখচন্দ্র না দেখিলে তাহারা নিদারুণ কষ্ট পায়। তোমার উপর তাহারা এতদূর নির্ভর করে যে নিজ উন্নতির জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার কি সাধ্য? তুমি একদিন বাহিরে গিয়াছ, তোমার হৃদয় তাহাদিগের জন্য চঞ্চল হইতেছে। অতি সূক্ষ্মসূত্রে তাহারা তোমাকে শৃঙ্খল অপেক্ষাও দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া তোমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করিয়াছে। তোমার আশ্রিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। তোমার বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই হয় ত তাহারা তোমার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা তোমার পুত্র কলত্র অপেক্ষা অধিক; তাহারাই তোমার প্রকৃত পরিবার।

ইহাদিগের দুঃখমোচনের নিমিত্ত হয় ত অতি বাল্যকাল হইতে উপার্জ্জনের জন্য আমাদিগকে লালায়িত হইতে হয়। আত্মোন্নতির সকল পন্থা বিসর্জ্জন দিয়া ইহাদিগেরই সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতে হয়। ইহারা তোমাকে স্নেহ ও মমতা সূত্রে একরূপ অধীন করিয়া রাখে, যে তুমি তাহাদিগের অনভিমতে কোন কার্য্যের কথা মাত্র উত্থাপিত করিতে পারে না। যতদিন তাহারা জীবিত থাকে, ততদিন তাহাদিগের মনোবেদনা দিয়া কোন কার্য্য করিতে সাহসী হও না। আত্ম উন্নতি, কি সমাজ-সংস্কার তাহারা মরিলে পর। কিন্তু ইতিমধ্যে কত প্রস্তাব তোমার মনে উদিত হয়; কত ইচ্ছা তোমার হৃদয়কে উত্তেজিত করে, সাধ্য কি তুমি তাহার তিলার্দ্ধ সম্পন্ন কর। সে সমস্ত অন্তরে উদ্ভূত হইয়া, অন্তরেই বিলীন হইয়া আইসে। কিছুকাল পরে, তোমার সকল তেজ বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে তোমার প্রকৃতি ক্রমশঃ একরূপ জড়প্রায় হইয়া পড়ে যে সময় কালে তোমার সমুদায় কার্য্যশক্তি আর উদ্রিত হয় না।

পারিবারিক প্রভাব ও অধীনতা অতিসূক্ষ্ম বিষয়। ইহা অতিক্রম করা অতি কঠিন কার্য্য। অতি গোপন ভাবে ইহা কার্য্য করে এবং হৃদয়কে পরাভূত ও নিস্তেজ করিয়া আনে; ধীরে ধীরে অতি দীর্ঘকালে আমাদিগকে সম্পূর্ণ বল বীর্য্য হীন করিয়া আনে। অবশেষে তাহারই দাসত্বে আমাদিগকে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া ফেলে। আমরা এই অধীনতায় এত নিস্তেজ হইয়া পড়ি যে আমাদিগের কিছুই কার্য্যশক্তি থাকে না। সমাজের কোন অনু-

ষ্ঠানে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। এই প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিলে আমাদিগের কার্য্যশক্তি বৃদ্ধি হইবে না। সামাজিক দেশাচারে আমাদিগের প্রকৃতিকে নিতান্ত মৃদু করিয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত দূষিত দেশাচারকে বিপর্য্যস্ত করিতে নাপারিলে আমাদিগের মঙ্গল নাই। ইহাদিগের বশীভূত থাকিয়া স্বাধীনতা লাভে আমরা কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। এই দেশাচারই আমাদিগের অধীনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। এবং অধীনতা বাড়িতেছে বলিয়া তাহাদিগের শাসন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না। দেশাচার অধীনতার প্রতিপোষক এবং অধীনতা দেশাচারের প্রতিপোষক। ইহারা পরস্পরের সাহায্যে উভয়েই পরিপুষ্ট হইতেছে। আমাদিগের সমাজের এইরূপ বিকৃত গঠন; এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। এসমাজকে সম্পূর্ণরূপ বিলোড়িত না করিলে আর নিস্তার নাই। ইহার আমূল দূষিত। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে তবে আমরা একদিন স্বাধীনতার আশা-পথে অবস্থিত হইব। নহিলে সমুদায় পণ্ডশ্রম মাত্র।

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলী।

রাধিকাকুঞ্জ।

সময় নিশীথ।

শ্রীকৃষ্ণ একাকী,—বংশী বাজাইতে বাজাইতে হঠাৎ থামন ও উৎসুক চিত্তে কুঞ্জের দ্বারের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে—

রাই-চরণ রুণু ঝুনু অই বাজত
রাই মোর আয়ত ঠিক!—
(তমাল-শেখরে কোকিল-ধ্বনি)
নহে কাঁহে কোকিল তমাল শেখরে
কুহু কুহু কুহরে?
কুহু কুহু কুহরি কায় বোলাবব?
সিনগধ শিশির সুসিকত কুসুম
পীযূষ সুরভিত পানে নিবিরত ভেয়ই
উড়ে উড়ি মধুপ মৃদু-মধু ঝঙ্কারে
কানন বিমোহিয়া কায় বোলায়ত?
নীলিমা নিরমল গগণ মাঝারে
ক্ষণে ক্ষণে [illegible] নিরখত?
—রাই মো[illegible] আয়ত ঠিক!—
নতুবা সমীরণ কানে কানে কাঁহে
প্রতি[illegible]—'আয়ল রাই'—?
যমুনা কল্লোলিনী কাঁহেইবা কহত
সেহ মৃদু কলে—'আয়ল রাই'—?
'আয়ল রাই!'—
আহা মরি অই শুন—'আয়ল রাই!'—
তরু-লতা সমীর সবই গাহত
এ মধুর সঙ্গীত ব্রজ বিমোহিয়া!
তালে তালে তার নাচত হমার
হৃদয়, রুধির ধমনী মাঝারে!—
বংশী! তু' কাঁহে নীরব?
রাধা নামে সুধু তুহত দীক্ষিত!—

'রাধা রবে তবে কাঁহে নাহি বাজত ?—

('রাধা'বোধা'—স্বরে বংশীধ্বনি)

(রাধিকার প্রবেশ।)

রাধিকা।—(শ্রীকৃষ্ণের বদন হইতে বংশী ধরিয়া)

হরি বাঁশরী দেহি হমারে—

আজি হম পেখব তাহারে!

কোন গুণে ব্রজ মোহিত কিয়ে ?—

(বংশী গ্রহণ)

নয়ন প্রীতি-কর শ্রবণ-মনোহর

বাঁশরী তোহারি।—

কপট যৈসন তু' বনয়ারী—

কপট তৈসন তোহার বাঁশরী!

শ্রীকৃষ্ণ।—রাধে!—

সরল বঙশে বিরচিত বংশী—

বঙশী সরল হমারি!

তোর কুটিল নয়নে গরল খেলত

পেখলো মুকুরে রাই

মম হৃদি-মুকুর তব রূপে বিম্বিত

জর জর হের তুয়া আঁখি বিখে!—

বংশীত সরল হমারি!

—কুটিল রাধে নয়ন তোহারি!—

(কুসুম-শয্যায় উপবেশন)

রাধিকা।—আজ বঙশী ভাঙব, যমুনামে ফেকব।

নতুবা অনলমে জ্বালায়ব তায়ও!

দারুণ দুরূহ মদন-হুতাশনে

জ্বালায়ত সে যৈসন মোয়ও!

আজি হরি না কহবি আর!

—ছোড়ব না আজি

ভাঙব জ্বালায়ব বঙশী তোহার!—

(বংশী ভাঙ্গিতে উদ্যতা)

শ্রীকৃষ্ণ।—(রাধিকাকে পার্শ্বে বসাইয়া)

রাধে!— বঙশী ভাঙবি কাঁহে ?—

তোহারি আশ্রিত তুয়া নামে দীক্ষিত

বৃন্দাবনে সুধু জানত তুহে!

তাহে পীড়ন প্যারি উচিতত নহে!—

রাধিকা—(শ্রীকৃষ্ণের গলায় হস্ত বেষ্টন করিয়া)

নিঠুর তু' বড়কান!—

সরলা পাইয়া করুণা না ভেল

বধিলি পরাণে হায়!

কি দিয়ে ভুলায়ে ফাঁদ পাতিয়ে,

বিহগী বাঁধিলি জালে!

টোপ দেখায়ে মীন গাঁথলি

তু' বড় নিঠুর কান!

বনের মাতঙ্গী বশ করলি

এ যাদু শিখলি কাঁহা ?

সরলা হরিণী বিজন বিপিনে

চরিতে আছিল একা—

আয়ত লোচনে তাহারে বিঁধলি

ধরম করলি ভালা!

সাগর-মথনে গরল উঠব

এ যদি জানতু আগে

হাতে করিয়ে মাটি খাইতে

এ সাধ করিত কে ?

পীরিতি—পীরিতি—শবদ মোহন

অমিয়া মাখন হায়!

পীরিতি চপলা ভুবন-মোহন

পরশে পরাণে যায়!

ক্ষীরের মাঝারে গরল গুপত

সন্ধান জানত যদি

খাল কাটিয়ে জল আনিয়ে
কুমীরে কে দিত বাসা?—
হায় সে কিশোর কাল!—
না ছিল যাতনা পরেরি ভাবনা
এ পোড়া যৌবন দায়!
এ পোড়া শরম এ পোড়া মরম
এ পোড়া বাসনা হায়!
এ পোড়া যৌবন কাঁহাসে আয়ল?
পাগল করল মোয়।—
পরেরি লাগিয়া মিছার ভাবনা
ভাবিয়ে পরাণ যায়!
অসাধ্য সাধনা এ আর যাতনা
যোগান পরেরি মন—
সুমেরু সরাণ সাগর সিঁচন
বরঞ্চ সহজ জ্ঞান।
সাধ করিয়ে পারবি হইয়ে
বিকায়ে পরেরি পায়
পরেরি ভাবনা ভাবিয়ে ভাবিয়ে
পরাণ নিকলি যায়!
এ দুঃখ কহব কায়?—
এ পোড়া জীবন এ পোড়া যৌবন
সোঁপিনু যাহার পায়!
শঠের প্রকৃতি কেমনে বুঝব?
সেজন পরেরি চায়!—
রাধার অধরে মধু ফুরায়ল
নতুবা এমন কাহে?
না ফুটিতে ফুল শুকাল বুঝিবা
রাধার কপাল ফেরে!
কুসুম শুকাল মধু ফুরায়ল
বধুয়া মজব কাহে?
হায়!

পরেরি নয়নে বধুয়া নয়ন
মিলন দেখিলে আঁখে
যমুনা-জীবনে ডারিয়ে যৌবন
মরিতে পরাণ চাহে!—

শ্রীকৃষ্ণ।—রাধে।—
তোর মুড পরশি শপথ করব
এ যদি কহবি ফের?
তোহারে হারাব আর কি কহব
মিছিয়া কহব যদি?
অমিয়া ত্যজিয়া সলিলে বাসনা
কে মূঢ় ভুবনে হেন?
গঙ্গাবাসী করে গঙ্গা জল ত্যজি
কূপজলে কিয়ে মন?
কুল ছুঁয়িয়া শপথ করব
মদনে করিয়া সাখী
পাঁচফুল-শরে জর জেয়ব
মিছিয়া কহব যদি!
মলয়-অনিলে গতর দহব
আর কি কহব রাধে!
চাঁদের কিরণে জ্বলন জ্বলব
মরব মদন বিখে!—
রাধার অধর মধুর-আধার
ত্যজিয়া বাসনা যদি
অন রমণী-অধর-মধুতে
আর কি কহব রাধে!—

রাধিকা।—বুঝিহে বুঝিহে শঠের প্রকৃতি
ত্যজহে নাগর ঠাট!
অবলা ভুলান সহজ বটেহে
শিখাহো ভালা সে পাট!
শঠেরি চরণে সোঁপিনু জীবন
লভিব মনন আসে

চোর ভাগল গেয়ান ভেয়ল
হমার করম দোসে!—
—সে দিন নাইহে বঁধু!
সরলা শঠতা চিনল বঁধুহে
কদিন চোরের রহে?—
শ্রীকৃষ্ণ।—দোহাই মদন দোহাই গৌরিতি
দোহাই কুসুম শর!
দোহাই রাধার—মিনতি চরণে
করিহে না করি পার!—
দেখহে গগণে স্থির ... না
ছড়ায়ে জোছনা রাজি
এরূপ অমিয়— ... অমিয়া
... আজি।—
তরগে তরগে ছুটিত লহরী
মাতল পবন রায়
কাঁপায়ে কুসুম কাঁপায়ে বল্লরী
মেছুল মেছুল বয়!
কুসুমে কুসুমে মাতাল ভ্রমরা
মুদিয়ে নয়ন রয়!
তমাল-শেখরে কুহরে কোকিল
আশীশ নিয়ারি তায়!
নিশি যে পোহাই যায়!—
অলস চাঁদিমা অইত দাঁড়ায়ে
তুইত ঘুমালে যায়।
পাতার আড়ালে আড় নয়নে
ঢাকিয়ে বদন খানি
মুচুকি মধুর হাসিয়ে কুসুম
অইত সলাজে চায়!
নিশি যে পোহাই যায়!—
অইত ভ্রমরা কুসুমে শুয়িয়া
অলস নয়নে চায়!

বকুল-শেখরে গুমারে কোকিল
কুহরি দেতহে সাড়া!
বাধে।—
তুইত ঘুমালে ঘুমাব তারা!
তাজলো নূপুর বাজব ঝুমুর
সেবড় মুখরা রাই!
খুললো নিচোল ফেললো আঁচল
পবন বাধব তায়!
বাসনা যমুনা বিসম তুফানে
কইসে লাগাব পাড়ি?
বাধে!—তুইনা খুলিলে আঁচল নিচোল
পবন লাগাব আড়ি!—
একেত যমুনা বিসম প্রসব
নাগোয়ও নজর পাড়ি!
মেঘ পেখিলে মাতবে পবনা
তাজলো বসন প্যারি—
নীল বসন মেঘ-বরণ
তাইহে নিষেধ করি!—
রাধিকা—ভাল বটেহে কহিলে বঁধুয়া
তাজব নীল বাস—
নীল বসন তাজিলে গিরল
মিটল তোহার আশ!—
তনুর বরণ নীল চিকন
কইসে লুকাবি তারে?
ভালই ভইল ক্ষণেক ঠরহে
সখিয়া আইলে পরে
দধিয়া আনিয়া তাহারে কহব
ঢালিতে তোহার মুড়ে!—
শ্রীকৃষ্ণ।—কাঁহা বা সখিয়া কি কায দধিয়া?
শুনলো ফিকির রাই।
হেম তরল জিনিয়া চিকন

বরণ মোহন তোব!
কাঁহা সখিয়া—কিকায় দবিয়া?—
বসন কবিয়ে দব
আবব হমাবে!—মেঘ ঢাকব
নাবব পবন ডব!—
(রাধিকাব গাল টিপিয়া)
বাধে নীবব কাঁহে?
কোমল কুসমে বচিত তোহাব
বাসব সুন্দব বাই!
যদি—কুসুমে ঠেকিলে বিসম বাজেহে
বুক পাতিয়ে দেই।—
হাজার হাতব পাগলা মদন
হানিছে কুসুম বাণ।
দেওহে পিয়ারি গাল ফিবাযে
বাখিতে মদন-মান।—
(গাল ফিবাইয়া চুম্বন)
রাধিকা—(শ্রীকৃষ্ণের গলদেশ হইতে হস্ত সবাইয়া)
কিকর কি নিলাজ নাগর
ছোড়হে মিনতি পায়!—
কুল-ললনা হমবা শবমে
পরাণ নিকলি যায়।—
(শ্রীকৃষ্ণেব গলদেশ পুন বেষ্টন করিয়া)
আড় কুটিল চপল সন্ধানে
সঘনে নয়ন-বাণ
কাঁহে হানহে নিঠুর নাগর
যাবহে নিকলি প্রাণ!
দোহাই তোহারে মিনতি করিহে
দেওহে ছাড়িয়ে যাই—
মদন রাজার হজুর হইতে
অবলা খালাস পাই!—

(বৃক্ষান্তরাল হইতে বৃন্দার প্রবেশ;—
রাধিকা সলাজে গাত্রোত্থান করিয়া)
ছি ছি লাজ মবি হাধিক তোহারে!—
যম চিনেনা তোহে?
যমুনা ভাঁড়ারে নাহি কি সলিল—
ডুবিয়া নামব কাহে?
হাবরে লাজেরি কথা!—
নাহোয়ও শবম আড়ি পাতিয়ে
শুনিতে পরেবি কথা?
আব জনমে কুকুবী ভইবি
ঠিক কহলু তোরে!—
আপন করম ভোগ কাটাতে
দেবেও কদাপি নারে!—
বুড়িয়া ভইলি দিন কাটালি
তবু না মিটল আস!
যৌবন-নিদাঘ কেমনে কাটলি?
হাযরে সরবনাশ!—
জোয়ার সবল দিন গয়িল
এখন বাসনা মনে!
ধন লুটায়ে দেউলা ভইলি
সখ রাখিয়া প্রাণে!—
কাল নয়ন হীন নতুবা
পেখেনা নয়নে তোহে!
কুঞ্জ হইতে দূব ভেয়লো
মোর না নয়নে সহে—
বৃন্দা।—সাগব সেঁচেয়ে মানিক জুটায়ে
ভয়নু চখের শূল!
কুঞ্জ হইতে দূব ভইব
এহি লভনু মূল!—
যার লাগিয়ে চুরি করলু
সে কহে হমারে চোর!

ভাল কহলি রাজ-দুলালী
মরণ না হোও মোর!—
মদন-মন্ত্রে দীক্ষিত করলু
এবেহে হমারে লাজ!
এ আর নূতন নাচিতে বসিয়া
বয়স হইলে বাসনা ফুরায়—
কাঁহা পায়লি পাঠ?
প্রবীণে বাসনা প্রবীণ ভয়লো
বুঝবি দু'দিন যাক!—
ঘোমটা খুলিতে লাজ!
(কুঞ্জ হইতে প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ।—বৃন্দে!—বৃন্দে!—

নেপথ্যে।—ভাঙিতে ভাঙাতে জুড়িতে তাড়িতে
এবেহে তার কি কায?
নীরোগ শরীরে কি কায বেয়াজে
আপদ দূর হই যাক!—

(রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের হাস্য;—রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বামে উপবেশন; নেপথ্যে গীত-ধ্বনি;—নৃত্য গীত করিতে করিতে বিসখা ললিতা ইত্যাদি ব্রজাঙ্গনা গণের প্রবেশ ও ফুলবর্ষণ)—

গীত।

কালাংড়া।—আড় খেমটা।

(নেপথ্যে) চল সজনি দেখে আসি
মেঘের আড়ে সৌদামিনী।
মদন-মোহন শ্যাম আমাদের
রাই মদন-মোহিনী॥
(প্রবেশ করিয়া) রূপে ভুবন মোহিত হল
কামের ধনুর ফুল ছুটিল
আঘাতে ব্যাঘাত ঘুচিল—
ম'লাম যত বিরহিণী।
মলয়-অনিল-দোলন-ভরে
ফুলের মধু উপছে পড়ে
কুসুম শরের বিসম শরে
আপনি রতি পাগলিনী॥

(যবনিকা পতন।)

—

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বসন্তকুমারী। প্রথম খণ্ড। শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ৮৴ আনা। এখানি কাদম্বরীর আদর্শে গঠিত। গ্রন্থকার তরুণবয়স্ক হইলেও লেখনচাতুর্য্যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন।

গুপ্ত প্রেশ পঞ্জিকা। সন ১২৮৫, ইং ১৮৮৫।৭৯। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড।০। এই পঞ্জিকা খানি আমরা অনেক দিন পাইয়াছি, কিন্তু ৮৫ সালের আর্য্যদর্শন বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় এত দিন ইহার সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় নাই। ইহার সম্বন্ধে আমরা অধিক আর কি বলিব এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে এরূপ সুন্দর-চিত্র-বিচিত্রিত পরিশুদ্ধ সুমুদ্রিত পূর্ণ পঞ্জিকা এত অল্প মূল্যে প্রকাশিত হইতে পারে, ইহা

র্ব বিশ্বাস ছিল না।

বীণা—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। অ্যালবার্ট যন্ত্রে মুদ্রিত।

কৌমুদী—শ্রীরুক্মিণীকান্ত ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত। ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই দুই খানি "বিবিধ সঙ্গীত ও নানা বিষয়িণী কবিতাবিকাশিনী" মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া আমরা বিস্ময় ও হর্ষে আপ্লুত হইলাম। বিস্ময় এই জন্য যে মাসিক কবিতা পত্রিকা আর কোন দেশ আছে বলিয়া আমরা জানি না, আর প্রকৃত কবিত্ব মাসে মাসে বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রসূত হইতে পারে বলিয়া আমাদি[illegible] [illegible]স ছিল না, সুতরাং [illegible] সৃষ্টি দেখি[illegible] বিস্ময় জন্মিল। [illegible] পরে বিস্ময় [illegible] হইলে হয় [illegible] ভাবিলাম যাহা স্ব[illegible] হউবে [illegible] আমাদিগের ক[illegible] [illegible]বেরা য়েরাও পারে না [illegible]তে পারেন, যদি তাহা কি[illegible] আর অবি[illegible] তাহা অপেক্ষা [illegible] তর [illegible] পারে। আহ্লাদে

বাঙ্গালা ব্যাক[illegible] মণিকা। ফিমেল নর্ম্যালস্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা বাজবীয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আট আনা। এই ব্যাকরণ খানি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিত। অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় বিভিন্ন রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ততঃ সংস্কৃত "বাগ্মী" শব্দ সংস্কৃত ভাষায় "বাগ্‌মী" উচ্চারিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় ইহা "বাগ্‌গী" এইরূপ উচ্চারিত হয়। এই উচ্চারণের অনিয়ম বশতঃ বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য সকল দেশের লোকেরই বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণ করা কঠিন হইয়া উঠে। বৈদেশিকদিগকে প্রকৃত বাঙ্গালা উচ্চারণ শিখাইতে এ ব্যাকরণ খানি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে শব্দ ও ধাতু প্রকরণ ঠিক সংস্কৃত প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন কারকে শব্দের বিভক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্দ্দেশ, ও বিভিন্ন কালে ধাতুর বিভক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্দ্দেশ—আমাদিগের যতদূর স্মরণ হয়—বাঙ্গালায় এই প্রথম দেখিলাম। আশা করি পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সমাদরে পরিগৃহীত হইবে।

কবিতা-মুকুর।

মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত [illegible] গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। [illegible]৵০ আনা মাত্র। কবিবর হেমচন্দ্রের রীতি অবলম্বন করিয়া এই [illegible]বতা পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাদৃশ উচ্চ আদর্শে নিজ কবিতাগুলি সংগঠিত করিতে গিয়া সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। পাঠকবর্গের আর একটী সংবাদে জানা বিশেষ প্রয়োজন, কবিবরের আগে "মজুমদার" খেতাব ছিল, এখন ইনি "মুখোপাধ্যায়" হইয়াছেন।

পঞ্চানন্দ—একটী সরল রেখা কর্ত্তৃক সম্পাদিত। রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন। প্রথম সংখ্যা। চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্রালয়ে

শ্রীনন্দলাল বসু দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। আমরা ভ বত্তোদ্ধারের সমালোচনাস্থলে বলিয়াছিলাম যে একরূপ বিদ্রূপাত্মক এক খানি পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন। এত শীঘ্র আমাদিগের যে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে তাহা আমরা ভাবি নাই। কিন্তু পঞ্চানন্দের অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ সংশয়। পঞ্চানন্দ জন্মিয়াই নিদ্রা যাইতে বসিলেন, কবে জাগ্রত হইবেন তাহা বলিবেন না; কারণ প্রতিজ্ঞা করিলে লোকের আশার অন্ততঃ অর্দ্ধেকও মিটা ইতে হইবে। বঙ্গদর্শন আর্য্যদর্শন প্রভৃতি বর্ত্তমান সাময়িক পত্র গুলি নিয়মিতরূপে বাহির হইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া কিছু [illegible] জায় বাধিয়া পরে কোন [illegible] বাহির হইতে [illegible] না, এই জন্য পঞ্চানন্দ প্রা[illegible] [illegible]ন যে তিনি প্রথম হইতেই অনিয়মিতরূপে বাহির হইবেন। বঙ্গদর্শন আর্য্যদর্শন প্রভৃতি [illegible]ক পত্রিকা সকল গ্রাহকগণের জ্বালায় অস্থির, [illegible] জন্য পঞ্চানন্দ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি দর্শনী না পাইলে কাহাকেও মুখ দেখাইবেন না। পঞ্চানন্দের এসকল প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে ইহা আমাদিগের প্রার্থনা, কিন্তু দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কতদূর তাহা ঘটিয়া উঠিবে বলিতে পারা যায় না।

পঞ্চানন্দের প্রথমখণ্ডে তামাসা নয়, ভূমিকা, পঞ্চানন্দের আত্মচরিত, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, নরেন্দ্র-তরঙ্গিণী, ছায়া পূর্ব্বগামিনী, বঙ্গীয় প্রতিজ্ঞা-পত্র, প্রাকৃতিক নিয়ম, দুঃখ-সংবাদ, সঙ্গত প্রার্থনা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ বহুদর্শিতার অভাব, প্রশ্ন উত্তর, উকীল চিনিবার উপায়, বিষম সমস্যা, বিজ্ঞাপন, ভারতের জয়, সাহিত্য-সংবাদ এই কয়টী প্রস্তাব দৃষ্ট হইল। সকল গুলিই কঠোর বিদ্রূপোক্তিতে পরিপূর্ণ। কতকগুলি বিদ্রূপোক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইল। ত[illegible]বিদ্রূপের নৈতিক ফল প্রায়ই মন্দ। পঞ্চানন্দ সমাজের কোন নেতৃদলকেই সংমার্জ্জনী প্রহার করিতে ত্রুটী করেন নাই। দুই এক জনের অপরাধে দলকে দলের উপর তিনি গালি বর্ষণ করিয়াছেন। যাহা হউক পঞ্চানন্দের [illegible] কার দশা [illegible] আমরা সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] [illegible]বিক[illegible]তর প্রশংস[illegible]। তাঁহার "ভ[illegible] [illegible]বি[illegible]তর জ[illegible]" সঙ্গীতটি অতি সুন্দর হই[illegible] [illegible]য়াছে। আমর[illegible] কায়মনোবাক্যে [illegible] [illegible]নন্দের দীর্ঘ জীব[illegible] পঞ্চ[illegible] [illegible]না করি। তবে [illegible]হার কাছে [illegible] উপস্[illegible] [illegible]নন্দ ঠাকুরকে [illegible]এইমাত্র অনুর[illegible] [illegible]নি ব্যক্তি-বিশেষের [illegible] [illegible]বা দল বিশেষের উপর তাঁহা[illegible] [illegible]অপবাদ প্রক্ষিপ্ত না করেন। যেন বিষয়গত বা ব্যক্তিগত দোষকণা সংশোধন করিতে গিয়া সেই বিষয় বা ব্যক্তির প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা উৎপাদন না করেন; যেন বিদ্রূপের প্রকৃত বিষয় না জুটিলে শুদ্ধ বিদ্রূপ কণ্ডু নিবারণের জন্য নীরোগ নিরপরাধ খুল্লতাতকে গঙ্গা তীরস্থ না করেন; যেন স্মরণ থাকে যে একরূপ সংস্কারকের হৃদয় অমৃত ময় হওয়া চাই, সে হৃদয়ে গরল থাকিলে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট-সম্ভাবনা।

৭°

...র লক্ষ্য হইয়া বজ্রাদ-
...ব মর্কটের হস্তে পড়িয়া চূর্ণ
...ইয়া পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইল।
একের প্রণয় জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; অন্যের কোমলতার আভা উজ্জ্বলতায় কম না হইয়াও, ধিকি ধিকি জ্বলিয়া, নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করে। একের নির্ম্মাণ-পদার্থ অগ্নি-প্রস্তরবৎ কঠিন, তাই বিচূর্ণ হইবার শত কারণ সত্ত্বেও তাহার কণামাত্রও খসিল না; অন্যের গঠন-বস্তু নবনীতবৎ কোন কোমল পদার্থ, তাই লৌহবৎ কঠিন এই পৃথিবীর সংঘর্ষ সহ্য করিতে পারিল না, অল্পেই তাহার পার্থিব অস্তিত্বের শেষ হইল। একের কলঙ্কই তাহার উজ্জ্বলতা সমধিক বর্দ্ধিত হইবার কারণ; একের কলঙ্কই তাহার মহত্ত্ব; অন্যের মৃদুমধুর পবিত্র আভা যে একবার নয়নগোচর করিয়াছে, সে কখনও তাহাকে ভুলিতে পারিবে না। দলনী-রত্ন কবির অপূর্ব্ব

করিয়াছিলেন। এই বণিকের নাম গুরগণ খাঁ, ইস্পাহান ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি বস্ত্র ব্যবসায়ে জীবিকার সংস্থান করিবার জন্য বঙ্গ দেশে আসিয়াছিলেন; আসিবার সময় দলনী-রত্নকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; আনিয়াছিলেন এই মনে করিয়া, যে এই রত্নের বিনিময়ে, কোন অধিকতর লাভ-জনক এবং অধিকতর উচ্চ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। ইনি সামান্য বণিকের বেশে আসিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ইনি একজন প্রতিভাশালী লোক ছিলেন, ইহাঁর বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, ইহাঁর আকাঙ্ক্ষা সীমা কাহাকে বলে জানিত না। বস্ত্র-ব্যবসায়ের লাভালাভগণনে, ইহাঁর বুদ্ধি সম্যক্ পরিচালিত হইতে পারিল না; ইহাঁর অপরিসীম আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি জন্মিল না, ও উচ্চে উঠিবার জন্য ইহাঁর মন সর্ব্বদা ব্যগ্র রহিল। থাকিতে থাকিতে, বঙ্গের সিংহাসনে প্রতি ইহাঁর দৃষ্টি পড়িল,—একদিন বা... অধীশ্বর হইতে পারিবেন, এই ...

লইয়া স্বকার্য্য সাধন ক...

পৃথিবীর বণিকজাতি স্বভাবতই আ... চতুর এবং স্বার্থসাধন কুশল; অন্যথা এই বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্রে রাজ-বণিকের একাধিপত্য হইবে কেন? গুরগণ খাঁ অভিপ্রেত-সিদ্ধির জন্য দলনীকে নবাবের অবরোধ-বর্ত্তিনী করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। তিনি রাজ্য চিনিতেন, রাজপদ চিনিতেন, তাহাই লাভের আশায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন; তিনি রমণীরত্ন চিনিতেন না; দলনীরত্ন, রত্ন যে বক্ষে শোভা পায়, সে বক্ষে স্থান পাইলে যে তাঁহার অপবিত্র স্বার্থময় কামনার সিদ্ধিকার্য্যে সহায়তা করিবে না, সে পবিত্র রত্নকে যে তাঁহার অপবিত্র ভাব স্পর্শ করিতে পারিবে না, তাহা তিনি একবারও ভাবিলেন না ও তাঁহার কুটিল কলুষিত ভাবের যে কিছু সংস্পর্শ তাহাতে লাগিয়াছিল, তাহা যে ...হজেই প্রক্ষালিত হইতে পারিবে, তাহা ...নি বুঝিলেন না।

...লনী এবং শৈবলিনী এ উভয়েরই ...

... যে দেখে সেই স্তম্ভ... প্রণয় সুগন্ধ-কুসুম-শোভিত-তারা, সলিলা ঈষচ্চাঞ্চল্যময়ী মৃদুমধুর সরসীবৎ দর্শকের নয়নানন্দকর, দৃষ্টি সেই চক্ষু আকৃষ্ট হয়, চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। শৈবলিনী চিত্রের বহিরাবরণে কোমলতার লেশ মাত্রও নাই, দলনী অন্তরে বাহিরে কোমলতাময়, বাল্যে ভাগীরথীতীরে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া শৈবলিনী যখন নীরবে প্রতাপের মুখ পানে চাহিয়া থাকিত; থাকিয়া থাকিয়া, আকাশ নদী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে যখন তাকাইত; যখন সুকুমার বন-ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া, প্রতাপের গলায় পরাইত; আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইত, আবার খুলিয়া প্রতাপের গলায় পরাইত; সেই সময়েই কেবল শৈবলিনী-চরিত্রে কোমলতা দেখিতে পাই। শৈবলিনী পরিণত-বয়স্কা হইয়া, প্রণয়-

বেগে যখন হইতে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন হইতে আর তাঁহার চরিত্রে আমরা বাহিক কোমলতা দেখিতে পাই না। নদী যখন দুর্দ্দমনীয় বেগে কোন দিকে বহিতে থাকে, তখন তাহার সলিল স্ফীত হয় না। নদী যখন বক্ষ স্ফীত করিয়া তীর প্লাবিত করে, নদীর জল যখন চারদিকে উথলিয়া পড়ে, তখন তাহার দুর্দ্দমনীয় বেগ আর তত দুর্দ্দমনীয় থাকে না। শৈবলিনীর প্রণয় দুর্দ্দমনীয় বেগে প্রতাপের দিকে বহিতে ছিল, সুতরাং ...র বহির্ব্বিকাশ হয় নাই; বেগ-সা... ঘটিলে নদীর ভীষণতা দূর হইয়া, ন... যেরূপ স্থির কোমল ভাব ধারণ করে, তাহা সেরূপ স্থির কোমল ভাব ধারণ করিতে পারে নাই। স্বভাব-জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ কবি বুঝিয়াছিলেন, শৈবলিনী চরিত্রে কোমলতা অস্বাভাবিক হইবে; শৈবলিনী যেরূপ নির্ভীকতা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ নির্ভীকতা ও দুঃসাহসিকতার স্থলে, কোমলতা সুসঙ্গত নহে। নবাবান্তঃপুরেই দলনীর সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। কবির সহিত নবাব দুর্গে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাই, দলনী কখন কোন ময়ূরের পুচ্ছ ধরিয়া টানিতেছেন, কখন অন্য এক ময়ূরের গলায় আপনার হীরক-জড়িত বলয় খুলিয়া পরাইতেছেন, আবার একটা মুখরা কাকাতুয়ার মুখে চোখে গোলাবের পিচকারী দিতেছেন, কাকাতুয়া তাঁহারই নিজ-প্রদত্ত শিক্ষা মতে তাঁহাকে বাঁদী বলিয়া গালি দিতেছে। কখন দেখি দলনী একটী বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিতেছেন, এবং অতি মৃদুস্বরে গান করিতেছেন—গান করিতেছেন যেন শ্রোতার ভয়ে ভীতা হইয়া। কখন দেখি তিনি শয্যায় শুইয়া গুলেস্তাঁ পড়িতেছেন, আর কাহার দর্শন জন্য যেন মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে, গুলেস্তাঁ ফেলিয়া তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছেন; এক একবার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতেছেন, দেখিতেছেন যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন তিনি আসিতেছেন, কি না। আবার তাঁহাকে না দেখিয়া আপনার মনকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন একজন কেন আর একজনের পথ চাহিয়া পড়িয়া থাকে।' দলনীর এই সকলই কোমল, এসকলই মধুর। দলনীর অন্তর যে অনন্ত প্রেমের আধার এ সকল তাহারই বহির্ব্বিকাশ, দলনীর হৃদয় যে গভীর প্রেম-সমুদ্র এ সকল তাহারই বহিশ্চাঞ্চল্য। একদিন দলনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম গৃহতলে সুকোমল গালিচার বিছানা গন্ধ-তৈলের রজত-দীপ গৃহ আলোকিত করিতেছে, ক... সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হ... বালিকার ন্যায় সুকুমার খর্ব্বাকৃ... আপনার সুকুমার দেহলতিকা শয্যায় স্থাপিত করিয়া, কিঙ্খা... ধানে মস্তক রাখিয়া গুলে... ছেন। রমণীও কোমল, কৃতিও কোমল, রমণীও

প্রকৃতিও সুন্দর, রমণীকে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যাহা যাহা আছে, সে সকলও সুন্দর ও কোমল। রমণী কি ভাবিতে ভাবিতে গুলেস্তাঁ ছাড়িয়া গাত্রোত্থান করিল, তখন "নির্দ্দোষ গঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গরাশিতুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার দুলিল, স্বর্ণখচিত সুগন্ধ-বিকীর্ণ উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল—তাহার অঙ্গ সঞ্চালন মাত্র গৃহ মধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল। অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্য মাত্র তরঙ্গ উঠে তেমনি তরঙ্গ উঠিল।" দলনীর প্রণয়ও ঠিক এই প্রকৃতির। দলনীর প্রণয় অগাধ-সলিলরূপী, দলনীর মধুর ব্যবহার সেই অগাধ সলিলের তরঙ্গ মালা। সে সলিলে সে তরঙ্গ সর্ব্বদা বিরাজমান, সে তরঙ্গ গভীর জলের ঈষচ্চাঞ্চল্য-খচিত তরঙ্গের ন্যায় দেখিতে সুন্দর এবং নয়নের প্রীতিকর, তাহা একবার দেখিলে আর ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে না।

বিলাসের ক্ষেত্র নবাব প্রাসাদে শত শত রমণী থাকিতেও, প্রকৃত রমণী প্রণয় খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যে সুন্দরী-গণ ... গৃহের শোভা সংবর্দ্ধন করেন, নবাব দিগের বিলাস ভোগের ..., তাঁহারা প্রকৃত প্রণয়ের দৃষ্টান্ত ... জন্য নবাব গৃহে আনীত হয়েন ... গের অনন্তরূপতৃষ্ণা হেতুই তাঁহাদিগের স্থান। এই ... ও যে কখন কখন প্রকৃত ... পাবে, দলনী তাহারই দৃষ্টান্ত। শত সহস্র রমণীতেও যাহার রূপ-তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি জন্মে না, যাহার অন্তর কাহারও প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট হয় না, প্রকৃত প্রণয়ে যে তাহারও হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করিতে পারে, মীরকাসেম তাহারই প্রমাণ স্বরূপ। দলনী যেখানে পবিত্র প্রণয়-স্বর্গের সংস্থাপন অসম্ভব, সেই খানে সেই স্বর্গ সংস্থাপন করিলেন, এ সংসারে পবিত্র প্রণয়ামৃতের আস্বাদন যে শ্রেণীর লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা সুকঠিন, সেই শ্রেণীর এক জনকে সেই অমৃত পান করাইয়া দেখাইলেন কেবল মাত্র রূপ হইতে প্রকৃত প্রণয় কত অধিক সুখকর, যে ভূমে সুস্বচ্ছস্নিগ্ধ-সলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয় না, সেই ভূমে সেই স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করিলেন যে মরুভূমে সুশ্যাম নয়নরঞ্জন মনোরম বনরাজির শোভা-সন্দর্শন ঘটে না, সুশোভন হৃদয়-প্রফুল্লকর কুসুম শ্রেণী বিরাজিত উদ্যানাবলি যে মরুভূমের শোভা সংবর্দ্ধন করে না, সেই মরুভূমে সেই বনরাজির সৃষ্টি করিলেন, সেই উদ্যানাবলি রচিলেন; যে স্থানে পারিজাত প্রস্ফুটিত হয় না, সেই স্থানে পারিজাত প্রস্ফুটিত করিয়া সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ নবাবের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইয়া উঠিল। দলনী শুনিলেন যুদ্ধ বাঁধিলে মীরকাসেমের অধঃপতনই নিতান্ত সম্ভবপর। স্নেহময়ীর কোমল মন স্বামীর অমঙ্গল-চিন্তায় ব্যথিত হইল; স্বামীর

অনিষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহার উদ্বেগের সীমা রহিল না; যাহাতে এ যুদ্ধ না হইতে পারে তাহাই তাঁহার একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিল। তিনি শুনিলেন গুরগণ খাঁ এ যুদ্ধে প্রধান উদ্যোগী। গোপনে গুরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মিনতি করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবেন মনে মনে এই কল্পনা করিলেন। পতিগতপ্রাণা রমণী স্বামীর হিতচিন্তায় এত দূর নিমগ্নচিত্তা হইলেন, যে তিনি যে দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহাতে যে তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতে পারে, এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে অধিকার লাভ করিতে পারিল না; স্বকীয় ইষ্টা-নিষ্টের মঙ্গলামঙ্গলের ভাবনা স্বামি মঙ্গল-চিন্তায় নিমজ্জিত হইল। তিনি গুরগণ খাঁকে পত্র লিখিয়া রাত্রিযোগে কুল্‌সম সঙ্গে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া গুরগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কাঁদিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন তিনি চারিদিক্‌ অন্ধকার দেখিতেছেন। গুরগণ খাঁ তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীরকাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন—আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।" দল-নীর চক্ষু আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে মীরকাসেম আমার স্বামী?" গুরগণ অধিকতর বিস্মিত হইলেন; ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলি-লেন, "না বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে। আমার ভরসা আছে তুমি একদিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুর জাহান হইবে।" দলনীর চক্ষু অধিকতর আরক্ত হইল, তিনি ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিতে লাগিলেন, "তুমি নিপাত যাও! অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের যে স্নেহ দয়া ধর্ম্ম আছে তাহা তুমি জান না। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও ভালই, নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই? আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রু-সম্বন্ধ। আমি জানিব যে তুমি আমার পরম শত্রু। তুমিও জানিও আমি তোমার পরম শত্রু। এই রাজান্তঃ-পুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহি-লাম।" দলনী-চরিত্রে এইখানে আমরা প্রথম তেজ দেখিতে পাই, আর দেখি যখন তিনি নরাধম মহম্মদ তকিকে পাদা-ঘাত করিয়াছিলেন। এ তেজ পতিপ্রাণা সতীদিগের স্বভাবসিদ্ধ। পতিপ্রাণা নারী-দিগের এ তেজ দেখিতে অতি সুন্দর, ইহা তাঁহাদিগের ভূষণ স্বরূপ, এ তেজের কর্ক-শতাও মধুর ভাব ধারণ করে। দলনী এইরূপে গুরগণকে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; বাহিরে গিয়া চিত্ত-বেগ কিঞ্চিৎ শমিত

হইলে ভাবিলেন, যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইল না; অধিকন্তু সেনাপতিকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেলেন। তিনি ক্রোধ পরবশ হইয়া অধিকতর অনিষ্ট ঘটাইতে পারেন। এই ভাবিয়া সেনাপতি কর্ত্তৃক নিজ অপমান ক্ষণকালের জন্য ভুলিলেন, মীরকাসেমের জন্য আবার গিয়া কাঁদিয়া তাঁহরে পদপ্রান্তে পড়িলেন, আপনার রাগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, মীরকাসেমের কোন অনিষ্ট ঘটিলে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। বলিলেন "আমায় রক্ষা করুন—ভগিনী বধ করিবেন না। আমায় রক্ষা করুন। যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন।" ধন্য দলনী—! স্বামি-হিত-চিন্তায় আপনার মানাপমান, ইষ্টানিষ্টের কথা ভুলিয়া যাওযায় আপনার প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হওয়ায়, যে মহত্ত্ব, তাহা তোমারই ছিল। তোমার ন্যায় হৃদয়ের যে অধিকারী, তাহার রাজপদের প্রয়োজন কি? নির্দ্ধন হইয়াও যদি কেহ ধনিনাম পাইতে পারে, সে কেবল তোমারই ন্যায় হৃদয়-ধনের অধিকারী হইলে। শৈবলিনী! তোমারও প্রেমানুরাগ গভীর এবং উচ্চ; সেই প্রেমানুরাগের জন্যই তুমি রত্ন বলিয়া আদৃত হইবার উপযুক্ত; কিন্তু তুমি দলনীর নিকট দাঁড়াইতে পার না, দলনী তোমা অপেক্ষা অনেক মহৎ। তুমি উজ্জ্বল বট, দলনী অপেক্ষাও বরং তোমাকে উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দলনীর মূল্য তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক। দলনী দেখিলেন কাঁদিয়া পদপ্রান্তে পড়িয়াও, তাঁহার পাষাণ-হৃদয় ভ্রাতার মনে দয়ার উদ্রেক করিতে পারিলেন না। দেখিয়া বিষণ্ণ হইযা ক্ষুব্ধ মনে প্রস্থান করিলেন; যাইবার সময় ভ্রাতাকে বলিয়া গেলেন, "আপনি সাবধান থাকিবেন। আমাকে আপনার শত্রু করিবেন না। আত্মরক্ষার্থ আমি আপনার শত্রুতা করিতে পারি।" দলনী প্রস্থান করিলে গুরগণ ক্ষণেক চিন্তা করিলেন বুঝিলেন দলনী মীরকাসেমের, তিনি দেখিলেন এখন দলনীর নবাবান্তঃপুরে অবস্থানে তাঁহার কোন ইষ্ট হইবার সম্ভব নাই, অনিষ্ট হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব দলনীকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন মনে করিলেন। নীচ স্বার্থের বশ হইয়া তিনি এই রমণী-রত্নের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তুরঙ্গারোহণে দ্রুতগতি দুর্গদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার হুকুমেই প্রহরী দলনীকে দুর্গের বাহির হইতে দিয়াছিল, তিনিই দলনীকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধ করিলেন, ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে দলনী ও কুল্‌সম্‌কে বলিলেন আমি তোমাদের দুর্গ প্রবেশ নিষেধ করিয়া আসিয়াছি। দলনী ছিন্নলতিকার ন্যায় ঢলিয়া পড়িবেন; কাঁদিয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না।" গুরগণ তাঁহাকে তাঁহার কোন অনুচরের গৃহে রাখিতে চাহিলেন, দলনী তাহার প্রত্যুত্তরে যাহা বলা উচিত তাহাই বলিলেন, বলিলেন 'গঙ্গা-সলিল-গর্ভে

আমার স্থান হইবে।' এই প্রত্যুত্তরে গুরগণ চলিয়া গেলেন। দলনী নিতান্ত বিহ্বল হইয়া 'কুল্‌সম্‌' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শৈবলিনী হইলে হয়ত এস্থলে কোন কৌশলময় পথাবলম্বন করিতেন। দলনীর সরল মন কৌশল কাহাকে বলে জানিত না। বিপদে প্রত্যুৎপন্ন মতি এবং কার্য্যে কৌশলময়তা শৈবলিনীরই ছিল, দলনীর ইহার কিছুই ছিল না। ভালবাসা ও কোমলতা ভিন্ন, দলনীর গঠনে, কবি অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করেন নাই। দলনী স্বামীর প্রতি অনন্ত-স্নেহশালিনী ছিলেন, স্বামি-ভক্তিই তাঁহার জীবনের একমাত্র সার ব্রত হইয়াছিল। তিনি মনে করিতেন স্বামীর সুখ, স্বামীর মঙ্গলের জন্যই তাঁহার জীবন,—স্বামীর সন্তোষের জন্য তিনি অম্লান চিত্তে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন। দলনী মনে মনে ভাবিলেন "এই খানেই রাত্রি প্রভাত করিব। প্রত্যুষে আমাকে অবশ্যই নবাবের নিকট লইয়া যাইবে। নবাব যদি আমার প্রাণদণ্ডে সন্তোষ লাভ করেন, তাহাই আমার শ্রেয়, তাহাই আমার জীবনের সার্থকতা। আমি কেন না এ তুচ্ছ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে সন্তোষ করিব।" অন্যরূপ পরামর্শ প্রদান না করিলে, দলনী বাস্তবিকও তাহাই করিতেন।

প্রকৃতি-বিশেষে রাগ-প্রকাশও কোমলতার ভাব ধারণ করে; প্রকৃতি-বিশেষে আদরের কথাও কর্কশ বলিয়া বোধ হয়। কাহার কাহার রাগ-প্রকাশ দেখিয়া দর্শকের ভ্রম জন্মে, সে রাগপ্রকাশ না প্রণয় প্রদর্শন। বাস্তবিকও কোন কোন প্রকৃতি স্বভাবতই এত কোমল, যে সে প্রকৃতির সে কোমলতা তাহার ক্রোধাদি কর্কশ বৃত্তির কর্কশতাকে পরাজয় করিয়া তাহাতে মধুর বেশ প্রকাশ করে ও অন্য প্রকৃতিতে যাহা মধুর, তাহা সে প্রকৃতিতে মধুর হইবেই, অন্য প্রকৃতিতে যাহা কর্কশ, তাহাও সে প্রকৃতিতে মধুর বলিয়া বোধ হয়—সে প্রকৃতি মধুরতাতেই গঠিত, সে প্রকৃতি মধুরতারই প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। দলনী এই প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাঁহার রাগ প্রকাশেও তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতা বিরাজমান। কুল্‌সমের প্রতি দলনীর রাগ প্রকাশের দৃশ্যটি আমরা এই খানে উদ্ধৃত করিব। আমিয়ট প্রভৃতি ইংরেজগণ মুঙ্গের হইতে নৌকা খুলিয়া মুরসিদাবাদ উপস্থিত হইলে, নবাবের পক্ষ হইতে তকি খাঁ আসিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। দলনী এই নিমন্ত্রণের সংবাদ পাইয়া কুল্‌সমকে বলিলেন

"কুল্‌সম! শুনিতেছ? বুঝি মুক্তি নিকট।

কু। কেন?

দ। তুই যেন কিছুই বুঝিস না। যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে তাহাদের যে নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার

ভিতর কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বুঝি আজি ইংরেজ মরিবে।

কু। তাতে কি তোমার আহ্লাদ হইতেছে?

দ। নহে কেন? এ'টা বক্তাবক্তি না হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে তাহারা মরিলে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আমার আহ্লাদ বৈ নাই।

কু। কিন্তু মুক্তির জন্য বড ব্যস্ত কেন? আমাদের আটক রাখা ভিন্ন ইহাদের আর কোন অভিসন্ধি দেখা যায় না। আমাদের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য করিতেছেনা। কেবল আটক। আমরা স্ত্রীজাতি, যেথানে যাইব, সেইখানেই আটক।

দলনী বড রাগ করিল, বলিল 'আপন ঘরে আটক থাকিলেও আমি দলনীবেগম, ইংরেজের নৌকায় আমি বাঁদী। তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে বলিতে পারিস্?'

কু। তাত বলিযাই রাখিযাছে। মুঙ্গেরে যেমন হে সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনি নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি, হে সাহেবকে ছাড়িয়াদিলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে সাহেবের কোন অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদের ও অনিষ্ট ঘটিবে; নহিলে ভয় কি?

দলনী আরও রাগিল, বলিল, 'আমি তোর হে সাহেবকে চিনি না, তোর ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাহি না, ছাড়িযাদিলেও তুই বুঝি যাইবি না?

কুলসম রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিল 'যদি আমি না যাই, তবে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাও?'

দলনীর রাগ বাড়িতে লাগিল, বলিল, 'তাও কি সাধ না কি?'

কুলসম্ গম্ভীরভাবে বলিল,'কপালের লিখন কি বলিতে পারি?'

দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, বড জোরে একটা ছোট কিল উঠাইল, কিন্তু কিলটি আপাতত পুঁজি করিয়া রাখিল—ছাড়িল না। * . * * দলনী আপন কর্ণের নিকট সেই কিলটি উত্থিত করিয়া কৃষ্ণকেশগুচ্ছ সংস্পর্শে যে কর্ণ, সভ্রমর প্রস্ফুট কুসুমবৎ শোভা পাইতেছিল, তাহার নিকট কমলকোরক-তুল্য মুষ্টি স্থির করিয়া, বলিল, 'তোকে আমিয়ট দুই দিন কেন ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, সত্য কথা বল তো?'

কু। সত্য কথা বলিয়াছি, তোমার কোন কষ্ট হইতেছে কি না—তাহাই জানিবার জন্য। সাহেবদিগের ইচ্ছা যত দিন আমরা ইংরেজের নৌকায় থাকি, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি।' জগদীশ্বর করুন ইংরেজ আমাদের না ছাড়ে।

দলনী কিল আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া বলিল, 'জগদীশ্বর করুন তুমি শীঘ্র মর,"

দলনীর কুলসমের প্রতি এই রাগ

প্রকাশ তাঁহার কোমল প্রকৃতির কি উপযোগী, দেখিতে কি সুন্দর। দলনীচিত্রের স্রষ্টা, দলনীকে এতই কোমল করিয়া গড়িয়াছেন,যে দলনীর রাগও কোমলতা-জড়িত বলিয়া বোধ হয়, দলনীর রাগও দর্শকের আনন্দ বৃদ্ধি করে। শৈবলিনীর সহিত দলনীর আমূল তুলনা করিলে, দলনীর এই প্রকৃতি-কোমলতা আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা একস্থলে দেখিতে পাই, দলনী পাখীর সোহাগে, বীণাবাদনে, মধুর আলাপে, কোমলতার একশেষ দেখাইতেন; অন্যত্র দেখি শৈবলিনী সন্ধ্যাকালে ভীমা পুষ্করিণীর কাল জলে গা ডুবাইয়া ফষ্টরের সহিত আলাপ করিয়া নির্ভীকতার পরিচয় দিতেছেন। একস্থলে দেখিতে পাই, দলনী বিপদে পড়িয়া সূর্য্যাতাপে নবনীতবৎ গলিয়া পড়িতেছেন; অন্যত্র দেখি শৈবলিনী সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইংরেজের নৌকা হইতে প্রতাপকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন। এক দিকে দলনীর রাগও তাঁহার প্রকৃতির কোমলতার আভা ধারণ করিয়া, আমাদের নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করে; অন্য দিকে শৈবলিনীকে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দেখাইয়া, ফষ্টরকে তাঁহার নিকট গমনে নিবৃত্ত করিতে দেখিয়া, আমরা স্তম্ভিত হই। এক দিকে স্বামীর নিগ্রহ দলনী সহ্য করিতে পারিলেন না, নিজ প্রেমে স্বামীর অবিশ্বাস হইয়াছে জানিতে পারিয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন; অন্য দিকে শৈবলিনী হৃদয়-নিষ্পেষণকারী ক্লেশ-পরম্পরা সহ্য করিয়াও হৃদয়-দাহন ভীষণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও মরিতে পারিলেন না, পুনরায় স্বামী সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন।

কোন কোন লোকের প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহারা যেন পৃথিবীকে ভাল বাসিবার জন্যই পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের ভালবাসা সর্ব্বব্যাপিনী, তাঁহারা লোক মাত্রকেই প্রীতির নয়নে অবলোকন করেন। যে কেহ একবার তাঁহাদের সহিত কোনরূপে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াছে,যে কেহ একবার তাঁহাদের সেই অনন্ত প্রেম পারাবারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেই সে অপার স্নেহের অংশ ভোগ করিতে পাবে। উচ্চ নীচ, ভাল মন্দ প্রভেদ তাঁহাদের চক্ষে নাই—কি পাপী, কি পুণ্যবান, কি সৎ কি অসৎ, কি বড় কি ছোট,তাঁহারা সকলকেই ভালবাসেন। তাঁহারা যদি কাহারও প্রতি রাগ বা ঘৃণা প্রকাশ করেন সেও যেন তাহাকে ভাল বাসিয়া, বিষবৃক্ষের কমলমণিতে এই প্রকৃতি জাজ্জল্যমান। তিনি যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই ভাল বাসিতেন, তাঁহার ভালবাসা কিছুতেই ফুরাইত না। তিনি যে রাগ করিয়া হরিদাসী বৈষ্ণবীকে ঝাঁটা ফুটাইতে গিয়াছিলেন, সেও যেন তাহাকে ভাল বাসিয়া। বস্তুতঃ কোন সময়ে কমলমণিকে রাগ প্রকাশ করিতে দেখিয়া কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই, যে কমলমণি বাস্তবিকই রাগ করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরে দলনীই ঠিক এই

প্রকৃতির। তবে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে কমলমণির এই প্রকৃতি, কবি যেরূপ প্রস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন, দলনীর তাহা করেন নাই; অথচ দলনীতে যাহা আছে তাহাতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারে যে দলনীও অনন্ত-স্নেহশালিনী ছিলেন। একেত্রে বঙ্কিমবাবু পাঠকের বোধশক্তির উপর নির্ভর করেন নাই, যাহা সৌন্দর্য্য তাহা খুলিয়া দেখাইয়াছেন; অপরে সেই সেই সৌন্দর্য্য কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তিনি পাঠককে বলিয়াছেন, 'তুমি দেখিয়া লও, ইহাতেও সেই সৌন্দর্য্য পাইবে।' বিশেষতঃ কমলমণির নিত্য প্রফুল্লতা তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী ভালবাসার প্রকৃতির সহিত যোগ দিয়া সেই প্রকৃতিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছে। দলনী কমলমণি অপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর-প্রকৃতি ছিলেন; তাঁহাতে কমলমণির চাঞ্চল্যের কিছুই ছিল না; তিনি বিষণ্ণ চিত্ত না হইলেও, কমলমণির নিত্যপ্রফুল্লতা তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই; এই জন্যই একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে না দেখিলে তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত-স্নেহমমতা উপলব্ধি করা যায় না। পশ্চাদ্গামী একখান ক্ষুদ্র নৌকা দেখিয়া নবাবের নৌকা মনে করিয়া ফষ্টর যখন দলনী ও কুল্সম্কে নামাইয়া দিবার জন্য তীরে নৌকা লাগাইলেন, তখন কুল্সম্ বলিল, "আমি নামিব না। আমি নবাবের হাতে পড়িলে আমার কপালে কি আছে বলিতে পারি না। আমি সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় যাইব—সেখানে আমার জানা শুনা লোক আছে।" দলনী বলিলেন, "তোর কোন চিন্তা নাই, যদি আমি বাঁচি তবে তোকেও বাঁচাইব।" কুল্সম্ নামিল না। সে উত্তর করিল, "তুমি বাঁচিলে ত?" দলনী অনেক বুঝাইলেন, অনেক মিনতি করিলেন, কুল্সম কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিল না। দলনী তাহার জন্য চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নৌকা হইতে নামিলেন। বাঙ্গালার রাজমহিষী সামান্য বাঁদীর জন্য কাঁদিলেন। কাঁদিবেন না কেন? তাঁহার স্বর্গীয় মন নীচ বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানিত না, তাঁহার অনন্ত স্নেহশীল মন পাত্র বাছিয়া ভাল বাসিত না—যে কেহ কোন রূপে তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ছিল, সেই তাঁহার অপরিমেয় স্নেহের অংশ ভোগ করিত।

যে প্রণয়ে রমণীকে প্রণয় পাত্রের প্রতি স্থির বিশ্বাসশালিনী করিয়া তুলে, যে প্রণয়ে রমণী প্রণয়-পাত্রের প্রেমে বা অনুরাগে সন্দেহ করিবার কারণ স্বচক্ষে দেখিলেও আপনার চক্ষুই প্রতারিত মনে করে, বিশ্বাস করে না যে তাহার প্রণয়-পাত্রের স্নেহ বা অনুরাগের হ্রাস হইয়াছে, নিজের প্রতি প্রণয়-পাত্রের নিগ্রহের নিদর্শন পাইলেও মনে করে না যে তাহার প্রণয়-পাত্র বাস্তবিকই তাহার প্রতি নিগ্রহ করিয়াছেন, বা তাহার নিজ-প্রেমে তাঁহার বিশ্বাসের কোনরূপে লাঘব

হইয়াছে—সে প্রণয় এ পৃথিবীর নহে, সে প্রণয় অপার্থিব। এ প্রণয় যাহার হৃদয়ে অবস্থান করে প্রণয় পাত্রের অনুরাগে ও অনুগ্রহে অবিচলিত বিশ্বাসই তাহার জীবন। যে দিন তাহার সে বিশ্বাসের অভাব হইবে, সেই দিন আর কেহ তাহাকে জীবিত দেখিতে পাইবে না, সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনও অস্ত হইবে। দলনী এই অপার্থিব প্রণয় লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই অপার্থিব প্রণয় তাঁহাকে স্বামীর অনুরাগে ও অনুগ্রহে স্থির বিশ্বাসশালিনী করিয়াছিল। যে দিন তিনি জানিলেন নবাব মীরকাসেম তাঁহার সতীত্বে সন্দেহ করিয়া তাঁহার প্রতি নিগ্রহ করিয়াছেন, সেই দিন তাঁহার জীবন অসহ্যভার বোধ হইতে লাগিল, তিনি আর সে জীবন বহন করিতে পারিলেন না, তকি খাঁ দলনীকে বিষপানে বধ করিবার হুকুমনামা লইয়া, বিষপাত্র হস্তে দলনীর নিকট উপস্থিত হইলেন; দলনী তকিকে নিকটে দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া, বলিলেন, "একি খাঁ সাহেব, আমাকে বেইয্যত করিতেছেন কেন?" মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন!" দলনীর বিশ্বাস হইল না, দলনী হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল?" তকি উত্তর করিল "না বিশ্বাস করেন পরওয়ানা দেখুন।"

দ।—"তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই।"

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের সহিমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন। দলনী পরওয়ানা পড়িয়া, হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? মরিবে সেই জন্য?"

মহ।—"আপনি ভীতা হইবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি।

দ।—ও হো! তোমার কিছু মতলব আছে। তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?

মহ।—তবে শুনুন। আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে আপনি আমিয়টের নৌকায় তাহার উপপত্নী স্বরূপ ছিলেন। সেই জন্য এই হুকুম আসিয়াছে।

শুনিয়া দলনী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। স্থির বারিশালিনী ললাট-গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল— ভ্রূধনুতে মন্মথ চিন্তাগুণ দিল—মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদ গণিল। দলনী বলিলেন "কেন লিখিয়াছিলে?"

মহম্মদ তকি আনুপূর্ব্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

দলনী তখন বলিলেন "দেখি পরওয়ানা আবার দেখি।"

মহম্মদ তকি পরওয়ানা আবার দলনীর হস্তে দিল। দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন। বলিলেন, 'যথার্থ বটে। জাল নহে। কই বিষ?'

'কই বিষ' শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, 'বিষ কেন?'

দ। পরওয়ানায় কি হুকুম আছে?

মহ। আপনাকে বিষ পান করাইতে?

দ। তবে কই বিষ?

মহ। আপনি কি বিষ পান করিবেন নাকি?

দ। আমার রাজা'র হুকুম আমি কেন পালন করিব না?"

* * *

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে দলনী ভূমে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যাহা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন তাহা তাঁহার হৃদয়ের, তাঁহার প্রেমানুরাগের মহত্ত্ব অতি উজ্জ্বল বর্ণে প্রদর্শন করে, তাহা হৃদয় বিদারক, তাহাতে দলনীর সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। দলনী মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন "ও রাজ-রাজেশ্বর! শাহান শাহা! বাদসাহের বাদসাহা! এ গরিব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ। বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার অমৃত! তোমার ক্রোধই আমার বিষ— তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা? হে রাজাধিরাজ—জগতের আলো—অনাথার ভরসা—পৃথিবীপতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার সাগর— কোথায়রহিলে?—আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করির— কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না,—এই আমার দুঃখ।"

দলনী বিষপান করিলেন। এ অনন্ত দুঃখান্ধকারময় সংসারে সময়ে সময়ে যে দুই একটী সুখতারা উদিত হয়, তাহার উজ্জ্বলতমের অন্যতম দলনী। সে সুখতারা খসিল—এ দুর্ভাগ্য সংসারের ভাগ্যে তাহা টিকিল না। বাঙ্গালার রাজা অযত্নে যে প্রেম-রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, আপনার বুদ্ধি-দোষে তাহা হারাইলেন। বাঙ্গালার ন্যায় শত শত রাজ্য ও যে রাজ্যের সহিত বিনিময় হইতে পারে না, অক্লেশে ও অযত্নে যে রাজ্য রক্ষা করিয়া চিরকাল যে রাজ্যের অধীশ্বর থাকিতে পারিতেন, সহজেই তাহা বিনষ্ট করিলেন। দলনী বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন; আমাদের জন্য স্মৃতিমাত্র রাখিয়া গেলেন। সেই দুঃখের স্মৃতি কত সুখের! সেই দুঃখের স্মৃতি কত আদরে হৃদয়ে পোষণ করিতে ইচ্ছা করে। শৈবলিনীর ভাগ্য প্রতীক্ষা করিয়া শৈবলিনীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিলাম, তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলাম, তাঁহার জন্য কাঁদিলাম, পরে স্বামী সঙ্গে সম্মিলিত হইতে দেখিয়া তাঁহার কথা ভুলিলাম, কিন্তু দলনীর জন্য চিরকাল কাঁদিতে হইবে—দলনীকে জীবন থাকিতে ভুলিব না। বাঁদি কুল্‌সম্‌ দলনীকে ভুলিতে পারে নাই, আমরা ভুলিব কি করিয়া?

ভারতে ব্রিটীষাধিকার।

পুত্র হিন্দুদিগের অন্তিমে অনন্ত সুখ পাইবার প্রধান উপায়। পুত্র যেমন ইহলোকে জনক জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করে, তেমনি পরলোকেও তাহাদিগকে পুন্নাম নরকের হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিয়া শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা সম্প্রীত করে। হিন্দুগণ এজন্য ঔরস পুত্রের অভাব হইলে যথানিয়মে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদের বংশ রক্ষণ ও শেষের নরক যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় বিধান করেন। এই গৃহীত পুত্র ঔরস পুত্রের ন্যায় শাস্ত্রানুসারে পিতার সমস্ত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে। ব্রিটীষগবর্ণমেণ্ট এই দত্তক পুত্রের গ্রহণ সম্বন্ধে একটী বিধি প্রচারিত করেন। যে সমস্ত রাজ্য সর্ব্বোপরিতন প্রভু শক্তির আশ্রিত, সেই সমস্ত রাজ্যের অধিপতিগণ ঔরস পুত্রের অভাবে যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রভু শক্তির অনুমোদিত না হইলে উক্ত দত্তক-পুত্র বিধিসম্মত পুত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে না, এবং সে গ্রহীতা পিতার কোন সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবে না। এ অবস্থায় সেই রাজ্যাধিপতির রাজ্য সম্পত্তি উক্ত সর্ব্বোপরিতন প্রভু শক্তিতে উপগত হইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়াদি এই বিধির অধীন নহে। উচ্চতম প্রভু শক্তি সম্মত হউন বা না হউন, উহা কখনও দত্তকের বস্তুচ্যুত হইবে না। ভারতবর্ষের এই উচ্চতম প্রভুশক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর অদম্য ব্রিটীষগবর্ণমেণ্ট, আশ্রিত রাজ্য সেতারা ঝান্সী প্রভৃতি। এই আশ্রিত রাজ্যের অধিপতিগণ যে সমস্ত দত্তক গ্রহণ করেন, তাহা প্রভুশক্তির অনুমোদিত না হওয়াতে তাঁহাদের রাজ্য কোম্পানীর "মুল্লুক" হইয়া যায়।

সেতারা মহাবলেশ্বর পর্ব্বতের শীতল চ্ছায়ায় অবস্থিত। প্রসন্নসলিলা কৃষ্ণার পবিত্র জল প্রপাত ইহার পাদদেশ বিধৌত করিতেছে। অদূরে স্নিগ্ধ-হৃদয়া ভীমা ও নীরার অনুচ্চ শ্যামল তটদেশ ইহার আলেখ্যবৎ রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সেতারার রাজা আপাসাহেবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যায় তিনি একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা প্রতাপ সিংহ ইহার পূর্ব্বে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। রাজ্যচ্যুতির পর তিনিও একটী দত্তকের পিতৃস্থানীয় হয়েন। লর্ড ডেলহৌসী এই উভয় দত্তক গ্রহণই অসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ পূর্ব্বক সেতারা ব্রিটীষ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

পররাজ্য গ্রহণ সম্বন্ধে ব্রিটীষগবর্ণ-

মেন্টের অনুমোদিত এই একটী দ্বিতীয় ঘটনা। ন্যায়ের অনুরোধে আমরা এ কার্য্যেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন করিতে পারিতেছি না। ব্রিটীষ সিংহ পশ্চিম ঘাটের শিখরা-শ্রয়ী হইয়া ১৮১৯ অব্দে তদানীন্তন সেতারাপতি প্রতাপ সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। সেতারারাজ সন্ধিবদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ দেখাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সন্ধির ২০ বৎসর পরে (১৮৩৯ অব্দে) গোয়ার পর্তুগীজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া সেতারাপতি প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হয়। প্রতাপ সিংহ আরোপিত দোষ ক্ষালনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার অপরাধের বিচার কার্য্যও যথা পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইল না। বিনা আইনে বিনা বিচারে, রাত্রিকালে প্রতাপ সিংহকে নগর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী এক-খানি সামান্য পশু রাখিবার কুটীরে আবদ্ধ করিয়া পরে বারানসীতে নির্ব্বাসিত ও তাঁহার ধন সম্পত্তি অধিকার করা হইল। প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা আপা সাহেব পেশোয়া বাজীরাওর হস্তে বন্দীস্বরূপ ছিলেন, ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া সেতারার গদিতে আরোহিত করিলেন।

ইঁহারা যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন তাহা লর্ড ডেলহৌসীর মতানুসারে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের সম্মত বা অনুমোদিত হয় নাই। সুতরাং নিয়ম অনুসারে এই দত্তক সেতারার গদির অধিকারী হইতে পারে না। সর্ব্বোপরিতন প্রভুশক্তির অনুমোদন ব্যতিরেকে কাহারও কোন দত্তক গ্রহণ বিধিসিদ্ধ হয় না। লর্ডডেলহৌসী যুক্তি দেখাইয়া ১৮৭৯ অব্দের মিনিটে উল্লেখ করিয়াছেন, "সেতারারাজ কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া পরলোক গমন করাতে উক্ত রাজ্য ব্রিটীষ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইল।"

বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টর সভা ১৮৪৯ অব্দের ২৪লা জানুয়ারি ডেলহৌসীর পক্ষ সমর্থন করিলেন। তাহাদের মতানুসারেও ডেলহৌসীর প্রদর্শিত হেতুবাদ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং ডেলহৌসীর লিখিত সেতারার ললাটলিপি ডিরেক্টার সভার লেখনীর আঘাতে বিপর্য্যস্ত না হইয়া অটল হইয়া গেল।

লর্ড ডেলহৌসী যে ভাবে উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া সেতারা রাজ্য ব্রিটীষ কোম্পানীর অধিকারস্থ করিয়াছেন, তাহা সন্নীতির কত দূর অনুমোদিত হইয়াছে বলিতে পারি না। ১৮১৯ অব্দে যে সন্ধি হয়, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট বন্ধুত্ব বন্ধন জন্য সেতারা রাজ্য চিরকাল প্রতাপ সিংহের বংশধরগণের অধীনে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডেলহৌসী এই প্রতিশ্রুতি এই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া সেতারায় ব্রিটীষ পতাকা উড্ডীন করেন। সত্য প্রতাপ সিংহ রাজ্য-ভ্রষ্ট

হইয়া দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্য রাজা ভ্রষ্টের গৃহীত বলিয়া ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট এই দত্তকের প্রতি অনাস্থা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু আপা সাহেবের সম্বন্ধে ঈদৃশ কোন বিধি-বিপর্য্যয় ঘটে নাই। আপা সাহেব সেতারার গদির অধিকারী থাকিতেই যথা নিয়মে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি কোন্ বিধান অনুসারে তাঁহার এই দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ প্রতিপন্ন হইল, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

১৮১৯ অব্দে প্রতাপ সিংহকে রাজ্য দিবার সময় গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্য প্রতাপ সিংহের বংশধরদিগের অধীনে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা আপা সাহেবকে সেতারার গদিতে স্থাপিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেখাইয়াছেন যে প্রতাপ সিংহের পুত্রগণ ব্যতীত উক্ত বংশের অন্য শাখার ব্যক্তিগণও সেতারা রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিবে। ১৮৪৭ এবং ১৮৪৮ অব্দে প্রতাপ সিংহ ও আপা সাহেব এই উভয় ভ্রাতার মৃত্যু হইলে ইঁহাদের গৃহীত দত্তকদ্বয় সেতারার গদির প্রার্থী হয়েন। এতদ্ব্যতীত জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ বিশিষ্ট অনেক ব্যক্তি উক্ত গদির প্রার্থী ছিলেন। ব্রিটীষ রেসিডেণ্ট ফ্রিয়ার সাহেব ইহাদের সম্বন্ধে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন "ইঁহাদের কেহই ভূতপূর্ব্ব রাজা ও তাঁহার ভ্রাতার গৃহীত দত্তকদ্বয়ের স্বত্বের ন্যায় আপনাদের স্বত্ব সমান বলবৎ বিবেচনা করেন না, যেহেতু ইঁহাদের বিশ্বাসানুসারে এই উভয় দত্তকই বিধি-সিদ্ধ প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যদি দত্তক গ্রহণ না করা হইত, তাহা হইলে অনেকে সেতারার গদি পাইবার নিমিত্ত আপনাদের স্বত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন। এবং যদি ইহারা এই দত্তক দ্বয়ের অসিদ্ধতার বিষয় শ্রবণ করেন, তাহা হইলেও এক্ষণে সম্ভবতঃ আপনাদের স্বত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন। উপস্থিত বিষয়ে আমি যতদূর বিচার করিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই বোধ হইয়াছে যে, ইহাদের যে কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষের যে কোন প্রকাশ্য বিচারালয়ে আপনাদিগকে ভূতপূর্ব্ব রাজার ঘনিষ্ট আত্মীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন। যদি কোন রকম উত্তরাধিকারী না থাকে তাহা হইলেই আমাদের গবর্ণমেণ্ট সন্ধির সহিত একতা রাখিয়া সেতারার গদি লইবার দাওয়া করিতে পারেন।" কিন্তু লর্ড ডেলহৌসী উপস্থিত বিষয় বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে, যদিও ১৮১৯ অব্দের সন্ধিতে ভারতবর্ষীয় প্রথানুসারে দত্তক পুত্রদিগকে উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তথাপি দত্তকগণ উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। উত্তরাধিকারী কেবল পুত্র প্রভৃতি অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘনিষ্ট-রক্ত-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই বুঝাইবে। ডেলহৌসীর এই মতানুসারে তৃতীয় উইলিয়ম দ্বিতীয় জেম্সের উত্তরাধিকারী নহেন এবং কুইন বিক্টোরিয়াও চতুর্থ উইলিয়মের উত্ত-

রাধিকারী নহেন, যেহেতু ইহাঁদের কেহই পূর্ব্ববর্ত্তীর সহিত অব্যবহিত-ঘনিষ্ট বক্ত-সম্বন্ধ বিশিষ্ট নহেন। সুতরাং দ্বিতীয় জেমস্ বা চতুর্থ উইলিয়মের উত্তরাধিকারীর সহিত যে সন্ধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা তৃতীয় উইলিয়ম বা কুইন বিক্টোরিয়াতে বর্ত্তিতে পারে না।

লর্ড ডেলহৌসীর পৃষ্ঠ পূবকগণ যে সমস্ত যুক্তি অবলম্বন করিয়া সেতারা গ্রহণের সমর্থন করিয়াছেন, আমরা তৎসমুদয়ের অনুমোদন করিতে পারি না। ডিউক অব্ আর্গাইলের মতে ডিরেকটার সভার প্রায় সমুদয় সভ্যই ডেলহৌসীর প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছিলেন, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী মেজর ইভান্স বেল স্পষ্ট দেখাইয়াছেন ডিরেক্টারের অনেকে এই মতে সায় দেন নাই। টুকর, সেফার্ড, মেল্ভিল্ অলিফাণ্ট,কল্ফিও ইহাঁরা সকলেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। আর্গাইল অন্যস্থলে লিখিয়াছেন, "উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে কেবল লর্ড ডেলহৌসীই যে এই সমস্ত রাজ্য ব্রিটীষ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভূক্ত করিতেন এমন নহে, ইহার পূর্ব্বেও অধিকারি-শূন্য সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা বিহিত আছে। ডেলহৌসীর অন্যতম বন্ধু সার চার্লস জাক্সনও এই মতের এক জন প্রধান পরিপোষক। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রদেশীয় রাজাদিগের উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে তদীয় রাজ্য গ্রহণ-বিষয়িণী বিধি লর্ড ডেলহৌসীর সৃষ্ট নহে। ইহা পূর্ব্বাবধিই চলিয়া আসিতেছে। ডেলহৌসী এই চির-প্রচলিত আইনের অনুসারী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধায়ী ইভান্স বেলের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে ইহাও অসত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বেল স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ১৮৪৮ অব্দে সেতারা গ্রহণের সময়েই এই আইন অনুসারে কার্য্য হইয়াছিল। তিনি দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, লর্ড ক্যানিং মহারাজ সিন্ধিয়া এবং কাশ্মীর ও বেওয়ার অধিপতি প্রভৃতির দত্তক গ্রহণের অনুমোদন করিয়াছিলেন বিখ্যাত টাইমস্ পত্রও বিশেষ ন্যায় সঙ্গত বলিয়া লর্ডক্যানিঙ্গের এই কার্য্যের সমর্থন করেন। ক্যানিং ১৮৬০ অব্দের ২৬এ এপ্রেল ও ১০ই মে তারিখে যে শাসন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করেন এবং সর চার্লস উড (লর্ড হালিফাকস্) ২৬এ জুলাই তারিখে যে উত্তর দেন. তাহাতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, "উচ্চতম প্রভুশক্তি জাইগীর দার অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর প্রত্যেক রাজ্যাধিকারীর রাজ্যই স্থায়ী দেখিতে ইচ্ছা করেন। যদি ইহাঁদের মধ্যে কাহারও ঔরষ পুত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে হিন্দু আইন (যদি তিনি হিন্দু হয়েন) ও জাতীয় রীতি অনুসারে অন্য উত্তরাধিকারী গ্রহণ বিধি-সিদ্ধ বলিয়া অনুমোদিত হইবে।

ইভান্স বেলের ন্যায় নর্টন লাড্লো প্রভৃতি মনস্বী লেখকগণের লিখা ভঙ্গীতেও

স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়,যে বিধি অবলম্বন করিয়া সেতারা গ্রহণ করা হইয়াছে পূর্ব্বে তাদৃশ কোন বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। লর্ডডেলহৌসীর সময়ে—১৮৪৮ অব্দে সেতারা গ্রহণের সময়েই ব্রিটীষ ইণ্ডিয়ায় এই অসঙ্গত ব্রিটীষ নীতির কার্য্য দৃষ্ট হয়। অধিক কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর তদানীন্তন গবর্ণর সার জর্জ্জ ক্লার্কের ন্যায় রাজপুরুষও এই রাজনীতির প্রতিবাদ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। সার জর্জ্জ এবিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন"কোন ব্যক্তি বা তাহার দায়াদ এবং উত্তরাধিকারীর সহিত সন্ধিসম্মত চিরন্তন বন্ধুত্বের বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, যাহাদের সহিত সন্ধি হইয়াছে তাঁহাদের রীতি অনুসারে যে পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারীর অভাব দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য সম্পত্তি গ্রহণ করা ন্যায় সঙ্গত নহে। সেতারা রাজ এক্ষণে যে বালককে দত্তক পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, নিয়ম অনুসারে সেই বালকই তদীয় রাজ্যের এই প্রকার উত্তরাধিকারী।"

এডুইন আর্ণোল্ড লর্ড ডেলহৌসীর ব্রিটীষ ইণ্ডিয়া শাসনের সমালোচন করিতে গিয়া সেতারা গ্রহণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"নীরা ও ভীমা নদীর রমণীয় তট ও ফল সম্পত্তিশোভী মহাবলেশ্বর পর্ব্বতের সহিত বহুমূল্য কিন্তু বিধি বহির্ভূত পুরস্কার স্বরূপ সেতারা রাজ্য ব্রিটীষ ইণ্ডিয়া ভুক্ত হইল। প্রতাপ সিংহ স্বীয় অসৎ ব্যবহার নিবন্ধন গদিচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপাসাহেব আমাদের বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রশংসার্হ শাসন কর্ত্তা বলিয়াও সর্ব্বত্র পরিচিত। সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহার বিশেষ আস্থাছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয় দূরে থাকুক এস্থলে কেবল আইনের অধিকার লইয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই আইন লইয়া বিচার করিলে সেতারা গ্রহণ করিতে আমাদের কি অধিকার আছে? সেতারায় কোনরূপ অত্যাচার বা অরাজকতার অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। এস্থলে লর্ড ডেলহৌসী ও তাঁহার বিলাতী বণিক প্রভুগণ এই হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন, "সেতারা একটী অধীন রাজ্য এবং কলিকাতা তাহার শাসন বিধাত্রী প্রভুশক্তি।" যদি এইরূপ প্রভুশক্তি সম্পন্ন বলিয়া কলিকাতা প্রচারিত বিধি সেতারার স্বাধীনতা হরণ করে যদি সেতারা সিন্ধিয়া ও হুলকারের রাজ্য অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর হয়, তাহা হইলে ব্রিটীষ কোম্পানীর ১৮১৮ অব্দের ঘোষণা পত্রের অর্থ কি?

"কোম্পানী ১৮১৮ অব্দের ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, "সেতারার রাজা রাজীবাওর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবেন।" ঘোষণাপত্রের এই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার স্বরূপ ও অর্থ কি? প্রতাপ সিংহের রাজ্যচ্যুতির পর আপাসাহেবকে গদি দেওয়াতে আমরা অবশ্যই সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে রাজত্বের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম, নচেৎ আপাসাহেবকে স্বাধীন রাজা বলিয়া সম্মান করিবার সার্থকতা কি? কিন্তু আপাসাহেবের মৃত্যুর পর আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই অর্থের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলাম। কিরূপে ঈদৃশ ব্যবহারের সামঞ্জস্য হইল? প্রতাপ সিংহ রাজা থাকিতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন নাই, এজন্য আমরা সেই দত্তককে রাজা স্বীকার করিতে বাধ্য না হইতে পারি। কিন্তু আপাসাহেবের দত্তক পুত্রের সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। যদি বনিক কোম্পানীর বিবাদ পত্র (charter) উপস্থিত করা যায় তাহা হইলে আমরা এই দত্তক পুত্রকে বিধি সঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। যদি মতের গুরুত্ব রক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমরা বাধ্য, এবং যদি নীতির অনুসরণ করি, তাহা হইলেও আমরা বাধ্য। যে কার্য্য কখনও পর্য্যুদস্ত হইবে না, তাহার নিমিত্ত বিশেষ লজ্জিত হইয়া বলিতে হইতেছে যে সত্যবাদী ও সাধু ব্যক্তি আমাদের ন্যায় অবশ্যই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।"

আর একজন অপক্ষপাত লেখক এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "কোন ইংলণ্ডীয় ভূস্বামী কোন একটী (copyhold) ভূমি হস্তান্তরিত করিবার সময়ে নিয়মিত জরিমানা গ্রহণে অসম্মত হইয়া সেই ভূমি আত্মসাৎ করিলে যেমন দেখায় উচ্চতম প্রভুশক্তি দত্তক গ্রহণে সম্মতি না দিয়া সমস্ত রাজ্য সম্পত্তি অধিকার করিলে তেমনি দেখাইয়া থাকে। ইহা কদাচিৎ সময়ান্তরাল ঘটনা হইতে পারে, যেহেতু এরূপ ঘটনা সচরাচর সঙ্ঘটিত হয় না। ভারতবর্ষে কেবল ইংরেজগণই প্রকাশ্যভাবে এইরূপ অবৈধাচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যে কার্য্যে অসহিষ্ণু হিন্দু ও মুসলমান যথেচ্ছাচারিগণ অপরাধী হন নাই; একজন ইংরেজ গবর্ণর জেনারেল সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত হিন্দু ও মুসলমান যথেচ্ছাচারিগণও লজ্জিত হইতেন, এবং তাঁহারা কখনও ইহার সমর্থনে অগ্রসর হইতেন না।"

অপক্ষপাত লেখকের অপক্ষপাত লেখনী হইতে এইরূপ সার-গর্ভ বাক্য বহির্গত হইয়াছে। ন্যায় পরায়ণ মনস্বিগণ এইরূপ ন্যায় সঙ্গত যুক্তির উল্লেখ করিয়া অস্থায়ী জীবলোকে সত্যের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়াছেন। ন্যায়ের ঈদৃশ গভীর ধ্বনি কখনও নীরব হইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই এরূপ গভীর যুক্তি এরূপ গভীর ন্যায় বুদ্ধি ডিরেকটার সমাজের মস্তিষ্কে নীত হয় নাই। সুতরাং কলিকাতার লর্ড ডেলহৌসীর মুখ হইতে যে স্বর সমুত্থিত হয়, তাহাই লিডনহল ষ্ট্রীটে প্রতিধ্বনিত হইয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলে। সেই অবধিই যোগরত ভারতীয় আর্য্যতাপসগণের গভীর জ্ঞানের চিহ্নস্বরূপ ভারতমান্য শ্রুতি ও স্মৃতির হৃদয়ে কুঠারাঘাত আরম্ভ হইল, এবং সেই অবধিই ব্রিটীষ রাজনীতিজ্ঞগণের উদ্ভাবিত

দত্তক গ্রহণের অসিদ্ধতা সমর্থক আইনের বলে মিত্র রাজ্য সমূহ ভারত মানচিত্রে লোহিত রেখায় অঙ্কিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

বঙ্গীয় কবি।

১ম প্রস্তাব। বর্ত্তমান সময়।

বাঙ্গালি নিতান্ত কোমল প্রকৃতি, বাঙ্গালির শিক্ষারও শৈশবাবস্থা। অল্পকাল হইল বঙ্গভাষার তমসাচ্ছন্ন নিশীথিনীর অবসান হইয়াছে, তাই বঙ্গবাসীর লেখনী হইতে অদ্য বালমুখ নির্গত অর্দ্ধ পরিস্ফুট বচন লহরীর ন্যায়, প্রভাতের রমণীয় মধুর কোমল শিশির বিন্দু সদৃশী; মনোরঞ্জিকা মধুর সরস-বচন বহির্গত হইতে লাগিল। বাঙ্গালির অধ্যবসায় নাই, বাঙ্গালি সহিষ্ণুতা শিখে নাই, তাই তাহারা বিজ্ঞানের পথ অনুসরণ করিল না। বাঙ্গালি পুনঃ পুনঃ নিস্ফল হইয়া কি প্রকারে উদ্যম ও উৎসাহ রক্ষা করিতে হয় তাহা শিখে নাই—বাঙ্গালি দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বলীয়ান্ হইয়া, বিঘ্নসঙ্কুল, পথ পরিষ্কার করিয়া, দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর অনুসন্ধানব্রতে রত থাকিতে শিখে নাই—সুতরাং বাঙ্গালি, জাতীয় সাহিত্যের প্রথম উদ্দীপনাতে, আয়াসময় বিজ্ঞানের পথে ধাবমান হইল না। তাহারা সরসকোমল কবিতা ও রমণীয় চিত্তরঞ্জক উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। তাই আজি বঙ্গদেশ কবিতাতে ও উপন্যাসে প্লাবিত।

আমরা দেখিতে পাই যে কোন দেশে সাহিত্যের উদ্দীপনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ষোড়ষ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে ঘোর আন্দোলন ও বিতণ্ডায় সমুদয় ইংলণ্ড ও ইউরোপ বিলোড়িত হইয়াছিল তাহা হইতেই বোধ হয়, এলিজেবেথ এবং জেমসের রাজত্বকালীন অদ্ভুত কবিত্বতরঙ্গ উদ্ভুত হইয়াছিল। পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, রাজ্যশাসন প্রণালী নূতন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইল, পুরাতন পদ্ধতির সংস্কার হইল—এবং কিছুকাল পরেই ইংলণ্ডের সাহিত্যের দ্বিতীয় উদ্দীপনা লক্ষিত হইল, এবং মধুময়ী লেখনীনিঃসৃত রচনায় পাঠকদিগের মন পুলকিত হইতে লাগিল। পরিশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে যে মহাবিপ্লব ইউরোপ ভাসাইয়া দিয়া গেল—ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মসংস্কারের (Reformation) ন্যায় ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া গেল—তাহা হইতে বোধ হয় কতক পরিমাণে ইংলণ্ডের কবিত্বের মধুময় বসন্তকালের আবির্ভাব হইয়াছে।

ইংলণ্ডের সাহিত্যের তিনবার উদ্দীপনা হইল। তিনবারই এই উদ্দীপনার তরঙ্গ বিদেশ হইতে আসিল—এলিজেবেথের সময় ইটালি হইতে; এনের সময়, ফরাসী দেশ হইতে; বর্ত্তমানকালে জর্ম্মাণি হইতে।

আমাদিগের দেশের সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, আধুনিক সমকালীন বহুল কবিকুলের আবির্ভাবের বিষয় মনে করিলে, ইহা প্রতীয়মান হইবে যে অস্মদ্দেশীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনই তাহার এক প্রধান কারণ। ইংলণ্ডে যেমন আধুনিক উদ্দীপনা জর্ম্মণীদেশ হইতে আসিয়াছে, তেমনি আমাদিগের সাহিত্য ইংলণ্ড কর্ত্তৃক উদ্বোধিত হইয়াছে। আমাদিগের আধুনিক কবিগণ ইংরাজী ভাষাকে আদর্শ করিয়া, ইংরাজি সাহিত্য অবলম্বন করিয়া, তাহার সৌন্দর্য্য রাশি একত্র করিয়া, স্বদেশীয় ভাষায় প্রতিফলিত করিতেছেন। মধুসূদন যদিও বিবিধ ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, যদিও বিবিধ সুগন্ধি কুসুমরাশি একত্র করিয়া অপূর্ব্ব কুসুমহার রচনা করিয়া বঙ্গভাষার কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছিলেন—তথাপি, ইংরাজ শাসনগুণে, তদ্‌গ্রন্থিত মাল্যে ইংরাজ সাহিত্য-কুসুমোদ্যানের প্রসূনরাজি বহুল পরিমাণে উপলক্ষিত হয়। ইংরাজী ভাষার নিকটে হেমচন্দ্র কতদূর ঋণী তাহা তিনি স্বয়ংই তাঁহার বৃত্রসংহারের ভূমিকাতে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের রচনা পাঠ করিলেই স্পষ্টতঃ বোধ হয় যে তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি বার্ণকে আদর্শ করিয়া লিখিয়াছেন,—এমন কি তিনি কখন কখন বাইরণের অনাবৃত অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। মহাকবি মাইকেল যতদিন জীবিত ছিলেন তত দিন তিনি স্বদেশীয় কবিত্ব রাজ্যে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। পরে, সেই অসাধারণ প্রতিভাশালী অলৌকিক কবিত্বশক্তি সম্পন্ন মাইকেলের মৃত্যুর পর, দুই জন কবি তাঁহাদিগের কবিত্ব তরঙ্গোচ্ছাসে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে যখন একজনের যশ বঙ্গদেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল—যখন তাঁহার কবিতা সকল বঙ্গদেশের সুদূর প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তখন অন্য জন বঙ্গদেশের এক অজ্ঞাত তিমিরাচ্ছন্ন বিভাগের একটী অপরিচিত শিশু মাত্র—তখন এই শিশু বঙ্গসাগরতরঙ্গাহত, শৈলশিখরে কল্পনা দেবীর কোমল ক্রোড়ে পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। অল্পকাল মধ্যেই, এই বালক কবিতাদেবীর একজন সিদ্ধ উপাসক তাহা প্রতীয়মান হইল। কিছুকাল পরেই কোমলকলনাদী কবিত্বতরঙ্গময়ী "অবকাশরঞ্জিনী" প্রকাশিত হইল; সকলেই বিস্মিত হইয়া ইহা পাঠ করিলেন, এবং ইহার সুমধুর প্রাণাকুলকারী ক্রন্দন ধ্বনি নিবিষ্টমনে শুনিয়া বিহ্বল হইলেন। কয়েক বৎসর পরে, ইনি আর একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিলেন। তাহাতে ইহাঁর খ্যাতি আরও উজ্জ্বল

হইল এমন কি, কেহ কেহ বলিলেন যে নবীন কবি প্রবীণ কবির সমতুল্য। আমরা এক্ষণে এই বিষয়টী বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

হেমবাবু "কবিতাবলী" লিখিয়াছেন, নবীনবাবু "অবকাশরঞ্জিনী" লিখিয়াছেন। হেমবাবু "বৃত্রসংহার" লিখিয়াছেন, নবীন বাবু "পলাশীর যুদ্ধ" লিখিয়াছেন। ইহা ভিন্ন দুই জন অন্য অনেকগুলি কবিতাও লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উৎকৃষ্ট কবিতা উল্লেখ করিতে হইলে এই চারি পুস্তকের নাম করিতে হয়।

আমরা উভয়েরই রচনাবলী সানন্দে পাঠ করিয়াছি। উভয়ই কবিত্ব সম্বন্ধে দেবানুগৃহীত ব্যক্তি তাহা অনুমাত্র সন্দেহ করি না। কিন্তু যদি তাঁহাদের কবিতার তারতম্য করিতে হয়, যদি তাঁহাদের গ্রন্থের তুলনায় সমালোচনা করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগের অবশ্যই বলিতে হইবে যে হেম বাবুর লেখাতে যত তেজ, যত শক্তি, যত গাম্ভীর্য্য আছে, তাহা নবীন বাবুর কবিতাতে দৃষ্ট হয় না। নবীন বাবুর কবিতা মিষ্ট এবং কোমল, হেম বাবুর কবিতা গম্ভীর এবং তেজস্বী যখন নবীন বাবুর কবিতা পড়ি তখন যেন।

"——মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ
পরিমল বায়ু রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী মরি! মনোহর যথা
বাঁশরী স্বরলহরী গোকুল বিপিনে"

আর যখন হেমবাবু গান করেন তখন যেন

"গুণী বিশ্বাবসু বীণা নিয়া করে
মেঘের গবক্ষে গভীর ঝঙ্কারে
মোহিত করেন মানব গণে"

নবীন বাবুর কবিতা সরিমিয়ার টপ্পা হেম বাবুর কবিতা তানসানের গান। নবীন বাবুর কবিতা কোকিলকণ্ঠী সুন্দরীম কাওয়ালীর গীতের ন্যায়—সে যেমন অল্প অল্প নাচিয়া নাচিয়া, সৌন্দর্য্যের লহরী তুলিয়াদিয়া, তাহাতে সঙ্গীতের লহরী মিসাইয়া দেয়, তেমনি নবীন বাবুর সুন্দর সরল শব্দ গুলি নাচিয়া নাচিয়া চাকচিক্য তরঙ্গের সহিত মিলাইয়া যায়। সেই সুন্দরী যেমন বিস্ফারিত হৃদয়ে, আরক্তিম কপোলে, চন্দ্রমুখে, ঢুলু ঢুলু লোচনে, অতুল কণ্ঠে, ললিত পঞ্চম স্বরে প্রণয় গীত গাইয়া শ্রোতৃগণকে কখন কাঁদাইয়া, কখন মোহিত করিয়া দেয়, তেমনি নবীন বাবু তাঁহার সুললিত ভাষায়, তাঁহার মাধুরীময়ী ভাব ভঙ্গীতে তাঁহার হৃদয় মথিত অমৃত সমান কবিত্বময়ী চিন্তাতে পাঠকগণকে মুগ্ধ করেন। যখন নবীন বাবুর গান শুনি তখন বোধ হয় যেন—

"মিলাইয়া সপ্তস্বর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে বিমোহিত করিয়া শ্রবণ;
মিলাইয়া সেই স্বরে শতেক নবীনা
গাইতেছে সপ্তস্বর, ব্যাপিছে গগণ;"

তাহার সঙ্গে আরও মনে হয়

"নাচে অর্দ্ধ বিবসনা শতেক সুন্দরী
সুকোমল মকমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে"

নবীন বাবুর কবিতার এতদূর প্রশংসা করিয়া হেমবাবুর কবিতার সম্যক বর্ণনা করা দুরূহ বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নবীন বাবুর কবিতার অপেক্ষাও হেম বাবুর কবিতা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ট। হেম বাবুর কবিতা সম্যক্ রূপে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ইহাতে এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আছে হৃদয়কে নাচাইবার, শোণিতকে উত্তপ্ত করিবার, এমন এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে যিনি তাঁহার কবিতা পাঠ করেন নাই তাহাকে তাহা বর্ণনা দ্বারা অনুভব করাইয়া দেওয়া নিতান্ত দুরূহ। ইহা সময়ে সময়ে অতুলনীয়, অমানুষিক, অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ইহা মধুর গম্ভীর দেবকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের ন্যায়। নবীন বাবুর কবিতা ললিত রাগিণী, হেম বাবুর কবিতা ভৈরব রাগ; নবীন বাবুর কবিতা কুসুম সুরভি বসন্তানিলের ন্যায়, হেম বাবুর কবিতা নিদাঘ কালীন কাদম্বিনী নির্ঘোষবৎ ভীম প্রভঞ্জনের ন্যায়; * নবীন বাবুর কবিতা ভাগিরথীর কল্ কল্ ধ্বনি, হেম বাবুর কবিতা দিগন্তবিসর্পী অতলস্পর্শী জলধি কল্লোল। নবীন বাবু মানব হৃদয়ের কেবল মাত্র কোমল ভাব সুচারুরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। হেমবাবু সমগ্র মানব হৃদয় মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আলোচনা ও অধিকার করিয়াছেন।

হেম বাবুর কল্পনা-বিহঙ্গ যত উচ্চে ছুটিয়া যায়, নবীন বাবুর কল্পনা কদাচ তত উচ্চ উঠে না হেম বাবু যেন

"তুচ্ছ করি মর্ত্তাভূমি
জলন্ত অনল প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়
ছুটিয়া অনিল পথে পুষ্পর ছড়ান"

হেম বাবুর উৎকৃষ্ট কবিতাতে তাঁহার কল্পনা উচ্চাদপি উচ্চ প্রদেশে বিহার করে; দর্শক বিস্ময়োৎফুল্ল উর্দ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করেন; তখন তাঁহার কল্পনা যেন,

হৃদয়ে কিরণ লয়ে
উন্মত্ত হইয়ে গায়
পৃথিবী মাতিয়ে তায়
আশা মোহ মায়াভয় অন্তরে জড়ায়

কিন্তু হেম বাবু কখন কখন সম্ভাবনাতীত নিস্তেজ কবিতা লিখিয়া ফেলেন: তাঁহার কল্পনা কখন বা উদ্দীপ্ত অগ্নি শিখার ন্যায় মানসনেত্র ঝলসাইয়া দেয়;

* কোন কোন পাঠক হয়ত মনে করিবেন যে এই তুলনা হেম বাবুর কবিতার মিষ্টতার বিরোধিনী হইয়াছে। কিন্তু তাহার মেঘ গর্জ্জনের ভয়াবহ গম্ভীর সংগীতের মর্ম্মার্থ বুঝেন নাই। হেড্‌ন গীতে প্রসিদ্ধ হাণ্ডেলের (Handel ক্ষমতার চরমবর্ণনা করিবার সময় বলিয়াছেন যে হাণ্ডল ইচ্ছাক্রমে বজ্রধ্বনি শুনাইতে পারিতেন। আমরা এক দিন হারমোনিয়ম যন্ত্রের অপূর্ব্ব বাদন শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা বর্ণনা করিতে পারি না কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে নিপুণ বাদাকরের হস্তে যতক্ষণ হারমোনিয়ম বাজিয়াছিল, ততক্ষণ বোধ হইতেছিল যে একটী ঝড় বহিতেছে তাহার ভয়াবহ অথচ মধুরতান জীবনে কখন ভুলিব না।

কচিত বা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তমোমিশ্রিতালোক প্রদান করে; নবীন বাবুর কল্পনা নাতিতীব্র, নাতিক্ষীণ, সমবর্ত্তী মধুরদীপ্তি প্রকাশ করে।

আবার, নবীন বাবুর কল্পনা প্রণয় ঘটিত বা তৎসদৃশ অন্য কোন কোমল বিষয় লইয়া কাল অতিবাহিত করিতে বিলাস করে। হেমবাবুর কল্পনা সৃষ্টি প্রলয় ইত্যাদি ঘোর গভীর বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে ভাল বাসে। তবে যে হেম বাবু কোমল বিষয়িনী গীতি গাইতে পারেন না তাহা নহে। এই স্থলে আমাদিগের একটী কথা মনে পড়িল। এক দিন আমরা আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ গায়কের গান শুনিতে গিয়াছিলাম দুইটা তানপুরা তারস্বরে বাজিতেছিল, এবং একটা হারমোনিয়ম সজোরে স্বর দিতে ছিল, আর তাহার সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজিতেছিল। গায়কে কণ্ঠধ্বনি সেই য' গুলির স্বরে মগ্ন হইতেছিল না। সেই ধ্বনি যদিও মধুর তথাচ বহুদূরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। মনুষ্য কণ্ঠ হইতে তাহার অপেক্ষা উচ্চতর স্বর বহির্গত হইতে পারে এমন বোধ হইতেছিল না। যখন চৌতাল এবং খেয়াল গাওয়া হইয়া যাইল তখন তাঁহাকে টপ্‌পা গাইতে অনুরোধ করা হইল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন যে এমন গম্ভীর নিনাদী কণ্ঠে কখন টপ্‌পা ভাল লাগিবেক না। কিন্তু গায়ক, "আমরি কি মিহি সুতায় হার গেঁথেচে হীরে" এই গানটী, যখন বামাকণ্ঠে ধরিলেন, তখন সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। যে কণ্ঠ হইতে ক্ষণকাল পূর্ব্বে মেঘ গর্জ্জন হইতে ছিল তাহা হইতেই কোমল কামিনীস্বর নিঃসৃত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি টপ্‌পা দুই একটীর অধিক গাইতে চাহেন না। তিনি মনে করেন তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা অধিকতর উচ্চ সঙ্গীতের নিমিত্ত। হেমবাবুর "হতাশের আক্ষেপ" ও "প্রিয়তমার প্রতি" বৃত্র সংহারের দ্বিতীয় সর্গ পড়িয়া আমাদিগের এই অদ্ভুত গায়কের কথা মনে পড়ে। হেমবাবু ইচ্ছা করিলে নবীন বাবুর ন্যায় মৃদু কোমল স্বরে গাইতে পারেন না উল্লিখিত কবিতা গুলি পাঠ করিয়া কে বলিবে। হেমবাবু বসন্ত সমীরণ বহাইতে পারেন, প্রসূননিচয় শোভিত বল্লরীকে দোলাইতে পারেন—কল্লোলিনীর কুলু কুলু রব গোকুল নিকুঞ্জে রাধিকারমনের মুরলীধ্বনি সকলই শুনাইতে পারেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন যে তাঁহার জন্ম উচ্চ মহান সঙ্গীত গাইবার নিমিত্ত।

সংক্ষেপে, নবীন বাবুতে যাহা আছে তাহা হেম বাবুতে আছে। কিন্তু হেম বাবুতে যাহা আছে তাহা নবীন বাবুতে আছে ইহার প্রমাণ নবীন বাবু কুত্রাপি অদ্যাপি দিতে পারেন নাই। আমরা অধিক আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে এই দুই কবির কবিতা সূক্ষ্মরূপে সমালোচন করিয়া দেখি।

যদিও হেম বাবু নানা উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া স্বকীয় নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন

তথাচ তাঁহার নাম উচ্চারিত হইলেই বঙ্গবাসীদিগের তাঁহার "ভারত সঙ্গীত" ও "ভারত বিলাপের" কথা মনে পড়ে— যেমন গ্রে(Gray) তাঁহার একমাত্র এলেজি (Elegy in a country Churchyard) লিখিলেই চিরস্মরণীয় হইতেন,—যেমন উলফ (Wolfe) এক মাত্র মূরের সমাধি বিষয়ক কবিতা (The Burial of Sir John Moore) লিখিলেই কবি বলিয়া পরিগণিত হইতেন, যেমন পোপ (Pope) একমাত্র Eloisa to Abelard লিখিলেই কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন—যেমন সেক্ষপিয়ার একমাত্র হ্যামলেট Hamlet লিখিলেই তাঁহার অলৌকিক কবিত্ব জগতে প্রকাশিত হইত, তেমনি হেম চন্দ্র যদি মাত্র "ভারত বিলাপ" বা "ভারত সঙ্গীত" লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি একজন অসাধারণ কবি বলিয়া কবিদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইতেন সে বিষয় অনুমাত্র সংশয় নাই। যাহারা বঙ্গভাষাকে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন; যাহাদিগের দৃঢ়সংস্কার ছিল, বাঙ্গাভাষাতে হৃদয়ভেদী ও জ্বালাময়ী কবিতা লেখা যাইতে পারে না, তাহাদের হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত" ও "ভারত বিলাপ" পড়িয়া সেই ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। কোন জাতির মধ্যে, কোন ভাষাতে, কোন কালে, কোন পুস্তকে এই দুই কবিতার অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বিনী কবিতা আছে বোধ হয় না। যদি বঙ্গদেশের অবস্থা অন্যবিধ হইত, তাহা হইলে এই দুই কবিতাতেই ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত হইত এবং ফরাসীয় বিপ্লব কালে মারসেলস গীতির ন্যায় ইহা নগরে নগরে, সানন্দে, সোৎসাহে গীত হইত; সৈনিক পুরুষেরা, স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দিয়া, দলবদ্ধ হইয়া, ইহা একতানে গাইতে গাইতে সমরাঙ্গনে ধাবমান হইত—গাইতে গাইতে আনন্দে, নির্ভীকচিত্তে ভীষণ সমরে প্রাণত্যাগ করিত। ইহা জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বঙ্গদেশে পতিত হইয়া মহাবহ্নি প্রদীপ্ত করিয়া দিত। যদি এই দুই কবিতা যে ভাষায় বিরচিত, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বলিতাম, "হে হেমচন্দ্র তুমি ত্বদীয় "ভারত সঙ্গীতের" মহারাষ্ট্রীয় মাধবাচার্য্যের ন্যায়, হিমাচলের অভ্রভেদী শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া, তোমার জলদ গম্ভীর গগণভেদী তূরিধ্বনি কর। সেই ধ্বনি হিমগিরি হইতে কুমারিকা অন্তরীপ প্রতিধ্বনিত হইবে, সমগ্র ভারত ভূমির অন্তরের গভীরতম কন্দর পর্য্যন্ত আলোড়িত করিবে, ঘোর নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে, এবং মুমূর্ষু ভারতবাসী গণকে সজীব করিবে।" এই দুই কবিতার সহিত নবীন বাবুর কোন কবিতারই তুলনা হয় না। নবীন বাবুর কেন, বাঙ্গালাদেশের কোন কবিরই গ্রন্থে ঈদৃশ কবিতা লক্ষিত হয় না। ইহা একক, অদৃষ্ট পূর্ব্ব, অননুকরণ সাধ্য।

ক্রমশঃ

পলাশির যুদ্ধ কাব্যে রাণী ভবানী সান্ধ্য গগণে শুক্র গ্রহ; নারী-কণ্ঠ-শোভী হারের মধ্য মণি। পাঠক চক্রান্ত সভায় নারীর কি কত শুনুন—

"আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ।
অসহ্য দাসত্ব যদি; নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর সাজে নৃপতি সমাজ!
প্রবেশ সম্মুখ রণে; যেন পূর্ণ শশী—
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে,
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে,
হাসুক উজলি বঙ্গ,—এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসী রক্ত ধমনী ভিতরে,
নাহি হয় উন্মত্তর? আমি যে রমণী—
বহিছে বিদ্যুৎবেগে আমার ধমনী।

আর রাণী ভবানীর কি ইচ্ছা করে দেখুনঃ—

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে
নাচিতে চামুণ্ডা-রূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে;
সহি কিসে মাতৃ-দুঃখ? সত্য শেঠবর!
বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থ সুবিস্তার,
রয়েছে সম্মুখে ছায়া পথের মতন;
হও অগ্রসর নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পন্থে কর বিচরণ।"

এই গেল রাণী ভবানীর চরিত্র, আর সেই-বিষাদিনীর চিত্র? অতি চমৎকার! অতি মনোহর! কি কমনীয় ভাব।

"প্রেমপূর্ণ স্থিরনেত্রে আনত বদনে,
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ পানে;
বিলম্বিত কেশরাশি, আবরি আননে,
পড়িয়াছে পতিবক্ষে, শয্যা-উপাধানে;
একভুজবল্লী শোভে পতি-কণ্ঠ-তলে,
অন্যকরে মুছে নাথ-বদন-মণ্ডল;
থেকে থেকে তিতি বামা নয়নের জলে,
প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল;
মুছাইতে স্বেদবিন্দু, বামার নয়ন
অমর দুর্ল্লভ অশ্রু করিছে বর্ষণ।"

আর কবি কি বলেন শুনুনঃ—

"নির্জ্জন কাননে বসি জনক-নন্দিনী
—নিদ্রিত রাঘব শ্রেষ্ঠ উরু উপাধানে—
কেঁদেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী
চাহি পথশ্রান্ত পতি নরপতি পানে;
অথবা বিজন বনে, তমসা নিশীথে
মৃত পতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী
কেঁদেছিল যেই অশ্রু, এই রজনীতে
তুচ্ছ বঙ্গ-সিংহাসন—এই অশ্রু তরে—
কাঁদিতেছে সেই অশ্রু এই বিষাদিনী,
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপদ অম্লান অন্তরে।"

এই স্থলে কবি অসাধারণ ক্ষমতা ও কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিষাদিনী আর চিত্র আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে আজীবন তাহা ভুলিতে পারিব না। আবার কাপ গাবে "আশ্রয়-বিহীন তরুলতার মত" বিষাদিনীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তাহা অমূল্য।

রস রচনা বিষয়ে নবীন বাবু চিরকাল বায়রণকে অনুকরণ করিয়া থাকেন যদি বায়রণের সেই তেজ তিনি বাঙ্গালা কবিতায় মিশাইতে পারেন তবে আমাদের সুমহৎ উপকার করিবেন। তিনি বায়রণের একটী গুণই বলুন আর দোষই বলুন ঠিক যেন নিজের সম্পত্তি করিয়া

করিতেছে, সেই বীর-বীর মহাবীরের নাম যশ চিরকাল অক্ষয় রহুক।

পাঠক বর্গ এখন বুঝিবেন কিরূপ সময়ে, কিরূপ আখ্যানে, কিরূপ চরিত্রে, কিরূপ সত্য ঘটনা লইয়া, কিরূপ উপকরণে "পলাশির যুদ্ধ" লিখিত হইয়াছে। যদি নবীন বাবুর পলাশির যুদ্ধ ইতিহাস হইত, তবে চক্ষু-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পুস্তক ঘৃত-সংযুক্ত করিয়া বিভাবসুকে উপহার দিতাম। কিন্তু তাঁহার পুস্তক কাব্য—এবং তাহা এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে— তজ্জন্য কবি-স্বাধীনতার উপর দোহাই দিয়া আমরা সাদরে তাঁহার পুস্তক গ্রহণ করিয়াছি। বাল্মীকির অনুরোধে রাবণের দশ মুণ্ড, এবং অঞ্জনাহৃদয়-নন্দনের লক্ষযোজন বিস্তারিত লাঙ্গুল বিশ্বাস করিয়াছি, আর তাঁহার পলাশির যুদ্ধে যাহা মার্শম্যান প্রভৃতি ইতিহাস-লেখকেরা কৰ্ণ বঙ্গে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করিব না কেন?

মীরজাফরের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আর কি বলিব কি, পুনরায় এই মাত্র বলি যে পলাশির যুদ্ধ কাব্য না লিখিয়া নাটক লিখিলে ভাল হইত।

পলাশির যুদ্ধ-বর্ণিত পুংচরিত্র সকল ইতিহাসের সামগ্রী। তজ্জন্য কবি সেই সকল চরিত্রে যাহা করিয়াছেন তাহা আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আলোচনা করিব না। তবে তিনি নিজে যে চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই আলোচনা করিব। তিনি যে দুইটী স্ত্রী-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, রাণী ভবাণী তাহার মধ্যে প্রধান। কাব্যাংশে রাণী ভবানীর চরিত্র একটী দুর্লভ সামগ্রী। রাণী ভবানীর বক্তৃতার একটী বর্ণ মাত্র সরাইবার যো নাই। এতদূর দৃঢ় গাঁথনী, প্রতি ছত্রে ছত্রে এক একটী গভীর উপদেশ, প্রতি বাক্যে নীতি দেদীপ্যমান--এরূপ প্রায় সচরাচর দেখা যায় না। এক একটী কথা ভূয়োদর্শনের ফল।

"বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন
দাসত্বের পরিবর্ত্তে দাসত্ব স্থাপন।"

"দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্র গতি
হতেছে বিক্রমশালী কিছু দিন আর
মহারাষ্ট্র পরিচ্ছদে ভারত-ভূপতি।
অচিরে হইবে পুনঃ ভারত-উদ্ধার;
সার্দ্ধ পঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে।"

"কেন মিছে খাল কেটে আ'নিবে কুমীরে?

"যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গসিংহাসন
থামিবে না এই খানে;——

"জানি আমি যবনেরা ইংরেজের মত
ভিন্ন জাতি; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চাশতবর্ষ; এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু হ'য়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাবে, আর্য্যসুত মনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত।
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব, জাতি ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত
হইয়াছে যবনেরা

ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধর্ম্মজ্ঞান।

ধর্ম্ম কিসে হয়? * * *

এক দিন আমি দেখিলাম একজন অন্ধ যষ্টি দ্বারা পথ নির্ণয় করিতেছে। ঐ অন্ধ ব্যক্তি কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত। কুষ্ঠব্যাধি সংক্রামক রোগ। আমি শঙ্কা বশতঃ পথের এক পার্শ্ব দিয়া অগ্রগামী হইলাম। দূরে গিয়া নিকবেগে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া অন্ধকে দেখিতে লাগিলাম।

পরে দেখিলাম শ্যাম আসিতেছে। শ্যাম অন্ধকে দেখিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিল এবং রাস্তার তে-মাতা উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। অন্ধ একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিল। শ্যামকে জিজ্ঞাসা করাতে শ্যাম আমাকে এই কথা বলিল। "অন্ধকে দেখিয়া আমার কষ্ট বোধ হইয়াছিল, তদনন্তর আমি উহাকে অগ্রসর করিয়া দিলাম। ইহাতে আমার তৃপ্তি লাভ হইয়াছে বটে। কার্য্যটী ভাল কি মন্দ, কেন করিলাম, কি বৃত্তান্ত, তাহা বড় বুঝি না।"

একজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্যাম কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করিয়া অন্যায় কার্য্য করে নাই কি?" তিনি বলিলেন। "অন্ধকে পথ প্রদর্শন করা, দয়া নামে গণনীয়। দয়া অতি মহৎ কর্ম্ম। শ্যাম সৎকর্ম্ম করিয়াছে। হস্তের পরিবর্ত্তে যষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক পথ দেখাইলে কুষ্ঠরোগ স্পর্শজনিত দোষ পরিত্যক্ত হইতে পারিত।"

আমি মনে মনে শ্যামের প্রশংসা করিলাম। দয়ার লক্ষণ এবং মাহাত্ম্য সমস্তই বুঝিলাম। তথাচ ইহার পরেও আমার দ্বারা ঐ অন্ধের বিন্দু মাত্র উপকার হয় নাই। উহার কারণ কি?

দাঁড়াইয়া আছি এমন সময়ে আমার সম্মুখস্থিত গঙ্গার ঘাটে একখানি পাল্কি উপস্থিত হইল এবং একটী গণিকা ঐ পাল্কি হইতে নামিয়া স্নান করিতে গেল। রৌদ্র বিলক্ষণ প্রখর হইয়াছিল। বেহারাগণ অন্ধকে তাড়াইয়া দিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। নিকটে আর ছায়া ছিলনা। অন্ধ রৌদ্রেই বসিয়া থাকিল। দেখিলাম প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে তাহার ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতেছে। অন্ধ উচ্চৈঃস্বরে কাতরোক্তি করিতে লাগিল; বেহারাগণ তাহা শুনিয়া কটূক্তি করিল। গণিকা স্নানান্তে দাসীগণ সমভিব্যাহারে বৃক্ষমূলে আসিল। এবং পাল্কি আরোহণের পূর্ব্বে কতক গুলি ভিক্ষুককে কিছু কিছু দান করিয়া স্বস্থানে গমন করিল। অন্ধ একটী সিকি পাইল. এবং তাহার মুখভঙ্গিতে বোধ হইল সিকিটী পাইয়া বিশেষ হর্ষলাভ করিয়াছে।

অন্ধের হর্ষ শীঘ্রই বিনষ্ট হইল। পাল্কি

চলিয়া গেলে অন্ধ বৃক্ষমূলে আইল। কিন্তু গণিকার দাসীগণ বৃক্ষতলে জল নিক্ষেপ করিয়া পিছল করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে অন্ধের পদস্খলন হইল। সমস্ত বস্ত্রাঞ্চল পিচ্ছল হইয়াছিল। অন্ধ যষ্টির দ্বারা তাহা অনুভব করিল। পুনরায় রৌদ্রে চলিয়া গেল এবং রৌদ্রে গিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল।

* * * *

ধর্ম্ম কিসে হয়?

শ্যাম ধার্ম্মিক। কেননা অন্ধের উপকার করিয়াছে?

তবে, গণিকাও ধার্ম্মিক, কেননা অন্ধকে সিকি দান করিয়াছে। কেবল অন্ধ কেন অনেক গুলি ভিক্ষুককে অর্থ দান করিয়াছে।

গণিকা যদি ধার্ম্মিক হয় তবে অন্ধকে বৃক্ষচ্ছায়া হইতে দূরীকৃত করিবার পাপ কাহার? বিশেষতঃ গণিকা স্বভাবতঃই পাপিয়সী।

* * * * *

শ্যাম অতি মূর্খ, ন্যায় অন্যায়ের মর্ম্ম জানে না। বেহারাগণ বিশ্রামার্থ বৃক্ষচ্ছায়া দেখিয়া যেমন আকৃষ্ট হইয়াছিল শ্যামও সেইরূপ খাম খেয়ালের বশীভূত হইয়া পরোপকার করিয়াছে। হিতাহিত বা দয়ার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র বুঝে নাই। শ্যাম মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল। শ্যামের ন্যায় ধর্ম্ম আমি স্পৃহা করি না।

* * * *

ভাল। আমি এত কথা বুঝিলাম তথাপি আমার দ্বারা কি একটীও প্রকৃত সৎকর্ম্ম হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই?

"যষ্টির দ্বারা পথ প্রদর্শন"?—এ উপায়টী আমার স্মরণ হয় নাই।

"অর্থদান"?—আমি নিঃস্ব।

"সেই প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়েত অন্ধের হস্তস্থিত পাত্রে এক গণ্ডূষ জল আনিয়া দিতে পারিতাম"?—অন্ধকে দেখিয়া তৃষ্ণাতুর মনে হয় নাই। এক গণ্ডূষ জলেই বা উহার উপকার কি হইত?

"কিন্তু যখন গণিকার সহচরীগণ বৃক্ষমূলে জল নিক্ষেপ করিয়াছিল তখন আমার ত ঐ কথা স্মরণ হইয়াছিল। অন্ধ বেচারি স্থানচ্যুত হইবে তাহা আগেই বুঝিয়াছিলাম এবং যখন বেহারাগণ অন্ধকে কটূক্তি করে তখনও আমার ক্রোধ হইয়াছিল। তবে উহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতাম না কি?"—উহারা স্ত্রীলোক; বিশেষতঃ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ। উহাদিগের সহিত কথা কহিলে হয় ত একটা শ্লেষোক্তি করিত। বেহারাগণ হয় ত আমাকেই কটূক্তি করিত।

* * * * *

আমার বিলক্ষণ জ্ঞানযোগ হইয়াছে। (১) যষ্টি প্রসারণ আমার স্মরণ হইল না। (২) কুষ্ঠরোগের সংক্রমণশক্তি আমার বিস্মরণ হইল না। (৩) অর্থ, আমার নাই (৪) জল গণ্ডূষে, অন্ধের প্রয়োজন নাই। (৫) গণিকার সহচরীগণের সহিত আলাপ করা লজ্জার বিষয়। (৬) বেহারাগণের সহিত আলাপ অসম্ভ্রমের স্থল!!

আমি যদি মৌনী হইতাম, যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বাকসংযম করিয়া থাকিতাম তবে এতদপেক্ষা নিশ্চেষ্ট হওয়া অসাধ্য!

আমার ধর্ম্মজ্ঞান বাক্য মাত্র। উহাতে কোন ক্রিয়া নাই। ঐ জ্ঞান থাকা না থাকা সমান। বরং না থাকিলে ভাল হইত। না থাকিলে হয়তো পশ্বাদের ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ সংকল্প করিতাম। অন্ততঃ আমার জ্ঞানকৃত কুক্রিয়াগুলি হইত না।

ধর্ম্ম কিসে হয়? ক্রিয়াতে না চৈতন্যে?—

চৈতন্য কিরূপ?

চৈতন্য ভাবনা স্বরূপ।

ভাবনা? যথা চিন্তা। চিন্তা? যথা মনে মনে কথা। চিন্তা মনের ক্রিয়া।

ধর্ম্ম কিসে হয়? মনে কর ক্রিয়া অথবা চৈতন্যেই ধর্ম্ম। ক্রিয়া বলিতে বাহ্যিক ক্রিয়া। চৈতন্য—চিন্তার ন্যায়।—চিন্তা, মনের ক্রিয়া। অতএব ধর্ম্ম, বোধ হয়, ক্রিয়াতেই হইবে।

চৈতন্য ভাবনা স্বরূপ না হইয়া ত সুখ দুঃখ স্বরূপ হইতে পারে?

ধর্ম্ম কি দুঃখ স্বরূপ? তবে ধর্ম্মে প্রয়োজন কি?

ধর্ম্ম সুখ স্বরূপ? কিন্তু কুকর্ম্মেও ত বিলক্ষণ সুখ দেখা যায়?

সুখ? আপনার সুখ; পরের সুখ, তাবৎ লোকের সুখ। সুখ অনেক প্রকারই হইতে পারে।

* * * *

পরে প্রদর্শিত হইবে, ধর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন সুখও নহে; এবং কেবল চিন্তা বা বাহ্যিক ক্রিয়াতেও অবস্থান করে না। ধর্ম্ম মনোবেগ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই মনোবেগ হইতে ধর্ম্ম উৎপাদনার্থ চিন্তা নিয়োজিত হয়। পরিণাম ক্রিয়া; সেই ক্রিয়াতে আত্মসুখ এবং জগতের সুখ।

মনোবেগ, চিন্তা, ক্রিয়া আত্ম সুখ, এবং পরের সুখ,—এতৎসমুদায় যব ব্যবস্থা অর্থাৎ যথাযথ প্রয়োগ হইয়া ধর্ম্ম উদ্দীপিত হয়।

ধর্ম্মবিষয়ক ব্যবস্থার নিয়ামক তিন প্রকার। আপনার মনের ব্যবস্থা বিষয়ক বিচার। সমগ্র মানবমণ্ডলী—নৃপুঞ্জের (Humanity) মীমাংসা অনুযায়ী ব্যবস্থা এবং জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বরের বিধান।

জগদীশ্বরের বিধান এবং নৃপুঞ্জের বিচার জানিবার উপায় পরস্পর স্বতন্ত্র। উপায় দ্বয়ের প্রণালীসম্বন্ধে বিস্তর অনৈক্য কিন্তু উভয়ের মীমাংসা অনেক স্থলে এক।

জগদীশ্বর বল কিম্বা নৃপুঞ্জ বল, যাঁহার মীমাংসাকেই আমাদিগের জ্ঞানের চরম সীমা বলিয়া স্বীকার কর, ইঁহারা কি বিধানমতে ক্রিয়ার ধর্ম্ম অধর্ম্ম, দোষ গুণ, দণ্ড পুরস্কার নির্দেশ করেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যার পর নাই প্রয়োজনীয়। তাহা শিক্ষা করিবার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। অত্র প্রস্তাবের সহিত সেই সকল বিধানের সম্পর্ক নাই। নৃপুঞ্জ এবং জগদীশ্বরের বিচার জানিবার উপায় মধ্যে যত বিভিন্নতা থাকুক, আপন মনের বিচার জানিবার প্রণালীর সহিত উহার কোন

উপায়ের গুরুতর অনৈক্য নাই। সামান্য অনৈক্য যাহা আছে তাহার আলোচনা না করিয়াও কথঞ্চিৎ রূপে আপন মনের বিচার সমাধা করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ আত্ম মনের বিচার উল্লিখিত বিচার দ্বয়ের সোপান স্বরূপ। আত্ম মনের বিচার আদি, জগদীশ্বর বা নৃপুঞ্জের বিচার অন্ত। সত্য বটে, অন্তিম বিচার বুঝিতে পারিলে আপন মনের ব্যবস্থা বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু অন্তিম বিচারের শৃঙ্খলা আদ্যোপান্ত বুঝাইয়া দেওয়া অতি কঠিন কার্য্য। এমন কি সকল তর্কের মীমাংসা কখন সর্ব্ববাদী সম্মত হইবে কি না সন্দেহের স্থল। আপন মনের বিচার সকল লোকের আয়ত্ত এবং উভয় পক্ষেই অপরিহার্য্য।

অতএব চৈতন্য—ভাবনা—চিন্তা—মনবেগ—সুখ—দুঃখ এবং ক্রিয়া এই বিষয় গুলির নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত আপন মনের বিচার নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

(২)

"আমি দেখিলাম একজন অন্ধ"। ইহার অর্থ আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় সঞ্চালন দ্বারা দর্শন ক্রিয়া সমাপন হইয়াছে।

চক্ষুর ন্যায় আমার বিবিধ ইন্দ্রিয় আছে। সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রক্রিয়ার নাম থাকুক সংজ্ঞা।*

* উপস্থিত প্রস্তাবের পক্ষে অনাবশ্যক হইলেও সংজ্ঞা সমগ্রের নিম্ন প্রকার বিভেদ নির্ণয় জ্ঞানগম্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে।

সংজ্ঞা।

(দুই প্রকার)

দেহের বহির্ভাগ স্থিত সংজ্ঞা।
(পাঁচ প্রকার)

১। দর্শন।
২। শ্রবণ।
৩। ঘ্রাণ।
৪। আস্বাদন।
৫। ত্বকজনিত সংজ্ঞা।
(তিন প্রকার)
(ক) স্পর্শ
(খ) তৌল বা ওজন বিষয়ক সংজ্ঞা
(গ) শীতোষ্ণ সংজ্ঞা

দেহের অন্তর্ভাগ স্থিত সংজ্ঞা।

যে সমস্ত সংজ্ঞার অঙ্গ (ইন্দ্রিয়) কথঞ্চিৎ নির্ণীত আছে।

১। তৃষ্ণা।
২। ক্ষুধা।
৩। গা বমি বমি।
৪। মাথা ঘোরা; এবং গা টল টল বা তদ্বিপরীত যথা স্বাভাবিক অবস্থা

যে সকল সংজ্ঞার অঙ্গ নির্ণীত নাই; আনুষঙ্গিক সংজ্ঞার অঙ্গ সংশ্রুত।

১। লিঙ্গ সংশ্রুত।
২। লিভর, কিডনি এবং ওভেরি আদি কতিপয় অঙ্গ সংশ্রুত।

আমি মনুষ্য একটী দেখিয়াছি কিন্তু সেই সঙ্গে যত পদার্থ দেখিয়াছি তৎসমুদায়ের প্রতি কিছু আমার মনঃসংযোগ হয় নাই। মনে কর ঐ ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র; উহা দেখিয়াছি সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার কোন চৈতন্য আমার মনে উদয় হয় নাই। বস্ত্রের বর্ণ কি তাহা আমি বলিতে পারি না। অতএব বস্ত্রদর্শন সংজ্ঞা মাত্র। কিন্তু যাহাকে দেখিয়া চিনিলাম অমুক, তাহার বর্ণ এবং মুখ ও দেহের অবয়ব আমার মনে বিশিষ্ট রূপে অঙ্কিত হইবার পরে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি। তদ্ব্যতীত চিনিতে পারিতাম না। অতএব বস্ত্র দর্শন অপেক্ষা মুখের অবয়বাদি দর্শন কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়াছে। শেষোক্ত দর্শনে সামান্য সংজ্ঞা ব্যতীত বিশেষ মনঃসংযোগ হইয়াছিল। এই মনঃসংযোগ বিশিষ্ট সংজ্ঞার নাম থাকুক চৈতন্য।

আমি লোকটীর মুখশ্রী দেখিয়া চিনিয়াছি অমুক। অধিকন্তু স্বীকার করি যে তৎকালে অন্ধের চক্ষুদ্বয়ও আমার চৈতন্যের অন্তর্গত হইয়াছে। কিন্তু উহার কুষ্ঠব্যাধি বস্ত্রের দ্বারা আবৃত ছিল কোনমতে আমার সংজ্ঞা গোচর হয় নাই। পূর্ব্বে একবার যে ঐ ক্ষত দেখিয়াছিলাম, তাহার মূর্ত্তি আমার মনে জাগ্রত রহিয়াছে। যে মুখশ্রী দেখিয়া অন্ধকে চিনিয়াছি সেই মুখশ্রীর চৈতন্য এবং কুষ্ঠ ব্যাধির চৈতন্য, এতদ্বয় মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাই। কিন্তু একটী সাক্ষাৎ সংজ্ঞা জনিত, আর একটী পূর্ব্বের সংজ্ঞা ঘটিত স্মৃতি হইতে উদয় হইয়াছে। এতদুভয়ের নাম থাকুক (১) সাক্ষাৎ চৈতন্য (২) স্মৃতি চৈতন্য।

সাক্ষাৎ চৈতন্য এবং স্মৃতি চৈতন্যের সাদৃশ্য এবং বৈলক্ষণ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এই কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে স্বপ্নাবস্থায় যাহা সাক্ষাৎ চৈতন্য মনে হয় তাহা বাস্তবিক স্মৃতি জনিত। বাতুলেরা স্থল বিশেষে সাক্ষাৎ চৈতন্য এবং স্মৃতি চৈতন্যের প্রভেদ টের পায় না। লোকে যখন খেয়াল দেখে কিম্বা ভূত দেখিতেছি মনে করে তখনও ঐরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়।

চৈতন্যের আরো কতকগুলি শ্রেণিভেদ আছে। তাহা ক্রমে প্রকাশ হইবে। এস্থলে মানসিক ক্রিয়াগুলির একটী আনুপূর্ব্বিক তালিকা দেওয়া গেল।

I সংজ্ঞা (Sensation.)

II চৈতন্য (Consciousness) সংজ্ঞার পরে উদয় হয়। এক প্রণালি মতে চৈতন্য দুই প্রকার যথা—

ক। সাক্ষাৎ চৈতন্য (Presentative কিম্বা Objective consciousness.)

খ। স্মৃতি চৈতন্য (Representative কিম্বা Subjective consciousness.)

উভয় চৈতন্যকেই আর এক প্রণালি অবলম্বন পূর্ব্বক তিন শ্রেণিতে বিভাগ করা আবশ্যক। ১ ভাবনা ২ বেদনা ৩ মনবেগ।

১ ভাবনা (Ideation) দুই প্রকার।

(ক) স্থূল (Concrete idea কিম্বা Presentative-representative cognition.)

(খ) সূক্ষ্ম (Abstract)। সূক্ষ্ম ভাবনা দুই প্রকার; সরল, জটিল।

/০ সরল (Simple idea কিম্বা Representative cognition)

৵০ জটিল (complex idea; Re-representative)।

টিপ্পনী। জটিল ভাবনা বাক্য ব্যতীত নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অন্য গুলি তদভাবে ঈঙ্গিত বা ছবির দ্বারাও নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই প্রকরণ মতে ভাবনা দুই প্রকার। যথা (ক) চিন্তা (খ) ঈঙ্গিত ভাবনা।

২ বেদনা অর্থাৎ দুঃখ বা সুখ বা সুখ দুঃখের সমভাব। Pleasure Pain or Indifference)

৩ মনবেগ (Impulse কিম্বা Emotion)

III স্বেচ্ছা (Volition কিম্বা volition and inhibition) ইহা চৈতন্যের পরে উদয় হয়।

IV ক্রিয়া (Action এবং speech)

উদাহরণ স্থলে নিম্নলিখিত কথা গুলি লেখা যাইতেছে—

১। ভাবনা। (Ideation)

ঈঙ্গিত ভাবনা।

"অমুক অন্ধ।" সাক্ষাৎ চৈতন্য; স্থূল ভাব। *

"সে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।" (স্মৃতি চৈতন্য স্থূল ভাব) †

"উহার সাহায্য প্রয়োজন (অভাব) হইয়াছে।" (সাক্ষাৎ বা স্মৃতি চৈতন্য; সরল ভাব) ‡

চিন্তা।

"অন্যকে সাহায্য করা দয়া নামে গণ্য।"

"দয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

"দয়া করিলে ধর্ম্ম হয়।"

(স্মৃতি চৈতন্য, জটিলভাব) **

আর এক প্রকরণ মতে ভাবনা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা ঈঙ্গিত ভাবনা ¶ এবং চিন্তা ‖।

ঈঙ্গিত ভাবনা বাক্য ব্যতীত ও অনুভূত হইতে পারে।

চিন্তা, বাক্য ব্যতীত মনে ধারণ করা যায় না। অথবা বাক্যরূপে মনে উপস্থিত হয়।

ত্রিভুজ শব্দ শুনিলে এক প্রকার চৈতন্য উদয় হয়। আবার ত্রিভুজ ক্ষেত্র

---

* Presentative or objective consciousness Presentative-representative cognition; concrete idea

† Representative or subjective consciousness; concrete Idea.

‡ Representative cognition, abstract idea; simple kind.

** Re-representative cognition, abstract idea; complex kind.

¶ Thought by means of images.

‖ Do Do language.

একটী অঙ্কিত দেখিলে অথবা দৃষ্ট না করিয়া কোন ত্রিভুজাকার পদার্থ স্পর্শ করিলে এক প্রকার চৈতন্য উৎপন্ন হয়। এই দুই প্রকার চৈতন্যের বিভেদ ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত উল্লিখিত শ্রেণিদ্বয় আবশ্যক। "আইস" শব্দ এবং হস্তের দ্বারা আহ্বান করিবার ইঙ্গিত মধ্যেও ঐরূপ বিভেদ। এস্থলে ইঙ্গিত ভাবনা বাক্যের দ্বারা বক্তব্য প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু দয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ধর্ম্ম ইত্যাদি পদার্থ, কথা ব্যতীত ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

ভাবনা, ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্যের মধ্যে ঐক্য বা অনৈক্য ব্যক্ত করে। ঐক্য সর্ব্বাঙ্গীন বা আংশিক। ঐ আংশিক ঐক্য অনুসারে পদার্থের শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হয়। এই নিমিত্ত ভাবনা অনেক স্থলে কেবল পদার্থের শ্রেণি ব্যক্ত করে। সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র এতদ্বিষয়ক কথার উপরে সংস্থাপিত।

ভাবনা চিন্তা রূপে পরিণত না হইলে তর্কাধীন হইতে পারে না। "তুমি কি ভাবিতেছ" বলিলে অনেকে প্রত্যুত্তর দিতে পারে না। কারণ তৎকালে তাহাদিগের ভাবনা ইঙ্গিত স্বরূপ থাকে। তাহা কথাতে হঠাৎ ব্যক্ত করিতে পারে না। কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে ঐ ইঙ্গিত ভাবনা পুনরায় স্মরণ হইবে এবং তখন ঐ স্মৃতি চিন্তারূপে ব্যক্ত হইতে পারিবে।* অর্থাৎ নানাবিধ স্মৃতি-চৈতন্যের শ্রেণি নির্ণীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ঐক্য অনৈক্য স্থিরীকৃত হইবে।

২। উল্লিখিত ভাবনা সমগ্র ব্যতীত আর এক প্রকার চৈতন্য আছে—যথা বেদনা। বেদনাশব্দ বেদনা এবং তদ্বিপরীত চৈতন্য—সুখ—উভয় প্রকাশার্থই নিয়োজিত হইয়াছে।

উদাহরণ। বেহারাদিগের কটূক্তি জনিত আমার বেদনা। অন্ধের কাতরোক্তি হেতুক বেহারা দিগের বেদনা। শ্যামের মনে অন্ধের পথনির্ণয়ে ক্লেশজনিত বেদনা। অন্ধের সাহায্যান্তে শ্যামের এবং গণিকার সুখ। সেই উপকার দর্শনে আমার সুখ। বেহারা দিগের বিশ্রাম সুখ। আমি অন্ধের কোন উপকার করিনাই তন্নিমিত্ত দুঃখ। কুষ্ঠ রোগের চিত্র স্মরণে আমার বেদনা; সেই রোগ আমার হইতে পারে এই চিন্তা বা আশঙ্কা ঘটিত আমার বেদনা। কুষ্ঠস্পর্শ হইতে অব্যাহতি জনিত আমার সুখ।

৩। তৃতীয় শ্রেণীস্থ চৈতন্য মনবেগ। উদাহরণ বেহারাদিগের প্রতি আমার ক্রোধ। অন্ধের স্পর্শ বিষয়ে আমার আশঙ্কা। অন্ধের প্রতি শ্যাম এবং গণিকার দয়া। কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মপালনে আমার অনুরাগের অভাব।

---

* ভাষাজ্ঞান যত উন্নত হয় ততই ভাবনা পরিষ্কৃত রূপে চিন্তার আকার প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তি বিশেষ এবং জাতি বিশেষ উভয়ের মুখ নিঃসৃত ভাষার প্রতিই এই কথা বর্ত্তে। বালক, স্ত্রীলোক অশিক্ষিত ব্যক্তির ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে চিন্তাতে নিয়োজিত হয়। ইংরাজ ও ইংরাজির তুলনায় বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভাষীগণ এই বিষয়ে নিকৃষ্ট।

শেষোক্ত দুই প্রকার চৈতন্য অর্থাৎ বেদনা এবং মনবেগ আপাততঃ এক মনে হয়; কিন্তু ক্রোধ ভয় বা দয়া আদি চৈতন্য এবং তাহার পরিণাম স্বরূপ সুখ বা দুঃখ স্বরূপ চৈতন্য নিতান্ত বিভিন্ন।

৪। ক্রিয়া বলিতে স্বভাবতঃ বাহ্যিক ক্রিয়াই বুঝা কর্ত্তব্য।

ভাবনা, মনবেগ এবং সুখদুঃখ-চৈতন্য এই তিন প্রকার চৈতন্য মধ্যে ভাবনা এবং সুখ দুঃখ সহজে বোধগম্য হইবে। মনবেগ বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট।

মনবেগ—ভাবনা নহে। নতুবা পৃথক নামের প্রয়োজন ছিল না। দয়া ক্রোধ, ভয় ভরসা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি মনবেগ বিশেষের নাম। নামকরণ হইলে সকল পদার্থই চিন্তার আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মনবেগ ভাবনা স্বরূপ না হইয়াও চিন্তা রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

কিন্তু মনের যে অবস্থার নাম দয়া, ক্রোধ, ভয়, আকাঙ্ক্ষা বা অন্য কিছু তাহা ভাবনা স্বরূপ নহে। সংজ্ঞা কোথায় প্রকাশ হয় অনেক স্থলেই তাহার স্থান নির্ণয় হয়। মনবেগের স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না। স্মৃতিতে পূর্ব্বকালীন চৈতন্য সমস্তই পুনরুদ্দীপিত হয়; কিন্তু সাক্ষাৎ চৈতন্য এবং স্মৃতি চৈতন্য পরস্পরের অনুরূপ হইলেও উহাদিগের ন্যূনাতিরেক অনুভব হয়। মনবেগের সাক্ষাৎ ও স্মৃত অবস্থার মধ্যে লক্ষণ ভেদ নাই। কিন্তু মনবেগের স্মৃতি ভাবনা মাত্র; ইহার সহিত স্মৃত মনবেগের বিস্তর প্রভেদ। যেহারাদিগের আচরণ দেখিয়া আমার ক্রোধ হইয়াছিল। সেই আচরণের স্মৃতি চৈতন্য কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অবস্থাতে এখনও উদয় হইতেছে। কিন্তু ঐ কথা স্মরণ করিলেও কখন কখন ক্রোধ হয়। এই দুই প্রকার ক্রোধের মধ্যে কোন বাধায় নাই। অথচ "ক্রোধ হইয়াছিল" এই কথা স্মৃতি এবং চিন্তা মাত্র, মনবেগ নহে।

মনবেগ সুখ নহে দুঃখও নহে। আমরা অনুক্ষণ মনবেগের বশবর্ত্তী কিন্তু সুখ দুঃখের চৈতন্য সকল সময়ে অনুভব করি না। বিশেষতঃ সুখ এবং দুঃখ মনবেগের অনুবর্ত্তী। সুখ দুঃখের চৈতন্য সহজেই ভাবনা বা চিন্তার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। মনবেগ চিন্তারূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে উহার লক্ষণ ভ্রষ্ট হয়। সুখ দুঃখের পূর্ব্ববর্ত্তী চৈতন্যের মধ্যে মনবেগ অবস্থান করে।

মানসিক ক্রিয়ার তালিকার শেষভাগে IV সংখ্যাতে ক্রিয়া নাম লেখা গিয়াছে বাস্তবিক উহা মানসিক ক্রিয়ার পরিণাম মাত্র। ক্রিয়া বলিতে বাহ্যিক ক্রিয়া বা কথা যাহাতে দেহ সঞ্চালিত হয় এবং যাহা পুনরায় সজ্ঞা গোচর হয় তাহাই বুঝিতে হইবে।

মনবেগ উল্লিখিত ক্রিয়াতে পরিণত হয়। মনবেগ চরিতার্থ হইলে সুখ; অবরুদ্ধ হইলে দুঃখ। ঐ সুখ দুঃখরূপ ফল প্রতীক্ষাকালে মনবেগ স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকে।

ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বেচ্ছা (volition) নামে (III সংখ্যক) আর এক

প্রকার চৈতন্য পরিগণিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে অনেক মতামত আছে। ফলতঃ যাঁহারা স্বেচ্ছাকে অন্যান্য মানসিক অবস্থার অনধীন বলিয়া গণ্য করেন তাঁহারাও মনবেগের অস্তিত্ব এবং দোষগুণ অস্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে মনবেগ সম্বরণ ও পালন করা স্বেচ্ছাধীন এবং সেই নিমিত্ত, সৎ-প্রবৃত্ত-বেগের দোষগুণ স্বেচ্ছাতে বর্ত্তে, মনে করিয়াই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে হয়। ইহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা স্বেচ্ছাকে, মনবেগ ভাবনা এবং সুখ দুঃখরূপ চৈতন্যের অধীন গণ্য করেন। উভয় পক্ষেই মনবেগের লক্ষণ বিচার করা আবশ্যক; এতাবতা স্বেচ্ছা বিষয়ক বিচারের আড়ম্বর করা অপ্রয়োজন।

ভাবনা মনবেগ এবং সুখ দুঃখ এই তিন শ্রেণিস্থ চৈতন্য, কখন স্বশ্রেণিতে কখন ভিন্ন শ্রেণিতে এক হইতে অন্যের উৎপাদন করে। এক ভাবনা হইতে অন্য ভাবনা এবং এক মনবেগ হইতে অন্য মনবেগ উপস্থিত হইয়া থাকে; কখন ভাবনা হইতে মনবেগ বা সুখ দুঃখ, এবং কখন বা মনবেগ হইতে ভাবনা বিশেষের উদ্দীপন হয়।

মনবেগ কতপ্রকার হইতে পারে তাহা গণনা করা কঠিন। যত প্রকার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রকাশ হইবে, তাহা হইতে হয় সুখ নচেৎ দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অথবা সুখ-দুঃখের সংযোগ এবং ঐ সংযোগ হেতুক উভয়ের সমভাব কিম্বা অন্যতরের আধিক্য প্রকাশ হইবে। সুতরাং প্রত্যেক ক্রিয়া উপলক্ষে সুখ বৃদ্ধি বা দুঃখ নিবারণ নিমিত্ত মনমধ্যে এক একটী পৃথক আকাঙ্ক্ষা(অর্থাৎ মনবেগ)প্রস্ফুটিত হইতে পারে। এত প্রকার মনবেগের লক্ষণ বুঝিতে হইলে তৎসমুদায়ের শ্রেণি নির্ব্বাচন করা আবশ্যক।

(৩)

আমাদিগের ইন্দ্রিয় সমগ্র, প্রত্যক্ষ পদার্থ, তদ্ভিন্ন দেহ মধ্যে দুই প্রকার(nerve) স্নায়ু দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার এক প্রকার হইতে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, উহার নাম সংজ্ঞাস্নায়ু (sensory nerve) এবং দ্বিতীয় প্রকার স্নায়ু হইতে অঙ্গ সঞ্চালিত হয় তাহার নাম চালকস্নায়ু (motor nerve).

সংজ্ঞা এবং ক্রিয়া এতদুভয়ের ব্যবধান মধ্যেই নানা প্রকার চৈতন্যের অবস্থিতি। চৈতন্য যাহার, তাহারই মনে অনুভূত হইয়া থাকে। অপর ব্যক্তির মনে কি চৈতন্য হইতেছে তাহা আমার প্রত্যক্ষ করা অসাধ্য; সেই ব্যক্তির মুখভঙ্গি দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে তাহার চৈতন্য এইরূপ হইবে; অথবা তদুক্ত বচন বিশ্বাস করিলে আপনার উপলব্ধি মতে কোন অবস্থা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু এপ্রকার উপলব্ধি অনুমান মাত্র।

যদি মস্তিষ্কের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষরূপে নির্দ্দেশ করা যাইত তাহা হইলে বলিতে পারিতাম এই ব্যক্তির মস্তিষ্কের অমুক স্থানে এই লক্ষণ হইয়াছে অতএব ইহার মানসিক অবস্থা অমুক প্রকার হইবে।

মনোবিজ্ঞানের এতাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিলে হয়তো মনবেগ সংক্রান্ত অঙ্গ সমষ্টি, সংজ্ঞার অঙ্গের (ইন্দ্রিয়ের) ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত এবং মস্তিষ্কের অমুক অঙ্গ হইতে এইরূপ ক্রিয়া ও এরূপ মনোবেগ উৎপন্ন হয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত। এতাদৃশ জ্ঞান থাকিলে মনবেগের শ্রেণি নির্ব্বাচন করা সহজ হইত। তদভাবে কল্পনা করিয়া মনবেগের শ্রেণি স্থির করিতে হইবে।

এই রূপ কল্পনার দ্বারা (by the subjective method) কোন বিষয়ের শ্রেণি সংস্থাপনার্থ কেবল পদার্থের লক্ষণ ভেদ দেখিলেই হইবে এমত নহে। যে কার্য্যের উদ্দেশ্যে শ্রেণি সংস্থাপন করা যাইবে তাহার প্রতিও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

আমরা ধর্ম্মের লক্ষণ স্থির করিবার নিমিত্ত মনবেগের শ্রেণি বিভাগ করিতে চেষ্টা করিতেছি। অতএব যে সকল ক্রিয়াতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই তাহার প্রতি উপেক্ষা করিলে ক্ষতি হইবে না। অথবা যদি কোন মনবেগ বিশ্লেষ করিলে কিয়দংশ ধর্ম্ম এবং কতক অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাহা হইলে এতাদৃশ মনবেগ প্রকারান্তরে ব্যক্ত করাই শ্রেয়।

আমরা জগদীশ্বরের বিচার উপলক্ষ করিয়া ধর্ম্মের লক্ষণ স্থির করিতেছি না। জগদীশ্বর বল বা নৃপুঞ্জ বল ইহারা যে বিধান করিয়াছেন তাহা মনুষ্য প্রকৃতিতে বিদ্যমান আছে এই অনুমান স্বীকার করিয়া আমরা আত্ম মনের ব্যবস্থা নির্ণয় করিতেছি। এতদর্থে মনবেগের শ্রেণি নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই কথা স্মরণ করা আবশ্যক যে মনুষ্য একাকী বাসকরে না। জন সমাজে সকলেই পরস্পরের আচরণের উপরে অনেকাধিক নির্ভর করে। অতএব মনুষ্য মধ্যে অহং এবং পর, এই দুই শ্রেণি সহজেই লক্ষিত হইবে। আমি এক এবং আমি ভিন্ন যত কিছু দেখিতে পাই সমস্তই দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ। এই দ্বিতীয় শ্রেণিতে অন্য মনুষ্য, অন্যজীব, অন্য দ্রব্য ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থ থাকিতেছে।

আমি, আমার মন, আমার মনবেগ, আমার ক্রিয়া, আমার সুখ: এই সমস্ত এক শ্রেণি।

অন্য ব্যক্তি, অন্য সম্প্রদায়, তাহাদিগের সুখ, দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ ইহারা "পর"।

অতএব মনবেগ দুই প্রকার। যে ক্রিয়াতে আত্মসুখ হয় সেই ক্রিয়াজনক মনবেগ এবং যাহাতে পরের সুখ হয় তদাশ্রিত মনবেগ। ইহাদিগের নাম থাকুক (১) স্বার্থপর প্রবৃত্তি (২) পরার্থপর প্রবৃত্তি।

উল্লিখিত প্রবৃত্তি গুলি এক সম্প্রদায়ের মতে নিম্ন লিখিত রূপে শ্রেণিবদ্ধ হইতে পারে।

স্বার্থপর প্রবৃত্তি।

একান্ত স্বার্থপর প্রবৃত্তি।

রক্ষনেচ্ছা।—মোহ।

- দেহ রক্ষামূলক প্রবৃত্তি। ....
  - যথা গ্রাসাচ্ছাদনের ইচ্ছা। ১
- বংশ রক্ষামূলক প্রবৃত্তি। ২ প্রকার
  - মৈথুনেচ্ছা। ২
  - বংশবৃদ্ধি বাসনা। ৩

বর্দ্ধনেচ্ছা। লোভ।

- হরণ প্রবৃত্তি, যথা যুদ্ধ বিনাশ বা বলপ্রয়োগ দ্বারা হরণ করিবার বাসনা। ৪
- সৃজন প্রবৃত্তি যথা শ্রম জনিত ফললাভের বাসনা। ৫

সামাজিক বৃত্তি।

- প্রভুত্ব বাসনা। ৬
- যশঃ বাসনা। ৭

পরার্থপর প্রবৃত্তি।

ধর্ম্ম প্রবৃত্তি।

- প্রণয় ১
- ভক্তি ২
- দয়া ৩

উল্লিখিত মনবেগ সমূহের বিস্তারিত পর্য্যালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহাতে এই পর্য্যন্ত প্রদর্শন করা অভিপ্রেত যে আমরা নানা প্রকার মনবেগের বশবর্ত্তী হইয়া যে সমস্ত মানসিক অথবা বাহ্যিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করি তাহার লক্ষণ সমূহ যোগ বিয়োগ করিলে উল্লিখিত মনবেগ সমূহের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে গণ্য করিতে পারা যায়। ফলতঃ আমরা মনবেগগুলির বিশেষ লক্ষণ সংক্রান্ত বাদানুবাদ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত কেবল সাধারণ লক্ষণের উপরেই নির্ভর করিব। তবে উদাহরণ দিবার সময়ে অগত্যা পৃথক রূপে মনবেগ গুলির উল্লেখ করিতে হইবে। সে যাহা হউক ভরসা করি উল্লিখিত নামাবলী হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে আমাদিগের সমস্ত কার্য্য হয় আত্ম সুখের উদ্যোগে নতুবা অন্যের সুখের উদ্যোগে নিযুক্ত হয়।

অন্যের সুখসাধন বাসনা মনবেগের মধ্যে গণনীয়। ইহা চরিতার্থ হইলে আত্মসুখও হইতে পারে কিন্তু পরার্থপর মনবেগ সম্বন্ধে আত্মসুখ গৌণ উদ্দেশ্য পরের সুখ মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক সম্প্রদায়ের মতে আত্মসুখই সকল ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। তাঁহারা বলেন পরার্থপরতা আত্মসুখ চেষ্টার ফল মাত্র। ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে মস্তিষ্কের গুণ সমস্ত

যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে না পারা যাইবে সে পর্য্যন্ত মনোবিজ্ঞান অগত্যা অসম্পূর্ণ থাকিবে। সুতরাং উল্লিখিত মতের বাদানুবাদে বিশেষ উপকার দেখিতে পাই না। তবে একথা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে অনেক স্থলেই পরিণামে সুখলাভের প্রত্যাশা বশতঃ প্রথম কল্পে দুঃখ স্বীকার করিতে হয়। সুখোপার্জ্জনের চরম সীমা কোথায় তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে অথচ কষ্ট স্বীকার স্থলে চরম সুখের বিস্তর উল্লেখ হইয়া থাকে। ফলতঃ ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি অনুসারেই হয় সুখ নতুবা ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মানুক্লেশের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। পরোপকার ধর্ম্ম অতি দুর্লভ হইলেও সকলেই কোন কোন সময়ে উহা প্রতিপালন করিয়া থাকে। তৎকালের মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে যদিও অভ্যাস বা পূর্ব্ব চিন্তা অনুসারে দয়াবেগ তৃপ্তি জনিত আত্মসুখ স্মৃতি বহির্ভূত না হয় তথাচ তখন পরোপকার বাসনা এত প্রবল হইয়া থাকে যে উহাকে গৌণ বলা কোন মতেই সঙ্গত নহে। স্থূল কথা, আত্ম সুখকে সর্ব্ব-ক্রিয়ার উদ্দেশ্য বলিলেও দুই প্রকার আত্মসুখ স্বীকার করিতে হইবে। প্রথম আত্মসুখ চেষ্টার পরিতোষ জনিত সুখ এবং দ্বিতীয় অন্যের সুখসাধন-জনিত আত্মসুখ। সুতরাং প্রকারান্তে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা ব্যঞ্জক দুই প্রকার শ্রেণিই স্বীকার করিতে হইবে।

মনবেগ গুলির লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলে আর একটী কথা প্রকাশ হইবে যে আমাদিগের মনে নানাবিধ বেগ অনুক্ষণ প্রবল রহিয়াছে। অথচ অনেক সময়ে তাহার উপলব্ধি হয় না। "এখন আমার মনে কোন বেগ জাগরূক আছে।" এই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে জাগৃত মনবেগের রূপান্তর হইয়া চিন্তা বা বাক্য উৎপন্ন হইতে পারে। অনেকের সম্যক পরিমাণে এরূপ চিন্তা উদয়ই হয় না কিন্তু ঐ চিন্তা ব্যতীত মনবেগের লক্ষণ নির্ণয় করা এমন কি, অস্তিত্ব স্থির ~~করাই~~ কঠিন হইয়া উঠে।

আমি অন্ধকে দেখিয়া চিন্তা করিয়াছিলাম বেহারাগণকে কটূক্তি করিতে এবং জল নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করি; কিন্তু সেই সময়ে লজ্জাবেগ ও ভয়বেগ উপস্থিত হইল। আমার প্রভুত্ব এবং যশ বাসনার বিঘ্ন দেখিলাম, দেখাতে দয়াবেগ নিবারিত হইল। কিন্তু ঐ লজ্জা এবং ভয় স্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ স্বার্থপর বলিয়া প্রকাশ হইল না। অচিন্তিতরূপে অথবা গূঢ় ভাবে থাকিলেও মনবেগ দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবার ব্যাঘাত হয় না। উল্লিখিত স্থলে বোধ হয় লজ্জা ও ভয়ের স্বার্থপর লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ঐ স্বার্থপরতা দমন করিবার ইচ্ছাও উদয় হইত।

উল্লিখিত উদাহরণ হইতে তিনটী প্রতিজ্ঞা সংস্থাপিত হইবে।

(১) মনবেগ সকল সময়েই কোন আকারে মনে অবস্থান করে।

(২) যে মনবেগ জাগ্রত থাকে তাহা চিন্তাকারে পরিণত না হইয়াও আমাদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

(৩) মনবেগ স্বধর্ম্মানুসারে আত্মোপযোগী ভাবনা উদ্দীপন করে। (উদাহরণ) আমার স্বার্থপর বেগের প্রাদুর্ভাব বশতঃ অন্ধদর্শন মাত্রেই তাহার কুষ্ঠব্যাধি এবং সেই সঙ্গে কুষ্ঠ রোগের সংক্রামক গুণ স্মরণ হইল; দয়ার লক্ষণ বা মাহাত্ম্য স্মরণ হইল না।

ধর্ম্মের লক্ষণ যেরূপ হউক ঐ লক্ষণ নির্দিষ্ট ক্রিয়ার পূর্ব্বে তদুপযোগী মনবেগ উদয় হওয়া আবশ্যক। নতুবা সেই ক্রিয়া সর্ব্বোতোভাবে ধর্ম্ম নামে পরিগণিত হইবে না। ক্রিয়া যে মনবেগ অনুসারে নিষ্পন্ন হইবে সেই মনবেগের লক্ষণ বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে। এবং কোন মনবেগের চৈতন্য উদয় হইয়া যদি তদনুযায়ী কার্য্যের উদ্যোগ না হয় তবে ঐ চৈতন্য ভাবনা মাত্র। সেই ভাবনার মনোহারিত্ব বিষয়ক সুখও উদয় হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা ঐ মনবেগ সংশ্রুত নহে। মনবেগের চরিতার্থতা জনিত সুখ প্রাগুক্ত ভাবনার মনোহারিত্ব বিষয়ক সুখ হইতে বিভিন্ন। অন্ধদর্শন কালে যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম বিষয়ক যে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং শ্যামের উদ্দেশে যে প্রশংসা করিয়াছিলাম তাহা দয়া বা ভক্তি নহে; দয়া ও ভক্তি বিষয়ক সৌন্দর্য্যের ভাবনা মাত্র।

ভাবনার (ideation) উপরে মনবেগের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ধর্ম্মানুশীলনার্থে মনবেগের শিক্ষা সাধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন অনায়াসে স্বীকৃত হইবে। কেননা ক্রিয়া সম্বন্ধে মনবেগের প্রাধান্য কেহই অস্বীকার করেন না। ভাবনা সম্বন্ধে কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন বটে মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতার বলে ভাল মন্দ ভাবনা (idea) চিনিতে পারা যায়। অতএব পুস্তকাদি পাঠ দ্বারা নানা প্রকার ভাবনা সংকলন করাই আবশ্যক। কিন্তু ভাবনার ভাল মন্দ চিনিতে পারিলেই যে মনবেগ অবার্যরূপে সৎপথে প্রবর্ত্তিত হইবে ইহা মহা ভ্রম।

যাঁহারা স্বেচ্ছার কর্ত্তৃত্ব বিষয়ক মতের অনুরাগী তাঁহাদিগের স্মরণার্থ বলা আবশ্যক যে তাঁহাদিগের মতে মনবেগ পালন ও দমনার্থ স্বেচ্ছা নিয়োগ করিতে হয়; সুতরাং ক্রিয়া ও ভাবনার উপরে মনবেগের প্রাধান্য স্বীকার করাতে স্বেচ্ছার স্বাধীনতা বিষয়ে অস্তি নাস্তি কোন মীমাংসাই হইল না। স্বাধীন স্বেচ্ছা কদভ্যাস বশতঃ দূষিত হইলে মন্দ মনবেগকে দমন করিতে পারে না। সুতরাং স্বেচ্ছার স্বাভাবিক স্বাধীনতা থাকিলেও কদভ্যাসস্থলে তাহা পুনরায়ত্ত করিবার প্রয়োজন এবং তদর্থে মনবেগের সুশিক্ষা সাধন করা আবশ্যক হয়।

মনবেগের দুই শ্রেণি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; স্বার্থপর এবং পরার্থপর। স্বার্থপর মনবেগ না থাকিলে আমাদিগের জীবন ধারণ বা বংশরক্ষা হইত না; সুতরাং সমাজ পালনের উপায়ও বিনষ্ট হইত। স্বার্থ-

পরতাকে যতই পাপের মূল বলিয়া নিন্দা করি, উহার ধ্বংশ বাঞ্ছনীয় নহে।

সন্ন্যাস আশ্রমের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শুনা যায় তাহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী বলিয়া কেহই প্রকাশ করেন না। যে ধর্ম্ম সকলের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে, সমাজে তাহার প্রাধান্য কল্পনা করা বিফল। সন্ন্যাসী সমস্ত মনবেগ ধ্বংশ করিতে অভিলাষ করেন। তিনি কখন কৃতকার্য্য হইতে পারুন না পারুন, তাঁহার উপদেশ দ্বারা একটী মীমাংসা হইবে যে সংসারাশ্রম, মনবেগ-ধ্বংশের উপযোগী নহে; সংসার প্রতিপালন করিতে হইলে মনবেগ ধ্বংশ করিবার চেষ্টা মনের ভ্রান্তি। আমরা সংসারের অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া ধর্ম্মের লক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছি ইহাতে মনবেগ নাশের ফলাফল চিন্তা করা বৃথা।

সন্ন্যাসীর মত ঈশ্বরাদেশ ব্যতীত প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যদি জগদীশ্বর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে তাঁহার সমীপে নির্ব্বাণই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় পদার্থ এবং জন্মানুক্রমে মনবেগ ধ্বংশ করিবার চেষ্টাই উহার উপায় তাহা হইলে ইহার প্রত্যুত্তর নাই। এরূপ আদেশমতে অবশ্যই উপপন্ন হইবে যে সাংসারিক কার্য্যের ব্যবস্থা সন্ন্যাস-আশ্রমের উপযোগী এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের ব্যবস্থা মনবেগ-ধ্বংশের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাহাঁরা প্রাগুক্ত মূল কথার মীমাংসা করিতে পারেন নাই এবং না পারা হেতুক বা অন্য কারণে সংসার আশ্রমের মাহাত্ম্য অমান্য করিতে পারেন না তাঁহাদিগের নিমিত্ত অন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন।

অতি পূর্ব্বকালে এক মত প্রচলিত ছিল যে, সকল বিষয়ের আতিশয্য এবং অত্যল্পতা ত্যাগ করিতে পারিলেই ধর্ম্ম হয়। ফলতঃ স্বার্থপর বেগের আতিশয্যে পাপ এবং অভাবে সংসার নাশ এই উভয় সঙ্কটস্থলে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই মতের প্রতিবাদ এই যে ঐ মধ্যবর্ত্তী অবস্থার সীমা কি প্রকারে নির্ণীত হইবে? মনবেগের দৈর্ঘ্য কি ওজন নাই যে সংখ্যার দ্বারা পরিমাণ নির্ণীত হইবে। যে সীমা অতিক্রম করিলে মনবেগের দোষ হয় তাহাই উহার আতিশয্য এবং অভাবের মধ্যবর্ত্তী। কিন্তু সেই সীমা নির্ণয়ার্থ উপায়ান্তর প্রয়োজন।

মনবেগ সমূহের যেরূপ শ্রেণী নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহার প্রতি অনুধাবন করিলে কএকটী কথা প্রকাশ হইবে।

১। মনবেগ সমূহ মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধ ভাব আছে। এই বিরোধ দুই প্রকার (ক) প্রত্যেক ব্যক্তির আত্ম চৈতন্য ঘটিত বিরোধ। (খ) ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের মনবেগের ঐক্যের বিশেষ জনিত বিরোধ।

২। পরার্থপর বেগ হইতে মনুষ্য পরম্পরা মধ্যে বিরোধ জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ দয়া সর্ব্ব বিরোধ ধ্বংশ করে।

৩। স্বার্থপর বেগ পরার্থপর বেগ অপেক্ষা অনেক অংশে প্রবল।

৪। আত্ম চৈতন্য মধ্যে স্বার্থপরতা যেরূপ পরার্থপরতার বিঘ্নোৎপাদন করে পরার্থপরতা সেরূপ করে না।

প্রথমতঃ মনুষ্য পরম্পরা মধ্যে স্বার্থপরতা হেতুক যেরূপ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা অনায়াসেই অনুভূত হইবে।

রক্ষণেচ্ছা দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্যসামগ্রীর জন্য পিতা পুত্রেও বিরোধ ঘটনা হয়। সামাজিক ব্যবস্থাতে গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ক স্বার্থপরতা তাদৃশ প্রকাশ পায় না; কেননা ঐ ব্যবস্থাতে অনেক পরার্থপরতা নিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু একবার ঐ ব্যবস্থার উচ্ছৃঙ্খল ঘটিলে গ্রাসাচ্ছাদনের বিরোধ যত প্রবল হয় জগতে এমত আর কিছু দৃষ্ট হয় না। বংশ রক্ষণেচ্ছার অত্যাচার বিবাহ বিধির দ্বারা কথঞ্চিৎ দমন হইয়া থাকে *। যেখানে এতদ্বিষয়ক নিয়মের শিথিলতা ঘটে সেখানে সকলেই স্ব স্ব ভোগ্য বস্তু উপলক্ষে বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রকৃত বংশবৃদ্ধির লালসা পরীক্ষা করা আবশ্যক হইলে স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি অবলোকন করা কর্ত্তব্য; তাহাতে প্রকাশ হইবে যে সন্তানকামনার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ সতীত্ব ধর্ম্মেও জলাঞ্জলী দিয়া থাকে। ফলতঃ বিবিধ রক্ষণেচ্ছা ঘটিত বিরোধ প্রধানতঃ অসভ্য জাতি এবং পশু পক্ষী গণের মধ্যেই দেখা যায়। মনুষ্যের সামাজিক ব্যবস্থাতে ইহা অনেক শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

হরণেচ্ছা। হরণ শব্দ অপহরণ প্রকাশার্থ প্রয়োগ করি নাই। অন্যের অধিকৃত বস্তু সম্মতি ব্যতীত গ্রহণের নাম হরণ। এই ইচ্ছা পরিতোষের এক মাত্র উপায় বল প্রয়োগ। ছলনা, সম্মতিলাভ বা আপত্তি নিবারণের উপায় মাত্র। যেখানে কোনপ্রকার বল প্রয়োগ দেখা যায় সে খানে হরণেচ্ছা বা ধ্বংশ বাসনার প্রাদুর্ভাব অবশ্যই লক্ষিত হইবে। হরণেচ্ছার বাহুল্য হেতুক যেমন পরসুখ নাশের চেষ্টা উপস্থিত হয় সেইরূপ অন্য কর্ত্তৃক হরণ নিবারণার্থেও ধ্বংশ বাসনা উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্ম রক্ষার নিমিত্ত এইরূপ বাসনা অপেক্ষাকৃত নিঃস্বার্থ হইলেও ইহা হইতে আক্রমণকারী শত্রুর প্রাণ বা বল হরণাদি নানাবিধ ক্রোধের কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ইহাও হরণেচ্ছার অন্তর্গত। ক্রোধ নানা প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের কল্পনা এই যে কোন অভীষ্ট সাধনকালে কোন স্বার্থপর বেগের বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, সেই বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত যে মনবেগ উপস্থিত হয় তাহাই ক্রোধ নামে স্বার্থপর বেগের মধ্যে গণনীয়। এই মর্ম্ম

* যাঁহারা স্বানুবর্ত্তিতার অনুরোধে বিবাহ পদ্ধতির রূপান্তর অভিলাষ করেন তাঁহাদিগের এই কথা গুলি বিশেষরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক। স্বানুবর্ত্তিতা সদানুষ্ঠানে নিয়োজিত হইলেই ভাল নতুবা স্বেচ্ছাচার সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলিত করিয়া ফেলে।

স্বীকার করিলে অভিমান, খেদ, ঘৃণা, তাচ্ছল্য, বৈরক্তি, অনেক ব্যক্তির বৈরাগ্য, ইত্যাদি নানাবিধ মনবেগ, ক্রোধ এবং হরণেচ্ছার লক্ষণ বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। হরণেচ্ছার প্রধান ক্রিয়া যুদ্ধ। পৃথিবীর যত বিবাদ সমস্তই এই মনবেগ হইতে উৎপন্ন হয়। ধর্ম্ম বিষয়ক সকল মতেই এই বেগ দমনের উপদেশ দৃষ্ট হইবে। এমন কি কোথায় কোনমাত্র মাহাত্ম্যই স্বীকৃত হয় না। ইহার ফল এই যে সংসারী ব্যক্তিরা মনে করেন ক্রোধ দমন করা বৈরাগ্যের অঙ্গ এবং সামাজিক ব্যবহারের পক্ষে অযোগ্য। এরূপ মনে করিলে প্রাগুক্ত উপদেশের প্রতি উপেক্ষা করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। এই ভ্রম দূরীকরণের উপায় পরে প্রদর্শিত হইবে। আপাততঃ হরণেচ্ছা লোক পরম্পরা মধ্যে সমস্ত বিরোধের মূলীভূত কারণ ইহাই স্বীকার করা আবশ্যক।

সৃজনেচ্ছা। সৃজনেচ্ছা পরিতোষ করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে হয়। ভূমিকর্ষণ পূর্ব্বক শস্য সংগ্রহ (agriculture); শস্য ও ভূগর্ভস্থিত পদার্থ হইতে নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদন (manufacture) এবং আমদানি রপ্তানির দ্বারা ঐ সকল সামগ্রীর বিনিময় (commerce) সমস্তই শ্রম এবং সৃজনেচ্ছার ফল। ঐ শ্রম হ্রাস করণার্থই ছলনা নিয়োজিত হয়। একজন কর্তৃক দ্রব্যজাত সৃজন বা আহরণ হইলে অন্যের হরণ প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়া বিরোধ ঘটায়। সৃজনের দ্বারা হরণ প্রবৃত্তি অনেক দমন হয় বটে কিন্তু মনুষ্য শ্রমকাতর এবং তজ্জন্য সৃজনেচ্ছা তাদৃশ প্রবল হইতে পারে না। প্রথম কল্পে হরণের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া পরে হরণের বিঘ্ন দেখিলে অগত্যা সৃজন প্রবৃত্তি সঞ্চালন করিতে শিখে। হরণের ফললাভ আস্বাদন না করিলে সৃজন বাসনার উদ্রেক হয় না এবং সৃজন ব্যতীত সংসারের উন্নতি হইতে পারে না। আবার সৃজনের বৃদ্ধি এবং শ্রমের অভ্যাস সহকারে হরণের সীমা সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে।

যাঁহারা আত্মীয়গণের প্রতি ক্রোধ সম্বরণের চেষ্টা না করিয়া, শত্রু বা অনাত্মীয়দিগের সহিত সম্পূর্ণ শান্তিভাব স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য মনবেগের বশবর্ত্তী, সুতরাং তাঁহাদিগের চেষ্টা বাহিরে সুসিদ্ধ হইলেও অন্তরে নিবারিত হয়। কত লোক দেখিতে পাওয়া যায় যে পিপীলিকার প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করেন কিন্তু আপন সন্তান, ভৃত্য বা প্রজাগণের প্রতি ক্রোধ করিয়া ক্ষুব্ধ চিত্ত হন না।

ক্রমশঃ

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলী।

গোবর্দ্ধন শেখর।

সময় নিশীথ।

বীণা হস্তে নারদ মুনির স্বর্গ হইতে উত্তরণ—

এই গোবর্দ্ধন গিরি!—নিয়ে বৃন্দাবন
মর্ত্ত্যে সুরবন নন্দন কানন সম।
শোভিছে সুন্দর দূরে তমালের শ্রেণী
বিভূষিত চন্দ্রমার কৌমুদী ভূষণে!—
অদূরে চলিছে নাচি রজতাম্বুময়ী
যমুনা পূত সলিলা জাহ্নবী সঙ্গমে!
চলিছে তাসহ রঙ্গে যত তরঙ্গিণী
উন্মত্তা যৌবন গর্ব্বে!
—আলুলায়িত কবরী মাঝারে
প্রভাতিছে নিরুপম চন্দ্রকান্ত মণি!
স্বনিছে মলয়ানিল সুস্বনে উচ্ছাসি
যমুনার পবিত্র সলিলে
অবগাহি বপু!—কি মনোহর স্থান!—
বেড়িয়াছে ঊর্দ্ধে দেব রজনী রঞ্জনে
রজত জলদ মালা মণ্ডল আকারে!
কি মোনহর দৃশ্য!—বাজিছে অদূরে
মুরলী বৃন্দাবন বিমোহিত করি!
লক্ষ্মী অংশে ব্রজাঙ্গনা জন্মেছেন যত
নররূপী নারায়ণ তাসবার সহ
বিহারেন নিত্য নিত্য নিকুঞ্জ কাননে!
ধন্য বৃন্দাবন তোরে
মহা তীর্থ তুই অবনী মণ্ডলে!
অই বাজিছে আবার—
কি মনোহর তার!—দেখি পারি যদি তবে
বীণার তার মিলায়ে বান্ধিব—

(বীণার সুর বাঁধন)

বাজতরে বাপ—

(ক্ষণকাল বীণাবাদন)

ওঃ—বড় মজাই হয়েছে!—
সুরেন্দ্রাণী সহ রতি রম্ভা তিলোত্তমা
উর্ব্বশী মেনকা আদি আসিবেন আজি
হেথা দেখিবারে সম্মোহনে কতবল—
ফুল শরে কি পারে করিতে!—
আমোদের সীমা নাই কারো!
কি আপদ!—অর্দ্ধেক ইন্দ্রত্ব গিয়ে যদি
নিরখেন সুরেশ্বরী অধীর কুমারে
কুল শরে,—তাতেও প্রস্তুত!
এ মন্দ নয় খেলা!—
ভাল তিনি যেন দেবেন্দ্র, মহিষী
"দেখিব নীলাম্বু ঊর্ম্মি হেমাদ্রি শেখরে"—
মন্দাকিনী স্বর্গ ত্যজি বহিবে পাতালে!—
ভোগবতী ভীম নাদে ভেদিয়া পৃথিবী
নন্দন কানন বেড়ি বহিবে কল্লোলি!—
তাঁর পক্ষে এ আবদার কতকটা মানায়!
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা এরা কেন নাচে?
না!— তাদেরিবা দোষ কেন?
মূল লতা যেদিকেতে হেলে

শাখা পাতাও সেইদিকে হেলে তার সহ।
হুঁঃ—দেবরাজও ছিলেন সম্মত
কিন্তু বৃহস্পতি নিবারিলা তারে
দেবেন্দ্রের অগোচরে তাই
আসিবেন দেবেন্দ্রাণী।
এ খেলা খেলিতেই হবে।—
দোষিনা কুমারে আমি অবিদিত তাঁর
ফুল শর কি বিষম বাজে।
দেখ নাও ফুল শরে
উন্মাদ ... ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
... না হলে নারে কেন যোগ ভাঙ্গিবারে
নিমগ্ন যোগেন্দ্র যবে তপস্যা সাগরে
যবে ত্যজিলেন কাত্যায়নী
দক্ষালয়ে দেহ?—
যত দোষ ইন্দ্রাণীর।—
(বীণার প্রতি)
একটু থাক্ তবে বাপ
আগে লেগে যাক তার পরে বাজাইব—
(শচী, রতি, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা ইত্যাদির প্রবেশ)
শচী—প্রণমে ঋষীন্দ্র পদে তব চির দাসী
দেবেন্দ্রাণী—(প্রণাম)আশিস তাহারে।—
নারদ। (হস্ত উত্তোলন করিয়া)
পতি তব ত্রিদিবেন্দ্র।—
আপনি তুমি অনন্ত যৌবনা
তবে কিসের অভাব তব ত্রিদিব ঈশ্বরী?
আশিসিব কহ তা আমারে!
শচী।—কিসের অভাব মোর ওপদ প্রসাদে
দেবর্ষি।—সতত—এই ভিক্ষা করি
ওপদ প্রসন্ন যেন থাকে দাসী প্রতি!
নারদ।—বড ভালবাসি বৎস আমি দেবরাজে
তাঁহার মঙ্গল আমি চিন্তি অহর্নিশি!
তুমি তাঁর প্রণয়িনী
কবে অপ্রসন্ন আমি তোমাদের প্রতি?
(বীণার প্রতি)
হল নারে বাপ।—(স্বগত)
(প্রকাশে)—যাব আমি কৈলাশ শিখরে
ধবল শিখরে মগ্ন তাপসেন্দ্র তপে
একাকিনী কাত্যায়নী আছেন কৈলাশে
বিল্ব দলে মহা সাধে পূজিব মায়েরে!—
শচী।—উঃ— (অন্তর্দ্ধান)
বড ভয় হয়েছিল—বাচলাম এখন।—
রতি।—(উর্ব্বশীর হস্ত বুকের উপর দিয়া)
দেখ—
উর্ব্বশী।—এই যে তুমুল ঝড় বহিছে আলোড়ি
তব হৃদির প্রবাহে ফুলেন্দ্রাণী!—
শচী।—এখন সেনা নাথ এলে হয়!—
রম্ভা।—সে সন্দেহ সুরেন্দ্রাণী হবে না করিতে
অবশ্যই আসিবেন সুর সেনাপতি।
নির্জ্জনে তাঁহারে আমি কহিলাম কালি—
"নাহি ডর ফুল শরে সেনা সখা যদি
যাবে তবে কালি দেব গোবর্দ্ধন শিরে
শচি পতি অগোচরে নিশীথ সময়ে,
থাকিবেন কাম তথা তব অপেক্ষায়
আমরাও রব তথা দেবেন্দ্রাণী সহ
দেখিবারে—বুঝিবারে বড়াই দোঁহার।"—
উর্ব্বশী।—তার পর—
রম্ভা।—হাসি উত্তরিলা স্কন্দ—"যাব রম্ভা আমি
বল তুমি মন্মথে

মন সাধে যত বলে পাবেন মন্মথ
হানেন সে শর যেন।—বিষম ভাবিয়া
ব্যাকুল তোমরা যাহে—নহে কার্ত্তিকেয়
ডরে তাহে।—ফুলময় নহে মোর দেহ।
হেমাদ্রির ভার মোর সহে বাম করে!”—
রতি।—শুনিলেত সুরেন্দ্রাণী!—তারকে সংহারি
গরবে সেনানী নাহি ডরেন প্রাণেশে।—
আসেন নিশ্চিত যদি সেনানাথ আজি
দেখিব অপূর্ব্ব রঙ্গ সাধ ভরি তবে।—
শচী।—বড় সাধমনে সুরেন্দ্রাণী
অর্দ্ধেক ইন্দ্রত্ব দিয়ে যদি
তাতেও সম্মত—যদি গিরিজা নন্দনে
ফুল শরে ব্যাকুলিত পারি দেখিবারে!—
রম্ভা।—ফুল শরে অচলিত হেরিলে পুরুষে
ঈর্ষানলে প্রাণ মোর চাহে মরিবারে!—
রমণী কটাক্ষ যদি পুরুষের হৃদে
নারে জ্বালাইতে দাবানল মনানলে
কহ তবে কোন্ বালা নাহি মরে জ্বলি?—
রতি—বৃথা ফুলশর যদি ফুলশর হারে।—
আপনি হেমাদ্রি সম হৃদয় অটলে
নারেন ধূর্জ্জটি যাহে—সহিবেন তাহে
কার্ত্তিকেয়?—থাক কথা—বৃথা গর্ব্ব তার
নিশ্চয় হইবে খর্ব্ব সম্মোহন-বলে!——
তিলোত্তমা।—সুন্দে উপসুন্দে যবে চলিনু ছলিতে
আনন্দে চলিলা সঙ্গে সঙ্গী তব তবে।
উঠিতে শিখরে যুগ তুঙ্গ শৃঙ্গ সম
বিরাট মূরতি দ্বয়ে দেখিনু দাঁড়ায়ে
উপাড়িতে ক্রীড়া হেতু গিরি চূড়া করে!
দেখিনু আদিত্য দেবে শঙ্কিত অন্তরে
বেগে অনম্বর পথে ছুটিছেন পাছে
রোধে গতি ক্রীড়া হেতু প্রসারিয়া বাহু।—
হইনু নিকট যেই হানিনু অপাঙ্গে
হানিলা অনঙ্গ দেব অমনি তা সহ
টংকারি কুসুম ধনু।—বহিল অমনি
কুসুম সুবাস বাহী মলয় সমীর।
নব কিসলয় দলে শোভিল সুন্দর
মৃত তরু—নব মুঞ্জরিত ফুলাননে
বসিল অমৃত পানে উল্লাসে ভ্রমরা।—
উঠিল কুহরি পীক। হইল তরল
(সলিল পর্বত যথা তরল) মন্দর।
মন্দর সদৃশ দেহ হইল কাসহ
রম্ভা।—পড়িল খসি গিরি চূড়া ভূমে।—
অনবর তমুক অশেষে দিনা ভল গুল
চীবনাশা।—কার সাধ্য সহে স মোহনে?
শচী।—স্মর তব স্মরেশ্বরী তব প্রাণেশ্বরে।
(শচী, রতি, রম্ভা, উর্ব্বশী ইত্যাদি সকলে সমস্বরে)
ফেলিল সাগরে ফণের মাঝারে
জলদ বেষ্টিত গভীর অম্বরে
তুষার মণ্ডিত ভূধর শিখরে
শারদ শশীর কৌমুদী মাঝারে
নীহার নিষিক্ত নব দূর্ব্বাদলে
নীলনীরময়ী তটিনীর জলে
নব বিভাসিত প্রভাত কমলে
বায়ুবিলোড়িত তরঙ্গ সঙ্কুলে
মধ্যাহ্ন রবির প্রচণ্ডকিরণে
প্রসর মরুভ সৈকত শোভনে
অথবা রমণী বিলাস নয়নে
অথবা মানিনী মলিন বদনে
অথবা প্রণয়ী ললিত চুম্বনে

জলদে জলদে গভীর ঘর্ষণে
জলদ শোভিত বিজলি মালায়
কনক মণ্ডিত সাগর বেলায়
অথবা তরুর শীতল ছায়ায়
রসালে জড়িত স্বর্ণ লতিকায়
নীর নির্ঝরিণী রজত ছটায়
জলেব সম্পাতে নক্ষত্র প্রপাতে
গঙ্গাসাগবেব সঙ্গম সজ্ঘাতে
নব বধূ লাজ পূর্ণ কটাক্ষেতে
সুরভিত নব ফুল্ল পারিজাতে
কোকিল কুহরে ভ্রমব ঝঙ্কারে
জলধি গর্জ্জনে মরুত হুঙ্কারে
মানিনী সরোষ প্রণয় ভর্ৎসনে
পুত্র শোকাতুরা জননী রোদনে
নয়ন শ্রবণ মানস রঞ্জন, এই ত্রিভুবনে
সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা হও সমষ্টিত
সুরাঙ্গনা সমাদরে তোমা আবাহনে!—
নেপথ্যে।—মন্দাকিনী তটে আপনার মনে
ভ্রমিতে ছিলাম
বনফুল দলে আপনা লুকায়ে কিবা
দেখিলাম।

(কোরস্)

মন্দাকিনী কুলে কবরী এলায়ে
কাদম্বিনী জালে বিজলি ঢাকিয়ে
এক দেব বালা নয়ন মুদিয়ে
ঘুমায়ে ছিল!
নাসার নিশ্বাস সুরভি পবনে
কাঁপিতে আছিল অলকা সঘনে
সুমেরু কুমেরু বুকের বসনে
নাচিতে ছিল?—
যুগল নয়ন আছিল মুদিত
যেন তরবার পিধানে আবৃত
রাঙ্গিল অধর কিঞ্চিৎ কম্পিত
(স্বপনে হবে বা) হইতে ছিল
মলয় অনিলে বনজ বল্লরী
নাচিতে আছিল বুকের উপরি
যৌবন প্রবাহে রূপের লহরী
খেলিতে ছিল!
এক দেব সুত শরীর ঢাকিয়ে
তরুব আড়ালে আছিল দাঁড়ায়ে
অচল নয়নে মোহিত হইয়ে
দেখিতে ছিল!—

আরোপিয়া ফুল শর শরাসনে
দিলাম টংকার!
অব্যর্থ সন্ধান পলকে অমনি
বাজিল বিষম হৃদয়ে তার!—

(কোরস্)

রমণী প্রবাহে বিজলি খেলিল
হৃদয় সাগরে তুফান উঠিল
জ্ঞানের তরণী মগন হইল
অকুল সাগরে!
চপল নয়নে নিরখি সঘনে
চৌদিকে—চুম্বন দাগিলা বদনে!—
শিহরি অরুণ আরক্ত লোচনে
উঠিলা বালা—

পুন—
আরোপিয়া ফুল ফুলশরাসনে
দিলাম টংকার!
অব্যর্থ সন্ধান পলকে অমনি
বাজিল বিষম হৃদয়ে বালার!—

(কোরষ্)

গরল প্রয়োগে জীবন নাশক
বিকার যেমতি বিলোপ হয়
মরুত বহিলে তরুণ জলদ
পলকে যেমতি উড়িয়া যায়!
বাসনা প্রবাহে লাজের জাঙাল
অকূল পাথারে ভাসিয়া গেল
মদন গরলে বিরাগ বিকার
দেখিতে দেখিতে ভসম হল!
শরমে থরর বুকের বসন
খুলিয়া খুলিয়া পড়িতে লাগিল
ঈষদ হাসিযে উত্তর চন্দ্রানে
মদন বাজার ভরম রাখিল।—

কিন্তু—
রহিল ভসম—একিরে হইল?—
ফুলের শিকলে পড়িল টান!
স্মরিয়াছে রতি পলকে প্রলয
পলক বেযাজে বিদরে প্রাণ!—
(কোকিলের কুহুরব;— ভ্রমরের
ঝঙ্কার;—কোমল-বাদ্য;—
কুসুম বরষণ এবং তৎসঙ্গে
কামদেবের প্রবেশ—)

রতি।—(মদনের পার্শ্বে আসিয়া)
কোথা ছিলে প্রাণনাথ?—তব অ'শা
পথ চেযে
বহুক্ষণ হতে মোরা আছি বসি হেথা।—
(কামদেব দুই হস্তে রতির কবরীর
বিশৃঙ্খল পারিজাত দল শৃঙ্খলার
সহিত সাজান)

শচী।—তোমার বিলম্ব হেরি রম্ভা তিলোত্তমা
উর্ব্বশী মেনকা রতি—সকলেই মোরা
হযেছিনু নিরুৎসাহ—ভেবেছিনু পাছে
তুমিও বা নিলে পাঠ বৃহস্পতি কাছে!—

কামদেব।—সে পাঠ গ্রহণে সদা বিরত
মন্মথ

দেবেন্দ্রাণী!—ছিনু আমি মন্দাকিনী
তটে—
দেখিতে ছিলাম চারু রজত কৌমুদী
কিরীটে ভূষিত মঞ্জু কনক প্রবাহে
নাচিতে আবেশ ভরে রঙ্গে তরঙ্গিণী!—
হেরিনু সুসুপ্ত কূলে রূপে করি আলো
(বিজলির রেখা যেন!) এক দেব বালা
আলু থালু বাস তার—কাঁচলির ডোর
বিমুক্ত ঘুমের ঘোরে।—নহে বহু দূরে
দাঁড়াইয়া স্থির নেত্রে তরুর আড়ালে
নবীন যুবক এক পূর্ণ শশী রূপে!
—হানিলাম ফুল শর—
হইল উন্মত্ত, ধীরে দাগিল চুম্বন
বালার সুরভি ফুল্ল অধর কমলে!—
শিহরি উঠিলা বালা
হানিলাম পুন ফুল শর
কিন্তু
নারিনু দেখিতে রতি স্মরিল আমারে
নারিনু থাকিতে আর
পড়িল বিষম টান কুসুম শিকলে—
অমনি আকুল হযে আইনু ছুটিয়া!—

উর্ব্বশী।—কহ শুনি ফুল সখা কিসম্পদ লভ
বধি অবলার প্রাণ ফুল প্রহরণে?—
সরলা দেবের বালা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে
আছিলা নিদ্রায় মগ্না মন্দাকিনী কূলে
কি ফল লভিলা তার হৃদয়ে জ্বালায়ে

দাবানল?—সহে নাকি নয়নে তোমার
চিত্তের প্রশান্ত মূর্ত্তি?—কি নিষ্ঠুর তুমি!—
হলে মনে মরি লাজে সে কথা মন্মথ
এখনও—সুর নাথ হাসেন গোপনে
এখনও—নিরখেন যখন তাঁহারে
নাট্যালয়ে!—বলি হাবি দেই হে
তোমারে!—
রম্ভা।—হার যদি ফুল সখা সেনা নাথ
কাছে
নিশ্চয় জানিও তবে কাড়ি লব আজি
ফুল শর ফুল ধনু!—নন্দন কাননে
দিব না পশিতে আর!—নির্ভয়ে বসিয়া
গাঁথিব মন্দার মালা মন্দারের তলে!—
নিরবে রহিবে পীক তরুর শিখরে!
নাহি ঝঙ্কারিবে অলি!—মলয় বায়ুর
গরব খরব হবে!—মনের হরষে
আশিসিবে বিরহিনী আমা সবাকারে!—
(নেপথ্যে শঙ্খ নিনাদ)
(কামদেব রতির প্রতি কটাক্ষ পাত
করত শব্দের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)
শচী।—(রম্ভার দিকে দৃষ্টি করিয়া)
আস্‌ছেন—
(কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ)
কার্ত্তিকেয়।—যদি না কহিত রম্ভা ডরি-
বার কথা
হে মন্মথ ফুল শরে—তা না হলে আমি
আসিতাম নাহি কভু!—রমণী সমাজে
সাজেহে বিক্রম তব!—কিকাজ আমারে?
দৃঢ় অঙ্গে মধু সঙ্গী কি করিবে তুমি?—
হেরিছো যে বক্ষ মোর নহে বিরচিত
সুকুমার কুসুমেতে—রচিত মর্ম্মরে!
এই যে হেরিছো ধনু নহে ফুলময়
তোমা সম!—কি করহে?—ইহার
প্রতাপে
সুমেরু উড়িয়া যায় তুলার সদৃশ!—
এই যে হেরিছো শর নহে ফুল শর
—হানিলে পাতালে বেগে উঠিবে এখনি
ভীম নাদে ভোগবতী অন্তস্তল ভেদি—
অথবা চন্দ্র মণ্ডল সহস্র খণ্ডেতে
চূর্ণিত হইয়া মর্ত্ত্যে পড়িবে এখনি!—
পশিলে নাসায় মোর মলয় মরুত
না হই উন্মত্ত আমি!—অলির ঝঙ্কারে
নাচে না আমার মন.ওহে মনসিজ!
কুসুমিত নন্দন কাননে নাহি বাসি—
বাসি আমি মহাক্ষেত্রে প্লাবিত শোণিতে
—নহে পূর্ণ কুহু রবে—বিকট হুঙ্কারে—
মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে হৃদয় বিদারি!
কামদেব।—ত্যজ গর্ব্ব সেনা নাথ!—জগ
দম্বে ডরি
নতুবা বিক্রম মোর পারি দেখাইতে
ভাল মতে!—হেরিছো যে ফুলময় শর
ইহার প্রতাপে পর্ব্বত তরল হয়।—
বৃথা ফুল ধনু ধরি যদি নারি আমি
শিরিষ কুসুম চেয়ে সুকুমার-তনু
করিবারে বক্ষ তব গর্ব্ব কর যার।—
সাক্ষী তুমি সুরেন্দ্রাণী—তবে দেখ আজি
(ক্ষম মোরে সেনা নাথ)—তূণ ধনু তব
ঝুলাইব রমণীর বাসর দেউলে!—
ছাড়াইব শঙ্খ তব—ধরাইব বীণা
শঙ্খনাদ পরিবর্ত্তে গাওয়াইব গীত!
করাব সমর ক্ষেত্র প্রমোদ উদ্যান—
শিবির কুসুম ময় কামিনী বাসর!

পাইবে নূতন সেনা মধু অনুচর
কোকিল ভ্রমর আদি—গুঞ্জরি মধুরে
বাজাবে সমর বাদ্য শিঞ্জিতের সহ।—
শিখাইব নব যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন
ধনু শরে—দৃঢ় তব নয়ন ধনুকে
হানাব কটাক্ষ বাণ—হানিবেও তারা—
বিপক্ষ কামিনী সেনা বড় পরাক্রমী!—
জিনিয়াছো দৈত্য-বরে বীরত্ব প্রকাশি
হেরীরেন্দ্র মহারণে—উজ্জ্বল ত্রিদেশ
বিক্রম আদিত্যে তব।—তবেও বুঝিব
পার যদি রণ রঙ্গে এ সবার সহ।
এক এক জন তারা মহারথি রণে
উড়ায়ে প্রেমের কেতু অসীম বিক্রমে
প্রবেশে সমরে যবে পরম উল্লাসে
আরোহি যৌবন ধ্বজে—কোন যোদ্ধা হেন
দাঁড়াইবে স্থিরভাবে তাহার সম্মুখে?—
এক এক জন সহ যুঝিয়ে দেখিও
যাতে তব যায় মন!—অদ্বিতীয়া তারা
বাণ যুদ্ধে—দৃষ্ট ভেদী—হানিলে হৃদয়ে
রুধির প্রবাহে খেলে গরলের ধারা!—
বীর তুমি মহোল্লাস পাইবে পিরীতী
মল্ল যুদ্ধে -মল্ল-যুদ্ধে নিরুপমা তারা!—
(শচী, রতি, রম্ভা ইত্যাদির করতালি)
এস তবে সেনা নাথ!—দেহ অনুমতি
ফুল শর দেখাই তোমারে!—
(শচী, রতি, রম্ভা ইত্যাদির উল্লাসে কাম দেবের প্রতি ইঙ্গিত)
কার্ত্তিকেয়।—প্রস্তুত হে ফুল সখা!—কহ যদি তবে
খুলি বর্ম্ম, করি পথ ফুল শর তরে—
অটল হেমাদ্রি-সম উরস আমার
কহত হে বিদারিয়া দৃঢ় শরাঘাতে
(তূণ হইতে শর হস্তে লইয়া)
করি পথ—পাবে যেন ফুল শর তব
পশিতে মরম স্থানে।—নতুবা কেমনে
শুনি হে মকরধ্বজ নন্দন কাননে
কেমনে করিবে গর্ব্ব রমণী সভায়
প্রকাশি বীরত্ব তব—হানিয়াছো মোরে?
ভাঙ্গিয়াছো হিম'চলে মৃণাল আঘাতে।—
কামদেব।—(ফুল শরাশনে ফুল শর বসাইয়া)
ক্ষম মোরে তবে দেব!—এই হানিলাম
ফুলশর।—সম্বরহে তবে!—
(শচী রতি রম্ভা ইত্যাদির করতালি)—
কামদেবের ফুলশর ত্যাগ—সহসা শূন্য হইতে কার্ত্তিকের সম্মুখে ত্রিশূল পতন এবং ফুলশর ত্রিশূলে পতন—ত্রিশূল মুকুলিত—সকলে বিস্মিত নেপথ্যে কোমল বাদ্য—গিরজায়ার আবির্ভাব—সকলে লজ্জিত—সকলের প্রণাম—কার্ত্তিকের শির চুম্বন!—গিরিজাগার চরণমূলে বসিয়া কামদেবের গীত)।

থাম্বাজ। ঠুংরী।

দেগো মা বরদে বর
শঙ্কর হৃদি-বাসিনী।
জয়দা জয় দে মোহে জ্ঞানদা জ্ঞান দে মোহে
তারিণী তার মা মোহে ত্রিভুবন-তারিণী।
চারু চন্দ্র মণ্ডলে শোভিত মুখ মণ্ডল
তাহে কুঞ্চিত অলকা মৃদু অনিলে চঞ্চল
শ্বাস পরিমলে অলি কুতূহলে

বিম্ব ওষ্ঠ মূলে নাচিছেরে।—
(আমার) মনষটপদ পদ-কোকনদ
মধু পানে সাধ করিছেরে।—
(কিবা) নিতম্ব দেশ মেখলা রুচি মঞ্জুল
আবৃত কেশ জালে—
যেন মেঘ জালে চঞ্চলা খেলে—
ত্রয় নেত্র মাঝে দ্বিজ রুচি রাজে
দেহ বর মোহে—বরদে!—
হর বর দায়িনী॥

— —

ভগবতী।—একি খেলা সুরেন্দ্রাণী?—
পেলে না কি মনমত আর
আনন্দের অনন্ত ভাণ্ডার বৈজয়ন্ত ধামে?
মিটে নাকি আশা তব ফুল সখা
প্রকাশি বিক্রমে তব ত্রিভূবন-ময়?—
এই কি তোমার ক্ষেত্র কার্ত্তিকেয়?
—তুমি দেব-সেনাপতি!—

কার্ত্তিকেয়।—
ভুবনবিজয়ী দাস ও পদ পসাদে
কারে বলে ভয় মাতঃ নাহি জানি আমি
ফুল শর ভয় মোরে দেখান মন্মথ—
অগ্নিময় শরজালে না টলিনু আমি
মহারণে বীরশ্রেষ্ঠ তারকের সহ।
ফুল শর দিয়া মোরে চাহেন মন্মথ
অধীরিতে।—তাই মাতঃ এসেছিনু আমি
মন্মথের আবাহনে!—দেহ অনুমতি
যাব আমি ইন্দ্রালয়ে—

কামদেব।—
ভুবনবিজয়ী মাতঃ নগেন্দ্র-নন্দিনী
আমি ও পদপ্রসাদে।—অব্যর্থ আমার
ফুল শর—অবিদিত নহে মাতঃ তব!—
মুহূর্ত্তে ভুবন মত্ত পারি করিবারে
হানি যদি সম্মোহন।—কোন অহঙ্কারে
অবহেলা জগদম্বে করেন সেনানী
সম্মোহনে?—দাস তাহে নারে বুঝিবারে
(বিরক্ত হইয়া ভগবতীরে প্রণাম করিয়া
কার্ত্তিকের প্রস্থান)

রতি—নাহি ডরে মন্মথে ত্রিভুবনে হেন
নাহি হেরি ক্ষেমঙ্করী তব কৃপা বলে!—
সংহারি তারকাসুরে মত্ত অহঙ্কারে
কার্ত্তিকেয়।—অবহেলা তাই মা তারিণী
করেন কুসুম শরে!—জানেন আপনি
দেবাসুরে দ্বন্দ্ব যবে অমৃত লাগিয়া
ধরিলা মোহিনী মূর্ত্তি মাধব আপনি
কি হইল ফুল শরে?—জ্ঞানেন্দ্র আপনি
অজ্ঞান কুসুমাঘাতে,—মত্ত দেবাসুর—
স্মরিলে শরমে মরি ক্ষম মা দাসীরে!

ভগবতী।—(হাস্য করিয়া)
জানি আমি ফুল শরে মন্মথ মহিষী!—
পূর্ণচন্দ্র তেজে তেজী অবিদিত তার
ফুলশর।—অবহেলে তাই ফুলশরে
কার্ত্তিকেয় পুত্র মোর।—অনর্থ হইবে—
পশিলে কুসুম শর তাহার হৃদয়ে
সুরেন্দ্রাণী দেবকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে।—
নিমগ্ন যোগেন্দ্র যোগে ধবল শৃঙ্গেতে
একাকিনী ছিনু আমি কৈলাস শিখরে
ভবেশ-বিরহ সিন্ধু মাঝারে মগনা!
পাইনু এ বার্ত্তা আমি নারদের কাছে
দেখিনু নয়ন মেলি গোবর্দ্ধন শিরে
জানু পাতি নাথ তব আকর্ণ সন্ধানে!
তারিনু শিবশূলে কুমারে অমনি!—
নতুবা অনর্থ হত সুরেন্দ্রাণী আজি
রোষিতেন বিরূপাক্ষ।—কিবা যে হইত
স্মরিলে শিহরি আমি কি কব তোমারে!

শচী।—কি ভয় তাহার মাতঃ ভয়া আপনি
সদয়া যাহার প্রতি?—

রতি।—
হের মা ত্রিশূলে! ত্যজিয়া সংহার মূর্ত্তি
প্রাণেশের শরে মুকুলিত রুচিময়
পারিজাত সম।—কার সাধ্য সহে
ফুলশরে কৃপাময়ী তব কৃপা বলে?—

ভগবতী।—
পশিছে নাসায় মোর প্রভাতি সমীর
যাব এবে কৈলাশ শেখরে—
(যবনিকাপতন)

ক্রমশঃ

ভারত কাহার ?

একথার সদুত্তর দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। যাঁহারা আজি ভারতের অধিপতি, সেই শ্বেতাঙ্গ বৃটিশ জাতি কি ভারতকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন? তাঁহারা আপনার বলিয়া স্বীকার করিলে ভারতের ভাগ্য একদিন ফিরিয়া যায়। ভাগ্য তাঁহারা একদিন ভারতে আসিয়াছিলেন তাই ভারতের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে, তাই ভারতবাসিগণ সজীবিত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা কেন দাসের দেশকে আপনার বলিলেন। ঐ দেখ তাঁহারা গৌরবে পূর্ণ হইয়া বলিতেছেন, ভারত কেন আমাদিগের হইবে, আমরা ভারতের রাজা, ভারত আমাদিগের বিজিত দেশ। আমরা ভারতকে যথাবিধ শাসন করিব, তাহাকে শিক্ষা দিব, তাহার সন্মার্গ দেখাইয়া দিব এবং যত দূর সাধ্য তাহার উন্নতি সাধন করিব। আমরা ভারতে প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছি, বাণিজ্যার্থ আসিয়াছি, এবং আধুনিক সভ্যতার সুখ ভারতে বিস্তার করিতে আসিয়াছি। ভারত কেন আমাদিগের হইবে? ভারতে বাস করিয়া কি আমরা উৎসন্ন যাইব, বিলাসী হইব এবং আপনাদিগের স্বাধীন রাজ্য ত্যাগ করিয়া এখানকার একাধিপত্যের বশবর্ত্তী হইব? এরূপ কখন হইবে না। আমাদিগের দেশ সেই সুখময় স্বাধীনতার বলে, যেখানে সকলই সচ্ছন্দে, মনের আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। যেখানে বসন্ত ঋতু প্রশান্ত সাগরে স্ফীত হইয়া অগ্রে উদিত হয়েন এবং দেশময় প্রসূন নিকরে সুশোভিত করেন। যেখানে পবন দেব পশ্চিম সমুদ্র হইতে সুশীতল হইয়া মৃদু মৃদু শান্তি সঞ্চারণ করিয়া বেড়ান। যেখানে স্বাধীনতা দেবী স্বচ্ছন্দে বায়ুর মত সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সকলকে সজীবতায়, উৎসাহে, ও আনন্দে পূর্ণ করিতেছেন। যেখানে বাণিজ্যপোত পতাকা বিস্তার করিয়া নানা দিক দেশাৎ প্রভূত ধনরাশি আনিয়া গৃহে গৃহে ঢালিয়া দিতেছে। যেখানে সামুদ্রিক সেনা গৌরবের নিশান তুলিয়া সাগরময় বৃটিশ রাজ্যের জয়ঘোষণা করিতেছেন। যেখানে রাজমন্ত্রী ও রাজনীতিজ্ঞেরা গম্ভীর ভাবে বসিয়া দেশের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও পৃথিবীর ভাগ্য নির্ণয় করিতেছেন। যেখানে প্রতি দেশবাসী, প্রতি রমণীহৃদয়ও স্বদেশানুরাগে পূর্ণ হইয়া দেশের মঙ্গল সাধনে যথাসাধ্য যত্নশীল ও উদ্যোগী হইতেছেন। যেখানে উদ্যোগীতা, সাহস, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা একান্ত পরিশ্রমে মানব নামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া পুরুষত্বের পরাকাষ্ঠা পৃথিবীতে প্রদর্শন করিতেছেন। যেখানে আমাদিগের জন্ম সে দেশের

কুক্কুর পর্য্যন্ত দেশের, ও গৃহের নিতান্ত অনুরাগী। যে দেশ আমাদিগের দেশ, সে দেশ সাগরসম্ভূত রত্নময় বৃটিশদ্বীপ; যে দ্বীপের মহারাজ্যে দিনদেব কখন অস্ত যান না। আমরা সেই রত্নাকরের রত্ন রাজ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কেন অধমতম ভারতকে জননী ও স্বদেশ বলিতে যাইব। ভারত যদি আমাদিগের জননী হইতেন, তাহা হইলে আজি ভারতের ভাগ্য কি একরূপ হয়! তাহা হইলে আজি ভারতের দর্পে মেদিনী কম্পিত হইত, ভারতের গৌরবে পৃথিবী পূর্ণ হইত এবং ভারতের মুকুটমণির উজ্জ্বল বিভায় জগৎ প্রভাসিত হইত।

আমাদিগের গৌরাঙ্গ প্রভুদিগের এই কথা। আর যাহারা এককালে আমাদিগের প্রভু ছিলেন, এখন যাহারা ভারতের সর্ব্বত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্বকলঙ্ক স্বরূপ জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছেন সেই অগণ্য মুসলমানেরা কি বলেন। তাঁহারা তো বহুকাল ভারতের অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তব কি বলেন? তাঁহারাও বলেন ভারত কেন আমাদিগের হইবে? আমরা যাহার বংশধর তাহাদিগের নামে আজিও পৃথিবী কম্পিত হয়। আমরা ভারতের বাদসাহের জাতি, নবাবের বংশ। দেখনি কি এখনও আমাদিগের নবাবীচাল যায় নাই। আমরা যে নবাব ও বাদসাহ ছিলাম, পারি যদি, আর কখন আবার সেই নবাব ও বাদসাহের সিংহাসনে বসিয়া মনের সাধ মিটাইয়া লইব। তোমরা, বাঙ্গালী, তোমরা দাসের জাতি, তোমরা আমাদিগের সহিত মিলিতে আস কেন? আজিও আমাদিগকে নবাব বলিয়া মান্য কর। এ ভারত যে আমাদিগের এক কালের রাজ্য ছিল, এ ভারত আমাদিগের দেশ হইবে কেন? আমাদিগের দেশ, তাতার, মাঙ্গোলিয়া, পারস্য ও মক্কা। আমাদিগের ভাষা দেশী ভাষা নহে, আমরা আরবী পড়ি, ফার্সী কণ্ঠস্থ রাখি এবং ছাঁকা উর্দ্দুতে কথা কই। দেখনি কি আমাদিগের কথা বার্ত্তায় এখনো সেই নবাবী ধরণ নবাবী সেরেস্তা বোল চাল রহিয়াছে। মক্কা আমাদিগের তীর্থ স্থান ভারত আমাদিগের কিছুই নহে; তুর্কেরা আমাদিগের স্বজাতী এবং তাহাদিগের অভ্যুদয়ের প্রতি আমরা অহরহ তাকাইয়া আছি। তোমরা হিন্দু আমাদিগের হইতে পৃথক থেক।

এই তো আমাদিগের পূর্ব্ব বাদসাহের কথা। দেখি যাহাদিগকে আমরা এদেশের আদিম অধিবাসী বলি, তাহারা কি বলে? সেই অসভ্য পাহাড়িয়া ও বন্য জাতিদিগের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, ভারত আবার কি? ভারত আবার কোন্ দেশ? তাহারা কখন ভারতের নাম মাত্র শ্রবণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। তাহারা জানে যে বনে আমরা বাঘ মারিয়া, শীকার করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াই, ও এক এক বার এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া

দেখি কার কি আছে, সেই ঘনবৃক্ষাচ্ছাদিত, অসূর্য্যম্পশ্যা, অরাতিবিদূর, দুর্ভেদ্য ও নির্ব্বিঘ্ন বন্যরাজ্য আমাদিগের স্বদেশ। তোমরা সে দেশকে যাই বলিয়া ডাক, আমরা তোমাদিগকে সে দেশের নাম পর্য্যন্তও শুনাইব না, সে দেশের কোন বার্ত্তাও তোমাদিগকে দিব না। তোমরা কি জানিবে, আমাদিগের পার্ব্বতীয় গহ্বরের কত আদর? তোমরা কি জানিবে, আমরা কেমন বীর জাতি? আমরা সিংহ শার্দ্দূলের সহিত একত্রে বাস করি, সুখে উপত্যকায় বিচরণ করিয়া বেড়াই; পার্ব্বতীয় প্রসূনরাশি আমাদিগের কামিনীর শিরোভূষণ হয়। বাহ্য জগতের সহিত আমাদিগের সম্পর্ক নাই। এই উপত্যকা ভূমি নির্ব্বিঘ্ন থাক, এই বনদেশ অক্ষুন্ন থাক, এই বাহুতে বল থাক, এই ধনুতে টঙ্কার ধ্বনি থাক, এবং তূণীরে তীর থাক, আমরা আর কিছুই চাই না। আমরা পৃথিবীর সুখ সম্পত্তির প্রয়াসী নই, সভ্যতার সুখাভিলাষী নই, নবপতির তোষামোদ জানি না আমরা তোমাদিগের দেশে গিয়া কি করিব। এখানে আমাদিগের পর্ব্বতের নির্ঝরে ও বৃক্ষাচ্ছাদিত নদীতে নির্ম্মল বারি আছে, বনে ও গহ্বরে অগণ্য শীকার আছে, বাহুতে বল আছে, ভূমিতে ও বৃক্ষশিরে শয্যা আছে, আমরা তোমাদিগকে চাহি না, তোমাদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাহি না, আমরা জঙ্গুলে, আমরা ধাঙ্গড়, আমরা সব, আমাদিগের সহিত তোমাদিগের মিশিতে হইবে না। যখন ক্ষুধায় মরিব, ইংরাজগণের সঙ্গে জাহাজে চড়িয়া কোন দ্বীপে গিয়া না হয় শরীর খাটাইয়া খাইব। তাহার জন্য ভাবনা কি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কে, বলিব আমরা জঙ্গলে, তাহাদিগকে আমাদিগের দেশের নাম পর্য্যন্তও বলিব না। ভারত আবার কি, ভারত আবার কোন্ দেশ?

আর ঐ ফিরিঙ্গি জাতি—যাহাদিগের কোন পূর্ব্বপুরুষ অগ্রে পাশ্চাত্য, স্বদেশানুরাগী ইউরোপীয় জাতি বলিয়া গৌরব করিতেন,—তাহাদিগের বংশীয়গণ এক্ষণে ভারতের অধিবাসী হইয়া কি বলেন? হায়, রজনী আসিলে, কি পশ্চিম দেশে সূর্য্য-গৌরবের কোন রশ্মি রেখা মাত্র থাকে না! ফিরিঙ্গির ব্যাকরণ শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। তাহারা বলে, কালা বাঙ্গালী, ফের যদি বলিবে ভারত আমাদিগের দেশ, একটী ঘুসিতে তোমাকে ভূমিসাৎ করিব। দেখনি কি আমাদিগের জ্যাকেট আছে, পেণ্টুলন আছে, টুপী আছে আর আমাদিগের বিলাত আছে। আমার জনক জননী যখন বিলাত হইতে আসে, আমি তখন সমুদ্রের মাঝে জাহাজের উপর জন্মগ্রহণ করি। আমি ইণ্ডিয়াতে জন্মি নাই, হাঁ, তবে আমার ছেলেপিলে এখানে জন্মিতেছে বটে; কিন্তু কি করি নাচার, আমি তাহাদিগকে শীঘ্র বিলাতে পাঠাইয়া দিব। তুমি আমাকে এ দেশী বল না আমি সাহেব লোক। জান, আমি

আমার ধর্ম্মবাপকে বলিয়া' এখনি তোমায় জব্দ করিতে পারি। জানিস্ আমি কিছু টাকা জমাইয়া কি আর এদেশে থাকিব। পেন্সন লইয়া বিলাত চলিয়া যাইব। কালা বাঙ্গালি, লিচু যাও। তোমরা হিন্দু, তোমরা চাকরের জাত। জান আমি সাহেব লোক। জন—আমার বাবার নাম। আমার মার নাম—চুন্নী। তুমি এখন যাও, আমি জাহাজের কাপ্তেনের কাছে, দেশের কে কেমন আছে খবর জানিতে যাইব। সাবধান, আর কখন জিজ্ঞাসা করিও না তুমি কি ইণ্ডিয়ান? ইণ্ডিয়ান বলিলে আমাদিগের লজ্জা ও অপমান হয়। হউ ইণ্ডিয়ান ডগ্, বি অফ্।

আর বঙ্গবাসী, তুমি যে এতদূর উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছ, তোমার মূর্ত্তি ও রূপ দেখিয়া ভারত জননী অবাক হইয়া গিয়াছেন। তুমি যখন শাকারের ক্ষাণ নাড়ীকে টই টুম্বুর করিয়া ব্রাণ্ডি ঢালিয়া রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ কর এবং লেক্চার দিতে দিতে গান করিয়া উঠঃ—

"নেশাতে ঢুলু ঢুলু হয়েছে নয়ন।
কোথায় রহিল আমার সে বিধুবদন।"

বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ কর এবং তৎপরে বাটীর মধ্য হইতে চীৎকারধ্বনি উঠে, শুনিতে পাওয়া যায়, তোমার বৃদ্ধ মাতা মারের চোটে ধরাশায়িনী, নিরীহ ভার্য্যা ধরিতে গিয়া বিলক্ষণ ঘুসি খাইয়াছেন এবং শিশু সন্তানটি গলাটেপার দরুণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। তোমার এই পশুবৎ ব্যবহারে ভারতজননী নিতান্ত ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছেন। যাহার আত্মস্বজনের প্রতি এত মমতা ও স্নেহ, তাহার স্বদেশের প্রতি কিছু অনুরাগ হইবার আর সম্ভাবনা আছে? আর উনি কে, ঐ যে ট্যাসের মামা সাজিয়া চসমা নাকে প্রাতঃকালে বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হইয়াছেন উনি কি আমাদিগের বিফস্থার? উহাকে কি ভারত জননী চিনিতে পারিবেন? কই উহাকে চিনিবার তো কোন চিহ্ন নাই। উহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে উনি বলিলেন, 'অগ্রে আপনার উন্নতি সাধন কর, সভ্য হও, পরে বঙ্গ সমাজের উন্নতি, পরে ভারতের কথা, যদি উন্নতির সোপানে উঠিতে চাও ধর্ম্মসাহসী হও এবং পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কর; বৃদ্ধ ভারত জননীকে এক সুট গাউন পরাও, তবে তিনি সভ্য সমাজে আদরণীয় হইবেন। আমার মত যখন তোমরা ধর্ম্মসাহসী হইতে পারিবে তখন তোমাদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে। আমি বিলাত না যাইয়াও দেখ কত ধর্ম্ম সাহস ধারণ করি। যাঁহারা বিলাত গিয়াছেন, তাহারা ত সাহেব সাজিবেনই যেহেতু তাহাদিগের জাত গিয়াছে। আমি বিলাত না গিয়াও সাহেব। তোমরা সরিষার তৈল পরিত্যাগ কর, সাবান মাখ, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কর। অনেক দিন সাহেব হইয়াও আমার আঁতুড়ে তৈলের গন্ধ এখনও ঘুচিতেছে না, কিন্তু অনেক গিয়াছে আর

কিছু দিন হইলে সমুদায় যাইবে। তোমরা কাছে আসিলেই আমি সরিষার তৈলের গন্ধ পাই। তোমরা এত পড়া শুনা কর কিসের জন্য? কবি গে তোমাদিগের মত জাতির জন্য একটি সদুপদেশ পূর্ণ গল্প রচিয়াছেন। কবি গের গল্প সমূহের কি মর্ম্মগ্রহ হয় নাই? তবে তোমরা এখনও কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেও। আমাদিগের ভারত সন্তান ও রিফর্ম্মারের কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। পার্শ্বে ভারত জননী দাড়াইয়া কথা শুনিতেছিলেন, তিনিও শুনিয়া ক্ষণিক নীরব হইয়া রহিলেন, পরে পৃথিবীতে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমুদ্রে জলমগ্ন হইতে গেলেন।

বাঙ্গালী জাতির নিকট ভারত জননী কিছু আশা করেন না। তিনি বাঙ্গালী জাতির উচ্চ শিক্ষার ও পরিণাম দেখিলেন। বাঙ্গালী জাতি কেমন বাক্ পটু তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। তিনি, সেই জাতীয় দুই এক জন উচ্চ শিক্ষিত ভারত সন্তান বলিয়া চেঁচাইলেও তাহাকে কোলে করেন না; যেহেতু তিনি জানেন, সেরূপ সন্তানে তাঁহার প্রয়োজন নাই; সেরূপ সন্তান থাকা আর না থাকা সমান। অতএব হে কৃত বিদ্য বাঙ্গালী, তুমি কেন চেঁচাইয়া মর আমি ভারত সন্তান ভারত সন্তান। বঙ্গ কবি, তুমি ভারত সন্তানের গীত গাইয়া কাহার হৃদয় উচ্চ করিতে চাও? ও তো তোমার স্বাভাবিক রব নহে। তুমি যেন পড়া পাখীর মত রব করিতেছ। কই উহাতে ত কাহারও মন ভিজে না, হৃদয় আর্দ্র হয় না। পাখীর স্বাভাবিক সুস্বর গীতের মত উহা ত হৃদয় মন মাতাইয়া তুলে না। কেবল পাখী কেমন পড়িতে শিখিয়াছে এই দেখিয়া একটু আনন্দ জন্মে মাত্র।

কৃতবিদ্য জনকত বাঙ্গালী ছাড়িয়া, সর্ব্বসাধারণ বাঙ্গালী জাতিকে দেখ; তাহারা কি বলেন আমরা ভারত সন্তান? তাহারা কৃতবিদ্যগণের নূতন নূতন কার্য্য কলাপ দেখিয়া ও কথা বার্ত্তা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। তাহারা চিরকালই ত বাঙ্গালার নাম জানিতেন। "ভারতবর্ষ" এখন তাহারা ছেলে পড়াইতে পড়াইতে ইংরাজী অনুবাদ বাঙ্গালা ভূগোলে দেখিয়াছেন। নহিলে পূর্ব্বে ইহার নামও শুনেন নাই। পূর্ব্বে জানিতেন পৃথিবী ত্রিকোণ; এখন জানিলেন ভারত ত্রিকোণ, অতএব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ভারত ত্রিকোণ-পৃথিবী বিশেষ। তাহারা জানেন আমরা বাঙ্গালী জাতি; সমুদায় ভারতবর্ষের সহিত আমাদিগের সম্পর্ক কি? সত্য আমরা জননী জন্ম ভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী তুল্য মানি। কিন্তু সে জন্মভূমি ভারতবর্ষ নহে। আমাদিগের জন্মভূমি কোন গ্রাম পল্লী অথবা পল্লীস্থ সেই ক্ষুদ্র পরিসর স্থান মাত্র যেখানে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াছি। আমাদিগের উদাসীনেরা এক যুগের পর এক

দিন আসিয়া জন্মভূমি দেখিয়া যান এবং মনে করেন তাহাতেই তাহার সাত তীর্থের পুণ্য সঞ্চিত হইল। আমরা শুদ্ধ নিজগ্রাম মাত্রকে আপনার জ্ঞান করি। যখন বিদেশে থাকি বড় জোর আমরা বলি, বঙ্গদেশ আমাদের দেশ, তাহাতেও আবার পদ্মাপারস্থ পূর্ব্ববাঙ্গালাকে ছাড়িয়া দিই। কারণ, সে দেশ আমাদিগের বলিলে আমাদিগের রাগ হয়; গালা গালি হয়। ভারতের অপরাপর দেশ বাসীকে আমরা কি স্বজাতীয় জ্ঞান করি? স্বজাতীয় জ্ঞান করা দূরে থাক, আমরা জানিও না, ভারতের কোথায় কোন জাতি বাস করে। ভারতের কোন জাতীয় লোককে বাঙ্গালায় নূতন দেখিলে জ্ঞান হয় তাহারা পৃথিবীর কোন দূর দেশস্থ লোক হইবে। একজন চীন কি মগ, কি মান্দ্রাজী, কি ফরাসী, কি পঞ্জাবী কি ভুটিয়া, কি মহারাষ্ট্রীয়, কি গুজরাটী ইহাদিগের সকলকেই আমরা সমান চক্ষে দেখিয়া থাকি। কারণ আমাদিগের পক্ষে ইহারা সকলেই সমান বিদেশী। আমাদিগের দেশ, শুদ্ধ আমরা যেখানে বাস করি; তদ্ব্যতীত আর সমুদায় বিদেশ তৎপ্রতি আমাদিগের অনুমাত্র অনুরাগ নাই। কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইবার সময় নিজ গ্রামের কুকুরটাও ছুটে আসিতে দেখিলে যত আনন্দ হয়, অপর গ্রামের শিরোমণি মহাশয়কেও দেখিলে তত আনন্দ হয় না, বাঙ্গালীর ভারত তাহার নিজ গ্রাম বা পল্লী, তাহার জন্মস্থান, দ্বিপাদ মাত্র ভূমি খণ্ড। তবে আমরা ভারত সন্তান ভারত সন্তান বলিয়া চেঁচাই কেন? অগ্রে মন হইতে এই সমস্ত সঙ্কীর্ণ ভাব বিদূরিত করি, হৃদয়কে বিসারিত করিতে শিখি, অগ্রে সকলকে ভাল বাসিতে শিখি, সকলের জন্য কাঁদিতে শিখি, তবে ত ভারতসন্তান বলিতে যোগ্য হইব। নহিলে বাঙ্গাল বলিলেই যখন চটিয়া উঠি, উড়েকে মনুষ্য জ্ঞান করি না, তখন আমরা আবার ভারতসন্তান কি। সমগ্র ভারতের প্রতি কি আমাদিগের অনুরাগ আছে? কণামাত্রও নহে। তবে ভারত কাহার?

তবে ভারত কি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য জাতির এক দিনের তরেও নহে। সে দিন মাত্র, সিপাহী বিদ্রোহে, সিপাহীরা আমাদিগকে ইংরাজগণের সঙ্গে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়াছে। তাহাদিগের কি জ্ঞান ছিল, বাঙ্গালী তাহাদিগের স্বদেশীয় ও স্বজাতি। কি পশ্চিমাঞ্চলে, কি বোম্বাইয়ে, কি পঞ্জাবে, কি মান্দ্রাজে, কি উড়িষ্যায়, ভারতের সর্ব্বত্রেই একই ভাব। আমরাও যেমন বোম্বাই বাসীকে ভাবি, বোম্বাইবাসীও আমাদিগকে ঠিক তদ্রূপই ভাবে। তাহার অণুমাত্র প্রভেদ নাই। পঞ্জাবীরা জ্ঞান করে, তাহাদিগের দেশ লাহোর। উড়েরা জানে তাহাদিগের দেশ উড়িষ্যা মান্দ্রাজবাসীর সহিত বোম্বাইবাসির কোন সম্পর্ক নাই। তদ্রূপ মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত

গুজরাটীর ; এবং গুজরাটীর সহিত তৈলঙ্গীর। পার্সীরাও জানে তাহাদিগের দেশ ভারতবর্ষ নহে ; তাহারা বিদেশী। তাহারা যখন ভারতভূমিতে উপনিবেশী হয়, তখন যেমন আপনাদিগকে বিদেশী জ্ঞান করিত ; এখনও ঠিক তেমনিই করে। তাহারা আজিও সমান বিদেশী হইয়া আছে, চিরকাল থাকিবে। আমরা আজিও, এত অধঃপতনের পরও যখন আপনাদিগকে আর্য্যবংশীয়, ভাবিতেছি আর ধাঙ্গোড, ভীল, কুকী জাতিকে আমাদিগের বিজিত জাতি ভাবিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি ; আমরা আর্য্য আর্য্য আর্য্য বলিয়া যখন ঘোর রব তুলিয়াছি, তখন যে পার্সীরা ভাবিবে, 'ভারত আমাদিগের নয় ইহার আর বিচিত্র কি ?

ভারত কোন কালেই কোন এক নির্দ্দিষ্ট জাতির হয় নাই। ভারতকে কোন কালেই কেহ আপনার বলিয়া জ্ঞান করে নাই। ভারত চিরকাল বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল দেশ ও রাজ্যের বিভিন্নতা একেবারে নিঃসম্পর্কীয় ছিল। রামায়ণ দেখ, মহাভারত দেখ, হিন্দুদিগের পূর্ব্ব গ্রন্থাদি বিলোড়ন কর দেখিতে পাইবে ভারত চিরকাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রায় সমান প্রতাপশালী ও হীনবল ছিল। কোন্ রাজা কখন একটু বলবান হইয়া উঠিয়াছেন অমনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। এক জন তাহার বাহুবলে পরাস্ত হইলে সকলেই তাহার পরাভব স্বীকার করিয়াছে। কারণ সকলেই প্রায় সমান বলবান। দিগ্বিজয়ী নরপাল দেশে ফিরিয়া আসিয়াই ভাবিলেন, আমার সমুদায় কার্য্য শেষ হইল, আমি এখন অদ্বিতীয় নরপাল হইলাম, আমার গৌরবের শেষ নাই। অমনি অশ্বমেধ যজ্ঞ হইল। অশ্ব নির্ব্বিরোধেও যজ্ঞে ফিরিয়া আসিল। আর তাহার জয়ের সীমা কি ! সমস্ত ভূপালগণ তাহার করতলস্থ। তখন তিনি কাহারও সহিত সন্ধিবদ্ধ করিলেন। কাহারও রাজ্য কাড়িয়া পরকে দিলেন ; তিনি আপনার মানে আপনি মনে মনে ফুলিয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু সে নিতান্ত ভ্রম ! তিনি পূর্ব্বেও যেমন এখন ও তেমনি নিজ দেশের নৃপতি মাত্র। দুই দিন না যাইতে যাইতে আবার সকলি নূতন হইয়া গিয়াছে, সকলেই পূর্ব্বাবস্থ হইয়াছে। তাহার উত্তরাধিকারী দেখেন কোন রাজাই তাহার বশবর্ত্তী নহে। অশ্বমেধের ঘোড়া যত দূর বেড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, ততদূর জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী মনে করিয়াছিলেন, আমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছি। তাহার সসাগরা পৃথিবী সেই অশ্বের ভ্রমণ দেশ পর্য্যন্ত, আর তাহার অধীশ্বরত্ব সেই যজ্ঞ পর্য্যন্ত। কেহ কখন জানেন নাই, ভারত আমার রাজ্য, আমি ভারতের একাধীশ্বর।

মুসলমান রাজত্বের সময়েও ভারতে সকলে স্বাধীন। ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

নবাবীতে ও রাজত্বে বিভক্ত। তখন সকলেই স্বস্ব প্রধান এবং আপন আপন দেশের অধিস্বামী। তদ্ব্যতীত সকলেই গণ্ডগোল, গোলযোগ, বিদেশ, বীরভূম। সেখানে যাইবার যো নাই, থাকিবার যো নাই। আপনি যে স্থানে আছি সেই পর্য্যন্ত আপনার। সমুদায় ভারতকে আপনার ভাবা দূরে থাক, কেহ কখন সমুদায় ভারতকে স্বপ্নেও দেখে নাই।

ভারত চিরকাল এই রূপ নিঃসম্প কীয় আছে। ভারতকে কেহ কখন আপ নার বলিয়া জানে নাই। ভারত-সন্তান গণ আপনার জননীকে কখন চিনিতে পা রেন নাই। দশজনের জননী হইয়া ও যদি তাহারা জননী বলিয়া চিনিতে পারিত তবুও কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার দুঃখ মোচন হইত। কিন্তু যখন তিনি চির-কালই অপরিচিত ছিলেন তখন তাঁহার প্রতি সন্তানগণের অনুরাগের আর সম্ভাবনা কি? সেই জন্য ভারতের এই দুর্দ্দশা, ভারত পরকীয় হস্তে পতিত হই-য়াছেন। ভারত এখন বন্দিনী, এখন পরের দাসী। তবু এখনও ভারত সন্তানগণের মোহভঙ্গ হয় নাই; এখনও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। হায় ভারতের ভাগ্য, ধিক ভারত সন্তানের অনুরাগ!

শৈশবসহচরী—উপন্যাস *

সমাজের উন্নতি অনুসারে গীত হইতে কাব্য, কাব্য হইতে নাটক এবং নাটক হইতে উপন্যাস উৎপন্ন হইয়াছে। উপন্যাস বর্ত্তমান সময়ের সম্পত্তি—পূর্ব্ব-কালে এ প্রকার রচনা আদৌ ছিল না—সংস্কৃত আখ্যায়িকা কাদম্বরী, আরব্য একাধিক সহস্র রজনীর ন্যায় অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ঘটনাপূর্ণ উপকথা মাত্র, তাহাতে রস, ভাব বা চরিত্রের সম্পর্ক নাই—কবিত্বের চিহ্নও নাই। এই জন্য কাদম্বরী উপন্যাস শ্রেণীতে গণ-নীয় হইতে পারে না। অধুনাতন উৎ-কৃষ্ট উপন্যাস সকল, সৌন্দর্য্যের দর্পণ স্বরূপ, চরিত্রের চিত্রশালিকা স্বরূপ এবং আদ্যোপান্ত রস, ভাব ও কবিত্বে পরি পূর্ণ। গীতিকাব্যে অভাব আছে, মহা-কাব্যে অভাব আছে, দৃশ্যকাব্যে অভাব আছে কিন্তু উপন্যাসে কোনই অভাব অনুভূত হয় না। উক্ত ত্রিবিধ কাব্যে যাহা যাহা আছে, উপন্যাসে একাধারে সে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়—উপন্যাস সম্পূর্ণ কাব্য। ইংলণ্ডে এই প্রকার কাব্য চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইংরাজী

* পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিক্ষার প্রভাবে এক্ষণে আমাদের বঙ্গ-ভাষাতেও এই জাতীয় কাব্য নিতান্ত বিরল নহে এবং গুণাংশেও নিতান্ত সামান্য নহে। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস পাঠে আপামর সাধারণ সকলেই মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। কবিত্ব আছে, গুণ আছে বলিয়াই কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষের এত আদর। তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল, ভাবদ্যোতক এবং ওজো-গুণ সম্পন্ন বলিয়া আমরা বঙ্কিম বাবুর প্রশংসা করি না; তাঁহার বর্ণনা সকল সুন্দর হৃদয়-গ্রাহী ও প্রকৃতবৎ বলিয়াও আমরা তাঁহার প্রশংসা করি না। চরিত্র চিত্রন ও মানব হৃদয়ের বিবিধ প্রকার ভাবোদ্দোপনই তাঁহার মহত্ব এবং সেই নিমিত্ত তাঁহার প্রশংসা। বস্তুত চরিত্র অঙ্কন ও হৃদয়ভাব বিকাশনই কবির প্রকৃত কবিত্ব। চিত্রকার্য্য ও ভাস্কর্য্য হইতে কাব্যের যে শ্রেষ্ঠত্ব তাহাও কেবল এই চরিত্র সৃষ্টির জন্য, তন্ন তন্ন রূপে মানব-হৃদয়ের এই চিত্র প্রদর্শন জন্য। যদিও বঙ্কিম বাবু বাল্মীকি বা বেদব্যাস, সেক্সপিয়ার বা স্কটের সহিত তুলনীয় হইবার যোগ্য নহেন, যদিও তিনি তিন চারিটি মাত্র নারীচরিত্র এবং দুই একটি মাত্র পুংচরিত্র চিত্রনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, যদিও তাঁহার আএষা রেবেকার অনুকৃতি এবং গিরিজায়া ও রজনী নিডীয়ার ভিন্ন ভিন্ন উপকরণে সংগঠিত; আর যদিও তাঁহার বিমলা ও মতিবিবি এবং দুর্গেশনন্দিনী ও কুন্দনন্দিনী একই চিত্র তত্রাচ তিনি বঙ্গের একজন প্রধান কবি। সমালোচ্য উপন্যাস প্রণেতা, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের, সহ-দর ভ্রাতা, অতএব তাঁহারও কাব্য যে সুপাঠ্য ও আদরণীয় হইবে এরূপ আশা সহজেই সঞ্জাত হয় এবং তদীয় অগ্রজের কাব্যাবলি সহ তাঁহার অভিনব উপ-ন্যাসের তুলনা করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে তুলনায় কেবল তাঁহার গ্রন্থের কদর্য্যতা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে—দেখা যায় যে তিনি অগ্রজের প্রণালী অনুকরণ করিতে গিয়া, সচরাচর অনুকারীর যাহা ঘটিয়া থাকে, কেবল দোষাংশেরই অধিকারী হইয়া-ছেন। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যে সমস্ত দোষ আছে এ পুস্তকে সে সমস্ত দোষের এ কান্ত আতিশয্য দৃষ্ট হয়। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে সময়ে ঘটনার অযোগ্যতা, সং-স্থানের অযুক্ততা এবং দেশীয়-রমণী-চরিত্রের অসঙ্গত স্বাধীনতা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এ গ্রন্থে এই প্রকার দোষ উপর্য্যুপরি ও ভূয়োভূয়ো ঘটিয়াছে। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থের গুণভাগ এত অধিক যে তাহার দোষাংশ পাঠক সহজেই মার্জ্জনা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু শৈশব সহচরীর দোষ ভাগ এত অধিক যে ইহার গুণাংশ খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে।

আমরা গ্রন্থখানি খুলিয়াই দেখিলাম “সুদূর প্রসারিণী, উন্মাদিনী গঙ্গা কলকল রবে সাগরোদ্দেশে গমন করিতেছেন

এবং তদীয় সুবিশাল শুভ্র হৃদয়ে রজনী কান্তের ক্ষুদ্র তরণী ভাসিতেছে ও নাচিতেছে এবং নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে।" ভাবিলাম ঠিক হইয়াছে পারিবারিক সাদৃশ্য ঠিক রক্ষিত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলায় নৌযাত্রা, মৃণালিনীতে নৌযাত্রা, বিষবৃক্ষে নৌযাত্রা, চন্দ্রশেখরে নৌযাত্রা, রজনীতে নৌযাত্রা, এ পুস্তকেও নৌযাত্রা কেন না থাকিবে, ঠিকই হইয়াছে। শুদ্ধ তাহা নহে, দাদার উপন্যাসে ঝড়বৃষ্টি নিবন্ধন নৌকা ও চড়নদারকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, ইহাতেও সেই রূপ হওয়া আবশ্যক, অতএব "অল্পকাল মধ্যেই ঘোর রবে প্রবল ঝটিকা উঠিল ভাগীরথীর প্রশান্ত হৃদয় ত্রস্ত হইয়া উঠিল, রজনীকান্তের নৌকায় বিষম কোলাহল উঠিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইল'। হরি বোল হরি ।।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শুভসংবাদ দিতেছেন যে রজনী কান্ত অচেতন হইয়াছিলেন জলমগ্ন হন নাই। যদি প্রথম পরিচ্ছেদেই নায়ক ডুবিয়া মরিতেন তাহা হইলে প্রারম্ভেই গল্পের উপসংহার হইয়া যাইত। অতএব রজনী যে কেবল অচেতন হইয়াছিলেন, মরেন নাই, এ সংবাদে আমরা যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। নায়ক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বুঝিলেন ঝড় বৃষ্টি থামিয়াছে, রাত্রি হইয়াছে এবং তিনি নদীতীরে মৃত্তিকার উপরে পড়িয়া আছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মাটিতে পড়িয়া আছে কিন্তু বোধ হইল যেন তাঁহার মস্তক কোন বিচিত্র কোমল পদার্থে ন্যস্ত রহিয়াছে। "চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলেন এক লাবণ্যময়ী যুবতী অর্দ্ধজলে অর্দ্ধস্থলে বসিয়া সেই বিজন তটিনী কূলে তাহার উরূপরে রজনীর মস্তক রাখিয়া আলুলায়িত আর্দ্র কেশরাশি দ্বারা ঝড়বৃষ্টি হইতে রজনীর দেহ রক্ষা করিতেছিল" অথবা তাহার অন্তর্জলি করিতেছিল? আর আর্দ্র কেশ রাশি দ্বারা ঝড়বৃষ্টি হইতে কি রূপে দেহ রক্ষা হইতে পারে তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা বুঝিতে পারি আর না পারি তাহাতে গ্রন্থকারের ক্ষতির বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু এত রাত্রে এই গঙ্গাতীরে এ লাবণ্যময়ী যুবতী কে? গ্রন্থকার পরে ইহার পরিচয় দিয়াছেন—ইনি মুখুয্যাদের কুমুদিনী—রজনীর শৈশব সহচরী। এক্ষণে ইনি বিধবা, বয়স বিংশতি বৎসর। পুনরায় ইহার বিবাহ দিতে না পারায় ইহার পিতা শিবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গৃহিণীর উপর রাগ করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। বটে? কিন্তু মুখুয্যাদের কুমুদিনী এই ঝড় জলবাদলময়ী রজনীতে একাকিনী গঙ্গাতীরে কেন? বোধ হয় কেহই ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন না, তবে আমরা মোটামুটি এই রূপ বুঝিয়া লইয়াছি যে নায়িকা উপস্থিত না থাকিলে এই নিরাশ্রয় অবস্থায় নায়কের সেবা সুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে। তাই কুমুদিনীকে এত রাত্রে এই ঝড়বৃষ্টিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছে, বিশেষতঃ এই প্রকার সংস্থান

সকল উপন্যাসের একান্ত প্রয়োজনীয়—অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা দোষস্পৃষ্ট হইলেও অপরিহার্য্য, নতুবা উপন্যাসের বৈচিত্র সম্পাদন হয় না—এই জন্য কাঙ্গালিনী মনোরমা একাকিনী সুগভীর নিশীথ সময়ে বিজন প্রান্তবস্থ সরোবর সোপানে বসিয়া চন্দ্রালোকে কেশচর্চ্চা করিতেন এবং তুবড়িওয়ালার ভেঁপুর ন্যায়, একেবারেই সরু মোটা দুই সুর, শুনাইতেন; এই জন্য নবাব-নন্দিনী আয়েষা হিন্দু-রাজ-নন্দন বন্দী জগৎসিংহের শুশ্রূষা ও প্রকাশ্য-রূপে তাঁহার সহিত প্রণয়ালাপ করিতেন এই জন্য লম্পট দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী সাজিয়া নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার গান, বাজনা ও রং তামাসা করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই বালিকা কুন্দনন্দিনী পিতৃবিয়োগের পর দিবসে অজ্ঞাত কুলশীল অপরিচিত নগেন্দ্র নাথের অনুসরণ করিতে সাহসিনী হইয়াছিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। কুমুদিনীর যত্নে রজনী সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিলে উভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে এক দিবস রজনীকান্ত সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গাতীরে (আবার গঙ্গাতীরে?) এক অশ্বত্থতলায় দাঁড়াইয়া একটি পাতা খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে প্রক্ষেপ করিতেছিলেন, কেন না তিনি তাঁহার শৈশব সহচরী কুমুদিনীকে ভাবিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন বলিয়া ঐ প্রকার করিতেছিলেন। প্রিয়জনের চিন্তা করিতে গেলে ঐ প্রকার কিছু না কিছু একটা করিতে হয়, এ উপদেশটিও গ্রন্থকার তাঁহার দাদার কেতাবে পাইয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনীতে বিষবৃক্ষে এবং আরও কোথায়২ ঠিক স্মরণ হইতেছে না, প্রিয়জন চিন্তার এই প্রকার চমৎকার চমৎকার ছবি আছে। রজনীকান্ত ঐরূপ করিতেছিলেন এমন সময় একটি যুবতী ও একটি বালিকা গঙ্গাভিমুখে আসিতেছিল। যুবতী আমাদের সুপরিচিতা কুমুদিনী এবং বালিকা তদীয়া কনিষ্ঠা ভগ্নী স্বর্ণপ্রভা। তাহারা আসিতে আসিতে থমকিয়া দাঁড়াইল। কুমুদিনী কহিল, স্বর্ণ, ঐ গাছতলায় কে দাঁড়ায়ে, দেখ্। স্বর্ণ বলিল কৈ? কুমুদিনী উত্তর করিল, ঐ যে "তোর বর লো, তোর বর।" স্বর্ণপ্রভা রজনীকান্তকে দেখিয়া, পিছু ফিরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটীর দিকে দৌড়িল এবং দৌড়িতে দৌড়িতে পড়িয়া গেল। রজনীকান্ত আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন। তুলিবামাত্র স্বর্ণপ্রভা বলপূর্ব্বক তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া এক দৌড়ে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সে কালীবাড়ীতে আরতি দেখিতে গিয়া, প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল, হে মা কালি! রজনীকান্ত যেন আমার বর হয় (কেন না আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম সে আমার হাত ধরিয়া তুলিয়াছিল?)

দুই সপ্তাহ পরে তাহাই ঘটিল রজনীকান্তের সহিত স্বর্ণপ্রভার বিবাহ হইল।

কিন্তু শৈশবসহচরী কুমুদিনীকে সেই বিবাহ প্রাঙ্গনে দেখিয়া অবধি রজনীকান্তের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল, তিনি কেবল কলের পুত্তলের ন্যায় কার্য্য করিতেছিলেন। দুই হাত এক হইয়া গেলে, স্বর্ণপ্রভা যাবজ্জীবনের জন্য রজনীকান্তের হইলে যখন বরকন্যা বাসর ঘরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছিল, হঠাৎ একটা ঝটিকা উঠিল ও সকল আলোক নিবিয়া গেল, মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। এই অবসরে বর পলায়ন করিল—দেখ দেখ্ বর পলাইল কোথায়, দেখ্!—আমরাও বলিলাম দেখ্ দেখ বর পলাইল কোথা, দেখ।

"বিপদের উপর বিপদ" আবার সেই গঙ্গাতীরে। বর পলাইতে পলাইতে অন্ধকারে দিশা হারা হইয়া গঙ্গাতীর যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যেখানে নায়ক সেই খানে নায়িকা, যেখানে শ্যাম সেই খানে রাধা, অতএব সেই রাত্রে কুমুদিনীও সেখানে যাইয়া উপস্থিত। উভয় কতক্ষণ ধরিয়া পরিতাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস, কত মনের ব্যথা—প্রণয় কথা কহিয়া, মা গঙ্গার বিশাল হৃদয়ে সাঁতার দিল, পুনর্ব্বার কূলে উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। এই রূপ গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাস্নান, এই গ্রন্থে কতবার আছে তাহা আমরা ঠিক গণনা করিতে পারি নাই, কারণ আমরা একান্তচিত্তে ঔপন্যাসিক ঘটনাই অনুসরণ করিতেছিলাম, অত হিসাব রাখিবার অবসর পাই নাই। সে যাহা হউক, বর পলাইলেন আবার ফিরিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবাহ আর ফিরিল না, তিনি অসামান্য লাবণ্যবতী একাদশ বর্ষীয়া পতিপরায়ণা সতী স্বর্ণপ্রভাকে লইয়া ঘরকন্না করিতে বাধ্য হইলেন এবং অল্পদিনেই তাহার গণনাতীত গুণরাশীতে বশীভূত হইয়া পড়িলেন।

বিবাহের পর এক বৎসর সুখে কাটিয়া গেল, একদা রাত্রিকালে কুমুদিনী আসিয়া খবর দিল যে রজনীর চিরশত্রু রবিকান্ত প্রেরিত একদল দস্যু রজনীকান্তকে খুন করিতে আসিতেছে। এই সংবাদ দিতে না দিতে দস্যুদল আসিয়া উপস্থিত—কুমুদিনী তাহাদের দ্বারা আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং দ্বাদশ বর্ষীয়া সতী স্বর্ণপ্রভা প্রাণাধিক পতি রজনীকান্তকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনি দস্যুদিগের নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। ধন্য বালিকার প্রেম! এ প্রকার বালিকা প্রেমের গাম্ভীর্য্য ও মাহাত্ম্য কয় জন বুঝিতে পারিয়াছেন? পরে বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া দস্যুদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিল। রজনীকান্ত স্বর্ণপ্রভার সৎকার সমাধা করিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার তদীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুমুদিনীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্র নামে রজনীকান্তের এক মাস্তুত ভাই, সেই ডাকাইতি হাঙ্গামার সময় কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া কুমুদিনীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সেও কুমুদিনীর প্রণয় ও পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্রের প্রতি কুমুদিনীর

অধিকতর অনুগ্রহ ও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হওয়াতে রজনীকান্ত রেবেকা ও আএষার মত নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী শরৎচন্দ্রকে আপনার বিপুলৈশ্বর্য্য সমর্পণ করিয়া সামান্য রূপে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে কুমুদিনীর দেশত্যাগী পিতা গৃহে আসিয়া পুনর্ব্বার সংসারী হইয়াছিলেন—পুনর্ব্বার সংসারী হইয়াছিলেন, যেহেতু তাহার গৃহিণী স্বীকার করিয়াছিল যে এবার তাঁহার বিধবা কন্যার বিবাহ বিষয়ে কোন প্রকার আপত্তি বা বাঙ্-নিষ্পত্তি করিবে না এবং তাহার কন্যা কুমুদিনীও বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল।

সুযোগ বুঝিয়া এক দিন শরৎচন্দ্র কুমুদিনীর নিকট তাহাদের বিবাহের কথা উত্থাপন করিল এবং সে বিষয়ে তাহার মতামত জানিতে চাহিল। কিন্তু সর্ব্বনাশ! কুমুদিনী একেবারেই বলিয়া বসিল, আমি তোমায় বিবাহ করিব না। শরৎ জিজ্ঞাসিল কেন? কুমুদ উত্তর করিল, তুমি যে বড়মানুষ, আমি এক জন দরিদ্রকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। শরৎ বুঝিল, তবে কুমুদিনী রজনীকে বিবাহ করিবে, অতএব তাহার আর কোন আশা নাই, আবার ভাবিল কেনই বা নিরাশ হব, রজনী দরিদ্র বলিয়া কুমুদিনী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে, আমি যদি দরিদ্র হই তবে আমাকেই বা সে কেন না বিবাহ করিবে? (বটে-ইত) এই ভাবিয়া সে রজনীকান্তের চিরশত্রু বঙ্কিমকান্তের নামে আপনার বিষয় আশয় যথাসর্ব্বস্ব দানপত্র লিখিয়া দিল। আহা, প্রেমের কি বিচিত্র গতি! অথবা কবি সর্ব্বশক্তিমান, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

শরৎচন্দ্র এত করিল বটে কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল না, কৌশল-কুশলা কুমুদিনী কোনরূপে সেই দানপত্রখানি হস্তগত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল, অতএব শরতের আর প্রকৃতরূপে নিঃস্ব হওয়া হইল না। রজনী কান্তের সহিত কুমুদিনীর শুভ বিবাহ হইয়া গেল। এই খানে পাঠক মনে করিতেছেন উপন্যাস শুভ ঘটনায় পরিসমাপ্ত হইল, কিন্তু তাহা নহে এখনও গল্পের বাকি আছে। বিনোদিনী নামে কুমুদিনীর এক খুড়তুত ভগ্নী, ছিল, সেও খুব সুন্দরী সেও যুবতী, সেও রজনীকান্তকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসিত। কুমুদিনীর সহিত রজনীকান্তের বিবাহ হইলে সে ঘোর নৈরাশ্যে পীড়িতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কিন্তু তাহার বড় সুখের মৃত্যু হইয়াছিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "অধরপ্রান্তে মৃদুহাসি না মিলাইতে মিলাইতে বিনোদিনী রজনীর ক্রোড়ে প্রাণ ত্যাগ করিল"। রজনীর বড় জোর কপাল বলিতে হইবে মুখুয্যাদের তিনটি সুন্দরী মেয়েই তাঁহাকে সমান ভাল বাসিত, দুইটিকে তিনি বিবাহ করিতে পাইয়াছিলেন আর একটি তাঁহারই জন্য তাঁহার ক্রোড়ে শুইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই ত গেল মূল কথা, মুখুয্যাদের তিনটি

সুন্দরী মেয়ের প্রেমের কথা, এছাড়া ইহার আনুসঙ্গিক আর আর অনেক কথা আছে, যাহার সমস্ত জানিবার অভিলাষ হয়, তিনি সমালোচ্য পুস্তকের এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে যাহা যাহা আছে, ইহাতে সে সমস্তই আছে বরং কিঞ্চিৎ বেশি আছে—ইহাতে গঙ্গা আছে, যমুনা আছে, সরোবর আছে, মন্দির আছে, সন্ন্যাসী আছে, ডাকাইত আছে, ছেলেপেরা আছে, কাটাকাটি, মারামারি আছে, বিধবার বিয়ে আছে, বালিকার প্রেম আছে, সাঁতার দিতে দিতে প্রণয়ালাপ আছে, সংক্ষেপতঃ ইহার বাহ্যাবয়ব সমস্তই বঙ্কিম বাবুর মত. সেই কবিত্বের অভাব, কেবল বঙ্কিম বাবুর রস ভাব ও চরিত্রের অভাব। ইহাতে সাড়ে আঠার খানা মসালা ও আঠার ভাজা সমস্তই আছে. কেবল কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের অভাব।

যোগ।

যোগের প্রথমাধ্যায়ে প্রাণায়ামের ও সোমরসের ও পার্থিবামৃতের বিষয় বলা হইয়াছে এইক্ষণ পবন পানের দ্বারা যোগীদিগের যাহা হয় তাহা সপ্রমাণ বলা যাইতেছে।

বায়ু পৃথিবীমণ্ডলকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই বায়ু কার্য্য কারণ গতিকে ৪৯ পঞ্চাশৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অনাবশ্যক হেতু পবনের প্রত্যেক নাম ও ক্রিয়া এস্থলে লেখা গেল না। ইতঃপূর্ব্বে দেহস্থ বায়ু গুলির নাম ও ক্রিয়ার বিষয় লেখা হইয়াছে কিন্তু ভ্রূমধ্যস্থ চন্দ্র মণ্ডলাকৃতি বায়ুর বিষয় বলা হয় নাই অধুনা তাহারি বিষয় বলা যাইতেছে। সর্প আর ভেক অন্য কিছু আহার না পাইলেও নিরবচ্ছিন্ন পবন পান করিয়া যত দিন ইচ্ছা তত দিন পরমসুখে জীবিত থাকিতে পারে ইহা ভারতেরি স্বীকার্য্য। ভারতীয় পূর্ব্বার্য্যাচার্য্যেরা সর্প ও ভেকের কার্য্য করার উপায় ভবানীপতি ভবের নিকটে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে এ অধ্যায়ে পবন পানের ক্রম ও ফল শ্রুতি বলা যাইতেছে। যথা শিবসংহিতা।

সরসংযঃ পিবেৎ বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ। নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রম দাহ জরা ময়া ২১॥ তন্ত্রশাস্ত্রে পবন পানের যেরূপ বিধান আছে সেই বিধান ক্রমে প্রত্যহ বুদ্ধিমান যোগী সরস বায়ু পান করিলে সেই যোগীর যাবতীয় শ্রম ও গাত্রদাহ শরীরের জীর্ণতা ও ব্যাধি বিনষ্ট হইতে থাকিবে। ১॥

অপিচ। রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা যশ্চন্দ্রা দনিলং পিবেৎ। মাসত্রয়েণ যোগীন্দ্রো মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং॥ ২॥

জিহ্বাকে যেরূপে লম্বা ও সূক্ষ্ম করিতে হয় তাহা বলা যাইতেছে। জিহ্বার নিম্নে যে সকল বন্ধন আছে সেই বন্ধন গুলি উত্তম সুধার অস্ত্র দিয়া বিজ্ঞ যোগবিৎ গুরুর দ্বারা কর্ত্তন করিয়া সেই ক্ষত সুক্ষ কারক ঔষধাদি দ্বারা শুষ্ক হইলে ক্রমাগত বৎসরাবধি নবনীত দিয়া জিহ্বাকে টানিতে টানিতে লম্বা করিবে পরে অর্দ্ধ হস্ত লম্বিত জিহ্বাকে উলটাইয়া উর্দ্ধে উঠাইবে তৎপর ঐ উর্দ্ধগত জিহ্বাগ্রভাগ টাগরায় যে ছিদ্র আছে সেই বিবর মধ্যে প্রবেশ করাইলে ললাটস্থ চন্দ্রমণ্ডলাকার শীতল বায়ু ঐ জিহ্বাগ্রে স্পর্শ হইতে থাকিবে। এই রূপে যে যোগীন্দ্র তিন মাস নিরন্তর বায়ু পান করিতে পারেন তিনি নিশ্চয় মৃত্যুকে জয় করিবেন॥ ২॥

অন্যচ্চ। দন্তৈ দন্তান্ সমাপীড্য পিবে দ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ। ঊর্দ্ধজিহ্বাস্তু মেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোঽচিরাৎ॥ ৩ দন্ত দ্বারা দন্ত সকলকে চাপিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রসনাকে উর্দ্ধগামী করিয়া অল্পে২ টাকরার ছিদ্র দিয়া বায়ু ঐ জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিলে শীতল বায়ু পান করা হয়। এপ্রকার বায়ু পান নিরন্তর ৩ মাস করিলে যোগীর মৃত্যুভয় থাকে না॥ ৩॥

বায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা থাকায় বায়ু শীতল হয় সত্য সেই শীতল বায়ু জিহ্বাগ্রে স্পর্শ হইলে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও আধি ব্যাধি নিবারণ হয় ইহার হেতু বায়ু মধ্যে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল কণা আছে সেই জলকণার মধ্যে অমৃত ও তেজঃ আর ঔষধি থাকার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সেই অমৃত আর ঔষধি ও তেজঃ সকল যোগীদিগের জিহ্বাগ্রে অনবরতঃ স্পর্শ হইবায় বায়ুপায়ী যোগীদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম দাহ জরা জীর্ণতা একেবারে দূর হয় তাহাতে মৃত্যুভয় কি প্রকারে থাকিতে পারে। যদি বল বায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা কিরূপে যায় এরূপ আপত্তি হইলে তাহার উত্তরে এই বলা হইয়াছে যে বায়ুতে জল প্রবেশের উপযুক্ত ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র দিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা বায়ুতে প্রবিষ্ট হয়। আবার রৌদ্রের উত্তাপে সেই জলকণা তপ্ত হইলে বায়ু তপ্ত হয়। যখন রৌদ্রের উত্তাপ অল্প হয় তখন বায়ু শীতল হইয়া পড়ে। শীত কালের আর রাত্রিকালের বায়ু শীতল হইবার এই কারণ ভিন্ন অন্য কারণ দেখা যায় না, বায়ু সরস আর শীতল হইবার জন্য কুম্ভকের আবশ্যক। কুম্ভক অন্যূন দীর্ঘকাল ব্যাপক হইলে শরীরস্থ যাবতীয় বায়ু শীতল হইয়া যায়। বায়ু শীতল হইলে অন্যান্য দৈহিক পদার্থ সকলেরও শৈত্য ধর্ম্ম ঘটে। কিন্তু জীবনীশক্তির বিন্দু বিসর্গ হ্রাস হয় না। মানবগণের যখন প্রাণন ক্রিয়া বিরহিত হয় তখন তাঁহার শরীর হিমালয় হয় ইহার নাম মৃত্যু। বহির্ব্বায়ু দেহে প্রবিষ্ট ও ঐ প্রবিষ্ট বায়ু বাহিরে নিঃসরণ হওয়ায় শোণিত সঞ্চালন

ও সঞ্চালিত শোণিত উষ্ণ হইয়া থাকে পণ্ডিতেরা ইহাকেই প্রাণন ক্রিয়া বলিয়াছেন। যাহারা শরীরের মধ্যে বহির্বায়ু পূরণ করত সেইবায়ু জিহ্বা দ্বারা পান করে তাহাদিগের জীবন ধ্বংস না হইবার কারণ—পূরিত বায়ু শরীরস্থ হইয়া দেহের মধ্যেই শোণিত সকলকে সঞ্চালন করিতে থাকে। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া একেবারে রহিত হইয়া পড়ে না অল্প পরিমাণে রক্ত সঞ্চালন হয় তাহাতেই যোগীগণ জীবিত থাকেন। যোগীদিগের শরীরে অল্প অল্প শোণিত বৃদ্ধি হয়। রক্ত আহারের বিকার যোগীরা বায়ু পান করিতে থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগের বায়ুপান উপযোগী রক্তও হইতে থাকে।

কতকগুলি যোগী আছেন তাঁহারা কেবল পূরক কুম্ভক ও রেচক ক্রিয়ার সহিত ভ্রূমধ্যস্থ সরস বায়ু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পান আর কুণ্ডলিনীকে ষট্ চক্র ভেদ করিয়া পরমাত্মার সহিত যোগ করিতে করিতে অল্পে অল্পে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে লীন হন। এরূপ যোগীকে যুক্ত যোগী বলে। পূর্ব্বোক্ত যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। জীবন্মুক্ত যোগীর দেহ অচল পদার্থবৎ চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। উভয় প্রকার যোগীর মানসিক ক্রিয়া বৈ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়াই থাকে না। সাধারণ মনুষ্যের যেমন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা আছে বায়ুপায়ী যোগীদিগের কেবল নিত্য জাগ্রৎ অবস্থা বৈ আর কোন অবস্থা থাকে না। নিত্য জাগ্রদবস্থা কাহাকে বলে যে অবস্থায় থাকিয়া দিবা রাত্রি আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন অন্য চিন্তা মাত্র থাকে না তাহাকে নিত্য জাগ্রদবস্থা বলা যায়। চির-জাগ্রদবস্থান্বিত যোগীদিগের ভ্রম প্রমাদাদি কোন দোষ থাকে না এ নিমিত্ত তাঁহারা আপনাকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত করিতে পারেন।

এরূপ যোগ সাধনা সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিতগণ কি বলেন। তাঁহারা বলেন বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজন আর হাইড্রেজন পদার্থ আছে সেই পদার্থদ্বয়েতে মানবগণের জীবনী শক্তি হইতেছে, উহার প্রথমটিতে শোণিত শোধিত করে, অপরটিতে শরীরস্থ দূষিত পদার্থগুলিকে বাহির করে। নিঃশ্বাসে শোধন প্রশ্বাসে দূষিত পদার্থকে বাহির করায় এমতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যতই আধিক্য হইতে থাকে ততই শরীর সুস্থ ও বলশালী হইয়া মানুষ দীর্ঘজীবি হয়। অতএব ব্যায়ামকারীর ও যোদ্ধাগণের পরিশ্রম বাহুল্য হওয়া বিধায় ঐ সকল লোক অন্যান্য লোকাপেক্ষা নিরোগী ও সবল ও দীর্ঘজীবী হয়। এই নিয়মানুসারে যোগীরাও প্রাণায়াম ও রাজযোগ প্রভাবে অরোগী ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। প্রাচীন ও নবীন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মণ্ডলীতে যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার গুণ গান মুক্ত কণ্ঠে-স্বীকার করিয়াছেন তখন কেনই বা আমরা তাহা অমান্য করিব।

৬০। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বায়ু পায়ী যোগী দেখা যাইত। ৪০ কি ৪২ বৎসর অতীত হইয়াছে ঐকালে ভূকৈলাসে যে মহা পুরুষ আনীত হয় তিনি এক জন বায়ু পায়ী যোগী। তাঁহাকে যিনি যিনি দেখিয়াছিলেন তাঁহারা তৎকালে সকলেই ঐ মহাপুরুষকে বায়ু পায়ী অবধারিত করিয়াছিলেন। এই সময় শালিখা নিবাসী মৃত জমিদার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র বাবু শ্যামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জন্মান্তরীণ পুণ্য পুঞ্জ জাত জ্ঞান প্রভাবে কাশীধামে কতিপয় বৎসর বাস করিয়া যথাবিধানে প্রায়োপবেশন যোগা বলম্বনে ১৪ চতুর্দ্দশ দিবসে নশ্বর মানব দেহ পরিত্যাগ করায় কাশীধামে তাঁহার যশঃ জীবিত রহিয়াছে। এ যুগে এ প্রকার যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিতে যে কেহ পারিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই। প্রায়োপ বেশনের স্থলে কেবল মাত্র বায়ু ভক্ষণ হয় বলিয়া ২১ একবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত প্রায়োপবিষ্ট যোগী জীবিত থাকিতে পারেন। নিয়মিত রূপ বায়ু পান করিতে পারিলে যাহা হয় তাঁহা উপরে বলা হইয়াছে। শ্যামাচরণ বাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কেহ কেহ অবিবেক বশতঃ দোষারোপ করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু যখন বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে যান তখন তাঁহাদিগের জমিদারি ইত্যাদির কমবেশ ৪ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় ছিল বলিয়া যতদূর সম্ভব করিতে পারিবার তাহা করিয়াছিলেন, পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ কমবেশ ৪০টি করায় ও ব্রতনিয়মাদিতে প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহাঁর দৈব পৈত্রিকর্ম্মের আড়ম্বর যত ছিল বাবুয়ানার আড়ম্বর তত ছিল না। ইংরেজি পার্সী সংস্কৃত ভাষা জানিতেন। শান্ত প্রকৃতি ও সৌম্য মূর্ত্তির লোক ছিলেন কাশী যাইবার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে কেবল ২টি করিয়া ওলামাত্র—আহার করিতেন। অন্য কিছুই আহার করেন নাই। শ্যামাচরণ বাবু দ্বিতীয় রাজা রাম কৃষ্ণের ন্যায় যোগী ছিলেন। রাজা রামকৃষ্ণ ১৩টি শব সাধন করিয়া যে ফল পাইয়াছিলেন শ্যামাচরণ বাবু কেবল প্রায়োপবেশন যোগে তদপেক্ষা কম ফল পান নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে শব সাধনার যেমন প্রশংসা করা হইয়াছে যোগ শাস্ত্রের পক্ষেও তদ্রূপ বর্ণিত আছে। ইহার পর প্রায়োপবেশন যোগের বিষয় লেখা যাইবে।

ক্রমশঃ

বঙ্গীয় কবি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে,—এক উপলক্ষে, এক বিষয়ে, এই দুই কবির এককালে রচিত দুই কবিতার সমালোচনা করা যাউক। হেম বাবু "ভারতভিক্ষা" লিখিয়াছেন; নবীন বাবু "ভারত উচ্ছ্বাস।" হেম বাবুর কবিতার আরম্ভ এবং নবীন বাবুর কবিতার আরম্ভ এই দুইটী আলোচনা করিয়া দেখিলে এই দুই কবির মধ্যে কত প্রভেদ তাহা প্রতীত হইবে।

হেম বাবুর আরম্ভ:—

কি শুনিরে আজ—পুরি আর্য্যদেশ
এ আনন্দ ধ্বনি কেনরে হয়
বৃটিশ-শাসিত ভারতভিতরে—
কেন সবে আজি বলিছে জয়

নবীন বাবুর আরম্ভ:—

গাইছে পশ্চিমে, পূরবে দক্ষিণে
ভারত সাগর আনন্দে তরল
নাচিয়া নাচিয়া নীলিমা অসীমে,
দেয় করতালি তরঙ্গ চঞ্চল
যুবরাজ আগমনে—

এই অধীন, অস্তমিত গৌরব রবি তিমিরাচ্ছন্ন ভারতে কেন আনন্দধ্বনি হইল, এই বিদেশীয় পদাবনত মহীখণ্ডে সহসা কেন উৎসবের কোলাহল হইল? এই আনন্দ ধ্বনি শুনিয়া আর্য্যদেশীয় কবি চমকিত হইলেন—সহসা যেন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং নিদ্রাবেশে তিনি এই মহা কোলাহলের কারণ যেন বুঝিতে পারেন নাই, তাই স্বদেশীয়বাসিদিগকে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহার কারণ কি?

এই কয়েক ছত্রে প্রত্যেক শব্দে গূঢ় মর্ম্ম আছে, গভীর অর্থ আছে—পাঠ করিলেই বোধ হয় যে ইহা কোন দেশানুরাগীর শেলবিদ্ধ হৃদয় হইতে নিঃসৃত। "কি শুনিরে আজ," এই কয়েক শব্দে পাঠকের মনে হইল, বহুকাল হইতে ভারত নীরবে নিরানন্দে,কাল যাপন করিয়া আসিতেছে। "আর্য্যদেশ" এর আর্য্যশব্দে ভারতের ভূতগৌরব পাঠকের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল—অনেক সুখ দুঃখের কথা মনে পড়িয়া যাইল। "বৃটিশ শাসিত" ইহাতে যাহা মনে হইল পাঠক নিজে দেখুন। আরম্ভটী কেমন স্বাভাবিক সুন্দর।

আর নবীন বাবুর আরম্ভ? নবীন বাবু যে রাজকুমার আগমনে প্রথমেই ভারত সাগরকে আনন্দে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন তাহা কি স্বাভাবিক? পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন।

তৎপরে হেম বাবু লিখিলেন:—

"গভীর গরজে ছুটিছে কামান"

নবীন বাবু:—

একি!! মুহুর্মুহু যুড়িয়া ভারত
একবিংশ ধ্বনি ধ্বনিছে কামান,

"গভীরগরজে ছুটিছে কামান" ইহাতে "গভীর" এ গাম্ভীর্য্য "গরজে" মেঘগর্জ্জনের সহিত তুলনা ও উদ্দীপনা, "ছুটিছে" এই শব্দে বেশ প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেক শব্দে ভিন্ন ভিন্ন ভাব রহিয়াছে। বারটী অক্ষরে কেমন আশ্চর্য্য বর্ণনা হইয়াছে। হেমবাবু যাহা দ্বাদশ অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন, নবীন বাবু দ্বাদশশব্দে তাহা পারেন নাই। নবীন বাবু, যুবরাজ আগমনে তাঁহার ভারত-উচ্ছ্বাসের প্রথম তিন পৃষ্ঠাতে যে আনন্দ লহরী তুলিয়া দিয়াছেন তাহা কেহ তাঁহার হৃদয়োদ্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করে না। তাহা ব্রিটিশশাসিত ভারতবাসীর কর্ণে লাগিয়া প্রত্যাহত হয় হৃদয়ে প্রবেশ করে না। হেমবাবু যুবরাজ আগমনে যে আয়োজন ও সজ্জা হইয়াছে, যে বাহ্যিক উৎসাহ ও আনন্দ চিহ্ন দেখা যাইতেছে তাহা কতিপয় গাঢ় সংক্ষিপ্ত ছন্দে প্রকাশ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কন্যা অন্তরীপ হৈতে হিমালয়
কেনরে আজি এ আনন্দময় ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম "শাখাতে" ব্রিটিশজাতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বর্ণনা করিলেন। তাহাতে অধিনায়কেরও বর্ণনা হইল, তাহার কিছু পরে চন্দ্রসূর্য্যবংশোদ্ভব ভারত ভূপ দিগকে, এবং নিজাম প্রভৃতি নরপতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ;—

রাজদরবারে হওরে হাজির
করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা

*　*　*　*

জানুপাতি ভূমে হেলায়ে উষ্ণীষ
পরশি সম্ভ্রমে কুমার ব্রিটিশ

*　*　*

"ভারত নক্ষত্র" বাঁধিয়া গলায়
রাজধানী মুখে ধাবিত হও
ঘোটকে চড়িয়া ফির পাছে পাছে
ইত্যাদি ইত্যাদি

এই সকল বাক্যের রাজভক্তি কে বুঝিবে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের নিমিত্ত আর অধিক স্থান দিতে পারি না। আর একটী স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিব। নবীন বাবু লিখিয়াছেন :—

"এস রাজপুত্র, কি দেখিতে হায়
পতিতা ভারতে তব আগমন ?
ভারতের কীর্ত্তি এবে স্বপ্ন প্রায় ;
অনিদ্র নিশি তোমার সৃজন !
তোমার ইঙ্গিতে দেশ দেশান্তরে,
আপনি বিদ্যুৎ বহে সমাচার
তব পরশনে চলে রোষভরে
বাষ্পীয় বাহন ছাড়িয়া হুঙ্কার

হেমবাবু :—

কেনরে এখানে আসিছ কুমার
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার
কি দেখিবে আর—আছে কি সে দিন
ভারত সন্তান নৈঋত ঈশান
মুখে জয় ধ্বনি তুলিয়া নিশান
জাগায়ে মেদিনী গাইত গাথা

যাহা লিখিলাম তাহাতেই এই দুই পুস্তকের মধ্যে কত অন্তর তাহা প্রতীয়মান হইবে। তবে নবীন বাবুর "ভারত

উচ্ছাসে" যে কিছুই নাই তাহা বলি না। তাঁহার ১৯, ২০, ২১, ২২ শ্লোক অতি সুন্দর। কিন্তু "ভারত উচ্ছ্বাস" যে ভারত ভিক্ষার সহিত তুলনা হইবার যোগ্য তাহা কোনমতেই বলিতে পারি না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

শ্রীবোধেন্দু চক্রবর্ত্তী

রাজা আল্‌ফ্রেড।

বহুকাল পূর্ব্বে যখন অসভ্য বৃটন বাসীরা বিবিধ প্রকার বিকৃত রঙ্গে শরীর রঞ্জিত করিয়া তরু কোটরে, ভূগর্ভে এবং নিভৃত পর্ব্বত গুহায় অতি দীনহীন ভাবে দিন যাপন করিত, যখন তাহারা বল্কল পরিধান করিয়া অনাচ্ছাদিত পদে এবং অনাবৃত মস্তকে গহন বনে মৃগশাবক শিকার করিয়া বেড়াইত, যখন তাহারা প্রকাণ্ড ওক্ তরুর মূলে ধর্ম্ম বিভ্রান্ত চিত্তে দৈত্যকুলের পূজা করিত, যখন তাহারা সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ দ্বারা ড্রুইড্‌দিগের পদতলের ধূলি সকল মুছাইয়া দিত এবং সামান্য শয্যাভাবে আবর্জ্জনাপূর্ণ ভূমিতলে নিশা যাপন করিত, তখন কে মনে করিয়াছিল যে, সেই অসভ্য দুর্দ্দান্ত কাফ্রীসম বৃটন বাসীরা পৃথিবীর মধ্যে অতি উন্নত পদবী লাভ করিবে? যখন তাহারা নৈশগগণে অসংখ্য দীপ্তিমান নক্ষত্র পুঞ্জ পরিবেষ্টিত পৌর্ণমাসী শশধর কে দর্শন করিয়া অপার আনন্দে নৃত্য করিত এবং বায়ুর প্রবল ঘূর্ণন, অগ্নির ভয়ঙ্কর দাহন, মেঘের ভীমনাদ, ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক লহরী এবং জলের প্রবাহ দর্শন করিয়া তাহাদিগকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন জ্ঞানে দেবতা বোধে পূজা করিত, তখন কে মনে করিয়া ছিল যে, সেই জাতি আবার বিজ্ঞান বলে এই সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে? যখন তাহারা সামান্য পর্ণকুটীরও নির্ম্মাণ করিতে জানিত না, যখন কোন প্রকার বিলাসের খাদ্য তাহাদের জিহ্বা স্পর্শ করে নাই, যখন অনাবৃত শিরে মধ্যাহ্ন কালের প্রখর সূর্য্য কিরণ তাপে দগ্ধ হইতে হইতে তাহারা কদর্য্য তীর ধনু লইয়া বন্যবরাহ শিকার করিতে যাইত, যখন তাহারা গভীর মূর্খতা সাগরে নিমগ্ন ছিল, এবং অশন বসন জ্ঞান ধর্ম্ম সকল বিষয়েরই জন্য রোমের নিকট শিক্ষালাভ করিত, যখন সামান্য লেখনী এবং মসী পাত্রটির জন্যও তাহারা রোমবাসীর পদতলে পড়িয়া থাকিত এবং রোমের বিরুদ্ধে একটি বাক্যব্যয় করিতেও সমর্থ হইত না, তখন কে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিয়াছিল যে, সেই পদ দলিত পিশাচ সেবক বৃটেনিয়েরা শিক্ষা গুরু উন্নত রোমেরও শিরোদেশে সগর্ব্বে পদাঘাত করিবে? যখন গ্রেট

বৃটেনের সর্ব্বত্র জলময় জঙ্গলময় ছিল, যখন তথায় নগরের বা মিউনিসিপাল-সভ্যতার কোন প্রকার নিদর্শনই ছিল না, তখন কাহার মনে ইহা উদয় হইয়াছিল যে, সেই দেশ এক্ষণে বিদ্যা বুদ্ধি অধ্যবসায় প্রভৃতি সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ বিষয়েই পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করিবে? কিন্তু কালের বিচিত্র গতি! কালে সকলই হয়। সেই ইংলণ্ড এক্ষণে রাজমহিষী বলিয়া বিখ্যাত। সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কস্থায়িনী, পতাকা তাঁহার শিরোদেশে উড্ডীয়মান। পৃথিবীর সবদেশ পর্য্যন্তও তাঁহার অতুল যশ-দুন্দুভিনাদে ঘোষিত হইতেছে।

কিন্তু কিরূপে এই অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ উন্নতি সংসাধিত হইল, ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, একই উত্তর পাওয়া যায়। "উন্নত হইবার ইচ্ছা বৃটনীয়দিগের মধ্যে বড় বলবতী"। শুদ্ধ ইচ্ছা বলবতী নহে, সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার অভিলাষও বলবতী। কাজেই মহত্ত্ব আপনা হইতেই করায়ত্ত হয়। ভারতেরও এমন এক দিন ছিল, যখন আর্য্য মহর্ষিগণ জ্বলন্ত প্রতিভা ও উদ্দীপনার সহিত কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেন। এখন সে দিন গিয়াছে, সে দিনও নাই, সে দিন দেবও নাই। এখন সে সূর্য্য বৃটনাকাশে উঠে এবং বৃটন পর্ব্বত গুহাতেই লীন হয়। সে কিরণ হতভাগ্য ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না। যদিও কিছু কিছু আসিয়া থাকে, তদ্দ্বারা অনেক সময় আমাদের ভাল হয় না, বরং আমাদের সঞ্চিত সম্পত্তি শুষ্ক করিয়া লইয়া যায়। সময়ে সময়ে দেশীয় ছাতি দিয়া সেই প্রখর রৌদ্র রক্ষা করিতে হয়, নতুবা হিন্দুকলিজা শুকাইয়া যায়।

যাহা হউক, বৃটেনীয়দিগের পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার অসাধারণ এবং অপরিমিত গুণ থাকাতেই তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী মহৎ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন এবং যত দিন পর্য্যন্ত এইরূপ অধ্যবসায়, উদ্দীপনা ও মহতী ইচ্ছা তাঁহাদের মধ্যে প্রবল থাকিবে তত দিন পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের মধ্যে মহৎ লোকের অভ্যুদয় হইতে থাকিবে। কিন্তু এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন বৃটীশ জাতি রোমের অধীনে উন্নতির প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতেছিল, তখনও তাঁহাদের মধ্যে এক এক জন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহান্‌ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রাজা আল্‌ফ্রেড্‌ অগ্রগণ্য ও প্রাতঃস্মরণীয়। ইঁহার জীবন চরিত অতি উপাদেয় বিবেচনায় আমরা সংক্ষেপে তাহা এস্থলে বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আঙ্গল্‌স্‌ এবং স্যাক্‌সন্‌দিগের মধ্যে পরস্পরে যখন অন্তর্বিবাদ চলিতেছিল এবং ডেন্‌স্‌দিগের অত্যাচারে ইংলণ্ড যখন প্রপীড়িত হইতেছিল, তখন রাজা আল্‌ফ্রেডের অভ্যুদয় হয়। ইনি ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রথম নরপতি এগ্‌বার্টের

পৌত্র। এগ্‌বার্ট যেমন দয়া ধর্ম্ম বিদ্যা প্রভৃতির মূর্ত্তিমান অবতার স্বরূপ ছিলেন, ত্বদীয় পৌত্রও তদপযুক্ত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর এক দিন শারদীয় অপরাহ্ণে আল্‌ফ্রেডের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম গ্রহণের অতি অল্প কাল পূর্ব্বে ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন ও ভূমি কম্পন হইয়াছিল। আচার্য্যগণ তদ্দর্শনে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, "আল্‌ফ্রেড অতি বড় লোক হইবেন।" কালে, আচার্য্যদিগের বাক্য সফল হইয়াছিল। আল্‌ফ্রেড্‌ পরে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

আল্‌ফ্রেডের পিতা বড় বিদ্যাবসক্ত ছিলেন না, কিন্তু ত্বদীয় জননী অত্যন্ত বিদ্যাবতী ছিলেন। বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি সাধারণ্যে "উইটিনা" নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন। সাক্‌সন্‌ উইটিনা শব্দের অর্থ পণ্ডিতা। তিনিই আল্‌ফ্রেডের বাল্যকালের শিক্ষা গুরু। তিনি আপন সন্তানকে বর্ণ পরিচয় করাইতে আরম্ভ করেন এবং সাক্‌সন কাব্য গ্রন্থ সকল হইতে বীর রসাত্মক মূর্ত্তি সকল দেখাইয়া আল্‌ফ্রেডের মনে বাল্যকাল হইতে বীর ভাবের সঞ্চার করিয়া দেন। আল্‌ফ্রেডের মাতা আপন সন্তানকে ঐ সকল ছবি দেখাইতেন। তদ্দর্শনে সুকুমার মতি আল্‌ফ্রেডের কোমল হৃদয় ক্ষেত্রে বীর মূর্ত্তি সকল অঙ্কিত হইয়া যাইত। আল্‌ফ্রেড এক দিন মাতার নিকট ঐ পুস্তক প্রার্থনা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি পড়িতে শিখিলে ইহা প্রাপ্ত হইবে।" এই বাক্যটি বালক আল্‌ফ্রেডের হৃদয়ের অন্তরতম তন্ত্রীতে পর্য্যন্ত প্রতিঘাত করিয়াছিল, তাঁহার অস্থিতে অস্থিতে ইহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। বাস্তবিক ইহা তাঁহার নিকট অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি শীঘ্র শীঘ্র এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সত্বরেই পাঠ শেষ করিয়া জননীর নিকট সেই অভিলষিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তিনি ছোট ছোট শ্লোক এবং উত্তম উত্তম গীত সকল অভ্যাস্ত রাখিতেন এবং অবকাশ মতে মাতার নিকট ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে সেই সকল গীত স্বরে গাইয়া পুরস্কার লাভ করিতেন। মাতার নিকট কখন বীণা বাজাইতেন, কখন কবিতা আওড়াইতেন কখন মুখে মুখে অঙ্ক কসিতেন। তাঁহার মাতাও তৎপরিবর্ত্তে মিষ্টান্ন, খেলনা এবং ছোট পুস্তক সকল পুরস্কার করিতেন। এই সময়ে আল্‌ফ্রেড বিবিধ প্রকার সমর কৌশলে শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই সাহিত্যেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

আল্‌ফ্রেড বাল্যাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া যখন যৌবনাবস্থায় পতিত হইলেন, তখন তাঁহার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু সাধারণ প্রজা মাত্রেই যুব রাজের রাজ্যাভিষেকে অত্যন্ত ভীত হইল, তাহারা যুবা অল্‌ফ্রেডের প্রাণবিনাশের আসঙ্কা করিতে লাগিল। যে দিন তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির কথা

রাজ্যের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল, সেই দিন অত্যাচারী ডেনস্ সম্প্রদায় বলিয়া উঠিল যে, "যে প্রজা এই নূতন রাজার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে কর দান বা তাঁহার অভিমতানুযায়ী কোন কার্য্য করিবে, তাহার সত্বরেই ডেনস্ রাজ দণ্ডে প্রাণ বিনষ্ট হইবে।" উত্তরোত্তর ডেনসগণ আলফ্রেডের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড় যন্ত্র করিতে লাগিল এবং রাজ্যের প্রধান লোকেরা ডেনসদিগের অনুজ্ঞা মত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোপনে গোপনে তাঁহার প্রাণ বিনাশের সঙ্কল্প করিতে লাগিল। আলফ্রেড এক বন্ধুর মুখে ইহা জ্ঞাত হইয়া, সামান্য অতিথি বেশে রাজ্য হইতে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সামান্য মাত্র অর্থ এবং কয়েক খানা জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড মাত্র ছিল। একজন ভৃত্য তাঁহার পথের দোসর হইয়াছিল। ঐ ভৃত্যের সহধর্ম্মিণীও আলফ্রেডের সঙ্গে ছিল। এই রূপে নূতন রাজা, বিস্তৃত ধনরাশী রাজ্য খণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সামান্য জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড লইয়া অতিথি বেশে প্রাণ ভয়ে নিভৃত স্থল সমূহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা এক্ষণে এথেলনি দ্বীপে উপস্থিত হইলেন তথায় আল্‌ফ্রেডের কয়েক জন বন্ধু ছিল, তাঁহাদের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আল্‌ফ্রেডকে শান্তনা করিয়া নানা প্রকার উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি ইতর লোক সংগ্রহ করিয়া একদল ইংরাজ সৈন্য প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এই সৈন্যদল সদাসর্ব্বদা আল্‌ফ্রেডের তত্ত্বাবধান করিত এবং তাহারা আল্‌ফ্রেডের নিকট নানা প্রকার সমর কৌশলে শিক্ষিত হইত। এই ঘটনায় আল্‌ফ্রেডের হৃদয় স্থিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দিনে দিনে আহুতি পাইতে লাগিল এবং তিনি দিনে দিনে নূতন জীবন লাভ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক এই সৈন্যদল তাঁহার পক্ষে সঞ্জীবনী শক্তি স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

আলফ্রেডের সঙ্গে যে একটি স্ত্রী লোক থাকিত, তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র। তিনি নানা প্রকার সদগুণে ভূষিতা ছিলেন। তিনিই রাজার পরিচর্য্যা করিতেন। এই পরিচর্য্যায় তাঁহার নিজের কোন দূষিত স্বার্থ ছিল না। এই স্ত্রীলোকটি অবকাশ পাইলেই গোপনে গোপনে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং নিজ অলঙ্কার সকল বিক্রয় করিয়া সৈন্যদের ভরণ পোষণ করিতেন। এই রূপে অতি অল্প-কাল মধ্যেই প্রচণ্ড দল প্রবল সৈন্য আলফ্রেডের হস্তগত হইল। তখন তিনি সাহস নির্ভর করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় উপর্য্যুপরি বিংশতি বার ডেনসদিগের সহিত ভয়ানক সমরে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ হওয়ায়, আল্‌ফ্রেড অবশেষে পরাস্ত হইয়া, পুনরায় ছদ্মবেশে রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হয়েন।

এই বারে তিনি অত্যন্ত অপমানিত হয়েন। শত্রুদল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়, কিন্তু বিপক্ষ দলের কয়েকটি উন্নতচেতা প্রধান লোক গোপনে তাঁহাকে রক্ষা করেন।

ডেন্‌স্‌দিগের সহিত তাঁহার অষ্টম বারের যুদ্ধ কালীন তিনি বিপক্ষ সৈন্য দল কর্ত্তৃক গুরুতর রূপে আক্রান্ত ও আহত হইয়া, বন্দী হয়েন। ডেন্‌স্‌রাজ তাঁহাকে সিমাই নামে একটি বনময় পল্লীস্থ অন্ধকার কারাগারে দুই বৎসরের জন্য কারা বাসের দণ্ড দেন। তথায় আল্‌ফেড ৫ মাস কাল থাকিয়া, গোপনে পলাইয়া আইসেন। কারাগারে তিনি যে অবস্থায় কালাতিপাত করিতেন, তাহা শুনিলে অপরে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। মনুষ্য বিপদে পড়িয়াও কত যে মহত্ব দেখাইতে পারে, রাজা আল্‌ফেডের কারাগারস্থ কীর্ত্তি তাহার উজ্জ্বলতম অক্ষয় দৃষ্টান্ত। আমরা একখানি সত্য ইতিহাস হইতে ইহার কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। কারাগার গৃহটি অতি সঙ্কীর্ণ, সর্ব্বত্রই অন্ধকার ময়। কেবল শিরোদেশে, বায়ু আসিবার জন্য একটী সামান্য গবাক্ষদ্বারের ন্যায় ছিদ্র ছিল। আল্‌ফেড সেই গৃহে বসিয়া দিন রাত্রি যাপন করিতেন। ক্ষণেকের জন্যও বহির্দ্দেশে আসিতে পাইতেন না। একজন খৃষ্টীয় দ্বারবান নিয়মিত সময়ে দিনে দুইবার তাঁহার আহার আনিয়া দিত। সামান্য রুটি ও কয়েক খান অপক্ব মাংস খণ্ড আহারীয় দ্রব্য ছিল। এক খানি মৃত্তিকার পাত্রে ইহা আনা হইত। কিন্তু আল্‌ফেড নিত্য নিত্য মৃণ্ময় পাত্র গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। দ্বার রক্ষক কুপিত হইয়া একদিন লৌহ পাত্রে আহার আনিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। আলফেড একদিন লৌহপাত্র খানি ভগ্ন করিয়া ৪।৫ খণ্ড করিলেন। দুই খণ্ড ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদিত হইল। সেই অগ্নি লইয়া, আপনার ছিন্ন বস্ত্রে যে সলিতা করিয়া ছিলেন, তাহা প্রজ্বলিত করিলেন। তাঁহার আহারের জন্য যে মাংস দেওয়া হইত, তাহাই শুষ্ক করিয়া কেমনে তৈল বাহির করা হইত। এই রূপে তিনি অন্ধকার বাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ছিলেন। কয়েক দিন পরে তাঁহার গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা বলবতী হয়। কিন্তু তথায় লিখিবার কোন উপকরণই পাইলেন না। অবশেষে একখানা মাংসের অস্থি পাইয়া তাহাতেই কলম প্রস্তুত করিলেন। ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডকে কাগজ করিলেন এবং কালী না পাইয়া বাহু হইতে শোণিত বিন্দু বাহির করিয়া তাহাতেই মসীর কার্য্য করিলেন। এইরূপে তিনি বস্ত্র খণ্ডে গ্রন্থ লিখিতেন। যখন তাঁহার বস্ত্র শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি বিপক্ষ রাজার নিকট হইতে দ্বিতীয় বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। নির্দ্দয় রাজা দিতে অসম্মত হইল। কিছু দিন পরে তিনি দেখিলেন, পার্শ্বস্থ গৃহে এইরূপ আর একজন কয়েদি আছে। তিনি সেই লৌহ খণ্ড

দ্বারা সুড়ঙ্গ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার নিকট হইতে যন্ত্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে দুই খানি গ্রন্থ লেখেন। এক খানির নাম "ডেন্‌দিগের অত্যাচার" অপর খানি "অতিথি আল্‌ফ্রেডের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত। এই দুই খানি পুস্তক এখনও ইংলণ্ডে ছাপা হয় রাজা আল্‌ফ্রেড স্বীয় বাহুর রুধিরে ইহা লিখিয়াছিলেন বলিয়া আজিও ইহা লাল কালিতে মুদ্রিত হইয়া থাকে। কাল কালীতে ছাপা হয় না। যাহা হউক, তাঁহারা দুই জনে মিলিয়া সত্বরেই তথা হইতে পলায়ন করেন। একটি বৃহৎ সুড়ঙ্গ দিয়া তাঁহারা পলাইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পথিমধ্যে তাঁহার প্রিয় সখার মৃত্যু হয়।

যাহা হউক তিনি পলায়ণ করিয়া প্রথমে নক্‌স্‌কেন্টে তৎপর সমরসেটে আসিয়া উপনীত হন। তথায় প্রায় ১৬ মাস কাল অতিবাহিত করেন। এক দিন তিনি মধ্যাহ্নকালে তথায় এক স্ত্রীলোকের পর্ণকুটীরে বসিয়া আহ্লাদ করিতেছেন, এমত সময়ে স্বদীয় কতিপয় বান্ধব আসিয়া সংবাদ দিলেন যে "ডেন্‌স্‌ দল দেশ হইতে একেবারে তাড়িত হইয়াছে। রাজ্যের সাধারণ প্রজারা তাহাদের রাজত্বের মূলে একেবারে কুঠারাঘাত করিয়াছে এবং এক্ষণে তাহারা সতৃষ্ণ নয়নে আল্‌ফ্রেডের পুনঃরাজ্যাভিষেকের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" আল্‌ফ্রেড এই শুভবার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া পুলকিত মনে জগদীশ্বরকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং বন্ধুদিগকে সসম্মান অভিবাদন করিলেন। ত্বরায় তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে আসিতে লাগিলেন।

আল্‌ফ্রেড যখন পথে গমন করেন, তখন ডেন্‌স্‌দিগের রাজা গথরমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গথরম তাঁহাকে সসম্মান অভ্যর্থনা করেন এবং স্বকৃত পূর্ব্ব দোষ সমূহ জন্য আল্‌ফ্রেডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একথা কতদূর সত্য বলিতে পারি না। কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ প্রায় সহস্র বর্ষ পরে ইতিহাসে একথার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক গথরম অবিলম্বে খৃষ্টধর্ম্মে দিক্ষীত হন এবং দয়ালু আল্‌ফ্রেড তাঁহার দৈন্য এবং বৃদ্ধাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ইংলণ্ডের কিয়দংশ প্রদান করিয়া তাঁহার স্বচ্ছন্দ ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিলেন।

অতিঅল্প কাল মধ্যই আল্‌ফ্রেডের প্রবল প্রতাপ ও বুদ্ধি বলে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র শান্তিময় হইল। প্রজারা সুখে আপনাদের ধনসম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিল। রাজ্যের এই সুখকরী অবস্থা অবলোকন করিয়া, রাজা আল্‌ফ্রেড বিদ্যোন্নতি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। রাজ্যের সকল বালক যাহাতে রীতিমত লেখা পড়া শিখিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি অনেক পাঠশালা স্থাপন করিলেন এবং পণ্ডিত

সম্মাগমের জন্য "বিদ্বজ্জন-আশ্রম" নামে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই স্থানে নানা দেশীয় বিদ্বান্ পুরুষ ও বিদুষী স্ত্রীলোক নিয়ত বাস করিত। তাঁহাদের ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইত। প্রতি সপ্তাহে পণ্ডিতগণের সভার অধিবেশন হইত। আল্‌ফ্রেড সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি নিজে লাটীন ভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। লাটীন ভাষা হইতে অনেকগুলি পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত অনেক গুলি নীতিগর্ভ পুস্তক রচনা করেন। সাধারণে বিদ্যোন্নতি করিবার জন্য, তিনি অনেকগুলি হিতকরী আইন প্রবর্ত্তিত করিয়া যান।

রাজা আল্‌ফ্রেড সময়কে যথার্থ অমূল্য বিবেচনা করিতেন। সময়ের সদ্ব্যবহার তিনি যেরূপ জানিতেন, পৃথিবীর অতি অল্প লোকেই তাহা জানে। তিনি দিবা রাত্রিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ছিলেন। অধ্যয়ন, উপাসনা, প্রজারঞ্জন আহার, বিহার, নিদ্রা এবং সৎকার্য্যে উৎসাহ—এই সকল কার্য্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। দিবস ও রাত্রির অধিকাংশই লেখা পড়ায় তিনি যাপন করিতেন। এক মুহূর্ত্ত সময় ও তাঁহার নিকট বৃথায় যাপিত হইত না, তিনি নিশা কালে মোমবাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহা জ্বালাইতেন এবং তদ্দ্বারা কার্য্য ও সময়কে বিভাগ করিয়া লইতেন।

আল্‌ফ্রেড্ রাজ্যে বিদ্যালয়াদি স্থাপিত করিয়া, নৌ-বিদ্যায় মনোযোগী হইলেন সেনাদিগকে সমর নীতিতে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। এবং জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য একটি কারখানার সৃষ্টি হইল। তিনি প্রায় ১০০ শত নৌকা নির্ম্মাণ করেন। তিনি জানিতেন, জাহাজ নির্ম্মাণ না করিলে, বিদেশীয় আক্রমন কারীর আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করা সুদূরপরাহত। ইংলণ্ডে, জল যুদ্ধের প্রথা প্রথমে তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন। এবং বৃটনীয় রাজাদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণ ও তাহার তত্ত্বাবধারণার জন্য কারখানার সৃষ্টি করেন। এই সকল জাহাজ বাণিজ্য কার্য্যে ও নিযুক্ত হইত ইটালী, ফ্রান্স, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে জাহাজ সকল গমনা গমন করিয়া পুস্তক এবং অন্যান্য দ্রব্য ইংলণ্ডে আনায়ন করিত। আল্‌ফ্রেডের কয়েক জনবন্ধু অনেক বার ঐ সকল জাহাজ যোগে সমুদ্র যাত্রা করিয়া অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সেই সকল যাত্রা বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত। কথিত আছে আল্‌ফ্রেডের সময়ে এইরূপ ২৩ খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল।

রাজা আল্‌ফ্রেড ২৯ বৎসর বয়সে জ্বর বিকারে দেহত্যাগ করেন। প্রায় তিন মাস কাল জ্বর ভোগ করিয়া, তাঁহার মৃত্যু হয়। এই দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাধির সময় তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং সরল ব্যবহার পাঠ বা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত ও পুলকিত হইতে হয়। তাঁহার এই

সকল গুণের জন্য তাঁহার নাম ইংলণ্ডের অক্ষয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয়রূপে খোদিত আছে এবং জগতে যত দিন বিদ্যা ও সদ্গুণের মোহিনী মূর্ত্তি জীবিত থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার নাম কেহই ভুলিবে না। শুদ্ধ ইংলণ্ডে কেন, সমুদায় জগতের ইতিহাসে তাঁহার অতুল কীর্ত্তিগুলি লীলা করিবার যোগ্য।

স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা আল্‌ফ্রেড্ দয়া ও ন্যায় পরতার অবতার স্বরূপ ছিলেন। ইংলণ্ডের তদানীন্তন অবস্থায় তিনি যেরূপ বিদ্যাবত্তা, সাহস এবং সমরকৌশল দেখাইয়া ছিলেন, তাহা আজিকার সভ্যতম ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেহ সচরাচর দেখাইতে পারে না। বিচার বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। সকলেই তাঁহার বিচারে সন্তুষ্ট ছিল। মৃত্যুর সময়ে, স্বীয় পুত্র এডোয়ার্ডকে তিনি শয্যার পার্শ্বে বসাইয়া, যে সকল নীতিগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কতদূর মহান ভাব সূচক, ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। আমরা কয়েকটী মাত্র উপদেশ এ স্থলে ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

তাঁহার প্রথম উপদেশ এই, দেবতাকেও তাচ্ছিল্য করা যায়, মাতা পিতাকেও অভক্তি করা যায়, কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতি তাচ্ছিল্য কি অভক্তির পাত্র নহে। প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা ও মান্য রক্ষা করিতে হইবে। দ্বিতীয়—সমুদায় গ্রেটবৃটনে অধিক কি পৃথিবীতে একজন ইংরাজও জীবিত থাকিতে যেন ইংরেজ জাতি এবং ইংরেজের দেশ পরাধীন না হয়। স্বাধীন অবস্থায় কষ্ট ভাল তথাচ পরাধীন অবস্থায় সুখ ভাল নহে। তৃতীয়—প্রজারঞ্জন, বিজ্ঞজন সমাগম এবং সদ্ব্যবহার মনুষ্যকে ঈশ্বরের সমতুল্য করিয়া তুলে। চতুর্থ—রাজারা খুব সাবধানে রাজ্য শাসন করিবে এবং শত্রু বশ্যতা স্বীকার করিলেও তাহাকে নিরাপদে রাখিবে না। ইত্যাদি এই সকল উপদেশ মহাত্মা আল্‌ফ্রেডের মুখ হইতে নিসৃত হইলে পর তিনি মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

মুসলমান রাজত্ব।

*ভারতে মুসলমান অধিকার হইতে সুরবংশীয়দিগের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত।

(তৃতীয় সংখ্যা।)

২। দোষ পরিচ্ছেদ।

মুসলমান রাজত্বের গঠন প্রণালী যথা যথ বিবৃত করা গিয়াছে। অতঃপর তাহার দোষাদোষের বিষয় কথঞ্চিত আলোচনা করা যাউক।

অধুনাতন পৃথিবীস্থ সভ্যতম দেশ সমূহের রাজ শাসন প্রণালী পর্য্যালোচন

দ্বারা, রাজ শাসন সম্বন্ধে উৎকর্ষ বা অপকর্ষতা পক্ষে আমাদিগের যেরূপ সংস্কার পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই সংস্কারের অনুগামী হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, মুসলমান রাজশাসনের গঠন প্রণালী যতদূর পর্য্যালোচনা করা গেল, তাহার মধ্যে এই কয়টি দোষ সংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

১। রাজ যথেচ্ছাচার এবং মন্ত্রি সভার অক্ষমতা ও অস্থায়িত্ব।

২। রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্তদিগের সম্ভ্রমের অস্থায়িত্ব।

৩। জায়গির দ্বারা সৈন্য রক্ষা।

৪। সৈন্য গমনাগমন কালীন জেলাদারদিগের দ্বারা সৈন্যবর্গের রসদ সঙ্কুলান।

৫। কর্ম্মচারীদিগের উপর গুপ্তচর রক্ষা।

৬। জায়গীর এবং নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদানের প্রথা।

৭। করের হার বৃদ্ধি করণ, এবং তদুদ্দেশে ভূসম্পত্তির নিত্য নূতন নিরাকরণ।

৮। সরকারী কর ব্যতীত, ভূসম্পত্তির উন্নতি কল্পে রাজে কর আদায়ের জন্য মণ্ডল ও চৌধুরীর উপর ক্ষমতা প্রদান ও হারের অনির্দ্দিষ্টতা।

৯। শান্তিরক্ষণ প্রণালী।

১০। আইন ও আদালতের অসাব্যস্ততা।

১১। রাজ সম্পত্তির স্বামিত্ব।

১। রাজ যথেচ্ছাচার এবং মন্ত্রিসভার অক্ষমতা ও অস্থায়িত্ব।

সামাজিক ঐক্যতা, সমাজের শান্তি, শাসন, সচ্ছন্দতা বা উন্নতি সাধন পক্ষে অতি মহৎ এবং প্রধান কার্য্যকারক। সামাজিক ঐক্যতার সমাজ মধ্যে অস্তিত্ব থাকিলেই যে তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমভাব ধারণ করিয়া সর্ব্বত্রে সমান ফল প্রসব করিবে, তাহা নহে। সমাজ বিশেষে মানব চিত্তের উৎকর্ষ, অপকর্ষতা ও প্রবৃত্তি অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও অবস্থায়, উদ্দিষ্ট লালসিত বিষয়ের প্রকৃতি সহ সমধর্ম্মী হইয়া, এই ঐক্যতা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রতীয়মান হইয়া অনুরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। মানবচিত্তের স্বভাব এই যে, হয় কোন আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের লাভ প্রত্যাশা, নতুবা কোন বিষয়ে দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া তদনুগমন, এতদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে উৎসাহিত হইতে চাহে না। মানব চিত্ত যদি এবম্ভূত কারণ প্রাপ্তে উৎসাহিত হয়; এবং যদি প্রার্থিত বিষয় একেতে আবদ্ধ না হইয়া সকলের সমক্ষে সমফলদাতা রূপে প্রতীয়মান হয়; এবং সে উদ্দেশ্যলাভের পক্ষে যদি আর শত্রু থাকে; তাহা হইলে যখনই কোন সমধর্ম্মী ব্যক্তি সে উৎসাহিতের সন্নিকট হইবে, তখনই পরস্পরের প্রতি সাহানুভূতি বশতঃ, স্ববাঞ্ছিত লাভ প্রতিজ্ঞায়, তাহাদের মধ্যে ঐক্যতার উৎপাদন হইয়া থাকে। যে উদ্দিষ্ট বিষয়ের জন্য এই ঐক্যতা স্থাপিত হয়, তাহাই

ইহার দ্বারা সুসাধিত হওয়া সম্ভব; অপর বিষয় সম্বন্ধে সেরূপ নহে, কারণ অপরাপর বিষয় ঐক্যতার কারণ বহির্ভূত হওয়াতে, মানব তাহাতে অবস্থা শূন্য। এখানে যে ঐক্যতার অবতারণা করা গেল, তাহা রাজশাসন সম্বন্ধে।

ধনসঞ্চয় পূর্ব্বক শান্তিপ্রিয় হইয়া মানবজাতি যখন পাশব বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রমলব্ধ ফলভোগে প্রবৃত্ত হয়, তখনই মনুষ্যকে প্রকৃত পক্ষে সমাজবদ্ধ বলা যায়। এই সামাজিক জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় মানবচিত্ত স্বভাবতঃ তরল, অদূরদর্শী, অসন্দিগ্ধ, অল্পেতেই আয়ত্তাধীনে আইসে। এরূপ সমাজে যাহার ক্ষমতা অধিক সেই প্রভুত্ব করিয়া থাকে; এবং এরূপ প্রভুত্ব স্বভাবতই একেশ্বরত্ব ও অপরিসীম যথেচ্ছাচার যুক্ত হয়। এরূপ অবস্থায় যে ঐক্যতার উপস্থিতি হয়, তাহা কেবল প্রভুর বিরুদ্ধে হইয়া থাকে। সুতরাং সমাজ মধ্যে প্রভুত্ব ও তদ্বিরুদ্ধ একতার ঘাত প্রতিঘাত হওয়াতে সমাজ অতি অজ্ঞ ও নিকৃষ্ট হইলেও, ক্ষমতাশালীর অত্যাচার কোন মতে প্রবল হইতে পায় না। এজন্য অবস্থানুরূপ এক প্রকার স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়া থাকে। কিন্তু বহিঃশত্রু উপস্থিত হইলেই বিপদ। প্রভুত্ব এবং সমাজিক ইচ্ছা উভয়ের বিরোধ হেতু বহিঃশত্রু উপস্থিত হইলেই তাহার করতল গত হয়। দ্বিতীয় সামাজিক অবস্থা,—যখন মানব কালক্রমে পূর্ব্ব অদূরদর্শন এবং অসন্দিগ্ধতা, অজ্ঞান ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি চাপল্য লাভে চিন্তাশীল হইতে থাকে, এবং প্রাকৃতিক ক্ষমতা নিচয় কল্পনার সাহায্যে পর্য্যালোচনা দ্বারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়; তখন রাজক্ষমতাকে বিশ্বব্যাপি ক্ষমতার অংশ স্বরূপ কল্পনা করিয়া, তাহার উৎপত্তি ক্রিয়াকে অলৌকিক কার্য্য জ্ঞান করিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষিত হওন, এ সময়ের সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়িণী একতা বর্দ্ধিত হওয়ার প্রধান কারণ। কিন্তু এ একতার উদ্দেশ্য রাজক্ষমতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন মাত্র। এ সময়ে সমাজ ক্ষমতার আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দৃষ্টে তাহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিযুত হইয়া থাকে। ইহা হইতেই রাজদেবত্বের উৎপত্তি। এ সময়ের রাজআজ্ঞা দেব আজ্ঞা। সমাজ তদ্বারা উত্তেজিত হওয়ায়, বহু শত্রু যথাসাধ্য ও যথাবুদ্ধি নিবারিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তঃশত্রু নিবারণের তত সম্ভব নাই। এ সময়ের রাজা কেহ অকর্ম্মণ্য হইলেও, প্রজার ভক্তিতে সেও কর্ম্মণ্য বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু প্রধানতঃ দেখা যায় যে এ সময়ের রাজারা প্রায়ই ধীশক্তি সম্পন্ন। বোধকরি ইহা ঈশ্বরের নির্ব্বাচন। রাজক্ষমতা যথেচ্ছাচারী হইলেও সামাজিক ভক্তিতে তাহা কোমল হইয়া সমাজের পক্ষে সর্ব্বদা অহিতকর হইতে পায় না। আমাদিগের হিন্দু সাময়িক রাজ শাসন বহুলাংশে এই রূপ দ্বিতীয় অবস্থার। দ্বিতীয় অবস্থার সামাজিক

প্রকৃতি অপেক্ষা যদিও হিন্দু সমাজ কালে অপরাপর বিষয়ক বহুল উন্নতিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু ভারতীয়েরা একে আজীবন শক্তিচিন্তায় রত, তায় পার্থিব বিষয়ে সমূহ আস্থাশূন্য, সুতরাং সামাজিক অপরাপর উন্নতি সত্ত্বেও রাজশাসনের বড় একটা রূপান্তর ঘটিতে পায় নাই।

তৃতীয় অবস্থায় সমাজ পূর্ব্বোপার্জ্জিত বিষয়ে আপনাকে অশানুরূপ বিষয়ী জ্ঞান করিয়া, তাহার ভোগ লালসায় অলসপ্রিয় হইয়া অপরাপর বিষয়ে আস্থা শূন্য হইবায়; তাঁহাদের রাজনৈতিক কর্ত্তা গুণের লোপ হয়, এবং সামাজিক ব্যক্তিমাত্রে আত্ম সমর্থে রত হইয়া সামাজিক স্বচ্ছন্দতা উপেক্ষা পূর্ব্বক, দ্বেষাদ্বেষ ও আত্ম বিবাদে সমবাত্তিবাহিত করিয়া থাকে। যদি কিছু মাত্র ঐক্যতা থাকে, তবে তাহা কেবল অলস প্রিয়তা ও অকর্ম্মণ্যতায়। ফলতঃ এই সময়ে প্রজাপক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধকের অভাবে, রাজা অবারিত যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রজারা যেন অকাতরভাবেই তাহা সহ্য করিয়া থাকে, যখন প্রজারা নিতান্ত উত্যক্ত, এবং রাজ অত্যাচার যখন নিতান্তই অসহ্য হয়, তখনই কেবল ক্ষণেকের জন্য নিদ্রোত্থিতের ন্যায় জাগরিত হইয়া রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া, হয় রাজ অত্যাচারের নির্যাতন নতুবা আপনাদের আরও অধঃপতন সাধন করিয়া, একে তৃপ্তি অপরে নৈরাশ্য, এতদুভয়ের যে কোন বিষ ফল লাভ পূর্ব্বক আর উদ্যম আগ্রহ অনাবশ্যক এই বিবেচনায়, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ঔদাস্য অবলম্বন করিয়া থাকে। এবম্ভূত রাজ্যে প্রজার শুভাশুভ রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বিশেষের স্বভাব ও চরিত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। এরূপ রাজ্যে প্রজা যেমন রাজইচ্ছার অধীনে নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে, রাজাকেও সেই পরিমাণে সর্ব্বদা শশঙ্কচিত্ত থাকিতে হয়। এবং তাহার অত্যাচারের পরিমাণ অনুরূপ ক্ষমতাও ক্ষণ স্থায়িত্ব ভাব অবলম্বন করে; এবং জীবনও সর্ব্বদা কেশাগ্রে দুলিতে থাকে। ফলতঃ রাজা এবং প্রজা উভয়ই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করিলে, উভয়েরই মঙ্গল হইয়া থাকে। প্রজার বল রাজা রাজার বল প্রজা। প্রজাকে যেমন রক্ষার্থে রাজার মুখাপেক্ষা করিতে হয়, রাজাকেও তেমনি আত্মরক্ষার্থে প্রজার মুখাপেক্ষা করিতে হয়। নতুবা বিপরিত ঘটে। যথায় রাজাপ্রজায় এ নিয়মের বিপর্য্যয়, তদ্রূপ রাজ্যে ক্ষমতার বন্ধন শক্তির শিথিলতা অধীনস্থ প্রবল কর্ম্মচারীবর্গের বিদ্রোহ, কুমন্ত্রণা, রক্তপাত, রাজহত্যা প্রভৃতি নানাবিধ ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়া থাকে কে রাজা হয়, কে না হয়, সে বিষয়ে প্রজারা ঔদাস্য যুক্ত; সুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া নানাপ্রকার বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং যখন যে বলবান হইয়া উঠে, সেই রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বইসে, প্রজা রাজ পরিবারের প্রতি

অনুরক্ত হইলে, এবং তাহাদের শুভাশুভে স্নেহযুক্ত থাকিলে, কথনই এরূপ হইতে পারে না। দেশের এরূপ রাজনৈতিক অবস্থা, অপরাপর সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক অবস্থা হইতে নিকৃষ্টতম বলিয়া পরি গণিত করা যায়।

আমরা যে সময়ের রাজনীতি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভারতে সে সময়ে এই তৃতীয় প্রকার রাজনীতি প্রচলিত ছিল, এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে সে সময়ে সাধারণ প্রজাবর্গ কথন বা পশু-পালের ন্যায় রাজ অত্যাচার সহ্য করিতেছে, কথন বা অতি স্বচ্ছন্দতা ও উন্নত শ্রীতে মোহিত হইতেছে। আবার কথন বা ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায়, বিদ্রোহ অগ্নি জ্বালিয়া, রাজা,রাজকর্ম্মচারী যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই অত্যাচারের প্রতিফল দিতেছে। নতুবা ভগ্ন শক্তি ভগ্ন আশা হইয়া ব্যাধ বিতাড়িত পশুর ন্যায় প্রাণরক্ষার্থে বন পর্ব্বত আশ্রয় করিতেছে। রাজার বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে কথন বা অতি নীচ যে সে উচ্চ হইতেছে, আবার অতি উচ্চ যে সেও নীচ হইতেছে। রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া রক্ত পাত নিতান্ত বিরল ছিল না। ফলতঃ মুসলমান দিগের আমলে রাজপুত্র হইয়া যাহারা জন্মিত তাহারা একরূপ অতি দুর্ভাগ্য জীব। বহুজন্মার্জ্জিত পাপের ফল ব্যতিত বোধ হয় সাহজাদা হইয়া জন্মিত না। তাহাদের মধ্যে মার মার কাট কাট করিয়া যে সিংহাসনে উঠিতে পারিল, সেই বাঁচিল, নতুবা অপর সকলে ঈর্শা এবং ভয়ের কারণ স্বরূপ হওয়াতে, অভাবনীয় যন্ত্রণা ভোগ পূর্ব্বক বধকারীর হস্তে নিপতিত হইত। আবহমান কাল হইতে রাজক্ষমার দেবত্বে যে বিশ্বাস ছিল, এবং যে বিশ্বাস হিন্দুরাজত্বে এতদূর দৃঢ়তর হইয়াছিল, মুসলমানদিগের রাজ অত্যাচারে অবশ্যই তাহার বহুল ভাবান্তর ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে।

রাজা সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ভাবিতেন, যে সিংহাসন বিলাস ভবনের দ্বার স্বরূপ মাত্র। অবারিত বিলাস ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়াই সিংহাসন প্রাপ্তির উদ্দেশ্য। এবং প্রজামণ্ডলী তাহার বিলাস বশতঃ আহরণের নিমিত্ত তত সংখ্যক চর স্বরূপ। একরূপ ব্যুৎপত্তির প্রাবল্য হেতু, রাজা যদি ক্ষীণ চেতা হইতেন, তাহা হইলে সিংহাসনে আরোহণ মাত্রেই বিলাস ভোগে মত্ত হইয়া একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেন। এবং পার্শ্বস্থ নীচ ব্যক্তিবর্গ সেই অবসরে ও সুযোগে রাজকার্য্য হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক, নীচ প্রকৃতির রীতি অনুসারে রাজ্য লইয়া যদৃচ্ছা নীচ ক্রিড়ায় প্রবৃত্ত হইত। এবম্ভুত রাজ্য প্রায়ই অসহ্য হইত, সুতরাং রাজাকেও তন্নিমিত্ত অপসারিত হইতে হইত, এতদ্বিবরিনী তালিকা গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে কুতুবুদ্দিনের সিংহাসনারোহণ হইতে সুররংশীর রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্ব সুদ্ধ যে ২৪ জন বাদসাহ হয়েন, তাহার মধ্যে ১০ জনের অপমৃত্যু, ৬ জনের রাজ্যচ্যুতি, এবং কেবল ৮ জনের মাত্র স্বাভা-

বিক ভাবে মৃত্যু হয়। যাহা হউক, রাজা দৃঢ় চেতা হইলে, বিলাসে যদিও মত্ত সমানই হইতেন, কিন্তু নীচ প্রকৃতির লোকেব প্রাতুর্ভাব হইতে না পাবায; প্রজা সাধাবণ ধবিতে গেলে, তাহাবা অনেক পবিমাণে সুখে থাকিতে পাইত। এরূপ বাজাব অশিক্ষিত মানবীয স্বভাব হেতু যে কিছু মানসিক অস্থিবতা, যথেচ্ছা চাবিত্ব কুকার্য্যেব উদ্ভাবন প্রভৃতি হইত, তাহা পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গেব উপবেই প্রায় নিঃশেষিত হইত, তদতিরিক্তে কদাচ যাইত। প্রকৃতিদেবী তাহাব অত্যাচার বিমুখতা গুণের জন্যই হউক, বা সন্তানের দুঃখের লাঘব কবিবার জন্যেই হউক, অথবা যে কোন কাবণেই হউক, ভারত সিংহাসনে ক্ষীণ চেতা বাদসাহদিগকে অধিক দিন বসিতে দেন নাই। কাল পরিমাণ ধরিতে গেলে, দৃঢ়চেতা রাজাদেব বাজত্বই অধিক। প্রত্যেক রাজত্বের দোষভাগ ও গুণভাগ উভয় বিবেচনা পূর্ব্বক গড় পড়তা ধবিলে, উক্ত ২৪ জন বাদসাহেব বাজত্ব নিম্ন লিখিত মত ভাল মন্দ বা মধ্যমে পবিগণিত করা যায়।

বাদসাহদিগেব নাম।	উত্তম-বাজত্বেব বৎসর সংখ্যা।	মধ্যম বাজত্বেব বৎসব সংখ্যা।	অধম-বাজত্বেব বৎসব সংখ্যা।
কুতুবুদ্দিন	৫—০	০—০	০—০
আবম	০—০	০—০	০—১১ মাস
সমসুদ্দিন উলতমিজ	২৫—০	০—০	০—০
রুকনুদ্দিন	০—০	০—০	০—৭
সুলতানা বিজিযা	০—০	৩—৬	০—০
মইজুদ্দিন বেহবাম	০—০	০—০	২—২
আলাউদ্দিন মাসুদ	০—০	০—০	২—০
নশিরুদ্দিন	২০—০	০—০	০—০
গয়েস উদ্দিন বুলবন	০—০	২০—০	০—০
মইজুদ্দিন কৈকোবাদ	০—০	০—০	২—৬
জলাল উদ্দিন	৭—০	০—০	০—০
আলা উদ্দিন	০—০	২১—০	০—০
মোবাবক	০—০	০—০	৫—৩
খরু সাহ	০—০	০—০	০—৫
গয়েসউদ্দিন তোঘলুক	৪—০	০—০	০—০
মহাম্মদ সাহ	০—০	০—০	২৬—৩
ফিরোজ সাহ	৩৭—০	০—০	০—০
গয়েসুদ্দিন	০—০	০—০	০—৫

বাদসাহদিগের নাম।	উত্তম-রাজত্বের বৎসর সংখ্যা।	মধ্যম-রাজত্বের বৎসর সংখ্যা।	অধম-রাজত্বের বৎসর সংখ্যা।
আবুবেকর	০—০	১—০	০—০
নাশরুদ্দিন	০—০	৪—০	০—০
মহম্মদ	০—০	২০—০	০—০
সইদ বংশের রাজত্ব	০—০	৩৬—০	০—০
বিলোলি লোদি	৩৮—০	০—০	০—০
শিকন্দর লোদি	২৮—০	০—০	০—০
ইব্রাহিম লোদি	০—০	০—০	১০—০
	১৮৭—০	১০৫—৬	৫০—৬

এক্ষণে দৃষ্ট হইবে যে শ্রেষ্ঠ রাজত্বের ভাগই অত্যন্ত অধিক, নিকৃষ্ট রাজত্বের প্রাদুর্ভাব কাল অতি সামান্য।

রাজনৈতিক বিষয়ে প্রজার যখন ঔদাস্য এবং রাজ পরিবারের প্রতি যখন প্রজার পক্ষ হইতে অনুরাগের অভাব; তখন রাজা ও রাজপরিবারের স্বার্থ স্থূল দৃষ্টে ক্ষমতার অবিরোধ ভাবে দৃঢ় পরিচালনাই একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। এমন স্থলে যে রাজা কোন নীতি বা মন্ত্রি সভায় আবদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনার ক্ষমতার প্রতিবন্ধক জন্মাইবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এরূপ ক্ষমতার পরিচালকেরা দেখিতে পাউক আর নাই পাউক, শেষ প্রায়ই প্রতারিত হইয়া থাকে। এরূপ সারশূন্য বিষময় উপায়ের পরিবর্ত্তে রাজা যদি আত্ম ক্ষমতা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া তাহা প্রজার হস্তে প্রদান, এবং তাহাদের অনুরাগ ভাজন হইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে রাজা প্রজা উভয়েই সেই পরিমাণে নিঃশঙ্ক চিত্ত এবং তদুৎপন্ন সুখে উভয়েই সুখী হইতে পারিতেন। সত্য বটে যে সে সময়ে প্রজারা রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাস্য যুক্ত, কিন্তু তাহাদের সে ঔদাস্য ভঙ্গকরা কঠিন ব্যাপার নহে। তাহারা মনুষ্য প্রকৃতির বহির্ভূত নহে। সত্য বটে যে ঔদাস্য ভাঙ্গিলেও অভ্যাস বশতঃ তাহাদিগের রাজনীতি বিষয়ে পরিচালনায় আপাততঃ সম্যক পারগ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাহারা যত দূর পারগ হয়, সেই পরিমাণে তাহাদের উপর ভার ন্যস্ত, ও তাহাদের প্রতি বিশ্বাস করিলে, মানব প্রকৃতির স্বভাব অনুসারে তাহারা অবশ্যই সে বিশ্বাসের প্রতিদান করিত। কালে পরিচয় ও দূরদর্শনের ফল স্বরূপ আরও মঙ্গল ফলিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মহম্মদ শিয়োরা সে কথা বড় বুঝিতেন না। জ্ঞান সঙ্কীর্ণতা বশতঃ আশু চটকেই মোহিত হওয়া তাঁহাদের স্বভাব। এখন শয়তানের বাজি বশতঃ আশু চটক অসৎ পথেই অধিক। সুতরাং উদ্দেশ্যে

দোষ না থাকিলেও তাঁহারা যে অসদুপায় অবলম্বন করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি!

মানব মাত্রেই ভ্রম সঙ্কুল। সর্ব্বদা সুবিবেচনা পূর্ব্বক অপ্রতিহত ভাবে সর্ব্বদা সুকার্য্য করিব, ইহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। অভিপ্রায় সৎ হইলেও অতি নিরীহ এবং সুচেতার দ্বারাও বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে কখন কখন এমন গর্হিত কার্য্য ঘটিয়া থাকে, যে দুর্ব্বিনিতের নিকটেও অনেক সময়ে সেরূপ কার্য্য প্রত্যাশা করা যায় না। এমন স্থলে যে সকল কার্য্যে জাতি সাধারণের সংস্রব, তাহা কেবল একব্যক্তি দ্বারাই উদ্ভূত ও সম্পাদিত হওয়া কতদূর গর্হিত এবং তাহাতে সর্ব্বদা কতই বিষম ফল ফলিবার সম্ভব। সত্য বটে এরূপ কার্য্য মূলের স্বভাব অনুসারে, আবার সুফলও কখন কখন আশাতীত হইয়া ফলিয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ কার্য্যের ফল যাহাদের উপর বর্ত্তে, তাহারা কি ঘোর তুফানময়ী সাগর তরঙ্গে একবার উঠিতে এক বার পড়িতে থাকে। কখন নরকে পড়িতেছে, কখন স্বর্গে উঠিতেছে, যদিও ভাগ্য গুণে স্বর্গে উঠার ভাগ অতি অল্প। এরূপ অবস্থার নিরাকরণ, কার্য্য মূলের সংশোধন ব্যতিত হয় না। তাহা করিতে গেলে বহুজনের সহিত মন্ত্রণার আবশ্যক। আপন ভ্রম লোকে আপনি অতি কম দেখিতে পায়, কিন্তু অন্যে দেখিতে পাইয়া থাকে। এজন্য বহুজনের সহিত পূর্ব্বাহ্নে মন্ত্রণার ফল এই যে মন্ত্রক বর্গের পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ভ্রম প্রদর্শিত হইয়া কোন কর্ত্তব্য বিষয়ের অবধারণা হইলে, তাহা বহুলাংশে ভ্রম বিশুদ্ধ, সুতরাং সাধারণের পক্ষে সেই পরিমাণে মঙ্গলকর হইয়া থাকে কিন্তু মুসলমান রাজারা সে পথে যাইতেন না। মন্ত্রী ও রাজসভাসদগণ রাজার শক্তি অনুসারে কখন সর্ব্বে সর্ব্বা, কখন যেন কেহই নহে, এরূপ ভাবে থাকিত। দৃঢ়চেতা রাজার আমলে ইহারা কিরূপ ভাবে ভগ্নদণ্ড হইয়া থাকিত, আলা উদ্দিনের সদস্যদের কথা মনে করিলেই যথেষ্ট হইবে। আলা উদ্দিন পূর্ব্বে লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না। সিংহাসনে আরোহণের পর যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতাপ ও দাম্ভিকতা এরূপ ছিল যে, তাঁহার মন্ত্রী বা যে কেহই হউক তাঁহার সঙ্কীর্ণ বুৎপত্তির অতীত, কি রাজকীয় কি গার্হস্থ্য, কোন কথাই কাহারও তাঁহার সমক্ষে বলিবার সাধ্য ছিলনা। ক্ষীণচেতা রাজার মন্ত্রিত্বের নিদর্শন দেখাইতে গেলে 'মোবারক খিলিজির রাজমন্ত্রিত্বের উল্লেখ মাত্র করিলেই যথেষ্ট হইবে।

২। রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্তদিগের সম্ভ্রমের অস্থায়িত্ব।

রাজক্ষমতার ভঙ্গুরতা ও রাজ্যের উত্তরাধিকারের অনিশ্চয়তা পক্ষে ইহা

দ্বিতীয় কারণ স্বরূপ। বস্তুতঃ ধরিতে গেলে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত বর্গই সাধারণ প্রজা-বর্গ ও রাজার মধ্যে সংযোগ রজ্জু স্বরূপ, কারণ এই শ্রেণীর লোকদিগকে পদ ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সাধারণ প্রজা এবং রাজা উভয়েরই উপর সম অংশে নির্ভর করিতে হয়। এ নিমিত্ত ইহারা উভয় দিক যাহাতে রক্ষা হইয়া, আত্ম স্বার্থের হানি হইতে না পায়, তৎপক্ষে যত্নবান; এবং মধ্য স্থলে থাকিয়া হীন ভাগে বল প্রদান পূর্ব্বক, উভয় পক্ষেই কোন রূপ অত্যাচারের আধিক্য হওয়ায় কোন পক্ষে কোন হানী না হয়, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা এবং কার্য্য। সুতরাং এই শ্রেণীর দৃঢ়তা অনুসারে, প্রজার অত্যাচারের ভয় হইতে, পরিমাণ অনুরূপ, রাজা বহু-লাংশে নিরাপদ থাকিতে পারেন; আবার প্রজাও সেই পরিমাণে রাজ অত্যাচার হইতে নিরাপদ হইয়া থাকে। কিন্তু সম্ভ্রা-ন্তেরা মধ্যস্থলে থাকিয়া যে উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য সাধন রূপ গুরুতর কার্য্য সং-সাধন করে ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র প্রবলতম কারণ আত্ম স্বার্থ। এই স্বার্থ তাহাদের যতই প্রবল হইবে, এই গুরুতর কার্য্যে ততই তাহাদের নিবিষ্ট হইবার কথা। যেহেতু এই কার্য্য ও তাহাদের স্বার্থ সর্ব্বদা সংলগ্ন ভাবাপন্ন। তাহাদের এই স্বার্থ প্রধানতঃ আপন পদ ও মর্য্যাদার স্থায়িত্ব। যথায় স্বজীবন কালের জন্য উহার স্থায়িত্ব স্থাপিত, এবং যথায় তাহা উত্তরাধিকারেও প্রদানের সম্ভাবনা, সেখানে তৎপ্রতি লোকের কত অনুরাগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু যথায় উত্তরাধিকার দূরে থাকুক, দোষে হউক, আর বিনা দোষেই হউক, কোন রূপে আপন জীবন কালের জন্যও পদ ও মর্য্যাদার স্থায়িত্ব নাই, তথায় তাহারা কি স্বার্থে পূর্ব্বোক্ত রূপ গুরুতর কার্য্য সংসাধন করিবে। ইহারা জানে যে এই পদ ও সম্ভ্রম নিতান্ত ক্ষণ স্থায়ী, অতএব যতক্ষণ দাঁও, ততক্ষণ লুট পাট, যে কোন তদ্রূপ উপায়ে উদর পূর্ত্তি করিতে পারা যায়, তাহাই ভাল। ইহাতে রাজারই সর্ব্বনাশ হউক, আর প্রজারই হউক, তাহাতে তাহাদের বড় ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সুতরাং যাহাদের রাজা ও প্রজা উভয়ের মধ্যে বন্ধন রজ্জু স্বরূপ হওয়া উচিত, পাকত তাহারাই এমন রাজ্যে উভয় পক্ষেরই প্রধান শত্রু বিশেষ। রাজা সর্ব্বদা ইহাদের প্রতি সন্দিগ্ধ মনা থাকেন; এবং কাহারও একটু ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি দেখিলেই সশঙ্ক চিত্ত হইয়া, কিসে তাহার সর্ব্বনাশ করি-বেন, সেই চেষ্টায় তাঁহার নিদ্রা হয় না। এদিকে সম্ভ্রান্তেরাও ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া তাহার পরিশোধ লইতে ত্রুটি করেনা। ইহাদের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম সকল বিষ-য়েরই অস্থায়িত্ব হেতু, স্বভাবতঃ অসম-সাহসিক হইয়া, রাজার প্রাণ নাশ পূর্ব্বক রাজ পদ পর্য্যন্ত লাভে লোলুপ হইয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মুসল-মানদিগের রাজত্বে সম্ভ্রান্ত বর্গের অত্যা-চার, বিদ্রোহ, রাজপদাধিকার, অথবা

বাহ্য কোপে ধ্বংসপ্রাপ্ততা, কোনটিই একটিও বিরল নহে।

মুসলমান রাজাদিগের আমলে নিতান্ত ঘটনাবল না হইলে পদ কি মর্য্যাদা এক বংশে পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিতে পারে নাই। যখন যাহার প্রতি ইচ্ছা হইত, এবং ইচ্ছার যতদূর ভাগী ব্যক্তি অতি অন্ত্যজই হউক আর যেমনই হউক, তাহারই উপর পদ বা মর্য্যাদা অর্পিত হইত। কিন্তু যে তরঙ্গের ঢেউ অতি উচ্চ তাহার পতনও তেমনি ভয়ঙ্কর। রাজা যেমন এক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এমনই এক মর্য্যাদা রাশি রাশি প্রদান করিতেন, আবার পরক্ষণেই আর এক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাকে এমনি মর্য্যাদাচ্যুত ও অপমানিত করিতেন যে পথের কুকুরের অবস্থাও তাহাদের অপেক্ষা প্রার্থনীয়। ইহার আপাততঃ দৃশ্য ফল এই যে এরূপ ব্যক্তির উত্থানে যাহারা প্রকৃত সম্ভ্রান্ত, তাহারাও অপমানিত হয় ও শত্রু শ্রেণিতে আসিতই। পরন্তু প্রাপ্ত সম্মান অন্তরের আবার অবনতিতে। যে ব্যক্তির সম্মান মাত্র শত্রু হওয়ার কখনও সম্ভব ছিল, সেও এখন অবিরত ভাবে এবং প্রবল শত্রু মধ্যে গণিত হইল। ব্যক্তি বিশেষের গুণের প্রতি লক্ষ্য কম হইল। এ নিমিত্ত যাহারা যথার্থ পুরস্কারের যোগ্য তাহারা হয়ত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত, এবং যে নির্গুণ সে হয়ত ক্ষণ সৌভাগ্যে তাহাদের উপর উত্থান করিয়া, বাড়ার ভাগ তাহাদিগকে সর্ব্বদা জ্বালাতন করিত ইহার আপাততঃ ফল, সর্ব্বত্রে শঙ্কার বিরাজ, দূরফল যে পক্ষেই হউক, রক্তারক্তি।

রাজা এবং সম্ভ্রান্তবর্গের মধ্যে উপরোক্ত কারণ হেতু, যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তন্নিমিত্ত পাঠকবর্গকে রুকনুদ্দীন, মইজাদ্দিন, বেহরাম, কৈকোবাদ, প্রভৃতির সম্ভ্রান্তবর্গের প্রতি ব্যবহার সমালোচনা করিতে অনুরোধ করি। বেগম রিজিয়া এমন অতি অকর্ম্মণ্য ও নীচ জাতীয় হাবসীয় দাসকে সংপ্রতি আশক্তি বশত তাহাকে আমির উল ওমরা পদে উন্নত করিলে, অসন্তুষ্ট সম্ভ্রান্ত বর্গ কর্তৃক তাহার সিংহাসনচ্যুতি ও হত্যা; আদি ইতিহাস ঘটনাবলি, পূর্ব্বকথিত অবস্থার অবশ্যম্ভাবি ফল স্বরূপ। রাজত্বের [illegible] ক্ষণস্থায়িত্ব এতই লোকের শঙ্কাজনক ছিল, যে সেই কারণ হেতু ইবন বতুতা ধর্ম্মাধিকারের আসন গ্রহণের জন্য আলাউদ্দিন কর্তৃক ব্যবস্থার অনুরুদ্ধ হইলেও, তাহা গ্রহণ করিতে সাহসী হয়েন নাই। শেষে নিতান্ত না ছাড়াইতে পারিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম সুযোগেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে নিরাপদ বিবেচনা করেন।

৩। জায়গীর দ্বারা সৈন্যরক্ষা।

ইহা রাজপদের অস্থায়িত্বের তৃতীয় কারণ স্বরূপ। মুসলমান দিগের উৎপত্তি ও দিগ্বিজয়ের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা যে সময়ের সমা-

লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে কালের মধ্যে প্রায় কখনই মুসলমানেরা নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন দান পূর্ব্বক সৈন্যরক্ষা করিতেন না। যাঁহারা স্থাপিত মূল রাজ্যে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা ব্যয় সঙ্কুলান উপযোগী ভূসম্পত্তি দান দ্বারা সর্ব্বদা আবশ্যক অনুযায়ী সৈন্য রক্ষা করিতেন। আর যাঁহারা দিগ্বিজয়ের প্রসঙ্গেই উন্মত্ত থাকিয়া তদনুসরণ করিতেন, তাহাদিগকে কি ভূসম্পত্তি কি ধাতুমুদ্রা কোন প্রকার বস্তুই বেতন স্বরূপে সৈনিকবর্গকে প্রদান করিতে হইত না। লুটপাট দ্বারা উদরপূর্ত্তি এবং ধন সংগ্রহের প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া, অসংখ্য সৈন্য দিগ্বিজয়ীর অনুসরণ করিত। যে কোন অধিপতি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবে, তাহার সংবাদ প্রচার হইলেই, অসংখ্য সৈনিক পুরুষ নানাদিক হইতে আসিয়া তাহার সহায়তা করিত। দিগ্বিজয়ী সাধারণের প্রতি ইহাদের যে অত্যাচার, তৎপ্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেই, অনায়াসে এবং বিনা অর্থ ব্যয়ে জয়লাভ করিতে পারিতেন, চঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতির সৈন্যের অবস্থা এতদ্রূপ। ভারতীয় মুসলমানদিগের সৈন্য রক্ষা ভূসম্পত্তি দ্বারা জায়গীর দানে সম্পন্ন হইত।

পূর্ব্বেই একস্থানে বলা হইয়াছে যে এক এক জন অধিনায়ক যত সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইতেন, তাহাদের সকলের ব্যয় যাহাতে নির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ লাভবান এক একটি জায়গীর প্রত্যেক অধিনায়ককে প্রদত্ত হইত। কিন্তু ফলে এই দাঁড়াইত যে অধিনায়ক নিজেই জায়গীরের উপস্বত্ব ভোগ করিতেন, এবং এই ভোগের পরিবর্ত্তে সৈনিকবর্গকে সুযোগ পাইলেই যদৃচ্ছা লুটপাট দ্বারা উদর পূর্ত্তি বিষয়ে সাহায্য করিতেন। শক্তি এবং সাহস মাত্র সম্বল সৈনিকগণ নির্দ্দিষ্ট বেতন গ্রহণ অপেক্ষা যে লুটপাট অধিক ভাল বাসিবে, ইহাই সম্ভব; এবং কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়া থাকে, যেহেতু ইহা অধিক লাভের পক্ষে তাহাদের একমাত্র উপায়। আবার যাহার অনুগ্রহে তাহারা এরূপ উদর পূর্ত্তি করিতে পায়, তাহার প্রতি যে তাহারা অধিক অনুরক্ত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? অতএব ধন ও বল, উভয়েতেই অধিনায়ক প্রকারান্তরে বলি হইয়া পড়ে, এবং নিঃসহায় বেতনভোগী চাকরের যে ভয় সে ভয়কে অতিক্রম করিয়া উঠে। এমতে সৈন্যগণ বাদসাহি হইয়াও বাদসাহের নহে। যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রলোভনে হউক, বা বন্ধুত্ব সূত্রে হউক, অধিক সংখ্যক সেনানায়ককে আপনার বশে আনিতে পারে, রাজ্য মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক ক্ষমবান বলিয়া গৃহীত হয়। এবং যে এবম্ভূত ক্ষমবান হয়, তদাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহার দৃষ্টি হয় রাজ সিংহাসনের প্রতি, নতুবা আত্মস্বাধীনতা পক্ষে হইয়া থাকে।

এরূপ প্রথার দোষ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ

রাজাকে সৈন্যবলের উপর পূর্ণভাবে ক্ষমতা না থাকায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়; এবং রাজ্যমধ্যে যে কোন ব্যক্তি সম্পন্ন অবস্থায় উঠে, তাহারই প্রতি অবিশ্বাসের উৎপত্তি ও তাহার নির্য্যাতনে প্রবৃত্তি হয়। এবং শেষে এই অবিশ্বাস মূল, বা বলাধিক্য বশতঃ, চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; এবং রাজাকে প্রায় আজীবন এই বিদ্রোহ নিবারণের অশান্ত চিত্ত এবং প্রাণের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক ভাবে ক্রূরাচরণ পূর্ব্বক কাল যাপন করিতে হয়। মুসলমান রাজত্বের এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। আমরা যে সময়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই সময়ের ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাই, বিদ্রোহ, রাজ্যচ্যুতি, হত্যা, সৈনিক অত্যাচার এবং নিকৃষ্ট বিলাসের তত্ত্বে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ রাজা সময়ে সময়ে এমন ক্ষমতা শূন্য হইয়া পড়িতেন, যে আপন মন্ত্রিকে পর্য্যন্ত পরপক্ষীয় বলে ভীত হইয়া পদচ্যুত করিতে পারিতেন না। বাদসাহ নাসির উদ্দিন তাঁহার অত্যাচারী ও দাম্ভিক মন্ত্রি গয়েসুদ্দিন বুলবনকে এক সময়ে পদচ্যুত করিলে, ঐ মন্ত্রি কতক গুলি সেনাধিনায়ককে হস্তগত করিয়া এরূপ আত্ম দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিল, যে শেষে বাদসাহ বাধ্য হইয়া গয়েসুদ্দিনকে পুনর্ব্বার মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করিয়া নিষ্কৃতি বোধ করেন। জালালউদ্দিন খিলীজী কর্ত্তৃক কৈকোবাদের হত্যা ও সিংহাসন অধিকার, খসরু কর্ত্তৃক মোবারক খিলিজির হত্যা ও রাজ্য গ্রহণ, খসরুর আবার গাজি খাঁ কর্ত্তৃক নির্য্যাতন, তৎপরে সৈয়দবর্গের রাজত্ব ইত্যাদি, ইত্যাদি, এই সকলের উদাহরণ স্থল।

দ্বিতীয় দোষ এই যে সৈনিকবর্গ উপযুক্ত মত রাজার বশে না থাকায়; এবং সেনাধিনায়ক ও কখন কখন বা রাজার দ্বারাতেও উৎসাহিত হওয়ায়, তাহাদের অত্যাচারের পক্ষে প্রতিবন্ধকের অভাবে যখন যেখান দিয়া তাহারা চলাচল করিত, সাধারণ প্রজা বর্গকে ধন প্রাণ লইয়া সসব্যস্ত হইতে হইত। সেনাধিনায়ক নিতান্ত সৎ ও অত্যাচারের আধিক্যে বিমুখ হইলেই, এ অত্যাচারের কিছু সমতা থাকিত, নতুবা তাহার আর পরিসীমা থাকিত না। মুসলমানদিগের রাজত্ব যখন বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনই কেবল দেশমধ্যে, বিশেষ ঘটনা ভিন্ন, এ অত্যাচার সহ্য করিতে হইত না। কারণ তখন সৈন্যবর্গ প্রায়ই সীমান্ত প্রদেশে এবং রাজধানীতে মাত্র রক্ষিত হইত।

সৈন্যগণ এবং সেনাধিনায়কেরা যদি এরূপ প্রথায় রক্ষিত না হইয়া, নির্দ্দিষ্ট বেতন ভোগী করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে এরূপ হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে রাজত্বের অপরাপর বিভাগ সহ সৈনিক বিভাগও, পরস্পর পরস্পরের অধীনত্বে থাকায় কেহই কখন প্রবল হইতে পায় না। সৈনিক বর্গকে অত্যাচারী করিতে সেনাধিনায়কের আর কোন

স্বার্থ না থাকায়, প্রজাবর্গ শান্তিলাভ করে, এবং অধিনায়কের প্রতি অযথা সেনানুরক্তির অভাবে, অধিনায়কেরা পূর্ব্বোক্ত অযথা বলে শূন্য হইয়া কায়মনে বেতন দাতার বশবর্ত্তী থাকে। মুসলমান রাজত্বের মধ্যে সেরসাহ প্রথমে বেতন দান দ্বারা সৈন্য রক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এজন্য তিনি যতদূর নির্ভয়, ও তাঁহার রাজ্য যতদূর শান্তিস্থল হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে আর কোন মুসলমান রাজার ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।

৪। সৈন্য গমনাগমন কালিন জেলদার দিগের দ্বারা সৈন্য বর্গের রসদ সংকুলান।

ইংরেজ সৈন্য মধ্যে কমিসেরিয়েট বিভাগ যেরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, মুসলমানদিগের আমলে জেলাদারের উপর সেই কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইত। সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে রসদ দানের কোন প্রকার পাকা বন্দোবস্ত রাখা হইত না। ইহারা গমনাগমনে যখন যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইত, তখনই স্থানীয় জেলদারের উপর রসদের জন্য নির্ভর করিতে হইত। এ রীতি অতিশয় দোষাবহ। ব্যয় সম্বন্ধে রাজ সরকারের কোন ত্রুটি ছিলনা। কর সংগ্রহ কালীন, রসদ ও মদত দেওয়ার ব্যয় সংকুলনার্থে যথেষ্ট উপায় জেলাদারের হাতে রাখিয়া, তবে কর সংগ্রহ হইত। এবং সময়ে সময়ে যখন জেলাদারের ব্যয় অধিক হইয়া পড়িত, তখন কারণ দর্শাইয়া আরজি করিলে, তাহাও পাইতে পারিত। কিন্তু এরূপ প্রথার গুণ এমনি, যে সরকারের পক্ষে ব্যয় সম্বন্ধে যতই স্বচ্ছলতা হউক ব্যয় করিবার দোষে কার্য্যতঃ তাহা সাধারণ প্রজার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠিত। কোন অর্থ, যে কোন বিষয়ের ব্যয়ের জন্যই হউক, যদি বিনা হিসাবে একজনের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যদি ঋষি হয় তবেই স্বতন্ত্র কথা, নতুবা তাহার ব্যয় পক্ষে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। জেলদারের হস্তে বেহিসাবি অর্থ ন্যস্ত হওয়ায়, সে তাহা নিজের জন্য ন্যায্য সম্পত্তির মধ্যে গণনা করিত। এবং যখন যে কোন অংশে ব্যয় করিতে হইত, তখনই যেন নিজের অর্থ ব্যয় করিতেছে এরূপ বোধে মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত। তখন চেষ্টা হইত যে কিরূপে এই ব্যয়ের সমস্ত না হৌক, কিঞ্চিৎমাত্র হইতেও পরিত্রাণ পাইব ফলে এই দাঁড়াইত। প্রজাবর্গ একেত বাদসাহি নামে সশঙ্কিত, তাহাতে আবার যখন বাদসাহি সৈন্য আসিতেছে, তখন ভয়ে যে একেবারে ভীত হইবে, তাহা সম্ভব। জেলাদারেরা অজ্ঞপ্রজার এরূপ ভয়ে আরও বাতাস দিয়া, নানাছলে তাহাদের ধন হরণ পূর্ব্বক আপনাদের ব্যয় ভার লাঘব করিত। ইহাতে প্রজার যত সুখ তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। ইহা কেবল এই প্রথার

দোষে। নতুবা বসদের জন্য সরকার হইতে যে ব্যয় বাদ দেওয়া হইত, অথবা আবশ্যক মতে যদি তজ্জন্য করের ভার বৃদ্ধিই হইত, তথাপি তথাবিধ ব্যয়ের জন্য এরূপ বেবন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইলে, প্রজারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাইত, এবং করের ভার অধিক হইলেও তাহা সানন্দমনে প্রদান করিত। বাদ-সাহের স্থানীয় কর্ম্মচারী ও গুপ্তচরেরা ভাল হইলে অবশ্যই এ অত্যাচারের কিছু লাঘব হইত বটে, কিন্তু জেলাদারের ক্ষমতা যখন বিপুল, তখন সামান্য-প্রাণ অজ্ঞ প্রজারা যে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা প্রচার করিবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।

৫। কর্ম্মচারীদিগের উপর গুপ্তচর রক্ষা।

গুপ্তচর রক্ষার উদ্দেশ্য যে সাধারণ কর্ম্মচারীবর্গ আপন আপন কার্য্যে কোন রূপ অত্যাচার করিতে না পায়; এবং যদি করে তবে তৎক্ষণাৎ গুপ্তানুসন্ধানের দ্বারা গুপ্তচরের কর্ণগোচর হওয়ায়, সেই অত্যাচারের নিবারণ হয়। উদ্দেশ্য অতি প্রসংশনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এরূপ উপায় অবলম্বন সকল প্রকারেই দোষা-বহ। ইহাতে কার্য্য সুসাধিত না হইয়া বরং সময়ে সময়ে তাহার বিপরিত ফল ফলিয়া থাকে। মানব স্বভাব সর্ব্বদাই ইহার প্রতিকূল। মানব চিত্তের স্বভাব পরি-দর্শন পূর্ব্বক বিচারসঙ্গত দেখিতে গেলে এই দ্বিবিধ দোষ সর্ব্বাগ্রে নয়ন পথে উপস্থিত হয়।

প্রথমতঃ। মানব চিত্ত নিরন্তর প্রতি-বন্ধকের দ্বারা বিচালিত, বা কুটতর শাসনে শাসিত হইতে ভাল বাসে না। তাহা যত গুরুতর এবং অসহনীয় হয়, ততই প্রাকৃতিক বৈপরিত্য ঘটিবার, কার্য্য বৈপরিত্য ঘটিয়া থাকে। মানবকে যত প্রকৃতি দত্ত স্বাধীনতা দ্বারা কার্য্য করিতে দেওয়া যায়, তাহারা ততই কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। এবং তাহার কার্য্য যাহাতে সুশাসে হইতে পারে, তজ্জন্য কুটশাসনই যে এক মাত্র উপায়, এ ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া, উত্তম জ্ঞান শিক্ষা দাও, সেই শিক্ষাই সংপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পরি-রক্ষকের কার্য্য করিবে। মানবীয় শাসনের যে ইহাতে অনাবশ্যকতা সূচিত হইল, তাহা নহে। ভ্রান্তি সঙ্কুল এবং চপল-চিত্ত মানব যখন কোন ভ্রম প্রমাদে পতিত হয়, তাহার নিবারকণ; এবং যদি কখন নীতি বিপর্য্যয় ঘটে, তাহার প্রতিবিধান, ইহারই জন্য মানবীয় শাস-নের আবশ্যক। এই শাসন তদধীন ব্যক্তিবর্গের চিত্তসহ জ্ঞানাধিকারের পরি-মান অনুরূপ কঠিন বা কোমলতর হওয়া উচিত। গোপনীয় শাসন ও প্রকাশ্য শাসনের প্রভেদ এই। গোপনীয় শাস-নের উদ্দেশ্য যাহাই হউক কিন্তু উহার প্রকৃতি এরূপ ব্যক্ত করিয়া থাকে, যেন

আমি তোমায় কিছুমাত্র বিশ্বাস করিনা, এজন্য তোমার কার্য্য গোপনে পরিদর্শন করিয়া থাকি। অপরটি এরূপ ভাব ব্যক্ত করে, যেন তোমার প্রতি আমার এমন কোন অবিশ্বাস নাই, কেবল ত্রুটি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তোমাকে সাবধান ও শিক্ষা-দান বা তাহার প্রতিবিধান, এতদর্থে তোমার কার্য্য কলাপ দেখিয়া থাকি। সুতরাং একটি অবিশ্বাস, অপরটি বিশ্বাস মূল উচ্চতম বিজ্ঞ স্থানীয়, শাসন ব্যাপক মনুষ্য বিনা কারণে কাহারও নিকট অবিশ্বস্ত ভাবে কাল কাটিতে ভাল বাসে না। তাহাতে মনে ক্ষোভের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন আবার সে ক্ষোভের বৃদ্ধিতে মানসিক অশান্তির প্রাবল্য হইয়া থাকে, তখন অবিশ্বাস কারীর উপর প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত, চতুরের উপর চাতুর্য্য করিয়া মনকষ্ট নিবারণ, এবং অবিশ্বাসীকে ভেড়া সাজাইয়া মনের তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্তি হয। দেখা গিয়াছে যখনই যে দেশে প্রজার প্রতি রাজার অবিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে, তখনই সেখানে রাজা প্রতারিত হইয়াছে; অথবা যে খানেই গোপনীয় পুলিস বা দোষানুসন্ধিৎসুর দল রক্ষিত হইয়াছে, সেই খানেই পাপ কর্ম্মের ভাগ অধিক হইয়া যায়। ফলতঃ মানবকে বিশ্বাস কর, তাহাকে কার্য্য স্বাধীনতা দেও, এবং তুমি বিজ্ঞ-স্থানীয় হইয়া প্রকাশ্য ভাবে তাহার কার্য্য প্রণালী অবলোকন কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে সে উত্তম কার্য্য করিতেছে, ও তাহার ত্রুটি সামান্য, এবং সে সামান্য ত্রুটিও প্রায় অপর কোন কু অভিসন্ধির নাহইয়া সামান্য অনবধানতার ফল মাত্র। একেত চাতুরীবৃত্তি দোষাবহ, তাহাতে আবার অবিশ্বাস ও গুপ্তানুসন্ধান দ্বারা চতুরের উপর চাতুরী করিতে শিখাইও না। কেবল আপনি ঠকিবে।

দ্বিতীয়তঃ। যখন কর্ম্মচারী বর্গের দোষোদ্ঘাটনের নিমিত্ত কেবল সাধারণ প্রজা বর্গের অপেক্ষা না করিয়া, তন্নিমিত্ত বহুবৃত্তি ভোগী একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল; তখন তাহার উদ্দেশ্যই এই, অথবা উদ্দেশ্য যেমন হউক, কার্য্যত শেষে এই দাঁড়ায যে, কর্ম্মচারী বর্গের যে কিছু দোষ এই গুপ্তচরের দ্বারা প্রকাশিত হইবে, তাহাই সত্য; প্রজাবর্গের কথা আর শুনিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং সাধারণ কর্ম্মচারী বর্গের যে অত্যাচার, উচ্চস্থানে তাহার জ্ঞাপন ও তৎপূর্বে তাহার প্রতিবিধান, এতদুভয়ের নিমিত্তই প্রজাবর্গকে কেবল এক মাত্র গুপ্তচরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। এদিকে গুপ্তচর একক, এবং একজন সাধারণ মনুষ্য, অথবা তিনি অসাধারণ হইলেও, তাহাকে হাত করিতে এবং হাত না হইলে তাড়াইতে কতক্ষণ লাগে। প্রলোভন রত মানব যদি দশজন একত্র থাকে, বরং বহুবিভিন্ন প্রকৃতির একত্র সমাবেশ বশতঃ তাহাদিগকে হাত করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া থাকে, কিন্তু মানব একক হইলে

যদিও সে দৃঢ় চেতা হয়, তথাপি ছলে হউক, কৌশলে হউক, ভয়ে হউক, অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে। তুমি বলিবে এমন উন্নতমনা আছে, যাহাদের সম্বন্ধে আমার এ কথা খাটেনা। সত্য, তাহা আমিও জানি, কিন্তু কথা এই যেমন উন্নতমনা সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বদেশে, বিশেষ মহম্মদীয় ভারতে, হাজারে একটি মিলে কি না সন্দেহ। সে যাহা হউক, কর্ম্মচারী বর্গ যে আত্ম স্বার্থ সাধনার্থে একমাত্র গুপ্তচরকে স্ববশে আনিতে চেষ্টা করিবে ও তাহাতে সফল হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। ফলতঃ বাদসাহী কর্ম্মচারীরা তাহাই করিয়া বাদসাহের চক্ষে ধুলা দিত। প্রজাবর্গেরই অনুপায়। এদিগে এই নির্ভয় অত্যাচার, ওদিকে সে অত্যাচার উচ্চ স্থানে জ্ঞাপন করিতে কেহই নাই। সত্য বটে প্রজারা কখন কখন আপনা হইতে এভার গ্রহণ করিত, কিন্তু প্রজা ও বাদসাহে এমন সম্বন্ধ, যে তাহারা তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ করিত কি না, সন্দেহ স্থল। বিশেষতঃ তৎ তৎ বিষয়ে বাদসাহ গুপ্তচরের বিজ্ঞাপনী ব্যতীত কদাচ কোন বিষয় নিষ্পত্তি করিতেন না।

৬। জায়গীর এবং নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদানের প্রথা।

যে দেশে স্বচ্ছলতা গুণে নিত্য লোক বৃদ্ধি হওয়ায়, সমাজে খরচ বাহুল্য; এবং তৎকারণ হেতু রাজ্যেরও ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে; এবং যেখানে আজিও ভূসম্পত্তি সমস্ত উঠিত হয় নাই। সেখানে এরূপ জায়গীর ও নিষ্কর ভূসম্পত্তি দানের প্রথা দোষাবহ। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজস্ব মাত্রে প্রধান আয়স্থলীয় বস্তু ভূসম্পত্তি। যদি ভবিষ্যৎ উৎপাদিকা শক্তির উপর দৃষ্টি না রাখিয়া, সেই সম্পত্তি উপস্থিত মূল্যে স্থায়ী ভাবে যদৃচ্ছা বিলি করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাজ্যের যেমন ব্যয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনি অর্থকৃচ্ছ্রতায় অনেক ক্লেশ পাইতে হয়। এমনস্থলে অর্থ সংগ্রহের জন্য সময়ে সময়ে নানাবিধ উপদ্রব করভারের বৃদ্ধি হেতু নিষ্কর ভূসম্পত্তি ভোগী ব্যক্তি ভিন্ন প্রায় আর সমস্ত সাধারণ প্রজাবর্গকেই নিঃস্ব, এবং জ্বালাতন হইতে হয়। কখন কখন আবার কর নির্দ্ধারণেও সংকুলান না হইয়া, রাজাকে অবশেষে জুয়াচুরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ধন সংগ্রহ করিতে হয়, এবং সংগ্রহবৃত্তি অন্তে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর উৎপাদক স্বরূপ হইয়া থাকে। মহম্মদ তোগলকের রাজত্বে অর্থভাবে মুদ্রাস্থানে, তাম্র ফলকের প্রচলন, ইহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। প্রজারা ইহাতে বহুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া ভয়ে জঙ্গল ভূমি আশ্রয় করিলে, বন ঘেরিয়া সামান্য পশুবৎ তাহাদিগকে নিপাত করা হয়। অবশেষে প্রজার নিঃস্ব অবস্থা ও স্থান চ্যুতি বশতঃ সে বৎসর কৃষিকার্য্যের ন্যূনতা হওয়ায়; শেষে

এমন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল যে তাহাতে দেশ ছার খার হইয়া যায়। এই বিষয়ের আরও একটি হাস্যাস্পদ উদাহরণ দেখান যাইতেছে। আলাউদ্দিন এক সময়ে যখন দেখিলেন যে আর করভার প্রজারা সহ্য করিতে পারে না; তখন রাজ্যের ব্যয় সংকুলনার্থ অন্য উপায় না দেখিয়া; কর্ম্মচারীবর্গের বেতনের হার ন্যূন করিয়া দেন। তাহাদের আবার এই অল্প বেতনে যাহাতে চলিতে পারে, তজ্জন্য বাজারের দ্রব্য সস্তা করিয়া দিতে, প্রত্যেক দ্রব্য যে দরে বিক্রয় করিতে হইবে, তাহার একটি হার বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। শেষে ইহার ফল যাহা ফলিবার তাহাই ফলিল। আলাউদ্দিন এবং সেরসাহ প্রভৃতি জায়গীর ও ভূসম্পত্তি দানের এতদুর অসুবিধা ও এতদূর বিষময় ফল দেখিয়া, ঐ সকল পুনঃগ্রহণের চেষ্টা করেন। আলাউদ্দিন বড় সফল হইতে পারেন নাই। সেরসাহ অনেক জায়গীর ও ভূসম্পত্তি পুনঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল সৈন্য রক্ষা ও কর্ম্মচারীদিগের বেতন বাবদে জায়গীর ও ভূসম্পত্তি দান ব্যতীত, অন্যান্য বিষয়ে দান করার যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সৎ এবং রাজার অন্তঃকরণে সে উদ্দেশ্য জাগরুক থাকা রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে, ভূসম্পত্তি দানরূপ উপায়টি ভাল নহে। ভূসম্পত্তির পরিবর্ত্তে, উপযুক্ত ও নিয়মিত ভাবে, অর্থ দান করিলেই, উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সিদ্ধ হইতে পারে।

এ প্রথার অপরাপর দোষ উপরে নানা স্থানে যথাযথ সমালোচিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

সুখ।

এই পৃথিবীতে সকলেই সুখের জন্য লালায়িত। ধনী,দীন,জ্ঞানী,অজ্ঞানী,পাপী, ধার্ম্মিক সকলেই একবিন্দু সুখের আশায় সংসার সাগরে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। ধনীর ধন আছে বলিয়া সুখান্বেষণে বিরত নহেন। ধন থাকিলেই সুখ থাকে না। রাজা হইলে কি হয়—যদি সূত্র আবদ্ধ শানিত কৃপাণ শীরোপরি নিরত লম্বমান থাকে? ধন যে সুখের সীমা নহে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে না। অপর পক্ষে দীন মনে করে যে ধনীরা বড় সুখী। সুতরাং সে ধনের জন্য—সুখের জন্য চৌর্য্য নরহত্যা সকল করিতেও কুণ্ঠিত নহে। ঐ যে মহানগরীর রাজবর্ত্মে উৎকল দেশীয় বাহক শিবিকা স্কন্ধে একজন বিচারপতিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে উহাদের অন্তর ভাবিলে হৃদয় আলোড়িত হয়। বিচারপতি শিবিকা হইতে নামিয়া নিদাঘ

সন্তাপ বিদূরীকরণার্থ ব্যজনী ব্যজন সেবন করিবে, আর উক্ত বাহকেরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া পুনরায় যাত্রীর অন্বেষণ করিবে! কিন্তু সকলেই সেই এক সুখের অন্বেষণে প্রবৃত্ত। সেইরূপ অজ্ঞানী জ্ঞানীকে সুখী মনে করে কিন্তু জ্ঞানী-ব্যক্তিও সেই এক উদ্দেশে কর্ম্মক্ষেত্রে অহরহ বিচরণ করিতেছে। কেহ মনে করিতে পারেন যে উদাসীনেরা বড় সুখী কিন্তু বস্তুত সেই উদাসীনেরও সঙ্কল্প আছে, কার্য্য আছে তাহার ফল আছে। যাহাই থাকুক না কেন গৌণ উদ্দেশ্য সেই 'সুখ'কে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। এই সুখলালসার এমনি মোহিনী শক্তি যে পতিহীনা নারী বয়ঃপ্রাপ্ত অর্জ্জুন সম পঞ্চ পুত্র হারাইয়াও একমাত্র অপোগণ্ড দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আপনার ভবিষ্যতের আশা-ভরসার মূল করিয়া তাহা হইতে সুখ প্রত্যাশা করে। ফলভরে অবনত বৃক্ষরাজি পরিশোভিত উদ্যান ছেদিত হইলে, একটি মাত্র কীট সমাচ্ছন্ন তরুর উপরে সেই উদ্যানের মায়া পরিস্থাপন করিয়া সেই একমাত্র বৃক্ষ হইতে ভবিষ্যতে উক্ত উদ্যানপ্রদত্ত সন্তোষ লাভ করিব মনে করে, যেন কি এক মহীয়সী শক্তির বিকার বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক এই জগতী তলে সকলেই যে সেই এক কি বস্তুকে নিত্য মনে করিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে, যাহাকে পাইব মনে করিয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গ বিক্ষোভিত অর্ণবহৃদয়ে ভাসিতে পারি। অন্ধতমসাচ্ছন্ন নরক সদৃশ সুগভীর খনি রাজ্যে বাস করিতে পারি, যাহার ভবিষ্যৎ সঞ্চার সম্ভাবনা করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই—না জানি সেই সর্ব্বজন মোহন, সেই দেবতা দুর্লভ-ধন, সেই সর্ব্বসন্তোষের খনি, সেই পরশ মণি কেমন?

সুখ কি? পণ্ডিতেরা বলেন যে 'সুখী' একটি আপেক্ষিক শব্দ। আমি 'সুখী' অর্থাৎ তুমি যে পরিমাণে ক্লেশানুভব কর আমি তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে ক্লেশানুভব করি। অথবা, আমি দশবৎসর অগ্রে যে পরিমাণে আহার বিহারের কষ্ট সহ্য করিতাম অদ্য তাহা অপেক্ষা কম কষ্ট আমার সহ্য করিতে হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে দুঃখের অভাবই, এক প্রকার সুখ, যেমন অশ্ব, গো দুটী স্বতন্ত্র পদার্থ তদ্রূপ এই ভূমণ্ডলে সুখ দুঃখ বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। পরিমাণের ইতর বিশেষানুসারে নামকরণ হইয়াছে। একের আতিশয্যে অন্যের অভাব। ফলত তাপের সঙ্গে শৈত্যের যে সম্বন্ধ সুখের সহিত অনেকটা দুঃখের সেই সম্বন্ধ! যখন দুঃখাভাব সুখ সঞ্চার বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে তখন সুখী হইতে ইচ্ছুক হইলে দুঃখ পরিমাণ যে কম করিয়া আনিতে হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ইহাও বলিয়া দিতে হইবে না যে সকল অবস্থার লোক সকল অবস্থাতেই কতক অংশে তো সুখী হইতে পারে।

এখন দেখা যাউক কিসে মানুষের সুখ নাই, এবং কিসে আছে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় সুখ মনুষ্যের সুখই নহে। ইন্দ্রিয় লালসা তৃপ্তিসাধন জন্য মনোমধ্যে যে এক প্রকার তৃপ্তি উদয় হয়, তাহা যতই কেন প্রবল হউক না, এবং যতই কেন বিভিন্ন প্রকারে ভুক্তীত হউক না, তাহা আমরা মনুষ্যের সুখের মধ্যে পরিগণিত করিতে পারি না। এখানে 'ইন্দ্রিয় সুখ' মধ্যে আমরা পান, ভোজন, স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি পশুবৃত্তি সূক্ষ্ম শিল্প অর্থাৎ সঙ্গীত, স্থপতি বিদ্যা চিত্র বিদ্যা প্রভৃতি এবং উদ্যানপালন, রঙ্গভূমি প্রদর্শিত নানা দৃশ্য জনিত আমোদ এবং এমন কি মৎস্য ধরণ, মৃগয়া ব্যাপার প্রভৃতি কার্য্যকলাপও বুঝিব। ইন্দ্রিয় সুখ আমাদের সুখই নহে কারণ—

১। উপরি উল্লিখিত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ক্ষণ ত্যাগিনী, আপাততঃ ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। কার্য্যের আড়ম্বর এবং ভবিষ্যতে আমাদের প্রত্যাশা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে কত অল্পক্ষণ আমরা যথার্থ আমোদ উপভোগ করিয়াছি তাহা মনে করিলে বিস্ময় উৎপন্ন হয়। উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই পাঠকবর্গ আপনারাই উদাহরণ যোজনা করিতে পারেন। দেখিবেন যে সেরূপ আমোদে অহোরাত্রির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কত অল্প সময় অধিকার করিতে পারে।

২। পুনঃ পুনঃ উপভোগে এই সকল আমোদের নূতনত্ব যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেক সুখের পরিমাণও চলিয়া যায়। পুরাতন আমোদ ও নূতন আমোদে কত প্রভেদ তাহা সকলেই জানেন। আরও বিশেষ কথা এই যে এ ব্যাধির প্রতিকার নাই। ইহা স্বভাবের নিয়ম।

৩। বড় এবং জাঁকাল আমোদের আশায় আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপভোগকে বিদায় দিই। কিন্তু বড় জাঁকাল আমোদ কিছু দৈনিক ঘটনা নহে, সুতরাং তাহার প্রত্যাশাপন্ন হইয়া আমরা না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যথার্থ উপস্থিত আমোদ গুলিকে ভোগ করিতে পাই, না উহাকেই পাই। সুতরাং লাভের মধ্যে আমাদের সময় মিছা কাজে ব্যয়িত হওয়াতে আমরা অসুখানুভব করি। সচরাচর উপভুক্ত আমোদ হইতে আমরা অধিক পরিমাণ সুখের আশা করিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হই। যখন সেই আমোদটী যথার্থ উপস্থিত হয় তখন আমরা আপনা আপনি যে আমোদ ভোগ করিতেছি এটী বুঝিবার জন্য চেষ্টা করি। দেখিতে দেখিতে সময় বহিয়া যায়। অবশেষে আমরা কি আমোদ পাইলাম ক্ষুণ্ণ মনে ইহাই ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করি।

যাহারা ধনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া এবং সদসৎ বিবেচনা পরিশূন্য হইয়া

সুখ অনুসরণ করে তাহাদের সর্ব্বদা এই দশা উপস্থিত হয়। তাহারা কখনও একরূপ উপভোগে দীর্ঘকাল নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারে না। প্রথমে তাহাদিগকে অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিতে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আমোদ উপস্থিত হইতে হইতেই যাহাদের উৎসাহ ভঙ্গ হয় এবং অভাবে একবারে অপদার্থ হইয়া উঠে। ইহার তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে এ সকল উপভোগের একটী সীমা আছে এবং অতি শীঘ্রই সেই সীমা উপস্থিত হয়। সীমা অতিক্রম করিলেই উপভোগের আর গাঢ়তা থাকে না ক্রমশঃ হ্রাস আরম্ভ হয়। ইহার কারণ এই যে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিস্তেজ হইয়া উঠে। তখন যদি উপভোগের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আমাদিগকে ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিতে হইবে। তাহাতে অবশেষে এই হয় যে ইন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে এবং আমাদের ও তত্তৎইন্দ্রিয় সাপেক্ষ-মানসিক বৃত্তির ক্রমশঃ অধঃপতন হয়।

এইরূপে যে সকল সুখপ্রত্যাশীর ইন্দ্রিয় বৃত্তি হ্রাস হয় তাহাদের পরিণামের অসহ্য যন্ত্রণা স্মরণ করিলে মনে বড় দুঃখ হয়। পূর্ব্ব স্মৃতির বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা হৃদয়ের অগ্নিতে সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে থাকে।*

পূর্ব্ব বর্ণিত প্রথায় সুখান্বেষণকারীর আর একটী কার্য্যের কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইতেছিলাম। তাহা সুযোগ উপেক্ষা করণ। ইহাতেও তাহারা বড় যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে ধন অপব্যয় করিয়া যে সুখ উপার্জ্জনে তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন সে সুখের সহিত সে ধনের তুলনা করিয়া দেখিলে যাহা অনুভব হয় উক্ত প্রকারে সুখ প্রত্যাশীরা তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। তবেই মনুষ্যের যথার্থ সুখের যে ইহা প্রধান নহে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণা, পরিশ্রম, চিন্তা, কাজকর্ম্মের অভাব বিরক্তি প্রভৃতি না থাকিলেই যে মনুষ্যের সুখ তাহাও নহে। একরূপ অবস্থায় লোকে সুখী না হইয়া বরং 'মনমরা' হয়। তাহাদের কোন কার্য্য না থাকাতে একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং হয়ত আপনাদের শরীরে মিছামিছি রোগের কল্পনা করে, এবং তজ্জনিত চিন্তায় অশেষ অসুখ ভোগ করে। এবম্বিধ লোক সমাজের কণ্টক স্বরূপ। তাহারা লোকের কেবল উৎসাহ ভঙ্গ করিতে পারগ। প্রকৃতি কোন বস্তুকে স্থির হইয়া থাকিতে দেন নাই। অনুবীক্ষণ অগোচর কীটাণু হইতে কল্পনা অসাধ্য অতি বিশাল জড়পিণ্ড পর্য্যন্ত সকল পদার্থই নিয়ত কোন কার্য্য উপলক্ষে ব্যস্ত-জগতের কোন কার্য্য সাধন করিতেছে। জীবসৃষ্টির শীর্ষদেশস্থায়ী

* Vide Paley's *Moral and Political Philosophy*.

মনুষ্য যে আলস্যে কাল হরণ করিবেন ইহা বিশ্বকর্ত্তার কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ স্থলে যদি কোন মানসিক চিন্তা থাকে তাহাও সুখের বিষয় হয়। যেমন সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ক তর্ক, কিম্বা রাজ সরকারের বিচার প্রার্থনা কি দলাদলি, বারয়ারি পূজার প্রতিদ্বন্দ্বীতা, অধিক কি চতুরঙ্গ প্রভৃতি কোনও ক্রীড়া সময়ে সময়ে সামান্য ব্যক্তি হইতেও অনেক উপকার হয়।

তৃতীয়তঃ। বড়লোক হইলেই মান্য প্রাপ্ত হইল অথবা উচ্চপদস্থ হইলেই যে দুর্লভ সুখবস্তু লাভ হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। ইহাতেও সুখ নাই অন্যের উপর প্রাধান্য হইতে সুখ লাভ হইলে আমাদের সুখের পরিমাণ অসীম হইতে পারিত, কেননা এই পৃথিবীতে মদপেক্ষা অনেক ব্যক্তি অনেক বিষয়ে নিকৃষ্ট আছেন, কিন্তু ইহাতে যে কিছুমাত্র সুখ বা সন্তোষ নাই এ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরের সহিত তুলনায় আমাদের যদি প্রাধান্যের অস্তিত্বানুভব হয় তবে একটু সন্তোষ হইতেই হইবে। গাভীর উপর প্রাধান্যে রাখালের সুখ নাই। রাখাল অপেক্ষা কৃষক শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাহা হইতে তাহার সুখ কই। জমীদার আবার কৃষকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সুখানুভব করিতে পারেন না। অপরপক্ষে যদি পূর্ব্বোক্ত রাখাল অপর কোন রাখাল অপেক্ষা উত্তম গোচারণ ক্ষম হয় তবে তাহাতে তাহার সুখের সম্ভাবনা, রাম যদি নবীন অপেক্ষা উত্তম বস্ত্র বয়ন করিতে পারে তবে রামের সুখ বটে। যেখানে একটু প্রতিদ্বন্দ্বীতা আছে সেখানে একটু সুখ আছে। সংসারের এই নিয়ম। তবেই যদি প্রাধান্যে সুখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন তবে সে প্রাধান্য সমাবস্থাপন্ন প্রতিযোগীর উপর নতুবা নহে।

এস্থলে একটি কথা উপস্থিত হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস উচ্চাভিলাস ও সুখ কেবল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বর্গেরই সাধ্য। আমরা একথার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিনা। আর, এ কথায় আমাদের সহানুভূতি নাই। ডিসরেলী গর্চ্চাসকফ অপেক্ষা রাজনৈতিক জটিল বুদ্ধির অধিক বক্র খেলা দেখাইতে পারি বলিয়া বিস্‌মার্কের যদি অহঙ্কারের সঞ্চার হয় তবে নফর, পাঁচু অপেক্ষা উত্তম চর্ম্মপাদুকা নির্ম্মাণ করিতে পারি বলিয়া কেনারামও এক দিন গর্ব্ব করিতে পারে।

কিন্তু বস্তুত প্রাধান্যে সুখ নাই। বিজয়ের সুখের চমৎকারিত্ব স্বীকার করি। কিন্তু সেই বিজয় লাভের জন্য আয়াস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার ভবিষ্যত ফলাফল চিন্তা, যদি বিফল প্রয়াস হওয়া যায় তবে তাহার মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা স্বতন্ত্র করিলে চলিবে না। আবার দেখুন যদি উক্ত বিপদ সকল কাটাইয়া উঠিলেন তবে সে সুখ ক্ষণ স্থায়ী কেন না আবার নূতন চিন্তা, নূতন আয়াস নূতন প্রতিযোগী সম্মুখে উপস্থিত। এইরূপ ক্রমা-

গত চলিতে লাগিল তবে স্থায়ী নির্ম্মল সুখ কোথায় আর যদি এমনই হয় যে জয় লাভের পর আর কোন চিন্তা বা প্রতিযোগীতা না থাকে তবে আমাদের পূর্ব্ব সূত্রানুসারে নিষ্কর্ম্মা হওয়াতে আলস্যের সঞ্চার হয় এবং সমুদয় সুখ ঐখানেই সমাহিত হয়।

যাহাতে মনুষ্যগণ সাধারণত সুখ আছে মনে করে অথচ যাহাতে যথার্থ সুখ নাই তাহাদের বিবরণ আমরা স্থূল ভাবে পর্য্যালোচনা করিলাম। অতঃপর কিসে মনুষ্যের সুখের সম্ভাবনা আমরা তাহা বিবেচনা করিব। কিন্তু এটী বড় দুরূহ ব্যাপার। যেহেতু সকলের অবস্থা কিছু সমান নহে। বাল্যকাল হইতে আনন্দ প্রভাবে নানা ব্যক্তির নানা ভাবে প্রবৃত্তি গঠিত হইয়াছে। একজন ক্রমাগত গণিত বিদ্যার চর্চ্চা করিতে ভাল বাসে অপর কেহ সাহিত্যানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করেন। এইরূপ আহার ব্যবহার প্রভৃতি সকল বিষয়েই মনুষ্যেরা বিভিন্ন রুচির বশ। ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোক এমত অবস্থার সকল শ্রেণীর উপর সমান ভাবে প্রয়োগ হইবে এরূপ নিয়ম প্রকাশ করা দুরূহ ব্যতীত আর কি বলিব? ইহাতেও কতদূর কৃত কার্য্য হইতে পারা যায় দেখা যাউক। আর একটি কথা আছে। মানবের যথার্থ মনের ভাব আমরা জানিতে পারি না। উপরে দেখুন কোন লোকের অন্ন বস্ত্রের দুঃখ নাই, পুত্রকলত্রাদি নাশ জনিত শোকের দারুণ শেলাঘাত সহ্য করিতে হয় নাই। কোন শারীরিক পীড়া নাই। পরিবারের মধ্যে সচরাচর অল্প পীড়া হইয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি সচরাচর সংসারের যে সমস্ত অসুখ তাহা নাই। তত্রাচ সেই ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সুখ না থাকিতে পারে। না থাকার সম্ভব নহে। এরূপ স্থলে এ ব্যাধির ঔষধ নাই চিকিৎসা নাই তুমি আমি বলিব। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত তাহার মানসিক ভাব অবগত হইয়া হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশের অভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। ইহাতেও দেখা যাইতেছে আমাদের সূত্রের প্রভুত্ব এস্থলে খাটিবে না। মনের ভিতরের কথা লইয়া পর্য্যালোচনা করা এবং সাংসারিক ব্যাপারের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করা সহজ নহে। এ সকল বিঘ্ন বিপত্তির কার্য্য বক্তব্য নহে। সুতরাং এ সমস্তের কথা না স্বীকার করিয়া আমরা মূল ভাবে বিচার করিব। উপরে সুখ যদিও প্রকৃতরূপে সন্তোষ প্রদ না হইতে পারে তথাপি তাহা আপাতদৃষ্টিতে সেই মনুষ্যের সুখের পরিমাণের শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ গুণীতক (measure)। তাহা দেখিয়া আমরা সুখের মাত্রার পরিমাণ করিব।

ক্রমশঃ



আয়ুর্ব্বেদীয়।

স্বাস্থ্য সংরক্ষণী

চক্র তৈল।

প্রাচীন কালে আর্য্যেরা শরীরের সৌকুমার্য্য ও স্বাস্থ্য সংস্থাপনার্থ প্রতিদিন এই তৈল ব্যবহার করিতেন। সাধারণের বিদিতার্থ আয়ুর্ব্বেদ হইতে ইহার গুণ সমস্ত অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"যেমন তরুমূলে জল সিঞ্চন করিলে তরু সমস্ত বৃদ্ধি পায় তদ্রূপ এই তৈল শরীরে মর্দ্দন করতঃ জল সেচন করিলে অসংখ্য ২ লোম কূপ দ্বারা রক্তে তৈল মিশ্রিত হওয়াতে ধাতু সমস্তের বল বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহা দ্বারা দূষিত রক্ত সমস্ত বিশোধিত হইয়া ত্বকের উজ্জ্বলতা, শরীরের কোমলতা, ও স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়। কোন স্থান ভগ্ন, দগ্ধ, ঘৃষ্ট, বা কাটিয়া গেলে তৎ স্থানে এই তৈল তুলা ভিজাইয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে ২। ৩ দিবসের মধ্যে আরোগ্য হইয়া উঠে এবং ইহা মর্দ্দন করিলে ভ্রম, শিরঃশূল, কর্ণ, শূল, হনুস্তম্ভ, শিরোমল ইত্যাদি স্কন্ধের উর্দ্ধজাত রোগ সমস্ত দূর হয় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণ বর্ণ হয়।" * সাধারণে এইক্ষণ নারিকেল ও তিলের তৈল ব্যবহার করেন, এ কারণ পৃথক্ পৃথক রূপে এই উভয় তৈলের দ্বারা ইহা প্রস্তুত করতঃ গন্ধপাকের বিধানানুসারে পুষ্পাদির দ্বারা অতি মনোরম গন্ধযুক্ত করা হইয়াছে। মূল্যও যথা সাধ্য অল্প করা হইয়াছে। এক পোয়া শিশি ১ টাকা এক সের ৪ চারি টাকা, অধিক লইলে কমিসন দেওয়া যায়।

* যাঁহারা ইহার গুণের সত্যতা অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সুশ্রুত স্বাস্থ্যরক্ষা স্নেহ বিধি প্রণালীতে প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একটি গুণও আমার স্বকপোল কল্পিত নহে।

সর্ব্ব জ্বরারি লৌহ।

নবজ্বরে অধিক কুইনাইন সেবনের পর, ও সর্ব্ব প্রকার পুরাতন জ্বরের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহাতে অধিক পরিমাণে লৌহ থাকায় ধাতুস্থ জ্বরের বিশেষ উপকারী। মূল্য ১২ পান যুক্ত কৌটা ৷৹ আনা অনুপান সমেত ৷৵৹ আনা।

স্নায়ু রঞ্জনামৃত।

ইহা বল কারক, ধাতু পোষক, পরিপাক শক্তি পরিবর্দ্ধক ও কোষ্ঠ প্রসন্ন কারক, ইহার এই গুণ গুলিন থাকায় সর্ব্ব প্রকার পুরাতন পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। যাঁহারা শরীরের বল বিধানার্থ নিত্য দুর্গন্ধময় কড্‌লিভার অইল ব্যবহার করেন অন্ততঃ তাঁহারা এই ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখুন। ১ পোয়া ১৷৹

ত্রিফলা পাক।

ত্রিফলার (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া) গুণ ভারতবাসীদিগের নিকট অবিদিত নাই শীতলতা গুণের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। এতৎব্যতীত ইহা প্রত্যহ সেবন করিলে কোষ্ঠপ্রসন্ন থাকে ক্ষুধা ও বল বৃদ্ধি পায়। ইহা দ্বারা শরীরের জ্বালা, বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। ৵৫ বোতল ৸৹

হরীতকী পাক।

ইহা ত্রিফলার ন্যায় গুণবিশিষ্ট কিন্তু উহা পেক্ষা উষ্ণবীর্য্য ও বিরেচক। আর্য্যদিগের মধ্যে

ইহা নিত্য আহারীয় দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইল ।/৫ বোতল ৫০ আনা

বিল্বপাক ।

ইহা দ্বারা অতিসার, রক্তাতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ আমাশয় ও কোষ্ঠ বদ্ধ আরোগ্য হয় ।

অধিক দিনের অতিসার থাকিলে নিত্য বিল্ব পাক সেবনে মহোপকার দর্শে । /৫ পোয়া বোতল ১৲

কর্পূরাসব ।

ওলাউঠা রোগে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং হোমিও প্যাথিক স্পিরিট ক্যাম্ফর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে । ইহা ৮ । ১০ ফোঁটা সেবনে অপরিমিত আহার জনিত অজীর্ণ আরোগ্য হয় । ইহা প্রতি গৃহে রাখা কর্ত্তব্য । এক শিশি ৫০ আনা

অমৃতাদি চূর্ণ ।

ইহা কুইনাইনের সহিত সেবন করিলে অল্প কুইনাইনের দ্বারা জ্বর আরোগ্য হয় । সুতরাং অধিক কুইনাইন সেবন জনিত দোষ সমূহ ঘটিতে পারে না । এক কৌটা ৸০

অকৃত্রিম স্বর্ণ ঘটিত মকরধ্বজ ।

ইহা যথা শাস্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং ইহার গুণের ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । ১৪ পান যুক্ত কৌটা ১ টাকা ।

লালগুড়া ।

অতিসার ও গ্রহণীর শেষ অবস্থায় মহোপকারী । মূল্য ৭ পুরিয়া ১ টাকা ।

কলিকাতার গ্রাহকগণ যাঁহারা ৫ টাকা বা তদূর্দ্ধ মূল্যের ঔষধ লইবেন তাঁহারা হাড়কাটা পঞ্চানন্ তলা লেন ১৬ নং বাটী শ্রীযুক্ত বাবু ভবনাথ রায় অথবা বহুবাজার নেবুতলা ৩৩ নং বাটী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজা শঙ্কর রায়ের নিকট হইতে ঔষধ লইলে নিয়মিত রূপ কমিশন পাইবেন ।

দূষিত রক্ত ।

গুড়ূচী তৈল ॥০ বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি ১

মহারুদ্র তৈল ১৲

আমবাত ।

বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল ১৲ কুব্জ প্রসারণী তৈল ১।০

শূল ও অম্লপিত্ত ।

ধাত্রীলৌহ ॥০ অম্লপিত্তান্তক লৌহ ॥০

শূল গজেন্দ্র তৈল ১॥০

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত ।

উশীরাদ্য তৈল ১

প্রমেহ ।

বঙ্গেশ্বর ১৲ বৃহৎ বৃং বঙ্গেশ্বর ১॥০

মেহ মিহির তৈল ২৲

বৃহৎ প্রমেহ মিহির তৈল ১॥০

শিরো রোগ !

মহা দশমূল তৈল ১॥০ ষড়বিন্দু তৈল ১॥০

লৌহ ভস্ম (৮০ পুটিত) ১ তোলা ১।০

এবং অন্য অন্য সমস্ত প্রকার জারিত ধাতু দ্রব্য এবং অত্যাবশ্যকীয় ঔষধাদি প্রস্তুত হয় এবং ফরমাইষ পাইলে যত্নের সহিত বিলম্ব না করিয়া প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায় ।

শিয়াহাটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ ।

* এই তৈলটী দ্বারা দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত করিয়া পারদের দোষ নষ্ট হয়, চর্ম্ম রোগ মাত্র আরোগ্য হয়, মূত্র সরল এবং হস্তপদের দাহ নিবারণ হয় ।

চক্রদত্ত ।

আর্য্য চিকিৎসার গৌরব স্বরূপ এই মহোপকারক গ্রন্থখানি আমি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, গ্রহণেচ্ছুগণ আমার নিকট তত্ত্ব করিলে ইহার নিয়ম সমস্ত জানিতে পারিবেন

শ্রীহৃদয় নাথ রায় কবিরাজ প্রকাশক ।

বিমলা।

বিমলা বঙ্কিমবাবুর আদর্শচিত্র। বঙ্কিম বাবু বঙ্গকুলবধূকেও যেরূপ স্বাধীনতা ও তেজস্বিতায় ভূষিতা করিতে চাহেন, যেরূপ বুদ্ধিমত্তায় চতুরা করিতে চাহেন, স্বাধীনতার সহিত যেরূপ ধর্ম্মবলে বলবতী করিতে চাহেন, তাহার প্রথম আদর্শ বিমলায় প্রদর্শিত হয়। সে আদর্শের দ্বিতীয় চিত্র মতিবিবি, এবং তৃতীয় ফল লবঙ্গলতা। রাজকুলে ও বয়সে বিমলা, বেশ্যাবৃত্তিতে মতিবিবি, এবং গৃহস্থকুলে ও যৌবনকালে লবঙ্গলতা। নচিলে সেই তেজ, সেই সাহস, সেই স্বাধীনতা, সেই চতুরতা তিন জনেরই সমান ধর্ম্ম। পতির প্রতি বিমলার শ্রদ্ধা ও আদর যেমন, লবঙ্গলতারও তেমনি। ধর্ম্মবলে এই দুই জনের কেহই ন্যূন নহেন। মতিবিবি স্পর্দ্ধা করিয়া একদা দিল্লীর সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; আর যদি নব কুমারের অঙ্কস্থানীয় হইতেন, তৎপ্রতি স্পর্দ্ধা ও আদর কিছু ন্যূন হইত না। ইহাদিগের আশা ও অভিলাষ সর্ব্বদাই উচ্চদিকেই ধাবিত হইত। হৃদয়ের বল ও দৃঢ়তায় প্রয়োজনকালে তিন জনেই সমতুল্য ছিলেন। আবার তিন জনেরই হৃদয় সমান কামিনী সুলভ তরলতায় তরঙ্গিত হইত।

ভারতে বীরত্বের কাল বহুদিন অস্তগত হইয়াছে। শান্ত, সরলা, মৃদু প্রকৃতি, ও চিরদুঃখিনী সীতাদেবীর প্রতিমা সেই জন্য বহুকাল ধরিয়া নির্বীর্য্য ভারত কল্পনাকে একাধিকার করিয়াছিল; আজিও অনেক পরিমাণে করিয়া আছে। কেবল ইংরাজী ঔপন্যাসিক সাহিত্য পাঠকের মনে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। তাহার কল্পনার আর এক ধাতুর রমণীরত্ন উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইতেছে। তিনি মৃদু প্রকৃতি সতী সাধ্বীর সঙ্গে ক্রমশঃ এই রমণীকুলেরও আদর করিতে শিখিতেছেন। যে স্বাধীনতা ও ধর্ম্মবল, যে বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতা, ইউরোপীয় মহিলার সৌন্দর্য্য ও ভূষণ; যে গুণে অলঙ্কৃতা হইয়া ইউরোপীয় মহিলাগণ উপন্যাস ক্ষেত্র সুশোভিত ও আলোকিত করিয়াছেন, বঙ্গীয় ইংরাজী সাহিত্য পাঠক এখন স্ত্রী অঙ্গে সেই সকল গুণের আদর বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি অনেক সময়ে ইংরাজী মহিলার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যান। তাহার স্বাধীন ধর্ম্মবলের সহিত, তেজস্বিতা ও মনের দৃঢ়তার সহিত বঙ্গমহিলার নিস্তেজ ও মৃদু প্রকৃতির তুলনা করিয়া দেখেন। দেখিয়া তাহার মুখ কান্তি বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। তিনি এখন সীতা দেবীর পরিবর্ত্তে দ্রৌপদীকে অধিকতর আদর করিতে চান। সেই

আদরে ঔপন্যাসিক চিত্র কল্পনায় আঁকিতে বসেন। দ্রৌপদীতে রাজকুলাঙ্গনার তেজস্বিতা দেখেন, সীতা দেবীতে ধীরতার সহিত ধর্ম্মবল ও দৃঢ়তা দেখেন, বাঙ্গালিনীতে চতুরতার সহিত নম্রতা ও সহৃদয়তা দেখেন ; এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় মহিলাতে স্বাধীনতা সম্ভাবিত দেখেন। পরে এই গুণ-পরম্পরা, কল্পনায় মিলিত করিয়া এক পরমা সুন্দরীর সৃষ্টি করিতে যান। নিজ প্রকৃতির চরিতার্থতা হেতু সেই সুন্দরীকে আমোদিনীও করেন। সেই সুন্দরীর নাম বিমলা। বিমলা আধুনিক ইংরাজী সুশিক্ষিত যুবাজনের কাল্পনিক প্রতিমা। যে চমৎকার কৌশলে বিমলারও সৃষ্টি বঙ্গ উপন্যাসে সম্ভাবিত হইয়াছে, তাহা এই প্রস্তাবের সর্ব্বশেষে প্রদর্শিত হইবে।

যখন বীরধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব ছিল, তখন কুলকামিনী ও দ্রৌপদীতে বীরধর্ম্মিনী হইয়াছিলেন। তাহা কালের গুণ, ব্যাসের সৃষ্টি নহে। তখন তেজবাক্য ও তেজ ব্যবহার ক্ষত্রিয় কামিনীর সুলভ ধর্ম্ম ছিল। বিমলাও সে কালের কল্পিত কামিনী, সেকালে আর্য্যতেজ সম্যক অস্তমিত হয় নাই। বিমলা যে দেশে আশৈশব লালিত পালিত হইয়াছিলেন, মানসিংহের যে তেজস্বী কুলগৌরবে পরিবর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন, তাহাতে বিমলার প্রকৃতি যেরূপ তেজস্বিনী হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছিল। বিমলার তেজ, সাহস, ও স্বাধীনতা, মৃদু প্রকৃতি বাঙ্গালিনীতে দুর্ল্লভ। কিন্তু যে চতুরালী বাঙ্গালিনীর সুলভ ধর্ম্ম, শশিশেখরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিমলায় তাহা সম্ভাবিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু প্রথমে বিমলার কল্পনা এইরূপে বঙ্গপাঠকের মনে সম্ভাবিত করিয়া লইয়াছেন। একবার বিমলা তাহার কল্পনায় সুপরিচিত হইলে, লবঙ্গলতা আর অসম্ভাবিত বোধ হয় নাই। বেশ্যাবৃত্তি মতিবিবির কথা ধর্ত্তব্য নহে। যে সমস্ত উজ্জ্বলবর্ণের বাহ্যরেখায় বিমলার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা এক্ষণে বোধ হয় সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইল ; যে সমস্ত অন্তঃসৌন্দর্য্যে সেই চিত্র দ্বিগুণ প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। বিমলার নবীনত্বে আমরা যেমন চমকিত হইয়াছি, তাহার সৌন্দর্য্যে তেমনি চমৎকৃত হই।

উপন্যাস ক্ষেত্রে দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমবাবুর প্রথম উদ্যম। কিন্তু এই প্রথম উদ্যমে বঙ্কিমবাবুর ন্যায় বিশুদ্ধ রুচির লেখকও বঙ্গ সাহিত্যের একটি দোষ হইতে সহসা মুক্ত হইতে পারেন নাই। বিলাসী বাঙ্গালী ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সৌন্দর্য্যে এত মোহিত, যে একেবারে তাহার সমুদায় ভুলিয়া যাওয়া বড় কঠিন। তাহার হৃদয় মন এই সৌন্দর্য্যে পরিলিপ্ত। সুতরাং ইহার মোহিনী ভাব অজ্ঞাতভাবে তাহার লিখিত চিত্র মধ্যে প্রবেশ করে ; প্রবেশ করিয়া সেই চিত্রকে লম্পটের মোহিনী শোভায় ভূষিত করে। বিমলা ইহার দৃষ্টান্ত। বিমলা যখন নিভৃতে কেশ

বিন্যাস করিতে বসিয়াছেন বঙ্কিমবাবু অজ্ঞাতভাবে দ্বারদেশ হইতে উঁকি মারিয়া নিজে বিমলার অর্দ্ধনগ্ন দৈহিক সৌন্দর্য্যে এত বিমোহিত হইয়াছেন, যে সে দৃশ্য পাঠককে না দেখাইয়া থাকিতে পারেন নাই। এ দৃশ্য অতি মোহনীয় ও সুন্দর; কিন্তু এই সুন্দর দৃশ্যে শারীরিক অঙ্গ ভঙ্গি যে রূপে প্রকটিত হয়, তাহা কেবল লম্পটের নিকটেই আদরণীয়। এ চিত্র অতি গ্রাম্য; এবং ভদ্রলোকের কেবল শয়নকক্ষে স্থাপনের উপযুক্ত বলিয়াই স্থির হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু এই চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়াছেন। তিনি ভারতচন্দ্রের ন্যায় বাক্যাড়ম্বর করেন নাই বটে, কিন্তু তুলিকায় যাহা চিত্র করিয়াছেন, মানস চক্ষে যে ছবি ধরিয়াছেন, তাহা ভারতচন্দ্রের ক্ষমতার অতীত। রূপবর্ণনার ভঙ্গি ও গৌরবে বিমলাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে; বিমলা সেই সজীবতায় পাঠকের মনে উদয় হন। সেই সজীব বিমলার চিত্র বিলাসিনীর রূপ মাধুরীতে শোভিত দেখায়।

কিন্তু বঙ্কিমবাবুর নিপুণতা এই, যে তিনি এই দূষিত ভাবে নামিয়াও আশ্চর্য্য কৌশলে অতি পবিত্র ভাবে উঠিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বিমলা চিত্রের নৈতিক ফল মন্দ দাঁড়ায় নাই। বঙ্কিমবাবু যে বিমলাকে বিলাসিনীর রূপ দিয়াছেন, মদন রসলালসাপূর্ণ কটাক্ষ দিয়াছেন, যৌবনের টিপি টিপি হাসি দিয়াছেন, কালজয়ী বক্ষঃস্থল দিয়াছেন, স্থূল শরীরের পূর্ণতা ও চম্পকবর্ণের প্রভা দিয়াছেন তাহার বিশেষ কারণ আছে। কামিনীর নিকট তাহার রূপমাধুরী যে কি মহাস্ত্র বিমলা তাহা দেখান। বিমলার কৌশল এই ছিল, বিমলা নিজ রূপ বলে, এবং কটাক্ষ প্রভাবে, যেখানে থাকিতেন, তাহার চারিধারে পাপের মায়াজাল বিস্তার করিতে পারিতেন; বিস্তার করিয়া আপনি বিশুদ্ধ ভাবে অটল থাকিতেন এবং ব্যাধের ন্যায় কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইতেন। বিমলার রূপ তাহার বুদ্ধিকে সহায়তা করিত, তাহার গুণাবলিকে উজ্জ্বল করিত। বিমলা যে অন্তঃসৌন্দর্য্য ও গুণরাশিতে ভূষিতা হইয়াছেন, তাহাদিগের অধিকতর উজ্জ্বলতায় তাহার রূপলাবণ্য লুকাইয়া যায়। বিমলা, রূপে যত গৌরবিণী; কার্য্যে, সাহসে, বুদ্ধিমত্তায় এবং পৌরুষে তাহাকে তদপেক্ষা গৌরবিণী ও সজীবতর দেখায়। এমত কি তাহার গুণগরিমা এত অধিক যে বিমলাকে ভাবিতে গেলে অগ্রে তাহার গুণ গৌরবই মনে আইসে। বিমলা, তেজস্বিনী, চতুরা, সুন্দরী রূপে মনে উদিতা হয়েন। অগ্রে তাহার গুণ দেখি পরে তাহাকে সুন্দরী দেখি। এই চিত্রই প্রকৃত সুন্দরীর চিত্র।' কিন্তু এরূপ হইবার একটি কারণ আছে। বিমলার গুণ সকল বিশেষ প্রকার। এদেশীয় কামিনীর অঙ্গে এরূপ অসামান্য গুণাবলির সমাবেশ হওয়াতে তাহা সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। নহিলে, বিমলা যদি সামান্যা মৃদু প্রকৃতি

কামিনীর গুণরাশিতে ভূষিতা হইতেন, তাহা হইলে তাহার বিমোহন রূপের চিত্র ঢাকিয়া পড়িত কি না সন্দেহ। চিত্র আঁকিবার কৌশল এই।

বিমলা তিলোত্তমাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। অনেক কারণে তিলোত্তমা তাহার বিশেষ স্নেহভাগিনী হইয়াছিলেন। বিমলার নিরপত্যতা তিলোত্তমাকে কন্যা স্থানীয় করিয়াছিল, তিলোত্তমার বয়স ও মৃদু প্রকৃতি তাহাকে সখীত্ব দিয়াছিল, এবং তাহার জন্ম ও অবস্থায় বিমলা তাহার প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী হইয়া ছিলেন। বিমলা তাহাকে একদা কন্যা-ভাবে স্নেহ করিতেন, সখীভাবে ভাল বাসিতেন এবং নিজের ন্যায় সমদুঃখিনী বলিয়া তাহার প্রতি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিশেষরূপে অনুরাগিণী ছিলেন। তিলোত্তমার বয়স ও যৌবনবৃদ্ধি দেখিয়া বিমলা চঞ্চল হইতেন। ভাবিতেন, তিলোত্তমার বিবাহ কিরূপে হয়? কিন্তু বিমলার অভিলাষ উচ্চদিগকেই ধাবিত হইত। উপযুক্ত পাত্র না পাইলে তাহার প্রিয়সখী তিলোত্তমাকে তিনি কাহাকেও দিতে পারিবেন না। এমত সময় একদা জগৎসিংহের সহিত দেব মন্দিরে তাহা দিগের সাক্ষাৎ ঘটিল। তিলোত্তমার যৌবন ও রূপ প্রভাবে জগৎসিংহের চিত্ত চাঞ্চল্য বিমলা দেখিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, তিলোত্তমার অপাঙ্গে কটাক্ষ লুকাইতেছিল। বিমলা চাহিবামাত্র তি লোত্তমার নয়ন পল্লব উপর্য্যুপরি ভূইবার পতিত হইল; তিনি অঞ্চলে বদনদেশ ঝাঁপিয়া দিলেন। তিলোত্তমার এই ভাব দেখিয়া বিমলা অধর প্রান্তে মৃদু হাসিলেন এবং কহিলেন, কি লো, শিব সাক্ষাৎ স্বয়ম্বরা হবি নাকি? জগৎসিংহের পরিচয় পাইয়া বিমলার মন স্ফূর্ত্তির কত রমণীয় ভাবে বিচলিত হইয়া উঠিল। জগৎ সিংহকে একদা কতক আপনার আপনার জ্ঞান হইতে লাগিল। ভাবিলেন এইরূপ পাত্রই তিলোত্তমার উপযুক্ত। জগৎসিংহ যদি তিলোত্তমার স্বামী হন, তদপেক্ষা আর কিছুই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু এপথে যে কণ্টক তাহাও তিনি ভাবিলেন। তথাপি এ বাঞ্ছনীয় সুখের আশা তিনি একবারেও পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মানসিংহের গৃহে তাহার পূর্ব্ব সৌভাগ্য একবার মনে উদয় হইল। সেইরূপ সৌভাগ্যশালিনী হইতে আর একবার আশা হইল। এই সমস্ত ভাবে বিচলিত হইয়া বিমলা জগৎসিংহকে সেই দেবমন্দিরে দেখা সাক্ষাৎ করিতে বলি-লেন। তিলোত্তমার সহিত তাহার বিবাহ সংঘটনে তিনি ব্রতী হইলেন। আমরা বিমলাকে যখন এই প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নবতী দেখি, তখন বিমলা আমাদিগের নিকট কেমন মধুর বোধ হয়েন। একা-কিনী রজনীযোগে যখন তিনি শৈলেশ্বর সাক্ষাতে গমন করিতেছেন, তখন তিনি ঠিক প্রেমদূতীর প্রতিকৃতিরূপে আমা-দিগের নিকট প্রতীত হয়েন। তাহার অগ্রে অগ্রে সাহস ও আনন্দকে আমরা

কল্পনায় দেখিতে পাই। তৎপূর্ব্বে আশা, অভিলাষ, ও প্রিয়সখীর হিতকামনা পশ্চাৎগামী দেখি এবং ইহাদিগের পূর্ব্বে বিমলা দিগ্‌গজের সহিত রঙ্গরস করিতে করিতে অগ্রসারিণী হইতেছেন। এ সময়ে বিমলা এত মোহিতা, যে তিনি একবারও মনে ভাবেন নাই, যে জগৎ সিংহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ না হইবার ও সম্ভাবনা আছে। বিমলা যেমন এই সময়ে মোহিত হইয়াছিলেন, আমরা ও তাহাকে দেখিয়া তদ্রূপ মোহিত হইয়াছি। ভাবিয়াছি, এইখানেই বিমলা। বিমলা নির্ভীক মনে, উচ্চ অভিলাষে উৎফুল্লা হইয়া হিত কামনায় উদ্যোগিনী হইয়া, আনন্দে গীত গাহিতে গাহিতে একাকিনী রজনীযোগে প্রান্তর দিয়া গমন করিতেছেন; আর দিগ্‌গজকে ভয় দেখাইয়া আপনি তামাসা দেখিতেছেন। যদি বিমলাকে কেহ দেখিতে চাও, এইখানে বিমলাকে দেখ। দেখিয়া বল দেখি, বিমলার প্রকৃতি কেমন মধুর, কেমন স্বাধীন, কেমন নির্ভীক ও সাহসী, কেমন হিতচিকীর্ষু, কেমন উচ্চাভিলাষী, কেমন প্রেমব্রতী, কেমন প্রফুল্ল ও রঙ্গরস প্রিয়। তুমি কি একপ রমণী সচরাচর দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, স্বীকার কর, বিমলা তোমার মনোমোহিনী বটে।

বিমলার এই স্বাভাবিক ভাব,—এই নিশ্চিন্ত, স্বাধীন, উল্লাসিনী বিমলা। কিন্তু বিমলার আর এক ভাব আছে। বিমলা সে ভাবে গায়িকা, রঙ্গরস প্রিয়া প্রেমদূতী হইতে বিভিন্ন। তিনি ও সেই স্বাধীন, নির্ভীক, ও সাহসিনী বিমলা বটে, কিন্তু তাহার শরীরে উচ্চতর গুণ একপ বিকশিত হইয়াছে যাহাতে তাহাকে যেন আর একটি স্বতন্ত্র বিমলা করিয়াছে। বাস্তবিক দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা বিমলাকে তিনভাবে দেখিতে পাই। বিমলা ক্রীড়া কৌতুকিনী, বিমলা নিজ প্রবৃত্তি পরায়ণা, বিমলা নিপীড়িতা তেজস্বিনী রমণী রত্ন। প্রবৃত্তি পরায়না বিমলা অতি মধুরা, ক্রীড়াকৌতুকিনী বিমলা অতি রসিকা, এবং নিপীড়িতা বিমলা রমণী দুর্লভ সাহসিনী, বুদ্ধিমতী, এবং পুরুষার্থে পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! বিমলার হৃদয় কেমন মধুর জানিতে হইলে, দেখ বিমলা তিলোত্তমার জন্য কেমন স্নেহপূর্ণ হইয়া তাহার দৌত্য কার্য্যে একাকিনী তমিস্রা রজনীতে অগ্রসারিণী হইতেছেন। ইহা তাহার হৃদয়ের কার্য্য—ইহা বিমলার আমোদ ও সুখ। আর যদি তুমি বিমলার ক্রীড়া কৌতুকিনী লঘু প্রকৃতির আধ আধ নৃত্য দেখিতে চাও, বিমলা কেমন সামান্য সামান্য মধুর গুণে ভূষিতা তাহা যদি দেখিতে চাও; যে মলয় দেশ হইতে প্রভঞ্জনের বলবীর্য্য ভীষণ বেগে বিনির্গত হয়, সেই মলয় দেশ সময়ে সময়ে কেমন ফুর ফুর করিয়া সন্ধ্যার সমীরণও মৃদুতরঙ্গে একে একে ছাড়িতে থাকে, ছাড়িয়া চন্দ্রবিভাসিত যমুনা-লহরীর সহিত কৌতুক করিতে থাকে, প্রাসাদোপরি কুলকামিনীর অলকাগ্র

উড়াইয়া এবং বৃক্ষশিরে নব কিশলয়কে নাচাইয়া নাচাইয়া আনন্দে বহিয়া যায়, ইহা যদি তুমি দেখিতে চাও, তবে যাও, যেখানে বিমলা কেশবিন্যাস করিয়া বীরেন্দ্রসিংহের নিকট রূপ দেখাইতে গেলেন, যেখানে বিমলা আশমানির সঙ্গে গজপতির সহিত রঙ্গরস করিতেছেন, এবং যখন বিমলা দিগগজের সঙ্গে শৈলেশ্বরাভিমুখে মন্দ সমীরণের মত বহিয়া যাইতেছেন; সেই স্থানে এবং সেই সময়ে বিমলাকে দেখিয়া বল দেখি বিমলা কি শুদ্ধ রমণীয়তায় ভূষিতা নহে? কিন্তু যদি তুমি দেখিতে চাও সেই সন্ধ্যা সমীরণ আবার কেমন প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিতে পারে; সেই চন্দ্রবিভাসিত, লহরী-নর্ত্তিত, যমুনার জলে কত বল ও বেগ ধারণ করে, কালিন্দী আবার কেমন বিভীষণ রূপে মূর্ত্তিমতী হইতে পারেন, যদি বিমলার উচ্চ গুণ সকল তুমি দেখিতে চাও, তাহার সারবত্তা ও পৌরুষকার দেখিতে চাও, তাহার বুদ্ধিবল ও চাতুরী দেখিতে চাও, তাহার দৃঢ়তা ও প্রতিহিংসা দেখিতে চাও, তাহার দুর্দ্দমনীয়তা ও সাহস দেখিতে চাও, তাহার রমণীদুর্ল্লভ হৃদয়বল দেখিতে চাও, তবে যাও, যেখানে চতুরে চতুরে সাক্ষাৎ হইতেছে, সেইখানে বিমলা ওসমানের সহিত তেজস্বিনীর বলদর্পিত বাক্যে কেমন কথা বার্ত্তা কহিতেছেন তাহা দেখ যেখানে বিমলা প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মানা হইয়া স্বচক্ষে ও স্থিরচিত্তে বীরেন্দ্র সিংহের শিরশ্ছেদ দেখিতেছেন তাহা দেখ, যখন বিমলা স্বামীহন্তার কঠোর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া আসিতেছেন তাহা দেখ, এবং এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বল দেখি একি সেই ক্রীড়া কৌতুকিনী বিমলা? এ বিমলার শত্রু হইতে তোমার ভয় হয় কি না? এ বিমলাকে মিত্ররূপে লাভ করিতে তোমার বাসনা হয় কি না? ইহাতে প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধিপদ কার্য্যকৌশল আছে কি না? যদি থাকে তবে বল বিমলা সামান্যা রমণী রত্ন নহেন।

কুসুমে যে সুরভি আছে, তাহা সমীরণের আঘাত প্রাপ্ত না হইলে স্ফূর্ত্তি পাইয়া চারিদিকে বিস্তারিত হয় না। বিমলার হৃদয়ে যে বল, যে দৃঢ়তা, যে ধৈর্য্য যে সাহস ছিল, বিমলা নিপীড়িতা না হইলে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। নিগ্রহ ও নির্য্যাতনে যে হৃদয় দমিয়া যায়, সে হৃদয় নিতান্ত দুর্ব্বল ও অপৌরুষেয়, কিন্তু যে হৃদয় বিপত্তিতে আর ও স্ফূর্ত্তি পাইয়া উঠে, যেন তখনই তাহার বল দেখাইবার সময়, সেই হৃদয় যথার্থ তেজস্বী বলিতে হইবে, এবং সেই হৃদয় বিমলার ছিল। বিমলা সেই হৃদয়ে বীরপত্নীর ব্রতে ব্রতী হয়েন এবং চতুরে চতুরে সহসা সাক্ষাৎ হওয়াতে ওসমানকে বলদর্পিত বাক্যে তেজস্বিতা দেখান। বিমলা ঘোর বিপত্তিতে পড়িয়া বরাবর অতি স্থৈর্য্যের সহিত, দৃঢ়তার সহিত, এবং সাহস ও তেজস্বিতার সহিত সকল বিপত্তির উপর জয়ী হইয়া উঠিয়াছেন। বিমলার শরীরে

যে রমণী দুর্লভ অসামান্য গুণগ্রাম ছিল, তাহা দেখাইবার জন্যই কবি তাহাকে যথোপযোগী বিপদের মধ্যে ফেলিয়াছেন। ফেলিয়া দেখাইলেন, তৎপূর্ব্বে বিমলা যে সমস্ত গুণে পাঠকের হৃদয় হরণ করিয়াছেন, তাহা বিমলার অতি সামান্য গুণ, তদপেক্ষা উচ্চতর গুণে বিমলার রূপ উজ্জলিত হইয়াছে, এবং তাহাকে বীরেন্দ্র সিংহের উপযোগিনী রাজমহিষী করিয়াছে। তিনি তোমার আমার গৃহে শোভা পান না। তাহার যে স্থান উপযুক্ত, বঙ্কিমবাবু তাহাকে সেই স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। তাহার মত রমণীমণি রাজকুলেই শোভা পায়। তিনি রাজমহিষী হইবারই উপযোগিনী। রাজমহিষীর যেরূপ বীরধর্ম্মিনীর তেজস্বিতা ও হৃদয়বল থাকা আবশ্যক, বিমলার তাহা ছিল। বিমলার চিত্রে বঙ্কিমবাবু রাজকুলোচিত বীরাঙ্গনার উচ্চ গুণ সকল স্পষ্টাভিধানে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিমলার আদর আমরা জানি না। বিমলার আদর বীরধর্ম্মী নরপতির কাছে। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস উচ্চবংশীয়ের নিকট যত আদরনীয়, সামান্য জনগণের নিকট তত আদরনীয় নহে। ইহার প্রধান কারণ বিমলা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

ধর্ম্মজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যেমন হরণেচ্ছার পরে ভিন্ন, স্বজনেচ্ছা জাগরূক হয়না, সেইরূপ পরিবার, প্রজা, ভৃত্য, স্বগ্রাম বা স্বদেশবাসী, ইত্যাদি আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে হরণেচ্ছা ও ক্রোধ সংযমিত না হইলে উহা তদপেক্ষা অনাত্মীয়গণের প্রতি নিবারিত হইতে পারে না।

স্বজন প্রবৃত্তির মাহাত্ম্য হেতুক লোক, সমাজে একত্রিত থাকে; এবং একত্রিত হইয়া অর্থাহরণে নিযুক্ত হয়; কিন্তু তাহাতে মনুষ্যের মন পরস্পরের প্রতি বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হয় না; কেবল আপনার প্রয়োজন সিদ্ধি পর্য্যন্ত সামাজিকতা রক্ষা করে।

প্রভুত্ব ও যশঃ বাসনা। প্রভুত্ব বাসনাতে আজ্ঞাবাহীগণের পরানুবর্ত্তীতা রক্ষার জন্য তাহাদিগের মনোরঞ্জনাদি নানা প্রকার চেষ্টা পদে পদে উপস্থিত হয়। সুতরাং এতদ্বারা স্বভাবতঃই সামাজিকতা অধিকতর দৃঢ় হইয়া

উঠে। যাঁহারা লোকের প্রভুত্ববাসনা উচ্ছেদ পূর্ব্বক সমাজ পালন করিবার কল্পনা করেন তাঁহাদিগের কল্পনা নিতান্ত ব্যর্থ। তথাপি দুই জন প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী কদাচ পরস্পরের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া একত্রে বাস করিতে পারে না। অতএব এই বাসনা সামাজিকতার হেতু স্বরূপ হইলেও ইহার বিরোধ উৎপাদনগুণ সহজেই সপ্রমাণ হইবে। যশঃবাসনারও সেইরূপ বিরোধ, কেবল প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষীর প্রভুত্ব সহ্য করা যত লোকের পক্ষে এবং যে পরিমাণে ক্লেশজনক, যশাকাঙ্ক্ষীর যশ করা তেমন নহে। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষীগণ আপন তৃপ্তির নিমিত্ত বল এবং ছল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু যশাকাঙ্ক্ষীগণের পক্ষে বলপ্রয়োগ অযথা কার্য্য। ইহারা আত্ম যশের প্রতিবাদ না শুনিলে অন্যের যশে কাতর বা স্বয়ং তাহাদের যশ করিতেও অনিচ্ছু হয় না, সুতরাং যশাকাঙ্ক্ষীদিগের সামাজিকতা অপেক্ষাকৃত প্রবল। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষীরা সমকক্ষ ব্যক্তিকে দেখিতে পারে না কিন্তু যশ কীর্ত্তন দ্বারা কাহারো উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিলে তাহাতেও সম্মত হইয়া থাকে। ফলতঃ তোষামোদও অনেক স্থলে প্রভুত্ব বাসনার অঙ্গ হইয়া উঠে।

একপক্ষে প্রভুত্ব বাসনা এবং অন্য পক্ষে যশবাসনা উপস্থিত হইলে অথবা উভয় পক্ষে যশবাসনা প্রবল হইলে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ নিবারিত হইতে পারে। তদ্রূপ এক পক্ষে হরণেচ্ছা, অন্য পক্ষে সৃজনেচ্ছা এবং আত্মাবাহিতা (অর্থাৎ প্রভুত্ব বাসনার অভাব) ঘটিলে নির্বিরোধে সমাজ চলিতে পারে। বাস্তবিক জনসমাজে এই সকল প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন রূপেই উত্তেজিত হইয়া থাকে, তাহাতেই এই স্বার্থপরতাপূর্ণ জগৎ বিসর্জ্জিত হইতেছেনা। নতুবা সকলের মনে কোন একটী প্রবৃত্তি সমানরূপে প্রবল হইলে তাহাদিগের বিরোধ কখন নিবারিত হইত না। বরং বিরোধের আতিশয্যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধ হেতুক এক পক্ষ ক্ষয় হইত কিম্বা সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া সমাজ গ্রন্থি উন্মোচন করিত। এতাদৃশ বিরোধের অন্ত নাই, ফলতঃ এইরূপ প্রকৃতি অসভ্যদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক অসভ্যতা প্রাগুক্ত মনবেগ সমূহের অব্যবস্থার লক্ষণবিশেষ ভিন্ন নহে।

সভ্য সমাজেও অদ্যাপি মনবেগ জনিত বিরোধ সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হয় নাই। কখন নিবৃত্ত হইবে তাহাও বলা যায় না। কিন্তু উহা সঙ্কীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং অনেক সঙ্কীর্ণ হইয়াছে একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। ফলতঃ আমাদিগের বিবেচনাতে স্বার্থপরতার বিরোধ যতই সঙ্কীর্ণ হয় ততই প্রকৃত সভ্যতার উন্নতি। স্বার্থপরতা খর্ব্ব না হইলে পরার্থপরতা বৃদ্ধি পায় না, এবং পরার্থপরতার অভ্যাস বৃদ্ধিই প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ। উল্লিখিত বিরোধেরশান্তি

বাহ্যিক মাত্র হইলে শান্তি নামে গণ্য হইতে পারে না; লোকের মনে মনে পরস্পরের প্রতি বৈর ভাব নিবারিত হইলেই প্রকৃত শান্তি; এবং সেই শান্তিই সভ্যতার প্রধান অঙ্গ।

উল্লিখিত শান্তির পরিবর্ত্তে এক প্রকার কাল্পনিক শান্তিকেই অনেকে সভ্যতার সহচর বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কথাতে এইমাত্র সার ভাগ আছে স্বীকার করি যে দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন পক্ষে স্বার্থপর মনবেগের আতিশয্য ঘটিলেই তাহাদিগের বিরোধ বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু যেখানে কোন বিরোধ বাহিরে দেখা যায় না সেখানে হয় দুই কি এক পক্ষের পরার্থপরতা প্রকৃত প্রস্তাবে *জাগৃত হইয়াছে নতুবা দুই কি এক পক্ষ কাল্পনিক শান্তি প্রদর্শন করিতেছে, প্রকৃত পরার্থপরতা থাকিলেত কোন কথাই নাই; কিন্তু এরূপস্থলে যাহারা কাল্পনিক বা বাহ্যিক শান্তি প্রদর্শন করে তাহাদিগের ও স্বার্থপর বেগ কথঞ্চিৎ হীনবল হইয়াছে মানিতে হইবে। অতএব কাল্পনিক ভদ্রতা, বিরোধ শান্তির প্রকৃত লক্ষণ না হউক, অন্ততঃ বিরোধ হীনতেজ হইয়াছে প্রকাশ করে। সুতরাং সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে অধিক পরিমাণ কাল্পনিক শিষ্টাচার দেখিতে পাইলেও স্বার্থপরতার খর্ব্বতা বিষয়ক উন্নতি অপ্রমাণিত হইল বলা যায় না।

ফলতঃ সভ্য অসভ্য উভয় শ্রেণিস্থ লোকের মধ্যেই দোষী অপেক্ষা নির্দ্দোষীর সংখ্যা অল্প। যাঁহারা কাল্পনিক ভদ্রতার আধার বলিয়া সভ্যতার নিন্দা করিয়া থাকেন তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে সভ্য সম্প্রদায়ের এত কাল্পনিকতার মধ্যেও অকৃত্রিম সততা পাওয়া যায়। অসভ্যগণের অকৃত্রিমতা অপেক্ষাকৃত অধিক হইতে পারে, কিন্তু সেই অকৃত্রিমতা অন্য প্রকারে দূষিত। অনেক সময়ে ঐ অকৃত্রিমতা বিরোধজনক মনবেগের আতিশয্য প্রকাশ করে, সুতরাং তাহা কাল্পনিকতা অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। অসভ্যদিগের মধ্যে যে প্রকার শান্তি অকৃত্রিমরূপে অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রকাশ পায়, সভ্যদিগের মধ্যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শান্তি বহু সংখ্যাতে কৃত্রিমরূপে প্রদর্শিত হয়; এবং তদ্ভিন্ন অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর শান্তিও অকৃত্রিমরূপে অবস্থান করে। সভ্য ব্যক্তিরা যেখানে কৃত্রিমভাবে মনবেগ গোপন করিতে পারে তাদৃশ স্থলে অসভ্যেরা প্রকাশ্য রূপে বিরোধ বা যুদ্ধ করে। কৃত্রিমতা অতি নিন্দনীয় বটে; কিন্তু কদাচার অকৃত্রিম হইলে কোন মাহাত্ম্য লাভ করেনা বরং কৃত্রিমতা সংযোগে বাহিক বিরোধ ক্ষান্ত হইলে কর্ত্তার ধর্ম্মশীলতা যেরূপ হউক, যাহারা ঐ বিরোধের ফলভোগী হইত, তাহাদিগের কতক ক্ষতি নিবারণ হইতে পারে। অতএব অকৃত্রিম সৌজন্য অভাবে কৃত্রিম সৌজন্যকে অগত্যা সমাদর করা দোষের নহে। কেননা অসৌজন্য অপেক্ষাকৃত

জঘন্য। সভ্য সমাজের কাল্পনিক ভদ্রতার এক মাত্র দোষ যে উহা প্রকৃত নহে, কৃত্রিম; কিন্তু ঐ ভদ্রতার কাল্পনিকতা ক্রমশঃ সর্ব্বসাধারণের সমীপেই পরিচিত হইয়া উঠে এবং তখন কৃত্রিম তার আবরণ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ হইয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনবেগ সংক্রান্ত বিরোধ হইবে না;—শান্তি অকৃত্রিম হইবে;—ইহার উপায় কি? এই উপায় সুস্থির হইলে জন সমাজে ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইবে।

(৪)

স্বার্থপরতার আতিশয্য পরস্পরের মধ্যে যেরূপ বিরোধ উপস্থিত হয় পরার্থপরতাতে তাহা হইতে পারে না। প্রণয়ীগণ আপনাপন মনবেগের প্রবলতা হেতুক পরস্পরের প্রতি ক্রমশঃ অধিকতর অনুরক্ত হয়। একজনের একাধিক প্রণয়াকাঙ্ক্ষী থাকিলে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ হইয়া থাকে বটে; তাহার কারণ এই যে প্রণয়ে কিঞ্চিৎ স্বার্থপরতা আছে। ফলতঃ এরূপ স্থলেও, প্রণয়াকাঙ্ক্ষীগণ পরস্পরের প্রতি যত ঈর্ষাপরায়ণ হউক, প্রণয়পাত্রের মঙ্গল সাধনে কখনই বিরোধ করে না। যাহারা বিরোধ করে তাহাদিগের প্রণয়, প্রণয় নামের যোগ্য নহে; কেননা উহাতে প্রণয়পাত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা বিষয়ে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। ভক্তগণও ভক্তিপাত্রকে ভক্তি করিবার সময়ে কখনই বিরোধ করে না। উপাস্য ব্যক্তির অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা ঘটিত স্বার্থপরতা প্রবল হইলে সেই অনুগ্রহের ন্যূনাতিরেক বা অগ্রপশ্চাত বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু এতাদৃশ স্থলেও ঐ মনবেগ পরার্থপর বলিয়া গণ্য করা যায় না। আমরা যে মনবেগকে ভক্তি নামে ব্যক্ত করিয়াছি তাহা পরার্থপর না হইলে আমাদিগের নির্দ্দেশ মতে ভক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রকৃত পরার্থপর ভক্তি, ভক্তিপাত্রের মনোভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে ব্যগ্র হয়। ভক্তিপাত্র স্বার্থপর, এবং সেবক তাঁহার ইচ্ছাপালক হইলে ভক্তের ক্রিয়া ঐ স্বার্থপরতা দোষে কিঞ্চিৎ দূষিত হইতে পারে; কিন্তু ভক্তিপাত্র সর্ব্বতোভাবে নিঃস্বার্থ হইলে এরূপ দোষ সম্ভবে না। আর যদি ভক্তি পাত্রের দেহাবসান হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার কি কি অভিলাষ পূর্ণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ক মীমাংসা ভক্তের বিচারাধীন হয়, সুতরাং উপাস্য ব্যক্তির পরার্থপরতা অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তিবেগ পালনের কোন ব্যাঘাত থাকে না; এবং এতাদৃশ ভক্তি চরিতার্থ করণ বিষয়ে ভক্তগণের মধ্যে কোন বিরোধ হইবারও সম্ভাবনা নাই। দয়ার উদ্দেশ্য পরের হিত সাধন; দয়া পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা। ইহাতে কোন মাত্র বিরোধ সম্ভবে না, এ কথা বলা বাহুল্য।

পরার্থপরতা কেবল প্রণয়ী, দয়াবান ও ভক্তগণের মধ্যে শান্তি উৎপাদন করে এমত নহে; অনেক স্বার্থপর বেগের

বিরোধও নিবারণ করে। দুই জন ব্যক্তি কোন স্বার্থপর প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বিরোধ করিতেছে এতাদৃশ স্থলে এক পক্ষে পরার্থপরতার উদ্রেক হইলে উভয়েরই স্বার্থপরতা অবিরোধে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কেননা প্রথম ব্যক্তি ঐ পরার্থপরতা হেতুক দ্বিতীয় ব্যক্তির স্বার্থপরতা পরিতোষ না হওয়া পর্য্যন্ত নিবৃত্ত থাকিতে বা তাহার সহকারী হইতেও পারেন। একটি পাত্র হইতে জলপান করিবার নিমিত্ত দুই ব্যক্তির বিরোধ স্থলে এক পক্ষের কিঞ্চিৎ পরার্থপরতা উপস্থিত হইলে উভয়েরই মঙ্গল হয়। বংশ রক্ষা বিষয়ক প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এ কথা সপ্রমাণ করা অনাবশ্যক, কারণ বিবাহ বিধান দ্বারা সকলেরই ঐ প্রবৃত্তি পরিতোষের উপায় হইয়াছে। ঐ বিধানের অন্তর্গত প্রণয় বেগের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রকাশ হইবে যে তদ্দ্বারা বিবাহাকাঙ্ক্ষীগণ সকলেই পরস্পরের প্রতি অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া বিবাহের চেষ্টা করাই অপেক্ষাকৃত শ্রেয়স্কর মনে করে। এতাদৃশ সংকল্প অন্ততঃ কিঞ্চিৎরূপ, পরার্থপরতা মূলক ভিন্ন হইতে পারে না। স্বজনেচ্ছার বিরোধও ঠিক ঐরূপে নিবারিত হইয়াছে। অন্যের যশ অপহরণ করিবার বাসনা উপস্থিত হইলেও পরার্থপরতার দ্বারা বিবাদ নিবারিত হয়। ফলতঃ সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা, প্রত্যেক ব্যক্তি কি পর্য্যন্ত স্বার্থপরতা পরিতোষ করিলে সাধারণের মঙ্গল হয় তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহাদিগের পরার্থপরতাই সেই সীমা লঙ্ঘন নিবারিত করে। এই সীমা সংস্থাপন ও প্রতিপালনার্থ পরার্থপরতা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। লোকে কেবল স্বানুবর্ত্তী হইলেই জগতের মঙ্গল হয় না; সর্ব্বসাধারণের স্বানুবর্ত্তিতা রক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরার্থপর চিত্তে অন্য ব্যক্তির স্বানুবর্ত্তিতা মান্য করিতে হয়। তদ্ভিন্ন পরস্পরের সুখবর্দ্ধন হইতে পারে না।

প্রভুত্ব বাসনার সুব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। বাস্তবিক যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভুত্ব করিবার উপযুক্ত তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করা ভক্তির অঙ্গ। স্বভাবতঃ পরার্থপর ব্যক্তি ভক্তিপাত্রের অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী অন্য ব্যক্তিকে আপনার আজ্ঞাধীন করিতে বাসনা করে। অতএব একপক্ষে ভক্তি এবং অন্য পক্ষে ন্যায়ানুগত প্রভুত্ব বাসনা উপস্থিত হইলে উভয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট শান্তি স্থাপিত হইতে পারে।

কিন্তু প্রভুত্ব লাভ করিবার দুই উপায় দৃষ্ট হয়। (১) আশ্রিতগণের উপকার সাধন। (২) বলপ্রয়োগ। প্রথম উপায় পরার্থপরতা সংশ্রুত; দ্বিতীয় উপায় একান্ত স্বার্থপর। প্রথম উপায় অবলম্বন করিলে প্রভুত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত বিরোধ করিবার প্রয়োজন হয় না। বলপ্রয়োগের দ্বারা আশ্রিত গণকে বশীভূত রাখিতে হইলে প্রভুত্ববাসনা হরণেচ্ছার সহচর হইয়া পদে পদে বিরোধ উৎপত্তি

করায়। হরণেচ্ছা সর্ব্বতোভাবে দয়ার বৈরী। দয়া এবং হরণেচ্ছা কদাচ একত্রে থাকিতে পারে না; তবে একপক্ষের নিকট বলপূর্ব্বক হরণ করণান্তে অন্য পক্ষের প্রতি দয়া প্রয়োগ সম্ভাবিত হইতে পারে বটে। এই প্রণালীতে হরণেচ্ছা এবং প্রভুত্ব বাসনা উভয়ই আশ্রিতগণ সম্বন্ধে অবিরোধে চরিতার্থ হইতে পারে। কেননা এতাদৃশ স্থলে আশ্রিতের পক্ষে প্রকৃত ভক্তির সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে।

তদ্ভিন্ন কখন কখন লোক বুদ্ধি বা বলের হীনতা হেতুক অন্যের হরণেচ্ছা প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করে; তখন হরণকারী (যুদ্ধজেতা) অবিরোধে প্রভুত্ব বাসনা এবং হরণেচ্ছা দুই সন্তৃপ্ত করিতে পারে। এতাদৃশ স্থলে পরাজিত পক্ষের মনে প্রকৃত ভক্তির পরিবর্ত্তে কাল্পনিক ভক্তির উদয় হয়। বাস্তবিক প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষীগণ হরণেচ্ছা হেতুক মোহান্ধ না হইয়া পরার্থপরতার অনুবর্ত্তী হইলে কিয়ৎ পরিমাণে স্বার্থপর বেগও চরিতার্থ করিতে পারেন। জগতে বুদ্ধি ও বলের এত তারতম্য আছে যে প্রায় সকলেই আপন অপেক্ষা কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে দয়ার বিধানানুসারে আশ্রয় দান পূর্ব্বক তাহার ভক্তি ভাজন হইতে পারে। এতদর্থে আশ্রিতের প্রতি অকৃত্রিম দয়া এবং পক্ষান্তরে প্রভুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি উদয় হওয়া আবশ্যক। এরূপ ভক্তি এবং দয়া করিবার পাত্র প্রায় সকল ব্যক্তির পক্ষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ভক্ত-প্রভু-সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে সমকক্ষতাও হরণ করিবার অভিলাষ উপস্থিত হইয়াই সমস্ত অনর্থ ঘটায়।

অপর আশ্রিতকে আশ্রয় দানের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করিলেও উৎপীড়িত আশ্রিত ব্যক্তিরা গুহ্যভাবে বল বা ছল প্রয়োগ করিয়া সমাজের শান্তি বিপ্লব উপস্থিত করে। ফলতঃ প্রভুত্ব-বাসনা, হরণেচ্ছা সম্বরণ পূর্ব্বক দয়ানুবর্ত্তী হইলেই মনবেগের বিরোধ নিবৃত্ত হইতে পারে।' কিন্তু হরণেচ্ছা প্রভুত্ব বাসনার অধীন হইয়া আশ্রিতকে শত্রুর উৎপাত হইতে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই মনুষ্য সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হন। এই প্রকারে হরণেচ্ছা (বা ক্রোধ) ও পরহিতার্থ নিবসিত হইতে পারে। বিশেষতঃ অন্যের অত্যাচার বা হরণেচ্ছা হইতে আত্মরক্ষার্থ ক্রোধ, আশ্রমরক্ষার হেতু স্বরূপ হইয়া থাকে। যুদ্ধ অতি গর্হিত কর্ম্ম বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধ দ্বারাই প্রভুত্ব বাসনা তৃপ্ত হইয়া রাজ্যস্থাপন হয়; পরে সভ্যতার উন্নতি সহকারে পরস্পরের রাজ্যহরণ নিষিদ্ধ হইয়া জগতে শান্তি বিস্তার করে। কিন্তু ঐরূপ রাজ্যহরণ বা শত্রুর আক্রমণ নিবারণার্থ অর্থাৎ আত্মীয় ব্যক্তি কিম্বা স্বদেশ রক্ষা করিবার নিমিত্তে হরণেচ্ছার অন্তর্গত ক্রোধ বেগেরও প্রয়োজন হয়।

অতএব স্বার্থপর বেগের আতিশয্য

নিবারণার্থে পরার্থপরতার প্রাধান্য সংস্থাপন করাই কর্ত্তব্য। পরার্থপরতার মধ্যে দয়াই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু দয়ানুবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত অন্যান্য মনবেগ বিসর্জ্জিত করা আবশ্যক নহে। পরার্থপরতার প্রাধান্য সংস্থাপিত করিতে পারিলে মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ শান্তি হইবে। তদ্ব্যতীত ইহা হইতে আর একটী মঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে।

আমাদিগের স্বার্থপর প্রবৃত্তি গুলি কেবল যে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত বিরোধ ঘটায় তাহা নহে। আমাদিগের স্ব স্ব মনে ভিন্ন ভিন্ন মনবেগ এককালে জাগরূক হইলে তৎসমুদায় একত্রে বা তুল্যরূপে সন্তৃপ্ত হইতে পারে না; সুতরাং অগত্যা কোন কোন বাসনা সম্বরণ করিতেই হয়। কিন্তু মনবেগের তেজ অভ্যাসাধীন। যে বেগ যত অধিক পরিতৃপ্ত হয় তাহার প্রবলতা তত অধিক এবং তাহার সম্বরণ ততই কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। অতএব সময়ে সময়ে তুল্য রূপে বিভিন্ন বেগের বশবর্ত্তী হইলে যেটী যখন সম্বরণ করা আবশ্যক হইবে তাহারই নিমিত্ত পূর্ণ মাত্রায় সম্বরণ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি সমস্ত মনবেগকে পরার্থপরতার তারতম্য মতে এমন করিয়া শৃঙ্খলিত বা ব্যবস্থাপিত করা যায় যে যখন হউক বিভিন্ন বেগ জাগরূক হইলেই পূর্ব্বাশ্রিত অভ্যাস বশতঃ নিকৃষ্ট বেগ গুলি সম্বরণীয় এবং শ্রেষ্ঠ বেগটী সাধনীয় বলিয়া ধ্রুব সংস্কার বলবৎ হইবে তাহা হইলে এই ব্যবস্থার অভ্যাস সহকারে সকলেই স্ব স্ব অন্তঃকরণেও স্বার্থপর বেগের উত্তেজনা হইতে অনেক অব্যাহতি পাইতে পারে।

উল্লিখিত চিত্তব্যবস্থা এইরূপ যথা।

যে স্থলে প্রশংসাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে প্রণয়ের বিঘ্ন উপস্থিত, সেখানে প্রথমোক্ত প্রবৃত্তি দমন করা কর্ত্তব্য। যেখানে প্রভুত্ব বাসনার প্রবলতা হেতুক লোকনিন্দা উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে সেখানে বরং যশঃবাসনা সন্তৃপ্ত করাই ভাল। অথবা যেখানে সৃজনেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থ প্রয়াস হেতুক আশ্রিতগণের উপর প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ হয় সেখানে কার্পণ্য পরিত্যাগ করাই বিধেয়। এই প্রকারে সৃজনেচ্ছার সমীপে হরণেচ্ছা সম্বরণের কর্ত্তব্যতা, মৈথুনেচ্ছার তুলনায় বংশবৃদ্ধি বাসনাকে পরার্থপর, এবং গ্রাসাচ্ছাদনেচ্ছার অত্যাচার অপেক্ষা মৈথুনেচ্ছাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। অপর মনবেগ সমূহ অব্যবহিত রূপে কে কাহার শ্রেষ্ঠ তাহা অভ্যস্ত হইলে এক কিম্বা একাধিক বেগ ব্যবধানে উহাদিগের পরস্পরের তারতম্য অবশ্যই বাহুল্য পরিমাণে অনুভূত হইবে। যথা প্রণয়ানুরোধে দেহ-রক্ষণেচ্ছা সম্বরণ করা আবশ্যক ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে। অতএব পরার্থপরতার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া মনবেগ ব্যবস্থাপিত করিতে পারিলে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ শান্তি হয়, আপনাপন স্বার্থপর প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পথও থাকে অথচ অপেক্ষা-

কৃত নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বরণার্থ কষ্টের লাঘব হয়।

স্বার্থপর এবং পরার্থপর প্রবৃত্তির মধ্যে আত্মমনে বিরোধ উপস্থিত হইলে পরার্থ পরতার প্রাধান্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন, কেননা মনুষ্য স্বভাবতঃ অতি স্বার্থপর। তদর্থে জাগরূক স্বার্থপর প্রবৃত্তি পরিতোষের জন্য সময়ান্তর বা উপায়ান্তর লক্ষ্য করাই কৃতকার্য্য হইবার প্রধান উপায়। প্রাগুক্ত চিত্ত ব্যবস্থা এই কৌশলের উপযোগী।

স্বার্থপর প্রবৃত্তির মধ্যে যেরূপ তার তম্যের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে আমাদিগের পরার্থপর প্রবৃত্তি সমগ্রের মধ্যেও ঐরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এক ব্যক্তির প্রতি প্রণয়ানুরক্ত কিম্বা ভক্তিপূর্ণ হইয়া অন্যের প্রতি নির্দ্দয় হওয়া এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কার্য্য, তাহা সহজেই সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক উপলব্ধ হইবে। কেবল এস্থলে একটি কথা স্মরণ করা আবশ্যক যে অন্যকে দয়া করিবার জন্য প্রণয় পাত্রের প্রতি নির্দ্দয় হওয়া নিতান্ত অবৈধ, কেননা দয়া স্বভাবতঃ প্রণয় পাত্রের উপরে যেরূপ সতেজ হয় অন্যের প্রতি তাদৃশ হয় না। অতএব প্রণয়পাত্রকে উপেক্ষা করিয়া অন্যের প্রতি দয়া করা কিম্বা অনাত্মীয়ের প্রতি অক্রোধচিত্ত হইয়া আত্মীয়ের প্রতি ক্রোধ করা কদাচ নিঃস্বার্থ বাসনার লক্ষণ নহে। প্রভুত্ব বা যশঃবাসনার পোষকতা ব্যতীত এরূপ বাসনা উদয়ই হয় না, এবং দয়ার অনুবোধে প্রণয় সম্বরণের ভান করিলে প্রকৃত পক্ষে প্রস্তাবিত স্বার্থপর প্রবৃত্তিই পরিবর্দ্ধিত হইবে। বাস্তবিক কোন স্থলে প্রণয় পাত্র অপেক্ষা দয়া পাত্রকে সাহায্য করা অধিকতর প্রয়োজন হইলে দয়া পাত্রের আধিক্য রক্ষা করা অসাধ্য নহে। কেননা প্রণয়ের মহৎ গুণ এই যে বাহ্যিক ক্রিয়ার ক্রটীতে মনের বিকার জন্মে না। যাঁহারা পাত্র বিচার না করিয়া অসঙ্গত অক্রোধ কি অসঙ্গত দয়া প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের মনের ভ্রম দূর করা আবশ্যক। আত্ম-প্রতারণার ন্যায় প্রতারণা নাই।

ভক্তির কথা উল্লেখ করা অনাবশ্যক কেননা দয়ার সহিত এ প্রবৃত্তির বিরোধের স্থলই দেখিতে পাই না। বিরোধ উপস্থিত হইলেও তাহা নিবারণ করিবার প্রণালী উল্লিখিত মতে স্থিরীকৃত হইবে।

উপরিলিখিত চিত্তব্যবস্থার আবশ্যকতা অনেকেই সহজে স্বীকার করিবেন কেননা সকল ঈশ্বরবাদী মতেই প্রকারান্তরে ঐরূপ মীমাংসা দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরাদেশ বিষয়ে ঐকমত্য সাধিত হইলে ঐ মীমাংসার নিমিত্ত বাদানুবাদের প্রয়োজন হয় না কিন্তু সেই ঐকমত্য অভাবে ঈশ্বরাদেশ নির্ণয় করা এবং সেই আদেশ অনুযায়ী চিত্ত ব্যবস্থার মীমাংসা করা উভয়ই দুষ্কর হইয়া উঠে পরিশেষে লোকে অব্যবস্থিত চিত্তে যথেচ্ছাচার করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হয় না।

এই যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব কোন

কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এতই হইয়াছে যে তাঁহাদিগের নিকট চিত্তব্যবস্থার আবশ্যকতাই সন্দেহের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্তব্যবস্থা ধর্ম্মের লক্ষণ বিশেষ। ধর্ম্মের মাহাত্মই এই যে অন্ততঃ ইহকালে লোকের চিত্ত ব্যবস্থা সংস্থাপন করে। ব্যবস্থিত চিত্ত অন্য ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বাস এবং নির্ভর করিবার স্থল। যাহাদিগের চিত্তব্যবস্থা এক প্রণালীবিশিষ্ট তাহাদিগের মধ্যে বিরোধের পথ সঙ্কীর্ণ হয়। এতদ্ভিন্ন চিত্তব্যবস্থাতে যেমন নিজের মনকষ্ট নিবারণ হইতে পারে এমন আর কিছুতেই হয় না। সন্ন্যাস বিধানানুসারে মনবেগ ধ্বংশ করিতে পারিলেও তাহাতে দুঃখ নিবারণ ব্যতীত সুখোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই; অথচ সন্ন্যাস আশ্রম সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিধেয় কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু চিত্তব্যবস্থা সকলেরই আয়ত্তাধীন এবং সকলেরই সুখ বর্দ্ধক। ইহাতে পরার্থপরতা পরিতোষের সুখ, পূর্ণমাত্রায় এবং স্বর্থপরতা জনিত সুখ কিঞ্চিৎ পরিমাণে আস্বাদন করিতে পারা যায়।

যাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক জন সমাজে পরস্পরের বিরোধ অবলোকন করিয়াছেন তাঁহারা সেই বিরোধ শান্তির উপায় আগ্রহাশয়ে গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। এই বিরোধ যত সঙ্কীর্ণ হইবে ততই লোকে পরপোকার এবং স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। পরোপকার কেবল দয়াবেগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয় না। বুদ্ধিচালনা পূর্ব্বক ক্রিয়ার অগ্র পশ্চাৎ রক্ষা না করিলে নিরবচ্ছিন্ন দয়াবেগ হইতে লোকের উপকার না হইয়া পদে পদে অপকার ঘটিতে পারে। লোকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীতাতে যত উৎপীড়িত হয় ততই তাহাদিগের বুদ্ধি কেবল আত্মরক্ষা বা পরের ক্ষতি করিবার জন্য নিয়োজিত হয়, সুতরাং জগতের মঙ্গল বর্দ্ধন বিষয়ে বুদ্ধিচালনার অবসর হ্রাস হইয়া যায়। ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীতারএক মাত্র উদ্দেশ্য স্বার্থপরতা, সেই স্বার্থপরতা সম্বরণ করিলেই পরস্পরের মঙ্গল বর্দ্ধন হইতে পারে। জনসমাজে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মঙ্গল কখনই পৃথকরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে না; নতুবা স্বার্থপরতার প্রাদুর্ভাব সহকারে সমাজ অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হইত। প্রকৃত মঙ্গল বর্দ্ধন বা উন্নতির নিমিত্ত পরস্পরের মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। ইহার উপায় দয়া সঞ্চালন। দয়া অভ্যাস করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে প্রণয় শিক্ষা এবং চিত্তের ব্যবস্থা করা, তদনন্তর ভক্তি চরিতার্থ করিবার উপায় জানা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন পাত্র বিচার পূর্ব্বক যে যে স্থলে ত্রিবিধ পরার্থপরবেগ, অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে চরিতার্থ হইতে পারে, সেই সেই স্থলে উহার অভ্যাস আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পাত্রান্তরে ব্যাপৃত হওয়া এবং সেই সকল পাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। আপনাপন চিত্তের ব্যবস্থা করিতে পারিলে পরস্পরের মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইবে। এতদ্বয় এককালীন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় না ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বর্দ্ধনেরই নাম উন্নতি; তদ্ভিন্ন যে সকল মনবেগ কিম্বা কার্য্য প্রণালীর মধ্যে ঐক্য নাই তাহার শ্রীবৃদ্ধি কখনই স্থায়ী বা উন্নতি জনক হইতে পারে না। অতএব লোকালয়ে প্রণয় মজ্জা; ব্যবস্থা ভূমি এবং উন্নতি ফল স্বরূপ।

(৫)

সমস্ত মনবেগ স্বার্থপর এবং পরার্থপর এই দুই শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। দয়া প্রবৃত্তির প্রাধান্য এবং অন্যান্য প্রবৃত্তির তারতম্য বিষয়ক ব্যবস্থা দ্বারা মনবেগ ঘটিত আত্মমনের এবং বিভিন্ন ব্যক্তির বিরোধ কি উপায়ে নিবারিত হইতে পারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ ব্যবস্থা কার্য্য সম্পাদন করিবার উপায় বিষয়ে কএকটী কথা বলা আবশ্যক।

স্বার্থপর প্রবৃত্তি কদাচ পরার্থপর প্রবৃত্তি হইতে হীনবল হইবার নহে অথচ আমাদিগের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা মতে দয়াকেই সর্ব্ব প্রধান করা আবশ্যক। এই সঙ্কটের বিষয়ে তিনটী কথা স্মরণ করিতে হইবে।

১। মনুষ্যপ্রকৃতির উপরে অভ্যাসের আশ্চর্য্য শক্তি আছে। যে কার্য্য বা যেরূপ মনবেগ অভ্যাসিত হয় ক্রমে ক্রমে তাহার সঞ্চালন অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সুখপ্রদায়ক হইয়া উঠে এবং যাহার সঞ্চালন হয় না তাহার তেজ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অতএব পরার্থপরতা সঞ্চালন এবং স্বার্থপরতা সম্বরণ অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ পরার্থপরতার তেজ বৃদ্ধি এবং স্বার্থপরতার উত্তেজনা হ্রাস হইবে।

২। কিন্তু যতকাল অভ্যাস করা যাউক স্বার্থপরতা কদাচ বিলুপ্ত বা পরার্থপরতা অপেক্ষা হীনবল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যদি কেহ মনে করেন যে স্বার্থপরতা অভাবে সংসার প্রতিপালন করা অসাধ্য হইবে তাহা হইলে তাঁহার উদ্বেগ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

৩। অভ্যাসের মহদ্দোষ এই যে অভ্যস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ কালে কার্য্য কারণ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না। এবং সেই হেতুক ক্রিয়াগুলিও সুচারুরূপে সমাধা হয় না।

পরার্থপর মনবেগ অভ্যাস করিবার নিমিত্ত পরার্থপর ক্রিয়া অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, তাহাতে যদিও সকল সময়ে পরার্থপরবেগ উদয় না হয় তথাচ অভ্যাস সহকারে ক্রমশঃ এই দোষের পরিহার হইবে; অন্ততঃ পরার্থপর ক্রিয়া নির্ব্বাহ করাতে লোকের মঙ্গল বর্দ্ধন হইবে। কিন্তু অভ্যাসের দোষ নিবারণার্থ এবং পরার্থপর বেগ উদ্দীপন করিবার জন্য, পরার্থপর ক্রিয়ার উদ্দেশ্য এবং উহার পরার্থপর লক্ষণ ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

পরার্থপর অর্থাৎ সৎকর্ম্ম অভ্যাসের বিষয় উপরে বলা গেল কিন্তু কুকর্ম্ম এবং স্বার্থপরতা সম্বরণ অভ্যাস উপলক্ষে মনবেগের একটী স্বধর্ম্ম জানা আবশ্যক। কু-ক্রিয়া সম্বরণ করা যাইতে পারে বটে কিন্তু তদাশ্রিত মনবেগ এবং চিন্তা স্রোত নিবারণ করা অসাধ্য প্রায়; অথচ তাহা

নিবারণ করা যারপর নাই প্রয়োজন। বিস্মৃতি নিবারণ অপেক্ষা স্মৃতি দমন করা কঠিন এবং কোন চিন্তা উপস্থিত হইলে তাহা অপনয়নের উপায় নাই। মনোবেগও প্রায় তদনুরূপ। বস্তুতঃ অধিকাংশ চিন্তা ও ভাবনা মনোবেগের চাঞ্চল্য হেতুকই উদ্ভাবিত হয়। মনোবেগ সম্বরণের একমাত্র উপায় অন্য বেগের আশ্রয় গ্রহণ। অতএব যে স্বার্থপর বেগ যখন প্রবল হয় তদপেক্ষা হীন-স্বার্থ বেগের অনুগামী হওয়াই বিধেয়। কিন্তু কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন্ বেগ অবলম্বন করা সহজ, তাহার উপদেশ অন্যে দিতে পারে না। ইহার নিমিত্ত [illegible] মনের প্রকৃতি আপনি বুঝি[illegible]

এতদ্ভিন্ন আপনার মনো[illegible] অবস্থা স্থির করিতে না পারিলে সম্বর[illegible] পায় চিন্তার স্থলও থাকে না। অতএব আত্ম মনোবেগের লক্ষণ স্থির করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এতদ্বিষয়ে যাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন তাহার পক্ষে বৃথা চেষ্টা।

পরন্তু এক মনোবেগ দমনার্থ অন্য মনোবেগ উদ্দীপন করণাশয়ে কেবল চিন্তাতে নিবিষ্ট থাকিলে কখন কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। বরং তাহাতে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতা হেতুক বলবান (সুতরাং অপেক্ষাকৃত স্বার্থপর) বেগই ক্রমশঃ প্রবল হইতে পারে। কারণ কোন চিন্তা বাক্যরূপে মনমধ্যে জাগরূক হইলেও বিরুদ্ধ মনোবেগ এবং তদুপযোগী ভাবনা অপরিস্ফুটরূপে অথচ সমধিক তেজে মনে আশ্রয় করিতে পারে। এই কারণে অনেক সময়ে দেখা যায় যে কোন মনোবেগ সম্বরণার্থ অনেক চিন্তা করিবার পরেও সেই সম্বরণীয় বেগই ক্রিয়াতে স্ফূর্ত্তি পায়। এক [illegible] বেগকে অন্য বেগের দ্বারা আচ্ছাদন করা প্রয়োজন হইলে শেষোক্ত বেগের উপযোগী ক্রিয়াতে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। ক্রিয়া মনোবেগের অনুবর্ত্তী বটে কিন্তু ক্রিয়া হইতে নূতন সংজ্ঞা ও নূতন চৈতন্য উৎপাদিত হয় তাহাতে বিরুদ্ধ চিন্তা ও বিরুদ্ধ বেগ কথঞ্চিৎ নিবারিত করিতে পারে।*

(৬)

এখন আর একবার অন্ধ, শ্যাম ও [illegible]র কথা স্মরণ করা যাউক।

শ্যাম প্রকৃত দয়া-বেগ হেতুক অন্ধের [illegible]। তাহার মনে কোন চি[illegible] হয় নাই বটে কিন্তু তাহাতে তাহার [illegible] বেগের দোষ দেওয়া যায় না। এক দোষ, সংক্রামক রোগ স্পর্শ, অর্থাৎ ভবিষ্যতে শ্যামের রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কেবল শ্যামের নহে, যাহারা শ্যামের সেবা করিয়া থাকে তাহাদিগেরও যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবার কথা। তদ্ভিন্ন, ঐ রোগ বিস্তারের একটী নূতন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইতে পারে। যষ্টির দ্বারা পথ

* যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রাদিষ্ট নানা নিরর্থক ক্রিয়া উপলক্ষে শাস্ত্রকারগণকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন তাঁহারা মনোবেগের উপরে ক্রিয়ার আধিপত্য অবলোকন করিলে বোধ হয় কতক পরিমাণে আপনাদিগের মত পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইবেন।

প্রদর্শন করিলে এই দোষ নিবারিত হইত। কিন্তু এই দোষের সার কথা এই যে চিন্তার ক্রটী প্রযুক্ত ক্রিয়ার ফল ও দেহ-রক্ষা প্রবৃত্তির সম্যক উপলব্ধি হয় নাই। তথাচ শ্যাম অচিন্তিত রূপে মনবেগের যথাযোগ্য প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছেন বলিতে হইবে। আমি যে নির্ম্মম চিত্তে অন্ধের নিকট হইতে পলায়ন করিলাম, তাহার হেতু—ভয়; অর্থাৎ দেহরক্ষা প্রবৃত্তি এবং উল্লিখিত ক্রিয়াফল সমূহের ভাবনা। এক পক্ষে পরার্থপর-বেগ সঞ্চালন, স্বার্থপর বেগ সম্বরণ এবং ক্রিয়া ফলের প্রতি উপেক্ষা। অন্য দিগে, ভাবনা এবং স্বার্থপরতার আতিশয্য। সুতরাং চিত্তব্যবস্থার বিধানমতে আমা অপেক্ষা শ্যামের প্রাধান্য স্বীকৃত হইতেছে।

গণিকা অন্ধকে অর্থ দান করিয়াছে উহার ক্রিয়ার গুণাগুণ কি? গণিকা দয়া, চিত্তব্যবস্থা, স্বার্থপরতা-সম্বরণ ইত্যাদি বুঝে না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। গণিকার একমাত্র উদ্দেশ্য হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী পুণ্য সঞ্চয়। গঙ্গা স্নান করিলে, অন্ধকে দান করিলে পুণ্য হয়, গণিকা তাহাই করিয়াছে।

পুণ্য কিসে হয়? হিন্দু শাস্ত্রে কতক গুলি ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতেই পুণ্য সঞ্চয় হয়। পরন্তু মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে প্রকাশ হইবে, আমরা যে চিত্ত-ব্যবস্থার কথা বলিয়াছি তদনুযায়ী ক্রিয়া, অর্থাৎ "ধর্ম্ম" (virtue) এবং হিন্দুশাস্ত্রা দিষ্ট পুণ্যকর্ম্ম, অনেক স্থলেই বাহ্যিক দেখিতে প্রায় একরূপ। কেবল কথন কথন হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন যে পুণ্যেও প্রয়োজন নাই। যাঁহারা একথা বলেন তাঁহাদিগের উপাস্য "ধর্ম্ম"ও ঐ পুণ্যকর্ম্ম সংশ্রিত ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন।

কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রোক্ত পুণ্য সঞ্চয় বিধানের সহিত আমাদিগের প্রদর্শিত চিত্ত-ব্যবস্থার ভেদাভেদ কি? আমরা সৎ-কর্ম্মের অগ্র পশ্চাৎ অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী মনোবেগ এবং পরবর্ত্তী (বিরোধ আদি) ক্রিয়াফলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক বলিয়াছি। হিন্দু শাস্ত্রাদিষ্ট পুণ্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্য এতাদৃশ অগ্র পশ্চাৎ ভাবনার আদেশ দেখা যায় না, অন্ততঃ এরূপ অগ্র পশ্চাৎ স্বীকরণ, সাধারণ লোকের বিচারাধীন বোধ হয় না।

হিন্দুশাস্ত্রের প্রধান কথা দুটী। জ্ঞান কাণ্ড এবং ক্রিয়া কাণ্ড। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে এই দুই অংশের মধ্যে যেরূপ ঐক্য দৃষ্ট হয় হিন্দুশাস্ত্রে তাহা দৃষ্ট হয় না। না হইবার হেতু নির্দ্দেশ করাও কঠিন। "ক্রিয়া" শব্দে দেহ—তথা—জিহ্বা সঞ্চালন। কিন্তু "নিত্য ক্রিয়া" বল, কি "নৈমিত্তিক ক্রিয়া" বল, কিছুর মধ্যেই সংসারের প্রাত্যহিক ক্রিয়া—যথা আহার, নিদ্রা, বাক্যালাপ, শ্রম, ক্রয়, বিক্রয়, আদি ক্রিয়া গণনীয় বোধ হয় না। বিশেষতঃ এই সকল কিম্বা অন্যান্য ক্রিয়া সম্বন্ধে যে কিছু আদেশ পাওয়া যায় তাহাতে জ্ঞানকাণ্ড-অন্তর্গত জ্ঞান প্রয়োজনীয় বলিয়া দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের

অভিপ্রায় এইরূপ অনুমান হয়, যে জ্ঞান কেবল চিন্তার দ্বারা অর্জ্জিত হইতে পারে না; যেরূপ ক্রিয়া কর তদুপযোগী ভাবনা এবং মনোবেগ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইবে; সুতরাং অবিরত কি কি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে তাহার তালিকা করিয়া দিলেই লোকের ধর্ম্ম এবং পুণ্য সঞ্চয়ের উপায় হইবে। পুণ্য যথেষ্ঠ পরিমাণে সঞ্চিত হইলে তদনন্তর জ্ঞান কাণ্ড আলোচনা করিবার পথ হইবে।

এই সকল পুণ্য বা "নিত্য" ও "নৈমিত্তিক ক্রিয়া" উপলক্ষে শাস্ত্রকারেরা মনোবেগের বিষয় কি ভাবিয়াছিলেন?

আমরা যে পর্য্যন্ত হিন্দু শাস্ত্রের সার কথা বুঝিয়াছি তাহাতে এই জানি যে তত্ত্বজ্ঞানের অন্তিম উদ্দেশ্য দুঃখ-নাশ; মনোবেগ সন্তুপ্ত হইলে সুখ, নতুবা দুঃখ উৎপন্ন হয়; সুখদুঃখের সহিত দুঃখ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না; অতএব দুঃখ নাশের নিমিত্ত মনোবেগ নির্ম্মূল করাই আবশ্যক। হিন্দুগণ সুখ বৃদ্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে গণনা করেন না। বোধ হয়, প্রচলিত প্রবাদ "সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল" শাস্ত্রকারদিগের দুঃখ নাশ বিষয়ক ঐ গভীর উপদেশানুযায়ী; অথবা সর্ব্ব সাধারণের এই প্রকার সংস্কার হেতুক শাস্ত্রের প্রাগুক্ত বিধান উৎপন্ন হইয়াছে।

হিন্দুগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন জগদীশ্বর স্বয়ংই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে অমুক অমুক প্রণালীতে কার্য্য করিলে জীবনের যন্ত্রণা দূরীকৃত হইবে; যদি এক জন্মে এই ফল লাভ না হয় তবে জন্ম জন্ম ঐ ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করা আবশ্যক। তাহা হইলে পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হইবে এবং সেই সঙ্গে জীবনের যন্ত্রণাও অপনীত হইবে; কিন্তু সংসারে থাকিয়া সেই সকল প্রণালীমতে কার্য্য করা অসাধ্য; অতএব সংসার পরিত্যাগ করাই বিধেয়। শুকদেবের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আশ্রম ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়; অন্ততঃ জ্ঞান লাভ মাত্র বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে।

উভয় প্রকার মতেই পুণ্য কর্ম্মের সার উদ্দেশ্য দুঃখনাশ বোধ হইতেছে। কিন্তু এই বিধানমতে দারপরিগ্রহ এবং পুত্রোৎপাদন কেন নিষিদ্ধ হয় নাই তাহাই আমরা বুঝিতে পারি না। ফলতঃ সন্ন্যাস আশ্রম এবং সংসারাশ্রমের মধ্যে নিতান্ত বৈষম্য ভাব, তথাচ উভয়েরই গুণকীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে, আমরা সংসার মধ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক কি প্রণালীতে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারি তাহারই অনুসন্ধান করিব। উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরাদেশের কথা আমাদিগের বিচারান্তর্গত নহে। পাপ পুণ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ তর্ক করিলে অধ্যাপক মহাশয়েরা কখন কখন প্রকাশ করেন যে পুণ্য সঞ্চয়ার্থ "চিত্তশুদ্ধি" আবশ্যক। "চিত্তশুদ্ধি" ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত সুসিদ্ধ হয় না। চিত্তশুদ্ধির মর্ম্মানুসন্ধান করিলে, কথঞ্চিৎ মাত্র মনোবেগ এবং ভাবনার সংস্রব দেখিতে

পাওয়া যায়; বাস্তবিক তাহাতে কেবল পূর্ব্ব প্রকাশিত জ্ঞান কাণ্ড বা ঈশ্বরাদেশের লক্ষণই দৃষ্ট হয়। মনোবেগ বা ভাবনার দোষ গুণ বিষয়ে ঈশ্বরবাদী হউক কি নিরীশ্বরবাদী হউক, হিন্দু শাস্ত্রে, বৈরাগ্য ব্যতীত আর কোন বিষয়ের মাহাত্ম্য দেখা যায় না। গণিকা যশ বাসনার জন্য হউক বা কুক্রিয়া গোপন করিবার নিমিত্ত হউক স্নান দানাদি করিলেই হিন্দু শাস্ত্র মতে তাহার পুণ্য সঞ্চয়ের কোন ব্যাঘাত হইবে না। অর্থাৎ ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী মনোবেগ স্বার্থপর হউক কি পরার্থপর হউক, তাহাতে আপত্তি নাই, ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইলেই [illegible]। এই জন্যে বলি যে হিন্দু শাস্ত্রের জ্ঞান [illegible] এবং কর্ম্ম কাণ্ডের মধ্যে নিগূঢ় [illegible] পাওয়া কঠিন। হিন্দুশাস্ত্রো[illegible] অনেকস্থলেই দুঃখ নাশের [illegible] হইতে পারে; কিন্তু আক্ষেপের কথা এই যে উহার সহিত কর্ম্মকর্ত্তার মানসিক অবস্থার সংশ্রব অত্যল্প। পরবর্ত্তী ফল অনুসারে বিচার করিলে ক্রিয়া গুলি ভাল; পূর্ব্ববর্ত্তী মনের অবস্থা গণ্যকরিলে ভাল মন্দ দুইই হইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্র দুই প্রকার বিচারেই অস্বীকৃত।

হিন্দুশাস্ত্রের এই প্রকার বিধানের বিষময় ফল আমরা সকলেই ভোগ করিতেছি। মনোবেগ সুশৃঙ্খলিত না হইলে চরিত্রের কোন দৃঢ়তা জন্মে না; এবং বৈধ কি নিষিদ্ধ ক্রিয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রাদেশ পালনের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপর কি পরার্থপর যে প্রকার মনোবেগ হউক, অবিঘ্নে মনে আশ্রয় করিতে পারে। যে কোন নিয়মানুসারে কার্য্য কর তাহার উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা অভ্যাস না থাকিলে উহা প্রথামাত্র হইয়া উঠে। প্রথা, অজ্ঞাত কারণ অনুযায়ী নিয়ম মাত্র। কিন্তু কারণ না জানিলে নিয়ম যথাযোগ্যরূপে প্রতিপালন করা যায় না; এবং যে কার্য্য কেবল প্রথা রক্ষার নিমিত্ত সম্পাদন করা যায় তাহাতে সেই কার্য্যের উপযোগী অর্থাৎ সেই অজ্ঞাতকারণানুযায়ী মনোবেগ আশ্রয় না করিয়া কেবল প্রথাপালন-বাসনা কিম্বা প্রথালঙ্ঘন আশঙ্কাই আবির্ভূত হয়। ঐ বাসনা বা আশঙ্কা কোন প্রকারে নিবৃত্ত হইলেই উহার হেতু স্বরূপ প্রথা এবং সেই প্রথার মূল (কিন্তু অজ্ঞাত) উদ্দেশ্য উভয়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। শাস্ত্রাদিষ্ট পুণ্যকর্ম্ম প্রথা স্বরূপ প্রতিপালিত হইলেও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয় না বটে বরং তাহাতে দুঃখ নাশ রূপ উপকারও হইতে পারে। কিন্তু মনোবেগ, উপেক্ষা করিবার পদার্থ নহে। পুণ্যকর্ম্মের সঙ্গে মন্দ স্বার্থপর-বেগ আশ্রয় করিলে পরিশেষে স্বার্থপর অর্থাৎ পাপ ক্রিয়া নিবারণ করা অসাধ্য হয়। ধর্ম্মশাসন, রাজ শাসন, লোক নিন্দা, যে কোন উপায় বল, কেবল স্থল বিশেষেই মনুষ্যকে নিষিদ্ধ ক্রিয়া হইতে বিরত রাখিতে পারে। কিন্তু মনোবেগ তোষণার্থ প্রাগুক্ত শাসনাদির ছিদ্র আবিষ্কার হইতে কাল বিলম্ব হয় না। বাহিরের শাসনকে তাচ্ছল্য করি না;

কিন্তু মনের শাসন তদপেক্ষা অনেক প্রবল। বাহিরের শাসনের দ্বারা বাহ্যিক এবং বাহ্যিকের মধ্যে কেবল গুরুতর কুক্রিয়া গুলিই নিবারিত থাকে; প্রাত্যহিক বা সামান্য কুক্রিয়া ও কুচিন্তা কোন মতে অন্তর্হিত করা যায় না। সুতরাং কুচিন্তা ও কুক্রিয়া সামান্য হইলেও তাহার অভ্যাস হইতে স্বার্থপর বেগ ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া উঠে। তখন বাহ্যিক শাসনের ভয় খর্ব্ব হইয়া যায় এবং লঘু গুরু সকল কুকর্ম্মই আরব্ধ হয়। সামান্য কুক্রিয়া প্রাত্যহিক, ও সচরাচর প্রচলিত বলিয়াই "সামান্য" নামে গণনীয়। নতুবা সামান্য কুক্রিয়াতে যেমন চিত্তের ভাব প্রকাশ পায় এমন আর কিছুতে হয় না। চিত্তের ভাব বিকৃত অর্থাৎ চিত্ত ব্যবস্থার অভাব হইলেই গুরুতর দোষ, তাহাতে সামান্যত্ব নাই। অতএব "পুণ্য কিসে হয়" এই প্রশ্নের উত্তরের পরিবর্ত্তে পুণ্য কিসে হয় না তাহা স্থির হইতেছে। মনোবেগ এবং ক্রিয়াফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল প্রথা বা শাস্ত্রীয় বচনানুরোধে পুণ্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে পুণ্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না। অর্থাৎ ব্যক্তিগণকে পৃথকরূপে বিচার করিলে তাহাদিগের সদাচার স্থায়ী হয় না; এবং সর্ব্বসাধারণের কথা ধরিলে লোক সমষ্টির চরিত্রগত উন্নতি হয় না এবং পরিশেষে সর্ব্বসাধারণের ত্রুটী হেতুক লোক নিন্দা রূপ বাহ্যিক শাসনের লাঘব হয়। গণিকা প্রথারক্ষা স্বরূপ দান করাতে উহার চিত্তের সুব্যবস্থা প্রকাশ হয় নাই। মনোবেগ সম্বন্ধে গণিকার কোন ধর্ম্ম হয় নাই।

কেহ মনে করিতে পারেন যে গণিকা কেবল বিবাহ বিধানের বিদ্রোহী, অন্য প্রকারে তাহার দোষ নাই এবং তাহার পুণ্যকর্ম্মকে অকিঞ্চিৎকর মনে করা অন্যায়। কিন্তু যে কারণ হইতে বিবাহ-বিদ্রোহীতা উৎপন্ন হয় তাহা যে কেবল ঐ একটী ক্রিয়াতে প্রকাশিত হয়, এমত নহে। প্রকৃত বিবাহ বিদ্রোহী আজ্ঞানুবর্ত্তিতার মাহাত্ম্য জানে না; এবং প্রকৃত ভক্তি তাহার মনে স্থান পায় না। এই জঘন্য স্বেচ্ছাচারের লক্ষণ বিবাহ বিদ্রোহী অর্থাৎ স্বৈরিণী মাত্রের আপাদ মস্তক দৃষ্ট হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রে যেমন মনোবেগের প্রতি উপেক্ষা তেমনি অন্য কোন কোন মতে মনোবেগ সংক্রান্ত এক প্রকার অত্যুক্তি দৃষ্ট হয়। এই মতাবলম্বীরা বলেন আমাদিগের এক প্রকার মনোবৃত্তি আছে তাহা অন্যান্য মনোবেগের সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। মনোবেগের স্বধর্ম্মানুসারে ইহার পরিতোষ ক্রি অবরোধ হইলে সুখ অথবা দুঃখ উৎপন্ন হ য়া থাকে বটে; কিন্তু তদ্ভিন্ন ইহাতে কোন্ কার্য্যটী সৎ এবং কোন্টী কুকর্ম্ম তাহা ও বলিয়া দেয়। এই মনোবৃত্তির প্রচলিত নাম "বিবেক"। আমরা বিবেচনা করি যে এই বৃত্তির কার্য্য সকল অন্য প্রণালীতে অর্থাৎ চিত্ত ব্যবস্থার দ্বারা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; এই বিভেদ রক্ষার নিমিত্ত আমাদিগের প্রদর্শিত চিত্ত ব্যবস্থার পরিণামকে **ধর্ম্মজ্ঞান** নামে ব্যক্ত করিয়াছি।

বিবেক এবং ধর্ম্মজ্ঞান আমাদিগের বিবেচনায় একই পদার্থ। আমরা বলি বিবেকের এক অংশ মনোবেগ অপরাংশ ভাবনা ও চিন্তা। এই সমুদায় হইতেই চিত্তব্যবস্থা অমুক ক্রিয়া ভাল, অমুক মনোবেগ মন্দ এবম্প্রকার চৈতন্য, ভাবনা কিম্বা চিন্তা স্বরূপ; তাহাতে কোন বেগ নাই; কেবল বুদ্ধি চালনা এবং ক্রিয়া ফল বিষয়ক অভিজ্ঞতা (experience) হইতে উৎপন্ন হয়। আমি যখন বুঝিয়াছিলাম অন্ধের এই এই উপকার করা যাইতে পারে তখন আমার মনে ক্রিয়ার দোষ গুণ বিষয়ক চৈতন্য (বিবেকের একাংশ) বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া ছিল। আমি যদি অতি পাপিষ্ঠ এবং যার পর নাই কুপ্রবৃত্তি পরায়ণ হইতাম তথাচ আমার পক্ষে ঐ অভিজ্ঞতার চৈতন্য অসম্ভাবিত নহে। কিন্তু এই চৈতন্যের উপযোগী সুব্যবস্থিত মনোবেগ (বিবেকের অপরাংশ) আমার অন্তঃকরণে উদয় হয় নাই অথবা অত্যল্প পরিমাণে উদয় হইয়াছিল; ধর্ম্ম বিষয়ক অভিজ্ঞতা ছিল, মনোবেগ ছিল না; সুতরাং আমা কর্ত্তৃক বিবেক আজ্ঞা অথবা পরার্থপরতার নিয়ম অনায়াসে লঙ্ঘন হইয়াছে।

যাঁহারা বিবেককে একটী অবিভাজ্য পৃথক মনোবেগ বলেন তাঁহারাও স্বার্থপরতা অপেক্ষা পরার্থপরতার প্রাধান্য স্বীকার করেন। সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞান এবং বিবেককে এক পদার্থ বলিলে ফলাফলের কোন বিভেদ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিবেককে অবিভাজ্য বৃত্তি বলিলে এক প্রকার ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই ভ্রমের জন্য "বিবেক" বৃত্তিকে ধর্ম্মজ্ঞানের অত্যুক্তি বলিয়াছি।

যদি পরার্থপর হইবার বাসনাতে কাহার উপকারে নিযুক্ত হই তাহা হইলে সেই ব্যক্তির প্রকৃত উপকার হইল কি না তাহার অনুসন্ধান করা পরার্থপরতার বিধানানুসারে আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্তর্গত হইবে। মনে কর গণিকা অন্ধকে সিকির পরিবর্ত্তে পাঁচ শত টাকা দিল। কিন্তু এক জন দস্যু তাহা দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎকাল পরে অন্ধের প্রাণবধ পূর্ব্বক ঐ টাকা অপহরণ করিল। পরার্থপরতা এইরূপ পরবর্ত্তী ঘটনা উপেক্ষা করিয়া ক্রিয়ার দোষ গুণ বিচার করিতে পারে না। বিবেকবাদীগণ হয়ত তাহাতে দোষ দেখিবেন না। অন্ধের বল নাই, দৃষ্টিশক্তি নাই, সহায় নাই, পাঁচ শত টাকা তাহার হস্ত হইতে অপহরণ করা অতি সহজ কার্য্য, ইহাতে অনেক দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিই প্রবৃত্ত হইতে পারে। তথাচ বিবেকবাদীগণ এই বিবেচনার ত্রুটি হেতুক ঐ অর্থ দানকে অন্ধের মৃত্যুর কারণ বলিয়া হয়ত স্বীকার করিবেন না। কিন্তু সুব্যবস্থিত পরার্থপরতা, টাকা দিলে তাহা কি প্রকারে অন্ধের ভোগে আসিবে, তাহার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কেননা পরার্থপরতা কেবল দান ক্রিয়াতে আশ্রিত নহে; তদ্দারা অন্ধের প্র-

কৃত হিত না হইলে ঐ দানক্রিয়া নিষ্ফল, বরং অন্ধের প্রাণনাশের হেতু বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অন্ধকে উপকৃত করিবার বাসনাই পরার্থপরতার উদ্দেশ্য; কিন্তু যেখানে অর্থ দান দ্বারা তাহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, সেখানে অগত্যা ঐ কার্য্য পরার্থপর শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবে। বিবেকবাদীগণ একথা হয়ত স্বীকার করিবেন না।

আমরা যাহাকে প্রকৃত বিবেক বা ধর্ম্মজ্ঞান বলি প্রস্তাবিত স্থলে তাহাও কেবল অর্থদান দ্বারা নিবৃত্ত হইবার নহে। কিন্তু বিবেকবাদীরা হয়ত বলিবেন প্রাগুক্ত দান ক্রিয়া বিবেক আদিষ্ট হইলেই যথেষ্ঠ; উহার পরিণাম বিবেচনা না করা ক্ষোভের স্থল হইতে পারে; কিন্তু উহার আদেশ মতে প্রথমে যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহা সেই অবিবেচনার নিমিত্ত দূষনায় হইতে পারে না।

যাহারা বিবেক শক্তিকে এরূপে স্বতঃসিদ্ধ মনে করেন তাঁহারা মনুষ্যের ক্রিয়া এবং জগতের ঘটনা সমূহকে কার্য্যকারণরূপ শৃঙ্খলে আবিদ্ধ করিতে পারেন না। অন্ধকে পাঁচশত টাকা দানের সহিত দস্যু হস্তে অন্ধের মৃত্যু ঘটনা শৃঙ্খলিত করিতে না পারিলে, অন্ধের মৃত্যুর হেতু নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। এবং যদি সাংসারিক ঘটনা দর্শন জনিত ক্রিয়াফলের অভিজ্ঞতা ব্যতীত কেবল বিবেক শক্তির প্রভাবে "এটা ভাল" "ওটা মন্দ" ইত্যাকার ভাবনা উদয় হইতে পারে, তবে চিন্তা এবং ভাবনা মাত্রকেই স্বতঃ উদ্ভাবিত বলা যাইতে পারে। এবং চিন্তার অনুক্রম, মনোবিজ্ঞান এবং ন্যায় দর্শনাদি শাস্ত্র সমস্তই কল্পিকাপূর্ণ বলিয়া গণনীয় হইবে। ফলতঃ বিবেকান্তর্গত মনোবেগ এবং ভাবনা পৃথক না করিলে এই বিশৃঙ্খলা অপনীত হইতে পারে না।

বিবেক সম্বন্ধে জগদীশ্বরের নির্দ্দেশ স্বীকার করিলেও বিবেকের অত্যাচার নিবারণার্থে ন্যায়শাস্ত্র এবং চিন্তবার স্থার প্রয়োজন। জগদীশ্বরের আদেশের সহিত প্রাগুক্ত বিধানের বিরোধ কদাচ সম্ভবে না।

আমাদিগের এই বাদানুবাদ, কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র নহে। অনেক লোক দেখা যায় যে বিবেকের দোহাই দিয়া ক্রিয়ার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিতে চাহেন না। যদিও এইরূপ অবিবেচনা কেবল অধুনাতন হিন্দুসমাজেই বাহুল্য রূপে প্রকাশিত এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিষময় * ফল বলিয়াও

---

* পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে হিন্দুশাস্ত্রের বিষময় ফলের উল্লেখ স্থানে স্থানে করা গিয়াছে বলিয়া আমরা ঐ শাস্ত্রের মাহাত্ম্য অস্বীকার করি। অন্য কি, ক্রিয়ার মাহাত্ম্য সম্বন্ধেই হিন্দুশাস্ত্রের বিধান সভ্যতার আদীম অবস্থায় পরম মঙ্গলজনক ছিল বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তখন লোকে মনোবেগের বিষয়ে অনেক কথা বুঝিত না সুতরাং বাহ্যিক ক্রিয়ার উপরেই পাপ পুণ্য সংস্থাপন করা বৈধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন মনুষ্যের ভাবনা মনোবেগ এবং সুখ-দুঃখ-চৈতন্য এত সূক্ষ্ম হইয়াছে যে পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাণে গণনা না করিলে ইহাদিগের সংশ্রিত ক্রিয়ার দোষ গুণ নির্ণয় করা অসাধ্য।

পরিগণিত হইতে পারে, অথাচ যখন দেখা যায় যে লোকে এইরূপে বিবেক-শক্তির অযথা ব্যবহার করিতে উদ্যত তখন স্পষ্টাক্ষরে উহার প্রতিবিধান করাই কর্ত্তব্য।

এখন আর একটী কথা বিবেচনা কর; শ্যাম এবং গণিকা উভয়ের মধ্যে কে অন্ধের অধিক উপকার করিয়াছে? দয়াবেগ বা বিবেকের বিষয় বিচার করিলে শ্যামই অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মশীল। কিন্তু গণিকা-দত্ত সিকিটী অন্ধের পক্ষে পথপ্রদর্শন অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় সন্দেহ নাই। অতএব ইহার মীমাংসা কি?

এক সম্প্রদায় (utilitarian) আছেন তাঁহারা বলেন মনোবেগ, বিবেক বা ক্রিয়া কিছুতেই ধর্ম্ম (virtue) নাই। কোন ক্রিয়া হইতে যত অধিক লোকের যত অধিক পরিমাণ সুখ হয় ততই সেই ক্রিয়ার মাহাত্ম্য। পথ প্রদর্শন অপেক্ষা সিকি দানে অন্ধের অধিক সুখ হইয়াছে। কেবল তাহা নহে সিকিটীর দ্বারা হয়ত অন্ধের কোন আত্মীয় ব্যক্তিরও দুই এক দিনের আহার চলিবে সুতরাং সুখের পরিমাণ এবং সুখী লোকের সংখ্যা ধরিলে সিকি দান অপেক্ষাকৃত মহৎ। এই মতাবলম্বীরা অর্থ দানের সহিত গণিকার চরিত্রগত দোষ গুণের বিচার করিতে চাহেন না।

বিবেক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা ক্রিয়ার ফল উপেক্ষা করেন; এবং উল্লিখিত মতে কেবল ক্রিয়ার ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা মনোবেগের গুণাগুণ উপেক্ষা করেন এই দুই সম্প্রদায় সর্ব্বতোভাবে পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু আমরা মনোবেগ সংক্রান্ত যেরূপ ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছি, অনুধাবন করিলে তাহার মধ্যে উভয় মতেরই সারাংশ দৃষ্ট হইবে। ফলতঃ মনোবেগের মাহাত্ম্য এবং ক্রিয়াফলের দোষ গুণ কিছুই তুচ্ছ নহে। গণিকার ক্রিয়া সুখবর্দ্ধক বটে কিন্তু উহার মনোবেগ পরার্থপর নহে। ক্রিয়াটির গুণ স্বীকার করি লোকটা ধার্ম্মিক বলিতে পারি না। জনসমাজে কেহ কচিৎ কোন সৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে জগতের বিশেষ মঙ্গল হয় না। সকলে একচিত্তে অবিচ্ছেদে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান এবং কুকর্ম্ম সম্বরণ করিলেই মঙ্গল। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কোন কর্ম্মেই ধর্ম্ম ভুলেন না। ব্যবস্থিত-চিত্তের মনে দয়াবেগের প্রাধান্য অস্তমিত হইবার নহে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অকস্মাৎ লোকের অমঙ্গল ঘটিলে তাহা বহুলোকের উপরে কিম্বা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিস্তার করিতে পারে না। অধার্ম্মিকের সৎকর্ম্মও ঠিক ঐরূপ অস্থায়ী; কেন না উভয়েরই মনের অভিলাষ প্রস্তাবিত ক্রিয়া সমূহের বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে লোকের কেবল সুখবৃদ্ধি কামনা করেন তাঁহারা মনোবেগের মাহাত্ম্য না মানিলেও দয়াবেগের বশবর্ত্তী। অতএব ক্রিয়াফল ও সুখ বৃদ্ধি (utility) অনুসারে ধর্ম্ম নির্ণয় করিলেও পরার্থপরতা এবং দয়ার মাহাত্ম্য সপ্রমাণিত হইবে।

পরন্তু ক্রিয়াফল অনুসারে মনোবেগ

শিক্ষিত করা কঠিন। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের সুখ বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে এক প্রকার মনোবেগ জন্মিতে পারে বটে; কিন্তু দয়া অভাবে কেবল ভাবনা কিম্বা চিন্তার দ্বারা সুখবর্দ্ধক ক্রিয়া নিরূপণ করিতে হইলে ক্রিয়ার পরিণাম কি পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে তাহার সীমা স্থির করা যায় না। যেমন কেবল মনোবেগ বা বিবেকের উপরে নির্ভর করিলে ক্রিয়ার পূর্ব্বাবস্থার অর্থাৎ অন্যের মঙ্গল বিষয়ক অভিলাষেরই আধিক্য হয় এবং ক্রিয়াফলের প্রতি দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়, তদনুরূপ কেবল সুখবৃদ্ধি-বিধান অবলম্বন করিলে একমাত্র ক্রিয়াফলের প্রতিই মন নিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং মনোবেগ সমূহ অব্যবস্থিত হইয়া কুকর্ম্মানুরক্ত হইতে পারে।

সুখ বৃদ্ধি বিষয়ক বিচার সর্ব্বসাধারণের আয়ত্ত নহে। সর্ব্বসাধারণ কেন, বোধ হয় কেহই তাহাতে সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। আমি এখন যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছি ইহা বর্ত্তমানে নাস্তি তুচ্ছ হইলেও ইহার ফল কতকাল বিস্তার করিবে তাহার সীমা নাই সুতরাং তদ্বিষয়ে ক্রিয়ার পূর্ব্বকালীন বিচার কি রূপে সম্পূর্ণ হইবে এবং সেই বিচারের ভ্রম হইলে তাহার জবাবদিহি কাহার উপরে নিক্ষিপ্ত হইবে?

পরার্থপরতা যতদূর সাধ্য এই বিচার করিতে বাধ্য বটে কিন্তু কোন সময়ে ইহাতে ভ্রম হইলেও পরার্থপর মনোবেগের মাহাত্ম্য বিনষ্ট হয় না; কেন না ঐ প্রকার মনোবেগের উপর নির্ভর করিলে ভবিষ্যতের ধর্ম্মসাধন বিষয়ে একাগ্রতার ব্যাঘাত হইবে না। নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াফলের প্রতি লক্ষ্য করিলে সেই আভ্যন্তরিক একাগ্রতার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। মনোবেগ আত্মচৈতন্যের অন্তর্গত; এই নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে ক্রিয়ার অগ্রবিচারাধীন। ক্রিয়াফল পশ্চাদ বিচারাধীন, উহাকে অগ্রবর্ত্তী করা অসাধ্য।

বিবেক (conscience), ধর্ম্মজ্ঞান (পরার্থপরতা altruism), এবং সুখবৃদ্ধিবিধান (utility), তিনই এক উদ্দেশ্য বিশিষ্ট। বিবেক, মনোবেগের উপরে এবং সুখবৃদ্ধি বিধান, ক্রিয়াফলের উপরে কিঞ্চিৎ বাহুল্য পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে; পরার্থপরতা মূলক চিত্ত-ব্যবস্থা বা ধর্ম্মজ্ঞান উভয়ের প্রতিই তুল্যরূপে লক্ষ্য করে।

আর এক সম্প্রদায় বলেন উল্লিখিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত মনোবেগ এবং ভাবনা পুরুষানুক্রমে অর্জ্জিত হইয়া থাকে। যেখানে বহুদিন লোকে স্বার্থপরতা শাসন পূর্ব্বক পরার্থপরতা অভ্যাস করিয়াছে সেখানে সকলেরই মাতৃগর্ভ হইতে এমন ক্ষমতা জন্মে যে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সেই ক্ষমতাদ্বারা সৎকর্ম্ম কুকর্ম্ম চিনিতে পারে এবং চিনিয়া স্বভাবতঃ যেন বিবেকেরই আদেশ অনুসারে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

আমাদিগের ভাবনা এবং মনোবেগ সমূহ কি কি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে তদ্বিষয়ক বিচার এই

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং এই মতের বর্ণনা আমাদিগের সীমা বহির্ভূত হইতেছে। কেবল এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে বিবেক, ধর্ম্মজ্ঞান এবং শুভ বুদ্ধি বিধানের আদি যেরূপ হউক, কাল সহকারে এতদ্বিষয়ে মনুষ্যের মত সমগ্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যথা, অসভ্য গণের ধর্ম্মজ্ঞান সভ্যজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অতএব যতদিন ধর্ম্ম-বিষয়ক মত পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয় ততদিন কেবল পৈত্রিক ধর্ম্মজ্ঞানের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলে ভাবী উন্নতি অবরুদ্ধ হইবে। আমরা পূর্ব্ব পুরুষের উপদেশ মতে বালক কালে যে ধর্ম্ম-জ্ঞান অভ্যাস করিয়াছি, যৌবনে জ্ঞানবৃদ্ধি এবং মনের দৃঢ়তা সহকারে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নতির সংস্থান করা আবশ্যক। এবং যাহা আমরা অনেক চিন্তার দ্বারা সুস্থির করিল, আমাদিগের সন্ততিগণ বাল্য-কালেই তাহা অভ্যাস করিলে ভাল হয়। এই উন্নতি সাধন পক্ষে মনোবেগের সু-ব্যবস্থা অভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়।

আমাদিগের এবং পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত জ্ঞানের ভ্রম বশতঃ এক শ্রেণিস্থ মনোবেগ ভবিষ্যতে অন্য শ্রেণিতে পরিগণিত হইতে পারে; কিন্তু দুটী কথার সংস্কার যত দৃঢ় হয় ততই মঙ্গল; চিত্ত-ব্যবস্থার আবশ্যকতা এবং ব্যবস্থা করিবার জন্য আত্ম-চৈতন্যের বিচার। বিচার ব্যতীত উন্নতি সম্ভবে না এবং বিচারানুযায়ী চিত্তশুদ্ধি না জন্মিলে বিচার সফল হইল বলা যায় না। আর একটী কথা এই, চিত্ত-ব্যবস্থার নিমিত্ত স্বার্থপরতা সম্বরণ ও পরার্থপরতা পালন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উপায় অদ্যাপি দেখা যায় নাই।

কালের ঢেউ।

"জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধুপানে ধায়, ফিরাব কেমনে।"

"Each nobler aim, represt by long control,
Now sinks at last, or feebly mans the soul;
While low delights succeeding fast behind,
In happier meanness occupy the mind."

এক্ষণে বঙ্গসমাজে দুইটি স্রোত চলিতেছে। এই স্রোতদ্বয় পরস্পর প্রতীপ-গামী। এক স্রোত সমাজের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে; অন্যতর স্রোত ইহার অভ্যন্তর দিয়া গোপনে গোপনে বিপরীত দিকে বহিয়া যাইতেছে। উপরের প্রবাহ যে দিকে সমাজকে আকৃষ্ট করে, নিম্নগামী প্রবাহ তদ্বিপরীতদিকে সমাজকে

লইয়া যায়। সুতরাং উপরস্থ প্রবাহের বল ও প্রভাব নিম্নস্থ প্রবাহের বল ও প্রভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। বঙ্গ সমাজের গতি এজন্য নিতান্ত মন্দীভূত হইয়াছে।

ইংরাজী সাহিত্য পাঠে যদি আমরা কোন অমূল্য ভাব লাভ করিয়া থাকি, তাহা স্বদেশানুরাগ ও স্বাধীনতার সুমহৎ ভাব। যে "স্বাধীনতা কয়েদীর সুখের স্বপন, যাহা কবির উদ্বোধন শক্তি, উৎসাহ ও উন্মত্ততা" সেই স্বাধীনতার ভাব যখন বঙ্গবাসীর মনে ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতে লাগিল, বঙ্গবাসীগণ তখন যেন এক সুরলোকের ঈষৎ আভা দেখিতে পাইলেন। তাহার হৃদয় মন সেই আলোকে আলোকিত হইল, উৎফুল্ল হইল, উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তদবধি নিতান্ত বাসনা, কিরূপে সেই স্বাধীনতার সুখভাগী হন। মনের ইচ্ছা সেই দিকে ধাবিত হইল, অন্তরের মহৎ ভাব সমুদায় সেই দিকে উদ্রিক্ত হইল। যে অধীনতার ঘোর নিগড়ে বঙ্গদেশ আবদ্ধ, তাহা হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য বাঙ্গালীর একান্ত বাসনা জন্মিল। সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে যে উপায় আবশ্যক তাহা স্থিরীকৃত হইল। সমাজের জন্য স্বার্থ ত্যাগ, সাধারণ উন্নতির জন্য একতা, এবং আত্ম বলে পরবশতা পরিবর্জ্জন, না করিতে পারিলে প্রকৃত স্বাধীনতার পথ পরিষ্কৃত হইবে না। ইংরাজী শিক্ষা ও সাহিত্য আমাদিগকে সেই স্বাধীনতারই দিন দিন প্রয়াসী করিতেছে, তাহার মূল্য ও সুখ আমাদিগের কল্পনা চক্ষে দিন দিন বর্দ্ধিত এবং স্পৃহনীয় করিতেছে। তজ্জন্য স্বদেশানুরাগ মনে মনে ফুলিয়া উঠিতেছে। ইচ্ছা, যত্ন তজ্জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। মনের সকল ভাব ও সকল চেষ্টা, সেই উদ্দেশে উৎসাহিত ও প্রয়োজিত হইয়াছে। এই ভাবের স্রোত বঙ্গসমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আশার প্রসন্ন বায়ু অনুকূল বহিয়া স্রোতোবেগ প্রতাড়িত করিয়া দিতেছে। ইহার জন্য কত সাধু অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। কত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কত স্বদেশানুরাগীর উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। কত বাগ্মীর উন্মত্ত হৃদয় অগ্নিপরীত বাক্যে সময়ে সময়ে সমাজকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। কতবার কত কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্য আমাদিগের হৃদয়ে যে সমস্ত মহৎ ভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা কত চেষ্টা করিতেছি। তজ্জন্য আমাদিগের হৃদয় কেমন স্ফীত হইয়া উঠে। বাস্তবিক ইংরাজী সাহিত্য ও তৎপাঠের ফল আমাদিগের অন্তরকে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবল স্রোতে ফেলিয়াছে। সেই স্রোতে হৃদয় ভাসিতে চাহে। সেই স্রোত সমাজ, দেশ, সকলই প্লাবিত করিতে চাহে। তাহাতে পূর্ব্ব আচার, পূর্ব্ব পদ্ধতি বিনষ্ট হয় হউক। আমরা সে আচার ও পদ্ধতির ফলাফল

বিলক্ষণ দেখিয়াছি। তাহাতে আমরা হৃতসর্ব্বস্ব ও মৃতপ্রায় হইয়াছি। আর আমরা সে সকল দেশাচার ও রীতির অনুবর্ত্তী হইতে চাহি না।

ইংরাজী সাহিত্য পাঠে আমাদিগের মন এইরূপ স্বদেশাচারের প্রতি নিতান্ত বিরাগী হইয়াছে। বিরাগী হইয়াছে এই জন্য যে সেই দূষিত দেশাচার হেতু আমরা অতি নীচ ও অধম জাতিরূপে পরিণত হইয়াছি। বিরাগী এই জন্য যে তাহা স্বাধীনতা লাভের পক্ষে নিতান্ত প্রতিবিরোধী। বিরাগী এইজন্য যে তাহাদিগের ফলাফলক্রমে আমরা সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার বিসর্জ্জন দিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে দুই একটি রীতি নীতি ভাল থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে আমরা আর এক স্বতন্ত্র তুলায় তাহাদিগকে ওজন করিতে বসিয়াছি। এই ওজনে অনেকেরই গুরুত্ব কমিয়া যায়। স্বাধীনতা লাভের সাধন পথে যে সকল রীতি নীতি অন্তরায় স্বরূপ হইবে, তাহা কেন সহস্ররূপে মঙ্গলকরী হউক না, সেই এক কারণে তাহা নিতান্ত পরিত্যাজ্য। দেশাচার, পাত্র ও কাল ভেদে পরিবর্ত্তিত হওয়া চাই। আমরা যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই কালের মহৎ উদ্দেশ্য যাহা, যদ্দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয়, তাহাই অবলম্বন করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। নহিলে আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য হইব না। নহিলে আমরা কর্ত্তব্য অবহেলায় দারুণ পাতকে লিপ্ত হইব। তাহার ফলাফল আমাদিগের ভবিষ্যত পুরুষে সম্ভোগ করিয়া আমাদিগের উপর কেবল তাহারা গালি বর্ষণ করিবে। পৃথিবীর ও মানব সমাজের পরকাল বিনষ্ট হইবে। আমাদিগের পরবর্ত্তী কাল যদি মানব জাতির প্রকৃত পরলোক হয়, তবে আমাদিগের কার্য্য সন্তান নিশ্চয় সেই লোকে প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এই পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা প্রচলিত রীতি নীতির বিচার করিব। স্বদেশের ও সমাজের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা দেশাচারের পরীক্ষা করিব। সেই পরীক্ষায় যাহা রক্ষিত হইবে, তাহাই রক্ষণীয়, নহিলে সমুদায় বিনষ্ট করা উচিত। আর আমরা পূর্ব্বপুরুষের নামে বিকাইতে চাহি না। আমাদিগের শিরে একটি বিশেষ কার্য্যভার পড়িয়াছে। সেই কার্য্যভার অতি গুরুতর। আমরা যদি পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় মূর্খ ও অজ্ঞ হইয়া কিছু না জানিতে পারিতাম, আমাদিগের তত প্রত্যবায় হইত না। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া আমরা কিরূপে নীরব, নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি। যাহারা থাকিতে পারে তাহারা মনুষ্যনামের যোগ্য নহে।

বঙ্গ সমাজের শিক্ষিত জনগণের মনে এক্ষণে এই মহা ভাব-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তাহার আশা, ভরসা, চেষ্টা এক্ষণে এই স্রোতে নিয়োজিত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব তাহার মনকে

এইদিকে ফিরাইতেছে। তিনি স্বাধীনতার একান্ত প্রয়াসী হইয়া সকল দেশাচার, সকল রীতি নীতি সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল কি না এবং কতদূর উপযোগী তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন। তিনি স্বাধীনতার প্রয়াসী হইয়া যাহাতে বঙ্গসমাজ প্রকৃত স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে তজ্জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। কিসে আমাদিগের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতা পরিলব্ধ হয়, আপাততঃ সেই উদ্দেশ্য প্রতি স্বদেশানুরাগী ও সুশিক্ষিত জনের মনকে উত্তেজিত করিতেছে। এই বল বঙ্গসমাজের উপর এক্ষণে পতিত হইয়াছে। এই বলে যে স্রোত উত্থিত হইয়াছে, আমাদিগের আশা, এক দিন সেই স্রোত বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিবে। এই বল বঙ্গ সমাজকে ওতপ্রোত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা বঙ্গসমাজে এক দিন মহা বিপ্লব উত্থাপিত করিবে। কিন্তু সে দিনের আজিও অনেক বিলম্ব আছে। রাষ্ট্র-বিপ্লব এক দিনে সম্পন্ন হয় না। এক দিনে একটি বৃহৎ পুরাতন সমাজ আমূল তোলপাড় হয় না। এক দিনে কোন সমাজ বিপর্য্যস্ত হয় নাই, বঙ্গসমাজই বা কেন হইবে? যত দিন না এই বল বঙ্গসমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, তত দিন প্রকৃত বিপ্লবের সূত্রপাত হইবে না। যত দিন আমরা প্রতি কার্য্য প্রতি অনুষ্ঠান প্রতি আচার ব্যবহার, প্রতি রীতি নীতি ও ভাব স্বাধীনতা লাভের পরীক্ষা দ্বারা পরিমাণ করিতে না শিখিব, তত দিন আমাদিগের স্বাধীনতা লাভ আশামাত্র থাকিবে। তত দিন স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত পন্থা অবলম্বিত হইবে না। কিন্তু যে দিন হইতে আমরা সেই পরীক্ষায় অগ্রে প্রতি কার্য্য বিচার করিয়া তবে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, সেই দিন হইতে সে আশা সম্পূরণ হইতে আরম্ভ হইবে। এক্ষণে তাহা হইতেছে না বলিয়া আমাদিগের আশা কেবল আশামাত্র রহিয়াছে। আমাদিগের সমাজের উপরস্থ স্রোত কেবল ভাসিয়া যাইতেছে। তাহা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে সমাজের অন্তর নিজ বল দ্বারা ফিরিতে পারিবে না। স্রোত সমাজের শিরোদেশ দিয়া বৃথায় বহিয়া যাইবে। সমাজের সমুদায় দেহ অটল থাকিবে।

এক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। এই স্রোত সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু নিম্নে আর এক তরঙ্গে সমাজ প্রচালিত হইতেছে। উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের শিরোদেশ যেমন সুরলোকের জ্যোৎস্না অথবা রবিকরে হাসিতে থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যদেশ যেমন কাদম্বিনীজালের ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে এবং সময়ে সময়ে প্রবল ঝটিকায় কম্পিত হয়, বঙ্গসমাজের এক্ষণে সেই দশা। ইহার উপরে উচ্চ আশা, উচ্চ অভিলাষ বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু ইহার অভ্যন্তর ও মধ্যদেশ যত নীচতায়, অধীনতায় ও নীচকার্য্যে

পরিপূর্ণ। এই জন্য ইহার মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে না।

বহুকাল ধরিয়া আমরা ঘোর অধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া আছি। শুদ্ধ রাজনৈতিক অধীনতা নয়, সামাজিক ও পারিবারিক অধীনতায় আমাদিগের প্রকৃতি অতি মৃদু ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। এই অধীনতার দাস হইয়া আমরা কতদূর *নির্বীর্য্য* ও *জড়প্রায় হইয়া পড়ি*য়াছি, তাহা বার বার এই পত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। একে এই ঘোর অধীনতায় নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া আছি, তাহাতে আমরা আবার এমত সকল ব্যবসায় ও কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছি ও করিতেছি যদ্দ্বারা সেই অধীনতার শনৈ শনৈ বৃদ্ধি হইতেছে এবং আমরা অধিকতর মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছি। উচ্চ আশা ও অভিলাষ, আমাদিগকে উচ্চ দিকে উন্নীত করিতে চায় বটে, কিন্তু ব্যবসায় ও কার্য্য আমাদিগকে অধোগতিতে গাঢ়তর নিমজ্জিত করিতেছে। উচ্চে উঠিতে যাইব কি, আমরা কার্য্যগতিকে অধিকতর নামিয়া পড়িতেছি। আমাদিগের গতি নিম্নদিকে রহিয়াছে, আমরা এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া উপর দিকে দৃষ্টিপাত করি মাত্র। যদি আমরা কখন এই নিম্নগতি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি, যদি আমরা কখন উর্দ্ধদিকাভিমুখে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাড়াইতে পারি, তখন আমরা এক দিন উন্নতির আশা করিতে পারিব। নহিলে যদি কেবল নিম্নাভিমুখে যাইতে যাইতে এক একবার উর্দ্ধদিকে ফিরিয়া চাই মাত্র তাহাতে কি গতির কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে? ঘোর অধীনতা স্রোতের প্রভাব ও বল আমাদিগকে এইরূপ নিম্নতর অধস্তলে নামাইয়া আনিতেছে। সেই স্রোতের বিপরীত দিকে দাঁড়াই, আমাদিগের এমত বল নাই। তাহার বল অতিক্রম করিয়া *বিপরীত দিকে উঠিতে যাওয়া আমাদিগের* চেষ্টার অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অমাদিগের যদি এক্ষণে কোন বীরত্বের আবশ্যক হয় তাহা এই বীরত্ব, তাহা সামাজিক অধীনতার বল অতিক্রম করিয়া উন্নতির দিকে উঠিতে পারার বীরত্ব। এই বীরত্বে মাতিতে পারিলে তবে আমরা এক দিন পুরুষ নামের উপযুক্ত হইব। এই বীরত্বে মাতিতে পারিলে আমরা সর্ব্ববিধ যুদ্ধে ক্রমশঃ সমর্থ হইব। যে শত্রু অতি গোপনীয় ভাবে অদৃষ্টরূপে আমাদিগের সমূহ অনিষ্ট করিতেছে, আমরা যদি তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে না পারিলাম, তবে আর কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইয়া, আলস্যের শয্যায় শুইয়া, কামিনীকুলে পরিবেষ্ঠিত হইয়া ব্যসনেওনৃত্যগীতে অলস হইয়া, দাসত্বে প্রভুর সেবা শুশ্রূষা করিয়া কি কখন বীরত্বের উপযোগী হইতে পারা যায়? কিন্তু আমাদিগের ঠিক এই লজ্জাকর অবস্থা। আমাদিগের আশা বটে, কিসে অধীনতার হস্ত হইতে মুক্ত হই, কিন্তু চেষ্টা কি

তাই? চেষ্টা কিরূপে উচ্চ চাকরী ও দাসত্বের ঘোর নিগড়ে নিবদ্ধ হইব। দেশাচার যেরূপ নৃশংসতার সহিত আমাদিগকে শাসন করিতেছে, এক একবার তাহার বিরুদ্ধে উঠি নিতান্ত অভিলাষ হয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমোদ প্রমোদে পরিলিপ্ত হইয়া সকলই ভুলিয়া যাই। নৃত্য ও গীতের মোহিনী শক্তিতে নির্বীর্য্য হইয়া পড়ি। সুন্দরীর রূপ দেখিয়া ঢলিয়া পড়ি। স্ত্রৈণতা, আমোদ প্রমোদ, ভোগ ও ব্যসন আমাদিগকে দ্বিগুণতর নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য করিয়া আনিতেছে। অধীনতার নিগড় অধিকতর আবদ্ধ করিয়া দিতেছে। ভাবি, আমাদিগের সঙ্গীত বিদ্যা কি চমৎকার পদার্থ। ইহার আলোচনা রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন আমরা সেই সঙ্গীত বিদ্যায় একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ি, যেন তাহাই আমাদিগের জীবনের সারকার্য্য, তখন জানি না তাহার নিয়ত আলোচনায় আমাদিগের প্রকৃতি কত মৃদুতর ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তথাপি ইহাই আজ কালি আমাদিগের তরুণ বয়স্কগণের এক মাত্র আমোদ, ব্যসন ও সুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যদি কোন বিদ্যার আলোচনা করেন, তাহা এই বিদ্যা—এই বিমোহিনী, নির্বীর্য্যকরী সঙ্গীত বিদ্যা। কিন্তু অধুনা, এ বিদ্যার এতদূর আলোচনা যে নিতান্ত অনিষ্টকর, তাহাতে যে আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহা তাহারা একদিন স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখেন না। এমত কি সে বিদ্যার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে গেলে অমনি খড়্গ হস্ত হইয়া উঠেন।

সর্ব্ববিধ বিলাসীতা ও ভোগেচ্ছা এখন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদিগের তরুণবয়স্কগণের যদি কোন কার্য্য থাকে, আলোচনা থাকে, চেষ্টা থাকে তাহা এই ভোগ বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। তাহারা যদি কখন আলস্যের শয্যা হইতে উত্থিত হন তাহা এই ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য। এই ভোগের মৃদু স্রোত বঙ্গ সমাজকে নিয়ত তরঙ্গিত করিতেছে। এই পঙ্কিল স্রোত বঙ্গসমাজের অভ্যন্তর দিয়া তরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। নৃত্য গীত, সুরা, লাম্পট্য ও আমোদ প্রমোদের প্রবল বায়ু এই স্রোত প্রতাড়িত করিয়া দিতেছে। আমাদিগের তরুণবয়স্কগণ উন্মত্ত হইয়া এই স্রোতে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং স্রোতোবেগে ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতেছেন। আজিও চৈতন্য হয় নাই, আমরা কি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি। কোথায় যাওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য, আর কোন পথে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করা যে অন্যায় তাহা আমি বলি না; তাহা একেবারে পরিবর্জ্জন করিয়া কেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু তাহাতে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়া, যেন তদপেক্ষা আর কোন গুরুতর কার্য্য নাই, আর কোন চিন্তা ও চেষ্টা নাই, এই আমোদ প্রমোদে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া পড়া একান্ত দুষণীয়।

তাহাতে আমাদিগকে অধিকতর স্থৈর্য, মৃদু প্রকৃতি ও নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলিবে। আমরা কোন গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িব। ইহা একালের উপযোগী নয়, এজন্য পরিত্যাজ্য। কালোপযোগী নয় বলিয়া যদি কোন বিদ্যার লোপ অথবা অনিষ্ট হয়, হউক, আমরা সে নির্ব্বীর্য্যকরী, বিমোহিনী বিদ্যার আর আলোচনা করিতে চাহি না। তাহা ক্রমশঃ আমাদিগের জীবনীশক্তি হরণ করিতেছে। সে বিদ্যা হারাইলে তাহা পুনর্লাভ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু তাহাকে পুষিয়া রাখিয়া যে কোন মহামূল্য বস্তুলাভে অকৃতকার্য্য হইব ইহা কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি বিবেচনাসিদ্ধ বলিবে?

বঙ্গদেশ শুদ্ধ এই আভ্যন্তরিক স্রোতে প্রচালিত হইতেছে না; আর এক স্রোত এই স্রোতের পার্শ্বদেশ দিয়া বহিয়া বঙ্গ সমাজকে গাঢ়তর অধঃস্তরে নিপাতিত করিতেছে। আমাদিগের সুশিক্ষিত জনগণ চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। বাঙ্গালী আর কিছুর জন্য জাতি দিতে পারেন না, ধর্ম্ম দিতে পারেন না, দেশত্যাগী হইতে পারেন না, কেবল চাকরীর জন্য পারেন। তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বড় চাকর হইতে যান; ইংলণ্ডে যান, বড় চাকর হইবার জন্য। তিনি গোলামীকেও গৌরবে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাকে সালের পাকড়ী, ওয়াচগার্ড, ও মহামূল্য বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। সেই পাকড়ীর মধ্যে সাহেবের পদাঘাত লুকাইয়া রাখিয়া তৎপুরস্কার স্বরূপ বেতনের চাক্‌চিক্যে তাহা উজ্জ্বলিত করিয়াছেন। সমাজে মান মর্য্যাদা লাভ করিতে হইলে এই চাকরী চাই। তুমি যেরূপ লোক হও না কেন, মূর্খ হও, পাপী হও, ঘৃণিত হও, অধম জাতি হও, যাই হও না কেন, চাকরী থাকিলেই ভদ্র লোক। ভদ্র লোক বলিলেই বড় চাকরেকে বুঝায়। ভদ্রলোক হইতে গেলে অগ্রে চাকরী চাই। বাস্তবিক সকল মান মর্য্যাদা এখন সমাজ এই চাকরীর উপর স্থাপন করিয়াছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোক এখন এই চাকরীর প্রয়াসী হইয়াছে। সকলই আপন আপন কার্য্য ও ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সকলেই ভদ্রলোক হইয়া বসিয়াছেন। চাকরীর বিলক্ষণ মান বৃদ্ধি হইয়াছে। ভদ্রলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে; এবং তৎসঙ্গে দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এই গোলামীর প্রভাব কিরূপ, ইহাতে আমাদিগের নীচতা কতদূর বর্দ্ধিত হইতেছে, আমাদিগের অধীনতা কিরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা এই পত্রের অন্য এক প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্রোত সমাজের অভ্যন্তরে বহিয়া সমাজকে ক্রমশঃ নীচতর অধীনতায় অবনীত করিতেছে। অথচ আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না।

আমাদিগের নিস্তেজ প্রকৃতিতে এই দাসত্ব মিলিয়া গিয়াছে। মিলিয়া গিয়া আমাদিগকে অধিকতর দাসত্বের উপযোগী করিয়া আনিতেছে। আমাদিগের উচ্চ আশা, উচ্চ অভিলাষ সকল যে মহৎ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, এই দাসত্ব আমাদিগকে তাহার ঠিক বিপরীত দিকে নামাইয়া দিতেছে। শুদ্ধ অভিলাষে যাহা আছে, কার্য্যে ও ফলে তাহার ঠিক বিপরীত ঘটিতেছে।

দিন দিন অধীনতার যত বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা ততই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। আমাদিগের অভিলাষস্রোত যে দিকে বহে, কার্য্যের স্রোত তাহার ঠিক বিপরীত দিকে যায়। এই দুই স্রোত যখন এক মুখী হইবে তখন সমাজের গতি দুর্নিবার ও প্রবল হইবে। সুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় সমাজের জনকত লোক যে দিকে যাইতে চাহে, সাধারণ জনগণ অসমর্থতা হেতু সে দিকে যাইতে চাহে না। স্বদেশানুরাগী জনগণের এখন কর্ত্তব্য এই, প্রাকৃত জনগণের আভ্যন্তরিক স্রোত ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে সদভিলাষের স্রোতোমুখী করিয়া দেন। যত দিন না ইহা সম্পন্ন হইতেছে, তত দিন তাঁহাদিগের সকল চেষ্টা ও অনুষ্ঠান বিফল হইয়া যাইবে। সকল সমাজ আভ্যন্তরিক বলেই প্রচালিত হয়। সেই আভ্যন্তরিক বল নিয়মিত করিয়া দিতে পারিলে সমাজ আপনাআপনি উন্নতির দিকে চালিত হইবে। এই বল নিয়মিত করিয়া দেওয়াই সমাজ সংস্কর্ত্তার কার্য্য।

আমাদিগের স্বদেশানুরাগী সমাজ সংস্কর্ত্তাগণকে সমাজের উপরস্থ স্রোত প্রতাড়িত করিতে যত যত্নবান দেখা যায়, নিম্নস্থ আভ্যন্তরিক স্রোতের বিরুদ্ধে যাইতে তত দেখা যায় না। সত্য বটে, তাহারা স্বাধীনতার মধুর রবে উল্লাসিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন; সেই রব চারিধারে পরিঘোষিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন; এবং এই রব বঙ্গদেশের যেখানে ঘোষিত হইবে, সেখানে প্রবৃত্তি নিশ্চয় সেই রবে আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে ঈষৎ আকৃষ্ট করাই কার্য্যের শেষ নহে। সেই প্রবৃত্তির রাগ ও বল কেমন কার্য্যের ও অভ্যাসের শীতল প্রভাবে প্রশমিত হইয়া যায় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা চাই। সমাজের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হইলে তাহা জানা যাইতে পারে না। কেবল আপনিই জানিলে কার্য্যের শেষ হইল না। সমাজের দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতার কারণ যাহা, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা উচিত, এবং সেই কারণ প্রতি জনের মনে দৃঢ় প্রতীত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগের কারণ না জানিতে পারিলে তাহার ঔষধ নির্ণীত হয় না। এজন্য প্রতি জনের জানা চাই কি জন্য তিনি অসমর্থ ও দুর্ব্বল। যে যে কারণে আমরা অসমর্থ ও দুর্ব্বল, আমাদিগের আজিও কাহার তাহা জ্ঞান নাই।

সে দিকে চিন্তা ও ভাবনাই নাই। কেবল মুখে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া বেড়াই মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে কি আমরা স্বাধীনতার অভিলাষী হইয়াছি? তাহা বোধ হয় নহে। তাহা যদি হইত, আমরা প্রতি কার্য্য, প্রতি প্রবৃত্তি, প্রতি দেশাচার, প্রতি রীতি নীতি, প্রতি অভিলাষ চিন্তা ও ভাব সেই তুলে পরিমাণ করিতাম। স্বাধীনতা লাভই যদি আমাদিগের এক মাত্র বাসনা হইত, তাহা হইলে আমরা সকল বিষয় অগ্রে সেই উদ্দেশ্য ধরিয়া পরীক্ষা করিতে শিখিতাম। তাহা কি আমরা করিয়া থাকি? যত দিন না তত দূর করিতে পারিব, যত দিন না কেবল তন্ময় হইব, ততদিন জানিব আমরা আজিও স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রকৃষ্ট রূপে উদ্যোগী হই নাই। যতদিন না আমরা আত্মানুসন্ধান করিয়া প্রতি কার্য্য প্রবৃত্তি এই স্রোতোমুখী করিয়া দিব ততদিন আমাদিগের সকল চেষ্টা ও যত্ন বৃথা হইয়া যাইবে। এক সমাজে দুই বিপরীত স্রোত কখন প্রবল হইতে পারিবে না। এক স্রোত আর এক স্রোতকে নিশ্চয় ফিরাইয়া দিবে।

যোগ।

বৈদিক ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় বলা হইয়াছে আর্য্যদর্শনে তাহাই বলা যাইতেছে। অন্যান্য যোগ-শাস্ত্রে সোম রস পানের ও পার্থিবামৃত সেবার বিষয় সামান্যাকারে উল্লেখ হইয়ায় আর্য্যদর্শনে তাহা বিশেষরূপে বলা হইল। এখন বায়ু পানের বিষয় যাহা বলা যাইতেছে তাহার পর অনল সেবার বিষয় ও সাধন চতুষ্টয় ও আত্ম সংযম ব্যাপার বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাইবে।

বায়ু পান করার পূর্ব্বে যতদিন রসনাগ্র সূক্ষ্ম ও লম্ব না হইবে তত দিন কঠিন দ্রব্যাদি আহার করিতে যোগীর ক্ষমতা থাকিবে। তৎপর জিহ্বাগ্র সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ হইলে কেবল পানীয় দ্রব্য মাত্র আহার চলিবে। পানীয়ের মধ্যে দুগ্ধ আর তরল ঘৃত ও মধু পান করিতে পারিবেন। ইহার পর ঐ জিহ্বা উলটাইয়া টাগরার ছিদ্রে প্রবেশ করিতে পারিলে আর আহার করিতে আবশ্যক হইবে না; তখন কেবল আত্ম-চিন্তা মাত্র ক্রিয়া থাকিবে। অন্য কোন ক্রিয়ার আবশ্যক হইবে না। ইহাকেই সমাধি অবস্থা বলা যায়। সমাধি হইলে আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তখন যোগী যাবৎ ব্রহ্মাণ্ডকে এক ব্রহ্মজ্যোতিঃ বলিয়া

জ্ঞান চক্ষুদ্বারা দেখিতে থাকিবেন। তখন তাঁহার আনন্দের চিহ্ন স্বরূপ চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু দর দরিত ধারায় পতিত হইতে থাকিবে। ইহা যোগ সাধনার চরম সীমা। ইহার পূর্ব্বে পঞ্চাগ্নি সেবা করিয়া শরীর ও শরীরস্থ জীবাত্মাকে সংশোধন ও অক্ষম করা হইবে। অগ্নির যে পাবকতা শক্তি আছে তাহা অমরকোষাভিধানে প্রকাশ আছে। যথা শুচি এই নামটি অমর কোষে ধৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পাবকও বলা হইয়াছে। পবিত্র কারককে পাবক আর শুদ্ধি-কর্ত্তাকে শুচি বলা যায়। পাবক শব্দে যেমন পবিত্রকারককে বুঝায় তেমনি রক্ষাকর্ত্তাকেও বুঝায়। এতাবতা অগ্নির রক্ষা-কর্তৃত্ব ও পবিত্র-কারকত্ব উভয় ধর্ম্ম আছে তজ্জন্য যোগী ও মুনিগণ অগ্নির সেবা সর্ব্বদা করিতেন।

বেদান্তসূত্র। ২৪।

বৈশ্বানরঃ সাধারণ শব্দ-বিশেষাৎ। তাৎপর্য্য—এই বৈশ্বানর শব্দে অগ্নিকে কেন বুঝায় এ সম্বন্ধে বেদ বলেন যে বিশ্বসংসারের নর অর্থাৎ কর্ত্তা যিনি তিনিই বৈশ্বানর। বিশ্বসংসারের কর্ত্তা পরমেশ্বর বৈ আর কেহই হইতে পারে না। যোগী সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পর মেশ্বরের সেবার কারণ পঞ্চাগ্নির সেবা করিতে থাকেন।

পঞ্চাগ্নি—অর্থাৎ যোগীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে এবং ঊর্দ্ধে প্রখর সূর্য্য রশ্মি থাকিবে। ঐ চতুর্দ্দিকস্থ অগ্নির উত্তাপে ও মস্তকস্থ সূর্য্য-কিরণে দেহকে পবিত্র ও রক্ষা করিতে থাকিবে। এবং অন্তরে বৈশ্বানর দেবকে নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকিবে। বাজসনেয়ীরা পরমাত্মাকে বৈশ্বানর বলিয়া গান করেন, ইহাও বেদান্তসূত্রের ২৬ সংখ্যায় পরিস্ফুট আছে। কি রাত্রি কি দিবা সকল সময়ে অগ্নির সেবা করিবে; দিবাভাগে পঞ্চাগ্নি, রাত্রিভাগে চারিপ্রকার অগ্নি সেবা করিবে। এরূপ ক্রমাগত তিনবৎসরকাল অগ্নিসেবা করিলে শরীর পবিত্র ও অরোগী হইবে, বিশেষতঃ অন্তঃকরণের যে চঞ্চলতা তাহা একেবারে বিদূরিত হইবে। দশবৈদ্যসমোবহ্নিরিতি। ইহার পর সাধন চতুষ্টয় করিবে।

সাধন-চতুষ্টয়।

সাধন-চতুষ্টয় তাহাকে বলি;—যথা নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহা মুত্রার্থফল-ভোগ বিরাগ, সমদমাদি ষট্‌কসম্পত্তি, মুমুক্ষুত্ব। আত্মানাত্ম-বিবেক দেখ। মহাপ্রলয়েও যাহার ক্ষয় নাই এমন যে পদার্থ তাহাকে নিত্য, আর মহাপ্রলয়াদিতে যাহার ক্ষয় জন্মে তাহাকে অনিত্য বস্তু বলা যায়। মহাপ্রলয়াদিতে পরমাত্মার ক্ষয় বা রূপান্তর হয় না। তদ্ভিন্ন আর তাবতেরই ক্ষয় বা রূপান্তর-প্রাপ্তি হয় বলে। আত্মানাত্ম বিবেক বলেন ব্রহ্মের সত্যং জগন্মিথ্যা। এইরূপ সংস্কার অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপ জন্মাইলে আত্মানাত্ম বিচারের যথার্থ ফল জন্মে। যে যোগীর আত্মানাত্ম বিচারের ফল জন্মে নাই তাঁহাকে ভাক্ত যোগী বলে। যাঁহার নিত্যানিত্য-

বস্তুবিচারের ফল জন্মিয়াছে তাঁহাকে শাক্ত যোগী বলা যায়। এরূপ সংস্কারজ যাঁহার জন্মজন্মান্তরীণ পুঞ্জপুঞ্জ থাকে তাঁহার ইহজন্মে অল্প পরিশ্রমে ঐ ফল লাভ হয়। তদন্যথায় ইহজন্মে নিত্যানিত্য বস্তুবিচার করিতে করিতে ফল না জন্মিয়াও যদি দেহত্যাগ করা যায় তবে হয় অব্যবহিত পর জন্মে, না হয় তৎপরজন্মে উহার ফল ফলিবেই ফলিবে। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব দেখ।

নিত্যানিত্য বস্তুবিচারের পর ইহামুত্রার্থ ফলভোগে বৈরাগ্য জন্মান চাই। অর্থাৎ ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যত সুখ আছে সে সকল সুখে উদাসীন হওয়া। যোগীর পক্ষে এরূপ সুখ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও ঘৃণাজনক। জীবাত্মাকে পরমাত্মারূপ প্রত্যক্ষ করায় যে সুখ জন্মে সে সুখ আর কিছুতে জন্মে না. এজন্য যোগিগণ ইহামুত্রার্থ ফলভোগ কামনা করেন না। অতঃপর শমদমাদি ষট্‌ক সম্পত্তির বিষয় বলা যাইতেছে।

শমদমাদি ষট্‌ক সম্পত্তি যথা। শম পদে অন্তরিন্দ্রিয়কে বশীভূত করা। অন্তরিন্দ্রিয়ার্থ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, প্রভৃতি—ইহা বেদান্ত-শাস্ত্রানুমত। শাব্দিকদিগের মতে কেবল মনই অন্তরেন্দ্রিয়। দমার্থ বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে বাধ্য করা। বাহ্য ইন্দ্রিয় শব্দে চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাক্য, হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ। উপরতি শব্দে অন্তঃকরণকে বাহ্য বিষয় হইতে জ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত করিয়া পরমাত্মাতে লিপ্ত করা। তিতীক্ষা—বিষয় বাসনাকে পরিত্যাগ করার যে বলবতী ইচ্ছা তাহাকে তিতীক্ষা বলা যায়। এই তিতীক্ষা কার্য্যভেদে দুইপ্রকার। তাবৎ বিষয় হইতে বাসনাকে অন্তরিত করা এক প্রকার তিতীক্ষা। আর বিষয়-বিশেষ হইতে মনকে নিবৃত্ত করা আর এক প্রকার তিতীক্ষা। যোগীদিগের পক্ষে তাবৎ বিষয় বাসনা নিবৃত্তিরূপ তিতীক্ষাই তিতীক্ষা। ধ্যানার্থ কোন একটি নির্দ্ধারিত প্রিয় বস্তুকে চিন্তা করা। সে চিন্তা এরূপ গাঢ় হইবে যে চিন্তিত ব্যক্তির নিকট ঢাক্‌ ঢোল বাজাইলেও—চিন্তিত ব্যক্তির চিন্তা ভঙ্গ হইবে না। যোগীবরেরা যোগসাধনাবস্থাতে ঐরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। একনিষ্ঠা চিন্তাই চিন্তা। নানাবিষয়িণী চিন্তাকে গৌণ চিন্তা কহে। মোক্ষ চিন্তার বিষয় কেবল একত্ব জ্ঞান। চিত্তের ধর্ম্ম চিন্তা। চিত্তকে বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন না করিতে পারিলে মোক্ষ চিন্তা হয় না। চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিবার উপায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিশুদ্ধচেতা ব্যক্তির চিত্ত নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় সুস্থির হয়। যতপ্রকার চিত্ত-প্রশমনোপায় বলা হইয়াছে তাহার তাবতি ফল-দায়ক, কিন্তু জন্মান্তরীণ সংস্কার আর সংসর্গই চিত্ত প্রশমনের প্রধান উপায়। ধারণার্থ ধেয় বিষয়টি নিরন্তর অন্তঃকরণে স্থিতি করা। যেমন শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর গোপাঙ্গনা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও মোহাবস্থায়

অন্তরে দেখিয়া বহুকাল জীবিতা ছিলেন। সেইরূপ যোগী সকল ধেয় বস্তুকে অনবরত প্রশান্ত চিত্তে সন্দর্শন করত মানব জন্ম সফল করেন। যে যোগী ধারণাক্ষম নন, তাঁহার চিন্তার ফল হয় না। যোগীকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইল। ধ্যান আর ধারণার পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধানুসারে তাবতেরই চলা উচিত। ধ্যানাভ্যাস করিতে করিতে ধারণার অভ্যাস হয়। ধারণার নিমিত্ত পৃথক্ কোন প্রক্রিয়া করিতে হয় না। যিনি যখন কোন বিষয় ধ্যান করিবেন তিনি ধেয় বস্তুকে যতক্ষণ মানস প্রত্যক্ষ না করিতে পারিবেন ততক্ষণ নয়নকে কেবল নাসাগ্র দর্শনে নিয়োগ করিবেন। নাসাগ্র দর্শন ভিন্ন ধ্যান ধারণার সুবিধা হয় না। এ নিমিত্ত শিব সংহিতাদি যোগ শাস্ত্রে নাসাগ্র দর্শনের বিধি আছে। যোগসিদ্ধ মহাত্মারা যোগ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। অতঃপর আত্ম-সংযমের বিষয় বলা যাইতেছে।

আত্ম-সংযমার্থ জীবাত্মাকে অবৈধ বিষয় ভোগ করিতে না দেওয়া। যে সকল বস্তুর সহিত জীবাত্মার ঐহিক পারত্রিকের সুসম্বন্ধ আছে সেই সকল বিষয়কে বৈধ বিষয় বলিয়া বেদে গীত হইয়াছে। যে সকল বস্তুর সহিত জীবাত্মার ঐ প্রকার সম্বন্ধ নাই তাহাকে অবৈধ বিষয় বলা যায়। অন্তর বাহ্য উভয় জগতীয় বিষয় মাত্রের সহিত জীবাত্মার বৈধাবৈধ সম্বন্ধ আছে সেই ভাল-মন্দ সম্বন্ধ নির্ব্বাচন করা মানবের প্রাথমিক কার্য্য। সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়া জীবাত্মাকে বিষয় ভোগ করাইলে শ্রেয় হয়। অন্যথা করিলে অশুভ ঘটে। এখন দেখা যাউক বাহ্য-জগতীয় যাবতীয় পদার্থের সহিত জীবাত্মার যে প্রকার সম্বন্ধ অন্তর্জগতীয় তাবৎ পদার্থের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি না। কি প্রাচীন আর্য্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কি অভিনব সর্ব্বজাতীয় জ্ঞানী—ইঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে বাহ্য-জগতীয় তাবৎ পদার্থের সহিত জীবাত্মার যে প্রকার সদসৎ সম্বন্ধ তদ্রূপ অন্তর্জগৎস্থ তাবৎ পদার্থের সহিতও ভাল মন্দ সম্বন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্ত্র শাস্ত্রে ষট্‌চক্র ভেদ করার যে সকল বিষয় চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে তৎ সমুদায় অন্তর্জগতীয় চিন্তা। আত্ম তত্ত্বই অন্তর্জগতের বিষয়। সেই আত্ম-তত্ত্বের সহিত জীবাত্মার যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাহ্য-জগতীয় কোন পদার্থের সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধ যে আছে এরূপ বোধ হয় না। কারণ বাহ্য জগতীয় যাবতীয় পদার্থ প্রাকৃতিক হেতু অসৎ। অন্তর্জগতীয় পদার্থ অপ্রাকৃতিক নিমিত্ত সৎ। মহাপ্রলয়াদিতে বাহ্য জগতের তিরোভাব হয়, অন্তর্জগৎ যেমন তেমনই থাকে। পৌরাণিক মতে যমালয় কৈলাস ধাম বৈকুণ্ঠধাম, গোলোক ধাম প্রভৃতি অন্তর্জগতীয় স্থান এ সকল স্থান পাপ-শূন্য শোক-দুঃখ-বর্জ্জিত নিত্য সুখের আস্পদ; কেবল যমালয় সুখ দুঃখের স্থান।

বাহ্য পদার্থের সহিত স্থূল পাঞ্চ-

ভৌতিক দেহের সম্বন্ধ যাহা আছে তাহা জানা সকলেরই বিশেষতঃ যোগী-দিগের অতীব কর্ত্তব্য। যে যোগী ইহা না জানিয়া আত্মসংযম করিতে যান তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি পক্ষে বিলম্ব ও বিঘ্ন হয়। জগতীয় যাবৎ পদার্থের সহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের শুভ ও অশুভ সম্বন্ধ আছে। যে যে পদার্থের সহিত স্থান ও কাল ও মাত্রাদি বিষয়ে সুসম্বন্ধ আছে তাহা সেব্য ও ব্যবহার্য্য আর যাহার যাহার সহিত ঐ প্রকারে কুসম্বন্ধ আছে তাহা অসেব্য ও অব্যবহার্য্য। এই প্রকার বিচার করিয়া কার্য্য করিলে আত্মসংযম করিতে কোন কষ্ট হয় না। আত্ম-সংযম অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। সদগুরুর সন্নিধানে কিছু কাল থাকিয়া তাঁহার উপদেশ ও তদনুযায়ী আচরণে শিক্ষিত হইতে পারিলে যোগ সাধনা যথার্থরূপে হইতে পারে। তাহা না হইলে কোন স্থানে কোন কালে কেহই যোগ সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ক্রমশঃ

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

কবি-হৃদয়।

১

আছে এক দেশ অতি চমৎকার—
সুখের ভাণ্ডার স্বরূপ যথা।
ভোলে শোক তাপ, যাতনার ভার,
লভে নানা সুখ যে যায় তথা॥

২

দিবসে সেখানে নিকুঞ্জ কাননে
কেবলি শুনিবে মধুর গান;
মধুর বাদনে, মধুর বদনে,
মধুর বচনে তুষিবে প্রাণ॥

৩

সেখানে যামিনী চন্দ্রমাশালিনী,
অমার আঁধার নাহি সে দেশে,
নাচে যুগে যুগে প্রমদা কামিনী
অপ্সরী জিনিয়া মোহিনী বেশে॥

৪

ঝর ঝর ঝর ঝরণা ঝরিছে,
অচলে সেখানে জ্বলিছে রতন,
শীতল সমীর সুরভি বহিছে,
সুরভি কুসুমে শোভিছে কানন॥

৫

রজত-লহরী শোভিছে পুলিন,
হীরক সফরী খেলিছে তায়,
হরিৎ বাগানে সোণার হরিণ
ধাইছে ত্বরিত তড়িৎ প্রায়॥

৬

অতি রমণীয় মণির মনিয়া,
আরো কত পাখী সুচারু বরণ
মুকুলিত শাখে সুখেতে বসিয়া
মধুর মধুর করিছে কূজন॥

৭

বীরের মুরতি দেখিবে সেথানে—
তেমন মুরতি দেখনি আর,
যে সকল ছাঁচে ভারত-আখ্যানে
দ্রোণ ভীমার্জ্জুন স্থতকুমার॥

৮

শান্তির প্রতিমা দেখিবে সেখানে,
করুণার ছবি অমৃতময়,
দেখিবে সেখানে বিহরে বিমানে
রূপে আলো করি দেবতাচয়॥

৯

না জানে ছলনা, দ্বেষ প্রতারণা;
সরলা, কোমলা ললনা তথা—
জিনি বিদ্যাধরী বিমল বরণা,
সুভাষে বিনাশে মনের ব্যথা॥

১০

তাহাদের প্রেম "হেম সমতুল"
দাহনে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়,
সেরূপ প্রণয় অমূল্য অতুল
পাবে কি খুঁজিয়া পৃথিবীময়॥

১১

যা কিছু সেখানে সকলি সুন্দর,
সকলি বিমল, অমিয়াময়।
পৃথিবী হইতে অনেক অন্তর
শোভন সে দেশ কবি-হৃদয়॥

শ্রীল।

ভারতের নীতি গৌরব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দ্বারা সংস্কৃত ভাষার আলোচনার ফল একটি নব পৃথিবী আবিষ্ক্রিয়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ ফলোৎপত্তির পূর্ব্বে পুরাবৃত্তের ও পুরাকালিক মানব জাতির অবস্থানুসন্ধান অন্ধকারে হাত হেলান মাত্র ছিল— ইহুদি অপেক্ষা পুরাতন জাতি নাই, গ্রীক অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভাষা পৃথিবীতে লক্ষিত হইত না, মিশর জাতি অপেক্ষা আদি সভ্য জাতি আর কেহ ছিল না, তখন ভারতবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য নিগর জাতি মধ্যে পরিগণিত মাত্র ছিলেন। যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা ইউরোপ খণ্ডে পর্য্যালোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত এই সমস্ত সংস্কার ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, ভারতবর্ষেরই কোন অংশে যে আদি আর্য্য জাতিদের বাসস্থান ছিল, এই স্থানেই যে সভ্যতার বীজভূমি, ভাষার আকর, ও পাশ্চাত্য সভ্য বর্গের পিতামহগণের জন্ম স্থান ছিল তাহা ক্রমে স্বীকৃত হইতেছে—ইহাও ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে যে বর্ত্তমান সভ্যতার অনেকানেক লক্ষণ, ভাষাসংস্করণ, সমাজ বন্ধন, দেবার্চ্চনা, সামাজিক ধর্ম্ম, দর্শন, কাব্য, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি ভারতেই প্রথমতঃ সংস্থাপিত বা আলোচিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান কালের সভ্যতা ভারতের পুরাতন সভ্যতার সংস্করণ মাত্র। নূতন

সৃষ্টি কিছুই নাই, যা ভারতে ছিল না, আজও কোথায় নাই। অবশ্য অপরাপর দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিজয় প্রতিপত্তি দেখিয়া ভারতবাসীরা হতাশ হইতে পারেন, আপনাদের অপেক্ষাকৃত অসভ্য নামে কলঙ্ক কালি লেপন করিলে চুপ করিয়া দেখিতে বাধ্য হন, কিন্তু মনে করা উচিত যে, কোন বিষয়ের আবশ্যক না হইলে আবিষ্ক্রিয়া হয় না, জীবনযাপন জন্য বা ঐহিক সুখসচ্ছন্দতা হেতু যা কিছু আবশ্যক তাহা সকলই ভারতে উপজাত হইত; তদ্ভিন্ন ঈশ্বর-তত্ত্ব ও মানসিক নীতিধর্ম্ম প্রচার ভারতে আর্য্য জাতিগণ এখন পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রধান। বোধ হয় শুনিলে অনেকে চমৎকৃত হইবেন যে অনেকানেক নীতিসম্ভব গল্প যাহা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সারাংশ বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং অনেকানেক পীর, পয়গম্বর, সেণ্ট বা যে ধর্ম্মাত্মাগণ রোমান কাথলিক গণের মধ্যে রোম নগরে বা লিসবন সহরে গির্জ্জাঘরে পরম পবিত্র খৃষ্টিয়ান ঋষি বলিয়া পূজিত হইতেছেন, তাঁহারা ভারত বাসী রাজতনয় শাক্য সিংহের স্বর্গীয় মূর্ত্তির বিকৃতি মাত্র। অজ্ঞ গোঁড়া পাদরী-দের সচেষ্টায় নামান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দুইটি কথা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই বোধ হয় নীতি প্রচার সম্বন্ধে যে সভ্য সমাজে ভারতের সর্ব্বোচ্চ আসন পাওয়া উচিত তদ্বিষয়ে আর কথা থাকিবেক না।

গল্প ও নীতি কথার প্রাচুর্য্য সংস্কৃত * সাহিত্যের ন্যায় আর কোন ভাষাতেই নাই। ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেন যে পশু, পক্ষী সম্বন্ধে যে সমস্ত নীতি কথা নানা দেশে প্রচলিত আছে তাহা ভারত-বর্ষেই প্রথমত রচিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ গল্পের বিশেষ চলন ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা দরিদ্র, কাঙ্গাল, নীচ জাতির মূঢ়গণকে নিজ ধর্ম্ম অবলম্বন করা-ইবার চেষ্টায় ছিলেন এই সকল লোককে বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে গল্প আবশ্যক হইত, ঐ গল্প গুলি সময় মত রচিত হইত, বা পূর্ব্বস্থিত শাস্ত্রশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়া কিঞ্চিৎ রূপান্তর প্রাপ্ত হইত—বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে ও পরে ব্রাহ্মণেরাও গল্প ছলে নীতির শিক্ষা দিতেন—এই গল্প সংগ্রহ মধ্যে পঞ্চতন্ত্র সকল অপেক্ষা বিখ্যাত। এই পঞ্চতন্ত্র হইতেই আবার নীতি সার পূর্ণ উপদেশ সংগৃহীত হয়। এই উভয় পুস্ত-কের মূলই ইংলণ্ড ও জর্ম্মণী প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছে ও ইংরেজি ফ্রেন্স এবং জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

এই সমস্ত গল্পের রচনা কাল নির্দ্দেশ করা কঠিন, কিন্তু খ্রীষ্টাব্দের ৫৫০ বৎসরে ঐ সকল গল্প পারশী ভাষায় অনুবাদ আছে—অতএব ঐ সময়ের পূর্ব্বে এই সকল নীতি কথা যে রচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই ইউরোপে প্রথমতঃ ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে

* "No ohter literature can vie with it in that respect." *Maxmüller.*

ফ্রেঞ্চ কবি লা ফন্‌টেন কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। তিনি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়াছেন যে "তাঁহার পুস্তকের বহুলাংশ গল্পই ভারতীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত পিলপে হইতেই ধার করিয়া লইয়াছেন" সেই গল্পের দুই একটী এই খানে আলোচনা করা উচিত।

"ডিম ফুটিবার পূর্ব্বে মুরগী বাচ্চার সংখ্যা গণনা করিও না" ইংরাজিতে এই কথাটি প্রচলিত আছে ইহা লা ফন্‌টেনের অনুবাদিত নিম্নলিখিত গল্পের তাৎপর্য্য মাত্র।

"পেরেটনাম্নী গোপিনী দুগ্ধ পাত্র মস্তকে লইয়া বাজারে যাইতেছিলেন ও জেগে জেগে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে তাঁহার দুগ্ধ যে কড়িতে বিক্রয় হইবে তাহাতে ১০০ শত অণ্ড খরিদ করিবেন, ঐ অণ্ডজাত মুরগী বিক্রয় করিয়া একটি শূকর ক্রয় করিবেন, তাহাকে খাওয়াইয়া মোটা করিয়া বিক্রয়ান্তে একটি সবৎস গাভি লইবেন, সেই বাছুরটি এই রকম পা ছুড়িয়া ফেলিবে বলিয়া পেরেট গোপিনীও পা ছুড়িলেন; কিন্তু পা•ছুড়িতে মাথা হইতে হাঁড়িটি পড়িয়া গেল, দুগ্ধ ছড়ান হইল, অর্থ সংগ্রহের সব আশা নিরাশ হইয়া রিক্ত করে গৃহে আসিয়া কিরূপে গোয়ালার হস্তে প্রহার হইতে অব্যাহতি পাইবেন তাহাই ভাবিয়া পেরেট গোপিনী অস্থির হইলেন।"

এই গল্পের রূপান্তর এলেনাসকার কর্ত্তৃক আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণের গল্প এই খানে মনে করা উচিত। পঞ্চতন্ত্রে এই গল্পটি আর এক ভাবে দেখা যায়।

"স্বভাব-কৃপণ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা তিনি কিঞ্চিৎ চাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উদর পূরণান্তে যাহা বাঁচিয়াছিল তাহা একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া একটি খুঁটিতে দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। এক রাত্রে আপন খাট সেই হাড়ির নিম্নভাগে রাখিয়া শয়ন করিলেন ও সমস্ত রাত্রে সেই হাঁড়ির দিকে দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন "এই পাত্রটি কানা পর্য্যন্ত চালে পূর্ণ। যদি এই সময় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় আমি উহা বিক্রয়ে শত টাকা পাইব, সেই টাকা হইতে ২টি ছাগল খরিদ করিব, ছয় মাস অন্তর তাহাদের বাচ্চা হইলে আমার এক পাল ছাগল হইয়া উঠিবে, তার পর ছাগলের বদলে গাই খরিদ করিব, তাহার বাছুর হইলে বাছুর বিক্রয় করিব, তার পর গাভি বিক্রয় করিয়া মহিষ খরিদ করিব, এবং মহিষের পর ঘোঁড়া কিনিব, যখন তাদের বাচ্চা হইবে, আমার অনেক ঘোঁড়া হইবে ও ঘোঁড়া বিক্রয় করিলে অনেক অর্থ হইবেক ঐ অর্থে আমি চকমক-সংযুক্ত একটি বাটি নির্ম্মাণ করিব,তাহা হইলে কোন না কোন ব্রাহ্মণ আপন সুন্দরী কন্যা ধন পণসহ আমায় সম্প্রদান করিবে, তাহার সন্তান হইলে আমি সোম শর্ম্মা নাম রাখিব, যখন সোম শর্ম্মা জানুতে বসাইয়া পড়াইবার উপযুক্ত হইবে আমি পুথি লইয়া আস্তাবলের নিকট বসিয়া পড়িতে থাকিব

সোম শর্ম্মা তাহার মাতার ক্রোড় হইতে লাফাইয়া আমার দিকে দৌড়িয়া আসিয়া যখন ঘোঁড়ার পায়ের নিকট পঁহুছিবে আমি ক্রুদ্ধ ভাবে ব্রাহ্মণীকে কহিব "ছেলে লয়ে জাও লয়ে জাও বলচি", কিন্তু ব্রাহ্মণী গৃহ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যদি আমার কথা না শুনে আমি উঠিয়া তাহাকে এমনি একটি পদাঘাত করিব" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ অন্যমনস্কে পা ছুড়িলেন পা উঠাইতে মৃৎপাত্রে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, চাল সমস্ত ব্রাহ্মণের গাত্রে ছড়িয়া পড়িল ও তাহাকে ধবলবর্ণ করিল. সোম শর্ম্মার পিতার মত যে বৃথা কল্পনায় ব্যস্ত হয় তাহার চালের ধূলা ও ধবল ত্বক মাত্র লাভ হয়।

হিতোপদেশে এই গল্পটি আবার পরিবর্ত্তিত দেখা যায়।

"দেবকোট নগরে দেব শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, শারদীয় পর্ব্বকালে তিনি এক থাল চাল দাল পাইয়াছিলেন। রৌদ্রে আক্রান্ত হইয়া ঐ চাল দাল সহ এক কুম্ভকারের দোকানের এক কোনে যাইয়া বসিলেন ও বসিবা মাত্র ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন। পাছে কেহ তাহার চাল উঠাইয়া লয় এই আশঙ্কায় তিনি একটি লাটি হস্তে লইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন 'এই চাল বিক্রয় করিলে দশ কড়া কড়ি পাইয়া সেই কড়িতে তৎক্ষণাৎ ভাঁড় ঠাঁট খরিদ করিব, এবং ক্রয় বিক্রয় করিতে করিতে আমার টাকা বৃদ্ধি হইবে ও সেই টাকায় সুপারি ও কাপড়ের কারবার করিতে করিতে আমি বড় ধনা হইব। তাহার পর আমি চারিটি বিবাহ করিব তন্মধ্যে যেটি সর্ব্বকনিষ্ঠা ও সুন্দরী হইবে তাহাকে বড় প্রিয় করিব, তাহা হইলে অপর ব্রাহ্মণীগণ তাহার সহিত সক্রোধে বিবাদ আরম্ভ করিবে, ঝগড়া নিবারণ জন্য আমিও তাহাদের অপেক্ষা ক্রুদ্ধ হইয়া যষ্টি হস্তে প্রহার আরম্ভ করিব' এই কথা ভাবিতে ভাবিতে হস্তস্থিত যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন তাহাতে কুম্ভকারের কয়েকটি ভাঁড় ঠাটসহ তাহার নিজ চালের পাত্র ভাঙ্গিয়া গেল. কুম্ভকার শব্দ শুনিয়া দোকানে আসিল, এবং ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিল।" ভাবী ঘটনায় যে অনর্থক আমোদ করে তাহার কেবল এই হাঁড়ি ভাঙ্গা ব্রাহ্মণের মত মনস্তাপ লাভ হয়।

গল্পান্তরে যদিও ব্রাহ্মণ-তনয় গোপিনী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন তত্রাপি পঞ্চতন্ত্র কথায় যে লা ফনটেনের নীতিকথার ভিত্তি তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই গল্প ভারতভূমি হইতে ফরাসী দেশে কি প্রকারে গেল ও সংস্কৃত-বেশ ত্যাগ করিয়া ফরাসীর বেশ ধারণ করিল? এই কৌতুক কিসে তৃপ্ত হইতে পারে। কোন অধ্যাপক লিখিয়াছেন উপকথার সঞ্জীবনী শক্তি অতি বৃহৎ বোধ হইতেছে। ভাষা পরিবর্ত্তন হইতেছে, রাজ্য ধ্বংশ হইতেছে তত্রাপি নীতিকথার মার নাই। সহস্র সহস্র বৎসর দূর দূরান্তে পাঠশালার ছেলেদের মুখে মুখে সমান ভাবে জল্পিত হইতেছে

কিন্তু যে প্রণালীতে এই গল্প ভারতবর্ষ হইতে ক্রমে পশ্চিমাঞ্চলে গমন করে সে প্রণালী এই গল্পের নীতি অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও শিক্ষাপ্রদায়ী। স্বল্প কথায় সেই প্রণালী উদ্ধার জন্য ভারতবাসীরা অধ্যাপক মক্ষমূলারের নিকট চিরবাধিত থাকিবেন। অধ্যাপক এক স্থানে লিখিয়াছেন "উনিশ শতাব্দীতে এই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম-প্রধান দেশে আমরা যে আপনাপন সন্তানগণকে ঐহিক জ্ঞান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রদান করিতেছি তাহা ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিরোধী পৌত্তলিক ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের পুস্তক হইতে ধার করা হইয়াছে। ঐ কথা অনেকের বিশ্বাস হওয়া সুকঠিন কিন্তু সেই জ্ঞান এক কি দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন বিজন পল্লীতেই আলোচিত হয় ও সেই সুদুর্লভ বীজ সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া নর বা অমর লোকের সম সমাদৃত, অর্থাৎ বালক হৃদয় স্বরূপ সৎ-ক্ষেত্রে শত শত গুণ ফলোৎপাদন করিতেছে। কোন নিয়ম-প্রবর্ত্তক কোন বিজ্ঞানবিৎ লোকই সেই গল্পরচয়িতার ন্যায় বহুকালব্যাপী সুবিস্তার সম্পূর্ণ প্রতিপত্তি আজ পর্য্যন্ত স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে গল্পে লোকটি যে কি ছিলেন তাহা নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। মানব জাতির অন্যান্য প্রকৃত হিতার্থীর ন্যায় তাঁহার নাম বিস্মৃত। কেবল এই মাত্র জানা যায়—তিনি এক জন সেই ভারতবর্ষবাসী, যাহাদিগকে কেহ কেহ নিগার নাম দিয়া থাকেন। তিনি দুই সমাপ্তি বৎসর পূর্ব্বে মাত্র জীবিত ছিলেন"।

নানা পথে ও নানা প্রণালীতে পঞ্চতন্ত্রের গল্প সকল এক নগর হইতে অন্য নগরে গিয়াছিল, নানা প্রকারে সেই গল্প গুলির রূপান্তর হয়, ও নীতিশিক্ষা, দেবার্চ্চনা বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিস্তার মানসে সেই গল্প সকল ইউরোপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সকল কথার আলোচনা সাধারণতঃ বিস্ময়কর ও আমোদপ্রদায়ী, কিন্তু ভারতবাসীদের পক্ষে অবশ্যই গৌরবের বিষয়। এই গল্প চলাচল সম্বন্ধে নানা কথা উপস্থিত হইয়াছে। এক এক বার এমন মনে হয় যে যৎকালে আদিম আর্য্যগণ আপনাপন আদি গৃহ ছাড়িয়া নানা স্থানে উপনিবেশ জন্য গমন করেন, তখন দেবতাদের নাম, ভাষা, নীতিশিক্ষা, প্রহেলিকা, বীরগণের কাহিনী সহ কতক গুলি গল্প লইয়া যান, কিন্তু এই কথা অনুমান দ্বারা মীমাংসা হওয়া কঠিন। এই মাত্র দেখা যায় যে কতকগুলি কথা অতি পুরাতন কাল হইতে সর্ব্ব দেশে সমান প্রচলিত আছে। দিব ধাতু হইতে উৎপন্ন কয়েকটি শব্দে সকল দেশেই দেবতার নাম বুঝায়। ভারতে দেবেন্দ্র ও ইন্দ্রদেব ও গ্রীসে দিয়স বা জিয়সের সাদৃশ্য অতি চমৎকার। উভয়েই বজ্রপাণী, পর্ব্বতবাসী, উভয়েই দাম্ভিক ও বিলাস সুখ সম্ভোগে দোষান্বিত, উভয়েই বারিদাতা। এক জন বৃত্রাসুর-হন্তা, এক জন টাইটস্-দানব-হননকারী। উষা

অরুণের কন্যা বলিয়া অনেক আর্য্যজাতীয় কবিরা উল্লেখ করেন। আবার নীতি সম্বন্ধে একটি কথা অনেক জাতির মধ্যে সমান প্রচলিত। যেমন কোন পীড়িত সিংহকে যে সকল শৃগাল দেখিতে যাইয়াছিল, তাহাদের গর্ত্তমুখে প্রত্যাগমনের পদচিহ্ন না দেখিয়া একটি দূরদৃষ্টি শিবা প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হয়। এই গল্প হইতে উভয় সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষায় সম সদৃশ একটি কথা চলিত আছে। "পরের চরণতল দেখে চলা ভাল"। আবার সিংহের মামা ভোম্বল দাসের গল্প সর্ব্বত্র প্রচার আছে। ভারত ক্ষেত্রে অজা, বৃদ্ধ সিংহের চর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, সিংহের মামা সাজিয়া সিংহ-প্রসাদে নির্ভয়ে কিয়ৎ কাল বনে বিচরণ করিয়াছিল। সেই গল্প হইতে "হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য মহদাশ্রয়ঃ" নীতি প্রচার হয়। আবার গ্রীস দেশেও একটি গর্দ্দভ এইরূপ বলবৎ জন্তুর চর্ম্মে ভূষিত হয়, ও শুনা যায় তদনুরূপ একটি অবিকল গল্প চীন রাজ্যে ও প্রচলিত আছে। প্রভেদ এই মাত্র যে গর্দ্দভ সিংহ গর্জ্জন করাতে আপন সুস্বর বাহির করেন তাহাতে ধৃত হইয়া লজ্জিত হন। বোধ হয় বড় লোকের মামা সাজা সকল দেশে লোকের অভ্যাস থাকায় সকল স্থানে এইরূপ গল্পের সৃষ্টি হয়। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে পঞ্চতন্ত্রে যে সকল নীতি কথা এখন পাঠ করিতে পাওয়া যায় তাহা হিন্দু পণ্ডিতেরা সেকেন্দার বাদসা'হর সঙ্গীদের নিকট গ্রীক ভাষা হইতে প্রাপ্ত হন। কেহ এমনও মনে করিতে পারেন, যে বাইবলের অনেক কাহিনী পাদরি পরিভ্রামকগণ হিন্দু স্থানে সময়ে সময়ে আনিয়াছিলেন সেই গুলি আবার চিরধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ আপনাদের পুস্তকে লুকিয়ে লুকিয়ে লিখিয়া লইয়াছেন। এই সকল কথার মতামত মীমাংসা করার আমাদের আবশ্যক নাই। হতে পারে দুই একটি গল্প বা নীতি সম্বন্ধে উপকরুক্ত অনুভবই সত্য। আবার কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে আর্য্য জাতির মনোভাব বা কল্পনা শক্তির সাদৃশ্য হেতু তাহারা নানা স্থানে বাস করিতে যাইয়াও বিনা পরামর্শে এক এক বিষয়ে একই প্রকার গল্প সৃজন করিয়াছেন। অধ্যাপক মৃত উইলসন সাহেব সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে ট্রয় নগরের ঘোড়ার উপাখ্যান হিন্দুদের লিখিত কোন গল্পেও প্রচলিত আছে; প্রভেদ এই মাত্র দেখা যায় যে ট্রয়ের অশ্ব ভারতে আসিয়া হস্তিরূপ ধারণ করিয়াছে। ট্রয় নগর নয় বৎসর অবরোধের পরেও গ্রীক যোদ্ধাদের হস্তে পতিত হইল না, তজ্জন্য একটি বৃহৎ কাষ্ঠের ঘোড়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রশস্ত উদর মধ্যে যোদ্ধৃগণ লুকাইয়া রহিলেন, অপর সকলে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়িয়া গেলেন, ট্রয়-নগর-বাসীগণ ঘোড়াটি নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে লইয়া সাজাইয়া রাখিলেন, তাহাতে যোদ্ধৃগণ সময় পাইয়া নগর আক্রমণ করিয়া জয়ী হইলেন। সংস্কৃত পুস্ত-

কের গল্পটি আবার এই--কোন রাজা একটি উপযুক্ত পাত্রকে জামাতা করিবার ইচ্ছায় একটি হাতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উদরে কতকগুলি যোদ্ধা লুকাইয়া পশুটি জঙ্গলে রাখিলেন, সেই জঙ্গলে পাত্র শীকার করিতে আশায় অস্ত্রধারী পুরুষগণ হাতির উদর হইতে বাহির হইয়া তাহাকে ধরিয়া রাজার নিকটে হাজির করিল। সিংহল দ্বীপের প্রাচীন পুরাবৃত্তে মহাবংশে কুমার বিজয় সিংহের কুবেণীনাম্নী যক্ষিণীর কুহকে পড়িবার উপাখ্যান হোমর প্রণীত ইলিয়ডের ইউলিসিস্‌ বীরের কারবস উপদ্বীপের সাইরেন কাহিনীর সহিত কেমন সাদৃশ্য দেখা যায়? সার ইমারসন টেনেণ্ট লিখিয়াছেন অনুমান হয় যে হোমর পাঠ করিয়া মহাবংশ লিখিত হইয়া থাকিবেক; উভয় স্থানে যক্ষিণীর সমান কুহক ও সমান চতুরালি, কেবল কুবেণী বিজয়ের অনুচরগণকে শূকর করিয়াছিল, স্থানান্তরে ইউলিসিসের সঙ্গীগণ গুহা মধ্যে ভেড়া হইয়া আবদ্ধ ছিল। এখানে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কামরূপে পুরুষকে ফেড়া করিয়া রাখিবার যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাও কি বাঙ্গালিদের হোমর পাঠের ফল? প্রকৃতার্থে এই তিনটী গল্পই কবির সৃজন, লাবণ্যময়ীগণের মোহিনী-শক্তি-প্রদর্শক মাত্র। আবার অন্যান্য লেখকের মত অন্য রকম শুনা যায়। কেহ বলেন "পূর্ব্বকালীয় আর্য্যগণ, সকল জাতি অপেক্ষা কেবল প্রাচীন না হউন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও তীব্রতা সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"। ইহাঁদের মতে বাইবলের অনেকানেক কাহিনী আর্য্যজাতিদের পুরাতন গল্প ইয়ুদিরা সংগ্রহকার মাত্র—আবার অল্প দিন হইল কোন লেখক কহিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতে কোন কোন উপাখ্যান বাইবল হইতে গৃহীত। এই বিস্ময়ের উত্তরে জেকুলেট মহাত্মার দুইটী প্রশ্ন এইখানে উদ্ধৃত করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিব "ইহুদি ও হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীন? পুরাতনটি নূতনের নকল বলা কি সঙ্গত?" যাহা হউক, এ সকল কথা, কল্পনা-বায়ুর হটাৎ উৎপত্তি বলিলেও বলা যায়; কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের গল্প সম্বন্ধে আনুমানিক তর্ক আবশ্যক নাই, পঞ্চতন্ত্রের গল্প যে প্রণালীতে অনুবাদ হইয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া যায় তাহা অনুমানের অধীন নহে, পুরাবৃত্তের দ্বারা প্রতিপন্ন, যাহা মুক্তারেরা কহিয়া থাকেন "হাতে কলমে ধরা কেতাবী বাত" অনুবাদকগণের নিজ লেখনীতেই স্পষ্ট প্রকাশ।

এই অনুবাদের মধ্যে সর্ব্ব-পুরাতন পারসী পুস্তক "কলিল দমিনা" (সংকরতক দমনক)। খসরু নসেরেঁায়া বাদসা শুনিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে নীতিসম্বন্ধে অনেক পুস্তক প্রস্তুত আছে, সেই সকল সংগ্রহ করিতে উভয় পারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় নিপুণ কোন ব্যক্তিকে বাছিয়া নিযুক্ত করিবার জন্য তখন আপন উজির বুজুরক মিহিরের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করেন,

তদনুযায়ী বরযুজ নামা একজন সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক সেই কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি ভারতে পরিভ্রমণ করিয়া পুস্তক সংগ্রহ করেন, পুরাতন পারসী বা পালবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া খসরু রাজের দরবারে লইয়া যান, তজ্জন্য তিনি অপর পুরস্কার সমস্ত তুচ্ছ করিয়া সম্মান-চিহ্ন স্বরূপ বাদসাহের নিকট হইতে একটী পোষাক মাত্র গ্রহণ করেন; স্থানান্তরে আর একটি কথাও লিখিত আছে যে এই সুচিকিৎসক শুনিয়াছিলেন যে ভারতে মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা বৃক্ষ বা জড়ি মাত্র। বাদসাহের হুকুমে সেই জাতির সন্ধানে বরজু ও ভারতে আসেন, তথায় জ্ঞানী লোকদের সহিত কথোপকথনে জ্ঞাত হন যে জড়ির গল্প, আত্মা-সম্বন্ধীয় রূপক মাত্র। যে জন মূর্খতা বা পাপে মৃতবৎ হইয়াছে তাহাকে বাচাইবার ঔষধি স্বরূপ নীতি-নিকর ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে স্থাপিত আছে; তাহাতেই তিনি "কালিল দামনি" অনুবাদ করেন। আবার দুইশত বৎসর পরে আরো পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ বাগদাদ নগরে এই পুস্তক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরব্য ভাষায় আবদল্লা কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া আলমানসার খলিপার Almanvar Khalipa দরবারে অর্পিত হয়। এই গল্প সমস্ত ইউরোপের তাবৎ রাজ্যে বিস্তার হইয়া স্পেন প্রদেশে খলিফাদের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছ। পরে খ্রীষ্টীয় ১০৮০ সালের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে বা পরে সাইমন নামক একজন ইহুদি ইহা গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন, আবার গ্রীক হইতে লাটিনতে ও ইটালিয়ান ভাষায় তরজমা হইয়াছে। কখন কখন কোন মহাত্মা নিজ কবিত্ব শক্তি দেখাইবার জন্য পদ্য ও গল্প রচনা করিয়াছেন, বালকদের পাঠোপযোগী ইংরেজি পুস্তকেই এক পেরেট এলেলাঙ্কা প্রভৃতি তিন রকম গল্প দেখা যায়। এইরূপ পাঁচ নকলে আসল খাস্তা হইয়াছে, তত্রাপি ভারতের বুড় গল্পে ব্রাহ্মণের গৌরব অপ্রতিহত রহিয়াছে।

আবার আর-এক পথে হিব্রু হইতে ইটালিয়ান ভাষাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তৃতীয় পন্থায় আর দেখায়—আরবি তর্জ্জমা হইতে কোন পারসী কবি নসির আল্লা ১১৫০ খৃঃঅব্দে পারসিকে অনুবাদ করেন এবং এই অনুবাদ হইতে স্পেহীনগরবাসী ডোরড্ সাহেব গল্প গুলি ফ্রেন্স ভাষাতে সজ্জিত করেন। বোধ হয় এই ফ্রেন্স অনুবাদ হইতেই কবি লা ফনটেন আপন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টিয় ১১। ১২ ও ১৩ শতাব্দীতে ইউরোপ রাজ্য সমস্তে এই সকল গল্পে লোক এতদূর অনুরাগী হয় যে কোন বিখ্যাত অধ্যাপক লিখিয়াছেন বোধ হয় তাহাদের ধর্ম্ম-পুস্তক বাইবেল ভিন্ন আর কোন পুথি এত দূর পাঠ্য ছিল না। ধর্ম্মোপদেশ, নীতিকথন, প্রহেলিকা কাহিনী খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের নীতি সারত্ব সংস্থাপন হেতু অনেকেই এই গল্প

সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। অনেক স্থানীয় ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ও বহুদিন পর্য্যন্ত বিলাত প্রদেশে বাস করিয়া তাহাদের পূর্ব্বাঞ্চলীয়-বেশ-ভূষা-ত্যক্ত হইয়া ক্রমে গল্প গুলি বিলাতি রূপ ধারণ করিয়াছে। *এখন ভারতবাসীদের মুখে* এই গল্প শুনিলে পাদরি মহাত্মারা মনে করেন যে তাঁহাদের জ্ঞান-সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম পুস্তক হইতে গল্প গুলি অপহৃত হইয়াছে।

কিন্তু স্বভাব-কৃপণ ব্রাহ্মণ কি প্রকার পেরেট গোপিনী-রূপিণী হইলেন? মক্ষমুলার সাহেব লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ কোন কোন গল্পে চাষার বলিয়া উল্লেখ হয়, তার পর গল্পটি রঙ্গিন করিবার জন্য চাষার আবার গোয়ালিনীতে পর্য্যসিত হইয়াছে। লাফণ্টেন কবি ছিলেন তজ্জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ত্যাগ করিয়া সুন্দরী গোপিনীকে আপনার পুস্তকে স্থান দান করিয়াছেন।

নীতি সম্বন্ধে ভারতের নিকট সমস্ত সভ্য রাষ্ট্র এই প্রকার ঋণী, এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি মাত্র উপাখ্যান বক্তব্য। ধর্ম্মাত্মা জোসেফঠ করনেল তাবৎ খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের পূজ্য। উভয় পূর্ব্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রতি বৎসর ২৬ ও ২৭ নভেম্বর তারিখে তাঁহার অর্চনা হইয়া থাকে, হুগলি নগরের নিকটবর্ত্তী বানাতগাড়ির গিরজায় এই নবেনা পর্ব্বই অনেকেই দেখিয়া থাকেন। এই সাধুর সৃষ্টি কৌশল অতি কৌতুক-জনক। বাগদাদের যে খলিফা আলমানসায়ের দরবারে "করটক দমনক" অনুবাদক আবদাল্লা প্রতিষ্ঠিত, সেই দরবারে আর একজন সরজিয়স নামা খ্রীষ্টীয়ান রাজকোষাধ্যক্ষ বা খাজাঞ্চি ছিলেন, তাহার জন নামে এক সন্তান ছিল; জন কোন ইতালিয়ন *পাদরি দ্বারা শিক্ষিত ও ধর্ম্মনীতিতে দী*ক্ষিত হন, পিতার মৃত্যুর পরে জন তাহার কার্য্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু কিঞ্চিৎকাল পরে দামাসকাস নগরে মঠবাসী সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হন, এই সময়ে অপরাপর পুস্তক মধ্যে বারলেন ও জোসেফট সাধুদের বিবরণ জন কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়, সে গল্প এই "ভারতবর্ষে এক রাজা ছিলেন তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের চির শত্রু ও পীড়ক তাহার এক মাত্র সন্তান ছিল। জ্যোতিষ্কগণ গণনা করিয়া কহিয়াছিল যে সে রাজকুমার নব ধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। তজ্জন্য যাহাতে কুমার পৃথিবীর দুঃখ যাতনা হইতে অন্তর থাকিয়া বিলাস সম্ভোগেই কাল যাপন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে রাজা বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু কোন খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসী রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে রাজকুমার কেবল নব ধর্ম্ম অবলম্বনে ক্ষান্ত না হইয়া ঐহিক সমস্ত অর্থ ত্যাগ করিলে পরে নিজ পিতাকেও নব ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া বনে গমন করেন"; খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাই এই পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য। এই পুস্তকের রাজপুত্র খ্রীষ্টীয় সমস্ত চর্চ্চেই

সমান পূজ্য, তাহার গল্পটি প্রথমে গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়। পরে চালড়িয়া, আরবী, মীশর, আরমানী, ও ইহুদি-দের ভাষায় পূর্ব্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে লাটিন ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জর্ম্মনি, এস্-পেনিস্, ইংরেজি ও আইসলণ্ডের ভাষাতে পর্য্যাপ্ত অনুবাদ হইয়া বারনাম জোসেফট সর্ব্বত্র পূজ্য, সকলের সম অনুরাগ-ভাজন হয়, আবার একজন জিষুট মিস নারি দ্বারা ফিলিপাইন উপদ্বীপের ভাষায় এই গল্পটী প্রচার হয়, এখন একবার ললিতবিস্তার বৌদ্ধ দেবের কাহিনীর সহিত বারনেম জোসেফেটের জীবন-বৃত্তান্ত মিলাইয়া দেখা যাউক্। বৌদ্ধের পিতা ও রাজা ছিলেন, বৌদ্ধের জন্মের প্রাক্কালে জ্যোতির্ব্বেত্তারা শুনিয়া বলেন যে তিনি গৌরবান্বিত হইবেন, হয় মহারাজা হইবেন নচেৎ রাজসিংহাসনত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া সর্ব্বজ্ঞান লাভ করিবেন, যাহাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী না হন রাজা তাহাই চেষ্টা করেন ও তাঁহাকে বিলাস সম্ভোগী করিবার জন্য রম্য উদ্যানে স্থিত করেন, কিন্তু পরে তিনি মানব দুঃখ দর্শনে জীবনের অসারত্ব দেখিয়া রাজ্য ত্যাগ করেন ও বৌদ্ধ হন। গল্পের সহিত আরো সাদৃশ্য এই উভয় জোসেফট ও বৌদ্ধ আপন আপন পিতাকে নব ধর্ম্মাবলম্বী করেন ও উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া মানব মণ্ডলীতে পূজ্য হন। জন আরো লিখিয়াছেন যে তাঁহার গল্প প্রকৃত, ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছিলেন। এমত স্থলে খ্রীষ্টিয়াবতার সেণ্ট জোসেফট গৌতম শাক্যমুনির রূপান্তর মাত্র বলা কি অসঙ্গত? * ইউরোপে অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সাদৃশ্য স্থির করিয়াছেন, যেমন-পেরেট নাম্নী গোপিনী ভারত-প্রজাত নীতি-কথা হইতে উৎপন্ন, তেমনি জোসেফট বৌদ্ধ অবতারের প্রতিরূপ—খ্রীষ্টিয়ানদের মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করা উচিত। লজ্জা কি? বৌদ্ধদেবের মত এরূপ অকৃত্রিম স্বর্গীয় পুরুষ আর কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? প্রকৃত দয়ার সাগর সত্য-নিষ্ঠ শাক্যসিংহের ন্যায় আর কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়? মানব জাতির উদ্ধার হেতু তাঁহার মত যৌবন-সুখ, রাজ্য-সুখ, সংসার-সুখকে অবলীলা ক্রমে ত্যাগ করিয়া "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" প্রচারের সন্ন্যাসাশ্রম আর কে গ্রহণ করি

---

*স্থানে স্থানে জনের লিখিত জোসেফটের জীবন-বৃত্তান্ত ও বৌদ্ধ দেবের চরিতাবলির সৌসাদৃশ্য দেখিয়া মোক্ষমূলার অনুমান করেন যে জন কেবল বাচনিক কথায় নির্ভর না করিয়া বোধ হয় ললিত বিস্তার পুস্তক যথার্থই দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তিনি উভয় ধর্ম্মাত্মার পরিভ্রমণ বিবরণটি উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে সংস্কৃতে মানব—জীর্ণতার প্রসঙ্গে যে যে কথা ব্যবহার হইয়াছে, জন-কৃত গ্রীক পুস্তকে অবিকল সেই গুলিই প্রয়োজিত দেখা যায়—যথা বৃদ্ধ old, বলিনিচিত-কায় wrinkled, প্রবেধয়মান weak in the kurr, কুব্জ bent, পলিত কেশ grey, সর্ব্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গেঃ in all limbs, খণ্ড দন্ত toothless &c.

Max Muller.

য়াছেন? কোন্ সাধুর চরিত্রে ও জীবনে এই রাজকুমার সন্ন্যাসী এবং সাধুর সহিত তুলনা হইতে পারে?

পুরাবৃত্তের এই উপন্যাসটি ভারত বাসীদের প্রকৃত গৌরব স্থল। প্রতি বৎসর ২৭ নবেম্বর নবেনা উৎসবে এই ভারতক্ষেত্র বেঙ্গেল প্রভৃতি গিরজ্জা-প্রাসদে স্থানে স্থানে যে শত শত দীপ চঞ্চল শিখায় জ্বলিয়া থাকে তাহা ভারতের প্রদীপ্ত গৌরব-শিখা বলিয়া সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের স্বীকার করা উচিত বোধ হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

মূল বিশ্বাস ও জ্ঞান।

১ সূত্র। যাহা কিছু বাস্তবিক আছে তাহাকে দ্রব্য কহা যায়।

দ্রব্যের অস্তিত্ব কোন ব্যক্তির কল্পনা অথবা জ্ঞানের বস্তু হইতে পারে কিন্তু তৎ সাপেক্ষ নহে। একবার জ্ঞানগোচর হইলে দ্রব্যের বাস্তবিক অস্তিত্ব বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না। যাহা কিছু যথার্থই আছে তাহাই দ্রব্য *।

আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি, আস্বাদন, আঘ্রাণ বা স্পর্শ করি, তাহা কোন দ্রব্যের গুণ মাত্র; প্রকৃত দ্রব্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। যাহা কিছু অনুভব করি, স্মরণ করি, বিচার করি, বুঝি, বা ভাবি তাহা কোন এক দ্রব্যের গুণ মাত্র; দ্রব্য, ভাবনার অতীত। যাহা কিছু উপলব্ধি করি, তাহাও দ্রব্যের ভাব মাত্র। প্রকৃত দ্রব্য উপলব্ধির বিষয় নহে। দ্রব্য যখন মানবজ্ঞানের অতীত হইল, মানব তখন কোন দ্রব্যই জানিতে, ভাবিতে, বা বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে কোন দ্রব্য না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতাম না, জানিতাম না, ভাবিতাম না বুঝিতাম না। দ্রব্য জ্ঞানের বস্তু বা আধার। জ্ঞান ব্যতীত দ্রব্য থাকে, কিন্তু দ্রব্যাভাবে জ্ঞান হয় না। জ্ঞানগ্রাহ্য গুণ সমূহের অদৃষ্ট আধার, দ্রব্য।

২ সূত্র। দ্রব্য বিশ্বাস দ্বারা উপলব্ধ, বিশ্বাস দ্রব্যজ্ঞানের পন্থা। বিশ্বাস জ্ঞানের অতীতকে স্পর্শ করে, বিশ্বাস জ্ঞানের মূল।

বিশ্বাস না থাকিলে দ্রব্য আমরা কখনই জানিতাম না। দ্রব্য যে বাস্তবিক আছে তাহা আমাদিগের জ্ঞানের সাপেক্ষ নহে, তাহা বিশ্বাসের বস্তু। ইহা বিশ্বাসেরও সাপেক্ষ নহে। তুমি বিশ্বাস কর, আর নাই কর, দ্রব্য আছে। দ্রব্য যথার্থই আছে বলিয়া, আমরা বিশ্বাস

* Substance

করি। যাহা বাস্তবিক নাই, তাহাও কখন কখন লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা উপবিশ্বাস মাত্র। প্রকৃত দ্রব্য ও প্রকৃত বিশ্বাস না থাকিলে, এই উপবিশ্বাসও হইত না। যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে কল্পনা অসম্ভব, তেমনি প্রকৃত বিশ্বাস না থাকিলে উপবিশ্বাসও অসম্ভব। কল্পনার ন্যায় উপবিশ্বাস বিশ্বাসের অনুকরণ মাত্র, এবং উহা দ্রব্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত। কিন্তু যেমন কল্পনা অসত্য বলিয়া কল্পনার মূল প্রত্যক্ষজ্ঞান অসত্য নহে তেমনি উপবিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস ভ্রান্ত বা কাল্পনিক নহে।

বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করা মনুষ্য প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বাস মনুষ্য প্রকৃতির বিশ্বাস্য। তাহাকে অবিশ্বাস করিলে অবিশ্বাসকে অবিশ্বাস করিতে হয়, এবং তাহা হইলে পুনঃ বিশ্বাস বিশ্বসনীয় হয়। এই বিশ্বাস প্রকৃতি মূলক ও যথার্থ। পণ্ডিতেরা এই বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করিয়া বহুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিজ্ঞানবেত্তারা বিশ্বাসকে উপহাস করিয়া আপনারাই উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। মনস্তত্ত্ববেত্তারা আত্মজ্ঞানাভিমানে বিশ্বাসকে পরিহার করিয়া মূর্খতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং মনস্তত্ত্বকে অসম্ভব প্রলাপ মাত্র করিয়া তুলিয়াছেন। বিশ্বাসকে ছাড়িয়া পণ্ডিত মূর্খ হয়েন এবং বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া মূর্খ পণ্ডিত হয়েন। বিশ্বাসের কাছে মূর্খ পণ্ডিত নাই, সকলেই সমান।

বিশ্বাস জ্ঞানের মূলভিত্তি। বৃক্ষ, হর্ম্ম্যাদি যেমন অদৃশ্য মূল ও ভিত্তির উপর সংস্থিত, জ্ঞান তদ্রূপ অজ্ঞাত বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। বিশ্বাসকে হরণ কর, জ্ঞান প্রলাপ মাত্র হইবে। বিশ্বাস জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আছে; বিশ্বাস না থাকিলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান আবার বিশ্বাসের শাসন কর্ত্তা। বিশ্বাস ভ্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে। বিশ্বাস প্রকৃতিস্থ থাকিলে জ্ঞানের মূল মাত্র থাকে। জ্ঞাতব্য মধ্যে আপন অধিকার প্রচার করিতে যায় না। তাহা হইলেই অতিবিশ্বাস বা কুসংস্কার জন্মে। জ্ঞানের চর্চায় এই সকল উপবিশ্বাস ধ্বংস হয়। উপবিশ্বাসের প্রতি বিরাগ প্রযুক্ত জ্ঞানীরা আবার বিশ্বাসের প্রকৃত অধিকারের উপর অত্যাচার করিয়াছেন। তাহাতেই মনোবিদ্যাকে, ও দর্শন শাস্ত্রকে ঢেকির কচ্‌কচি বলিয়া উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছে। জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়, কিন্তু অধিকার পৃথক্ পৃথক। এই অধিকারচ্যুত হইলে সকলই বিকৃত হইয়া যায়। এই জ্ঞান ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে বিশ্বাসেরই জয় হইয়া আসিয়াছে। বিশ্বাস মনুষ্যকে অন্ধ করিয়া জ্ঞানকে তাচ্ছিল্য করায় বটে, তত্রাচ মনুষ্যের জীবন যাত্রার ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু জ্ঞান বিশ্বাসকে অতিক্রম করিয়াও বিশ্বাসকে একেবারে তিরোহিত করিতে পারে না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসী লোক জীবন যাত্রায় ও সামান্য বিষয় ব্যাপারে

বিশ্বাসকেই অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকে, জ্ঞানকে তখন ফেলিয়া দেয়।

অতএব দ্রব্য বিশ্বাস দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উহা বিশ্বাসের সাপেক্ষ নহে। বিশ্বাস না করিলেও উহার অস্তিত্ব সমানভাবে থাকে। বিশ্বাস আবার জ্ঞানের মূল; উহা জ্ঞানের সাপেক্ষ নহে। জ্ঞান বিপরীত ভাব ধারণ করিলেও বিশ্বাস সমভাবে থাকে। বিশ্বাসের ধ্বংস হয় না। বিশ্বাস দ্বারা দ্রব্য জানা যায়, কিন্তু দ্রব্য আছে বলিয়া বিশ্বাস আছে। তদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা বিশ্বাসের আলোচনা হয়, কিন্তু বিশ্বাস আছে বলিয়া জ্ঞান সম্ভব।

৩ সূত্র। জ্ঞান কতিপয় লক্ষণ দ্বারা দ্রব্য বিশ্বাস নির্ব্বাচিত করে। সেই লক্ষণ সাতটী। দ্রব্য বিশ্বাস সহজ, সাক্ষাৎ, সাধারণ, অপরিহার্য্য, স্বতঃসিদ্ধ, সত্য ও নিরপেক্ষ। এই লক্ষণ দ্বারা প্রকৃত বিশ্বাস নির্ব্বাচিত হয়।

১ সহজ—। জ্ঞানের প্রথম প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, চেতনার প্রথম চৈতন্যে, বোধের প্রথম আবির্ভাবে, অতি সহজে দ্রব্য বিশ্বাস জন্মে। কিছু একটা স্পর্শ কর, অমনি দেহ ও বহির্দ্দেশ আছে এই বিশ্বাস জন্মে। কেহ বলিয়া দেয় না, বুঝাইয়া দেয় না, শিখাইয়া দেয় না, প্রতিপন্ন করিয়া দেয় না, অথচ এবিশ্বাস সহজে জন্মে। স্পর্শ করিতে বরং চেষ্টা আবশ্যক, আয়াস আবশ্যক; কিন্তু স্পর্শ মাত্রে দ্রব্য বিশ্বাস বিনা প্রয়াসে উপজাত হয়। বরং এই বিশ্বাস করিতে আয়াস, যত্ন, তর্ক, ও শিক্ষা আবশ্যক। তথাপি সে বিশ্বাস অল্পে অপনীত হয় না। শিশু অশিক্ষিত ভাবে স্তনপান করে; কিন্তু তাহাও সময়সাপেক্ষ, আয়াস সাপেক্ষ ও সাহায্য সাপেক্ষ। দ্রব্য বিশ্বাস ইন্দ্রিয় বোধের সঙ্গে অনায়াসে, অতি সহজে সমুত্থিত হয়। এজন্য বিশ্বাসকে পণ্ডিতেরা সহজ জ্ঞান বলিয়া আখ্যা করিয়াছেন। যেরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে জড় দ্রব্য অনায়াসে অনুভূত হয়, চিন্তা ও বোধের প্রথম প্রক্রিয়ার সহিত অতি সহজে চিন্তার শক্তি ও মনোদ্রব্য প্রতীত হয়। আমি জানি, আমি শুনি, আমি দেখি—এই আত্মজ্ঞান বিশ্বাস-সমূলক। দেখিলেই—যে দেখে, সে আছে, এই রূপ বিশ্বাস স্বতঃই জন্মে। ভাবিলেই—যে ভাবে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে হয়। এই বিশ্বাস কাহাকে শিখাইতে হয় না। ইহা তর্ক করিয়াও সিদ্ধান্ত করিতে হয় না। শিশুর আদি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনোদ্রব্যে বিশ্বাস জন্মে। যদি সহজে না জন্মিত তবে কেহ বুঝাইয়া দিয়া বিশ্বাস করাইতে পারিত না, পারিবে না। আবার আত্মার প্রথম প্রত্যক্ষ ও প্রথম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত, সম্পূর্ণ, স্বাধীন ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে। অন্তবৎ জড় বস্তুর সহিত অনন্ত ব্যক্তি, এবং অন্তবৎ অধীন মনের সঙ্গে অনন্ত, স্বাধীন ব্যক্তির বিশ্বাস সহজে আবির্ভূত হয়। এই বিশ্বাস সহজ, ও স্বপ্রকাশ; উহা শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে।

সম্পূর্ণ, অনন্ত, স্বাধীন ব্যক্তি আছে, এই বিশ্বাস সকল জ্ঞানের আদিতে নিহিত আছে। দ্রব্য জ্ঞান সহজে জন্মিতে না পারে; কিন্তু অসম্পূর্ণ হউক, দ্রব্যবিশ্বাস অতি সহজে সমুত্থিত হয়। এই জন্য বিশ্বাসকে সহজ জ্ঞান বলা যায়।

২ সাক্ষাৎ—। দ্রব্য বিশ্বাস সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ। দ্রব্যের গুণ দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব বিচার করা, ক্রিয়া দেখিয়া কারণের অনুমান করা—এ সকল তর্ক দ্বারা দ্রব্যবিশ্বাস জন্মে না। দ্রব্য আছে, এই সত্যটি আমি একেবারে ধরিয়া লই, ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। ইহাতে কোন তর্ক নাই, প্রক্রিয়া নাই, বিচার নাই। স্পর্শ করিলাম, স্পর্শজ্ঞান অনেক প্রক্রিয়াতে উৎপন্ন হইল বটে, কিন্তু যাহা স্পর্শ করিলাম তাহা যে প্রকৃত দ্রব্য, এই জ্ঞান একেবারে জন্মিল। ইহাই সাক্ষাৎ জ্ঞান। তর্ক করিয়া, অনুভব করিয়া, যাহা জানা যায় তাহাকে বিশ্বাস কহে না। যাহা সাক্ষাৎ ভাবে একেবারে জানা যায় তাহাই বিশ্বাস। বিশ্বাস সাক্ষাৎ জ্ঞান পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শিশুদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস এই প্রকার সাক্ষাৎ। তর্ক ও বিচার করিয়া তাহা লাভ করিতে হইলে, সে প্রকার জ্ঞান ও বিশ্বাস উৎপন্ন হইত কি না সন্দেহ। পণ্ডিতেরা পরিণত বয়সে যখন এই সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করেন, তখন বরং দেখা যায়, নানা কুতর্ক আসিয়া এই বিশ্বাস সমূহ সন্দেহ জালে আচ্ছন্ন করে। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল বিশ্বাস যে কেবল সহজে উৎপন্ন হয় এমত নহে, উহারা অন্তরে সাক্ষাৎ প্রতিভাত হয়।

৩ সাধারণ—। এই বিশ্বাস কোন শিক্ষা বা মতের অনুসারী নহে; ইহা মানব-প্রকৃতিমূলক। যাহা মানব-প্রকৃতিতে নিহিত আছে তাহা তোমারও আছে, অন্যেরও আছে। প্রকৃত বিশ্বাসকে উপবিশ্বাস হইতে প্রভেদ করিলে এই বৈলক্ষণ্য হয় যে, প্রকৃত বিশ্বাস সর্ব্বসাধারণ, উপবিশ্বাস সে ধর্ম্মাক্রান্ত নহে। মানব যখন, যে অবস্থায়, যেখানে থাকুক এই বিশ্বাস সর্ব্বসাধারণ ভাবে সকল মানবেতেই আছে। অসভ্য বনবাসীর মনে এই বিশ্বাস যেমন প্রবল, সভ্যতম নগরবাসীর মনেও তদ্রূপ। তাহার অনুমাত্র প্রভেদ ঘটে না। দ্রব্য আছে, একথা অসভ্য বন্যদিগের মধ্যে কেহ কখন সন্দেহ করে নাই। মূলবিশ্বাসের সহিত অনেক উপবিশ্বাস জড়িত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উপবিশ্বাস গুলির লক্ষণ এই তাহা সকল লোকে সমান নহে, তাহা সর্ব্বসাধারণ নহে। অন্য দিকে প্রকৃত বিশ্বাস এত সাধারণ যে, যাঁহারা কুতর্কে অন্ধ হইয়া তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারাও কার্য্যকালে তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া কার্য্য করিয়া যান, যেন তদ্বিষয়ে তাহাদিগের অনুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। সচরাচর বিষয় কার্য্যে ইহা প্রতীত হয়।

৪ অপরিহার্য্য।—দ্রব্য বিশ্বাস শুদ্ধ সাধারণ নহে, ইহা থাকিবেই থাকিবে। পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট হউক, অথবা নাই হউক, প্রকৃতি ধরিয়া নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, এই বিশ্বাস অবশ্যম্ভাবী। এই বিশ্বাস নাই, এমত মনুষ্য দেখা যায না, এমত মানুষ হইতেই পারে না। জড়বস্তু আছে—এ বিশ্বাস নাই, এমত জীব অবলক্ষিত হয় নাই। যাঁহারা নাই বলেন, তাঁহারাও কখন জড় নাই এমত ভাবে চলেন না। আমি নাই, মন নাই, একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের সেই বলাতেই আমিত্ব প্রকাশ পায়—তাঁহাদের চিন্তাতেই জড়াতীত মনোদ্রব্য সুপ্রতীত হয়। ঈশ্বর নাই একথা অনেকে বলেন, ও সেই মতে চলিতে যান বটে, তথাচ তাহারা সকলেই এক এক প্রকারে ঐশীশক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন বিধ ঐশীশক্তি বা দেবভাব নাই এমত মত পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হয় না। যাঁহারা জড়কে একমাত্র দ্রব্য বলেন, তাঁহারা ঐশ্বরিক দ্রব্যের ভাব জড়মধ্যেই দিয়া থাকেন, এই মাত্র প্রভেদ; তাঁহারা আর স্বতন্ত্র ঐশীশক্তি স্বীকার করিতে চান না। জড়েতে ঈশ্বরত্ব প্রদান করেন মাত্র। নহিলে জড় ও ঈশ্বর, এই দুইটী স্বতন্ত্র ভাব অস্বীকার করিতে পারেন না। মহা মহা নাস্তিকেরা এই ঈশ্বরভাবকে মানব প্রকৃতিতে এত দৃঢ়বদ্ধ দেখিয়াছেন যে তাঁহারা অবশেষে এই মাত্র বলিয়া আপনাদিগের পক্ষ বাঁচাইয়া জান, যে এই বিশ্বাস বহুকাল শিক্ষা প্রভাবে মানবের এরূপ অভ্যাস পাইয়া আসিয়াছে যে ইহা মানব মন হইতে শীঘ্র অপনীত করা অতি সুকঠিন ব্যাপার। তাঁহারা নিজেও কোন না কোন দ্রব্যকে ঐশীভাবাপন্ন করিয়া দ্রব্যবিশ্বাসের নিতান্ত আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং এই বিশ্বাসকে অবশ্য অপরিহার্য্য বলিতে হইবে।

৫ স্বতঃসিদ্ধ।—দ্রব্য আছে এই বিশ্বাস আপনাআপনি হয়, ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ নহে। যে বিশ্বাস সকল প্রমাণের মূল, প্রমাণের প্রমাণ, তাহাকে আবার প্রমাণ করিবে কে? তুমি দুই আর দুইয়ে চারি হয় একথা যদি বিশ্বাস না কর, তবে কোন তর্ক ও প্রমাণ দিয়া তোমাকে বিশ্বাস করান যাইবে না। জড় পদার্থ আছে, ইহা সকলেই বিশ্বাস করে। যে পণ্ডিতেরা জ্ঞান দ্বারা উহার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিতে যান, তাঁহারা নিশ্চয় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। আছে, এই বিশ্বাস স্বতঃই পড়িয়া আছে, তাহা জন্মাইতে বা প্রমাণ করিতে হয় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন বলিয়া প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে যান। ঘর হইতে বাহির হতে গেলে, দেওয়াল কিছু নহে আমার দেহ ও মস্তক কিছু নহে, এরূপ বিশ্বাসে কি কেহ কখন দেওয়াল ফুঁড়িয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, না যথাস্থানে গিয়া দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়াছেন?

আমি আছি, একথা সকলই বুঝেন, আমি জড় হইতে পৃথক তাহাও বুঝেন; তবে ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা অবগত হইতে পারি না, এই দুঃখে অনেকে তাহা অবিশ্বাস করিতে যান। নচেৎ আমি আছি, মন আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রমাণ আবশ্যক করে না। ইহা অগ্রে আমরা স্বতঃসিদ্ধ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, পূর্ব্বে ধরিয়া লইয়াছি, তৎপরে প্রমাণ করিতে যাই, ও বিচার করি। কিন্তু এই বিশ্বাস ধরিয়া না লইলে প্রমাণ বা বিচার অসম্ভব। ঈশ্বর আছেন এ বিশ্বাসও স্বপ্রমাণ। ইহা প্রমাণ করিতে গিয়াই নাস্তিকতার উৎপত্তি। লোকে ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের প্রক্রিয়া মধ্যে ঈশ্বর জ্ঞান চাহে। কিন্তু তাহারা জানে না, ঈশ্বর অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় কেবল বিশ্বাসের বস্তু। ঈশ্বর আছেন, একথা অগ্রে বিশ্বাস কর, পরে বিচার সম্ভব। ঈশ্বর অভাবে, আত্মা, জড়, তর্ক, প্রমাণ, পরীক্ষা, এ সমুদায়ই অসম্ভব।

এরূপ আপত্তি হইতে পারে, যে যদি দ্রব্যজ্ঞান এত সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ হইল, তবে এতৎসম্বন্ধে সন্দেহ ও বিবাদ উপস্থিত হয় কেন? দ্রব্য বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নহে। কিছু আছে, একথা বলিলেই মন সন্তুষ্ট হয় না। যাহা আছে, তাহা কি, অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হয়। ইহা জানিতে হইলে দ্রব্যের গুণ জ্ঞান আবশ্যক, এবং গুণ জ্ঞান, জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ। এই জ্ঞানচর্চ্চা সহজ ও স্বতঃ সিদ্ধ নহে। বুদ্ধি, শিক্ষা, অভ্যাস, চেষ্টা, সাধনাদি প্রভেদে এই জ্ঞানের তারতম্য হয়। এই তারতম্য হেতু মতের প্রভেদ হয়; এবং গুণ জ্ঞান কঠিন ও প্রভেদ দেখে দ্রব্য আছে এই সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসকে লোকে উপেক্ষা করে। ঈশ্বর একজন আছেন, কি থাকিতে পারেন কোন নাস্তিক তাহা অস্বীকার করিতে পারে না। কেবল ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার গুণ কি কি?—যাহা তুমি বল তাহা ঈশ্বর নহে, তেমন নহে,—এই সমস্ত লইয়া বিবাদ ও তর্ক। এ সকল জ্ঞানের সমালোচনা এককালে একমত হয় না। কারণ, এ সমস্ত জ্ঞান স্বপ্রমাণ নহে। এই জন্যই অবিশ্বাস ও মতভেদ।

৬সত্য।—এই দ্রব্যবিশ্বাস যদি সহজ, সাক্ষাৎ, সাধারণ, অপরিহার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ হইল তবে ইহা অবশ্য সত্য। সত্য বলিয়া এই বিশ্বাস হয়, এই বিশ্বাস যদি অসত্য হয়, তবে সকলই অসত্য। সকলই অসত্য হয় যদি তবে অসত্যও অসত্য। সুতরাং অসত্যকেও আবার অস্বীকার করিতে হয় এবং তাহাহইলে পুনর্ব্বার এই বিশ্বাসকে বিশ্বাস করিতে হয়। যাহা মূলবিশ্বাস, যাহার উপর সকল জ্ঞান, তর্ক ও বিশ্বাস স্থাপিত, তাহাকে অসত্য কিরূপে ভাবি? প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ও যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা অসত্য কে বলিল? কে প্রমাণ করিল? কে বিশ্বাস করিবে? এ সকল কুটতর্কে

পড়িয়া জ্ঞান সমুদ্র শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তথাপি আজিও কি মানবের চেতনা হয় না? সত্য বলিয়া যাহা বিশ্বাস করি, যে বিশ্বাস শিক্ষালব্ধ নহে, যাহা তর্ক বা বিশেষ অবস্থায় স্থিত নহে, যাহা সহজ, সাক্ষাৎ, সাধারণ, অপরিহার্য্য ও স্বতঃ সিদ্ধ তাহা সত্য না হইলে উন্মাদ হইতে হয়।

৭ নিরপেক্ষ—। এই বিশ্বাস তাবৎ জ্ঞানের আদি ও মূল। ইহা কাহারও উপর নির্ভর করে না। জ্ঞান মাত্রই আপেক্ষিক, এজন্য দ্রব্য জ্ঞান দ্বারা পাওয়া যায় না। নিরপেক্ষ দ্রব্য বিশ্বাসে উপলব্ধ। পরীক্ষার উপর ইহা নির্ভর করে না। একবার বিশ্বাস জন্মিলে, দ্রব্য আছে, এ বিশ্বাস আর ভুলিতে পারা যায় না। পরীক্ষায় উহার বিপরীত হইবার নহে। দ্রব্য নাই, এরূপ জ্ঞান কে কখন পরীক্ষায় পাইয়াছেন? জ্ঞানে পাওয়া যায় না, এই মাত্র তর্ক। বিশ্বাসে উহা পাওয়া যায় না কে বলিতে পারে? বলা অসম্ভব।

এই সকল লক্ষণ দ্বারা প্রকৃত বিশ্বাস নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, এবং উপবিশ্বাসের সহিত বিশ্বাসকে একত্র বা ভ্রান্তি করা অসম্ভব হয়। নাস্তিকেরা ঐশ্বরিক ভাব সম্বন্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে যখন লোক ও জাতিভেদে ঐ ভাবের বিস্তর প্রভেদ দেখা যাইতেছে, যখন কেহ ঈশ্বরকে নিরাকার, কেহ সাকার, কেহ মঙ্গলময়, কেহ দুরাচার, কেহ নিষ্পাপ, কেহ বা অপবিত্র বলিয়া কল্পনা করিতেছে তখন ঐ জ্ঞানকে সাধারণ ও অপরিহার্য্য কিরূপে বলি? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বরের গুণজ্ঞান ও তাঁহার সত্ত্বায় বিশ্বাস এ দুইটি বিভিন্ন বিষয়। গুণজ্ঞান জ্ঞান মাত্র, তাহা জ্ঞানের আলোচনায় উৎপন্ন হয় এবং সেই জন্য ভ্রান্ত বোধ হইলে পরিহার্য্যও হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর দ্রব্যে বিশ্বাস সেইরূপ নহে; তাহা একটি মূল বিশ্বাস, সাধারণ, এবং অপরিহার্য্য।

৪ সূত্র। জ্ঞান, দ্রব্য বিশ্বাসের লক্ষণ ধরিয়া নির্ব্বাচন করে বটে, কিন্তু তাহাকে তিরোহিত করিতে পারে না। সন্দেহবাদ, নাস্তিকতা, জড়মাত্রবাদ, মনোমাত্রবাদ, প্রভৃতি যত পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে তাহা সকলেই অস্বাভাবিক। এই সমস্ত বাদ অসম্পূর্ণ ও অসত্য দর্শন শাস্ত্রের বৃথা জল্পনা মাত্র, এবং প্রত্যেকেই দ্রব্যবিশ্বাস অবহেলন করিয়া সঞ্জাত হইয়াছে। ঐ বিশ্বাস গ্রাহ্য করিলেই প্রকৃত মনোবিজ্ঞান সম্ভাবিত হয়।

দ্রব্য বিশ্বাস অতি সহজ, সাধারণ, স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মূর্খ, নির্ব্বোধ সকলেই বিশ্বাস করে। তাহাতে পাণ্ডিত্যাভিমানীরা মনে করেন এই বিশ্বাসকে যেমন আছে তেমনি গ্রহণ করিলে তবে আর জ্ঞানের মহিমা কোথায় রহিল? সাধারণ জনগণের সংস্কার সকল, জ্ঞানালোচনার পন্থা দিয়া না আসিলে এবং জ্ঞানচর্চ্চার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে জ্ঞানীর

মনস্তুষ্টি হয় না। আবার লোকেও বহুতর কাল্পনিক বিশ্বাসকে এই মূল বিশ্বাস শ্রেণীতে ফেলিয়া থাকে তাহাতে জ্ঞানীরা বিশ্বাস সমূহে সন্দিহান হয়েন। তাঁহারা বলেন যদি একটী বিশ্বাসকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলে, অন্যতরকে কেন করিবে না? এবং সকলগুলি গ্রহণ করিলে, পরস্পর অনৈক্য, বিসম্বাদী, ও বিপরীত ভাবকে সত্য বলিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ নিচয় দ্বারা মূলবিশ্বাস নির্ব্বাচন করিয়া লইলে এই গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে। দর্শনশাস্ত্র বহুকাল জ্ঞানালোচনার পর স্থির করিয়াছে, যে এই সমস্ত মূলবিশ্বাসের উপর দর্শন শাস্ত্র নির্ম্মাণ করাই জ্ঞানালোচনার সহজ পন্থা এবং তাহাদিগের অনুমোদন না করিলে দর্শনশাস্ত্র দাঁড়াইবার স্থল পায় না। যে দর্শনশাস্ত্র এই ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহাই সহজে বোধগম্য হয়। এতকাল মনুষ্য চেষ্টা করিয়া দেখিল যে, এই বিশ্বাস সকল গ্রহণ না করিলে কোন মতে চলে না। বাস্তবিক, উহাদিগকে গ্রহণ না করিলে, কি মনস্তত্ব, কি জীবনযাত্রা, কি ধর্ম্মশাস্ত্র, সকলই অসম্ভব হইয়া উঠে। মূল বিশ্বাসকে অস্বীকার করিলে যে অসম্ভাবনায় পড়িতে হয় তাহা পরে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

সন্দেহবাদ।—প্রকৃত দ্রব্যজ্ঞান আমাদিগের অসম্ভব বলিয়া, প্রকৃত দ্রব্য আছে কি না, তৎপ্রতিই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অনেক মনোবেত্তা প্রত্যক্ষবোধ ও বিচারসিদ্ধ জ্ঞানালোচনাকেই একমাত্র জ্ঞানাগমের পথ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বাস গ্রহণ যোগ্য নহে সিদ্ধান্ত করিয়া দ্রব্যের সত্বের প্রতি সন্দিহান হইতে যান। দর্শনশাস্ত্রে স্থির নিশ্চয় হইয়াছে যে, দ্রব্যজ্ঞান মনুষ্যের অসম্ভব। তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে দ্রব্য আছে কি না তাহাই সন্দেহ। কিন্তু যখন বিশ্বাস প্রকৃতিমূলে থাকিয়া এই দ্রব্য সকলকে সাব্যস্ত করিতেছে তখন এই সন্দেহবাদকেই অস্বাভাবিক ও অসত্য বলিতে হইবে। সন্দেহবাদ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হইতে পারে, কিন্তু তাহা কার্য্যের সময় অসত্য ও অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। যেহেতু তদনুসারে বাস্তবিক কাজকর্ম্মে কেহ চলিতে পারে না। এজন্য বলিতে হইবে, লোকে জ্ঞানে সন্দেহবাদী হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ও কার্য্যকালে সন্দেহবাদী হইতে পারে না। কার্য্যকালে মতের বৈপরীত্যে চলিতে হইবেই হইবে। অতএব প্রকৃত পক্ষে সন্দেহবাদী পৃথিবীতে বিরল। এই মত বিদ্যাপ্রকাশ ও বাক্‌বিতণ্ডা মাত্র। একমুহূর্ত্তও মনুষ্য দ্রব্যের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারে না। সন্দেহ করে কে? আপনার অস্তিত্ব বিশ্বাস না করিলে সন্দেহও অসম্ভব। মনুষ্যপ্রকৃতি কখন সর্ব্বসন্দেহকে স্থান দিতে পারে না। দ্রব্য বাস্তবিক আছে যদি এইরূপ ভাবিয়া চলিতে হয়, যদি দ্রব্যবিশ্বাস অতিক্রম করা না যায়,

তবে কেন আমরা প্রকৃতিকে অবিশ্বাস করি? সন্দেহবাদের অধিকার কোথায়? যদি সকলই সন্দেহ, আত্মসত্বা ও সন্দেহের বিষয়, তবে সন্দেহবাদ কোন প্রমাণের উপর স্থাপিত? সবল সন্দেহবাদ যদি থাকে তাহা তর্ক মাত্র। তর্ক মাত্রকে সরলতা বলা যায় না। কার্য্যে যাহা উপলব্ধি ও প্রতীত হইতেছে না, জ্ঞানে তাহা সবলভাবে কিরূপে মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারিবে? অতএব সন্দেহবাদ অবিশ্বাস্য এবং অসত্য।

নাস্তিকতা।—সন্দেহবাদের অনুসরণ করিয়া অনেকে শেষে ক্রমে ক্রমে কোন দ্রব্য নাই বলিয়া বসেন। ইহাদিগকেই নাস্তিক বলা যায়। দ্রব্য আছে যে রূপ তর্কে সিদ্ধান্ত হয় না, দ্রব্য নাই ও তদ্রূপ তর্কাতীত। দ্রব্য নাই তর্ক তুলিলে তোমাকে দেখাইতে হইবে যে তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ যে দ্রব্য নাই। কিন্তু দ্রব্য নাই ইহার প্রমাণ কি? সুতরাং এরূপ নাস্তিকতা প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীরা কখনই এরূপ নাস্তিক হইতে পারেন না। কোন দ্রব্য আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। "আমি নাই"—একথা বলে কে, যদি আমি না থাকি? কয়জন ব্যক্তি কিছুই নাই বলিয়া জড়পদার্থকে উপেক্ষা করিতে পারে? তবে নাস্তিক শব্দ অন্য এক অর্থে অধিক প্রয়োজিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর মনুষ্যের ইন্দ্রিয় ও বোধের অতীত এবং তাঁহার গুণজ্ঞানও কেবল সমুন্নত ও সুপরিচালিত জ্ঞানভাব এবং কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়া অনেক নাস্তিক পার পাইয়া থাকে। এজন্য নাস্তিক বলিলে সচরাচর নিরীশ্বরবাদী বুঝাইয়া থাকে। নির্জ্জড় ও নিরাত্মবাদী অতি বিরল; নিরীশ্বর নাস্তিকই অধিক।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নাস্তিক সংখ্যাও অল্প। কোন ঈশ্বর দ্রব্য নাই একথা প্রায় কেহই বলে না। সকলই এক এক রূপে ঈশ্বর দ্রব্য স্বীকার করিয়া থাকে। যিনি এই নাস্তিকতার চূড়ান্ত সীমায় গেলেন তিনি হদ্দ বলিতে পারিলেন যে তৎ সম্বন্ধে বিদ্যমানতার প্রমাণাভাব। তথাপি নিশ্চিত নাই বলিতে পারিলেন না। যেহেতু অজ্ঞতা কখন নিশ্চয়তায় উঠিতে পারে না। তিনি হদ্দ বলিলেন ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ বিষয়ে এতদ্ব্যতীত অধিক আর বলা যাইতে পারে না। যিনি ঈশ্বর নাই একথা নিশ্চিত বলিতে সাহসী হন তিনি পাকতঃ এই কথাই বলিতেছেন যে আমার জ্ঞান অনন্ত অসীম, অভ্রান্ত ও সম্পূর্ণ। কিন্তু এই শেষ অভ্যুপগম (assumption) যে মিথ্যা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেহ কেহ ঈশ্বরত্ব পাত্র বিশেষে আরোপ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন তথাপি একেবারে নাই বলিতে পারেন না। পাত্রবিশেষে ঈশ্বরত্ব আরোপ করায় পাকতঃ ঈশ্বরদ্রব্য স্বীকার

কল্প হইল। অতএব জড় আছে, আমি আছি, এই বিশ্বাসও তেমনি। মানব যতক্ষণ আপনাকে অসম্পূর্ণ, অজ্ঞ, বল হীন, বলিয়া বুঝিতে পারিবে, যতক্ষণ তাহার দুর্ব্বলতা, অধীনতা, অক্ষমতা প্রতীত হইবে, ততক্ষণ তিনি হাজার কেন ঈশ্বর নাই নাই বলিয়া চিৎকার করুন না, তাহার কার্য্য, বিষয় ব্যাপার তাহার সম্পূর্ণ অলিকত্ব প্রতিপাদিত করিয়াদিবে। আমরা যেমন জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব এবং আপনার অস্তিত্বে বিশ্বাস ও নির্ভর না করিয়া চলিতে পারি না তেমনি ঈশ্বর দ্রব্যে বিশ্বাস ও নির্ভর না করিয়া চলিতে পারি না। অতএব, ঈশ্বরদ্রব্যে একেবারে অবিশ্বাসী এরূপ নাস্তিক পৃথিবীতে অতি বিরল; বিরল কেন, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সচরাচর নাস্তিক অর্থে ঈশ্বরের গুণ সম্বন্ধে অস্বীকারীকেই বুঝাইয়া থাকে। সাধারণ লোকে তাঁহার যে প্রকার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকে, তাহা লইয়াই যত বিবাদ ও তর্ক। গুণ সমূহ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ, সুতরাং তাহা বিচারাধীন। কিন্তু গুণ সম্বন্ধে তর্ক ও বিচার আছে বলিয়া দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার অযৌক্তিক এবং অন্যায়। অনেকে সাধারণ নির্ণীত ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে না পারেন; কিন্তু তা বলিয়া তাহাদিগকে নাস্তিক বলা যাইবে না। যাঁহারা সেরূপ ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া ভাবেন ঈশ্বর নাই, তাহারা কিরূপ জ্ঞানী তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তাহারা হদ্দ বলিতে পারেন সাধারণজনগণ নির্ণীত ঈশ্বর স্বরূপ নিতান্ত অবজ্ঞেয় ও পরিহার্য্য। ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় অসত্য হইতে পারে, অর্থাৎ মানবজ্ঞান ভ্রান্ত ও অসত্য হইতে পারে; কিন্তু তা বলিয়া সৎ স্বরূপ ঈশ্বর কখন অসত্য নহে। মানবকল্পনা ঈশ্বরকে অনুভব করিতে না পারে তা বলিয়া তাঁহার অসত্যতা প্রতিপাদিত হয় না। অতএব প্রচলিত ঈশ্বর স্বরূপ অস্বীকারী নাস্তিকতা, ঈশ্বর দ্রব্য বিশ্বাসের বিরোধী নহে।

এক ধর্ম্মীয়লোকে অন্য ধর্ম্মপথাবলম্বি জনগণকে নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করেন। অনেক ঈশ্বর পরায়ণ সাধুজনগণ প্রচলিত কুসংস্কার মার্গ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত জন সমাজ কর্তৃক নাস্তিক নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। একেশ্বরবাদী, পৌত্তলিক ও নরেশ্বরবাদীদের কাছে নাস্তিক বলিয়া পরিচিত। পুরোহিতদল নিজ কল্পনা সম্ভূত দেবতা অবিশ্বাসীকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। এরূপ নাস্তিকতা প্রকৃত নাস্তিকতা নহে। ভ্রান্তধর্ম্ম সম্প্রদায়ী লোক আপনাপন ভ্রম সংরক্ষণার্থ বিপরীত মতাবলম্বী জনগণকে নাস্তিক বলুক, কিন্তু এবম্বিধ নাস্তিক দ্বারা জ্ঞান, সংস্কার, ধর্ম্ম ও সত্যের উন্নতি বই অবনতি সাধিত হইতেছে না। তাঁহারা ঈশ্বর অবিশ্বাসী নাস্তিক নহেন।

অনেকে আবার আপনাপন চরিত্রদোষ গোপন অথবা প্রতিপোষণ, আত্মা-

ভিমান রক্ষণ এবং বিবেককে স্তোক দিবার জন্য নাস্তিকতার বড়াই করিয়া থাকেন। কিন্তু ইতিহাস ও জীবনে দেখাগিয়াছে মহা মহা প্রবল নাস্তিকেরাও জীবনের এক এক সময়ে আপনাপন মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। নিদান এক এক সময়ে আপন অবস্থার জন্য অনুশোচনা করিয়াছেন। নাস্তিক কখন নিজে সন্তুষ্ট নহে। প্রকৃতি নাশে কে সুখী থাকিতে পারে? বস্তুতঃ জড় ও মন অতীত একটী ঐশীশক্তি বা ব্যক্তি নাস্তিকেও অবিশ্বাস করে না। কেহ জড়সমষ্টিতে সেই ঐশীশক্তি প্রদান করে, কেহ বা মনে সেইভাব প্রয়োগ করে মাত্র। নহিলে এরূপ ভাবের অস্তিত্বে বিশ্বাস অবশ্য অনবহেলনীয় বলিতে হইবে।

জড়মাত্রবাদ।—এক দ্রব্য দ্বারা অপর দ্রব্যের অভাব মোচন করিতে, এক দ্রব্য অপর দ্রব্যের গুণ মাত্র প্রতিপন্ন করিতে, আংশিক নাস্তিকের চেষ্টা চির কাল চলিতেছে। কিন্তু যত কেন বিদ্যা বুদ্ধি প্রয়োগ কর না, ইহা কখন হয় নাই, হইবার নহে। ঈশ্বর চিন্তা মনুষ্যচিন্তার পুত্তল ও কল্পনা মাত্র; আত্মা জড়জগতের একটি প্রক্রিয়া মাত্র; চিন্তা মস্তিষ্কের ফল মাত্র; জীবন পরমাণু সমষ্টির বিশেষ সংযোগ ফল মাত্র; এই প্রকার তত্ত্ব ও মত সকল প্রতিপাদন এবং প্রচারিত করিবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি প্রাণ, মন, ঈশ্বর কেহ পরমাণু সমষ্টির যোগ দিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, বা সৃষ্ট হইয়াছে দেখাইতে পারেন নাই। যে জড়বস্তুর দ্বারা সকল দ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছে ইহারা দেখাতে চাহেন, অগ্রে তাহারই অস্তিত্ব তর্কে বুঝাইয়া দিউন, পরে অন্য কথা। যাহারা অন্যদ্রব্য অস্বীকার করিলেন, তাহারা জড়ের অস্তিত্ব কি প্রমাণে স্বীকার করিলেন—তাহা বুঝা যায় না। যদি সকল দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইল, তবে এক মাত্র জড়ই সৎ কিরূপে স্বীকৃত হয়? অপর দ্রব্য স্বীকার করিতেছি বটে, কিন্তু বলিতে হইবে উহা জড়ের ফল মাত্র। ফল না বলিয়া স্বতন্ত্র স্বীকার করাতে কি ব্যাঘাত জন্মিল। দ্রব্য স্বীকার করিব, অথচ বলিব তাহা অপর দ্রব্য হইতে উৎপন্ন; এ কিরূপ স্বীকার্য্য? এক দ্রব্য অপর দ্রব্যসম্ভূত বলিয়া তাহারা নিশ্চয় প্রথমোক্ত দ্রব্যের তিরোধান করিতে চান না। কেবল আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধির গুণপনা দেখাইতে চান। নহিলে দ্রব্যের গুণ সমস্ত পরস্পর এত বিভিন্ন যে যত কেন বিদ্যালোচনা কর না একের দ্বারা অন্যের উৎপত্তি কখন সাব্যস্ত হয় না।

মনোমাত্রবাদ।—পূর্ব্বে মনোবিজ্ঞান জ্ঞান হইতে উৎপন্ন বলিয়া জড়-দ্রব্যের সত্তা মন দ্বারা সাব্যস্ত করিতেন। কিন্তু এই মায়াবাদ, এই ভাব দর্শন আপনাপনি অপ্রমাণিত ও তিরোহিত হইয়াছে। জড়দ্রব্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান ও

অস্তিত্ব এত দেদীপ্যমান যে তাহার পৃথক অস্তিত্ব নাই যে বলে তাহাকেই লোকে বাতুল বলে। কোন দার্শনিক অদ্যাপি এই মতানুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ইহার বিপরীতে কার্য্য করিতে গেলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। ছাদ হইতে নীচে পতিত হইতে গেলে, আঘাতকে ব্যাঘাত না বুঝিলে আহার ও নিশ্বাস উপেক্ষা করিলে জীব কতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে? জড় না থাকিলে এ সকলের অপেক্ষাই বা কি? আমি সৎ ও সত্য ইহা যদি বিশ্বাস হয়, জড় বস্তু সৎ ও সত্য কেন বিশ্বাস হইবে না। লোকের মনে এই দুইটি বিশ্বাসই সমপ্রবল। যদি একটী বিশ্বাস ভুল, অপরটিও ভুল। তবে ভুলটি ও ভুল; সুতরাং দ্রব্য বিশ্বাস মাত্রই অবিশ্বাস্য হইয়াও বিশ্বাস্য।

ঈশ্বর ও মন এক, এইরূপ ভাবিয়া ঈশ্বর দ্রব্যকে একেবারে উড়াইয়াদিয়া তৎস্থানে মনকে স্থাপন করা বৌদ্ধ ভিন্ন আর কোন মতে পরিদৃষ্ট হয়না। ঈশ্বর ও আত্মায় এত সৌসাদৃশ্য যে, যে একটীকে বিশ্বাস করে সে অন্যতরকে ছাড়েনা। তত্রাপি বৌদ্ধমতে বলে বুদ্ধি অর্থাৎ মনের উৎকর্ষে ঈশ্বরত্ব উৎপন্ন হয়। বুদ্ধ যে জীবাত্মা হইতে ক্রমে ঈশ্বর হইয়াছেন এরূপ কেহ দেখে নাই। এই অপ্রমাণিত কথা যদি মানিতে হয় তবে আত্মা ও পরমাত্মার পৃথক অস্তিত্ব কেন মানিবেনা? মান আর নাই মান, মন ও ঈশ্বর এদুইটী প্রভিন্ন ও স্বতন্ত্র এইরূপ বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতেই হইবে। আমার মন যদি উন্নত হইয়া ক্রমে সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর হইতে পারিবে তবে এখন আমি কিছুই সৃষ্টি করিতে পারি না কেন? বুদ্ধি জীব হইতে ঈশ্বর হইলে জীব প্রথমে কে করিল? অগ্রে সৃষ্টিকর্ত্তা, না সৃষ্টি? অগ্রে জীব না ঈশ্বর? বুদ্ধ এককালে বিনষ্টও হইবে। তখন জীব জগৎ কে রাখে? মন হইতে জড় বা ঈশ্বর সত্ত্বার উদ্ভাবন করা বাতুল অপেক্ষা বাতুলের কর্ম্ম।

ঈশ্বরমাত্রবাদ—। কতিপয় পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের অনন্ত সত্ত্বার মধ্যে অন্তর্বৎ জড় ও মনের সত্ত্বা রাখিতে পারেন না। জড় ও মন ঈশ্বরের ভাব বা অংশ মাত্র তাহারা ঈশ্বর মাত্রবাদ প্রচার করেন। একমাত্র ঈশ্বর সৎ, আর সকলই অসৎ, বা ঈশ্বরের রূপ বা বিকার মাত্র, ঈশ্বর মাত্রবাদ এইরূপে প্রচারিত দেখা যায়। এই অদ্বৈতবাদ এ দেশে শঙ্করাচার্য্য ইউরোপে স্পিনোজা যুক্তি ও প্রণালীমত শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু যদি জড় ও মনকে অবিশ্বাস করিতে হয় তবে ঈশ্বরকে ঘোর প্রবঞ্চক বলিতে হইবে। অসত্যকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে যিনি আমাদিগের বিশ্বাস দিয়াছেন, তিনি প্রবঞ্চক নয় ত কি? প্রবঞ্চক ঈশ্বর ঈশ্বর নহেন। আর যদি আমরাই ঈশ্বর তবে ঈশ্বর নিজেই ভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত। এরূপ ঈশ্বর ঈশ্বর নহেন। আমি ঈশ্বরের

রূপ অথবা আমিই ঈশ্বর একক বলিতে কাহারও সাহস হয় না। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে, ধ্রুবাবিশ্বাস অস্বীকার করিলে মানব কত প্রকার ভ্রান্তিতে উপনীত হয়। এই ধ্রুবাবিশ্বাসের একটীকে পরিত্যাগ কর, অমনি একটী মহাভ্রান্তিতে পতিত হইবে। সন্দেহবাদ নাস্তিকতা জড়মাত্রবাদ প্রভৃতি বাদসমূহ এই কথাই সপ্রমাণিত করিতেছে। ইহারা আর কিছুই নহে কেবল দার্শনিকগণের সৃষ্টি ও জ্ঞানের ভ্রান্তি মাত্র। মূলবিশ্বাস পরিবর্জ্জন করিয়া দর্শনশাস্ত্র কিরূপ ভ্রম প্রমাদে ভ্রমণ করিয়াছে এই বাদ প্রভৃতি তাহারই ইতিহাস মাত্র। এই ইতিহাসের সারগর্ভ উপদেশ প্রকৃত জ্ঞানীগণ কখনই অবহেলন করেন না। তাহারা দেখেন মূলবিশ্বাস বিচ্যুত হইলেই দর্শনশাস্ত্র কেবল বাতুলের প্রলাপমাত্র হয়। তাহা অস্বাভাবিক, অপ্রামাণিক, অসম্ভব ও অসত্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যে বিশ্বাস গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই, সেই বিশ্বাসই মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত মূল ও ভিত্তি। এই বিশ্বাসই মনোবিজ্ঞানের সার পাণ্ডিত্য।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ *

* এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইলে আমরা গোবিন্দ বাবুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ইহা একটি বৃহৎ প্রস্তাবের সূত্রপাত মাত্র হইতেছিল। গোবিন্দবাবু দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, উপাধিধারী একজন সদ্বিদ্বান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার দর্শনশাস্ত্র প্রগাঢ় অধ্যয়নের ফল প্রকাশ না হইতে হইতে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বঙ্গভাষা এইরূপ কত রত্ন হারাইয়াছেন কে বলিতে পারে। চিত্তবিনোদিনী নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাস এই গোবিন্দ বাবুরই প্রণীত। আর্য্যদর্শন ইঁহার নিকট হইতে সময়ে সময়ে সাহায্যলাভ করিয়াছে। এ জন্য আমরা ইঁহাকে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি ইনি যেরূপ উন্নতমনা ব্যক্তি ছিলেন, ব্রাহ্মমণ্ডলীও ইঁহাকে হারাইয়া ততোধিক ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন। প্রায় আট বৎসরকাল মুনসেফি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অতি বিচক্ষণতার সহিত ইনি বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। অতএব গবর্ণমেণ্ট ও একজন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বি, এল মুনসেফ হারাইয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগের দীনাহীনা বঙ্গভাষার যে ক্ষতি হইল, তাহাই বিশেষ দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

স।

সুখ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

কিসে আমাদের সুখ আছে তাহা বলিবার পূর্ব্বে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে সুখলাভাশয়ে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সে কার্য্যটী কেমন তাহা বিবেচনা করা উচিত। সে কার্য্য হইতে যথার্থ সুখ পাইবার কতটুক সম্ভাবনা। এবং যদিও সুখলাভ কোনওক্রমে ঘটিয়া উঠে তাহা স্থায়ী হইবে কি না, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত একটু অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া আমরা সে সুখ ভোগ করিতে

পারিব কি না। এই সকল বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে একটা আমাদের আশা থাকে এবং নিতান্ত অন্ধকারে বিচরণ করিতে হয় না হাঁ ইহাও স্বীকার করি এমনও অনেক সময়ে ঘটে যে যে কার্য্যে আমরা কিছুমাত্র সুখের প্রার্থনা করি নাই তাহা হইতে অসম্ভাবিত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এমনও অনেক সময় হয় যে কোন কার্য্যে সুখের পরিবর্ত্তে আমাদের দুঃখলাভ হয় এবং তখন আশা দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না। এ সকল জানিয়াও আমরা পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলাম কেন না ইহার প্রতিবিধান মানবের অসাধ্য। প্রথমতঃ সমাজ-প্রেমে সুখ আছে ইহা সচরাচর দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি পুত্র কলত্রাদি পরিবার পরিবৃত্ত হইয়া বাস করেন তাঁহার স্বভাব যেন কেমন মধুর। স্বভাবতঃ স্নেহ ও শ্রদ্ধা-ব্যঞ্জক। এরূপ লোকের উপর সহজে লোকের বিশ্বাস ও পরে ভক্তি জন্মাইতে পারে। এরূপ লোকে কখন প্রকৃত পক্ষে ক্রূর হয় না। এই শ্রেণীর লোকের আসঙ্গ লিপ্সা বড় প্রবল। মূল কথা (কোন গূঢ় কারণ বিদ্যামান থাকা অপর কথা এবং তাহা ধর্ত্তব্য নহে) এ শ্রেণীর লোক সুখী এবং সেই কারণে ইহাঁদের কার্য্য কলাপে সেই সুখের একটু আভাস পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে উদাসীন বা বিজনপ্রবাসীর স্বভাব বিরক্তি-পরিপূর্ণ এবং রোগীর ন্যায়। সর্ব্বদা অসন্তোষের বিকাশ। দান ও পরোপকারে যে সুখ তাহাকে আমরা এই শ্রেণী-নিবিষ্ট করিলাম।

দ্বিতীয়তঃ কোন উদ্দেশ্য সাধন সঙ্কল্পে যদি আমরা মনোবৃত্তি কিম্বা শরীরকে নিয়োগ করি তাহাতেও সুখ আছে। পরিণামে যদি সুখের বা সচ্ছন্দতার আশা না থাকে তবে বর্ত্তমানে যত সন্তোষ আমরা ভোগ করি না কেন তাহাতে যথার্থ সুখের ভাগ অতি অল্প পরিমাণেই পরিলক্ষিত হইবে। বঙ্গের ধনী সন্তানগণ এ বিষয়ের উত্তম উদাহরণ স্থল। তাঁহাদের আহার বিহার প্রভৃতি নিত্য কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং অলসতার ক্রোড়ে তাঁহাদের স্থান। দিন আর যায় না। কিছুতেই আর মন উঠে না, কোন অভাব নাই তবু মন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। কেবল নূতন আমোদ অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। কিছুতেই তবু চিত্ত স্থির হয় না, এই কারণেই বোধ হয় সামান্য অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে তাঁহাদের আমোদ অন্বেষণ। শুনা যায় যে অমুক রাজা বা অমুক নবাব লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া পোষিত কপির বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহা আর কিছুই নহে; ভবিষ্যতে সুখাশা বিহীন, লক্ষীর বরপুত্রগণের কোনওক্রমে কাল যাপন করিবার যথেচ্ছা প্রবৃত্ত উপায় পরম্পরের মধ্যে একটি উপায় মাত্র।

তবেই দেখা যাইতেছে আশা আমাদের সুখের প্রধান উপাদান।

এরূপ আশা আমরা দুই প্রকারের বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। আশার উদ্দেশ্য সংসাধনে যখন আমাদিগকে আয়াস স্বীকার করিতে হয়; এবং যখন কিছুই করিতে হয় না। শেষোক্ত প্রকারেই অস্বচ্ছন্দতার প্রবল কারণ। প্রথমোক্ত আশা কতকাংশে মূল্যের বটে।

উপরে যে কথাগুলি ব্যক্ত হইল তাহা সহজেই সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে একটির পর একটি এরূপ আমোদ-প্রদ নিয়োগে ব্যাপৃত থাকিতে পারা যায়? কার্য্যটি অতি দুরূহ বলিয়া সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে যে দুইটিমাত্র উপায় আমরা অবলম্বন করিতে পারি। আমাদের সুবিধামত সঙ্কল্প বাছিয়া লওয়া এবং আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন। এরূপ করিতে পারিলে যখন কোন একটি সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইবে তখন তাহার উ ায় নির্দ্ধারণে আমরা মনকে অবলীলাক্রমে নিযুক্ত করিতে পারিব। এইজন্য যে কার্য্যে আমাদিগকে যত ব্যাপৃত রাখে, সুখের ভাগ শেষে তাহাতে অধিক হউক আর নাই থাকুক, সে কার্য্যের তত গৌরব, এবং সে কার্য্য সন্তোষ-প্রদ বলিয়া গণ্য হইবে।

যে জন ভবিষ্যত সুখলালসায় লোলুপ, পৃথিবীতে তিনিই জ্ঞানী, কেননা ভবিষ্যত সুখলাভরূপ একটি রত্ন তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে; তিনি তাহা পাইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ধৈর্য্য প্রভৃতি সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন; সর্ব্বদা মনোগত বিষয় বিশেষ নিয়োগ করিতে শিক্ষা করা এবং সুখ-সোপানাবলীতে পদক্ষেপ করা একই কথা।

কার্য্যই জড় জগতের জীবন। যিনি মানসিক বৃত্তি সমূহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলেন তিনিই একরূপ পৃথিবীতে কাটাইয়া উঠিলেন। নতুবা কার্য্যেকে একবারে বিসর্জ্জন দিয়া দিবারাত্রি চিন্তাশক্তির অনুশীলন করিলে সুখের ব্যাঘাত হয়। মানসিক বৃত্তি সমূহের সহিত কার্য্য পরম্পরায় সামঞ্জস্য ও সহানুভূতি না রাখিতে পারিলে চিত্তবৃত্তির যেরূপ বৈকল্য উপস্থিত হইতে পারে এবং যেরূপ মহান্ অনর্থ সংঘটিত হয় কবিকুলচূড়ামণি মনুষ্য-হৃদয়বিদ্ সেক্সপীর তাহা হামলেটে দেখাইয়া গিয়াছেন। জড় জগতে কার্য্যের প্রকারবিশেষ দেখাইতে হইবে না। সামান্য অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক যে কোন কার্য্যে মন ও শরীর নিয়োগ করিতে পারেন। স্বদেশের হিতসাধন-ব্রতে ব্রতী হইলে তাহাদিগকে কার্য্যের জন্য ভাবিতে হইবে না; নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারেন। তদ্ভিন্ন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীরও কর্ম্ম করিতে পারেন। সন্তানকে শিক্ষাদান, বিজ্ঞান বা সাহিত্যানুশীলন, কি পুস্তক লেখা এ সকল কার্য্যও উপেক্ষার সামগ্রী নহে। যাঁহারা 'সখ্'

করিয়া বাগান করেন, কি সেই বাগানে একটী গাছের উপর যত্ন করেন, তাঁহা-দিগকেও আমরা নিন্দা করি না। স্থূল কথা এই যে কোন প্রকারে, যে কোন উপায়ে মনকে সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। কার্য্যবিহীন হইলেই নানা বিপত্তি উপস্থিত হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় আবার বলি বিশ্বকর্ত্তা এ কর্ম্মক্ষেত্র জগতে কাহাকেও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেন নাই। আবার বলি কার্য্যই জড় জগতের জীবন।

তৃতীয়তঃ সুবিবেচিত অভ্যাসের উপর *অনেক সুখ নির্ভর করে। যেমন* অভ্যাসই হউক না কেন মানবের অভ্যাস-টী এমনই হওয়া উচিত যে অভ্যাসের কোনও ব্যতিক্রম হইলে বা অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিলে তাহাতে যেন কোনও ক্লেশ না হয়। এটি সম্পাদিত হইলে যথার্থ সুখের বিষয়। সকল অভ্যাসই সমান। প্রথমে একটু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একবার অভ্যাস দাঁড়া-ইয়া গেলে আর কষ্টের কিছুই নাই। তেমনই যে কোন অভ্যাসই হউক না কেন পুরাতন অভ্যাস প্রত্যাবর্ত্তনও অতি সহজ। যে সকল অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হইলে ক্লেশ হয় না, সে সকল অভ্যাসের প্রভুত্বের কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ধনী সন্তান স্বর্ণ-থালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন আহার করেন; ঘৃত সংযুক্ত গোবিন্দ-ভোগ ধান্যের অন্ন, রোহিতের মুড়া, আমারদের অন্ন, তাঁহার দৈনিক জিহ্বা পরিতুষ্টির উপাদান। পক্ষান্তরে কৃষকের পর্ণকুটিরের উদর সেবা মনে করুন। দুই প্রহরের পর কৃষকপুত্র কদলী-পত্রে নোনা-ধান্যের রক্তান্ন লবণ সংযোগে অথবা যৎসামান্য উপকরণে গলাধকরণ করিতেছে। কিন্তু এই ধনী কৃষকের মধ্যে *এক দিন যদি একের খাদ্য* অন্যকে প্রদান করা যায় তাহা হইলে ধনী সন্তানকে পূর্ণ উপবাসী থাকিতে হইবে অথচ কৃষক পুত্রের সে দিন ভোজন সুখের পরাকাষ্ঠা। পাঠকবর্গ এক্ষণে আমাদের পূর্ব্বকার বাক্যের তাৎপর্য্য *গ্রহণে সক্ষম হইবেন। সংক্ষেপে* অভ্যাসের উপর আমাদের দৈনিক ও পার্থিব সুখ-দুঃখ অনেকটা নির্ভর করে। কৃষক সমস্ত দিন স্বহস্তে হলচালনা করে আর একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক সমস্ত দিন চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় অতিবাহিত করেন। খেলাতে যদি কোনক্রমে বাধা উপস্থিত হইল তবে ক্রীড়কের আর অসুখের সীমা থাকে না; কিন্তু কৃষক পক্ষে বাধা, হলচালনাজনিত শ্রমাপনয়নের সম্পূর্ণ উপযোগী ও আনন্দদায়ক। অভ্যাসের তারতম্যে এইরূপ নানাপ্রকার লোকের মধ্যে নানাপ্রকারের অবস্থা ও তজ্জনিত ফলাফলের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

চতুর্থতঃ স্বাস্থ্যে আমাদের সুখ। সুবি-ধার জন্য আমরা 'স্বাস্থ্য' বাক্যটী সম্মুখে ধরিলাম কিন্তু ইহাতে আরও দুই একটি বিষয় বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র শারী-

রিক ব্যাধি হইতে অব্যাহতির কথা বলিতেছি না। তদ্ভিন্ন চিত্তের স্থৈর্য্য দাঢ্য প্রভৃতি বৃত্তিনিচয় এবং চিত্তের সেই প্রমোদগুণ যাহার কল্যাণে লোকে সমাজে 'আমুদে' বলিয়া পরিচিত হয়—বুঝিতে হইবে। স্বাস্থ্য সুতরাং অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে যদি ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, ব্যয় ভার বহন করিতে হয়, আত্মসংযম করিতে হয়, সমুদয়ই কর্ত্তব্য। কেননা, যখন শারীরিক বা মানসিক কোন পীড়া না থাকে, তখন মন স্বভাবতঃ কেমন প্রফুল্ল হয়। এই সংক্রামক ব্যাধি-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে দুর্ব্বল রোগী আর সবল সুস্থ ব্যক্তির অবস্থার বিভেদ প্রদর্শনার্থ লেখনী সঞ্চালনের আবশ্যক করে না। সংক্ষেপে স্বাস্থ্য সকল সুখের আকর, স্বাস্থ্য এই জরামরণসঙ্কুল পৃথিবীর ত্রিদিব ধাম।

মানবগণের এই পৃথিবীতে সুখের কি আছে কি নাই একরূপ দেখান গেল। অনেকে আমাদের এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হয়ত হতাশ্বাস হইবেন। কুইনাইন সেবনে জ্বর যেমন আরোগ্য হয় তাঁহারা হয়ত মনে করিয়াছিলেন আমাদের এই প্রবন্ধে এমন কিছু থাকিবে যাহা পাঠ করিলেই তাঁহারা সুখী হইবেন, দুঃখের আর লেশমাত্রও থাকিবে না। যাঁহারা পৃথিবীর সহিত একরূপ পরিচিত হইয়াছেন তাঁহারা কখনই পূর্ব্বোক্তরূপ আশা করিবেন না, ইহা আমরা জানি। পৃথিবী এমনই স্থান এবং জাতিগত পরিবারগত ব্যক্তিগত পার্থক্য সম্পাদিত হওয়াতে ইহা অধুনা এমন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে যে সর্ব্ববাদী সম্মত সুখ-পন্থা নির্দ্দেশ করা একরূপ অসম্ভব। তবে এপথের পথিক সকলেই হইতে চাহেন, কিন্তু প্রায় শতকরা নিরনব্বই জন অকৃতকার্য্য হয়েন। আমরা অপেক্ষাকৃত সুবুদ্ধি পথিকগণকে এই পথে বিচরণ করিবার বিপদ, আপদের কথা বলিয়া দিলাম। কোথা দস্যুভয়, দেখাইয়া দিলাম। কোন্ স্থানে অতিথিরা নিরাপদে থাকিতে পারেন, নির্দ্দেশ করিলাম। আমাদের ইঙ্গিত বুঝিয়া কার্য্য করিলে এই দুঃখময় পৃথিবী অনেকটা সুখের হইবে।

আর কিছু হউক আর নাই হউক এ প্রবন্ধ পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে পৃথিবীর লোক যে যেমন অবস্থাপন্ন হউক না কেন চেষ্টা করিলে অনেকটা সুখ-সচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া সহজে দুঃখের জীবনকে সুখে অতিবাহিত করিতে পারেন। সুখ সুখ করিয়া ভ্রমণ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি নিঃস্ব অতএব আমি সুখী হইতে পারিব না মনে করা ভ্রম। তাবৎ বলি সকল অবস্থায় লোকেই চেষ্টা করিলে সেই অবস্থা উপযোগী সুখলাভে সক্ষম হইতে পারেন। এ প্রবন্ধ পাঠে ইহাও উপলব্ধি হইবে যে সুখ লাভার্থে কখন কোন ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করিতে হইবে না। চিরকালই পাপের উপর ধর্ম্মের জয়। এইমাত্র বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব যে

সুখ পাইবার জন্য আমাদের কিছু আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। সুখ লাভের যাবতীয় উপাদান আমাদেরই নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে; বিবেচনা পূর্ব্বক নিয়োজিত করিতে পারিলেই আমরা সুখী হইতে পারিব। কেবল আপনাদের অবস্থার উপর একটু দৃষ্টি করিলেই যথেষ্ট হইবে। যাঁহারা এ প্রবন্ধ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে অন্যের উপরের সুখ দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইবার কোন কারণ নাই। অমুক অপেক্ষা অমুক সুখী নির্দ্ধারিতরূপে এরূপ নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন কর্ম্ম, অথবা একরূপ অসম্ভব। স্বকীয় অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখিয়া আপনার, নিজ পরিবারের, আত্মীয় স্বজনের, স্বদেশের হিতসাধনে ব্রতী হও, মনকে জ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তি সহযোগে সুশোভিত কর, চিত্ত-সচ্ছন্দতা ও সুখ আসিয়া তোমাকে সান্দ্রালিঙ্গনে অভিষেক করিবে।

শ্রীবিঃ

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলী।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

সময়—নিশীথ।

(চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের অনতিদূরে রতি, কামদেব, বনদেবী, যমুনাদেবী আসীন;—রতি কামদেবের পৃষ্ঠভাগে বসিয়া তূণ হইতে এক একটী ফুল-শর লইয়া দর্শন করিতেং—

এত সম্মোহন!—চিনি এরে—
উন্মাদন এই!—এদু'টী কি?
ওঃ—শোষণ তাপন!—এটী কি আবার?
চিনেছি স্তম্ভন।—ও মন্মথ!
(মদনের গাল ফিরাইয়া)
এটী কি তোমার?—

কাম।—'আশা' ওটী ফুলময়ী ইন্দ্রজালময়
ত্রিভুবন ভ্রান্ত প্রিয়ে যাহার কুহকে!—

রতি।—এটী কি আবার?

কামদেব।—'লাজহর' প্রাণেশ্বরী!—
ইহারে হানিলে
লাজ ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কুলবালা
সাধে পুরুষের মন!—ওকে আসে?—
(চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)
বহ শুনি কি বলে এ!—(লাজ হর গ্রহণ)

চন্দ্রা।—হায়রে ললাট মোর!—
কাঁহে না মরলু?— যব জনমলু
পিয়াক না পালু যদি!
কাঁহে জনমলু?— দুর্ল্লভ জনমে
কি ফল—কেশবে যদি
হৃদয় মাঝারে নারলু রাখিতে?
বিফল জীবন মোর।—
বিফল সাধনা করম বিপাকে!
বিধাতা কি দোষ তোর?

'দে জল'—'দে জল' জপই যতনে
সাধলু জলদ বরে!
জলের বদরে বজর গিরল
হমার কপাল ফেরে!
পিয়াসে দহিয়া জলধি দেখিয়া
উদল মানসে আশ!
জলধি শুকল পিয়াসা না গেল
হায় রে সবর নাশ!—
তাপিত ভইয়া অটবী হেরিয়া
পুলকে পূরল মন!
অটবী ভাঙ্গিয়া মুড়মে গিরল
বিধিরে এ তোর গুণ!
ফুলের আবলি যতনে গাঁথিয়ে
গলায় পরলু তাবে!
সাপিনী ভইয়া হায় রে কপাল
দংশল হৃদয়ে মোর!—
কাঁচন নেহারি যতন করিয়ে
বাঁধনু আঁচল কোণে!
খুলিয়া পেথলু হায়রে ভসম
হমার কপাল গুণে!—
শারদ নীলিমা গগণ নিরখি
পাগল ভইল মন!
ধন্ব ভাবিয়া পচিমে ধায়লু
মিছা ভইল শ্রম!
শারদ শশীর মাধুরী নিরখি
দুরাশা ভইল মনে!
সোপান বনাতে জীবন গয়িল
না পালু সে শশী ধনে!
(হম্)—নখরে পৃথিবী খুদিয়ে খুদিয়ে
পুকুর কাটলু হায়!
(হম্)—যোগাসনে বসি জনম কাটালু
তবুও না পালু তায়!

(চিন্তা)

রতি।—(কামদেবকে লাজ হর শরাসনে আরোপণ করিতে উদ্যত দেখিয়া নিবারণ করত)

রহ নাথ শুনি আগে আবার কি বলে!—
মর আখে শূন্য মোরা—মরের শ্রবণে
না পারে বাজিতে যাহা কহিছি আমরা।

চন্দ্রা।—হায়রে সে দিন।—

কুদিন হলেও সুদিন সে দিন!—
কুদিন কহব কেসা?
(যদি) কুদিন সেদিন সুদিন তাহলে
অভাগী জীবনে কাঁহা?
(মোর)-জীবন তামসী নিশির মাঝারে
জীবনে চাঁদিমা যদি
উদল—তাহলে সে দিনই সে দিন
কুদিন কহতু যারে!
(মোর) যে দিন হৃদয় আকাশে উদয়
নীরদ চাঁদিমা ভেল—
আশার সরসে প্রণয় কুমুদ
সে দিন বিকাশ ভেল!
(সে যে) বিকাশ ভেয়ল আর না মুদল
রহল একই ভাবে—
(মোর) হৃদয় সরসে সে নীল শশীর
মূরতি নিয়ত জাগে!
(হম্) অভাগা চাতকী শারদ গগণে
জলদে নেহারি হায়!
বরথর বলি বৃথাই ভুললুঁ
পিয়াসে পরাণ যায়!
রাবণক চিতা হৃদয় মাঝারে
ধিকি ধিকি ধিকি জ্বলে!
(হম্) কি দিয়া নিবার? কাঁদিয়া নারলু
না নিবে নয়ন জলে!

(অরে)-নিঠুর মদন না হোয়ও মরণ
বজর গিরক ভালে।
(তোর) ফুলের ধনুকে লাগুক অনল
মলয়ে দংশুক নাগে!
(হম্) তোর লাগিয়ে পাগব ভয়নু
কাহা পলাব হায়!
(মোর) মরণ ভইলে বাঁচন ভইত
এ পোড়া মদন দায়।
এ পাপ জীবনে কি ফল হমার?
না পালু কেশবে যদি—
(হম্) সে রূপ ধেয়নে যোগাসনে বসি
জীবন কিয়ব মাটি।
(হম্) ব্রজের বেণুমে বেণু ভৈয়ব
বাধব বঁধুব পায়!
ব্রজের মরুতে মরুত ভইয়ে
বহব বঁধুর গায়!
ব্রজের সলিলে মিলিত ভইয়ে
মিলব বঁধুর সনে।
ব্রজের অনলে অনল মিলিয়ে
জাগব বঁধুব মনে!
ব্রজের আকাশে আকাশ মিশাব
ব্রজের অনুমে অনু!
(আবার) ব্রজের বিপিনে অম্বুব সংযোগে
পায়ব নূতন তনু!
ভয়ব বকুল কদম বল্লরী
ফুটব কুসুম তায়!
তাহার তলায় অধরে মুরলী
দাঁড়াব কেশব রায়!
ব্রজের হিলোলে খুলিয়ে পাবড়ী
গিরব তাহার গায়!
(আবার) ব্রজের কামিনী তুলই যতনে
গাঁথই আবলি তায়
ঝুলাব যতনে চরচি চন্দনে
বিশাল উরশে তার!
(আবার) ব্রজের মরুতে মিশায়ে পরাণ
পসব নাসায় তার!—
(হমায়) জীবনে কি কায? যদি না লভলু
দুর্লভ বঁধুব পদ!
(হমার) ব্রজের বেণুতে বাসনা মিসিতে
পাইতে নির্ব্বাণ পদ!—
(ক্ষণকাল চিন্তা;—পরে শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিয়া)
অই নিশীথে সুরয উদয় ভেল!—
এরূপ নেহারি পাসরি কইসে?
কই সে ধৈরজ ধরি?
(মোর) পরাণ গয়িল!—কি ফল হমার
শরহে মরম করি?
(হম্) মদনক পাশ তুকব পসারি
বাঁধব উরশে তায়ে!
(হম্) সাপটি ধরিয়ে জনম সফল
কিয়ব জনমু তার!
পলকের তরে উরশে পরশি
উরশ মোহন তার—
যায় যদি প্রাণ!— তাহে কি ক্ষতি?
তাহি বাসনা মোর!
(যদি) পরশি উহারে জীবন ত্যজলু
তবে কি চাহিরে আর?—

(কামদেবের লাজ-হর ত্যাগ—চন্দ্রাবলীর বক্ষে পতন,—শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ,—চন্দ্রাবলী আলু থালু বাসে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মানা,—রতি কামদেব বন দেবী যমুনা দেবীর অন্তর্দ্ধান।)

শ্রীকৃষ্ণ।—কোন্ আরে?—চন্দ্রাবলী!—
বাসর কি সুবচিত ভেল?
কুঞ্জ কাননমে আয়ল কি রাই?
হম যমুনা তীরমে বইঠি
ফুকারই বঙশী বোলায়লু তায়!
কহ চন্দ্রাবলী
সাধনা কি সকল ভেল?
কুঞ্জ গগণমে উদয় কি ভেল
ভাগ-চাঁদিমা মোর?

(চন্দ্রাবলী দক্ষিণ হস্তের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গলদেশ বেষ্টন করিয়া গতি রোধ করণ)

হম চলত ত চন্দ্রাবলী
তু কাঁহে পাকড়ি লেঁউ?—
সখী চন্দ্রাবলী তু কিবতু কা?
অপরাধী নিচল কাঁহে লেত মোয়?—

চন্দ্রাবলী।—(শ্রীকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে কুঞ্জ কুটীরের সম্মুখস্থ লতা মণ্ডপের দিকে লইতে লইতে)

অপরাধী নহ?—তু কইসে কহত?—
আড় কুটিল খরতর সন্ধানে
সরলা ব্রজ বালা বিঁধই ঘুমত!—
নিলাজ তুবড়!—
অপরাধী নহ নহে কাঁহে কহত?—
(ক্ষণকাল পরে)।
অধীর না ভেয়ও বনোয়ারি
আজিত অতিথি তুহু হমারি!—
(হম্) যোগাসনে বসি জনম কাটায়লু
অহি শ্রীচরণ আশে!
গ্রহ পরসন আজি মোর ভেয়ল
মিলল কুঞ্জ নিবাসে!
ললিত লবঙ্গ লতায় বিরচিত
কুঞ্জ কুটীর!
হেরহে নটবর অই বিরাজত
মদন মনোহর!
ছোড়ব না আজি অইঠে বইঠবি
চল বনয়ারী!
কইসে ভাগবি? শকবিত না হরি
লাগায়ব মদনক বেড়ি?
হৃদিকারাগরে আগর আটকই
আটকব তোহে?
(ভাল)—কইসে ভাগবি কপট কালিয়া
পেখব ত আজি তাহে!—

(কুঞ্জ কুটীরের সম্মুখই লতা মণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া উপবেশন)

অধীর ভেয়তু কাঁহে?—বঁধুহে বইঠ—
যতনে পুজব তোহে!
ফুলের কুটীরে চলহে নাগর
পায়বি পীরীতি তাহে!
ফুলের আগর আটকি যতনে
আটক কিয়ব তোহে!
চপল নয়নে চাহত সঘনে
কিভয় উদল মনে?
উরশ বাসরে শোয়াব তোঁহারে
বিবস বদন কেনে?
ফুলের কুটীর ফুলের ছাউনি
ফুলের আগর তায়!
ফুলের পাঁচীরে ভ্রমরা বিহারে
মধুর মধুর গায়!
ফুল ধনু করে ফুলের বঁধুয়া
ফুল শর ঘন হানে!
ফুলের আঘাতে হিয়া বিদরত
কইসে ধৈরয মানে?—

ফুলের বাসর ফুলের তৈজস
ফুলের বেড়ায় ঘেরা!
ফুলের শিখরে শোয়াব ভ্রমরা
মধুরে দেত্ হে সাড়া!
ফুলের সৌরভে মোহিত কোকিলা
কুহরে তমাল শিরে!
বঁধুহে বইঠ না ভেব উতরা
হৃদয়ে শোয়াই তোরে।
অধর অমিয়া পিয়াব যতনে
তবে হে বিরস কাহে?
সেওহে নাগর দিনু হে ফিরায়ে
দাগহে চুম্বন তাহে!—
(শ্রীকৃষ্ণের মুখের নিকট ধীরে মুক লওন
শ্রীকৃষ্ণ অপ্রভিরে ন্যায় কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়)
—হায়রে করম দশা!—
মাণিক হেরিয়ে উন্মাদ ভইয়ে
হাত বাড়ালু হায়!
কে জানে মাণিক নাগের মাথায়
উলটি দংশল গায়!
ফুলের সুরভে মোহিত ভইয়ে
ধরলু নাসার মূলে!
নাগিনী ভইয়ে ললাটে দংশল—
এহি আছিল ভালে!
জলের লাগিয়ে হাত পাতলু
গরল দিলিহে বঁধু!
ভিকের আশয়ে করঙ পতিলু
মুট দেখালি সুধু!
তু'বড় নিঠুর কৃপণ নাগর
নাভেল করুণা মনে?
কি বড় কথা হে?—একটী চুম্বন
এতেও বিমুখ দানে?

শ্রীকৃষ্ণ।—চন্দ্রাবলী।
আজি ছোড়ি দেহ মোহে!
কালি দরশন পুন দিব তোহে।—
বাসর বনাই রাধিকা বৈঠত
কুঞ্জ বিপনমে
বিপদ বিসম বিলম্বে ভেয়ব
বজর গিরব মাথে!
চন্দ্রাবলী।—আজি ছেড়ি দেহ মোহে
কালি দরশন পুন দিব তোহে!
চন্দ্রাবলী।—দিন পায়লু যদি হে নাগর
কে ছোড়ে আজি হে তোহে?
রতনে পাইয়া যতনে বাঁধলু
খুলিয়া ফেকব কাঁহে?
পিয়াসে জ্বলিয়া জল লভলে
না পিয়ে কে ছোড়ে তারে?
হিমানী সহিয়া অনল লভলু
নিবাব কাহার তরে?
ছোড় হে চাতুরী বঁধু!—
না হই বালিকা বুঝি হে নাগর
ভুলি না কথায় সুধু!—
(আজি) কে ছোড়ে নাগর তোরে?
(যদি) লভলু রতনে বাঁধলু যতনে
খুলব কাহে হে বঁধু!
অধর আগারে রাখলু যতনে
পিয়াব তোহারে মধু!
বাসব বিভব কুবের ভাঁড়ার
চরণে দিউক ধরি,
বঁধুহে বিফল!—— যাউক জীবন
তবুও তোহে না ছোড়ি!
বঁধুহে!——
নিজ অধিকারে পায়লু তোহারে
তু'হলি হমার প্রজা

হুকুম বিহনে যা দেখি কই সে
আব হি হমত রাজা!
খাজানা-চুম্বন ওয়াদা ভেয়ল
তাগাদা করতু সুধু!
কর হে দাখিল মদন মৌসিল
নতুবা দিবহে বঁধু!—
মদন পেয়াদা ভ'লে ওয়াদা
না মানে আপন পর!
ত্যজ হে ছলনা, ওয়দা ভেয়াদা ভেয়ল
কর হে দাখিল কর।
(চুম্বন)
ছল করিয়ে যাবে হে ভুলায়ে
সে আশা ত্যজহে বঁধু।—
ছল করিয়ে ভকতে ভুলাও
হবি হে তু বড় সাধু!
বঁধুরে— আমরি!—
তু বড় কলপতরু!—
মুটের লাগিয়ে আঁচর পাতলু
নিরাশ করলি তাহে!
লাজ ত্যজিয়ে যাচলু একটী
না দিলি নাগর মোহে!
দিতি যদি হে সুদে আসলে
শোধিতু তাহলে তোহে!
দিতি একটী লভতি দশটী
অবোধ তু বড় কাম!
লাজ খাইয়ে যাচিকা ভয়লু
রাখিলি ভালা হে মান!—
রাখ বা না রাখ যা খুসি তা কিয়
না ছোড়ি বঁধুয়া তোরে!
হরিণ করিয়ে পালব বঁধুয়া
যৌবন কাননে তোরে!—

কানন মাঝারে ফিরবি ঘুমবি
চরবি যা খুসি তাহে!
বাপী কূপ সর নির্ঝর কন্দর
ভূধর প্রান্তর যাহে
উতলা ভই লে বিপদ ভেয়ব
বঁধুয়া রাখবি মনে!
(শ্রীকৃষ্ণের গলায় ফুলমালা পরাইয়া)
(এই) ফুলের শিকলে লাগালু কুলুপ
বারণ আজি না মানে!—
(মোর) মানস বারণ না মানে বারণ
কি করি?—কহিদে মোহে!
উরশে উরশ পরশ নাগর
বিরশ বচলি কাহে?—
(শ্রীকৃষ্ণকে কিঞ্চিৎ আপনার দিকে টানিয়া লওন)
ছিছিরে কালিয়া কাঠের পুতলি
পাথাণে রচিত হিয়া!
সাধনে সদয় না ভেলি কালিয়া
সাধব আর কি দিয়া?
শরমে যদিহে নীরব বঁধুয়া—
শরম করত কাহে?
ধবায় নিরখি কাঁহেরে নাগর?
সুধাই কহত মোহে!—
তুলহে বদন দাগ হে চুম্বন
না রবি এমন ধারা!
তমাল বকুল লবঙ্গ বল্লরী
সুখে কি অরথ তারা?
(চুম্বন)
(মোর) মধুর আধার অধর কমলে
যদি না রহতু মধু!
(এ) যৌবন জোয়ারে রূপের লহরী
যদি না পেলতু বঁধু!

আঁচল নিচোল উছলে মলয়
যদি না বহতু বাত!—
বঁধু হে তা হলে আপনি(হি) বুঝিতু
ধরতু না তোর হাত!
হের হে বঁধুয়া পরখ করিয়া
না হই কুরূপা কভু!
(তোর) বুকের উতাপে গলিয়া যাবব
কোমল এই মম বপু।
যমুনা সৈকতে নাচিয়া বেড়াব
না রব চরণ রেখা।
মালতী শাখায় শোয়াব ভইলে
হেলব নাহিক সখা।
(এ) মধুর আগার অধরে হমার
কভু না ফুরায় মধু।
না হোয় বারেক হের না বঁধুয়া
পরীখা করিয়ে সুধু!—
শ্রীকৃষ্ণ।—হম্ চলব অব--ছোড় চন্দ্রাবলী!—
নিশি বুঝি অবসান ভেল।
চন্দ্রাবলী।—নিশি থাক বা না থাক যাকনা বঁধুয়া
কি ক্ষতি তাহে হে মোর?
দিবসে কি ফুলে না বসে ভ্রমর
বঁধুহে সুধাই তোর?
(যদি) তরুণ ভানুর ললিত কিরণ
না সহে ললিত গায়ে
এলায়ে কবরী যতন করিয়ে
রাখব আড়াল দিয়ে!
শীতল লোলিত মেদুল নিশ্বাসে
ব্যজন কিয়ব তোহে।
নয়ন আসারে ধোয়াব বঁধুয়া
ভাবনা কিয়তু কাঁহে?

(নিশি)-থাক বা না থাক যাক না বঁধুয়া
না ছোড়ি আজিছে তোর!
যতন করিয়ে রাখব নাগর
খোপার মাঝারে মোর!
নতুবা যতনে হার করিয়ে
উরসে পরব তোরে!
আঁচলে নতুবা যতনে বাঁধিয়ে
ঝুলাব নিতম পরে!—
(শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ)
শ্রীকৃষ্ণ।—ছোড় লো কিকর?—কর হমারি
চন্দ্রাবলী।—না ছোড়ি নাগর তোহে!—
তবেত ছোড়ব মানস হমার
উলটি আগে দে মোহে!
শ্রীকৃষ্ণ।—নিলাজ তু'বড় সখী!
প্রভাত ভইল একিবে বালাই
না ছোড় হমারে কাঁহে?
প্রভাত ভইলে বিপদ ভেয়ব
বিফল বুঝান তোহে!—
(বিরক্ত হইয়া চন্দ্রাবলীর হস্ত ছাড়াইয়া গাত্রোত্থান;—চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছিত হইয়া পতন; শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতীভ হইয়া)
কি ভেল আবার?—
(ব্যস্ত হইয়া কখন হস্তে কখন গণ্ডে কখন বক্ষে কখন ওষ্ঠে হস্ত সঞ্চালন;—কখন হস্ত টিপিয়া নাড়ী দর্শন;—নয়নে কর্ণে ও ওষ্ঠে ফুংকার ও চৈতন্য করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করন; পরিশেষে চুম্বন;—চন্দ্রাবলীর নয়ন উন্মিলন—তদ্দর্শনে আশ্বাস্থ হইয়া পুন পুন চুম্বন)

চন্দ্রাবলী।—কাঁহা আবহি হম্ ?
অমরে না ম'র ?—জলে না অনলে ?
উষা না প্রদোষ এবে ?
জীবনে কি ভাল ?—না মরণে মঙ্গল ?
ঠাহরিতে এবে নারি !—
এহিত জীবন আছিল হমার
জীবনে মরণ তবে।
(আবার) মরণ ভইল লভলু সে সুখ
জীবনে নারলু যাবে !
বঁধু—তুই কি বধলি মোরে ?
আবার বধহে মিনতি বঁধুয়া
বধহে চরণে ধরি !
(তোর) কুটিল নয়নে বিরাগ তরগ
পেখিতে আর যে নারি !
(তোর) কঠিন হৃদয় লকিব নয়ন
মারিত জীবনে মো'হে।
(তোর) সদয় অধর যদি না বরখিত
অমিয়া বরখি মুখে !—
(গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করতঃ)
বঁধুহে তোহার বিমল অধর
ললিত নিশান মোর
ললিত অধরে লাগল যদিহে
কি দিয়া শোধব তোর ?
শোধে যদি হে আপনা বিকালে
আপনা বিকাই তবে!
কি নহে বঁধুয়া সুলভ মূলমে
দিব হে ছোড়িয়া তোরে !
হারাব বলিয়া ডরহ যদিহে
লওহে বঁধুয়া তবে !—
(শ্রীকৃষ্ণের মুখের নিকট মুখ লইয়া)
দাগহে তোহার মদন মোহন
(হমার)-তরল অধর মূলে !—
হাজার চুম্বনে বেচব এমন
সুলভ ?—বঁধুহে কিন !—
এক দিনে নার দশ দিনে দিহ
পরোহে বিরস কেন ?—
(নিস্পন্দের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকন;—পেপথ্যে কোমল বাদ্য)
শ্রীকৃষ্ণ।—এ কিবে ভইল ?
(চন্দ্রাবলী নিদ্রাভিভূত হইয়া ঢলিয়া পড়ন)
অলসে নয়ন মুদিত ভেয়ত
কই সে——
(নিদ্রাভিভূত হইয়া চন্দ্রাবলীর পার্শ্বে ঢলিয়া পড়ন;—যমুনা দেবী ও বন দেবীর পুনরাবির্ভাব)
বনদেবী—হেরিলেত লাজ হরে ?—
কহ যদি সখী এবে প্রতিকার করি !—
যমুনা দেবী।—কেমনে করিবে সখী ?—
স্মর তবে স্মরে !
সম্মোহনে উনমাদ করিবে কেশবে।—
বনদেবী।—হিতে বিপরীত হবে স্মরেরে স্মরিলে
বিঘ্ন যার প্রতি কাযে !—
যমুনা দেবী।—তবে কি করিবে ?
বনদেবী।—ফুল শরাঘাতে কালি গোবর্দ্ধন শিরে
কুসুমিত শূলী শূল হয়েছিল যেই
এই সেই ফল সখী !—শুনিয়াছি আমি
মদন-মন-মোহিনী বলেছেন মোরে
নিদ্রাকালে যার আঁখে ছোয়াবে এ ফুল

নিদ্রা ভঙ্গে যার মুখ প্রথমে দেখিবে
মজিবে তাহার সহ!—দেব-মায়াবলে
নররূপী নারায়ণ আছেন নিদ্রিত!—
পাশে তাঁর চন্দ্রাবলী!—নিদ্রাভঙ্গে আঁখি
অবশ্য পড়িবে তাঁর চন্দ্রাবলী পানে!—

যমুনাদেবী।—সেই ভাল!—
বনদেবী।—এস তবে!—
(শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে ফুল ছুয়াইয়া বনদেবী ও যমুনাদেবীর অন্তর্দ্ধান)

(যবনিকা পতন)

বহমান বা গ্যালভানীয় তাড়িত।

(Current Electricity or Galvanism.)

গ্যালভানীয় অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়া জনিত তাড়িতের আবিষ্ক্রিয়া। ইহার উদ্ভাবনী শক্তি সম্বন্ধে গ্যালভানির ভ্রমাত্মক মত। ভলটার-volta তত্ত্বানুসন্ধান। ভলটীয় স্তম্ভের-Voltaic Pile আবিষ্ক্রিয়া। ভলটীয় তাড়িত বিজ্ঞানের সূত্রপাত। বিবিধ ভলটীয় ব্যাটারি। তাহাদের কার্য্য প্রণালী বিষয়ক বিবিধ মত। সার হাম্‌ফ্রে ডেভির-Sir Humphrey Davy-তত্ত্বানুসন্ধান। ক্ষার-Alkali এবং মৃত্তিকা সমূহের বিশ্লেষণ-Analysis। এতদ্‌সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা। প্রচণ্ড বলশালী গ্যালভানীয় ব্যাটারির প্রথম সূত্রপাত। নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি কর্ত্তৃক তাহাদের বলের পরীক্ষা। সার্ হাম্‌ফ্রে ডেভি কর্ত্তৃক গ্যালভানীয় তাড়িতের কতিপয় পরীক্ষা।

আঠারশ শতাব্দির শেষের সহিত তাড়িত বিজ্ঞানের একটী নবযুগের আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ সমূহে আমরা ঘর্ষনোত্তেজিত তাড়িতের ক্রমোন্নতি নির্দ্দেশ করিয়াছি। এক্ষণে রাসায়নিক প্রক্রিয়া জনিত তাড়িত বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইল। অধিকাংশ আবিষ্কারের ন্যায় এইটীও দৈব ঘটনা যোগে প্রকাশমান হয়।

পেভিয়ার-Pavia-এনাটমির-Anatomy অধ্যাপক গ্যালভানি সর্ব্ব প্রথম তাড়িত বিজ্ঞানের এই নব শাখার প্রবর্ত্তনা করেন বলিয়া বিখ্যাত হন। তদনুসারে তাঁহারই নাম হইতে এই বিজ্ঞান বহুকালাবধি *গ্যালভানিজ্‌ম্* বা *গ্যালভানীয় তাড়িত* বিজ্ঞান নামে আখ্যাত হয়। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ দেখা যায়। কথিত আছে, বিবি গ্যালভানি কোন সময় পীড়িত হন, তাহাতে ভেক মাংসের ঝোল আহারের ব্যবস্থা হওয়ায়, গ্যালভানির জনৈক ছাত্র মেজের উপর একটী তাড়িত-যন্ত্রের নিকট গ্যালভানির স্ত্রীর সমক্ষে একটী ভেক কর্ত্তন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহারা উভয়ে লক্ষ্য করিলেন যে ঐ ভেকের পদদ্বয় কর্ত্তন সময়ে ছুরীকা সংস্পর্শে হঠাৎ আন্দোলিত-

Convulsed-হইয়া উঠিল। ১৭৯১ খৃঃঅব্দে বলোনায় গ্যালভানি কর্তৃক বিজ্ঞান সভার নিমিত্ত এক খানি গ্রন্থ প্রচারিত হয়; তাহাতে তিনি লিখেন, "তাঁহার মেজের উপর একটী তাড়িৎ যন্ত্রের নিকট কোন সময়ে তিনি একটী ভেক কর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জনৈক ছাত্র হঠাৎ সেই ভেকের জাঙ্ঘীক শিরা-crural nerve-ছুরিকা সংস্পর্শ করায় ভেকের প্রত্যঙ্গ সমূহ-limbs-আন্দোলিত হইয়া উঠিল। গ্যালভানি এই পরীক্ষাটী অনেক বার পুনরাবৃত্ত করিয়া দেখেন যে, সকল অবস্থায় কোন ধাতব প্রতিচালক ঐ শিরার সংস্পর্শে আনিবামাত্র প্রত্যঙ্গের উক্তরূপ আন্দোলন হইয়া থাকে। কিন্তু কোন ধাতব পরিচালকের সংস্পর্শ বিনা ওরূপ ফলোৎপত্তি হইবে না।

গ্যালভানির এই বিশ্বাস ছিল যে, যাবতীয় ধামনিক কার্য্য-Muscular action-তাড়িত মূলক। পূর্ব্বোক্ত পরিক্ষাটী তাঁহার এই মতের পোষকতার স্বরূপ হইল। তখন তিনি অধিকতর অধ্যবসায়ের সহিত উহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভেকের মৃতদেহ লইয়া তিনি তাড়িত যন্ত্র-Electrial machine-তাড়িতবহ যন্ত্র Electrophorus লিডেন বোতল-Leydenjar-প্রভৃতি যন্ত্র সহযোগে বিবিধ পরীক্ষা সংসাধন করেন। তৎপরে তিনি নিম্নলিখিত রূপে উক্ত ভেক শরীরের উপর বায়বীয় তাড়িতের বল প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার বাটীর শীরোসংলগ্ন বিদ্যুদ্দণ্ডে ভেকের শুটিকতক পাদ সংলগ্ন করিয়া দেখেন যে, প্রতি বিদ্যুদ্দাম কালীন পাদচয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। এবং আরও দেখিলেন যে, বিদ্যুদ্দাম রহিত নির্ম্মল বায়ুতেও বায়বীয় তাড়িত-বল হেতু পূর্ব্ববৎ উক্ত পাদচয় আন্দোলিত হয়। তবে উক্তরূপ বেগে নহে। তৎপরে গ্যালভানি তাহার উদ্যানের লৌহ রেলিংএর উপর কতকগুলি ভেকের পাদ লইয়া লৌহ হুক দ্বারা দোদুল্যমান রাখেন। তাহাতে দেখেন যে উক্ত লৌহ হুক ঐ লৌহ রেলিং সংলগ্ন করিবামাত্রই পাদগুলি সঞ্চালিত হয়। তাহাতে তিনি অনুমান করেন যে, উক্তরূপ কার্য্য তবে বায়ুর উপর কোন প্রকারে নির্ভর করে না। তদনুসারে তিনি তাঁহার গৃহে একটী ভেক লইয়া পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ করেন যে, ভেকের জাঙ্ঘীক শিরা এবং অন্তর্ধমনির সহিত কোন ধাতব সংযোগ করিয়া দিলেই প্রত্যঙ্গ সমূহ আন্দোলিত হয়। গ্যালভানি প্রতিপন্ন করেন যে জীবদৈহিক তাড়িতই উক্তরূপ কার্য্যের কারণ। ভেকের বহিঃ এবং অন্তর্ধমনিদ্বয় যেমন লিডেন বোতলের বহিঃ ও অন্তর্পত্র স্বরূপ; উভয়ের মধ্যে ধাতব সংযোগ স্থাপন দ্বারাই সমতুল্য কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। ধাতব দণ্ডটী কেবল বহিঃও অন্তরস্থ তাড়িতদ্বয়ের একত্রিত হইয়া মিলিবার সুবিধার জন্য। এবং সেই মিলন সময়েই উক্তরূপ লিডেন বোতলের ন্যায় ভেকেরও প্রত্যঙ্গের

মধ্যে তাড়িত কার্য্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ঐ সময়ে এতৎসম্বন্ধে ভলটা তাঁহার এইরূপ মত ব্যক্ত করেন যে, উক্তরূপ তাড়িতকার্য্য কেবল ধাতব সংস্পর্শ হইতেই সংঘটিত হয়। জীবদৈহিক শিরা ও ধমনীস্থ তাড়িত উহার কারণ নহে। তাঁহার এই মতের পোষকার্থে তিনি একটী পরীক্ষার উল্লেখ করেন যে, এক খণ্ড রৌপ্য এবং এক খণ্ড শীস অথবা দস্তা জিহ্বার উপরে রাখিলে তাহাদিগের সংস্পর্শে একরূপ আস্বাদনের উদ্রেক হইয়া থাকে এবং সামান্য অগ্ন্যাভাসও লক্ষিত হয়। এই ঘটনাটী সাল্‌জার সাহেব সর্ব্বপ্রথম ১৭৬০ খৃঃ অ, লক্ষ্য করেন। কিন্তু সেই সময়ে এতদসম্বন্ধে কোন বিশেষ আন্দোলন হয় নাই।

ভলটা অনুমান করেন যে বহুসংখ্যক রৌপ্য ও দস্তার ফলক Gold & Zinc Plates উপর্য্যুপরি রাখিয়া তদ্দ্বারা বিশেষরূপ তাড়িত কার্য্য উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। তদনুসারে তিনি কতকগুলি রৌপ্য এবং দস্তার ফলককে উপর্য্যুপরি স্তম্ভাকারে রাখেন, ও প্রতি রৌপ্য ও দস্তার ফলকের মধ্যে এক খণ্ড করিয়া ঐ আয়তনের ও আকৃতির কাপড়ের চাক্তি জলে সিক্ত করত স্থাপন করেন। এই যন্ত্রটীকে ভলটীয় স্তম্ভ কহে। এতদ্দ্বারা তিনি তাঁহার অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ প্রভূত তাড়িৎবল উদ্ভাবিত হয়।

ভলটার উপরোক্ত মহতী পরীক্ষা সমূহ ২৬ জুন, ১৮০০ খৃঃ অব্দে সার্ জোসেফ্ ব্যাঙ্কসকে-Sir Joseph Banks একখানি পত্রদ্বারা সবিশেষ বর্ণন করেন। ঐ পত্র রাজকীয় সভায়-Royal Society পঠিত হয়। তাহাতে ভল্‌টা তাহার পরীক্ষা লব্ধ ফল এইরূপে বর্ণনা করেন, যে বিভিন্ন প্রকার ধাতু বা অন্য কোনরূপ পরিচালকের শুদ্ধ সংস্পর্শ দ্বারা তিনি প্রচুর পরিমাণে তাড়িতোত্তেজিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং ঐ পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার ধাতব ফলক সম্বলিত স্তম্ভটী প্রস্তুত করেন। তাহা সর্ব্ববিধায়ে লিডেন বোতল এবং তাড়িত ব্যাটারির সমতুল্য। কেবলমাত্র এই প্রভেদ যে, তাহার স্তম্ভোত্তেজিত তাড়িত নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। তাঁহার উক্ত যন্ত্রটীর অবয়ব এইরূপ; কতকগুলি রৌপ্য ও আর কতকগুলি দস্তার ১ইঞ্চ ব্যাস প্রমাণ বৃত্তাকার চাক্তি এবং ঐ আয়তনের কতকগুলি পুরু কাগজ অথবা পারচমেণ্টের চাক্তি জলে কিম্বা লবণাক্ত জলে সিক্ত, এই গুলিই তাঁহার যন্ত্রের উপকরণ মাত্র। প্রথমে এক খানি রৌপ্য অথবা দস্তার চাক্তি স্থাপন করিয়া তাহার উপর এক খানি সিক্ত কাগজের চাকতি তদুপরি একখানি অন্যরূপ ধাতব চাক্তি এই প্রকারে সমস্ত চাক্তিগুলি বিন্যাস করিলে স্তম্ভাকৃতি হইবে। এবং তাহার সর্ব্ব নিম্নে এক প্রকার ধাতব এবং উপরে অন্য এক প্রকার ধাতব চাকতিটী

অর্থাৎ নিচে রৌপ্য চাক্তিটী থাকিলে উপরে দস্তার চাক্তিটী দিয়া শেষ হইবে। ঐ দুই চাক্তির কোনরূপ পরিচালক দ্বারা সংস্পর্শ হইবা মাত্রই তাড়িতবলের সত্তা উপলব্ধি হইবে। সর্ব্বোপরি ও নিম্নস্থ দুই চাক্তি দুই হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবা মাত্র সংক্ষোভ Shock প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং দুইটী ধাতব তার ঐ দুই চাক্তি সংস্পর্শে রাখিয়া তারদ্বয়ের অপর প্রান্ত-দ্বয় পরস্পরের সন্নিকট ধৃত করিলে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ প্রকাশমান হয়। তৎপরে ভলটা দ্বিপঞ্চবিংশতি জোড়া ধাতব ফলক উক্ত-রূপে বিন্যাস করিয়া একটী স্তম্ভ প্রস্তুত করেন, তাহা হইতে প্রচণ্ড বলশালী তাড়িত উত্তেজিত হয়।

কিয়ৎকাল ভল্টা ঐ স্তম্ভ দ্বারাই যাবতীয় তাড়িত পরীক্ষা করিতে থাকেন, কিন্তু উক্তরূপ স্তম্ভের নানা প্রকার অসু-বিধা বিধায় তিনি ঐরূপ চাক্তি সমূহের প্রকারান্তর বিন্যাস দ্বারা যন্ত্রের সুবিধা-জনক রূপান্তর করিবার কল্পনা করিলেন। এবং সত্বরেই কৃতকার্য্য হয়েন। কত-গুলি কাচের পাত্রকে লবণাক্ত জলপূর্ণ করেন তৎপরে প্রথম পাত্রে একটী দস্তার ফলক জলমগ্ন করিয়া তাহার শীরোদেশে একখণ্ড ধাতব তার সংলগ্ন করতঃ ঐ তারের অপর শেষাংশে একখানি তাম্রফ-লক ঐ রূপে সংলগ্ন করিয়া ঐ ফলককে অন্য একটী পাত্রস্থ জলমগ্ন করেন। তৎপরে সেই দ্বিতীয় পাত্রেই আর একখানি দস্তার ফলক আর একখণ্ড তার সংযুক্ত করত নিমজ্জিত রাখিয়া ঐ তারের অপর শেষাংশে আর একখানি তাম্র ফলক সংযুক্ত করিয়া তৃতীয় পাত্রে জলমগ্ন রাখেন। এইরূপ ক্রম বিন্যাস দ্বারা প্রতি পাত্রে একখণ্ড করিয়া দস্তা ও এক খণ্ড তাম্র ফলক লবণাক্ত জলে বিচ্ছিন্ন ভাবে নিমজ্জিত থাকিবে, অর্থাৎ উভয়ের সংস্পর্শ না হয়। এবং এক পাত্রের তাম্র ফলক অপর পাত্রের দস্তার ফলকের সহিত তারদ্বারা সংলগ্ন থাকিবে প্রথম ফলক তাম্র ফলক হইলে সর্ব্ব শেষ পাত্রের শেষ ফলক দস্তা ফলক হইবে। পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভের ন্যায় ঐ দুই ফলক স্পর্শ মাত্র প্রবল সংক্ষোভ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং অপ-রাপর বিবিধ তাড়িত কার্য্য উদ্ভাবিত হয়। ধাতব ফলকের সংখ্যানুসারে উত্তেজিত তাড়িতবলের ন্যূনাধিক্য হইবে।

মৃতদেহের উপর গ্যালভানির পূর্ব্বো-ল্লিখিত পরীক্ষা ভলটা কৃত শেষোক্ত তাড়িত যন্ত্র বা ব্যাটারি দ্বারা আরও অদ্ভুত রূপে প্রকাশমান হইল। অর্থাৎ উক্ত ব্যাটারির দুই প্রান্তস্থ তারদ্বয় মৃত জীবদেহের যে কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের অন্তর এবং বহিঃ শিরা সংলগ্ন মাত্র সেই অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের অদ্ভুত সঞ্চালন লক্ষিত হয়। তাহাতে মৃতদেহ পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ পরীক্ষা সাধারণ্যে প্রদর্শন করতঃ অনেকে একরূপ অর্থকরী ব্যবসা আরম্ভ করিল। এবং গ্যালভানির আবি-ষ্ক্রিয়াটাই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিল,

এবং যে ব্যাটারির সাহায্যে গ্যালভানির পরীক্ষা সমুজ্জ্বল হইল, তাহার আবিষ্কর্ত্তার নাম ভুলিয়া গিয়া লোকে অন্যায়পূর্ব্বক তাহাকে "গ্যালভানীয় ব্যাটারি" নাম প্রদান করিল এবং ঐরূপে উত্তেজিত তাড়িত বিজ্ঞানকে "গ্যালভানিজম" বলিয়া প্রচার করিল। ভলটার মহতী আবিষ্ক্রিয়া, তাঁহার শেষোক্ত ব্যাটারি—সম্যক সমাদৃত না হইয়া ঐ ব্যাটারির কার্য্য বা ফলমাত্র অধিকতর সমাদৃত হইল। কারণ অপেক্ষা তাহার কার্য্য মাত্রই প্রতিষ্ঠাভাজন হইল।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন তড়িদুত্তেজনার উক্ত নবাবিষ্কৃত উপায় ভলটা কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়, তখন ঐ আবিষ্ক্রিয়াতে প্রকারান্তরে পূর্ব্ব পরিজ্ঞাত সাধারণ তাড়িতমাত্র উত্তেজিত হয়, অথবা তাড়িতের ন্যায় কোন অভিনব বলশালী পদার্থের আবিষ্ক্রিয়া হইল, তাহা পদার্থবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিতে পারেন নাই। যদিও পরে তাহা সুবিজ্ঞ বিজ্ঞান বেত্তা কর্ত্তৃক বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা নিঃশংসয়িত রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঘর্ষণোত্তেজিত তাড়িত এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যাটারি জনিত তড়িত একই পদার্থ।

জীবদেহের উপর পূর্ব্বোক্ত উভয় তাড়িতদ্বয়ের কার্য্য একই। এককালীন উভয়ই বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে সংক্ষোভ প্রদানে সক্ষম; যে সমস্ত পদার্থ একের তৎসমস্তই অপরের পরিচালক অথবা অপরিচালক; উভয়বিধ তাড়িতেরই উত্তাপকারী ও দাহিকা শক্তি আছে; উভয়েই অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রকাশমান হইয়া থাকে, উভয়েরই আকর্ষণী এবং বিক্ষেপণী শক্তি আছে এবং উভয়দ্বারা রাসায়নিক বিশ্লেষণ সংঘটিত হইয়া থাকে। তবে দুইয়ের মধ্যে এই দুইবিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হয়, ১ম—ভলটীয় তাড়িত এককালীন অধিক পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া থাকে কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল। ঘর্ষণোত্তেজিত তাড়িত যদিও এককালীন স্বল্প পরিমাণে উত্তেজিত হয় কিন্তু তাহার বল অপেক্ষাকৃত অনেক প্রচণ্ড। এবং ভলটীয় তাড়িতও তাহার কার্য্য সমূহ অপরাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী।

ভল্‌টার আবিষ্কারের পরেই অনেকে তাঁহার ব্যাটারির আকৃতির উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়েন। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত বিবিধ গঠনের ব্যাটারি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগেরসমস্তেরই কার্য্য প্রণালীর মূলতত্ত্ব একই। পরিচালক তরল পদার্থ ভেদে এবং তন্মধ্যে নিমজ্জিত ফলক সমূহ ও তৎসমস্তের আয়তন ও সংখ্যার ন্যূনাধিক্য ভেদে উত্তেজিত তাড়িতের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। ভলটার পরেই ডিঃ ল্যাক্ নামক জনৈক ফরাসীস বিজ্ঞানবেত্তা নির্ম্মিত ব্যাটারি যন্ত্রের এ স্থলে উল্লেখ আবশ্যক। ঐ যন্ত্রের বিশেষ লক্ষণ এই যে উহাতে আদৌ কোন তরল পদার্থ বা আর্দ্রতার নিয়োগ নাই। কতক গুলি এক ইঞ্চ ব্যাস প্রমাণ চাকতি তাহাদের এক পৃষ্ঠে অতি পাতলা প্রকার

পাত ও অপর দিকে Black oxide of manganese উত্তমরূপে আটা দ্বারা মণ্ডিত। ঐ চাকতি গুলি দস্তার মুখ সমস্ত এক দিকে করিয়া উপর্যুপরি বিন্যস্ত করত একটী কাচের চোঙ্গার ভিতর উত্তম রূপে চাপিয়া রাখেন,এইরূপে তিনি প্রথমে ১০,০০০ চাকতির সংযোগে একটী যন্ত্র প্রস্তুত করেন। উহা হইতে যাবতীয় তাড়িৎ কার্য্য প্রদর্শিত হয়। এবং ঐ যন্ত্রের বল ও প্রচণ্ড ও দীর্ঘকাল স্থায়ী, এমন কি দুই চারি বৎসর পর্য্যন্ত একাদিক্রমে সম বলশালী থাকে। ঐ যন্ত্রের কার্য্যকারীতা উক্ত কাগজের চাকতিস্থ সামান্য আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। যদিও আপাততঃ দেখিতে উক্ত চাকতি গুলি সম্পূর্ণ শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক বায়ুর সকল অবস্থাতেই তাহাদিগের মধ্যে যৎসামান্য আর্দ্রতা বর্ত্তমান থাকে। এবং তাহাই তড়িদুত্তেজনা ও পরিচালন পক্ষে যথেষ্ট। এ স্থলে ঐ কাগজের চাকতি গুলি ভল্‌টা-স্তম্ভের সিল্ক কাপড়ের চাকতির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

ভল্‌টীয় ব্যাটারি যন্ত্রে তড়িদুদ্ভাবনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি? কিরূপে উত্তেজনী শক্তির উদয় হয়? ব্যাটারির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এই প্রশ্ন লইয়া এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞেরা ব্যস্ত হয়েন। তৎসম্বন্ধে ভল্‌টার মত এই যে ভিন্ন প্রকার ধাতুর পরস্পর সংস্পর্শে তড়িদুদ্ভাবিত হইয়া থাকে; যে তরল পদার্থে ধাতব ফলক সমূহ নিমজ্জিত থাকে তাহা কেবল ফলক হইতে ফলকান্তরে তাড়িত সঞ্চালন হেতু পরিচালক স্বরূপ মাত্র। আর লবণাক্ত জল অধিকতর পরিচালক হেতু শুদ্ধ জলাপেক্ষা উহা দ্বারা ব্যাটারি অধিকতর কার্য্যকারী হয়। ভল্‌টার এই মত যে, ভ্রমাত্মক তাহা সত্বরেই ডাক্তার উলাস্‌টন্‌ কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হয়। উক্ত ডাক্তরের মতে ব্যাটারিস্থ দস্তাফলকের উপর লবণাক্ত জলের রাসায়নিক প্রক্রিয়াই তড়িদুত্তেজনী শক্তি মাত্র। অর্থাৎ ব্যাটারিস্থ দস্তাফলক এবং তরল পদার্থের পরস্পর সংযোগে এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে তড়িতের উদ্ভাবন হয়। এই মতের পোষকতায় সার হম্‌ফ্রে ডেভি বিবিধ পরীক্ষা করেন, তাহাতে তিনিও স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে ভল্‌টীয় তড়িদুত্তেজনা হেতু রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিতান্ত আবশ্যক। তিনি পরীক্ষা দ্বারা আরও সপ্রমাণ করেন যে কোনরূপ ধাতব ফলক বিনাও ভল্‌টীয় ব্যাটারি প্রস্তুত হইতে পারে। ১৮০১ খৃঃ অব্দ নবেম্বর মাসে তিনি উক্ত রূপ একটী ব্যাটারি প্রস্তুত করেন। তাহাতে ধাতব ফলকের পরিবর্ত্তে ১০ খণ্ড কাষ্ঠের কয়লা ব্যবহৃত হয়। কতিপয় কাচের গ্লাসকে এক পংক্তিতে পরস্পর সন্নিকটে রাখিয়া প্রথমটী অবক্ষারাম্ল Nitric acid, ও দ্বিতীয়টী জলপূর্ণ, পুনরায় তৃতীয়টী ঐ দ্রাবক ও চতুর্থটী জলপূর্ণ, এইরূপ সমস্ত পাত্র গুলি পূর্ণ করতঃ প্রতি পাত্রে এক

খণ্ড করিয়া কয়লা নিমগ্ন করিয়া, তাহাদিগকে তার দ্বারা পরস্পর সংযোগ করত যন্ত্রটী সম্পূর্ণ করেন। এই ব্যাটারি দস্তা, রৌপ্য এবং জল সম্বলিত ব্যাটারির সর্ব্ব বিষয়ে সমতুল্য। তৎপরে ডাক্তার ক্যাবাডেও পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ধাতব ফলক বিশিষ্ট ব্যাটারিতে ও ধাতব ফলকের বিনা সংস্পর্শে তড়িচ্ছ্রাবিত হইবে।

ভলটার আবিষ্ক্রিয়া রাজকীয় সভায় পঠিত হইবার দুই মাস পূর্ব্বে নিক্‌লসন্ এবং কার্‌ল্ আইল কর্ত্তৃক ভলটার ব্যাটারির সাহায্যে প্রথম বারি বিশ্লেষণ সমাধিত হয়। উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের পরীক্ষা সমূহ অনুসরণ করিয়া সার হমফ্রে ডেভি জল হইতে ব্যাটারির সাহায্যে দুইটী কাচের নল মধ্যে প্রাণবায়ু Oxyzen ও উদজান বায়ু Hydrozen সঞ্চিত করেন। অধিকন্তু তিনি প্রভূত বলশালী ব্যাটারির সহযোগে বিবিধ মিশ্র পদার্থের বিশ্লেষণ সংসাধন করণে সক্ষম হয়েন। এবং প্রতি পরীক্ষা কালীন লক্ষ্য করেন যে, যে সমস্ত মিশ্র পদার্থে গন্ধক অথবা কোন ধাতু প্রাণবায়ু সহযোগে অবস্থিতি করে, সেই সমুদয় পদার্থের বিশ্লেষণ কালীন গন্ধক ও ধাতু ব্যাটারির বিয়োগিক প্রান্তে এবং প্রাণবায়ু তাহার যৌগিক প্রান্তে আসিয়া সংযুক্ত হয়। ইহাতে এবং ইত্যাকার অন্য কতিপয় পরীক্ষা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে তাড়িত কার্য্য এবং রাসায়নিক সংশক্তি একই বল।

ভলটীয় ব্যাটারির কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধীয় তত্ত্বানুসন্ধান কালীন সার হমফ্রে ডেভি নির্দ্ধারণ করেন যে ব্যাটারিস্থ ফলকের সংখ্যার উপর তাড়িত বলের ন্যূনাধিক নির্ভর করে, এবং ফলকের আয়তনের উপর তাড়িত সমষ্টির পরিমাণ নির্ভর করে। ইহা পরে চিল্‌ড্রেন্ সাহেব কর্ত্তৃক একটী পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। তিনি কেবলমাত্র এক জোড়া সুবৃহৎ দস্তা ও তাম্র ফলক সম্বলিত ব্যাটারি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা কতিপয় কঠিনতম ধাতুকেও অনায়াসে দ্রব করেন।

ইত্যাকার প্রচণ্ড বলশালী বিশ্লেষক যন্ত্র পাইয়া অনেকানেক রাসায়নিক মিশ্র পদার্থের বিশ্লেষণ দ্বারা আদিভূতের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ডাক্তার হেন্‌রি কতিপয় অম্লকে Acids বিশ্লিষ্ট করেন এবং এমোনিয়া হইতে প্রায় তাহার উপাদানীভূত পদার্থ নিচয় পৃথকীভূত করেন। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলসমূহ সাময়িক পত্রিকায় প্রচারিত হওয়াতে তাড়িত বল সহকারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান অধিকতর প্রচলিত হইল।

ভলটীয় ব্যাটারির আবিষ্কারের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্রই সার্ হম্‌ফ্রে ডেভি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে রাসায়নিক তত্ত্বানুসন্ধান সম্বন্ধে ঐ যন্ত্রটী মহোপকারী হইবে। তাঁহার স্মৃতিকার এক স্থানে লিখিত আছে যে "ভল্‌টা, নিক্‌ল্‌-

সন ও কারুন্ আইলের নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম, যেহেতু তাঁহাদিগের বহ্বায়াসে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য মহোপকারী বিশ্লেষক যন্ত্রের সাহায্য পাইয়াছি।" ইহার ছয় বৎসর পরে তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলেন যে, এই অভিনব বিশ্লেষক যন্ত্র সহযোগে সকল মিশ্র পদার্থের উপাদান পদার্থ সমূহ আবিষ্ক্রিয়া করিতে সক্ষম হইতে পারিব। যে রাসায়নিক সংশক্তি বা আকর্ষণ বলে উপাদান পদার্থের সংযোগে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে সেই সংশক্তি বা আকর্ষণের ইয়ত্তা থাকিবে। কিন্তু এই অভিনব ব্যাটারি যন্ত্রোদ্ভূত তাড়িত বলের সীমা নাই। ব্যাটারির বল বৃদ্ধির দ্বারা তাহাকে অসীম রূপে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। সুতরাং সেই প্রভূত বলের নিকট যে রাসায়নিক বল যতই অধিক হউক না কেন পরাভূত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া পটাস্ Potass লইয়া তাহার বিশ্লেষণোদ্দেশে কতিপয় পরীক্ষার প্রবর্তনা করিলেন। পূর্ব্বে ঐ পদার্থকে অমিশ্রক উপাদান পদার্থ বলিয়া জানা ছিল। পটাস্ তাড়িতের অপরিচালক, সুতরাং প্রথমতঃ তাহাতে তাড়িত কার্য্য প্রয়োগ করণে সমূহ দুরূহ দেখিলেন। তৎপরে তাহাকে দ্রব করিয়া তাড়িতবল প্রয়োগ করাতে তাহা হইতে ধাতব পদার্থ নিসৃত হইতে দেখিলেন। তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না, গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রকৃত নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে মনের স্থৈর্য্য পুনঃ সংস্থাপন করতঃ পরীক্ষা পুনরারম্ভ করেন।

যে ব্যাটারির প্রচণ্ড বল সহকারে সার্ হম্ফ্রে ডেভি উপরোক্ত মহতী বিশ্লেষণ সাধনে সক্ষম হয়েন, তাহা তিনটী বিভিন্ন বলশালী ব্যাটারি একত্রে সন্নিবেশিত থাকে। প্রথমটীতে চতুর্ব্বিংশতি যোড়া দ্বাদশ বর্গ ইঞ্চ বিস্তৃত তাম্র ও দস্তার ফলক থাকে। দ্বিতীয়ে একশত যোড়া ছয় বর্গ ইঞ্চ এবং তৃতীয়ে দেড় শত যোড়া চার বর্গ ইঞ্চ তাম্র দস্তার ফলক থাকে। ভলটীয় ব্যাটারির এই এক অদ্ভুত ধর্ম্ম দেখা যায় যে বহু সংখ্যক ফলক-রাশী জনিত তড়িতের পরিমাণ সমষ্টি সেই রাশীস্থ সর্ব্বন্যূনায়তন ফলকের উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ ব্যাটারি বিভিন্নায়তন যত সংখ্যক যোড়া ফলক দ্বারা নির্ম্মিত হউক না কেন, তন্মধ্যে সর্ব্বন্যূনায়তন বিশিষ্ট তত সংখ্যক যোড়া অন্য এক ব্যাটারির যে বল তাহারও সেই বল দাঁড়াইবে। সার্ হম্ফ্রে ডেভির উক্ত ব্যাটারিতে সর্ব্ব সুদ্ধ দুই শত চুয়াত্তর যোড়া বিভিন্নায়তনের ফলক ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বন্যূনায়তন যোড়া রাশীর পরিমাপ চতুঃবর্গইঞ্চ, সুতরাং চতুঃবর্গইঞ্চ পরিমিত দুইশত চুয়াত্তর যোড়া ফলক বিশিষ্ট ব্যাটারির বল তাঁহার সমস্ত ব্যাটারির বল সমষ্টির সহিত সমতুল্য দাঁড়াইয়াছিল। পরে রাজকীয় বিদ্যালয়ের সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ ডেভির

ব্যবহারের নিমিত্ত ছয়শত যোড়া ফলক বিশিষ্ট একটী ব্যাটারি প্রস্তুত করাইয়া দেন। তাহার পর চাঁদা দ্বারা দুই সহস্র যোড়া ফলক বিশিষ্ট একটী সুবৃহৎ ব্যাটারি তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

কথিত আছে যখন নেপোলিয়ান্ শুনেন যে জনৈক বিলাতি বিজ্ঞানবেত্তা কর্ত্তৃক ব্যাটারি যন্ত্র সহযোগে ক্ষারসমূহের বিশ্লেষণ সংসাধিত হইয়াছে তখন তিনি পারিস্ ইনস্টিটিউটের পণ্ডিতগণকে অতি ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেন যে ঐ আবিষ্ক্রিয়াটী ফ্রান্সদেশে সর্ব্বপ্রথম কেন না হইল। তদুত্তরে বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ট বলশালী ব্যাটারির অভাবই কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। তচ্ছ্রবণে সম্রাট ঐরূপ একটী ব্যাটারি প্রস্তুতকরণের আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ দিলেন। যন্ত্রটী সমাধা হইলে পর, তদ্দর্শনার্থে এক দিবস তিনি ইনস্টিটিউটের বাটীতে গমন করেন। এবং একরূপ আগ্রহাতিশয়ের সহিত ব্যাটারির প্রান্তস্থ তারদ্বয় ধারণ করত এককালীন জীহ্বাগ্রে স্থাপন করেন, যে উপস্থিত পরীক্ষক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে নিবারণ করিবার সময় পাইল না। তাহাতে তিনি একবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়েন। পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া তাহার অভ্যস্থ মৌনাবলম্বনের সহিত, ব্যাটারির বল পরীক্ষার্থে তথায় তথায় আর বিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাগত হয়েন। তৎপরে আর কখন তিনি এই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই।

ক্রমে অধিকতর বলশালী ব্যাটারির সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং বিবিধ মিশ্র পদার্থ ক্রমে বিশ্লিষ্টও হইল। যে সমস্ত সুদৃঢ় পদার্থ ইতিপূর্ব্বে অতি প্রচণ্ড অগ্নিতেজ দ্বারাও কোন রূপে দ্রবীভূত করা যায় নাই, তাহাদিগেরও দ্রবীকরণ ব্যাটারি সহযোগে সম্পাদিত হইল। এমন কি হীরক খণ্ডও ব্যাটারির অগ্নিশিখায় দাহিত হইল। এবং তাহাতেই হীরক ও কয়লা Carbon যে একই পদার্থ তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা গীতিকাব্য।

কবিকাহিনী। শ্রীদীনেশচরণ বসু প্রণীত।

কবিতামালা। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল্ বিরচিত।

বাঙ্গালায় অত্যুৎকৃষ্ট মল্‌মল্‌ জন্মে, কিন্তু শালের জন্ম অন্য দেশে। বাঙ্গালা ভাষায় গীতিকাব্য যেমন প্রচুর ও মধুর, মহাকাব্য তদ্রূপ নহে। আমরা বাঙ্গালা ভাষায় যে দুই তিন খানি মহাকাব্য দেখিয়াছি সে সমস্তই নামে মহাকাব্য, বস্তুতঃ সে সকল কাব্যে মহাকাব্যের কোনই লক্ষণ লক্ষিত হয় না। মহত্বই মহাকাব্যের প্রাণ। কিন্তু সে সকল কাব্যে মহতী দৃশ্য-কল্পনা, মহতী চরিত্র রচনা, সুগম্ভীর ভাবব্যঞ্জনা কৈ? মহত্ব দ্যোতক সে বীররস কৈ? একটী মাত্রও বীর চরিত্র কৈ? "মেঘনাদ বধ" নারী-প্রধান কাব্য, "বৃত্রাসুর বধ" ও নারী-প্রধান কাব্য। বীরত্বে মেঘনাদ অপেক্ষা প্রমীলা শ্রেষ্ঠ, বৃত্রাসুরের অপেক্ষা ঐন্দ্রিলার চরিত্র অধিকতর তেজস্কর। মেঘনাদ-বধে প্রমীলা ও সীতা, বৃত্রাসুর বধে ঐন্দ্রিলা ও ইন্দুবালা সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র। মেঘনাদ-বধে একটিমাত্র বীর-চরিত্র নাই, বৃত্রাসুর-বধেও একটিমাত্র বীর-চরিত্র নাই। উভয় কাব্যেই বীররসের একান্ত অসদ্ভাব। যে কাব্যে বীররস ও বীর-চরিত্রের অভাব, সে কাব্য মহাকাব্য নহে। মেঘনাদ-বধ আদ্যোপান্ত কবিত্ব-পূর্ণ হইলেও, কবিতা-রচনার আদর্শস্বরূপ হইলেও, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে অতুলনীয় হইলেও এবং বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য হইলেও মহাকাব্য নহে। মধুসূদন মহাকবি হইলেও মেঘনাদ-বধ মহাকাব্য নহে। পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়ার, কিন্তু পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহাকাব্য আমাদের দ্বৈপায়ন-প্রণীত "মহাভারত"। মহাভারতে ভারতীয় মহাকাব্যের শেষ হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আর্য্যবীরত্বের অবসান হইয়াছে, এবং দ্বাপরের সহিত আর্য্যজাতির গৌরব-রবি অস্তগমন করিয়াছে। এ কালিমাময় কলিকাল ভারতের কালরাত্রি; এখন সমস্ত আর্য্য সন্তান জড়বৎ নিষ্পন্দ। দুই এক জন কবি ভারতের পূর্ব্ব প্রভা স্বপ্ন দেখিয়া "উঠ, জাগ বীরগণ" বলিয়া এক এক বার চীৎকার করেন বটে, কিন্তু তখনই—

"রাই জাগ, রাই জাগ! শুক সারী বলে,
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে?
রজনী প্রভাত হইল বলিয়ে তোমারে,
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥"

অমনি আর্য্যকবির হৃদয়-কমলিনী

নিদ্রাভঙ্গের সুকোমল করুণস্বরে বলিয়া উঠেন—

"এখনও যামিনী আছে কোথা যাবে বল প্রাণ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হোক নিশি অবসান"।

ইহাতেই বঙ্গের কবি গলিয়া যান এবং বীররসের অবতারণা করিতে গিয়া, আদিরসের ছড়াছড়ি করিয়া বসেন। নিস্তেজ, ভীরু, বাঙ্গালী বাবু-পরিবৃত বাঙ্গালী কবির পক্ষে প্রকৃত বীরচরিত্রের কল্পনা বোধ হয় অসম্ভব, তাই বাঙ্গালা ভাষায় বীররসাত্মক মহাকাব্য নাই। গীতিকাব্যে বাঙ্গালী কবির অসাধারণ ক্ষমতা। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রাম প্রসাদ ও ভারতচন্দ্র এবং মধুসূদন ও হেমচন্দ্র যে কোন ভাষায় গান করিতেন, সেই ভাষাকেই অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন।

বাহ্য ও অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য, নবীনতা ও মহত্ব শশীকরে সাগরোচ্ছ্বাসবৎ কবিহৃদয়ে উদ্বেলিত হয় এবং সেই উদ্বেলিত হৃদয়-ভাব ব্যক্তিই গীতি। গীতিকাব্যে কবি কেবল নিজ চিত্তভাব চিত্রিত করেন। ইহাতে তাঁহার সৃষ্টি-কৌশল দেখাইবার অবকাশ নাই, ইহাতে চরিত্র চিত্রন জন্য তাঁহার অসামান্য কল্পনাশক্তি এবং বিশ্বব্যাপিনী সহানুভূতিরও প্রয়োজন নাই। সামান্য বিভাবনা, সহৃদয়তা ও বর্ণনা শক্তির সাহায্যে কবি অমৃতময় গীতিপরম্পরা রচনা করেন। প্রকৃত কবির চিত্ত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের আধার, গীতি সেই সুন্দর কবি হৃদয়ের ছবি, তাই গীতিকাব্য এত মধুর ও মনোহর। গীতিকাব্যে কবি নিজ মুখে, বা কোন কল্পিত অথবা সাধারণ পরিচিত পাত্র বিশেষের প্রমুখাৎ আপনার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাইরণই "চাইল্ড হেরল্ড" কাব্যের নায়ক, কালিদাসই মেঘদূতের যক্ষ এবং জয়দেবই গীতগোবিন্দের কৃষ্ণ। বাঙ্গালা ভাষায়, পারমার্থিক ও ঐহিক, লৌকিক ও নৈসর্গিক এই চতুর্ব্বিধ গীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

১ম পারমার্থিক গীতি। এই শ্রেণীর গীত সকল ভক্তি ও শান্তি রসাশ্রিত। দেবদেবীর বন্দনা, ঈশ্বরস্তোত্র ও ভজন; এবং বৈরাগ্য উত্তেজক ও আত্মার পারত্রিক গান এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। এই প্রকার গানে রামপ্রসাদ ও রামমোহনরায়ই সুপ্রসিদ্ধ। কবিবর রামপ্রসাদ সহজ কথায় এবং সামান্য উপমা দ্বারায় যে অসামান্য ভক্তিভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় প্রকৃত ভক্ত ও কবিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে অসাধ্য। রামপ্রসাদের পদাবলী ভক্তি-রসের উৎস স্বরূপ। আমরা সেই অপরিমেয় ভক্তিরসাশ্রিত দুই একটী গান পাঠককে শুনাইতেছি—

কাজ কি আমার কাশী?
ঘরে বসে পাব গয়া গঙ্গা বারাণসী।
কাশী মলে হয় মুক্তি
সে বটে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।

২য় গীত।

মা, আমায় ঘুরাবি কত ?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।
বেঁধে দিয়া ভবের গাছে,
পাক দিতেছ অবিরত।
একবার খলে দেমা চোখের ঠুলি,
হেরি ঐ তোর অভয় পদ॥

এই গীতদ্বয়ে, কবি, সামান্য কথায় হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তিভাব কেমন অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এ সকল গীতে লাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসীর গন্ধমাত্র নাই, কষ্ট কল্পনার চিহ্নও নাই। এ সকল গীতি কবির ভক্তি উৎসারিত অকৃত্রিম ভাবরাশি। যিনি প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ নিজ গ্রামের তরুরাজি-পরিবৃত, তৃণাচ্ছাদিত সামান্য কুটীরেরও শোভা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জানেন রামপ্রসাদী পদাবলী কি অমূল্য বস্তু। রামপসাদের রচনা বাঙ্গালা চালার ন্যায় সামান্য হইলেও বাঙ্গালীর চক্ষে তাজমহল অপেক্ষাও সুন্দর, যেহেতু তাহার বাঁশ খুঁটি, খড় দড়ি, সমস্তই বঙ্গদেশজাত, তাঁহাতে দেশ দেশান্তরের হর্ম্মোপযুক্ত উপকরণের প্রয়োজন হয় নাই। "দ্বিরদরদনির্ম্মিত হৈমময়" অলঙ্কার ভূষিত, মহাকোলাহলময়ী, বহুরূপা মহানগরী হইতে, প্রশান্ত, নিভৃত পল্লিগ্রামে যাইয়া বাঙ্গালার প্রকৃত সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা অবলোকনে মনোমধ্যে যে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় হয়, ইদানীন্তন কাব্যকলাপ পাঠান্তে রামপ্রসাদের পদাবলী শ্রবণ করিলে হৃদয়ে অবিকল তদ্রূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

২য় দৈহিক গীতি। এই শ্রেণীর গীতাবলী স্নেহ, বাৎসল্য, করুণা ও আদিরসাশ্রয়ে সংরচিত হয়। পূর্ব্বতন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী, রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন, নিধুবাবুর টপ্পা, রামবসু ও হরুঠাকরের কবিগান এবং ইদানীন্তন মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্ব্বতন কবিগণের গীতাবলী যদিও অধিকাংশই আদিরস ঘটিত এবং স্থানে স্থানে অমার্জনীয় অশ্লীলতা-দূষিত, তথাপি বেদনা, ভাবব্যঞ্জনা ও প্রাঞ্জলতায় অধুনাতন অধিকাংশ কবিতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে সকল গীতি ভাবময়, মধুময়, তেজোহীন চন্দ্রালোকতুল্য মনোহর। সেরূপ গীতি বাঙ্গালীর একায়ত্ত সম্পত্তি—সেরূপ কোমলতাময়, স্নেহময় গীতি বাঙ্গালীর কোমল প্রকৃতি হইতেই সম্ভবে, অন্যত্র অসম্ভব ও দুর্লভ। আমাদের কথার প্রমাণার্থ কয়েকটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম ?
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

চণ্ডীদাস।

জনম অবধি হম্ রূপ নিহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
কতই মধুর বোল শ্রবণহি শুনিনু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিনু
তবু হিয়া যুড়ান না গেল॥
বিদ্যাপতি।

দুঃখ দিলে বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখ সুখ জ্ঞান করি যতনে তায় তুষিব।
না থাকে তাঁহার মন,
করিবে না আলাপন,
তবু সে বিধুবদন দূরে থেকে দেখিব॥
নিধুবাবু।

ভালবাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমাবই আর জানিনে,
বিধুমুখে মধুর হাসি,
দেখিতে হে ভাল বাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে।
শ্রীধর।

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন-পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষে নিশি, গগণে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আয় আয় মা মা বলি ধরিয়া কর অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথারে?
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে কি হে সহিতে তা পারে?
আমি কহিলাম তায় চাঁদ কিরে ধরা যায়
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে বসে গিরিবর, করে বহুসমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে
সানন্দে কহিলা হাসি ধর মা এই লহ শশী
মুকুর লইয়া দিল করে
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহা সুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥
রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন।

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়া
তত্ত্ব না পেয়ে যার
তোমার সেই উমা এই এল, যাতনা ঘুচিল
সঙ্গে শিব পরিবার
এখন গঞ্জনা এড়ালে ওহে গিরিরাজ
সব দুঃখ দূরে গেল
আমার মা কৈ মা কৈ, বলে উমা ঐ
ব্যগ্রচ হয়ে দাঁড়াইল।
হোক হোক হোক উমা সুখে রোক
সদাই হোতেছে মনে
ভিখারীর ভাগ্যে পড়েছেন দুর্গে
তাঁর ভাগ্য হেন হবে কে জানে?
দুহিতার সুখ শুনিলে হে গিরি
যে সুখ হয় আমার
আছে কন্যা যার সেই সুধু জানে
অন্যে কি জানিবে তার
যদি কেহ বলে ওগো উমার মা
উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই অমনি ধেয়ে যাই
আনন্দে হয়ে বিভোর॥ রাম বসু।

বলুন, এরূপ স্নেহময় ভাবগম্ভীর গীতাবলী আর কোন্ ভাষায় শুনিয়াছেন? শ্রীধরের টপ্পা ও গোবিন্দদাসের পদাবলীতে কিঞ্চিৎ কবিত্ব ও লালিত্য থাকিলেও কুৎসিত ভাবদ্যোতক বলিয়া শিক্ষিত মাত্রেই তাঁহাদের রচনা সর্ব্বান্তকরণের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। কবিওয়ালাদের খেঁউড় গানের ত কথাই নাই, অমার্জ্জিত রুচি ইতর লোক ব্যতীত সে সকল গান এখন কেহই আর মুখে আনেন না। অশ্লীলতাময়, শৃঙ্গার-রস-প্লাবিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য যে ধর্ম্মভাববিবর্জ্জিত কদর্য্য সময়ের ফল, সেই কদর্য্য সময়েই ঐ সকল নারকী গীতি বাঙ্গালী সমাজে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিল। ভারতচন্দ্র সময় ও শিক্ষার দোষে স্বরচিত সুন্দর কাব্য কলঙ্কিত করিয়াছেন। মধুসূদন সময় ও শিক্ষার গুণে নিজ-প্রণীত কাব্য সুসভ্য শিক্ষিত সমাজেরও আদরণীয় করিতে পারিয়াছেন। কবিত্বে উভয়েই সমান; উভয়েই সমান লিপি-কুশল; বর্ণন নৈপুণ্যে, সৌন্দর্য্য-চিত্রনে এবং অলঙ্কার-প্রয়োগে উভয়ে সমান ক্ষমতাশীল।

সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দি ভাষায় সুপণ্ডিত ভারতচন্দ্র প্রাচ্য সাহিত্য হইতে ভাব আহরণ করিয়া নিজ কাব্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। লাটিন, গ্রীক ও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ মধুসূদন পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মেঘনাদ বধের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে ভক্তিরসের অবতারণা করিতে গিয়া বিদ্যাসুন্দরী অশ্লীলতা উপস্থিত করিয়াছেন। মধুসূদন মেঘনাদবধে বীরের চিত্র আঁকিতে গিয়া, নারীচিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন। গীতি-রচনায় ভারতচন্দ্র যেমন সুদক্ষ, মধুসূদনও সেইরূপ। ধর্ম্মগীতাবলী অন্নদামঙ্গল কাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বক্তৃতাংশ, ব্রজাঙ্গনা গীতি মধুসূদনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। ভারতচন্দ্রের রচনা গ্যাসালোকের ন্যায় জাঁকজমকসম্পন্ন, সমুজ্জ্বল ও ঈষত্তাপযুক্ত, কিন্তু দুর্গন্ধ ও কালিমোদ্পাদক। মধুসূদনের রচনা উ সব-পাঙ্গণোজ্জ্বল সুগন্ধি বর্ত্তিকালোকের ন্যায় শোভন ও আনন্দোৎপাদক।

৩য় লৌকিক গীতি। সামাজিক দোষোদ্ঘাষণ, মহাত্মাগণের গুণকীর্ত্তন উৎসব-গীতি ও বীরগান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্ররোচনা উদ্দীপনা এই সকল গীতের আত্মা। কবিবর হেমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রকার গীতের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উদিত হইয়া যে অমৃতময় মৃৎসঞ্জীবনী গীতাবলি বর্ষণ করিয়াছেন, তেমন গম্ভীর, তেমন তেজোময় স্বরলহরী কেহ কখনও শুনে নাই। বাঙ্গালায় সে গীত অভূতপূর্ব্ব, অননুভূতপূর্ব্ব। হেমচন্দ্র বাঙ্গালায় ধ্রুপদ আরোপ করিলেন—সমস্ত বাঙ্গালা স্তম্ভীত ও চমৎকৃত হইল—কিয়ৎকালের জন্য বাঙ্গালীর মৃতদেহে শোণিত সঞ্চার হইল—কিয়ৎকালের জন্য বাঙ্গালীর শীতল হৃদয়ও উষ্ণ হইয়া উঠিল। গাও হেমচন্দ্র গাও

সুগম্ভীর মৃদঙ্গ তালে জলদ নির্ঘোষে ধ্রুপদ গান কর—তোমার গান সূর্য্যালোক সম প্রচণ্ড অথচ স্বাস্থ্যকর ও মহা-ফলোৎপাদক।

ইদানীন্তন অধিকাংশ খণ্ডকাব্যে এই শ্রেণীর গীতি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবের শীর্ষোল্লিখিত কবিকাহিনী-প্রণেতা দীনেশচরণ বসু এই প্রকার গীতি-রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাঁর কল্পনা, বর্ণনা, ভাবব্যঞ্জনা ও বেদনা প্রায় হেম বাবুর সমতুল্য। ইহার রচনায় একপ্রকার চমৎকার মাদকতা ও মধুরতা আছে। কবিকাহিনীর অন্তর্গত প্রায় সমস্ত গীতই মনোমুগ্ধকর। বিশেষতঃ এই—

আইলা ভারতী সঙ্গে লয়ে স্মৃতি
তাই হেম জ্যোতি ছুটিছে;
বীণাপাণি বীণা বাজান আপনি
তাই সুধা ধ্বনি উঠিছে!
বৎসরেক পরে ভারত ভিতরে
শ্রীপঞ্চমী ফিরে আইল,
বৎসরেক পরে কবির অন্তরে
ভক্তি কোকনদ ফুটিল!

শাখা।

আজ কি ভারতে আনন্দ অপার!
কমলবাসিনী দিলেন দেখা;
আঁধার জীবনে এ সুখ যামিনী—
একটি উজ্জ্বল কণক রেখা!

চিতেন।

আজি কি ভারতে আনন্দ অপার,
ভারতীয় বীণা বাজিল আবার।
বহুদিন পরে সুধার ঝঙ্কার
আবার দিগন্ত পূরিল রে!

ভরিয়া অঞ্জলি লহ শতদল
লহ স্নিগ্ধমুখী গোলাব বিমল,
আরণ্য যূথিকা—চামেলী সকল
তুলি রাখ রাঙ্গা চরণে রে!

সুরভি কুসুমে মনোহর হার
সুচিকণ করি গাঁথরে আবার
দোলাও সে হার গলে সারদার,
তারা যথা নীল আকাশে রে!

বাজাও সেতার ভ্রমর গুঞ্জনে,
বাজাও বাঁশরী পিক-কুহরণে,
বাজাও বেহালা, উঠাও গগনে
ধীরে ধীরে স্বর-লহরী রে!

আর এইটি—

গিরিরাজ আর সে দিন কি আছে!
স্বর্ণ আর্য্য ভূমি শ্মশান হয়েছে
কাল-স্রোতে ভাসি সকলি গিয়াছে
ভারত কঙ্কাল হয়েছে সার!
সাঙ্গ অযোধ্যায় অভিনব সব,
নির্ম্মল-সলিলা সরযূ নীরব
অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত কৌরব
শূন্য হস্তিনায় শুধু আঁধার!

আর যমুনার সে তরঙ্গ নাই
তমালের তলে নাচে না কানাই
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি ধরাসনে রাই
বিরহ-বিধুরা নাহি লুটায়
কুঞ্জে কুঞ্জে আর বাঁশরী বাজে না,
কুঞ্জে কুঞ্জে আর ময়ূরী নাচে না,

বৃন্দাবনে আর গোপাল খেলে না,
মাঠে ধেনুপাল চরে না হায়।
ইত্যাদি।

এবং এগীতটিও আমাদের অত্যন্ত হৃদ্য বোধ হইল—

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
যে অনল দগ্ধ করে,
তুই কি দেখিবি তার? অন্য কেহ দেখেনা
যে জন অন্তরযামী
তিনি আর জানি আমি,
এ বহ্নির শতশিখা কে করিবে গণনা?
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা?
ইত্যাদি।

৪র্থ নৈসর্গিক গীতি। সাধারণ লোকের চক্ষে বাহ্য প্রকৃতি যেরূপ প্রতীয়মান হয়, কবির চক্ষে সে রূপ নহে। কবি বিভাবনা-বলে সামান্য শৈবালে পরম রমণীয় উপবনের শোভা অনুভব করেন, সামান্য মৃত্তিকাস্তূপে অভ্রভেদী হিমাচলের গম্ভীর শোভা উপলব্ধি করেন এবং স্বর্গ হইতে মর্ত্য পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিদর্শন করিতে পারেন। কবি, স্বভাবকে যে ভাবে অবলোকন করেন, স্বভাবের তদনুরূপ চিত্র শব্দ সংযোগে চিত্রিত করিয়া থাকেন। সে চিত্র যে অতীব চমৎকার তাহা বলা বাহুল্য। এই প্রকার স্বভাব-চিত্র বা স্বভাব-বর্ণনা প্রায় সকল কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন কবি প্রকৃতিকে প্রেমিকের বা ভক্তের চক্ষে অবলোকন করিয়া তাহার গুণগান বা মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই প্রকার প্রকৃতিগত প্রেম বা ভক্তিভাব ব্যক্তিই নৈসর্গিক গীতি। বাঙ্গালা ভাষায় কেবল শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত আমাদের এই প্রস্তাবের শীর্ষোল্লিখিত কবিতামালা গ্রন্থে এই প্রকার কয়েকটি গীত দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকৃষ্ণ বাবু সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত, তাঁহার প্রায় সমস্ত গীতই গাম্ভীর্য্য, ওজস্বিতা ও সাধুভাবে অনুরঞ্জিত। তাঁহার যে যথেষ্ট কবিত্ব আছে এ কথা বলাই বাহুল্য। আমরা তাঁহার প্রণীত "সূর্য্য" শীর্ষক গীতি হইতে কিয়দংশ পাঠকের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

"দেব দিবাকর, অন্ধকার হর,
সৌন্দর্য্যের উৎস, তেজের আকর,
কেন না তোমারে নানা দেশে নর
পূজিবে অটল ভকতি ভাবে?
তুমি দেখা দিলে উদয় অচলে,
রূপের প্রবাহ চারিদিকে চলে,
সঙ্গীত তরঙ্গ চৌদিকে উথলে;
ভূতলে নন্দন কে নাহি ভাবে?
আঁধার গ্রাসিলে অবনীমণ্ডল,
বোধ হয় সব গেল রসাতল,
মরণ সমান নীরব সকল,
আইলে যেমতি প্রলয় কাল;
তুমি দিনকর দিয়া যেন দৃষ্টি
কর অকস্মাৎ অমৃতের বৃষ্টি,
অমনি নূতন হয় যেন সৃষ্টি,

পুন প্রাণ পায় মৃত কঙ্কাল।

* * * *

ভাসিয়া অনাদি কালের তরঙ্গে
বিপুল জগৎ ছায়াসম সঙ্গে,
কোথা দেব তুমি চলিতেছ রঙ্গে,
কি কাজ সাধিতে অনন্ত আকাশে?
অগ্রগামী তব প্রতাপ ধাইছে,
তব কৃপাভায় গগণ ছাইছে,
তোমার প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিছে
দূরে পলাইছে তমঃ তরাসে।
প্রথমে যেমন করিলে সৃজন
কালে কালে সব করি আকর্ষণ
পুনর্বার নাকি করিবে গ্রহণ,
হবে এজগৎ তোমাতে লয়?
আদি কালে তুমি আছিলে যেমন,
পুনর্বার তুমি রহিবে তেমন,
একা অদ্বিতীয় নিখিল কারণ
নূতন-সৃজন- শকতিময়?"

ইত্যাদি।

শ্রীলক্ষ্মী।

ওয়াসিংটন্।

টিউডর রাজবংশের খরতর শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া কতিপয় ব্রিটনবাসী জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অাটলাণ্টিক বক্ষে পোত ভাসাইয়া আমেরিকার উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হন। এই ক্ষুদ্র উপনিবেশ শতাধিক ব্রিটন পিতার আবাসহইতে ক্রমে একটী বিশাল রাজ্যে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই উপনিবেশ মাতৃভূমির শাসনাধীন হয়। ১৫৭৮ হইতে ১৭০৮ পর্য্যন্ত রাজ্ঞী এলিজেবেথ্, প্রথম জেম্স, প্রথম চার্লস, লঙ্ পার্লিয়ামেণ্ট, ক্রমওয়েল্, দ্বিতীয় চার্লস, দ্বিতীয় জেম্স তৃতীয় উইলিয়ম, রাজ্ঞী আন্ এই কয় জনের রাজত্ব কালে—ভার্জিনীয়া, ম্যাসচুসেট্স, মেরীল্যাণ্ড, কারোলিনা এবং নিউইয়ার্কের ঔপনিবেশিকগণের স্বত্বপত্র লইয়া নানা প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হয়। যদিও সেই সুদীর্ঘ সময়ে আমেরিকাবাসিগণের স্বত্বনিচয় কখন স্বীকৃত, কখন বিতর্কিত, কখন সঙ্কুচিত, কখন পরিবর্দ্ধিত, কখন বিনষ্ট ও কখন পুনরুজ্জীবিত হয়, তথাপি এই ওতপ্রোত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ঔপনিবেশিকগণের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতাবীজ ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতেছিল; তাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়প্রত্যয় ছিল যে স্বত্বপত্র বিনষ্ট করা ইংলণ্ডেশ্বরের করায়ত্ত বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্বের বিলোপ সাধন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।

লোকসংখ্যা, ঐশ্বর্য্য, ও সামাজিক

উপকরণ-সামগ্রীর বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এবং পরিপুষ্ট রাজনীতি ও বিজ্ঞানবলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে লোকের মন জগতের বিজয়সাধনে সমুদ্যত হইল। এই বিজয় ব্যাপারে আমেরিকা অল্প অংশ গ্রহণ করেন নাই।

আমেরিকার এইরূপ উন্নতিপ্রবণ অবস্থা—এমন সময় ইংলণ্ড বলদর্পে অন্ধ হইয়া আমেরিকাবাসিদিগের প্রাকৃতিক স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিলেন। "প্রজাদিগের সম্মতি ব্যতীত প্রজাদিগের উপর কর ধার্য্য করায় রাজার কোন অধিকার নাই" ব্রিটনের রাজনীতির এই মূল সূত্র ব্রিটনবাসিগণ আমেরিকায় যাইয়াও পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জনেও এই স্বত্ব রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এই সময় তিনটী প্রভুশক্তি কর্ত্তৃক ব্রিটিশ আমেরিকার অদৃষ্টচক্র পরিভ্রামিত হইত—ইংলণ্ডেশ্বর বা তদীয় প্রতিনিধি, ব্রিটিশ পালির্য়ামেণ্ট, এবং আমেরিকাবাসিগণ বা তাঁহাদিগের প্রতিনিধি সভা। এই তিন প্রভুশক্তির পরস্পরের মধ্যে সতত ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। পরস্পরের জয়পরাজয়ে পরস্পরের স্বপক্ষে বিপক্ষে বলিবার অনেক সুবিধা হইত। সুতরাং যে প্রভুশক্তি যখন যথেচ্ছাচারিণী হইয়া অপরের প্রাকৃতিক স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিত, সে—ই তখন আপনার যথেচ্ছাচারের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি ও পূর্ব্ব নিদর্শন পাইতে পারিত।

এই তিন প্রভুশক্তির পরস্পর সম্প্রীতি না থাকায় পরস্পরের দৌর্ব্বল্যে পরস্পর সুবিধা লইতে চেষ্টা করিত। এই জন্যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রথম চার্লসের মস্তকের সহিত যখন ইংলণ্ডের রাজাতন্ত্র ভূপতিত হয়, তখন ম্যাসাচুসেট্‌স প্রভৃতি কয়টী ষ্টেট্‌স ইংলণ্ডের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু লঙ্ পার্লিয়ামেণ্টের অসুদ্ধত রাজনীতিতে ও ক্রমওয়েলের সুদৃঢ় শাসনে সে স্বাধীনতাপ্রবৃত্তি সঙ্কুচিত ও দমিত হইয়াছিল।

ষ্টেট্‌স সকলের অন্তর্দৌর্ব্বল্য তখন এত অধিক ছিল যে ক্রমওয়েল্‌কে এই শাসন করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। সে সময় ভার্জ্জিনীয়ার লোকসংখ্যা ৩। ৪ সহস্র মাত্র ও মেরীলাণ্ডের লোকসংখ্যা দ্বাদশ সহস্রের অনধিক ছিল, এবং অধিবাসীদিগের অধিকাংশই শারীরিক বল ও নৈতিক একতায় নিতান্ত হীন ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে শাসনে রাখিতে ক্রমওয়েলের বিশেষ কষ্ট করিতে হয় নাই।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর ইংলণ্ডীয় শাসনপ্রণালী যখন সুদৃঢ় স্বাধীন রাজনৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়, তখন ইংলণ্ডের উপনিবেশ সকলের অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেম্‌সের সময়

আমেরিকার যে স্বত্বপত্র বিনষ্ট বা নিরাকৃত হয়, তাহা এক্ষণে আংশিকমাত্র প্রদত্ত হয়। প্রভুশক্তিদ্বয়ের মধ্যে সেই সংঘর্ষ, সেই বিতণ্ডা আবির্ভূত হয়। ইংলণ্ড হইতে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ একে একে বহু গবর্ণর আসিতে লাগিলেন, তাঁহারা রাজস্বত্বের সমর্থনে বা আপনাদিগের দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনেই বিশেষ ব্যস্ত থাকিতেন, সুতরাং প্রজাদিগের হিতসাধনে তাঁহারা বড় সময় পাইতেন না।

হতভাগা আমেরিকাবাসিগণ শুদ্ধ ইংলণ্ডেশ্বর বা তদীয় প্রতিনিধির পূজা করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন না, ইংলণ্ডের প্রতিনিধি-সভার সন্তোষ বিধানে তাঁহাদিগের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইত। এক প্রভুর মনস্তুষ্টি বিধান কত দূর কষ্টকর ও দুরূহ ব্যাপার যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন সহস্র প্রভুর অনুবর্ত্তন কতদূর সুখকর ও সুসাধ্য। সকলেই রাজা, সকলেই প্রভু—হুকুম চালাইবার সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু প্রজাদিগের শুভাশুভের দায়িত্বের ভার কাহারও মস্তকে অর্পিত নাই।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও আমেরিকার সৌভাগ্যলক্ষ্মী ক্রমেই পুষ্ট-কলেবর হইতে লাগিলেন। যে আমেরিকা একদিন কুটীরবাসী চীরধর ফলমূলাহারী কতিপয় পিউরিটান্ পিতার আবাসভূমি ছিল, সেই আমেরিকা ক্রমেই ধন জনে পরিপূরিত, আভ্যন্তরীণ বলে বলীয়ান্, এবং বহিশ্চর রাষ্ট্র সকলের স্তোত্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; সেই আমেরিকার কৃষি বাণিজ্য ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপ ক্রমেই জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল।

বাহ্য উন্নতির সহিত আভ্যন্তরীণ উন্নতির স্রোতও প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। ক্ষেত্রের কৃষক ও বাণিজ্যাগারের বণিক্ পর্য্যন্ত এই আভ্যন্তরীণ নৈতিক বল উপলব্ধি করিতে লাগিল।

এই নৈতিক বলে বলীয়ান্ হইয়া ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেট্স ব্যবস্থাপক সমাজ "ম্যাগ্না চার্টার" অনুকরণে এই মর্ম্মে একটী বিধি ব্যবস্থাপিত করেন যে "গবর্ণর, মন্ত্রিসভা, এবং জাতীয় প্রতিনিধি-সভার সমবেত সম্মতি ব্যতীত কোনপ্রকার কর, মাশুল, টোল প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হইবে না"। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেটসের অনুকরণে নিউ ইয়র্কের ব্যবস্থাপক সমাজ ও এই মর্ম্মে একটী বিধি ব্যবস্থাপিত করেন যে "সমবেত জাতীয় সভা, মন্ত্রিসভা ও গবর্ণরের ঐকতানিক সম্মতি ব্যতীত যে কোন প্রকার করস্থাপনা প্রজাসাধারণের প্রাকৃতিক স্বত্বের উপর হস্তাক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইবে"।

ব্রিটনীয় রাজলক্ষ্মী মৌনভাবে এই সকল বিধির অনুমোদন করিলেন; সুতরাং আমেরিকার প্রজাগণ তাঁহাদিগের এই প্রাকৃতিক স্বত্বকে এখন হইতে রাজনৈতিক স্বত্ব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই স্বত্বের প্রবল ভাব আ-

মেরিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেরই মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল।

সুতরাং যখন তৃতীয় জর্জ্জ পার্লিয়ামেন্টের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া ঘোষণা করিলেন যে "উপনিবেশ সকলের প্রজাবৃন্দের উপর তাহাদিগের সম্মতি না লইয়াও কর স্থাপন করিতে ইংলণ্ডেশ্বরের সম্পূর্ণ অধিকার আছে," তখন জাতীয় প্রতিনিধি স্বরূপ অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও বলশালী আমেরিক স্বদেশের গৌরব ও প্রাকৃতিক স্বত্ব সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইলেন। বাস্তবিক ইহাঁরাও স্বদেশের গৌরব ও জাতীয় প্রাকৃতিক স্বত্বের জন্যই নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়াছিলেন, জাতীয় অর্থহানির চিন্তা তাঁহাদিগের মনে বিন্দুমাত্রও প্রবল হয় নাই। কারণ যে কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহা অতি সামান্য—চার উপর প্রতি পাউণ্ডে তিন পেন্স করিয়া মাত্র।

এই বৈপ্লবিক শঙ্কট সময়ে যে মহাপুরুষ জাতীয় দলের অধিনায়ক হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরের যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় চরিত জগন্মান্য ওয়াসিংটনের জীবনী বিষয়ে গুটিকত ঘটনা আমরা এইস্থলে সংক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই শঙ্কট সময়ে ওয়াসিংটন বীরোচিত সাহস ভরে বলিয়া উঠিলেন "আমরা কি চার উপর প্রতি পাউণ্ডে তিন পেন্স করিয়া কর দিতে কাতর হইতেছি। এই সামান্য করকে আমরা কি গুরুতর ভার বলিয়া মনে করিতেছি? কখনই নহে—আমাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব ও জাতীয় গৌরব রক্ষাই আমাদিগের এই প্রতিবাদের একমাত্র লক্ষ্য"। ওয়াসিংটনের এই বাক্য সমস্ত আমেরিকায় প্রতিধ্বনিত হইল; সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী এক সুরে বাজিয়া উঠিল।

সেই সময় আমেরিকার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সমিতি সমবেত হইতে লাগিল। সাধারণ বা প্রাদেশিক সমিতি সকলে অসংখ্য লোক এক উদ্দেশ্যে মিলিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ মাতৃভূমির সহিত ভাবী বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় ভীত ও ব্যাকুলিতচিত্ত, আবার অনেকে আমেরিকার অবশ্যম্ভাবি—সৌভাগ্য লক্ষ্মীর সমাগম-সম্ভাবনায় আনন্দে নর্ত্তনশীল কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক, আমেরিকার জাতীয় গৌরব রক্ষাই সকলের এক মাত্র লক্ষ্য; তাহাতে জন্মভূমির সহিত বিচ্ছেদ হয়, অধিক কি প্রাণ যায়, তাহাতেও তাঁহারা প্রস্তুত।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ফিলাডেল্‌ফিয়ায় প্রথম কঙ্‌গ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই কঙ্‌গ্রেসের নির্দ্দিষ্ট কমিটির উপর মাতৃভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট প্রেরণের জন্য একখানি আবেদনপত্র লিখিবার ভার অর্পিত হয়। সেই আবেদন-পত্রে ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতি যথোচিত ভক্তি, ও মাতৃভূমির সহিত বিচ্ছেদের অনিচ্ছা সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হয়।

প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার এই বিবাদ চলিয়াছিল, তথাপি জাতীয় দলের কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি রাজতান্ত্রিক কি লোকতান্ত্রিক সকলেই একবাক্যে ধীর অথচ সুদৃঢ় পাদবিক্ষেপে এই বৈপ্লবিক পথে অগ্রসর হইতে ছিলেন একবারও অধীরতা দেখান নাই। প্রাচীন শাসন-সৌধ ভাঙ্গিয়া নূতন শাসন-সৌধ গড়িতে আমেরিকাবাসী জনসাধারণের প্রবৃত্তি ও সাহস ছিল না। অতি দূরদর্শী ব্যক্তিও বিপ্লবের ভাবী পরিণাম কি হইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই. অতি সাহসিক ব্যক্তিরও হৃদয় বিপ্লবের ভাবী অনিষ্টোপাতের আশঙ্কায় কম্পিত হইয়াছিল। প্রকৃত আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য আমেরিকার অধিবাসি সাধারণ তৎকালে বিন্দুমাত্রও প্রস্তুত ছিলেন না। ওয়সিংটন, জেফারসন, প্রভৃতি দুই এক জন মনীষীই কেবল অলৌকিক প্রতিভাবলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে মাতৃভূমির সহিত আমেরিকার পুনর্ম্মিলন অসম্ভব এবং মাতৃভূমির সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও আমেরিকার অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। তথাপি তাঁহারা পুনর্ম্মিলনের জন্য চেষ্টার বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা স্থাপনার এক বৎসর পূর্ব্বে ওয়াসিংটন্ ব্রিটিস্ সেনাপতি তদীয় বন্ধু মেকেঞ্জিকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন:—

"তোমাদিগকে এইরূপ বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে ম্যাসাচুসেট্‌সের অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বন্ধুবর! তুমি যদি আমায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমি বলিব যে তোমরা সম্পূর্ণ প্রতারিত হইয়াছ। আমি এত বিশ্বাস ও সাহসের সহিত একথা বলিতেছি তাহার কারণ এই যে, আমি ম্যাসাচুসেট্‌সের অধিনেতৃবৃন্দের ও অধিবাসিগণের হৃদয় জানি, ও তাঁহাদিগের কার্য্যের লক্ষ্য কি তাহাও সবিশেষ অবগত আছি। এই সকল জানিয়া আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে ইংলণ্ডের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়া আমেরিকার কোন ষ্টেটসের ইচ্ছাও নহে এবং স্বার্থও নহে। যাহারা এই কথা বলিয়া তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, তাহারা আপনাদিগের কার্য্যের দুর্ব্বলতা জানিয়া জগতের নিকট আপনাদিগের দোষক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। কিন্তু যদিও আমেরিকার ষ্টেট্‌স সকল সমবেত বা বিচ্ছিন্ন ভাবে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপিত করিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নহে, তথাপি তাহারা সহজে সে সকল অমূল্য স্বত্ব ও অধিকার পরিত্যাগ করিবে না, যাহা প্রত্যেক স্বাধীন রাজ্যের সুখের অপরিহার্য্য উপকরণ, এবং যাহার অভাবে জীবন স্বাধীনতা ও সম্পত্তি সকলই অনিশ্চিত।

জেফারসনও ২৯এ নবেম্বর ভার্জিনীয়ার অভ্যুত্থানের অনতি পরেই র‍্যান্ডলফকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন:—

"মহাশয়! আমার কথায় বিশ্বাস করুন যে আমেরিকায় এমন এক প্রাণীও নাই যিনি ইংলণ্ডের সহিত পুনর্ম্মিলন আমার মত অন্তরের সহিত প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট যে নিয়মে সেই পুনর্ম্মিলনে সম্মত, তাহাতে স্বীকৃত হওয়ার পূর্ব্বে আমি এ দেহে কখন প্রাণ রাখিব না। ইহা কেবল আমার নিজের মত নহে, আমি সমস্ত আমেরিকার সমবেত অভিমত ব্যক্ত করিলাম। ইত্যাদি"

আমেরিকাবাসীদিগের হৃদয়ের এইরূপ ভাব জানিয়াও তৃতীয় জর্জ্জ স্বকীয় মন্ত্রিসভা ও পার্লিয়ামেণ্টকে আমেরিকার বিরুদ্ধে বিবাদে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। আবেদনের উপর আবেদনসকল ভক্তিভাবে ইংলণ্ডেশ্বরের চরণতলে অর্পিত হইতে লাগিল, ধর্ম্মালয় সকল ইংলণ্ডেশ্বরের নামে ও তদীয় মঙ্গলোদ্দেশে উপাসনা সকল হইতে লাগিল, তথাপি তাঁহার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল না। তদীয় সেনা তাঁহার আদেশে আমেরিকাবাসিদিগের বিরুদ্ধে অন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হইল।

আত্মরক্ষায় অস্ত্রধারণ যেমন ব্যক্তিগত অধিকার, তেমনই জাতীয় অধিকার। যখন কোন গবর্ণমেণ্ট যথেচ্ছাচারী হইয়া প্রজাদিগের ধন, প্রাণ, মানের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হন, যখন অভ্যুত্থান ব্যতীত অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার আর উপায়ান্তর থাকে না, তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে প্রজাদিগের অধিকার আছে। অধিকার কেন? অত্যাচার অসহ্য হইলে এরূপ জাতীয় অভ্যুত্থান অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। কোন মানবী শক্তি দ্বারা এই অভ্যুত্থানের স্রোত নিবারিত হইবার নহে। যে শক্তি সেই অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হইতে সাহস করিবে, তাহার সমাধি সেই স্রোতের অভ্যন্তরেই।

এই অভ্যুত্থানে আমেরিকার স্বাপক্ষে শুদ্ধ যে জাতীয় অধিকার ছিল এরূপ নহে, আমেরিকার বিজয়লাভের সম্ভাবনাও ছিল। লর্ড নর্থ-অধিষ্ঠিত মন্ত্রি সভা সাহসে ও বিদ্যা বুদ্ধিতে অতি হীন ছিল। তৎকালে লর্ড চ্যাটমই ইংলণ্ডের একমাত্র প্রতিভাশালী ও তেজস্বী লোক; তিনি আমেরিকার অনুকূল ছিলেন। সুতরাং আমেরিকার আশা করিবার অধিকার ছিল।

ভীষণ অত্যাচারের যুগ অতীত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইংলণ্ড এইরূপ স্বাধীনতা-সমরে যেরূপ অতিমানুষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার সেরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিবার সম্ভাবনা ছিল না। ইংলণ্ড আমেরিকার প্রতি সেরূপ নির্যাতন করিলে ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সকল উদাসীনভাবে তাহা দেখিতে পারিতেন না। সময়ের পরিবর্ত্তন এরূপ, যে ইংলণ্ডে আমেরিকার প্রবল শত্রুদিগের মনেও সেরূপ নির্যাতনের ভাব একবারও উদিত হয় নাই। আবার অন্য দিকে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে ব্রিটনের

বাগ্মিক-শ্রেষ্ঠ আমেরিকার অনুকূলে তদীয় বজ্রনিনাদ উদ্ঘোষিত করিতে লাগিলেন। ধন্য প্রতিনিধি-শাসন প্রণালী! তোমার অনির্ব্বচনীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত রাজ্যে অতি নিঃসহায় প্রজারও অনুকূলে দুকথা বলিবার জন্য লোকের অপ্রতুল হয় না।

ইউরোপও বহুদিন উদাসীনভাবে এই প্রকাণ্ড সংঘর্ষ দেখিতে পারিলেন না। ইউরোপের দুই প্রবল প্রভুশক্তি ফ্রান্স এবং স্পেন—ইংলণ্ডের হস্তে আমেরিকায় বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন; সুতরাং প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থসাধনের এই উপযুক্ত সময় তাঁহারা বৃথা যাইতে দিলেন না। নবাভ্যুদিত দুই প্রভুশক্তি—রুশিয়া ও প্রুশিয়া—স্বাধীন রাজনীতির পক্ষসমর্থন করিয়া স্বাধীন রাজনীতির শৈশবদোলা ব্রিটনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে ও ত্রুটি করিলেন না। ধনে মানে পূজিত প্রাচীন সাধারণতন্ত্র হলণ্ড—যদিও এখন ইহার সে প্রতাপ ও সে গৌরব নাই তথাপি—অস্তগমনকালে একবার পূর্ব্ব-প্রতিদ্বন্দ্বীর ধ্বংশসাধনে অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা আমেরিকার সাহায্য করিতে ত্রুটি করিলেন না এবং ইংলণ্ডের রণতরি সকল যে সকল সামুদ্রিক রাজ্যের গৌরব হরণ করিয়াছিল—নেপলস, টসকানী, জেনোয়া প্রভৃতি সেই ক্ষুদ্র রাজ্যসকলও আমেরিকার অভ্যুত্থানে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন না।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী সকলদিকেই আমেরিকার অনুকূল হইলেন। যে কার্য্যে আমেরিকা প্রবৃত্ত, তাহার মূলে ন্যায় পতাকা; যে সেনাদল লইয়া ইহা স্বাধীনতাসমরে অবতীর্ণ, তাহার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধমান; এদিকে তাহাদিগের অভিপ্রায়ের মূলে নীতি ও একতা, একপ্রকার রীতি নীতি একপ্রকার বিধিপ্রণালী, একই লক্ষ্য একই ঘটনা—সমস্ত আমেরিকাকে যেন একটী ব্যক্তি করিয়া তুলিয়াছিল। গাঢ় মিলন, বহিশ্চর রাষ্ট্রসকলের সহানুভূতি, এবং মাতৃভূমির বাগ্মিকশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক স্বপক্ষসমর্থন—এত অনুকূল ঘটনার সমবায় আর কোন বৈপ্লবিক যুগে ঘটে নাই——কৃতকার্য্যতার এত সম্ভাবনার সহিতও আর কোন জাতি এরূপ বৈপ্লবিক সমরে প্রবৃত্ত হয় নাই।

তথাপি আমেরিকাকে কত বিঘ্ন, কত বিপৎ পরম্পরা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল! কত অমঙ্গলের বিনিময়ে আমেরিকাকে স্বাধীনতা সুখ ক্রয় করিতে হইয়াছিল! কতবার আমেরিকার সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইয়াই আবার অস্তমিতপ্রায় হইয়াছিল!

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞান ও ঈশ্বর।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে কতিপয় মহামান্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং অপর কতকগুলি সমপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সুধীশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে কোপার্নিকস, গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন, বয়েল, পাস্কেল, ড্যাল্টন প্রভৃতি মহাজনগণ গণনীয়; এবং লাপ্লাস, লাগ্রেঞ্জ, ইউলার, ক্লেরল্ট, ড্যালাম্বার্ট প্রভৃতি বিখ্যাতনামা পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় দলভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ জনগণ অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তনকালীন হওয়াতে এক্ষণে বিজ্ঞানের প্রতি এই অপযশ আসিয়াছে, যে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত নাস্তিকতার প্রচার হইতেছে। মানব যত প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন, ততই বুঝিতেছেন যে, প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের প্রমাণ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রকৃতির কার্য্য ও কৌশল দেখিয়া লোকে কোথায় বিশ্বপতির যশোঘোষণা করিবে, না তাহার ঠিক বিপরীত করিতেছে। অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ আদৌ ঈশ্বর স্বীকার করিতে চান না। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও গুণগৌরব প্রচার করা ত দূরের কথা। নাস্তিকতার এইরূপ বৃদ্ধি ও প্রচার দেখিয়া ঈশ্বরপরায়ণ পরম ভক্তিশীল পুণ্যবান্ জনগণ নিতান্ত কাতর ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এমত কি, বিজ্ঞানের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে। তাঁহারা লোককে বিজ্ঞানালোচনা হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতেছে, একই বিজ্ঞানবৃক্ষে এই দ্বিবিধ ফল ফলে কেন? একই বিজ্ঞানপথ অনুসরণে কেহ বা নাস্তিকতায় কেহ বা আস্তিকতায় উপনীত হয়েন কেন? একই প্রকৃতির জটিলব্যাপার মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পান, কেহ কেহ বা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন কেন? তত্ত্ববিৎ ডাক্তার হুইয়েল এই সমস্যার যেরূপ রহস্যোদ্ভেদ করেন তাহাই প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য *।

তিনি কহেন, এই সমস্যার নিরাকরণ করিতে হইলে, বিজ্ঞানবিৎগণের মানসিক প্রকৃতি ও অভ্যাসের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইদানীন্তন বিজ্ঞানপথে

* Astromy and General Physics, considered with reference to Natural Theology. by W. Whewell. D. D. Book. III. chaps. V and VI.

সত্যসন্ধান করিবার উভয়বিধ প্রণালী প্রচলিত আছে। এক প্রণালীক্রমে বহুদৃষ্টান্ত হইতে একটী সাধারণ সত্য ও নিয়ম অনুমিত হয়, অন্য সরণি অবলম্বন করিয়া আবিষ্কৃত অথবা স্বতঃসিদ্ধ সাধারণ সত্য এবং নিয়ম হইতে অপর সিদ্ধান্তে আসিতে পারা যায়। প্রথমোক্ত ন্যায়ক্রমে স্যার আইসাক নিউটন পার্থিব সকল পদার্থের আকর্ষণ শক্তি অনুমান করেন। আমরা সকল ব্যক্তিকে মরিতে দেখিয়া অনুমান করি, মনুষ্যমাত্রেই মরণশীল। অন্যবিধ ন্যায় প্রণালী ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সুন্দর প্রদর্শিত আছে। তাহাতে কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ হইতে দ্বাদশ অধ্যায় প্রতিজ্ঞাবলি যথাক্রমে সিদ্ধ হইয়াছে। অধুনা বিজ্ঞানে এই দুই ন্যায়প্রণালী যথারীতিক্রমে ন্যূনাধিকরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। যাঁহারা যে পদ্ধতির অতিশয় আলোচনা করেন, তাঁহাদিগের মানসিক চিন্তাপ্রণালী সেইরূপ অভ্যস্ত হইয়া আইসে। অতএব যে সমস্ত মহামহোপাধ্যায়গণ প্রথমোক্ত অনুমান প্রণালী অবলম্বন করিয়া অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে মহা মহা সাধারণ সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা যে তদ্রূপ মানসিক চিন্তাপ্রণালী ও অভ্যাসক্রমে একজন বিশ্বস্রষ্টা চৈতন্যস্বরূপকে অনুমান করিতে পারিবেন তাহার আর বিচিত্র কি! কিন্তু বিজ্ঞানবিৎগণের মধ্যে এ প্রণালী অতি অল্প লোকেই অনুসরণ করেন। কারণ এ প্রণালী অতি প্রশস্ত হইলেও ইহাতে সকলে সমান ফললাভ করিতে পারেন না। জগতে নিউটনের মত কয় জন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কয়জন তাঁহার মত সাধারণ মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন? অধিকাংশ লোক দ্বিতীয় প্রণালীই অবলম্বন করেন। এই প্রণালীক্রমে বৈজ্ঞানিকেরা যেমন মহা মহা মৌলিক তত্ত্ব হইতে ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রতর সিদ্ধান্তে আনীত হয়েন, তাঁহাদিগের চিন্তাপ্রণালীও ক্রমশঃ অভ্যাসপ্রভাবে সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে। তাঁহারা ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তরে উঠিতে জানেন না, কিন্তু বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রে নামিতে জানেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টি সেই আবিষ্কৃত সাধারণ মৌলিক তত্ত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাঁহাদিগের ন্যায় পদ্ধতি সে গণ্ডি কখন অতিক্রম করিতে জানে না। তাঁহারা প্রকৃতির কঠিন ত্বক্ উদ্ভেদ করিয়া তাহার গূঢ় রহস্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। অতএব বিচিত্র কি, সেই সঙ্কীর্ণদৃষ্টি অন্ধজনগণ কখন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন না। এই দুই প্রণালীর প্রকৃতি আমরা যতই অনুধাবন করিয়া দেখিব, ততই আমাদিগের প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত বিশদ হইয়া আসিবে।

প্রাকৃতিক ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা এবং বহুদর্শনে এমত অনেক প্রাকৃতিক কার্য্য দেখিতে পান, যাহার প্রকৃত কারণ নি-

র্ণয় করিতে পারেন না। কিন্তু যখন কোন চিন্তাশীল দার্শনিক পণ্ডিত এই সমস্ত অনির্ণের কার্য্যের রহস্যোদ্ভেদ করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত কারণ দৃষ্টি-গোচর করেন, যাহা তৎপূর্ব্বে কেহ দেখিতে পান নাই এবং কাহারও জ্ঞান-গোচর ছিল না, তখন তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার অপূর্ব্ব সত্যসন্ধানে সকলই বিশদ ও সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়েছে। যাহা পূর্ব্বে অবিজ্ঞেয় ও দুর্ব্বোধ্য ছিল, এক্ষণে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। তিনি সহসা যেন কি এক আহলাদ দেখিতে পাইলেন; যে আলোক সমদায় অজ্ঞান-তিমির দূরীকৃত করিয়া প্রকৃতির মুখ প্রভাসিত করিয়া দিল। এইরূপ আলোক কেপ্‌লার দেখিয়াছিলেন, যখন তিনি গ্রহগণের কক্ষের ব্যাসের সহিত প্রদক্ষিণকালের সম্বন্ধবিষয়ক সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন। এইরূপ আলোক নিউটন দেখিয়াছিলেন, যখন তিনি এক আকর্ষণশক্তির সাধারণ নিয়মে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ও সৌরজগৎ, গ্রহ, তারা, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, নক্ষত্র এবং এই পার্থিব বালুকণাকেও একসূত্রে আবদ্ধ করেন। এইরূপ আলোক কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিও প্রভৃতি মৌলিক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দেখিয়াছিলেন, যখন তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সমুদায় প্রতি দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও বিশদ এবং পরিস্ফুটরূপে প্রমাণিত হইতে লাগিল। যাহা পূর্ব্বে অকারণ ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া জ্ঞান হইত, তাহা তখন তাঁহাদিগেরই আবিষ্কৃত তত্ত্বের প্রমাণ হইয়া তাহাকে দৃঢ়তর প্রতিপোষণ করিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যখন কোন প্রাচীন লিখন-খণ্ড পৃথ্বীতল হইতে আবিষ্কার করিয়া দেখেন যে, তাহার এক বর্ণও বুঝা যায় না, তাহাতে যে অক্ষর আছে, তাহা কোন পরিচিত ভাষার অক্ষরের মত নহে, কেবল সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র, তখন তাহারা সেই লিখন খণ্ড লইয়া সেকাল সোদযোগে পড়েন, বৈজ্ঞানিকেরাও সেরূপ প্রকৃতির কোন জটিল কার্য্য পরিচিত সাধারণ সত্য দ্বারা বুঝিতে না পারিলে মহা গোলযোগে নিপতিত হয়েন। কিন্তু সেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রকৃত ভাষা ক্রমে যখন উদ্ভাবিত ও অনুমানিত হইতে থাকে, তখন একে একে যেমন সমুদায় লিখনের অর্থ হইতে থাকে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে অপার আনন্দ সঞ্চারিত হয়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও যখন বিশাল প্রকৃতির জটিল গ্রন্থের এক এক অধ্যায়ের গূঢ় অক্ষরের অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহাদিগের মনেও ঠিক তদ্রূপ আনন্দ ও ভাবের সঞ্চার হইতে থাকে। এই উল্লাস এত অধিক হয় যে, ইহা হৃদয়ে ধারণ করা যায় না। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে এই উল্লাস ও উন্মত্ততার বিস্তর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই আ-লোক দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের মন কিরূপ কুজ্‌ঝটিকার অনতি অন্ধকারে আবৃত থাকে, তাহা কেপ্‌লারের জীবনী লেখক তাঁহার দৃষ্টান্তে সুন্দর প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কেপ্‌লার কত রূপ অনুমান করিতেন এবং কত অনুমানই অসিদ্ধ হইয়া যাইত। কখন সন্দেহ, কখন নৈরাশ্যে মন নিতান্ত অভিভূত ও কাতর হইয়া পড়িত, আবার কখন বা সত্যের ঈষৎ বিভায় তাহা প্রভাসিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। কখন অন্তর্দ্দেশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন বোধ হইত; কখন সেই মেঘের মধ্য হইতে যেন ক্ষুদ্র আলোক তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইত। অবশেষে অটল অধ্যবসায় সহকারে যখন তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপ্রভাবে প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়াকাশে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম কেমন পরিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইল। নিউটন একদা এইরূপ নিজ হৃদয়ালোকের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের আলোক দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন:—"ঐ দেখ সূর্য্য দেবের মহা প্রদীপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে কেমন সুন্দর স্থাপিত রহিয়াছে। কে উহাকে সৌরজগতের এমত স্থলে স্থাপিত ও জ্বালিত করিয়া দিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড একদা নিয়মিত, পরিচালিত এবং আলোকিত হইতে পারে!"

নিউটন এই রূপ নিজ আবিষ্কৃত সত্যের হৃদয়ালোকে প্রচালিত হইয়া আর একটি বৃহত্তর আলোকে আনীত হইয়াছিলেন। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যখন একটী মাত্র চমৎকার নিয়মের সুন্দর কার্য্য ও কৌশল উন্নয়ন করিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই কৌশলের পরিস্থাপক বিশ্বপতির সর্ব্বশক্তিমান্ হস্তবল অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃই উদ্বোধিত হইয়া উঠিল। তিনি অমনি বিশ্বপতির যশোঘোষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একদা পৃথিবী হইতে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড হইতে সুরলোকে উত্থিত হইলেন। মানিলেন, বিশ্বপতির কি চমৎকার কৌশলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে। এক মাত্র শক্তি-কৌশলে নিখিল সংসার ভ্রাম্যমান হইতেছে!

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যখন এইরূপ নানাবিধ কার্য্য পরম্পরা দেখিয়া কারণ হইতে কারণে উন্নীত হন, তাঁহাদিগের চিন্তা ও মানসিক ভাব সমুদায় সেই রূপ অনুমান প্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া আইসে এবং এই অভ্যাস-প্রভাবে তাঁহারা ক্রমে এক আদি কারণে অধিরোহণ করেন। এই অনুমান প্রণালীকে উন্নয়ন (Inductive) প্রণালী কহে। এই প্রণালীতে আমাদিগের কল্পনার অনেক কার্য্য আছে। কারণ, কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কোন উন্নয়ন-সিদ্ধ তত্ত্ব ও নিয়ম অনুমিত হইতে পারে না। কিন্তু এই

কল্পনা এত দূর যুক্তিমূলীয় যে, তাহাতে কোন দোষ স্পর্শ করে না। এই কল্পনা কিরূপ যুক্তিমূলীয় তাহা আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

মনে করুন আমরা দেখিতেছি, যে আমাদের সমক্ষে রাম, শ্যাম, কামিনী, রমণী প্রভৃতি অসংখ্য ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল। কিন্তু তাহা দেখিয়া আমরা অনুমান করিলাম সকল ব্যক্তিই মৃত্যুর বশবর্ত্তী। এই সিদ্ধান্তটি অনুমান মাত্র; কারণ আমরা কি রূপে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া প্রমাণিত করিতে পারি যে আমরা রাম ও শ্যামকে মরিতে দেখিয়াছি বলিয়া আমিও মরিব, যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারাও মরিবেন, এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিবেন তাঁহারাও মরিবেন। এই খানে আমাদিগকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল এবং সেই কল্পনার অবলম্বনে আমরা অনুমান করিলাম যে জীবিত এবং ভবিষ্য মানবকুলও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। কল্পনায় যে সিদ্ধান্ত স্থির করিলাম, অসংখ্য দৃষ্টান্তে তাহা প্রমাণিত হইতে লাগিল। যদি ইহা অসত্য হইত তবে ইহার অসারতা কোন না কোন দৃষ্টান্তে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। এই সিদ্ধান্তে আমরা কোন একটি মূল বিশ্বাসকে কল্পনা বলিয়াছি। তাহার কারণ এই, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে বিশ্বাসের স্থল নাই। নিউটন পার্থিব আকর্ষণ-শক্তি দেখিয়া চন্দ্রমণ্ডলে যখন সেই শক্তি আরোপ করেন এবং চন্দ্রমণ্ডল হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ডময় তাহা বিস্তৃত করেন, তখন তিনি একটি সামান্য কল্পনা মাত্র করিয়াছিলেন। সেই কল্পনায় যে সিদ্ধান্ত অনুমিত হইল, তাহা কেপ্লার আবিষ্কৃত নিয়মাবলিতে আরও দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইল এবং সমস্ত জগতীয় গণনার সহিত সমঞ্জসীভূত হইল। তৎপরে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারে এমত কোন ঘটনা ও দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা তাহার অনুমানকে প্রতিপোষণ করে নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রতি দিন নিজ বিস্তৃত আলোচনায় নিউটনের অনুমান সমর্থ করিতেছে। তদীয় অনুমানের বিরুদ্ধে কোন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান নাই বলিয়া সেই অনুমানকে সকলেই সত্য বলিয়া সম্ভাবিত জ্ঞান করেন। এরূপ সম্ভাবনার উপর যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গণনীয় হয়। এই জন্য, এই অনুমান মূলে কল্পনা থাকিলেও তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। এই প্রকার অনুমানক্রমে আমরা যে সমস্ত মহা মহা সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই, তাহাই উন্নয়ন-প্রণালী-সিদ্ধ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। কল্পনা ইহার মূল, দৃষ্টান্ত ইহার প্রতিপোষক।

এই প্রকার যুক্তিমূলীয় অনুমান ব্যতীত কোন সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না। যাঁহারা মহা মহা সাধারণ তত্ত্ব সকল কল্পনার বলে অনুমান করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমশঃ তদ্রূপ তর্কপ্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন।

সে রূপ তর্কপ্রণালীমূলক কোন দোষ দেখেন না। তাঁহাদিগের চিন্তা ও মন সেই রূপ তর্কপ্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া আইসে। তখন তাঁহারা যে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির আদিকারণকে সেই অভ্যাস প্রভাবে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইবেন তাহার আর বিচিত্র কি। প্রথমে অনুমান করেন পরে অসংখ্য অনুকূল দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ দেখিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে দেদীপ্যমান দেখিতে পান।

এক্ষণে আমরা বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে এত দূর উন্নতি দর্শন করিতেছি, এই সমস্ত সাধারণ মূলতত্ত্বই তাহার কারণ। যে সকল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সেই সমস্তের আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আধুনিক বিজ্ঞানের নেতা স্বরূপ বলা যাইতে পারে। তাঁহারা এমত তত্ত্ব সমস্ত জগতে প্রচার করিয়াছেন যাহা পূর্ব্বে কাহারই জ্ঞানগোচর ছিল না এবং যদভাবে বিজ্ঞান এক স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। তাঁহারা এই তত্ত্বসকল আবিষ্কার করিলে পর, গণিতজ্ঞেরা বিবিধ বিনিয়োগ দ্বারা তাহাদিগের সত্যতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই গণিতজ্ঞেরা যে প্রকার কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সহিত এ কার্য্য সমাধান করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই মূলতত্ত্ব সকলের সত্যতা যখন গণিতশাস্ত্রে এতদূর প্রতিপন্ন হইয়া গেল, যে তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না, এবং তাহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস রূপে পরিণত হইল তখন অপর এক শ্রেণীস্থ বৈজ্ঞানিকেরা উঠিয়া সেই সমস্ত মূলতত্ত্বের উপর আপনাদিগের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিস্থাপন করিলেন এবং তাহাদিগেরই সম্প্রসারণ ক্রমে নানাবিধ সিদ্ধান্তে অবনীত হইতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন হইল। বিজ্ঞানশাস্ত্রে এখন যে অসংখ্য পুস্তক দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে এই সমস্ত মূলতত্ত্বের গণনাক্রমে অপর সিদ্ধান্তের সমাধান করা হইয়াছে। তাহাতে যাহা আছে, তাহা এই সমস্ত মূলতত্ত্বে নিহিত আছে।

বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রণালীক্রমে এই সমস্ত নীচতর সিদ্ধান্তে অবনীত হইয়াছেন, তাহাকে অবনয়নপ্রণালী (Deduction) কহে। এই ক্ষণে এই প্রণালী বহুলরূপে প্রচলিত এবং তাহা উন্নয়নপ্রণালীর ঠিক বিপরীতগামী। এক্ষণে বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞানকে দিন দিন সম্পন্ন করিতেছেন। এই প্রণালীর সর্ব্বদা অনুসরণ এবং নিয়ত পর্য্যালোচনায় বৈজ্ঞানিকগণের মানসিক চিন্তা ও ভাব সমুদায় তাহারই অনুগত হইয়া আসিয়াছে। মন এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীতে ক্রমশঃ কেমন সঙ্কীর্ণ হইয়া নাস্তিকতায় পরিণত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে একপ্রকার প্রদর্শন করিয়াছি। ইহাতে মনের এরূপ অভ্যাস হইয়া আইসে যে, কল্পনাপথে কোন

তত্ত্বের আবিষ্কার করিবার পক্ষে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়ে। কেবল কারণ হইতে কার্য্য এবং মূলতত্ত্ব হইতে সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করা যাহার ধর্ম্ম, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া, যাহা সেই প্রবণেও মূলতত্ত্বে নিহিত নাই এমত সত্যে আসিতে পারা যায় না। নিয়ত কেবল এই তর্কপ্রণালীর অনুসারী হইলে মন কখন অন্যপথে যাইতে চাহে না; সেই পথেরই নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। তখন কাজেই অপর প্রণালীসিদ্ধ আনুমানিক তত্ত্ব তাহার সমক্ষে আনিলেই সেই তত্ত্বের আনুমানিক অংশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। এই দেখুন কিরূপ ন্যায়ে তাঁহারা ঐশ্বরিক অনুমানের খণ্ডন করিতেছেন :——

(১) যখন আমরা জানি অথবা দেখি যে অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য উদিত হয়, তখনই আমরা সেই কার্য্য দেখিলে সেই কারণের অনুমান করিতে পারি; নহিলে নহে।

(২) আমরা ঈশ্বররূপ আদিকারণকে কখন জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্য করিতে দেখি নাই, তখন আমরা কি ন্যায়ে জগৎ কৌশল দেখিয়া তাহার আদি কারণ ঈশ্বরের অনুমান করিতে যাই?

(৩) মনুষ্য অগ্রে কল্পনা ও সংকল্প করে, তৎপরে সেই কল্পনানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই কার্য্য কল্পনার ফল অথবা অবয়ব মাত্র। অগ্রে অট্টালিকার নক্সা প্রস্তুত হয়, তৎপরে সেই নক্সানুসারে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। তজ্জন্য আমরা একটি অট্টালিকা দেখিলে অনুমান করিতে পারি যে, তাহা পূর্ব্বে নির্ম্মাতার মনে কল্পনারূপে অবস্থিত ছিল, অথবা তাহা কল্পনারই ফলমাত্র। ইহা মানুষ ব্যাপার।

(৪) কিন্তু এই বিশ্বব্যাপার ও ব্রহ্মাণ্ড কোন মানুষ কার্য্যের সহিত তুলনীয় নহে, অথবা মানুষ কার্য্যের সাংসৃষ্টিক-ন্যায়ে (Analogy) ইহার কারণ অনুমিত হইতে পারে না। যেহেতু :——

(৫) ঈশ্বরকে আমরা কখন কল্পনা করিতে দেখি নাই; অথবা মানবাতীত অন্য কারণের কার্য্য যে মানবীয় কার্য্যের ন্যায় কৌশল ও কল্পনা-সম্ভূত হইবে তাহা কিরূপে অনুমিত হইতে পারে?

(৬) কল্পনার অনুমান ও কৌশল উন্নয়ন করা, মানবমনের ধর্ম্ম। মানব আত্মবৎ জগৎকে দেখিবে। মানবের চিন্তা কৌশলের সৃষ্টি না করিয়া কোন বিষয় অপর বিষয়ের সহিত পরস্পর সম্বন্ধে অনুবদ্ধ করিতে পারে না। সেই জন্য আমরা অভ্যাস বশতঃ বিশ্বব্যাপারে ও কৌশলের অনুমান করিয়া থাকি। কিন্তু মানবমন নিজ স্বভাব নিবন্ধন যে কৌশলের অনুমান করিতে যায়, সেই কৌশলেই যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? মানবের মন ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ নহে। ব্রহ্মাণ্ড মানবের নিকট যে রূপে প্রতীত হয় তাহা মানবের অনুমান মাত্র।

(৭) অতএব ঈশ্বররূপ আদিকারণে কৌশল কিরূপে আরোপিত হইতে পারে?

(৮) অতএব ব্রহ্মাণ্ডরূপ অদ্বিতীয় কার্য্যেরও যে কারণ আছে, তাহার প্রমাণ অভাব। যেহেতু কারণ ব্যতীত যে কার্য্য হইতে পারে না, সে তর্ক ব্রহ্মাণ্ডরূপ অদ্বিতীয় কর্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না। এজন্য ঈশ্বর অসিদ্ধ।

উল্লিখিত তর্কপ্রণালীতে পরিদৃষ্ট হইবে যে, তাহা অবনয়ন (Deducton) মূলক। যে বুধগণ এই আপত্তি উত্থাপিত করিয়া ঐশ্বরিক অনুমানের খণ্ডন করিতে উদ্যত, তাঁহাদিগের চিন্তা ও মন অবনয়ন তর্ক-প্রণালীর এত পক্ষপাতী এবং তাহাতে নিয়ত এত অভ্যস্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা অন্য মাপে আর কিছুরই পরিমাণ করিতে জানেন না। যে তর্ক যাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না, সে তর্ক তাহাতে প্রয়োগ করিয়া সকল মূলবিশ্বাসের প্রতি তাঁহারা কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তাঁহারা এমত কোন কারণ ভাবিতে পারেন না, এবং এমত কারণকে যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করেন না, যাহাতে প্রতিপাদনীয় সিদ্ধান্ত নিহিত নাই; এবং এমত কার্য্য ও সুসিদ্ধ জ্ঞান করেন না যাহা কারণে নিহিত নাই। ইহাই ন্যায়-শাস্ত্রমূলক তর্ক। এ তর্ক-অতীত কোন সত্য গ্রহণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, যে সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ও মূলতত্ত্ব সকল তর্কের মূল, তাহারা কোথা হইতে আইসে? যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা মূলসত্য বলিয়া তাঁহারা ধরিয়া লয়েন তাহারা কোন্ তর্কসাপেক্ষ। যেই সকল মূলতত্ত্ব কেবল কল্পনামূলক এবং ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত উক্ত অবনয়ন-প্রণালীতে বিখণ্ডিত হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত "সকল মনুষ্যই মরণশীল" এবং "নিউটনের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ-শক্তির অনুমান" এই দৃষ্টান্তদ্বয়ে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তবে আর তর্কের মূল কিরূপ রক্ষিত হইতে পারে?

অতএব অবশ্য বলিতে হইবে যে, আমরা উন্নয়ন-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া যে সমস্ত মূলতত্ত্ব লাভ করিয়াছি, তাহার কোনটিই অবনয়ন তর্ক প্রণালীদ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না। উন্নয়ন-প্রণালীসিদ্ধ তত্ত্বের ধর্ম্মই এই। যে তর্কে ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ অনুমিত হইয়াছে, তাহা উন্নয়নসিদ্ধ। উন্নয়ন-সিদ্ধ তত্ত্ব দৃষ্টান্তে সমর্থিত হইবে, কিন্তু তর্কে প্রতিপাদিত হইবে না। সৃষ্টির যে কোন আদি কারণ আছে, এ মতের বিরুদ্ধে কোন দৃষ্টান্ত অবলক্ষিত হয় না। বরং ইহা চিরকালই দৃষ্টান্তে শনৈ শনৈ সমর্থিত হইয়া আসিতেছে। অতএব ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি প্রকৃত অনুমানমূলক-যুক্তি-সঙ্গত নহে।

তবে ঐশ্বরিক অনুমানের বিষয় লইয়া পৃথিবীতে এত গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে, ঐশ্বরিক অনুমান সম্বন্ধে যে

পৃথিবীতে এত বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূল বিবাদ-ভূমি সৃষ্টির আদিকারণ নহে; কিন্তু সেই আদি-কারণের গুণ-পরম্পরা। ঈশ্বরকে কোন কোন মতে এত ভয়ানক বর্ণে বর্ণিত করিয়াছে, এবং মনুষ্যের কার্য্যাদির ফলাফল ও পাপ পুণ্য সম্বন্ধে এমত ভয়ঙ্কর মত সকল প্রচারিত আছে যে, অনেকে নাস্তিকতার আশ্রয় গ্রহণ করাও সন্তোষকর জ্ঞান করেন। খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রধানতঃ এই প্রকার মত পরিপূর্ণ। অন্যান্য ধর্ম্মে যে নাই আমরা একথা বলি না। বাস্তবিক ঈশ্বরকে নানা জাতি, নানা ধর্ম্মপ্রণালী, নানা পণ্ডিত, নানাবিধ রূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই সমস্ত কল্পনা উন্নয়ন ন্যায়-প্রণালীর অপসিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। যে হেতু সে সমস্ত কল্পনা ও মত ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যে ও বিশ্বব্যাপারে সমর্থিত হয় না। দৃষ্টান্তে যাহা সমর্থিত না হয় তাহা কখন সত্য ও পরিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সৃষ্টির আদিকারণের অনুমান যতদূর এই পরীক্ষা-সহ হইবে তত-দূর সত্য; তদতীত অসত্য বলিতে হইবে।

এ প্রস্তাবের উপসংহার কালীন আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ইহার আমূল শেষ পর্য্যন্ত হুইয়েল হইতে গৃহীত হয় নাই। এই প্রস্তাব-লিখিত ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় তাবৎ কথা হুইয়েলে নাই। তাহার মূল মত ও অভিপ্রায় লইয়া আমরা তাহা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ডাক্তার হুইয়েলের এমন অভিপ্রায় নহে যে, এক ন্যায়-প্রণালী অনুযায়ী সমস্ত পণ্ডিতই ঈশ্বর সম্বন্ধে অবশ্যই এক মত হইবেন। তবে কোন্ বৈজ্ঞানিক ন্যায়-প্রণালীর প্রবণতা ও সম্ভাবিত ফলাফল কিরূপ হইতে পারে তাহাই প্রদর্শন করা তাহার অভিপ্রায়। এক শ্রেণীর সমস্ত পণ্ডিতই যে নাস্তিক হইবেন, তাহা সম্ভাবিত নহে। এবং এক শ্রেণীর সকল পণ্ডিতই যে ঈশ্বরের হস্ত প্রতি সৃষ্টি-কাণ্ডে দেখিতে পাইবেন তাহাও অসম্ভব। তবে কোন্ তর্ক-প্রণালী অধিক আলোচনা করিলে অপরিনিয়মিত ও অপরিণত মনে কিরূপ ফলাফল দর্শে তাহাই এ প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা মনকে নিতান্ত অন্ধ ও পক্ষপাতী করিয়া ফেলেন নাই, বিবেক যাঁহাদিগের মনকে সুশাসনে রাখিয়াছে, তাঁহাদিগের নাস্তিক হইবার অল্পই সম্ভাবনা। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মাত্রেই যে নাস্তিক হইবে এ কথা নিতান্ত অসত্য। এক্ষণে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে যে সমস্ত পণ্ডিতগণ ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবনয়ন-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন; শুদ্ধ অবলম্বন নহে, তাহাতে দিন রাত আসক্ত হইয়া আছেন; সুতরাং তাঁহাদিগের চিন্তা ও মানসিক ভাবাদি সেই প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে এবং অনেকেই এই জন্য নাস্তিকতায় পদার্পণ করিতেছেন। অতএব

স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, ইহা বিজ্ঞানের দোষ নহে, ইহা তদীয় শিষ্যগণের দোষ, এবং বৈজ্ঞানিক শিষ্য মাত্রেরই নাস্তিক হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীপূ—

প্রেম-পরিণাম।

(গদ্যকাব্য।)

দ্বিতীয়াংশ। অনুতাপ—নায়িকা ও ছুরিকা।

যাহা গেল তাহা তো আর আসিল না। দিবাকর। প্রতিদিন সায়ংকালে তোমাকে পশ্চিম গগনে অস্ত যাইতে দেখি, কিন্তু সেই অস্তই তোমার শেষ নয় তো। নিশানাথ! পৌর্ণমাসীর বিমল আলোক তোমার চিরস্থায়ী সম্পত্তি নয় বটে, কিন্তু মাসে মাসে তুমি তো সেই সম্পত্তির পুনরধিকারী হইয়া থাক। প্রকৃতি! তুমি এক্ষণে শ্রীহীনা, কিন্তু সময়ক্রমে তোমার বসন্ত পুনরাগমন করিয়া তোমাকে তো বিভূষিতা করিবে। কোকিল! আজি তোমার সে মোহন স্বর বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু দশ দিন পরে তো তুমি সেই স্বর পুনরায় লাভ করিয়া লোকের চিত্ত হরণ করিবে। হায়! সকলেরই যাহা যায় তাহা আবার আইসে, কিন্তু এ অভাগিনীর যে অমূল্য সম্পত্তি গেল, তাহা তো আর আসিল না। কেবল আসিল না নয়; রোদনে, অনুতাপে, যাতনায়, পীড়ায় কাতর হইয়া দেশে দেশে ফিরিলাম, তথাপি বারেক সে অতুল বিধির পুনর্দর্শনলাভও ঘটিল না। অভাগিনীর যাহা গেল তাহা আর আসিল না।

অদৃষ্ট! তোমায় ধিক্। যাহা প্রকৃতির নিয়ম, যাহা সাধারণ অধিকার, যাহা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা আমার পোড়া অদৃষ্ট তাহাতেও বঞ্চিত। আমার প্রতি বিধাতা বাম। বিধাতা সকলের করুণায় কর্ণপাত করেন, সকলের প্রার্থনা পূরণ করেন, সকলের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন, কিন্তু এমনি আমার কপাল—আমার প্রার্থনা তাঁহার কর্ণগোচর হয় না, হতভাগিনীর অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ।

কিন্তু আমার অদৃষ্টেরই বা দোষ কি? আমার অদৃষ্টই বা মন্দ কিসে? আমার সৌভাগ্যের সীমা ছিল না তো! আমি যাহার জন্য এক্ষণে কাঁদিতে কাঁদিতে

দেশে দেশে ফিরিতেছি, সে তো আমার জন্য কতই কাঁদিয়াছে; সে তো আমার কতই উপাসনা করিয়াছে; আমার অনুগ্রহ লাভার্থ সে কোন কার্য্যেই কুসঙ্গত হয় নাই তো, সে তো সম্পূর্ণ হৃদয় আমাকে দিয়াও নিয়ত ভাবিয়াছে যে কিছুই দেওয়া হয় নাই। তবে আমার অদৃষ্ট মন্দ কিসে? যাহা দেবদুর্লভ সামগ্রী তাহা তো আমার চরণতলে ছিল। কিন্তু হায়! সে নিধি এখন কোথায়? কাহার দোষ দিব—কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব—আমি আপন পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছি—হায়! এ দুঃখের কথা কে বিশ্বাস করিবে?

এ ঘটনা কেন ঘটিল? কেন এ ভয়ানক পার্থক্য আমাদিগকে চির জীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল? কাহার দোষে এ অচিন্তনীয় অনর্থের উৎপত্তি হইল? তাঁহার কি দোষ? প্রাণনাথ পাপী নহেন। হৃদয়েশ! তোমার গুণের সীমা নাই। এই মন্দভাগিনীই সমস্ত পাপের নিয়ন্ত্রী। আগে কেন বুঝে নাই? কেন পূর্ব্বে হৃদয়ে এ প্রবৃত্তি জন্মে নাই? কেন আমার কুটিল মতি আগে এরূপ হয় নাই? আগে যদি বুঝিতাম যে, পাষাণ দেহে শোণিতশিরা থাকে, আগে যদি জানিতাম যে, নীরস বালুকার তলে ফল্গু অলক্ষিতভাবে বহে, তবে আজি আমায় কাঁদিতে হইত না; হায়! তাহা হইলে আমার আর এ দশা হইত না।

যখন প্রাণনাথ আমার চরণ ধরিয়া রোদন করিয়াছেন, তখনও আমার এ ভ্রান্তি কমে নাই তো! যখন সেই অতুল নিধি আমাকে নানা উপায়ে বুঝাইবারে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন তাহাতেও বুঝি নাই তো! যখন সেই হৃদয়-রত্ন, এ ব্যবহারের জন্য আমাকে কোন না কোন সময়ে যাতনা পাইতে হইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন, তাহাতেও আমার চৈতন্য জন্মে নাই তো!

কিন্তু এখন যাহা বুঝিতেছি, আগে তাহা বুঝি নাই কেন? আজ্ যে যাতনায় হৃদয় পুড়িতেছে, আগে তাহা হয় নাই কেন? অধুনা যে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহা আচ্ছন্ন ছিল কেন? এ কথার উত্তরে কি বলিব? কি বলিয়া এ ঘোর অত্যাচারের বিলোপ করিব? যৌবন-তেজ মনুষ্যকে অন্ধ করে। ভাল দুই বৎসর পূর্ব্বেও আমার যে যৌবন-তেজ ছিল এখনও তাহাই আছে তো; কে আমাকে দেখিয়া এখন প্রবীণা মনে করে। তবে যৌবনের তেজ এ অপকর্ম্মের কারণ নহে। সংসর্গ ও শিক্ষার দোষে মনুষ্য না বুঝিয়াও নানা গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকে। শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে আমি জীবিতেশ্বরের সে অতুলনীয় প্রেম বুঝিতে পারি নাই। এ কারণও যথার্থ নয়। যে শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে প্রথমে তাঁহার উদার প্রেমের অপার মহিমা ও অসীম গৌরব বুঝিতে দেয় নাই, সেই শিক্ষা ও সংসর্গ পূর্ব্বেই তো জানিতে পারিয়াছি যে, আমি দেব-দুর্লভ রত্ন

পদাঘাতে নষ্ট করিয়াছি, পিত্তল-ভ্রমে কাঞ্চনে বঞ্চিত হইয়াছি, এবং চণ্ডাল-জ্ঞানে দেবতাকে তুচ্ছ করিয়াছি। কিন্তু আগে না বুঝিয়া এখন বুঝি কেন? কি বলিব কেন? বুঝি প্রেম চাপা থাকে, বুঝি ভালবাসা সকল সময় বুঝা যায় না, বুঝি মোহ ও মাৎসর্য্য ক্ষণেক পবিত্র প্রণয়কেও পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে। তাহাই বটে—নচেৎ আর কি? পোড়া বুদ্ধির দোষেই আজ আমার এ যম-যন্ত্রণা। যখন প্রাণনাথে হৃদয় ভরিয়া, প্রণয়ের ডালি সাজাইয়া আমায় উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, তখন ভাবিয়াছি এ জগতে স্ত্রী-জাতির এরূপ উপহারে ন্যায়ানুযায়ী অধিকার; তখন ভাবিয়াছি, স্ত্রী দেবতা, পুরুষ উপাসক। যখন হৃদয়েশ অতি দীন ভাবে আমার করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন, তখন ভাবিয়াছি, সহজে হৃদয় দান করা স্ত্রী-চরিত্রে নিষিদ্ধ; তখন ভাবিয়াছি ভিক্ষুকের কি সীমা আছে? যখন সেই সর্ব্বস্ব ধন আমার উপেক্ষার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যার পর নাই যাতনা ভোগ করিয়াছেন, তখন ভাবিয়াছি পুরুষকে যাতনা দেওয়া স্ত্রী-লোকের একটা প্রধান কর্ম্ম; তখন ভাবিয়াছি দুঃখের পথ কণ্টকাকীর্ণ, রত্ন লাভার্থে যত্নের প্রয়োজন।

কিন্তু এখনই বা মতের এতাদৃশ অন্যথা কেন? তাহার অনেক কারণ। এখন দেখিতেছি হৃদয়েশের সেই যে ভালবাসা তাহার তুলনা এ জগতে আর পাওয়া যায় না। তাহা দেব-দুর্ল্লভ সামগ্রী মহার্হ রত্ন। এখন দেখিতেছি প্রাণেশের সেই প্রেম ব্যতীত আর যত প্রেম সকলই লিপ্সা, মোহ, বিকার ও কপটতায় পূর্ণ। স্বর্গে ও নরকে যে প্রভেদ হৃদয়নাথের সেই পবিত্র প্রণয়ের সহিত সাধারণ লোকের সাধারণ ভালবাসায় তত প্রভেদ, একথা এখন বুঝিতেছি। সেই ভুবন-মোহন কান্তের বিচ্ছেদ আমাকে এখন এই সকল শিক্ষা দিয়াছে। সে রত্ন না হারাইলে তাহার এ সাহস ও গৌরব বুঝিতে পারিতাম না। যে দ্রব্য আছে তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায় না। যে নিত্য স্বর্গ-বাসী সে স্বর্গের উৎকর্ষ বুঝে না; যে কষ্ট না পাইয়াছে সে সুখ জানিতে পারে না; যে না ঠেকিয়াছে সে শিখিতে পারে না; যে যাহা না হারাইয়াছে সে তাহার জন্য কাঁদে না। প্রাণেশের বিচ্ছেদাগ্নি আমার হৃদয় দগ্ধ করিয়া ইহাকে প্রদীপ্ত করিয়াছে। এখন ইহা বুঝিয়াছে যে, কৃপণের ধনের ন্যায় যে প্রেম-রত্ন কাহাকেও দিব না ভাবিয়াছিলাম এখন দেখিতেছি তাহা আমার ধন নহে; তাহা রাখিতে আমার অধিকার বা ক্ষমতা নাই; তাহা বিনিময়ের সামগ্রী। একজন তাহার বিনিময়ার্থ তদনুরূপ—না, তদপেক্ষা বহু গুণে মূল্যবান্ সম্পত্তি দান করিয়াছে, অথচ এ পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্য তাহাকে দেওয়া হয় নাই।

এ সৎজ্ঞান এ পাপ-জ্ঞান কেন

জন্মিল? এ দুঃসহ, অহমা জ্ঞান অপেক্ষা সেরূপ জ্ঞান-হীনা থাকা শতাংশে শ্রেয়ঃ। এ অসহনীয় যাতনা অপেক্ষা চিরকাল নরকে পড়িয়া মরা ভাল। এ যাতনা আর সহে না। কি করিলে হে ভগবন্! এ দুঃসহ যাতনার অবসান হয়? দয়াময়! আমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে মার্জ্জনা কর; তোমার চরণে ধরি, আমায় ক্ষমা কর। হে অনাথনাথ, ভবেশ! আমায় বারেক সেই মোহন কান্তির সমীপস্থ কর।

হায় কি বৃথা কথা বলিতেছি? এরূপ বিবেক-বিহীনা পাপীয়সীর কথায় বিধাতা কর্ণপাত করিবেন, এও কি সম্ভব? যদি বিধাতার শরণ গ্রহণ করিলে যন্ত্রণার শান্তি হয়। তবে এ ঘোর পাপের শাস্তি হইবে কিরূপে? পাপীর দণ্ড এত লঘু নহে। বিধাতার নাম উচ্চারণে আমার অধিকারই বা কি? দয়াময় জগদীশ্বরের পবিত্র নাম এ অপবিত্র রসনা হইতে উচ্চারিত হইবার যোগ্য নহে। যে দুশ্চারিণী হাসিতে হাসিতে গুণময় প্রেমময় কান্তকে অকারণে নিয়ত যন্ত্রণার অনলে দগ্ধ করিয়াছে, যে পাষাণী সেই পুরুষরত্নের মর্ম্মান্তিক রোদন দেখিয়া এক ফোটা অশ্রু বিসর্জ্জন করা দূরে থাকুক, হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করিয়াছে, যে হৃদয়-হীনা অবিরত যাতনা বিষে সেই গুণধামের অন্তর জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহাকে চিরকালের নিমিত্ত সমাজ হইতে বিদূরিত করিয়াছে। এবং সম্ভবতঃ আহার দুর্ব্ব্যবহার জনিত অসহ্য যন্ত্রণা হেতু তাঁহার জীবনের অস্তিত্বও——ওঃ ভগবন্! আর না। দুঃখিনী, পাপীয়সীর ক্লেশের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে; যাহা ভাবিতেও শোণিত শুষ্ক হয়, আমার আত্মা, অন্তরের অন্তর কাঁপিয়া উঠে, তাহা যেন না ঘটে। যে পাপীয়সী পাপের উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছে, বিধাতার নাম উচ্চারণে তাহার কোনই অধিকার নাই। বিধাতার নাম স্মরণে আমার নিস্তারের আশা নাই। আমার নিস্তারের অন্য উপায়ও নাই তো।

তবে ক্রন্দন আমার নিয়তি; যাতনা আমার সহচর; অনুতাপ আমার নরক। নরক—হাঁ—নরক জীবনাবসানে নয়। কে বলে স্বর্গ ও নরক পরকালে? নরক পরকালে নয়। স্বর্গও নরক ইহ জীবনে আমার নরক জীবন্ত। মৃত্যুর পর আমার নিমিত্ত না জানি কি নূতন নরক সৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু যতই হউক, আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি কিছুই নহে। আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তি অসম্ভব।

কিন্তু মৃত্যুর পরে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া ইহ-জীবনে আর কত কষ্ট সহিব? এ যাতনা আমার ন্যায় পাষাণময়ী না হইলে এত দিন সহিতে পারিত না। আমার হৃদয় লৌহময়, বজ্রময়, বা তদপেক্ষাও কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত। কিন্তু আমিও আর পারি না তো।

এ কষ্ট আর সহে না। মৃত্যু আসিয়া আমায় গ্রাস করিবে না। বিধাতা আমার

জীবন্ত নরক ব্যবস্থা করিয়াছেন,—মৃত্যু হইলে সে দণ্ড পূর্ণ হয় কই? আমার মৃত্যু হইবে না। তবে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার নিষ্কৃতির উপায় কি? আমি তাহাই করিব। আমি আত্মহত্যা দ্বারা এ ভাবভূত, পাপ-পীড়িত দেহ বিসর্জ্জন দিব। পরকালে যাহা হয় হইবে—আমি এ জীবন রাখিব না।

তবে আইস ছুরিকে! এ অন্তিম সময়ে তুমিই আমার বন্ধু; তোমার আলিঙ্গনই এক্ষণে আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। তুমি আমাকে নিস্তার কর। ছুরিকে! তোমার অনুগ্রহে এ ভব-যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে বটে, কিন্তু আমি এ সংসারে যে কীর্ত্তি রাখিয়া চলিলাম, তাহা লোক চিরকাল ঘৃণার সহিত শুনিবে; আমার নাম ধিক্কারের আস্পদ হইবে; পাপের উপমা-স্থল থাকিবে। আমার এ অপকীর্ত্তি, এ পাপ, এ কলঙ্ক, এ লোমহর্ষণ ব্যবহার, যে শুনিবে সেই শিহরিবে। আমার এ কলঙ্কিত নাম যেখানে উচ্চারিত হইবে, সেখানেই লোকে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া দূরে সরিয়া যাইবে। তাহাতেও আমি কাতর নহি। আমার তাহাই উপযুক্ত সৎকার। মৃত্যুর পর যাহা হয় হউক, কিন্তু জীবনে যে যাতনা সহিতেছি তাহা তো আর সহিতে হইবে না।

তবে আইস ছুরিকে! তোমার সাহায্যে এ পাষাণ-দেহ হইতে প্রাণবায়ু দূরীভূত করিয়া দিই। ছুরিকে! আমার এ ভারভূত জীবনের তুমিই এক মাত্র আত্মীয়—আমার হস্তে আর তোমার থাকিবার আবশ্যক নাই, তুমি আমার হৃদয়ে আমূল প্রবেশ কর, যে পাষাণ-হৃদয় এত দুষ্কর্ম্মে সমর্থ, হয়ত ছুরিকা, তোমার সহায়তাতেও তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিব না। হস্ত! তুমিও কি হীনবল? এই শাণিত ছুরিকা তুমি সজোরে আমার বক্ষমধ্যে আমূল প্রোথিত করিতে পারিবে না কি? যে হৃদয় তব প্রবঞ্চনায়, প্রাণনাথ! তোমাকে চিরকাল অশ্রুজলে ভাসাইয়া ভাসাইয়া সংসারত্যাগী করিয়াছি, অদ্য স্বহস্তে তাহা খণ্ড খণ্ড করিব। প্রাণেশ্বর। হৃদয়েশ। দুঃখিনীরতন! জীবিতেশ্বর। তোমাকে কি বলিব? কি বা না বলিব? কত কথাই তো বলিবার আছে, কিন্তু এখন যদি তোমার সাক্ষাৎ পাই তাহা হইলে কোন কথাই তো বলিতে পারি না। আমি কি বলিয়া তোমার সমক্ষে কথা কহিব? তোমাকে কিছুই বলিবার মুখ নাই। তবে তোমার উদ্দেশে জীবিতেশ। দুই চারিটী কথা না বলিয়া এ পাপ-পঙ্কিল দেহ বিসর্জ্জন দিতে পারিতেছি না তো? হে দয়াময় বিধাতঃ! হে বনচরগণ! হে বনস্পতি-সমূহ! তোমাদের যদি কাহারও এরূপ পাপীয়সীর অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে আমার এই শেষ অবস্থাটা দয়া করিয়া একবার প্রাণনাথকে জানাইও।

প্রাণনাথ! আমি তো চলিলাম; এ সংসার হইতে আমার এ পাপ নাম তো

ডুবিতে চলিল; এ পাপ পঙ্কিল দেহ তো অবিলম্বে প্রাণহীন হইবে; আমি যে কীর্ত্তির জন্য জন্মিয়াছিলাম তাহার তো এখনই চরম হইবে। এ অন্তিম সময়ে, এ মরণ-কালে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, ইহ জীবনে যাহা হইল না, পর জীবনে যেন তাহা ঘটে। আর কিছু হউক বা না হউক, নাথ! নরকে থাকিয়াও একবার যেন তোমায় দেখিতে পাই। তাহা হইলে সেই নরকেও আমি স্বর্গাপেক্ষা সুখ লাভ করিব। আর প্রাণেশ্বর!—আর কি বলিয়া বলিব? কোন্ মুখে সে কথা পাড়িব? প্রাণেশ্বর তুমি করুণাসিন্ধু। তুমি এ পাপীয়সীর দোষরাশি ক্ষমা করিলে করিতে পার—কিন্তু নাথ! আমি তো ক্ষমার যোগ্যা নহি। দয়াময়! আমায় ক্ষমা করিবে কি? হৃদয়েশ! যদি প্রবৃত্তি হয়, এ পরিত্যাগিনীর কলুষরাশি বিস্মৃত—না বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব—ক্ষমা করিও। তোমার চরণোদ্দেশে বার বার প্রণাম করিয়া, তোমার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া, তোমার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, আমি স্বহস্তে আত্ম-জীবন বিনাশ করিয়া আমার এ ঘোর পাপের যদি প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবে—তবে তাহাই করি। আর না। হস্ত প্রস্তুত হও—ছুরিকা আইস—

—নাথ ক্ষমা—ওঃ—

ইতি দ্বিতীয়াংশ।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

—oo—

বেদ বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত।

ন্যায় দর্শন।

দার্শনিক আর্য্যগণ মধ্যে গৌতম ঋষি সর্ব্ব-প্রাচীন। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত পাঠকেরা অনেক সময় অনেক স্থলে গৌতমের নাম শুনিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এক গৌতমের প্রসঙ্গ আছে, তিনি মহর্ষি জাবালীর গুরু। শতক্রতুর লাম্পট্য জন্য যাঁহার গৃহিণীকে পাষাণময়ী হইতে হইয়াছিল। সেই অহল্যাপতি গৌতমের নামও পাঠকের অজ্ঞাত নহে।

পাণ্ডবদের গুরুও গৌতম নামক জনৈক ভূসুর ছিলেন, আবার বৌদ্ধগণের আরাধিত এক গৌতম ছিলেন যাঁহার নামান্তর 'গদমা'। ইহাঁদিগের মধ্যে ন্যায়সূত্র-প্রণেতা কোন্ গৌতম তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন, যাহা হউক

ন্যায়সূত্র-প্রণেতা গৌতমের নামান্তর অক্ষপাদ। অক্ষপাদ শব্দের ব্যুৎপত্তি এরূপ করিলে অর্থ কিছু বিশদ হইতে পারে—যথা "অক্ষেণ জ্ঞান-বিশেষেণ ব্যবহারেণ বা পদ্যতে জ্ঞায়ত ইতি অক্ষপাদঃ"। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি, গৌতম-প্রণীত ন্যায়-দর্শন সম্বন্ধে যে অতীব প্রগাঢ় ভাব প্রকাশ করেন তাহা বিবেচনা করিলে ন্যায়-দর্শন যে পৃথক্ এক গৌতম প্রণীত তাহা প্রমাণীকৃত হয়। তিনি লিখিয়াছেন "যে ব্যক্তি তর্ক শাস্ত্রানুসারে তাৎপর্য্যার্থের অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তিই শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্ম-নির্ণয়ে সমর্থ হয়"। বোধ হয় সুরাচার্য্য বৃহস্পতি এই তর্ক শাস্ত্রানুশীলন করিয়াই নাস্তিক্য মত প্রচারে দীক্ষিত হয়েন। কেন না তিনি বেদের রচক ঈশ্বর অথবা পারলৌকিক আত্মা আছে ইহা সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করিয়াছেন:—পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে মূল সংস্কৃত না লিখিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। "স্বর্গ অপবর্গ বা পরলোকগামী আত্মা নাই; বর্ণাশ্রমাদির কোন ক্রিয়াও ফলদায়িনী হয় না। অগ্নিহোত্র বেদত্রয় ও ভস্ম লেপন বুদ্ধি-পৌরুষ হীন ব্যক্তিদিগেরই ধাতৃ নির্ম্মিত জীবিকা। যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন স্ব জনককে বলিদান করে না? যে জন্তুগণ মরিয়াছে, শ্রাদ্ধে যদি তাহাদিগেরও তৃপ্তি জন্মে; তবে পর্য্যটক-বৃন্দের সঙ্গে পাথেয় রাখিবার প্রয়োজন নাই। যদি স্বর্গস্থিত লোক ভূতলস্থ দানে তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়; তবে হর্ম্মোপরিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্ত্যর্থে ভূতলে অন্ন কেন প্রদত্ত না হয়? যত দিন জীবিত থাক সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর। (ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ) ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন কর, ভস্মীভূত শরীরের পুনরাগমন কোথায়? যদি দেহ হইতে নির্গত আত্মা পরলোকে যায়, তবে স্বজন মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেন ফিরিয়া না আইসে? সুতরাং মৃতগণের প্রেত কার্য্য বিহিত করা ব্রাহ্মণবর্গের জীবিকা মাত্র। তিন বেদের কর্ত্তা ভণ্ড, ধূর্ত্ত নিশাচর। জর্ফরী তুর্ফরী ইত্যাদি পণ্ডিতগণের বচনই শ্রুত। লিখিত আছে যে অশ্বমেধে—রাজ পত্নী অশ্ব ধরিবেন। ভণ্ডগণ এবম্বিধ কত কি ধরিবার কথা লিখিয়াছেন। তদ্রূপ আমিষ ভোজন নিশাচর নির্দ্দিষ্ট।" পাঠক বুঝিলেন সুরপুরোধা বৃহস্পতি কেমন যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আপন মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। এ সকল বৃহস্পতির লিখিত কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কেবল মাধবাচার্য্য সর্ব্ব দর্শন-সংগ্রহে উপরি-উক্ত বচন গুলিকে বৃহস্পতির বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক আমাদিগের প্রস্তাব্য বিষয় আলোচনা করা যাউক। গৌতম ঋষি এই ন্যায়-শাস্ত্রে পদার্থ ও মানস-তত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণবর্গকে বিদ্যার বিবিধ শাখার উপদেশ কর-

পার্থে আদৌ ষোড়শ পদার্থ সূত্রবদ্ধ করিলেন, ষোড়শ পদার্থ মধ্যে আত্মিক ভৌতিক নানা প্রকার তত্ত্ব এবং রূপ রস গন্ধাদির আলোচনা বিশেষরূপে করিবার জন্যে ঐ আলোচনাকে অপবর্গের হেতু বলিয়া লিখিলেন। গৌতম-প্রণীত ন্যায়-দর্শনে পঞ্চ অধ্যায় আছে; প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি আহ্নিক এবং প্রত্যেক আহ্নিকে অনেকগুলি প্রকরণ আছে। ন্যায়দর্শন-মতে জীব চৈতন্য স্বরূপ নহেন, যেহেতু সুষুপ্তি মূর্চ্ছা ও সমাধিকালে চৈতন্য উপলব্ধি হয় না, কিন্তু জাগ্রতকালে আত্ম-মনঃসংযোগে তাঁহার চৈতন্যগুণ জন্মে। যথা—

অচিদ্রূপোহথ চিদ্রূপোজীবোহ-
চিদ্রূপ ঈষ্যতে। চিদাভাবাৎ
সুষুপ্ত্যাদৌ জাগ্রচ্চিন্মনসা কৃতা॥*

নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, সুতরাং মীমাংসকদিগের ন্যায় বেদের প্রামাণ্য গ্রাহ্য করিতে পারেন না। বেদবিষয়ে গৌতম এই প্রকার তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন—

"তদপ্রামাণ্যম্ অনৃত ব্যাঘাত-
পুনরুক্ত-দোষেভ্যঃ।"

বেদ অনিত্য ও অপ্রমাণ, যেহেতু ইহাতে অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তি দোষত্রয় দৃষ্ট হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিতেছেন, অদৃষ্টার্থক শব্দ বেদ অপ্রমাণ, কারণ ইহাতে দোষত্রয় লক্ষিত হয়, প্রথম অনৃত যথা পুত্রেষ্টি যাগাদিতে অনেক সময় ফলের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্ধেতু বেদ বাক্যের অযথার্থ কথন। দ্বিতীয় ব্যাঘাত যথা উদিত কালে হোম করিবে না এবং অনুদিতে হোম করিবে না। তৃতীয় পুনরুক্তি শুক কথা বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে অতএব বেদ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। গৌতম অন্য সূত্রত্রয়ে পূর্ব্বোক্ত দোষত্রয়ের নিবারণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কর্ম্ম-কর্ত্তার অযথাবিধি কর্ম্মকরণ প্রভৃতি বৈগুণ্য প্রযুক্ত যাগফলের অনুপপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ অনুদিত কালে হোম করিব এইরূপ স্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি তদ্বিপরীত কর্ম্ম করে, অথবা উদিত কালে হোম করিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যে ব্যক্তি যথা সময়ে কর্ম্ম না করে, তাহার পক্ষে উক্ত নিষেধ, সাধারণ পক্ষে নহে। তৃতীয়তঃ পুনরুক্তি দোষ নহে, বরং গুণ-বিশেষ। কারণ অনেক বিষয় দুই তিন বার না বলিলে শ্রোতৃবর্গ তাহার তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন না। যথা—

"অনুবাদোপপত্তেশ্চ ন পৌন-
রুক্ত্যং। নিষ্প্রয়োজনত্বেহি পৌন-
রুক্ত্যং দোষঃ, উক্তস্থলে অনু-
বাদস্য উপপত্তেঃ প্রয়োজনস্য
সম্ভবাৎ।"

সুতরাং বেদের প্রামাণ্য কোন প্রকারেই ব্যাহত হইল না।

এইরূপ দোষত্রয় প্রত্যাদেশ করিয়া

* অধিকরণমালা ১৮ সূত্র।

অক্ষপাদ স্বমত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা—

"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ প্রামাণ্যং আপ্ত-প্রামাণ্যাৎ।" ন্যায়দর্শন।

বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিলেন "আপ্তস্য বেদকর্ত্তুঃ প্রামাণ্যাৎ যথার্থোপদেশকত্বাৎ বেদস্য তদুক্তত্বমর্থাৎ লব্ধং। তেন হেতুনা বেদস্য প্রামাণ্যমনুমেয়ং। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। মন্ত্রো বিষাদিনাশকঃ। আয়ুর্ব্বেদভাগশ্চ বেদস্য এব। তত্র সংবাদেন প্রামাণ্যগ্রহাৎ তদ্দৃষ্টান্তেন বেদত্বাবচ্ছেদেন প্রামাণ্যমনুমেয়া" অর্থাৎ যেরূপ প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ, তদ্রূপ বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী বলিয়া বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া বাৎস্যায়ন ভট্টাচার্য্য তাঁহার বৃত্তিতে অতি সরল ভাষায় অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন, উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন—"মন্বন্তর যুগান্তরেষু চ অতীতানুগতেষু সম্প্রদায়াভ্যাস-প্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং। আপ্ত প্রামাণ্যাৎ চ প্রামাণ্যং। লৌকিকেষু শব্দেষু চৈতৎ সমানং" অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তর ও যুগান্তর সময়ে বেদের সম্প্রদায়, অভ্যাস এবং প্রয়োগ অবিচ্ছিন্ন থাকে, এ জন্য বেদ নিত্য। আর যথার্থবাদী প্রণেতার যথার্থ উপদেশ এই হেতু বেদের প্রামাণ্য, লৌকিক বাক্যেও এই নিয়ম। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নৈয়ায়িকেরা বহুকাল প্রচলিত আছে, এজন্য বেদের নিত্যত্ব এবং বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী বলিয়া বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, বেদোক্ত বিষয়ের সত্যতা আছে বলিয়া যে বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে এরূপ কি নিয়ম আছে। ঘট কুম্ভকার কর্ত্তৃক কৃত এই বাক্যার্থের যাথার্থ্য আছে বলিয়া যেমন ঐ বাক্যের অভ্রান্ত পুরুষোক্ততা আছে, তদ্রূপ বেদ অভ্রান্তপুরুষ-প্রণীত এই মাত্র, নতুবা বেদ যে কোন পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত নহে এমত নহে। যদিও এরূপ অভ্রান্তপুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি এখন অভ্রান্তপুরুষ একেবারে নাই, ইহাও বলা যাইতে পারে না, যেহেতু সর্ব্ববিৎ জগৎপ্রসবিতা সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বশুভপ্রদায়ক ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বসাধারণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়দর্শনমতে বেদ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া প্রমাণ।

এক্ষণে ন্যায়দর্শন আলোচনা করিয়া গৌতমের অসাধারণ পাণ্ডিত্য পাঠকগণকে জ্ঞাত করিতেছি। ন্যায়সূত্রকার অনুমানকে পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নির্গমন। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মজ্ঞানতা জন্য জ্ঞানকে অনুমিতি কহা যায়, তাহারি করণ অনুমান। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এই জ্ঞানকে অনুমিতি বলা যায়, তাহাতে ধূম আছে এবং ধূমেতে

অগ্নির ব্যাপ্তি এই জ্ঞান ঐ অনুমিতির করণ, ইহাই অনুমান। সুতরাং অনুমানকে লিঙ্গপরামর্শও কহা যায়। যথা—"তত্র ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা-জ্ঞান-জন্যং জ্ঞানমনুমিতিস্তৎকরণ মনুমানং তচ্চ লিঙ্গ-পরামর্শঃ।" ন্যায়দর্শন।

গৌতম উপদেশ করিলেন যে, অনুমান পঞ্চ-অবয়বি। আদ্য দুই অবয়ব প্রতিজ্ঞা এবং হেতু সংক্ষেপে তর্কার সাধক হইয়া থাকে, যথা—

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

যে স্থলে প্রতিবাদী অনুপস্থিত সে স্থলে এই সংক্ষেপ তর্ক ব্যবহার হইয়া থাকে, দর্শনভাষ্যাদি গ্রন্থের মধ্যে এই প্রকার তর্কই সামান্যতঃ দেখা যায়। কিন্তু প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া নির কুশমুখে তর্ক করিলে অবশিষ্ট তিন অবয়বের প্রয়োজন হয়, কেননা এমতস্থলে প্রতিজ্ঞা ও হেতুর উদ্দেশ করণান্তর হেতুবাদ প্রতিপন্ন করা আবশ্যক হয়। উদাহরণ দ্বিবিধ, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। অন্বয়ীর লক্ষণ এই "সাধ্য সাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্।" ব্যতিরেকীর লক্ষণ "তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতং ব্যতিরেক্যুদাহরণম্।" যথা—ধূম সত্বে বহ্নির সত্বা যেমন মহানসে, এই অন্বয়ির উদাহরণ। মেঘাভাবে বৃষ্টির অভাব এই ব্যতিরেকী উদাহরণ। চতুর্থ অবয়ব উপনয়, ইহার অর্থ সাধ্য পক্ষেতে উদাহরণাপেক্ষ উপসংহার, যথা "পর্ব্বতে উদাহরণবৎ ধূমের সত্বা" পঞ্চম অবয়ব নিগমন, ইহার অর্থ হেতু স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি যথা পর্ব্বত বহ্নিবান্। চতুর্থ ও পঞ্চম অবয়ব ক্রমশঃ দ্বিতীয় এবং প্রথমের প্রতিপাদন পূর্ব্বক দ্বিরুক্তি, যাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

গৌতম পরমাণুবাদ লইয়া জগতের স্থিতি ভঙ্গের কারণ উৎপন্ন করিয়াছেন। তিনি যদিও বেদকে প্রামাণ্য ও কোন অদ্বিতীয় পুরুষ রচিত বলিয়া স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহার পুনর্জন্ম ও পরমাণুবাদে তাহা এক প্রকার অগণ্য করিয়া তুলিয়াছেন। গৌতম বলেন 'অকারণবত্নিত্যং।' পরমাণুর উৎপত্তি নাই, সুতরাং তাহা নিত্য এবং সৃষ্টি প্রকরণে লিখিয়াছেন "ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।" ঈশ্বর একক কারণ নহেন, কেন না পুরুষ-কর্ম্মাভাবে ফল-নিষ্পত্তি হয় না, ইহা কেবল পুনর্জ্জন্মবাদবশাৎ অসামঞ্জস্য হইয়াছে। কেন না ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করিয়া প্রাক্তন কর্ম্মকেই তাঁহার সহকারী করিলেন। জৈমিনিও কর্ম্মকেই মূল বলিয়া মীমাংসাতে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কণাদ স্পষ্টতঃ অদৃষ্টবাদী তাহা পরে তদ্দর্শনে বিবৃত করা যাইবে। গৌতম আত্মার নিত্যত্ব স্থাপন করিবার প্রতিজ্ঞায় কহিয়াছেন যে তাহার আদিও নাই অন্তও নাই।

অনাদিত্ব বিষয়ের হেতুবাদ এই যথা "পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষ ভয়-শোক-সম্প্রতিপত্তেঃ" অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যা-

সের স্মৃতির অনুবন্ধে সদ্যোজাত শিশুর হর্ষ ভয় শোক হইয়া থাকে। এই সূত্রের উপর বৃত্তিকার সন্দিহান হইয়া আপত্তি শঙ্কা করিয়াছেন যথা "পদ্মাদিষু প্রবোধঃ সম্মীলন-বিকারবত্তদ্বিকারঃ॥ ২০ সূত্র। বৃত্তির অর্থাৎ বালকের হর্ষ-শোকাদি-জাত মুখ-বিকার পদ্মাদির বিকাসাদির ন্যায় অপর দ্রব্যাদি বিশেষাধীন হইতে পারে, পূর্ব্ব জন্ম-সংস্কার বশতঃ নহে, গৌতম এ আপত্তির এই রূপে নিরাকরণ করিয়াছেন, যথা "উষ্ণ শীত বর্ষা কাল নিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্মক বিকারাণাং।" অর্থাৎ পূর্ব্ব পক্ষের আপত্তি কোন কাজের নয়। যেহেতু উষ্ণ শীতাদি ঋতু দ্বয়ের পঞ্চ ভূতের বিকার সম্ভবে।

নৈয়ায়িকেরা ত্রিবিধ কারণ স্বীকার করেন, যথা "অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ব-বর্ত্তিতা। কারণত্বংভবেত্তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতং। সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বং।" ইত্যাদি- অর্থাৎ অন্যথাসিদ্ধি শূন্য পদার্থের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতাই, কারণ, আর সই কারণ ত্রিবিধ সমবায়ি, অসমবায়ি, এবং নিমিত্ত কারণ।

উদাহরণ। যাহা সমবেত হইলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই তাহার সমবায়ি কারণ, তাহাতে আসন্ন যাহা তাহা অসমবায়ি কারণ, এবং এ উভয় হইতে পৃথক্ যাহা তাহা নিমিত্তকারণ। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে গৌতম বলেন উহা কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, "পূর্ব্বকৃত-ফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ।" গৌতম সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্বের আভাস যেমন অল্প মাত্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি পরমাণুবাদও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে এ জগতের রচয়িতা ঈশ্বর কি ইহা পরমাণু-সমষ্টির অভিঘাতে রাসায়নিক যোগে উৎপন্ন তাহা স্পষ্টতঃ লিখেন নাই।

"তৎকারিত্বাদহেতু" জগৎ ঈশ্বরের কারিত হওয়াতে পুরুষ-কর্ম্ম অহেতু হইল। এবং উদ্যোতকর মিশ্রের টীকানুসারে গৌতম ঈশ্বরকে অদৃষ্টের প্রতিযোগী করিয়া অদৃষ্টকে অহেতু করিয়াছেন, মহর্ষি গৌতম মোক্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তদীয় ষোড়শ পদার্থজ্ঞানে মুক্তি হয়, তিনি জন্ম এবং প্রবৃত্তিকে মুক্তি-বাধক দোষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন যথা—

" দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ মিথ্যা
জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদ-
নন্তরাপায়াদপবর্গঃ॥

বাৎস্যায়ণ এই সূত্রের এই প্রকার অর্থ করিতেছেন (পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত ঐ সূত্রের অর্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।)

মিথ্যা জ্ঞান অনেক প্রকার, আত্মার বিষয়ে যে তাহা নাই. অনাত্মার বিষয়ে যে তাহা আছে, দুঃখে সুখজ্ঞান অনিত্যে নিত্যজ্ঞান অত্রাণে ত্রাণ, সভয়ে নির্ভয়. নিন্দিতে অভিমত, ত্যাগে অত্যাগ জ্ঞান, প্রবৃত্তি বিষয়ে যে কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম কর্ত্তে নাই, দোষের বিষয়ে যে দো-

সার দোষ নিমিত্ত নহে, প্রেত্যভাব বিষয়ে যে জীব জন্ম নাই, সত্ব আত্মাও নাই, যাহা মরণের পর পুনর্জাত হয়, জন্ম অনিমিত্ত, প্রেত্যভাবের আদি আছে কিন্তু অন্ত নাই, প্রেত্যভাব নৈমিত্তিক, অতএব কর্ম্ম নিমিত্ত নহে, প্রেত্যভাব নিরাত্মক, কেননা তাহাতে দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, বেদনার বিস্তার এবং উচ্ছেদ আছে, অপবর্গ ভয়ানক, কেন না ইহাতে সকল কর্ম্মের লোপ, অতএব কোন বুদ্ধিমান্ লোক সর্ব্ব-সুখভ্রষ্ট ঐ অচৈতন্য মুক্তির অবস্থা সুঙ্খা করিবেক।

"এই মিথ্যা জ্ঞানেতে অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ, প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মে এবং রাগ দ্বেষের অধিকৃত অসূয়া ঈর্ষা, মায়া, মদ, অভিমান লোভ ইত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয়, দোষাশ্রিত হইলে শারীরিক প্রবৃত্তি দ্বারা লোকে হিংসা, চৌর্য্য, লাম্পট্য আচরণ করে, মুখে মিথ্যা কটু এবং নিন্দা বাক্য কহে, মনেতে পরহিংসা, পরদ্রব্যে লোভ এবং নাস্তিক্য ভাব ধারণ করে, এই পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি হইতে অধর্ম্ম সম্ভবে, কিন্তু শরীরের দ্বারা দান, পরিত্রাণ, পরিচর্য্যা করা, মনেতে দয়া, মুখেতে সত্য হিত, প্রিয় বাক্য বলা এবং বেদাধ্যয়ন করা, শ্রদ্ধা করা, এবং নিস্পৃহ হওয়া ইহাতে ধর্ম্ম সম্ভবে; এই প্রবৃত্তি সাধন ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তি শব্দেতে উক্ত হয়। যেমন অন্ন সাধন প্রাণ অন্ন শব্দে বাচ্য হয়, এই প্রবৃত্তি কুৎসিত এবং অভিপূজিত জন্মের কারণ। শরীর, ইন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধির সাকায় প্রাদুর্ভাবকে জন্ম কহে, জন্ম হইলে দুঃখ হয়, তাহাতে অনিষ্ট, বেদনা, বোধ, পীড়া অনুভূত হয়। এই সকল মিথ্যা জ্ঞানাদি দুঃখ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন প্রবর্ত্তমান্ ধর্ম্মকে সংসার কহা যায়।

"কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তখন মিথ্যা জ্ঞানের নাশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, প্রবৃত্তির নাশে জন্ম নষ্ট হয়, জন্মের নাশে দুঃখ নষ্ট হয়, দুঃখের নাশে আত্যন্তিক অপবর্গ, তাহাই নিশ্রেয়সঃ অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ, তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা মিথ্যা জ্ঞানের বিপরীত কহাতেই হইল"। গৌতম সূত্র ও তদ্ব্যাখ্যাকার বাৎস্যায়ন উত্তম কহিয়াছেন কেন না সংসারের যথার্থ আখ্যান করা যায় তবে তাহাকে অমঙ্গল ব্যতীত আর কি কহা যাইতে পারে, আমরা যে পাঞ্চভৌতিক শরীর ধারণ করি যদিও তাহা প্রমোদ-মত্ত মানবের নয়নে রমণীয় বোধ হয় তথাপি তাহাকে নশ্বর ব্যতীত আর কোন নাম দত্ত হইতে পারে, বাস্তবিক শরৎকালীন মেঘ গন্ধর্ব্ব নগর এবং অচিরপ্রভা সৌদামিনীতে যে 'স্থৈর্য্য আরোপ করিতে পারে সেই শরীরেতে বিশ্বাস করুক যথা "তড়িৎসু শরদম্বুষু গন্ধর্ব্ব-নগরেষু চ স্থৈর্য্যং যেন বিনির্ণীতং স বিশ্বসিতু বিগ্রহে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট-

তঃই বোধ হয় যে সংসার ক্ষণস্থায়ী ও শরীরও ক্ষণভঙ্গুর, তবে যে দীর্ঘ আয়ুব কামনা করিয়া থাকি সে মোহ প্রযুক্ত, যাহারা দীর্ঘায়ুর প্রার্থনা করে তাহারা বিষয়-কালসর্পের সঙ্গে বিষাক্ত-চিত্ত হইয়াছে। বোধ হয় মহাকবি বাল্মীকির এই শ্লোকটী মানব হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ হয়। যথা "পংক্তিবদ্ধেন্দ্রিয়পশুং ফল্গু তৃষ্ণা গৃহাঙ্গনং। চিত্ত ভৃত্য-"ক্লান্তানন্দং নেষ্টং "দেহ গৃহং মম।" সর্ব্ব সংসার দুঃখানাং তৃষ্ণৈকা দীর্ঘ-দুঃখদা। অন্তঃপুরস্থমপি যা যোজয়ত্যপি শঙ্কটে॥ জাতাস্ত এব জগত্যাং জন্তবঃ সাধু জীবিতাঃ। যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষা জঠর গর্দ্দভাঃ॥

অদ্বৈত রামায়ণ।

অর্থাৎ আমি এমত দেহ রূপ গৃহে বাস করিতে চাহি না যাহাতে বৃথা তৃষ্ণাই গৃহিনী, ইন্দ্রিয়গণই পশু, এবং চিত্তই ভৃত্য। অখিল সংসার-দুঃখের মধ্যে তৃষ্ণাই দীর্ঘ-দুঃখদায়িকা যাহা অন্তঃপুরের মধ্যেও স্ত্রীকে সঙ্কটে যোজনা করে। অতো তাঁহারাই সাধু, যাঁহারা এবম্ভূত কষ্টদায়ক সংসারে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন না, অবশিষ্ট সকলেই জঠর-গর্দ্দভ জানিবা। মহর্ষি গৌতম বলেন সংসার ইষ্টানিষ্ট সুখ দুঃখ ধর্ম্ম ধর্ম্মে মিশ্রিত, তন্নিমিত্ত সকলি ত্যাজ্য এবং অপবর্গই পরম পুরুষার্থ। অপবর্গের অর্থ কি বোধ হয় পাঠকবর্গ জানিতে ইচ্ছা করেন, গৌতম বলেন, "দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যা জ্ঞানের অপবর্জ্জন ইহাকেই অপবর্গ কহে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুখাবস্থা" লৌকিক ক্রিয়া কলাপ গৌতমের মতে অপবর্গের বাধক। তিনি যম নিয়মাদি যোগাভ্যাসের বিধি দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কিয়ৎ কালের নিমিত্ত অধর্ম্ম নিবারণার্থে, অপবর্গ লাভার্থে নহে। ধর্ম্ম সাধনের ফলে যে অপবর্গের বাধা হয় তাহা তিনি এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পক্ষ "ঋণ ক্লেশ প্রবৃত্ত্যনু বন্ধাদপবর্গাভাবঃ" ন্যায় শূং অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্ম বশতঃ তিনটী ঋণগ্রস্থ হয়েন, ব্রহ্ম চর্য্যার্থে ঋষিদের, অপত্যার্থে পিতৃলোকের যজ্ঞার্থে দেবতাদের। এই সকল ঋণ পরিশোধ করিলে পুণ্য হয়, সুতরাং তৎফল ভোগার্থে স্বর্গাদি গমন পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম আবশ্যক। পরে অন্য এক পূর্ব্ব পক্ষ স্মরণ করেন "নন্বগ্নিহোত্রস্য প্রতিবন্ধক ত্বেপতৎ ফলং স্বর্গ এবাপবর্গ প্রতিবন্ধকঃস্যাৎ" অগ্নিহোত্রের ফল স্বর্গ তাহাও তো অপবর্গের প্রতিবন্ধক। ইহার উত্তরে বলেন "পাত্রচযান্তানুপপত্তেশ্চফলাভাবঃ।

"ব্রাহ্মণের অন্তিম আশ্রম ভিক্ষুত্ব" সে আশ্রমে যজ্ঞের শ্রুচাদি পাত্র সঞ্চয় সম্ভবে না, পাত্রাভাবে জ্ঞানীর যজ্ঞ সম্পাদনা ভাব সুতরাং তৎফলাভাব, যজ্ঞের সঙ্কল্পাভাব না থাকাতে অধর্ম্মাভাব। অতএব ঐ আশ্রমে জ্ঞানির পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাভাব প্রযুক্ত অপবর্গের প্রতি

বন্ধক হয় না, ন্যায় শাস্ত্রের মূল কথা এই যে চতুর্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারো অপবর্গ লাভের অধিকার নাই। অতএব ন্যায়দর্শন মতে বেদ কোন মহান্ পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত, এবং অপবর্গই ফলমাত্র মোক্ষ তদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আমাদিগের গৌতম প্রণীত ন্যায়শাস্ত্র দেখিয়াই ইউরোপীয় গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেন। মহর্ষি গৌতম এই ন্যায়দর্শনের বীজ মাত্র রোপণ করেন। পরে সেই বীজ মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের প্রযত্নে অঙ্কুরিত হয়। তৎপরে ক্রমে২ শাখা প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া দিগ্-দিগন্তব্যাপী নর্ম্মদা তীরস্থ কবীর বটবৃক্ষের ন্যায় হইয়াছিল, এই ন্যায় দর্শন মহর্ষি গৌতমের অসাধারণ চিন্তাশীলতা ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের ফল। ভারতবর্ষীয় সমস্ত জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালী এই ন্যায়দর্শনে বিশেষ দক্ষ। এমন কি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়স্থ লোকও এই বঙ্গ-ভূমিতে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ভারতে ন্যায়শাস্ত্র ছিল না, কেবল মাত্র মিথিলাতে এক খানি গ্রন্থ ছিল, তত্রত্য পণ্ডিতগণ সমীপে কোন যুবক পাঠার্থী হইলে তাহাকে গ্রন্থ দিতেন না, পাছে প্রবাসী শিষ্যবর্গ ন্যায় শাস্ত্রখানি লইয়া দেশে বহুল প্রচার করে, কিন্তু তাঁহাদিগের চতুরতা বঙ্গকুলতিলক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির স্মরণশক্তির নিকটে পরাভূত হইয়াছিল। শিরোমণির পাঠ সমাপ্ত হইলে তাঁহার আচার্য্য পক্ষধর মিশ্র ন্যায়গ্রন্থখানি কাড়িয়া রাখেন। তখন পণ্ডিত রঘুনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, গুরো। পত্রস্থ অক্ষর আপনার নিকটে রহিল, কিন্তু আমার হৃদ্-প্রস্তরে যে ন্যায়দর্শনের জ্ঞান অঙ্কিত হইয়াছে তাহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। এই কথা বলিয়া গুরুর নিকট হইতে স্বদেশে আসিয়া প্রথমেই ন্যায়দর্শনখানি লিপিবদ্ধ করেন। কি অদ্ভুত মেধা। কি চমৎকার স্মৃতিশক্তি! যে ন্যায়দর্শন বাদার্থ 'প্রভৃতি শাস্ত্র হইতেও প্রগাঢ়, পণ্ডিতবর রঘুনাথ তাহা আদ্যোপান্ত অভ্যস্ত করিয়া আপনার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পরে কোন সময়ে স্বীয় গুরু পক্ষধর মিশ্রকে ন্যায়শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, কি সুখের বিষয় যে আমাদের বঙ্গদেশে এমন মহা পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি এই মহাত্মা না জন্মিতেন তবে কোন দিনই বাঙ্গালীগণ ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করিতে সমর্থ হইতেন না। আবার যদি আমাদিগের ভারতবর্ষে মহর্ষি গৌতম না জন্মিতেন ও ন্যায়দর্শন না লিখিতেন তবে অদ্যাপি ইউরোপীয়েরা ন্যায়দর্শন কি পদার্থ তাহা জানিতে পারিতেন না। অতএব ধন্য আমাদের দেশ ও ধন্য দেশবাসী মহর্ষিগণ! কিন্তু আমরা এক্ষণে তাঁহাদিগের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম নই, আমরা

যে সিংহের উদরে শৃগাল জন্মিয়াছি। নচেৎ যে দেশের শাস্ত্র লইয়া চির-অসভ্য জাতিরা সভ্য ও বিদ্বান বলিয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইতেছেন, আমরা সেই দেশে সেই আর্য্যকুলে জন্মিয়া কেন মূর্খ কাপুরুষ হইলাম। জগদীশ যে ভারতের প্রতি বাম ও ভারতবাসীর প্রতি অপ্রসন্ন তাহা কর্য্যেই দেখা যাইতেছে। দেশীয় মহাত্মগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ গ্রন্থগুলি নয়ন পথে পতিত হইলে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া আসিতে পারা যায় না,—অদ্য এই পর্য্যন্ত।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন
কুষ্টীয়া—

—— oo ——

ওয়াসিংটন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যখন ইংলণ্ড বলদর্পে অন্ধ হইয়া আমেরিকার অধিবাসিদিগের সম্মতি না লইয়া তাহাদিগের উপর অন্যায় কর নির্দ্ধারণ করেন, তখন সমস্ত আমেরিকা একবাক্যে ইংলণ্ডের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ইংলণ্ড সে প্রতিবাদে কর্ণপাত না করায়, আমেরিকা যখন স্বাধীনতা স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন, তখন আমেরিকায় সে ঐক্য রহিল না। তখন সাধারণ-তান্ত্রিক দল ও টোরী বা রাজতান্ত্রিক দলে আমেরিক হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত হইল। নিউইয়ার্কে রাজতান্ত্রিক দলের এত প্রাদুর্ভাব ছিল, যে সাধারণ-তান্ত্রিক দলের রক্ষার নিমিত্ত কনেক্‌টিকট্ হইতে সৈন্য আনয়ন করিতে হইয়াছিল। অধিক কি নিউ ইয়র্কের রাজ-তান্ত্রিক দল ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল্ গেজের সাহায্যার্থে অনেক সৈন্য প্রেরণ করেন, এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন সেনাপতি হাউ আমেরিক উপকূলে অবতরণ করেন, তখন অনেকে প্রকাশ্যরূপে আনন্দ প্রকাশ, রাজবশ্যতা-সূচক শপথ পুনঃ গ্রহণ, ও রাজানুকূলে অস্ত্র গ্রহণ করেন। নিউ জার্সেতেও ঠিক এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এরূপ অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে ওয়াসিংটনের নিরাপদে অবস্থিতি অসম্ভব

হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভুকে তাঁহাকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত একটী ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, এবং সেই ষড়যন্ত্রে তাঁহার নিজ পারিপার্শ্বিকেরাও লিপ্ত ছিলেন। ম্যারীল্যাণ্ড, জর্জিয়া, ক্যারোলিনা প্রভৃতিও দুই দলে বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই আভ্যন্তরীণ বিবাদে মহাসভা (কাঙ্গ্রেস) ও প্রাদেশিক শাসনসমিতি সকল প্রথমে অত্যন্ত ধীরতা ও অনুদ্ধতার সহিত চলিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বাধীনতা-প্রতিবাদিগণের কার্য্যকলাপ উপেক্ষা করিয়া তদনুকূল পক্ষের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিতে লাগিলেন। সাহায্যদানে অস্বীকৃত প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য না চাহিয়া প্রকাশ্য পত্রে লিখিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র চিঠি লিখিয়া, প্রকাশ্য সভা করিয়া, ও স্থলবিশেষে দূত প্রেরণ করিয়াও স্বাধীনতার অনুকূলে প্রতিপক্ষদিগকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং বলবতী যুক্তিপরম্পরা দ্বারা তাঁহাদিগের কার্য্যের আবশ্যকতা ও ন্যায়বত্তা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

ন্যস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণে অনিচ্ছা, রাজভক্তি, মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা, চিরাগত বস্তুজাতের প্রতি শ্রদ্ধা, ও শৃঙ্খলাপ্রেমই রাজতান্ত্রিকদলের উৎপত্তি ও স্থিতির মূল। সেই সকল গুণের অস্তিত্ব নিবন্ধন রাজতান্ত্রিক দলের প্রতি কাহারও অশ্রদ্ধা ছিল না। সাধারণতান্ত্রিক দল এই জন্য প্রথমে ইঁহাদিগের প্রতি আর কিছু না করিয়া শুদ্ধ ইঁহাদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন, কদাচ বিরুদ্ধাচরণ দেখিলে নিবারণ করিতে লাগিলেন মাত্র। কিন্তু ঘটনাস্রোতে পড়িয়া, ভাবী বিপদ আশঙ্কায়, সময়ের আবশ্যকতায়, ও দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির উত্তেজনায় তাঁহাদিগকে অচিরে কঠোরতর নীতি অবলম্বন করিতে হইল। ধৃতকরণ ও নির্বাসন ঘন ঘন হইতে লাগিল, কারাগার সকল অচিরে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সম্পত্তি জাতীয় কোষজাতকরণও আরম্ভ হইল। সাধারণ রক্ষাবিধায়িনী সমিতি সকল শুদ্ধ লোকের কথা মাত্র শুনিয়া প্রতিপক্ষদলের স্বাধীনতা হরণ করিতে লাগিল। সাধারণ জনগণের অত্যাচার আরও বেশী হইতে লাগিল। নিউইয়র্কের এক জন মুদ্রাকর রাজকীয় দলের অনুকূলে কিছু মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া কানেকটিকট হইতে এক দল অশ্বারোহী আসিয়া তাহার প্রেস ও অক্ষর সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। সর্ব্বত্র বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার ভাব উদ্দীপিত হইল। জর্জিয়া, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, কানেকটিকট ও পেনসিল্‌ভেনিয়া প্রভৃতিতে এই সংঘর্ষ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। এই উদ্যমের স্বাপক্ষ্যে ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুমোদন সত্ত্বেও, এবং অধিনেতৃবৃন্দ বিচক্ষণ ও ধার্ম্মিক হইলেও স্বাধীনতা পক্ষীয়দিগকে অন্তর্বিদ্রোহের সমস্ত অশুভ ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

জাতীয় দলকে দিন দিন অধিকতর কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। তাঁহাদিগের অভ্যুত্থানের লক্ষ্য এত পবিত্র যে, সে লক্ষ্যে জনসাধারণ অধিক দিন পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিল না। প্রথম অভ্যুত্থানকালে সর্ব্বত্র ঐকমত্য ছিল। তখন জাতীয় প্রাকৃতিক স্বত্ব ও জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত সকলেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যতই কেন অনুকূল হউন না, এরূপ গুরুতর কার্য্য দীর্ঘ কাল-সাধ্য; সুমহৎ কার্য্যে কৃতকার্য্যতা ক্ষিপ্রগতি নহে, এ দিকে জনসাধারণের ধৈর্য্যও অধিক দিন থাকিবার নহে; অল্প দিনের মধ্যেই জনসাধারণ অধৈর্য্য ও আলস্যে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই সময় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে— ওয়াসিংটন বার বার রাজার নিকট আবেদনপত্র পাঠানোর ব্যর্থতা প্রতিপাদন করিয়া এইরূপ উদ্দীপক বাক্যে স্বজাতি-সাধারণকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন "আমি বিবেচনা করি, অন্ততঃ আশা করি, যে এখনও আমাদিগের মধ্যে এরূপ জাতীয় ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে, যাহার বলে আমরা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়াও কষ্ট সঞ্চিত ধনে এই সুমহৎ লক্ষ্য সংসাধন করিতে পারিব। এই লক্ষ্য সংসাধনে আমাদিগের জাতীয় অধিকার আছে, এবং যতক্ষণ না আমরা সম্পূর্ণ দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছি, ততক্ষণ কোন পার্থিব প্রভুশক্তিই আমাদিগকে এ লক্ষ্য হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না" *।

এরূপ মহতী আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইবার সম্পূর্ণ উপযোগিনী, কিন্তু যে জাতি-সাধারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্য বিনা তাহা অসম্ভব, সে জাতি-সাধারণ তাদৃশী উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হয় নাই। হতাশতা কার্য্যে অর্দ্ধ-হৃদয়তা এবং অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য করণ-জনিত শ্রমের পরিহার-ইচ্ছা—এই সকল অশুভনিচয়ের বিরুদ্ধে অধিনেতৃবৃন্দের সতত ঘোরতর রণ করিতে হইয়াছিল। আত্মোৎসর্গের জাজ্জ্বল্যমান ভাব কেবল সেই অধিনেতৃবৃন্দের মধ্যেই দেদীপ্যমান ছিল। অন্য অন্য দেশে এরূপ বিপ্লবকালে অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের স্রোত জনসাধারণ হইতেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে সংক্রামিত হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকায় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীকেই স্বাধীনতার অনুকূলে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে হইয়াছিল। সিবিল বিভাগে সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী, সমৃদ্ধ বণিক্ ও মাজিষ্ট্রেটগণ এবং সৈন্যবিভাগে উচ্চ কর্ম্মচারিগণই স্বাধীনতার অবিচলিত ও সুদৃঢ় বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা জনসাধারণকে যাহা উপদেশ দিতেন, অগ্রে তাঁহারা তাহা কার্য্যে দেখাইতেন; তথাপি জনসাধারণ তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে পারিত না। স্বাধীনতা-যুদ্ধের তৃতীয় বৎ-

* ওয়াসিংটনের বচনাবলী, ২য় খণ্ড। পৃ ৩৯৫।

সরে ওয়াসিংটন্ কর্ম্মচারী মনোনীত করণ বিষয়ে জাতীয় সেনাপতি কর্ণেল বেলবাকে এই উপদেশ প্রদান করেন "কর্ম্মচারী মনোনীত করণ বিষয়ে আমি তোমাকে বিশেষ সতর্ক হইতে বলি। ভদ্রলোক ব্যতীত আর কাহাকেও কর্ম্মচারী মনোনীত করিও না*।" ওয়াসিংটন জানিতেন যে উচ্চ শ্রেণীই স্বাধীনতার একান্ত পক্ষপাতী, এবং তাঁহারাই স্বাধীনতা-সমরের কৃতকার্য্যতার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে ও শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সহ্য করিতে প্রস্তুত।" তিনি জানিতেন যে ঘরের খাইয়া লড়িতে কেবল তাঁহারাই সমর্থ, কারণ ষ্টেট্ তাঁহাদিগের খাদ্যের আয়োজন করিতে অক্ষম। আমেরিক সেনার ন্যায় কষ্ট যন্ত্রণা আর কোন সেনাকে কখন পাইতে হয় নাই। সংখ্যায় সতত হীন, বিশ্বাসঘাতকদিগের পলায়নে মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর, অতি বিস্তৃত অকৃষ্ট বিজন প্রদেশে শূন্য খাদ্যাগার, শূন্য কোষাগার, শূন্য অস্ত্রাগার লইয়া কখন চলিতে, কখন শিবির সন্নিবেশ করিতে, কখন বা যুদ্ধ করিতে বাধা; শান্তিসময়ে দুর্গস্থিত সেনার ন্যায় প্রজাসাধারণের ধন প্রাণের প্রতি সবিশেষ যত্নবান্, সুতরাং এরূপ সেনার যে কষ্টের ইয়ত্তা ছিল না তাহা বলা দ্বিরুক্তিমাত্র।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন্ কংগ্রেসের সভাপতিকে সৈন্যদিগের অবস্থা বর্ণন করিয়া এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন:—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শীঘ্র কমিসেরিয়েটের সুশৃঙ্খলা বিধান না করিলে, এই সেনাকে এই তিনটী গতির অন্যতম আশ্রয় করিতে হইবে—হয় ইহাকে অনশনে মরিতে হইবে, নয় বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, অথবা যে কোন প্রকারে খাদ্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে হইবে। জানিবেন যে ইহা অতিরঞ্জিত চিত্র নহে, আমি যাহা বলিতেছি তাহা প্রতিপন্ন করিবার আমার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই দুরন্ত শীতে আমাদের সেনার কি দশা হইবে? যখন এখন হইতেই আমাদের খাদ্যাগার বার বার শূন্য হইতে লাগিল, বসন্তকালে যখন সমস্ত সৈন্য একত্র সমবেত হইবে তখন আমাদের দশা কি হইবে? কিরূপে শত্রুসেনা পরিবর্দ্ধিত হওয়ার পূর্ব্বেই আমাদের সেনা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে? এই সকল গুরুতর বিষয় নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম চিন্তার বিষয়। যখন এই উদ্যমের কৃতকার্য্যতার সহিত আমার নাম ও খ্যাতি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, তখন কমিসেরিয়েটের সুব্যবস্থার নিমিত্ত আমাকে বিশেষ উত্তেজনা করিতে হইতেছে। আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে আর কোন সময়ে কোন সেনাপতিকে বোধ হয় আমার মত প্রতি পদে এত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

"আজ গণনা দ্বারা সংখ্যা করা গিয়াছে দুই সহস্র আট শত সৈন্য পাদুকা ও

* ওয়াসিংটনের রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড। পৃ ২৬৯।

বস্ত্রের অভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া শিবিরে অবস্থিতি করিতেছে।

"সৈন্যেরা শীতকালে ছাউনী করিয়া থাকিবে কি না না জানিয়াই অনেক সভ্য অগ্র হইতেই তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারা মনে করেন যে সৈন্যেরা পাষাণে নির্ম্মিত এবং হিম ও বরফে তাহাদিগের চেতনা উদ্দীপিত হয় না। বোধ হয় তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে আমাদের সৈন্যের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া তাদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুযোজিত মহতী সেনাকে ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে আবদ্ধ রাখিয়া পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া ও জারসী প্রদেশকে ধ্বংশ ও লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করা সম্ভবপর। কিন্তু আমি সেই সভাগণকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, যে সুখকর গৃহের অভ্যন্তরে অগ্নিপার্শ্বে বসিয়া তিরস্কারপূর্ণ পত্র লেখা বড় সহজ, বিনা বস্ত্রে, বিনা কম্বলে বরফ শয্যায় বরফ-জলে শীতক্লিষ্ট পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করা তত সহজ নহে। যাহা হউক সেই দুঃখ-প্রপীড়িত বিবস্ত্র সৈনিকগণের দুঃখে তাঁহারা কাতর না হইতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগের যে দুঃখ দূর বা নিবারণ করা আমার সাধ্যাতীত—আমি তাহাদিগের সে দুঃখের সহিত সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারি না।" *

* ওয়াসিংটনের রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড। ১৯৯ পৃষ্ঠা।

ওয়াসিংটন যে কংগ্রেসের নিকট সাহায্য চাহিলেন, সে কংগ্রেসও তাঁহার ন্যায় সে সাহায্য দানে অক্ষম। তাঁহার এমন শক্তি নাই যে, বলপূর্ব্বক তাহার আদেশ প্রতিপালন করান; এমন বৈধিক প্রভুতা নাই যে, তাহার বলে ধন ও খাদ্য সংগ্রহ করেন; সুতরাং বিদেশ ষ্টেট্‌সের নিকট এই সকল অবস্থা ব্যক্ত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা ব্যতীত ইহাঁর আর উপায়ান্তর ছিল না: কিন্তু সে ষ্টেট্‌স সকলের অবস্থাও অতি শোচনীয় ছিল। অর্থশূন্য প্রজা, নষ্টপ্রায় বাণিজ্য, কাগজের নোটের প্রতি লোকের অনাস্থা,—তথাপি কংগ্রেস ষ্টেট্‌স সকলের শরণাপন্ন না হইয়া আর কিছুই করিতে পারিলেন না, এবং ওয়াসিংটনের উপর ক্ষমতা প্রদান করিলেন যে, তিনি যে কোন প্রকারে অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

ওয়াসিংটন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই এক গুরুতর বিপৎ প্রাপ্ত হইলেন। এত দিন কোন প্রভুতাকেন্দ্র ষ্টেট্‌স সকলকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করে নাই। এত দিন ষ্টেট্‌স সকল স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন আভ্যন্তরীণ কার্য্য চালাইয়া আসিতেছিলেন। পরস্পর-সাপেক্ষতা কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না; বরং পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষপূর্ণ ছিলেন এবং সু-

নিধা পাইলেই পরস্পরের সীমা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেন। পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এইরূপ বিভিন্ন-লক্ষ্য-বিশিষ্ট বিদ্বেষপূর্ণ জিগীষাপরবশ প্রদেশ সকলকে এক কেন্দ্রীভূত প্রভুতার অধীনে আনিতে চেষ্টা করার উদ্যম সহজ নহে। বিশেষতঃ সৈনিকবিভাগের উপর ষ্টেট্‌স সকলের ঈর্ষানল অধিকতর উদ্দীপিত হইল। তাঁহারা আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, যে মহতী সেনা এক্ষণে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা যদি যুদ্ধাবসানে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রজাপুঞ্জের সহিত মিশাইয়া না যায়, তাহা হইলে যে সেনা বৈদেশিক অধীনতা হইতে দেশকে উদ্ধার করিল, সেই সেনা হইতেই ষ্টেট্‌স সকলের আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য ও অধিবাসিবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে। বস্তুতঃ চিরস্থায়িনী সেনা যে জাতীয় আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার প্রতিকূল, আধুনিক রাজনীতিজ্ঞেরা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। যে স্বদেশ-প্রেমিক মনীষিগণ বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারাও জাতীয় সেনার শিক্ষা ও উৎসাহে সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে লাগিলেন। সুতরাং, ওয়াসিংটনের এক মাত্র আশাস্থলও নৈরাশ্যের আকর হইয়া উঠিল।

এদিকে যে সেনাদলের উপর সকলেরই এতদূর অবিশ্বাস, তাহাদিগের মধ্যেই অবাধ্যতা ও স্বাধীনতার ভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। আদিষ্ট মাত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সৈনিক জীবনের অপরিহার্য্য ভূষণ। কিন্তু ওয়াসিংটনের প্রত্যেক আদেশে আপত্তি উঠিতে লাগিল। প্রত্যেক সৈনিকদল আপনাপন দলের সুবিধানুযায়ী স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইল। প্রত্যেক ষ্টেটের সেনাবিভাগ আপন আপন বিদেশীয় সেনাপতির আদেশ ব্যতীত পাদমাত্র অগ্রসর হইবে না; প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ আপন আপন মনোনীত কর্ম্মচারী ব্যতীত আর কাহারও আদেশ প্রতিপালন করিবে না। পরাজয়ের পর যখন ভবিষ্যৎ জয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, বিজয়ের পর যখন শত্রুদিগের অনুসরণ করিতে হইবে, তখন সেনাদল জাতীয় সেনাপতির আদেশ অপেক্ষা না করিয়াই আপন ইচ্ছামত ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। আমেরিক বিপ্লবের ন্যায় ন্যায়ানুমোদিত ঘটনা যে সকল বাধা বিপত্তি ও কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় ভয়ে ও সন্দেহে পরিপূরিত হয়। বিপ্লবকালে সমাজের অন্তর্নিহিত নৈতিক ও প্রাকৃতিক শুভ ও অশুভ উভয়-প্রকার উপাদান-সামগ্রীই পূর্ণ-বিকশিত হয়। অশুভ শুভকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু

পরিণামে শুভেরই বিজয় লাভ হয়। প্রথমে শুভ ও অশুভ এরূপ বিমিশ্রিত হইয়া থাকে যে, বিপ্লবেরই প্রতি লোকের ঘৃণা জন্মিয়া উঠে। কিন্তু কালে যখন অশুভ সম্পূর্ণ নিরস্ত হয়, তখন মঙ্গলের নিদান বলিয়া বিপ্লবের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা জন্মে। যখন অশুভের পূর্ণ নিরসনে ও শুভের পূর্ণ বিকশনে বিপ্লবের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা জন্মে, তখনই বিপ্লব কৃতকার্য্য হয়; তখনই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য সংসিদ্ধ হয়।

ফ্রাঙ্কলিন্,আডামস্, হামিলটন্,জেফারসন্, মাডিসন, জে, হেনরী, মেসন, গ্রীণ, নক্স, মরিস্, পিনকে, ক্লিণ্টন্, ট্রম্বল্, রুট্‌লেজ্ প্রভৃতি যে মহাত্মাগণ প্রাণাস্তপণে আমেরিকার স্বাধীনতা উদ্ধার ও আমেরিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপন করিয়াছেন, সেই মহাত্মাগণের নাম প্রাতঃস্মরণীয়; এবং যিনি, কি রণক্ষেত্রে, কি মন্ত্রভবনে, কি কুটীরে সকল সময়ে কার্য্যে ও বাক্যে তাঁহাদিগের অধিনেতৃত্ব করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা ওয়াসিংটন্ জগতের অধিকতর আরাধ্য, তাঁহার নাম অধিকতর স্মরণীয়।

যখন তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই গুরুতর কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন, যখন সমস্ত আমেরিকার আশানেত্র তাঁহার উপর পতিত ছিল, তখন তিনি বয়সে অতি নবীন ছিলেন।

উৎকলের প্রকৃতাবস্থা।

উৎকল দেশের প্রকৃতাবস্থা সাধারণে অবগত না থাকায় "উড়িয়া অথবা উড়িশ্যা নাম শুনিবা মাত্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন"। বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণের কুসংস্কার অপনোদন করিবার মানসে শীর্ষাঙ্কিত প্রস্তাবটী গত আশ্বিনের বঙ্গ-দর্শনে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু "অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ" ন্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঠকদিগকে প্রকৃত কথা বলিতে গিয়া তাঁহাদিগকে বিষম বিপদে ফেলিয়াছেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে ঐ ভ্রম-সঙ্কুল প্রস্তাবের উপর সম্পাদক মহাশয়ও টীকা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

উড়িশ্যা-পুরাবৃত্ত-লেখক হণ্টর সাহেবের মত এই যে "বর্ণ ভেদ হইবার

পূর্ব্বে আর্য্যজাতি উৎকল ও বঙ্গদেশে বাস করিতেছিলেন, তজ্জন্যই মনু-নির্দ্দিষ্ট চতুর্ব্বর্ণ এই দুই দেশে নাই"। আমাদের দীননাথ বাবু ইহার প্রতিবাদ করিয়া হণ্টরের মতকে ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই। আমরা বঙ্গদেশের কথা বলিতেছি না, কিন্তু উৎকল দেশ সম্বন্ধে হন্টর যাহা লিখিয়াছেন তাহা অযথার্থ বলিয়া কখনই বোধ হয় না। বর্ণভেদ হইবার পূর্ব্বে আর্য্যজাতি যে উৎকল দেশে বাস করিতেছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা অন্য প্রমাণ সংগ্রহের আবশ্যক নাই স্বয়ং মনুই ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ-স্থল। কারণ মনু কিছু নূতন ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই। কেবল দেশ-প্রচলিত ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র *।

মনু যে স্থলে ঔড্র অর্থাৎ উৎকলদেশবাসীদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন ১ তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে মনুর পূর্ব্বে উৎকলদেশে আর্য্যজাতিরা বাস করিতেন। আর উৎকলদেশ পুণ্য-ভূমি বলিয়া বহুকালাবধি বিখ্যাত অনেক প্রাচীন গ্রন্থের ভূরি ভূরি স্থলে এদেশের নাম উল্লেখ আছে ২। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে "পুরাণ সময়ের মধ্যম কালে উৎকল দেশে আর্য্যজাতি বাস করিতে আরম্ভ করেন" কিন্তু তাহা হইলে প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে উৎকলের নামোল্লেখ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

মনুর কাল নিরূপণ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নানা মত প্রকাশ করিয়া

---

* দেশ ধর্ম্মান জাতি ধর্ম্মান্
কুল ধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্
পাষণ্ডগণ ধর্ম্মাংশ্চ
শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান মনুঃ।
মনু ১ম অঃ ১১৮ শ্লোক।

১ পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ
কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ
পারদা পহ্লবা শ্চীনাঃ
কিরাতা দরদা খশাঃ।
মনু ১০ম অঃ ৪৪ শ্লোক।

২ প্রজাপতি স্তু চিত্তরং
শিশুমারসা বৈষ্ণবঃ
উপযেমে ভ্রমিং নাম
তৎসুতোবল্লবৎসরৌ।
ইডায়ামপি ভার্য্যায়াং
বায়োঃ পুত্র্যাং মহাবলঃ
পুত্রমুৎকলনামানং
যোষিদ্রত্নমজীজনৎ।
ভাগবত ৪র্থ স্কং ১০ম অং।

উৎকলাদর্শিতপথঃ
কলিঙ্গাভিমুখং যযৌ:
রঘুবংশ।

সুদ্যুম্নাচ দায়াদা
স্ত্রয় পরমধার্ম্মিকাঃ
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব
বিনতাশ্বশ্চ ভারত।
উৎকলস্যোৎকলা রাজন
বিনতাশ্বস্য পশ্চিমা।
হরিবংশ ১০ম অঃ।

উৎকলা মেখলা পৌণ্ড্রাঃ
কলিঙ্গাশ্চ সংযুগে।
ভাঃ উঃ ৪ অং

গিয়াছেন৩। যদিচ তাঁহাদের মত-সকলের সামঞ্জস্য নাই, তথাচ মনুসংহিতা যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কথা নাই; সুতরাং মনুতে যে স্থলে উৎকলের নাম উল্লেখ আছে সে স্থলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমাণ মতে উৎকল যে নূতন দেশ নহে এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

আর হণ্টার সাহেব যথার্থ কথা লিখিয়াছেন। এদেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই দুই জাতি নাই। উৎকলের "পুটুলি বেণিয়া" নামক জাতিকে কেহ কেহ বৈশ্য বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু কোন বিষয়ে ইহাদের সহিত বৈশ্য জাতির সাদৃশ্য নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "যে সময় আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিতেন সে সময় উৎকল দেশে কন্দ নামক জাতিরা বাস করিত। তখন রাজদণ্ডে দণ্ডিত আর্য্যগণের উৎকল নির্ব্বাসন ভূমি ছিল, এখন ঐ নির্ব্বাসিত আর্য্যেরা এদেশে বাস করিতেছেন" ইত্যাদি। তিনি আপন মতের পোষকতার নিমিত্ত মনুসংহিতার ৩৮০ শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। এটী কিন্তু দীনু বাবুর বিচিত্র দৃষ্টান্ত। কারণ মনুর ব্যবস্থা এই যে ব্রাহ্মণগণ অপরাধী হইলে তাহাদিগকে বনে পাঠাইয়া দিবে, উৎকলে পাঠাইয়া দিবে এমত কোন কথা নাই। আর তাহা হইলেও নির্ব্বাসিত ব্রাহ্মণেরা এদেশে বাস করিত, অন্যান্য জাতির বাস সম্ভব নহে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রমাণ করিতে চাহেন যে উৎকল দেশ নির্ব্বাসন ভূমি বলিয়া "বাঙ্গলাতে দক্ষিণ যমালয় বলে ও উৎকলে বৈতরণীনদীও আছে ইত্যাদি"। "দক্ষিণে যমালয়" এ প্রবাদটী যে কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে এমত নহে উৎকলেও প্রচলিত। তন্ত্রে দক্ষিণদিগের অধিপতি যম বলিয়া বোধ হয় সর্ব্বদেশে এই প্রবাদটী প্রচলিত আছে। উৎকলের বিতরণী, খর-স্রোতা, বালিহন্তা ও কাকাক্ষী নদীগুলি কালক্রমে বৈতরণী, খরসুয়া, বালণ্ডা ও কুয়াখাই এই অপভ্রংশ নামগুলি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্ততঃ এই কয়েকটী সামান্য কথা জানিয়া "উৎকলের প্রকৃতাবস্থা" লিখিতে বসিলে ভাল হইত।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "বহুকালাবধি উৎকল দেশে এক শ্রেণী পতিত ক্ষত্রিয় বাস করিতেছে, তাহাদিগকে "পাণ" বলে। পাণ শব্দ সংস্কৃত পৌণ্ড্রক শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।" দীনু বাবু ইহার কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। পাণেরা গ্রামান্তরবাসী অন্ত্যজ

৩ শ্লেগি ও সাথপস সাহেবের গণনায় খ্রীঃ শকের ১৩শত বৎসর পূর্ব্বে মনু রচিত হইয়াছে। শ্লেগেল সাহেবের মত মনু সংহিতা সেকেন্দর সাহার ৭ শত বৎসর পূর্ব্বে চলিত ছিল, কিন্তু অধ্যাপক উইলসন সাহেব সেকেন্দরের ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে মনু রচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আর অধ্যাপক সর উইলিয়ম জোন্স মনুর আরও প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন।

জাতি ইহাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে লোকে আপনাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করে। ইহারা সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করে, অতএব ইহাদিগকে পাণ বলে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে সকলের উন্নতি হইতেছে, কেবল উৎকলের পাণেরা পতিত অবস্থায় আছে।

এত দিনে কিন্তু দীন বাবুর কৃপায় গো-খাদক পাণেরা ক্ষত্রিয় পদ প্রাপ্ত হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পাণেরা পৌণ্ড্রক জাতি, কিন্তু "পৌণ্ড্রকা শ্চৌণ্ড্র দ্রাবিড়া ইত্যাদি" মনুটীকাকার কুল্লুক ভট্ট—ইহার এই প্রকার অর্থ করেন "পৌণ্ড্রাদি-দেশোদ্ভবাঃ"। বৃদ্ধ কুল্লুক ভট্টের দানা পাখি উঠিল দেখিতেছি।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ব্রাহ্মণের দাস উপাধি দেখিতে না পাইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন; সুতরাং উৎকলের দাস শর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগকে "আচার-ভ্রষ্ট পতিত" বিশেষণগুলি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভাল আমরা জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গলার সান্যাল, বটব্যাল, দিংসাই, পাকড়াশী ইহাঁরা তবে কি? যিনি উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে দাস শর্ম্মা উপাধিধারী ব্রাহ্মণেরা কোন অংশে গৌড়ীয় শ্রেণী হইতে ন্যূন নহেন *। বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "উৎকল শব্দ ভাববাচ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে"। তিনি কোন্ গ্রন্থ হইতে যে এই অমূল্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন তাহা তিনি জানেন। তাহাতেই আমরা বলিতেছি তিনি উৎকলের প্রকৃতাবস্থা লিখিতে কিছু দিন বিলম্ব করিলে ভাল হইত। উৎকলিঙ্গ (কলিঙ্গের উত্তরদিগস্থ দেশ) শব্দের অপভ্রংশ উৎকল; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সে স্থান হইতে এই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অসাধারণ অনুমান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে "বোধ হয় উৎকল প্রদেশে উপনিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্যই আর্য্য ঋষিগণ উৎকল প্রদেশের ঈদৃশ অত্যুক্তি-পূর্ণ বর্ণনা সকল করিয়াছেন"। আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিবাদ করিতে চাহি না। কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে যিনি কখন উৎকলের গড়জাত মহালে ভ্রমণ করিয়াছেন তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে কোন লেখনী উড়িশ্যার প্রকৃতি দেবীকে চিত্রিত করিতে পারে না। ইতি

শ্রীফকীর মোহন সেনাপতি
ঢেকানাল উড়িশ্যা।

* সারস্বতাঃ কাণ্যকুব্জাঃ
গৌড়-মৈথিল উৎকলাঃ।

যোগ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

সর্ব্ব-মঙ্গল বিধাতা মহাদেব যে সকল যোগের প্রত্যঙ্গগুলি শিবসংহিতায় বলিয়াছেন তৎসমুদায় নিতান্ত গোপনীয় ও ফলদায়ক হেতু সে সমুদায় প্রত্যঙ্গগুলি অভ্যস্ত না হইলে যোগ-সাধনার ফল লাভ হওয়া দুরূহ, কেবল পদে পদে বিঘ্ন ঘটে এ নিমিত্ত যোগ সাধনার সেই প্রত্যঙ্গগুলি এখানে লেখা যাইতেছে।

প্রাণায়াম একাদিক্রমে পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে তিন মাস করিলে যোগীর নাড়ী বিশুদ্ধি হয়। নাড়ী বিশুদ্ধি হইলে যোগীর শরীরে যত দোষ থাকে সকলি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া য সকল চিহ্ন হয় তাহা বলা যাইতেছে।

শিবসংহিতায়াং প্রমাণানি।

সমকায়ঃ সুগন্ধিশ্চ সুকান্তিঃ স্বরসাধকঃ॥ আরম্ভ ঘটকশ্চৈব তথা পরিচয় স্তদা। নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ॥

অসমকায় ব্যক্তি সমকায় হয় অর্থাৎ কৃশ স্থূল বা বক্র কুঞ্চিতাদি-রহিত হয়, গাত্রে উত্তম গন্ধ হয়, দেহে লাবণ্য জন্মে, পবনাভ্যাস যোগীর এই সকল চিহ্ন হয়। এই অঙ্গ পরিচয় সকল প্রকার যোগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই অবস্থার নাম যোগাবস্থা।

আরম্ভঃ কথিতোঽস্মাভিরধুনা বায়ুসিদ্ধয়ে। অপরং কথ্যতে পশ্চাৎ সর্ব্ব-দুঃখৌঘনাশকম্॥

আমাদিগের দ্বারা প্রাণায়াম সিদ্ধির নিমিত্ত আরম্ভ মাত্র কথিত হইল। অনন্তর সর্ব্ব-প্রকার দুঃখ নাশক অপর চিহ্ন গুলি পশ্চাৎ কহিব।

প্রৌঢ়বহ্নিঃ সুভোগী চ সুখী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ। সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্ব্বোৎসাহবলান্বিতঃ। জায়তে যোগিনোঽবশ্যমেতে সর্ব্বকলেবরে॥

প্রাণায়াম সাধক যোগীর নাড়ী শুদ্ধি হইলে বৈগুণ্য-রহিত জঠরানলের বৃদ্ধি হয়। সুন্দর রূপ ভোগে সমর্থ হয় এবং সদা সর্ব্বদা চিত্ত-সুখ রূপ দেশে ক্রীড়া করিতে থাকে। আর যোগীর সর্ব্বাবয়ব অতি সুন্দর হয়। এতদ্ভিন্ন যোগীর মন কদাচ ক্ষুণ্ণ হয় না। ইহা ভিন্ন সর্ব্ব-প্রকার উৎসাহ জন্মে এবং সবল শরীর হয়, যোগ সিদ্ধ হইলে এই সকল চিহ্ন যোগীর শরীরে দেখা যায়।

যোগের বর্জনীয় বিষয়।

অথ বর্জ্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরং। যেন সংসার-দুঃখাব্ধিং তীর্ত্বা যাস্যন্তি যোগিনঃ॥

অনন্তর যোগাভ্যাস কালে যোগ-বিঘ্নকর বর্জ্জনীয় বিষয় সকল কহিতেছি, যাহার

পরিত্যাগ দ্বারা যোগী সকল সংসার-ক্লেশ-সাগর হইতে অনায়াসে পার হইতে পারেন।

অম্লং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং
সার্ষপং কটুং। বহুলং ভ্রমণং
প্রাতঃ স্নানং তৈলং বিদাহকং॥
স্তেয়ং হিংসাং জনদ্বেষঞ্চাহঙ্কার-
মনার্জ্জবং। উপবাসমসত্যঞ্চ-
মোক্ষঞ্চ প্রাণিপীড়নং। স্ত্রীসঙ্গ-
মগ্নি-সেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়া-
প্রিয়ং। অতীব ভোজনং যোগী
ত্যজেদেতানি লক্ষণং॥

অম্ল, রুক্ষদ্রব্য, ঝাল, লবণ, সর্ষপ ও সর্ষপ-তৈলাদি, কটুদ্রব্য, অধিক ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলাদি দৈশত্যদ্রব্য, অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণ, প্রাণিহিংসা, দ্বেষ করা, অহঙ্কার করা, কৌটিল্য করণ, অনর্থ উপবাস করা, অসত্য ভাষণ, লোক পীড়ন, অমুক্তি চিন্তা, অতিশয় স্ত্রীসেবা, অবৈধ অগ্নিসেবা, সকলের সহিত অধিক আলাপ করা, অতিশয় ভোজন এই সকল কর্ম্ম যোগ-বিঘ্নকর। যোগীরা বিশেষরূপে এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন।

উপায়ঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগ-
স্য সিদ্ধয়ে। গোপনীয়ং সাধ-
কানাং যেন সিদ্ধির্ভবেৎ খলু॥

সাধকদিগের শীঘ্র যোগ সিদ্ধি হইবার জন্য গোপনীয় উপায় আমি কহি, যাহা করিলে নিশ্চিত যোগ-সিদ্ধি হইবে। অর্থাৎ যোগীদিগের যোগাভ্যাস কালে যে সকল পথ্য ও যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা পর শ্লোকে কহিতেছি।

ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং
চূর্ণবর্জ্জিতং। কর্পূরং নিষ্ঠুরং
মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মরন্ধ্রকং। সি-
দ্ধান্ত-শ্রবণং নিত্যং বৈরাগ্য-গৃহ-
সেবনং। নাম-সংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ
সুনাদ-শ্রবণং পরং। ধৃতিঃ
ক্ষমা তপঃ শৌচং হ্রীর্ম্মতিগুরু-
সেবনং। সদৈতানি পরং যোগী
নিযমানি সমাচরেৎ।

ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, কর্পূরাদি-বাসিত চূর্ণ-বর্জ্জিত তাম্বূল, ভোজন সুপথ্য হয়। নিষ্ঠুর বাক্যের অকথন, মিষ্টবাক্য কথন, ক্ষুদ্র-গবাক্ষবিশিষ্ট শোভন ঘর করণ, সিদ্ধান্ত বাক্যের নিত্য শ্রবণ, শুষ্ক-তর্কযুক্ত বিচার শ্রবণ না করণ, বৈরাগ্যযুক্ত অন্তঃকরণে সংসার-কার্য্য করণ, স্তুতি নিন্দায় সমজ্ঞান, উত্তম সুরসংযুক্ত হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ, ব্যাকুলতা বিবর্জ্জন, ধৈর্য্যাবলম্বন, ক্ষমাযুক্ত হওন, বৈধ তপস্যা করণ, শৌচাচার করণ অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত বাহ্যাভ্যন্তর সংশুদ্ধি করণ, মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য পরিষ্কার ও সন্তোষ দ্বারা চিত্ত পরিষ্কার করণ, হ্রী অর্থাৎ নির্লজ্জদিগের ন্যায় উদ্ধত বেশ ভূষা এবং অসৎ সম্মত কার্য্যাদি না করণ, মতি অর্থাৎ ভগবৎ বিষয়ে বুদ্ধির স্থিরীকরণ, গুরু সেবাকরণ ইত্যাদি যাবতীয় নিয়মের সমাচরণ, যোগীদিগের অবশ্য করণীয়।

অনিলেঽর্কপ্রবিষ্টে চ ভোক্তব্যং
যোগিভিঃ সদা। বায়ৌ প্রবিষ্টে
শশিনি শয়ন্তে সাধকোত্তমৈঃ॥

বায়ুতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিলে অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীর মধ্যে বায়ুর প্রবেশ কালে যোগিবরেরা আহার করিবেন। এবং বায়ুর মধ্যে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ হইলে অর্থাৎ ইড়ানাড়ীতে প্রাণবায়ু প্রবিষ্ট হইলে যোগী সকল শয়ন করিবেন। এতাবতা কুম্ভক সময়ে ভোজন ও শয়ন করিবে না। যখন স্বভাবতঃ বাম নাসিকাতে বায়ু বহিবে, তখন কুণ্ডলী দেবীর নিদ্রা কাল, এই সময়ে যোগীরা নিদ্রা যাইবেন। আর যখন দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু বহিবে তখন কুণ্ডলীর জাগ্রদবস্থা, সুতরাং তৎকালে যোগী আহার করিবেন, তাহাতে কুণ্ডলীমুখে আহুতি প্রদান করা হইবে। কুণ্ডলীমুখে আহুতি হইলে যোগীর আহার-শুদ্ধি হয়। এনিমিত্ত শিবসংহিতাতে আহারার্থ কুণ্ডলীমুখে আহুতি দিতে বলা হইয়াছে।

সদ্যোভুক্তেঽপি ক্ষুধিতে নাভ্যাসঃ
ক্রিয়তে বুধৈঃ। অভ্যাসকালে প্র
থমং কুর্য্যাৎ ক্ষীরস্য ভোজনং॥

আহার করিবামাত্র পবনাভ্যাস করিবে না এবং ক্ষুধাতুর হইয়াও তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব যোগীদিগের দ্বারা সর্ব্বদা ইহা বিচার করণীয়। অর্থাৎ আহার করিলে তৎকালে নাড়ী ছিদ্র-রসে পূরিত থাকে. তাহাতে বায়ুর গমনাগমনে ব্যাঘাত জন্মে, তজ্জন্য সাধকের শ্বাসাদি রোগ জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির ধাতু ক্ষীণ হয়, তৎকালে পবনাভ্যাসে শরীর শোষণ হইয়া ক্ষয় রোগোৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং এতদুভয়কালে যোগাভ্যাস করা কর্ত্তব্য নহে। প্রথমাভ্যাসকালে অন্য কোন দ্রব্য আহার না করিয়া কেবল ঘৃত দুগ্ধান্ন ভক্ষণ করিলে শ্রেয়ঃ হয়।

ততো যথেষ্টা শক্তিঃ স্যাদ্যো-
গিনো বায়ু-সাধনে। যথেষ্টং
ধারণাদ্বায়োঃ কুম্ভকঃ সিধ্যতি
ধ্রুবং। কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে
কিং নস্যাদিহ যোগিনঃ॥

বায়ুধারণা স্থিরীভূত হইলে যোগীর যেমন ইচ্ছা তেমনি বায়ু ধারণের ক্ষমতা জন্মে। যখন যেমন ইচ্ছা বায়ু ধারণের শক্তি হইবে, তখন নিশ্চিতরূপে কুম্ভক সিদ্ধি হইয়াছে জানা যাইবে। নিরবচ্ছিন্ন-কুম্ভক-সিদ্ধ যোগীর কোন সাধনাই দুর্ল্লভ হয় না।

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ
প্রথমোদ্যমে। যদা সংজায়তে
স্বেদো মর্দ্দনং কারয়েৎ সুধীঃ।
অন্যথা বিগ্রহে ধাতু নষ্টোভবতি
যোগিনঃ॥

প্রাণায়াম সাধনের আদিতে সাধকের দেহে ঘর্ম্ম হইবে; ঘর্ম্ম-সংজাত দেহকে ঐ ঘর্ম্ম হইতে বিমুক্ত করিবে অর্থাৎ যোগী ঐ ঘর্ম্ম সর্ব্বশরীরে মর্দ্দন করিবেন। ইহা না করিলে তাঁহার সর্ব্ব-দেহস্থ ধাতু ক্ষয় হইতে থাকিবে।

তস্মাস্তবে। মর্দ্দনং তেন কারয়েৎ।

অর্থাৎ ঐ ঘর্ম্ম দ্বারা গাত্র মর্দ্দন করিবে। উভয় বিধি শিবাজ্ঞা। উভয়ের ফল সমান। ঘর্ম্ম হওয়া প্রথম চিহ্ন। এক্ষণ দ্বিতীয় চিহ্ন যাহা হইবে তাহা বলা যাইতেছে।

দ্বিতীয়েহি ভবেৎ কম্পো দার্দ্দূরী
মধ্যমে গতিঃ। ততোহধিকতরা-
ভ্যাসাদ্গগনেচরঃ সাধকঃ॥

প্রাণায়ামের দ্বিতীয় কল্পে গাত্রকম্পন হয়। তৃতীয় কল্পে দর্দ্দূরগতি অর্থাৎ ভেকের ন্যায় গতি হইবে। যোগীর ভেক-সদৃশ গতির অর্থ এই পদ্মাসনস্থ যোগীকে অবরুদ্ধ প্রাণবায়ু প্লুতগতিবৎ চালিত করে। চতুর্থ কল্পে যোগীকে অবরুদ্ধ প্রাণবায়ু শূন্যে উঠাইবে। এই সকল ব্যাপারের জন্য বায়ু ধারণার যে নিয়ম আছে তাহা পশ্চাৎ বিবৃত হইবে।

যোগী পদ্মাসনস্থোঽপি ভুবমুৎ-
সৃজ্য বর্ত্ততে। বায়ুসিদ্ধস্তদাজ্ঞেয়া
সংসারধ্বান্তনাশিনী॥

পদ্মাসনস্থ হইয়াও যোগী যখন ভূতল পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে ক্ষমবান্ হইবেন, তখন যোগীর সংসাররূপ ঘোরান্ধকার-নিবারিণী পরাৎপর পরমা বায়ুসিদ্ধি হইয়াছে জানিবা। যাবৎ এইরূপ ঘটনা না হইবে তাবৎ যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা করিতে হইবে। যোগসিদ্ধির আর কতিপয় লক্ষণ শিব-সংহিতায় বলা হইয়াছে।

অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ
জায়তে।

যোগীর যোগ-সিদ্ধাবস্থাতে অল্পনিদ্রা ও অল্পমূত্র ও অল্প পুরীষ হইবে।

অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিন-
স্তত্ত্বদর্শিনঃ। স্বেদোলালাকৃমি-
শ্চৈব সর্ব্বথৈব ন জায়তে॥

পবনাভ্যাস যোগসিদ্ধি হইলে যোগীর শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাকে না: এতদ্ভিন্ন তিনি অন্য কোন প্রকার দুঃখে দুঃখিত হন না। প্রত্যুত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হৃদয় হইয়া কালাতিপাত করেন। ইহা ব্যতীত যোগীর গাত্রে যোগসিদ্ধি হইলে ঘর্ম্ম কৃমি কফ ও লালাদি জন্মে না।

কফপিত্তানিলাশ্চৈব সাধকস্য
কলেবরে। তস্মিন্‌কালে সাধকস্য
ভোজ্যেষ্বনিয়মগ্রহঃ॥

সিদ্ধাবস্থাতে সাধকের গাত্রে কফ বায়ু কি পিত্ত সমতা প্রাপ্ত ব্যতীত বিকৃতি ভাবাপন্ন হয় না। তৎকালে যোগীর পথ্যাপথ্য ভোজনাদির কোন নিয়ম করিবার আবশ্যক থাকে না। তখন—

অত্যল্পং বহুধাভুক্ত্বা যোগী ন ব্য-
থতে হি সঃ। অথাভ্যাসবশা-
দ্যোগী ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥
যথাদর্দ্দূরজন্তূনাং গতিঃ স্যাৎ
পাণিতাড়নাৎ। সন্ত্যত্র বহবো
বিঘ্না দারুণাদুর্নিবারণাঃ। তথাপি
সাধয়েদ্যোগী প্রাণৈঃকণ্ঠগতৈ-
রপি॥

যোগীকে বিনা আহারে কিম্বা অল্পা-

হাবে কি বহুবিধ আহার করিলেও পীড়া জন্য ক্লেশাদি ভোগ করিতে হয় না। এই যোগাভ্যাসবশে যোগবলে সাধকের ভূচরীসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ গম্যাগম্য সকল স্থানেই গমনাগমন করার শক্তি হয়। দদ্দুরী গতির লক্ষণ যেমন করতালি দিলে ভেক ভূতলে লম্ফ ঝম্প দিয়া পলাইতে থাকে, যোগীর প্রাণায়ামকালে বায়ুর অবরোধহেতু সেই প্রকার গতি হয়।

সন্ত্যত্র বহবো বিঘ্নঃ দারুণা দুর্নিবারণাঃ। তথাপি সাধয়েদ্যোগী প্রাণৈঃকণ্ঠগতৈরপি ॥

যদিও যোগাভ্যাসকালে দুর্নিবার্য্য অনেক দারুণ বিঘ্ন আছে, তথাপি কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও যোগী যোগ সাধন করিবেন।

ততোরহস্যুপবিষ্টঃ সাধকঃ সংজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নানাং নাশহেতবে ॥

ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া নির্জ্জন স্থানে সাধক উপবিষ্ট হইয়া বিঘ্ননাশ হেতু দীর্ঘমাত্রায় প্রণব জপ করিবেন। দীর্ঘ মাত্রে প্রণবার্থ স্পষ্টাক্ষরযুক্ত প্রণব জপ করিবেন।

পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি প্রাণায়ামেণ নিশ্চিতং। নাশয়েৎ ষোড়শ প্রাণায়ামেণ যোগপুঙ্গবঃ ॥

ষোড়শ বার স্পষ্টাক্ষরে প্রাণায়াম জপ যে যোগী একাসনে বসিয়া করেন, তিনি জন্মান্তরার্জ্জিত যাবতীয় কর্ম্মজ ফল ও ইহজন্মকৃত কর্ম্মজাত ফল বিনাশ করিবেন। কর্ম্মফল ধ্বংশ না হইলে যোগসিদ্ধি হয় না।

পাপতুলাচয়ানাহো প্রদহেৎ প্রলয়াগ্নিনা। ততঃ পাপবিনির্মুক্তঃ পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ ॥

যেরূপ প্রলয়াগ্নিদ্বারা তুলারাশি দাহন হয়, তদ্রূপ যোগী পাপরাশিকে ষোড়শ প্রাণায়ামে বিনাশ করেন। পাপবিনাশানন্তর পুণ্যপুঞ্জও বিলয় পায়।

প্রাণায়ামেণ যোগীন্দ্রো লব্ধ্বৈশ্বর্য্যাষ্টকানিবৈ। পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ ॥

যোগীন্দ্র প্রাণায়াম-যোগসিদ্ধ হইলে অনিমাদি অষ্টৈশ্চর্য্য তাঁহার লাভ হয়। অণিমাদি লাভ হইলে পাপ-পুণ্যোদধি উত্তীর্ণ হওতঃ ত্রিলোক পর্য্যটন করিবার ক্ষমতা জন্মে। সিদ্ধ যোগীরা না করিতে পারেন এমন কর্ম্মই নাই।

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব ঘটিকাত্রিতয়ং ভবেৎ। যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনস্থিপ্সিতা ধ্রুবং ॥

অল্প অল্প পবনাভ্যাস হইলে যখন ৩ ঘণ্টা অর্থাৎ এক প্রহর কাল কুম্ভক করিতে পারিবেন, তখন যোগীর অভিলষিত সমুদায় সিদ্ধি লাভ হইবে।

বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ। দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনং ॥ বিণ্মূত্রলে-

পদে স্বর্ণসদৃশাকরণস্তথা। ভব-
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ
যোগিনাং॥

এক প্রহর কাল কুম্ভক করিতে পারিলে যোগীর যাহা যাহা হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।

যথা—বাক্যসিদ্ধি অর্থাৎ যোগী যাহা বলিবেন, তাহা সফল হইবে; কামচারী হইবেন অর্থাৎ যোগী যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন বিনা বাধায় অবলীলাক্রমে সেই স্থানে গমন করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন দূর দৃষ্টি ও দূর শ্রুতি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিতে পারিবেন অর্থাৎ ইহজগতীয় তাবৎ স্থানের তাবৎ বিষয় মনে করিবামাত্র দেখিতে ও শুনিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত পরদেহে প্রবেশ করিতে ক্ষমবান্ হইবেন। এবং যোগীর বিষ্ঠা মূত্র কোন ধাতু দ্রব্যে লেপন করিলে তাহা স্বর্ণময় হইয়া যাইবে। আর অন্তর্দ্ধান শক্তিলাভ করিতে পারিবেন। ইহার পর পবনাভ্যাস-সিদ্ধ যোগীর যে প্রকারে ঘটাবস্থা লাভ হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

ঘটাবস্থা।

যদা ভবেৎ ঘটাবস্থা পবনাভ্যা
সিনঃ পরা। তদা সংসারচক্রে-
ঽস্মিং স্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥

পবনাভ্যাস-সাধক যোগীর যখন ঘটাবস্থা হইবে, তখন ইহসংসারের তাবৎ বস্তুই যোগীর সুলভ হইবে।

প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাত্ম-পর-
মাত্মনঃ। মিলিত্বা ঘটতে যস্মা-
ত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে॥

প্রাণায়াম-সাধক যোগীর যখন প্রাণবায়ু ও বিন্দু ও জীবাত্মা আর পরমাত্মা একত্র সংঘটন হয়, তখন সেই অবস্থাকে ঘটাবস্থা বলা যায়।

যামমাত্রং যদা ধর্ত্তুং সমর্থঃ স্যাত্ত-
দাদ্ভুতঃ। প্রত্যাহারস্তদৈবাস্যা-
ন্নান্তরো ভবতি ধ্রুবং॥

সম্পূর্ণ এক প্রহর কাল কুম্ভক করিয়া বায়ু ধারণ করিতে পারিলে তাহাকে প্রত্যাহার বলা যায়, প্রত্যাহার হইলে যোগ-সাধনার আর বিচ্ছেদ হয় না। প্রত্যাহারের ফল এই—

যং যং জানাতি যোগীন্দ্র স্তংত-
মাত্মেতি ভাবয়েৎ। যৈরিন্দ্রিয়ৈ-
র্যৈর্ব্বিধানং তদিন্দ্রিয়জয়ো ভ-
বেৎ॥

যোগী ত্রিভুবনস্থ যে যে বস্তুকে জ্ঞাত আছেন, ঐ সকল বস্তুকে প্রত্যাহারাবস্থাতে কেবল আত্মাময় দেখেন এবং যে যে ইন্দ্রিয়ের যে বিধান সেই সকল বিধান জানিতে পারিলে সেই সেই ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন। প্রত্যাহারের ক্ষমতা না জন্মিলে তাবৎ বস্তুকে আত্মময় দেখা যায় না, আর তাবৎ ইন্দ্রিয় জয় করিতেও পারা যায় না। এতদ্ভিন্ন সম্পূর্ণ এক প্রহর কাল কুম্ভক করিয়া যে যোগী শ্বাস ধারণ করিতে পারেন, তিনি অবলীলাক্রমে এক পায়ের

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীতে বাতুলের ন্যায় এক প্রহর কাল থাকিতে পারেন এমন ক্ষমতা হয়। প্রমাণ—

যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদভ্যাস-যোগতঃ। একবারং প্রকুর্ব্বীত যদা যোগী চ কুম্ভকং। দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ। স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সুধীঃ॥

পরিচয়াবস্থা।

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোঽভ্যাসতোভবেৎ। যদা বায়ুশ্চন্দ্র-সূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলং। বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুং সুষুম্না ব্যোম্নি সঞ্চরেৎ। ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্বা সুনিশ্চিতং। যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাস-যোগতঃ। ত্রিকূটং কর্ম্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতং॥

প্রত্যাহারাবস্থার পর যোগীর পরিচয়াবস্থা ঘটে। পরিচয়াবস্থা তখন বলা যায়, যখন বায়ু ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ী ত্যাগ করিয়া নিশ্চল হইয়া থাকে এবং ঐ পরিচিত প্রাণবায়ু সুষুম্নান্তর্গত ছিদ্রে কেবল সঞ্চারিত হইতে থাকে। ঐ বায়ু ক্রিয়াশক্তিকে গ্রহণ করত সকল চক্র ভেদ করিয়া যখন অভ্যাস ক্রমে নিশ্চিতরূপে পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন যোগীর আত্মকর্ম্মের ত্রিকূট দর্শন হয়। অর্থাৎ কর্ম্মজন্য আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপের অনুভব হইতে থাকে। এ অবস্থা না হইলে ত্রিবিধ তাপ অনুভব করিতে পারেন না।

ক্রমশঃ——

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

———oo———

ভারত-হিতৈষী

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হাবড়া জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর * গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় বিষ্ণুপরায়ণ ও স্বভাব-কুলীন, মাতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য্য শক্তি-সম্প্রদায়ভুক্ত ও ভঙ্গের সন্তান ছিলেন। ব্রজবিনোদের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের আদিবাস মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতী শাঁকাসা গ্রাম। নবাব সরকারে চাকরী করিয়া "রায়

* ঐ গ্রাম এক্ষণে হাবড়া জেলা-ভুক্ত হইয়াছে।

রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি বংশপরম্পরায় কেবল "রায়" উপাধিই চলিয়া আসিতেছে। অতঃপর নবাব কর্ত্তৃক হুগলী বর্দ্ধমান্ প্রভৃতি কয়েক খানি জেলার জমীদারগণের নিকট রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তসিলদারী পদে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে থানাকুল কৃষ্ণনগর গমন করিতে হয়। পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে সুবিখ্যাত অভিরাম গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের শ্রীপাঠ সন্নিকট রাধানগর নামক গ্রামে বাস স্থাপন করেন। ইহাঁর তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ অমর চন্দ্র রায়, মধ্যম হরপ্রসাদ রায়, কনিষ্ঠ ব্রজ বিনোদ রায়। কৃষ্ণ-পরায়ণ ব্রজ-বিনোদ তৎকালীয় পরম সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তিনি যেরূপ দেবনিষ্ঠ পক্ষান্তরে তেমনি আবার দানশীল ছিলেন। তিনি যথাসাধ্য পরের উপকারে কখন বিমুখ ছিলেন না।

শাক্ত বৈষ্ণব এই উভয় সম্প্রদায় মধ্যে চিরকালই ঘোর বিবাদ। তৎকালে শাক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার সকল সম্পাদিত হইত তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মেষ, মহিষ ছাগ প্রভৃতি ত দূরের কথা শাক্তগণ নরবলীকেও একটা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণনা করিতেন। এই সকল জঘন্য নিষ্ঠুরতা নিবারণই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। এমত অবস্থায় রাম মোহনের মাতৃ-পিতৃকুল বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই বিষয়ের একটা সুন্দর গল্প আছে। তাহা এই ব্রজবিনোদ অন্তিমকালে ভাগিরথীতীরস্থ হইলে পর শ্রীরামপুরের শ্যাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার বদান্যতা ও কৌলিন্যের পরিচয় পাইয়া তদীয় অন্তিম শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হন এবং একটী ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়া অগ্রেই প্রতিশ্রুত করিয়া লন। উদার-চরিত ব্রজবিনোদ ভট্টাচার্য্যের কপট অভিসন্ধির মর্ম্ম ভেদে অসমর্থ হইয়া অর্থীর আশা পূরণে স্বীকৃত হন। ভট্টাচার্য্য সময় বুঝিয়া বলিলেন "মহাশয় যেরূপ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি তাহাতে এ ভিখারীর সামান্য আশাটী কেনই বা না পূর্ণ হইবে? যদি এইরূপই হয় তবে জাহ্নবী-সমীপে আজ্ঞা হউক আপনার একটী পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবেন।" এক্ষণে সহজেই অনুভব করা যায় যে সরলমতি বিষ্ণু পরায়ণ ব্রজবিনোদ এক জন শাক্ত-সম্প্রদায়-ভুক্ত ভঙ্গ কুলীনের কথায় কিরূপ বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু নিরুপায়। জাহ্নবী সমীপে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া প্রতিজ্ঞা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিষম সমস্যা! কি করেন, অতঃপর উপায়ান্তর না দেখিয়া সাত পুত্রকে আপন সমীপস্থ হইতে অনুমতি করিলেন এবং আপন অভিমত প্রকাশ করিলেন। একে একে ছয় পুত্রই পিত্রাজ্ঞা পালন করিয়া কুলধর্ম্মে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। পরিশেষে পঞ্চম পুত্র রামকান্ত অতীব

আগ্রহ সহকারে পিতৃ-সত্য পালনে স্বীকৃত হন। ব্রজবিনোদ তাঁহার এরূপ সাধুতায় ও ত্যাগস্বীকারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন "বৎস তোমারি প্রকৃতি গুণে আমি এ অন্তিম কালের সত্য হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, আশীর্ব্বাদ করি তুমি পুত্র পৌত্রাদি লইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর; আমার এ অন্তকালের আশীর্ব্বাদে নিশ্চয় জানিও তোমার সন্ততিগণই সর্ব্বত্র প্রতিপত্তি লাভ করিবে"। অনন্তর তিনি হরিনাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া লোকান্তরিত হইলেন। ভট্টাচার্য্যও আশানুরূপ ফল লাভে কৃতকার্য্য হইয়া সানন্দ মনে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যথা সময়ে রামকান্তকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই রামকান্তের ঔরসে ফুলমণি দেবীর গর্ভে রামমোহনের জন্ম হয়।

ফুলমণি দেবী সচরাচর ফুলঠাকুরাণ নামে খ্যাত ছিলেন। অতঃপর এই প্রস্তাব মধ্যে তিনি ঐ নামেই উক্ত হইবেন। ফুলঠাকুরাণ অতি বুদ্ধিমতী ও অশেষ গুণবতী রমণী ছিলেন। সুবিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আপন জননী সম্বন্ধে বলেন "তিনি বাহ্য দৃশ্যে স্ত্রী-আকৃতি-বিশিষ্টা ছিলেন বটে কিন্তু কার্য্যে পুরুষাপেক্ষা অণুমাত্র ন্যূন ছিলেন না। আমাদের দেবী ফুলঠাকুরাণও এই প্রকৃতির নারী ছিলেন। সৎকার্য্য ব্যতীত আদৌ মন্দ বিষয়ের চর্চ্চা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। নৃশংস তা ও নীচ প্রকৃতির. তিনি বিশেষ বিদ্বেষিণী ছিলেন। মিথ্যা কথা কি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার তিনি কখন সহ্য করিতে পারিতেন না। বাস্তবিক তদীয় সমকালীন স্ত্রী-কুলের মধ্যে তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী স্ত্রী লোক অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই বলিয়া থাকেন নেপোলিয়ন মাতার প্রকৃতি গুণেই এতাধিক বীর্য্যবন্ত হইয়াছিলেন এ স্থলে অসঙ্কুচিত চিত্তে বলা যায় যে, রামমোহন মাতার গুণেই অসাধারণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া একদা দুঃখ-সন্তপ্তা ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

ফুল ঠাকুরাণ শাক্তের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন বটে কিন্তু পতি-গৃহে আসিয়াই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহাতে পরম বৈষ্ণব রামকান্তের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। রামকান্ত শৈশবকাল হইতেই পিতৃধর্ম্মে দিক্ষীত হন। তাঁহার পরলোকবাসী পিতৃ-সংপ্রতিষ্ঠিত রাধা গোবিন্দ পদে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া জল গ্রহণ দূরে থাকুক কাহারও সহিত বাক্যালাপও করিতেন না। ব্রজবিনোদ রায় মহাশয় তাঁহার সত্য পালনকারী পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া যান। কিন্তু পরে তাঁহার সকল পুত্রই বিষয়ের সমান অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামকান্ত হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগর* প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম

* এই গ্রাম এক্ষণে হাবড়া জেলাভুক্ত হইয়াছে।

ইতাম্রা লন। এই সকল কারণে বর্দ্ধমানাধিপের সহিত তাঁহাকে নিয়তই প্রায় কলহে লিপ্ত থাকিতে হইত। এই সময়ে রামমোহনের জন্ম হয়। রামকান্ত বর্দ্ধমানাধিপের অন্যায় ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া সাংসারিক কার্য্যে এক প্রকার বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। এবং একটী তুলসীর উদ্যানে নিয়ত অবস্থান পূর্ব্বক হরিনাম জপ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে দিন যাপন করিতেন এবং সময় মত জমীদারী কার্য্যও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার পরম বুদ্ধিমতী স্ত্রীর মন্ত্রণা ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। ফুলঠাকুরাণ রাম কান্তের এক প্রকার মন্ত্রী ছিলেন।

অতঃপর ফুলঠাকুরাণ কোন উৎসব উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র রাম মোহন সমভিব্যাহারে পিত্রালয়ে গমন করেন। রাম কান্তের ফুলঠাকুরাণ ব্যতীত আরো দুইটী পত্নী ছিল। জগমোহন রামমোহন দুই সহোদর ও রাম লোচন নামে তাঁহাদের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু এই সকল বংশ-পরম্পরার বিশদ বর্ণন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়।

ফুলঠাকুরাণ পিতৃ ভবনে যথা সময়ে উপনীত হইলেন। একদা তাঁহার পিতা শ্যাম ভট্টাচার্য্য দেবী-পূজা সমাপ্ত করিয়া সংপূজিত বিল্বদল গ্রহণ পূর্ব্বক দৌহিত্র রাম মোহনকে প্রদান করেন। রাম মোহন সেইটী চর্ব্বণ করিতেছেন মাত্র ইত্যবসরে ফুলঠাকুরাণ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং রামমোহনকে বৈষ্ণব-ঘৃণিত বিল্ব-পত্র চর্ব্বন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের মুখ প্রক্ষালণ করিয়া দিলেন এবং মহা-কুপিত হইয়া পিতাকে বলিলেন "কি আপনি বিষ্ণুপদ-মন্ত্রপূত পবিত্র তুলসীর পরিবর্ত্তে রাম মোহনকে বিল্ব পত্র চর্ব্বণ করিতে দিয়াছেন। আশ্চর্য্য। মাতামহ হইয়া অবোধ বালকের প্রতি কিরূপে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন?" রাম মোহনের পিতৃ-মাতৃ-কুল যেরূপ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ফুলঠাকুরাণ শাক্ত সম্প্রদায়ীর রীতি নীতি সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন, একারণ পিত্রালয়ে পুত্রের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতেন, কিন্তু এদিকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহা গোল বাধাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কন্যার নিকট এবম্প্রকার তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে বিষম রাগান্বিত হইলেন এবং কন্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "তুই গর্ব্ব করিয়া আমার মন্ত্রপূত বিল্বপত্র যে ঘৃণা করিয়া প্রক্ষেপ করিলি তাহাতে নিশ্চয় জানিস্ এ পুত্র লইয়া তুই কখন সুখী হইতে পারিবি না। তোর এই বালক কালে বিধর্ম্মী হইবে।" আপনারা সহজেই অনুভব করিতে পারেন স্বধর্ম্মপ্রিয় জননীর হৃদয়ে এই বাক্য কিরূপ শেল-সদৃশ লাগিয়াছিল। যাহা হউক ফুলঠাকুরাণ কঠোর শাপ হইতে নিষ্কৃতিলালসায় পিতৃ-পদে লুণ্ঠিত হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের শাপ কিছুতেই টলিবার নয়, তবে বৃদ্ধ

হউক কন্যাত। ভট্টাচার্য্য কতক তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু শাপান্তের আর উপায় ছিল না। অনন্তর ভট্টাচার্য্য বলিলেন "আমার বাক্য নিষ্ফল হইবার নয়, তবে ইহা নিশ্চয় জানিও যে উত্তর কালে তোমার রামমোহন রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক বলিয়া খ্যাত হইবে।" এই গল্পটী কতদূর সত্য বলা যায় না কিন্তু রায়-বংশীয় আবাল বৃদ্ধের নিকট এইরূপ শুনা যায়।

এই ঘটনার অল্প দিন পরে ফুল ঠাকুরাণ সপুত্র পতিভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং শাপান্তের বিষয় স্বামীর নিকট আমূল বিবৃত করিলেন। রামকান্ত ও ফুল ঠাকুরাণ উভয়েই এই সময় হইতে বালক রামমোহনের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে বিশেষ নজর রাখিতেন। রামমোহন এই সময় পৈতৃক কার্য্যানুসারে পারসী ও আরবী শিক্ষা আরম্ভ করেন। এবং তদানীন্তন প্রথানুসারে পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষাও শিখিতে আরম্ভ করেন।

রামমোহন প্রথমতঃ অত্যন্ত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। গৃহ-দেব দেবী রাধা গোবিন্দের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানিতেন না। কথিত আছে মানভঞ্জন যাত্রা তিনি বাটীতে অভিনয় করিতে দিতেন না। বৃন্দাবন বিহারী ভুবনেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র যে প্রিয়মহিষী রাধারাণীর পায় ধরিয়া কাঁদিবেন, ভুবনমোহন শিখিপুচ্ছ, পীতধড়া যে ধুলায় ধুসরিত হইবে ইহা ভারতের ভাবী ধর্ম্মসংস্কারকের চক্ষুশূল ছিল। আজ যদি সেই মহাত্মা সাহস করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র কুঠার গ্রহণ পূর্ব্বক একাকী ভারতের নিবিড় ভয়-সঙ্কুল কুসংস্কার-বনোচ্ছেদনে কৃতসঙ্কল্প না হইতেন তবে কে বলিতে পারে ভারতের অধুনাতন অবস্থা এত দিনে কিরূপ দাঁড়াইত? ইহা বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই কিরূপ ভয়ানক সময়ে তিনি এই পবিত্র কুঠার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফুল ঠাকুরাণের পিতৃশাপ অনুক্ষণই হৃদয়ে জাগরুক ছিল। তিনি স্বামীকে সর্ব্বদাই রামমোহনের ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইতে বলিতেন। রামকান্ত সচিব-শ্রেষ্ঠ ফুল ঠাকুরাণের বাক্যানুযায়ী রামমোহনকে হিন্দুধর্ম্মের আরো মর্ম্মজ্ঞ করিবার আশায় সংস্কৃত অধ্যয়নার্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন। এই ভাষায় তিনি হিন্দুধর্ম্মনীতি ও আইন পাঠে নিযুক্ত হন। এই অবস্থায়ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তিনি এত আশক্ত ছিলেন যে বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্ম্ম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। অগ্নি তৃণকাষ্ঠ পাইলে আর কতক্ষণ নিস্তেজভাবে থাকে? আর্য্যধর্ম্মনীতির প্রকৃত রসাস্বাদন করিয়া রামমোহন প্রকৃষ্টপথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পৌত্তলিকতার ভ্রম-সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন। বলা বাহুল্য যে ইহাতে পৌত্তলিক বাটীতে

তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইযাছিল। যাহা হউক বিষ্ণুপরায়ণ পিতা কর্ত্তৃক এই সময় তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে লামাপূজক তিব্বতদেশে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রাম মোহন রায়ের জীবনবৃত্তের এই স্থানটী যখন স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তখন হৃদয়-সাগরে যে কি অপূর্ব্ব ভাব-লহরী উদ্বেলিত হয় বলা যায় না। এরূপ নবীন বয়সে আশ্রয়-শূন্য হইয়া একাকী পৌত্তলিকপূর্ণ বিদেশে তাহাদের ধর্ম্মের উপর আঘাত করা কতদূর দুঃসাহসের কার্য্য তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। লোকের সাহস এক এক বিষয়ে পরিণত হইয়া থাকে। তাঁহারা আপনাপন অভীষ্ট পথে আসিবার জন্য কোন বাধাই মানেন না। খ্রীষ্ট গালিলিও সক্রেটিস প্রভৃতি অসাধারণ লোকেরা জীবন হারাইব জানিয়াও আপন অভীষ্টপথের রেখা মাত্র বাহিরে পদার্পণ করেন নাই। টস্কানো-রাজ পরসেন্না রোম অধিকার করিলে পর তদ্দেশীয় মুসস্ স্কিভোলা নামক জনৈক যুবক কোন উপায়ে বিজয়ী রাজ-সমীপে উপনীত হন এবং রাজা ভ্রমে তদীয় জনৈক পারিষদকে হত্যা করেন। রাজা তৎক্ষণাৎ হত্যাকারীর প্রতি ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া বধের আজ্ঞা দেন। স্কিভোলা এরূপ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া পার্শ্বস্থ প্রজ্জলিত হুতাশনে হস্ত প্রদান করিয়া দেখান যে কোন যন্ত্রণাই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে না। পরসেন্না যুবকের সাহস দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করেন এবং রোম অধিকারে বিরত হন। এইরূপে জানা যায় সাহসই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির দ্বার স্বরূপ। রাম-মোহন রায় বলিতেন "সাহস অবলম্বনই মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম" এবং সেই সাহসের মুখ চাহিয়াই ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সত্যের জন্য পিতৃভবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামমোহন ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর এইরূপে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। পরিশেষে তাঁহার পিতা সদয় হইয়া তাঁহাকে পুনরায় গৃহে লইয়া আসেন। এই সময় রাম-মোহনের বয়স ২০।২১ বৎসর মাত্র।

রামকান্ত ভাবিয়াছিলেন রামমোহন নানা কষ্টে পড়িয়া এবার বুঝি সম্যক্ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, অতঃপর পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিরুদ্ধে আর উত্থিত হইবেন না। সুখের বিষয় তাঁহার পিতার সে অনুমান কোন কার্য্যের হয় নাই। তাঁহার সেই রামমোহন সেই সত্যের কুঠার লইয়া কুসংস্কার বনোচ্ছেদনে কেবল অগ্রসরই হইতেছেন। পিতা পুত্র মধ্যে এই সময় নিয়তই প্রায় তর্ক-লহরীর বেগ চলিয়া যাইতেছে। রামকান্ত কিছুতেই আর পুত্র-কে আপন অভীষ্ট পথে আনয়ন করিতে পারিলেন না। তাঁহার সকল কৌশলই নিষ্ফল হইল। অতঃপর ভট্টাচার্য্যের শাপ স্মরণ করিয়া জয়ের মত রামমো-

হনকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে এই বঙ্গস্থলে উভয় পক্ষেরই আপদের শান্তি হইল। রামমোহন জীবিকা নির্ব্বাহের অনন্যোপায় না দেখিয়া অগত্যা রাজ-সরকারে চাকরীর প্রার্থী হন। এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুর গমন করেন। কার্য দক্ষতা গুণে ক্রমে তিনি এই কার্য্য হইতে দেওয়ানী পদে উন্নীত হন। তৎকালে বাঙ্গালী পক্ষে ইহাই সর্ব্বোচ্চ পদ ছিল। এই চাকরী করিয়া তিনি সচরাচর দেওয়ান নামে খ্যাত হন। ইতিপূর্ব্বে রামমোহন আপনা আপনি সামান্য রূপ ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে কার্য্যোপলক্ষে অনেক সময় ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাকে থাকিতে হইত। কার্য্য কুশল রামমোহন এই সুযোগে ইংরাজী ভাষা এক প্রকার আয়ত্ত করিয়া লন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অতঃপর সকলে অনুমান করিলেন এবার বুঝি রামমোহন ঔদ্ধত্যভাব ত্যাগ করিয়া সাংসারিক কার্য্যে মনোযোগী হইবেন। কিন্তু হায় তাঁহাদের সে অনুমিত জলবিম্ব জলেই মিসিয়া গেল। রামমোহন পবিত্র পূর্ণ জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, অপূর্ব্ব ব্রহ্মানন্দ রসে আপ্লুত হইয়াছেন, আর কি তিনি নিবীড় তমোময় পথে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় রামমোহন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রঙ্গপুরের দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিগুণতর অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে পবিত্র কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কি দেশীয় কি বিদেশীয় রামমোহন এই সময় ধর্ম্ম মাত্রেরই আভ্যন্তরিক কুসংস্কার সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য যে একারণ তাঁহার প্রতি সকলেই প্রকাশ্য শত্রুভাব ধারণ করিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার স্কটলাণ্ড দেশীয় দুই তিনটী বন্ধু মাত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। রামমোহন তাঁহার গর্ডন নামক জনৈক বন্ধুকে যে আপন জীবনীসম্বন্ধে এক পত্র লিখেন তাহাতে স্কটলাণ্ড দেশীয়গণের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্বধর্ম্ম-প্রচারোপলক্ষে অতঃপর রামমোহন রাধানগর পরিত্যাগ করিয়া মুরসিদাবাদ গমন করেন।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ আবশ্যক যে রায় বংশ বহু বিস্তৃত হওয়াতে অগত্যা ফুলঠাকুরাণ লাঙ্গলপাড়া নামক গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে রামমোহনের অপর দুই ভ্রাতা কাল গ্রাসে পতিত হন। এদিকে রামমোহনেরও এই গতিক। বিশেষতঃ তিনি আবার পিতা মাতার ত্যাজ্য পুত্র। প্রচলিত আইনানুসারে যদিও তিনি পিতৃ ধনের সম্পূর্ণ অধিকারী, তথাপি পার্থিব সুখে বীতরাগ বিনয়ী রামমোহন আত্মীয় স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া স্বহস্তে সকল গ্রহণ করিতে বিরত হন। যাহা হউক সকলই পূর্ব্বের ন্যায় [illegible]

তাঁহার মাতার অধীনে রহিল। তিনি জমীদারী কার্য্য প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া অতি সুচারু রূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এ দেশীয় জমীদারী কার্য্যনিচয় যেরূপ জটিল ও তাহাতে যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন তাহাতে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক অনেক সময় কত পুরুষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় একটী বঙ্গীয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধিমত কার্য্য সম্পাদন কত দূর কঠিন বিষয় বলা যায় না। কথিত আছে ফুলঠাকুরাণ গৃহ-দেবদেবী রাধা গোবিন্দ ও অসংখ্য শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া জমীদারী কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রামমোহন এই সময় কলিকাতায় আসিয়া একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এবং তাঁহার জন কয়েক স্ববংশীয় তাঁহার সহিত যোগ দেন।

রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথমে তিনি বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কুড়মন পলাশী নামক স্থানে বিবাহ করেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে পিত্রানুসারে পুনরায় তিনি পর পর দুইটী দারপরিগ্রহ করেন। রামমোহনের মধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতী দেবীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। হয়ত, এস্থলে রামমোহনকে অনেকেই বহুবিবাহের সাপক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু তিনি সে বিষয় হইতে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি সকল প্রকার কুসংস্কারেরই সংশোধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বাল্যকালে আপনার সম্বন্ধে কি করিতে পারেন? সুতরাং তাঁহাকে আপাততঃ এই বিষয়টীর জন্য কতক অংশে নিন্দার ভাগী হইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম-ধ্বজা উত্থিত করিয়া হিন্দুসমাজে পতিত হইয়াছিলেন। এ দেশের অবনতির একটী প্রধান কারণ দলাদলি। এই দলাদলির গোলে পড়িয়া কত লোককে কত যন্ত্রণা কত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে বলা যায় না। কৌলীন্যপ্রথা যেমন মঙ্গলাশায় প্রবর্ত্তিত হয়, দলাদলিরও সেইরূপ সদভিপ্রায় ছিল। দলাদলির অপরার্থ সমাজশাসন। সমাজস্থ কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহাকে সম্যক্ শিক্ষা দেওয়াই দলাদলির মুখ্য উদ্দেশ্য। কৌলীন্য ও দলাদলির এরূপ সদভিপ্রায় থাকিলেও কালের মাহাত্ম্যগুণে অথবা ভারতের মৃত্তিকা দোষে সকলই বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। দেশের ত এই গতিক, এ অবস্থায় এ দেশে একতার অবস্থান কেবল বাক্যেই পরিণত হইয়া থাকে। অধুনাতন প্রকৃষ্ট সমাজবিশেষে যদিও এ সকল দ্বেষের ব্যাপার অতি বিরল; কিন্তু রামমোহনের সময় মনে হইলে হৃদকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। দলাদলির প্রভাবে তাঁহার জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মে যোগ দেওয়া ত দূরের কথা, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেও

লোকে তখনি জাতিভ্রষ্ট হইত। কিন্তু কে কোথা দেখিয়াছে যে শিথিল বালির বাঁধ নদীর গতিরোধে সমর্থ হইয়াছে? সে সময়ে এমন কে ছিল যে, রামমোহনকে নিরস্ত করিতে পারে? এদেশে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যের যতই প্রাদুর্ভাব হউক না কেন, স্বজাতীয় প্রেম না হইলে আর কখনই মঙ্গল নাই। যখন প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব হয়, তখন স্বদেশহিতৈষী রামমোহন অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাহাতে যোগ দেন, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি দেশীয় ব্যক্তি তাঁহার উপর বিদ্বেষবশতঃ বিষম আপত্তি আরম্ভ করিলে, রামমোহন রায় তাহাতে অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া কলেজ কমিটি হইতে অপসৃত হইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি কমিটির মধ্যে থাকুন বা নাই থাকুন তাহাতে তিনি কিছু মাত্র ক্ষতি মনে করেন নাই। এদেশে একটা বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হউক ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। রামমোহন রায় তদানীন্তন এ দেশের গবর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহর্ষ্টকে এ দেশের শিক্ষা বিষয়ে যে পত্র লিখেন তাহা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে প্রেসিডেন্সীকালেজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় তাঁহার অধ্যাবসায় ও যত্নের একটী সুমহৎ ফল।

রাম মোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধা প্রসাদ রায়ের বিবাহে জাতি লইয়া এক মহা গোল উপস্থিত হয়। কিন্তু রামমোহনকে জাতি-ভ্রষ্টের ভয় দেখাইয়া দমন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। যাহা হউক পরিশেষে হুগলী জেলার অন্তঃপাতি ইড়পাড়া গ্রাম নিবাসী জনৈক বর্দ্ধিষ্ট ব্যক্তি রামমোহনের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রাধা প্রসাদকে আপন কন্যা সম্পর্ণে স্বীকৃত হন। অতঃপর মহা সমারোহে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিপক্ষ দল ভাবিয়াছিল যে রামমোহনের ও তাঁহার অশ্রিত জন কয়েক লোকের মধ্যে আদান প্রদান বন্ধ করিবে; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। ইহাতে বিপক্ষ দলের আর দুঃখের সীমা পরিসীমা ছিল না। তাহাদের হিংসা ও বিদ্বেষ হয় ত রামমোহনের নামে দুই একটী অশ্লীল গীত রচনাতেই পরিণত হইয়াছিল। নীচ লোকের ইহা ব্যতীত গাত্রদাহ নিবারণের আর উপায় কি?

কৃষ্ণ নগরের সন্নিকট রামনগর-গ্রাম নিবাসী রামজয় বটব্যাল নামক একব্যক্তি চারি পাঁচ সহস্র লোক লইয়া একটা দল পূর্ণ করে। কথিত আছে এই ব্যক্তি রামমোহনকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। এই দলের রামমোহন রায়ের উপর আক্রমণই প্রধান কার্য্য ছিল। অতি প্রত্যুষে ইহারা রামমোহনের বাটীর সম্মুখে আসিয়া অবিরত কুক্কুটধ্বনি করিত ও সন্ধ্যাকালে গোহাড় প্রভৃতি তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া নানাবিধ অত্যাচার করিত। [illegible] ইহাদিগকে এরূপ অত্যা[illegible]

হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন।

কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। তাহারা রামমোহনের বিনয়-নম্রতার বিভিন্ন চিত্র লইয়া এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিকতর রূপে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। তাহাদের এত অত্যাচারেও রামমোহন আর দ্বিরুক্তি করেন নাই। বিনয়ের কি মনোহারিণী প্রভাব! পরিশেষে দুরাত্মারা আপনা আপনি পরাজিত হইয়া নিরস্ত হইয়াছিল। নেপোলীয়ন সুতীক্ষ্ণ অসি লইয়া দেশ জয় করেন, রামমোহন ধৈর্য্যাস্ত্র প্রভাবে লোকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। রামমোহনের ক্রিয়া কলাপ দর্শনে ফুলঠাকুরাণ মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে হিন্দু ধর্ম্মের উপর ভয়ানক অত্যাচারে তাঁহার ক্রোধ-হুতাশন ক্রমে দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং রামমোহনের নব পুত্রবধূ ও বধূদ্বয়কে আপন আবাস হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। যাহা হউক রামমোহন জননীর আচরণে অণুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া মাতার বাটীর সন্নিকট কোন এক স্থানে বাস করিবার মানস করেন। কিন্তু সমস্ত কৃষ্ণনগর মাতার অধিকার ভুক্ত, তিনি হিন্দু-ধর্ম্মদ্বেষী তাজ্য পুত্রের জন্য কেনই বা বাসোপযোগী ভূমি দান করিবেন। ফুলঠাকুরাণ তখন একমাত্র পুত্র রামমোহনকে কৃষ্ণনগর হইতে একেবারে দূরীকৃত করিবার ইচ্ছা করেন; কিন্তু তিনি আশানুরূপ ফল লাভে বঞ্চিতা হন। রামমোহন জন্মভূমি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া মাতার বাটীর সন্নিকটে রঘুনাথপুর নামক গ্রামে অগত্যা এক সুবিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমির উপর বাস স্থাপন করেন এবং বাটীর সম্মুখভাগে একটী মঞ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক—"ওঁ তৎ সৎ একমেবাদ্বিতীয়ং" এই কএকটী অক্ষর তাহার চতুঃপার্শ্বে খোদিত করেন। সেই স্থানটী তাঁহার ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বৈঠক ও সন্ধ্যা উপাসনার স্থান ছিল। তিনি বাহিরবাটী হইতে বাটী গমন করিবার এবং প্রত্যাবৃত্ত হইবার কালীন উল্লিখিত মঞ্চটী সর্ব্বাগ্রে প্রদক্ষিণ করিতেন।

রামমোহনের এই নব-নির্ম্মিত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম তখন বিশ বৎসর মাত্র।

রামমোহন উভয় পুত্রকে লইয়া কলিকাতার বাটীতে থাকিতেন। এই সময় বিদ্যানুশীলনই তাঁহার প্রধান বৃত্তি ছিল। সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত তাঁহাকে ধর্ম্ম-যুদ্ধেও প্রবৃত্ত থাকিতে হইত। সহমরণ প্রথা উঠাইবার জন্য এই সময় তাঁহাকে কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকলেরই সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। পরিশেষে রামমোহন জয়ী হন এবং সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার জন্মের মত ভস্মীভূত হইয়া যায়। রামমোহন সম্বন্ধে এ বিষয়ের একটী সুন্দর গল্প আছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জগন্মোহন রায়ের মৃত্যু হইলে পর তদীয় স্ত্রী সহমৃতা;

হন। রামমোহন তাঁহাকে এরূপ অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুনয় করেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না; স্বামী এবার আর রোগ শয্যা হইতে উত্থিত হইবেন না ইহা জানিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই সকল যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরে তদীয় গ্রামস্থ অপর একটী স্ত্রীলোকও সহমৃতা হন। তিনি অর্দ্ধ দগ্ধশরীরে চিতা হইতে উত্থান করিয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেন ও আত্মীয় স্বজন কর্তৃক যেরূপ নিষ্ঠুররূপে দগ্ধীভূত হন তাহা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহা হউক রামমোহন এই দুইটী হৃদয়-বিদারক ব্যাপার দর্শনে মর্ম্মে আঘাত পাইয়াছিলেন। এই সময় হইতে সহমরণ প্রথার মূলোৎপাটনে তিনি বদ্ধ-পরিকর হন। অনন্তর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তখন ভারত-হিতৈষী মহাত্মা লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারও ভারত হইতে এই হত্যাকাণ্ড অপনীত করিবার সঙ্কল্প থাকে। এক্ষণে তিনি সময় বুঝিয়া রামমোহনের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে আপন সমীপে লইয়া আসিতে জনৈক পারিষদ প্রেরণ করেন। রামমোহন বড় একটা রাজদরবারী কিম্বা রাজ-মুখাপেক্ষী লোক ছিলেন না। তিনি ভাবিতেন আপন কার্য্য আপন অনুষ্ঠের মধ্যে, কার্য্যক্ষেত্রে সযত্নে বীজ বপন করিলে কখনই নিষ্ফল হইবার নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে যে কার্য্যেই এই মহাত্মার হস্ত পড়িয়াছে তাহা কোন না কোন প্রকারে ফলশালী হইয়াছে। যাহা হউক তিনি অতি বিনয় সহকারে রাজ-দরবারে গমনে অস্বীকার করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক সমস্ত অবগত হইয়া পুনরায় রামমোহনের নিকট বিশেষ অনুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ করেন। অতঃপর রামমোহন বেন্টিঙ্কের সভ্যতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তথায় গমন করেন। বলা বাহুল্য যে এই উভয় ভারত-হিতৈষীর একত্র মিলনের ফল ভারত হইতে নারী-হত্যার চির-উচ্ছেদ।

এই সময় রামমোহন রায় বিভিন্ন ভাষায় অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করেন। রামমোহনের মাতা কিছু দিন পরে পুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন এবং তাঁহাকে কয়েক খানি জমিদারীর অধিকারী করিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি জগন্মোহন ও রামলোচনের পুত্র পৌত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া তীর্থস্থল শ্রীক্ষেত্র গমন পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে রামমোহনের মধ্যমা স্ত্রীও পরলোক গত হন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে রামমোহন পুত্রদ্বয় লইয়া সর্ব্বদাই প্রায় কলিকাতার বাটীতে থাকিতেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী দেবীর সঙ্কটাপন্ন পীড়ার

সংবাদ আসিল। রামমোহন তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদকে কৃষ্ণনগর প্রেরণ করিলেন এবং গমন কালীন এই বলিয়া দিলেন যে "যদি তোমার মাতার বাঁচিবার সম্ভাবনা না থাকে তবে তখনই পাষাণে হৃদয় বাঁধিবা স্নেহময়ী জননীর মুখাগ্নি করিও না"। রাধাপ্রসাদ পিত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যথা সময়ে কৃষ্ণনগর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহারই অল্প কাল পরে শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু-সংবাদ আসিল। রামমোহন স্ত্রী-বিয়োগে শোকান্বিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ রসে রসজ্ঞ ব্যক্তির সে দুঃখ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। তিনি অভয় দাতার অভয় নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া গীতারম্ভ করিলেন :—

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়-
ঙ্কর, অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি
রবে নিরুত্তর।" ইত্যাদি।

শ্রীমতী দেবীর মৃত্যুর পর রামমোহন কৃষ্ণনগর গমন করিয়া তদীয় চিতার উপর একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অদ্যাপিও উহার ভগ্নাংশের কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়।

রামমোহনকে ধর্ম্মযুদ্ধে দমন লালসায় কি হিন্দু কি খৃষ্টান কি মুসলমান সকল সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম হইত। কাষ্ঠের ভিতর হইতে যেমন অগ্নি বাহির হয় সেইরূপ রামমোহন তাহাদের শাস্ত্রই বজায় রাখিয়া তাহার গূঢ় প্রদেশ হইতে পবিত্র ধর্ম্মের জ্যোতি বাহির করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। রামমোহন ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগ করিতেও অপ্রস্তুত ছিলেন না। এই ভয় তাঁহার সর্ব্বদাই ছিল পাছে হৃদয়-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায়-বিশেষে পরিণত হয়। পাছে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার বা একটা আমোদের দ্রব্য হইয়া উঠে। এই কারণে তিনি বেদ-বিধি অবলম্বন করেন। আর্য্যগণ যে ধর্ম্মের সহায়ে একদা উন্নতির উচ্চ মঞ্চে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম প্রভাবে একদা ভারত সুবর্ণখনি নামে আখ্যাত হন, রামমোহন সেই ধর্ম্মেরই পত্তনভূমির সংস্থাপন করিয়া যান। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত নয়। তাঁহার কার্য্যকলাপ মধ্যে একটী বড় অদ্ভুত গুণ দেখা যায়। তাঁহাকে সকল সম্প্রদায়ীরাই আপনাপন সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। তাহার কারণ এই যে রামমোহন কাহাকেও শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অণুমাত্র অবজ্ঞা ছিল না। তিনি সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরই মূল অন্বেষণ করিবার নিমিত্তই গ্রীক, লাটিন, আরবী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি কোরাণ বাইবেলের আদি গ্রন্থ হইতে মূল সত্য বাহির করিয়া নিরাকার পরব্রহ্মের সত্যতা প্রতিপন্ন করেন। ইহা কে না স্বীকার করিবেন যে কেবল আপনার বলিয়া নয়, সকল শাস্ত্রকেই রামমো-

হন সম চক্ষে দর্শন করিতেন। বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতির অতিরঞ্জিত আড়ম্বর ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যের ভাগ লিখিত করিয়া তিনি কেবল ভারতের কেন সমস্ত জগতের পরম উপকার সাধন করিয়াগিয়াছেন। রামমোহনের আর একটী অসাধারণ গুণ ছিল। তিনি বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন বটে, ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার কোন বিষয় কিছু মাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি ভ্রমেও কখন আপন সম্পত্তির গৌরবে মুগ্ধ হইতেন না। রাজপ্রসাদ পর্ণকুটীর তিনি সম জ্ঞান করিতেন। তাঁহার নিকট দরিদ্র ধনীর বিভিন্নতা ছিল না। একদা বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, এই সময় তাঁহার আর একটী বন্ধুও উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে রামমোহন উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আপনার বিষয়ে আর একটী ক্ষুদ্র গল্পও এস্থলে বিবৃত হইল। এক সময়ে তিনি বিশেষ কোন কার্য্য হইতে সামান্য অবসর লইয়া আহারীয় দ্রব্যের জন্য তাঁহার পাচককে আহ্বান করেন; কিন্তু সে সময় ঐ ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না। ক্রমে বেলাও বাড়িতে লাগিল তখনও তাহার দেখা নাই। বেলাতিক্রমে রামমোহন ক্ষুধায় বিষম কাতর হইয়া পড়িলেন। অতঃপর পাচক আসিয়া উপস্থিত হইল, রামমোহন তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য বেত হস্তে পাচকের নিকট উপস্থিত হইলেন। সে ব্যক্তিও সম্মুখস্থ একটী চেলাকাষ্ঠ লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। রামমোহন গম্ভীর স্বরে পাচককে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকি?"। সেও বলিল "তবে আপনার হস্তে ওকি?"। রামমোহন বিষম লজ্জিত হইয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং হয় ত, তিনি ইহাও ভাবিয়াছিলেন যে "আজ একটী কি শিক্ষা লাভ হইল।" বলা বাহুল্য যে তাঁহার এই সকল বিনয়ী অমায়িক স্বভাবেই তাঁহাকে সেই ভয়ানক সময়েও সকলের নিকট যশস্বী করিয়া তুলিয়াছিল। রামমোহন বিশেষ জানিতেন যে ধন-গৌরবে মোহিত হওয়া নীচমনার কার্য ও ধর্ম্ম-সংস্কারকগণের পক্ষে উহা সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং এই সকল নীচ প্রবৃত্তি হইতে উচ্চমনা রামমোহন বহু দূরে অবস্থান করিতেন। রামমোহনের বিলাত গমন বাসনা এই সময় হইতে প্রবল হইয়া উঠে। তখন প্রায়ই তিনি সার্কিউলার রোডস্থ তাঁহার উদ্যান-বাটীতে একাকী থাকিয়া বিদ্যানুশীলনে দিন পাত করিতেন। এস্থলে একটী রহস্যের অভিনয় হয় তাহা এই—একটী ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে তদীয় সেই উদ্যান-শালায় আসিয়া পূজার্থ পুষ্প লইয়া যাইতেন। একদা ব্রাহ্মণ একটী বৃক্ষের উপর আপন গাত্র বস্ত্র রাখিয়া অপর এক বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক পুষ্প চয়ন করিতেছেন, ঐ অবসরে রাম

মোহনের সঙ্কেতানুযায়ী তদীয় অনৈক ভৃত্য ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার গাত্র বস্ত্র খানি লইয়াগেল। ব্রাহ্মণ পুষ্প লইয়া অভিলষিত স্থানে আসিয়া দেখেন বৃক্ষোপরি গাত্রবস্ত্র নাই। ব্রাহ্মণ ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে রামমোহন তথায় উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা দেবজ্ঞানিত লোক, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় সেই একজন প্রধান ব্রহ্মজ্ঞানীর উদ্যানে আসিয়া আমার একমাত্র শীত বস্ত্রটা হারাইলাম।" রামমোহন ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্র বস্ত্র আনাইয়া দিলেন এবং বলিলেন "ভৃত্য ভাল মনেই আপনার বস্ত্রটী লইয়া সাবধানে রাখিয়াছিল, যাহা হউক এখন সন্তুষ্ট হইলেন ত।" ব্রাহ্মণ তখন মনে ভাবিলেন রামমোহন বুঝি তাঁহাকে দান করিলেন, ভাবিয়া কর্কশস্বরে কহিলেন "আপনার ধন ফিরিয়া পাইলাম তাহাতে, আবার তুষ্ট কি?" রামমোহন বলিলেন "এপুষ্প গুলি কাহার, এবং এগুলি লইয়াইবা কি করিবেন?" ব্রাহ্মণ পূর্ব্বমত তীব্রস্বরে কহিলেন "কেন দেবতার পুষ্প, দেবতারই তুষ্ট্যর্থে সমর্পণ করিব।" বাক্‌পটু রামমোহন ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক পুনরপি কহিলেন "তবে ঠাকুর! যাঁহার ধন তাঁহাকে দিলে কি তিনি খুসী হন?" এই ব্রাহ্মণ কালে পবিত্র আর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রধান ধর্ম্ম-সংস্কারকের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। রামমোহন যে এই উপায়ে কত লোককে পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন বলা যায় না। তিনি বিদ্যোৎসুককে বিদ্যাদান করিয়া, বিষয়ীর বিষয় বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, দরিদ্রের অন্নের উপায় করিয়া দিয়া, এবং ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুকে জ্ঞান-যোগ দিয়া পবিত্র পথে আনয়ন করিয়াছিলেন।

রামমোহন যথাসাধ্য জন্মভূমিকে বিবিধ ভূষায় বিভূষিত করিবার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন একতাই জাতীয় উন্নতির মহৎ উপায়, কিন্তু ধর্ম্মই একতা। সমস্ত ভারত এক প্রধান নিদানধর্ম্মাবলম্বী হইলে এক মনে এক তানে সুবিস্তীর্ণ ভারতের চারিধার হইতে এক মাত্র পরব্রহ্মের জয়ধ্বনি উত্থিত হইলে কি জানি চির-অভাগিনী ভারত-ভাগ্যে কি ঘটে। রামমোহন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "ভ্রাতৃ" শব্দ প্রচলিত করেন। এবং সমাজে সকলেই এক প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত হইবেন ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সে সময়ে ব্রাহ্ম মাত্রেই চোগা, চাপকান পায়জামা প্রভৃতি পরিধান করিয়া সমাজে উপনীত হইতেন। অধুনাতন এরূপ কোন প্রথার প্রচলন দেখিলে "হায় অনুকরণ সর্ব্বনাশ" এই স্বরে নিশ্চয় গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু তাঁহারা ভ্রমেও একবার বিবেচনা করেন না যে প্রকৃষ্ট সমাজের অনুকরণ না করিলে

উন্নতি প্রত্যাশা আর অল্পই করা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। ইহাতে স্পষ্টই অনুকরণ-বিধি প্রণীত হইতেছে। অথবা শাস্ত্র অন্বেষণেরই বা আবশ্যক কি? ক্ষণেককাল জাতীয় বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাপন বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে জিজ্ঞাসা করিলেই অনুকরণের কি মহদভিপ্রায় তাহা সহজেই প্রত্যক্ষীভূত হইবে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কি অবস্থা ছিল তাহার একটী আনুমানিক চিত্র প্রদর্শন করিয়া যাহা না হইবে, জাতি-বিশেষের মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ দৃষ্টি-গোচর করিলে তাহার সহস্রগুণ ফলের সম্ভাবনা। এক পরিধেয় বস্ত্র লইয়া অনুকরণের উপর সাংঘাতিক আঘাত যদি এ সময়েও দেখা যায় তবে আর উপায় কি আছে? ভিন্ন-দেশীয় বস্ত্র পরিধানে দেশের মহা অনিষ্ট করা হইল, উন্নতি-পথে কণ্টকাকীর্ণ হইল, ভারতের মলিন মুখ আরো শুখাইয়া গেল, চারিধার ছাই ভস্মে পূর্ণ হইয়া গেল—এইরূপ বিদ্বেষ পূর্ণ অভিপ্রায় প্রকাশে দেশের মঙ্গল না হইয়া কেবল অশুভ ফলই ফলিতেছে। যতদিন বিদ্বেষ, স্বেচ্ছাচার, আত্মগৌরব এদেশে থাকিবে ততদিন চারিধার গরল-পূর্ণ থাকিবেই থাকিবে, এ অবস্থায় অমৃতের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

দেশের কি ধর্ম্ম-সংস্কার কি বিদ্যানুশীলন কি রাজনীতি সকল বিষয়েই রামমোহনের বিশাল হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার নির্ম্মাতা ধরিতে গেলে রামমোহন রায়ই সর্ব্ব প্রথম আমাদের গণনা-পথে সমুদিত হইয়া থাকেন। তৎকৃত গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, ভূগোল খগোল প্রভৃতি এদেশের পাঠোপযোগী গ্রন্থনিচয় তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কোন সুবিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "রামমোহন রায়, ডেভিড্ হেয়ার ও ডাক্তর ডফ না থাকিলে এদেশে বিদ্যা-চর্চার এতাধিক উন্নতি হইত কি না সন্দেহ। তিনি হিন্দুজাতির পৈতৃক বিষয় সম্বন্ধে যে 'আইন-ঘটিত প্রস্তাব লিখেন ও ইংলণ্ডে যে ভারতবর্ষের রাজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন তাহাই তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ধর্ম্ম-সভায় যেরূপ তিনি ধর্ম্ম শিক্ষক ছিলেন তেমনি আবার রাজসভায়ও রাজনীতিবেত্তা ছিলেন। এখানে কেনা বলিবেন যে রামমোহন আর্য্যধর্ম্মের মোহিনী শক্তি প্রভাবেই এতদূর উন্নত হইয়াছিলেন। কালে সকলেই লয় পাইবে কিন্তু মহাত্মা রাম মোহনের গুণ-জ্যোতি আর কোন কালে নির্ব্বাপিত হইবার নয়।

রামমোহনের সময়ে এদেশের প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপনের প্রস্তাব হয়। কিন্তু কেহই এ বিষয়ের স্বপক্ষ ছিলেন না। রামমোহনও ইহাতে মত দেন নাই***।

ভারতের নাম শুনিলে যাহার শরীরস্থ প্রতি লোমকূপ হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখা বাহির হইত, সেই মেকলে পর্য্যন্ত

রামমোহনের সহিত আলাপ করিবার জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন। রামমোহন যে অসামান্য গুণে আপন পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন অধুনাতন অতি অল্পসংখ্যক লোককে সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তিনি পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি লালসায় কখন কাহারও স্বাবস্থ হন নাই, অথচ তাঁহার নাম শুনিলে বিদেশীয়গণ পর্য্যন্ত অশ্রু মোচন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার কার্য্যের মধ্যে এমনি সুশৃঙ্খলতা ছিল যে একদা সুসভ্য ইংরাজগণকেও তৎপ্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আশা ছিল ভাবিবংশ কর্ত্তৃক তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন সকলেতেই তাদ্বিপরীত ভাব লক্ষিত হইতেছে। এখন হিন্দুসমাজ এমনি বিচিত্র ভাব ধারণ করিয়াছেন যে প্রকৃত লোকের সংখ্যা অঙ্গুলি মাত্রে গণনা করা যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয় উৎসাহ অভাবে ক্রমে ঐ অল্প সংখ্যারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতা তাঁহাদিগকে যাঁহাদের করন্যস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের যদি ঐ সম্প্রদায়ের উপর অণুমাত্র কৃপা দৃষ্টি থাকিত, যদি উহাঁরা প্রকৃত উৎসাহ পাইতেন তাহা হইলে জন-সাধারণেরও প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইত এবং ঐ সকল লোককেও অন্নাভাবে অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতে হইত না।

পরিণামদর্শী রামমোহন দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা এক প্রকার জানিতে পারিয়াছিলেন। একারণ তিনি নানা উপায় অবলম্বন করেন। হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হইলেও তিনি স্বদেশের শিক্ষা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি অন্যের উপর সবিশেষ নির্ভর করিয়া সুস্থ থাকিবার লোক ছিলেন না। এ কারণ আপন ব্যয়ে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এ দেশীয় বালকবৃন্দকে যথার্থ নীতি শিক্ষা দেওয়াই উক্ত বিদ্যালয়টীর প্রধান উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় সেটী অনেক দিন হইল জলবিম্বের ন্যায় জলের মিশিয়া গিয়াছে। কি পরিতাপ! যে রামমোহন দেশের জন্য সকল বিসর্জ্জন দিয়া ছিলেন, দেশের মঙ্গল সাধনই যাঁহার জীবনের একমাত্র স্বার্থ ছিল, সেই রামমোহন রায় কি বাক্যেই পরিণত হইয়া থাকবেন? তিনি আমাদের সুবিস্তীর্ণ মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছেন বটে, কিন্তু কই তাহারত এমন কিছু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না! এমন কি কেহ নাই যিনি কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন স্বরূপ তদীয় শ্রদ্ধাস্পদ নামে স্থায়ী কোনরূপ ব্যবস্থা করেন? অমুকের অভ্যর্থনার্থ সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করা হইল, অমুক—অমুক পথ দিয়া গমন করিবেন—একারণ প্রভূত অর্থের শ্রাদ্ধ করা হইল। কই আমাদের মনো-রাজ্যাধিকারী রামমোহন রায়ের স্মরণার্থে কেহ এক কপর্দ্দকও ত ব্যয় করিতে অগ্রসর হইলেন না! ইচ্ছা করিলে কি একা বঙ্গবাসি-

গণ তদীয় মহামান্য নামে একটী বৃত্তি স্থাপন করিয়া বৎসরে বৎসরে এক একটী যুবককে ইংলণ্ড প্রেরণ করিতে পারেন না? হায় কেন আর সে সব দুরাশা। যদি তাহাই সম্ভব হইত তবে কি আর চির-দুঃখিনী ভারতের এ দশা থাকিত।

বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব সর্ব্ব প্রথম তিনিই করেন; কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় পান নাই। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় এবং তৎপরবৎসর তিনি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক মহামান্য সহকারে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড গমন জন্য তাঁহার দৌত্যপদে নিযুক্ত হন। এবং স্নেহাস্পদ পালক পুত্র রাজারাম রায়, ও রামরতন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাস নামক দুই জন সহচর সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় উপনীত হইয়া তিনি যে সকল কার্য্য সম্পাদন করেন তাহা আর বিজ্ঞ সমাজের অবিদিত নাই। সুতরাং ঐ সকলের পুনরুল্লেখে নিরস্ত হওয়া গেল।

এই অসাধারণ ব্যক্তি ভারতকে শোক সাগরে ডুবাইয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড নগরীর অন্তঃপাতী ব্রিষ্টল নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়।

তাড়িত-বিজ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়।

তাড়িত চুম্বকত্বের আবিষ্ক্রিয়া। কুণ্ডলাকারে জড়িত তার সহযোগে তাড়িত-চুম্বকের বলাধিক্য। তাড়িত-চুম্বকতত্ত্ব। আম্পিয়ার দলের কার্য্য। গ্যালভানীয়-তাড়িত-পরিমাপক যন্ত্র অথবা গ্যালভানোমিতি যন্ত্র। তাড়িতবার্ত্তাবহ সম্বন্ধে ইহার নিয়োগ। চৌম্বকীয়-তাড়িতের আবিষ্ক্রিয়া-চৌম্বকীয়-তাড়িত-যন্ত্র। তেজোদ্ভূত-তাড়িত। ফ্যারাডে কর্ত্তৃক বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা তাহার তত্ত্বালোচনা। অভিনব নামকরণের প্রবর্ত্তনা। ডেনিএল্ কৃত ব্যাটারি। তাড়িত-রাসায়নিক-কার্য্য। বাষ্প হইতে তড়িদুদ্ভাবন। তড়িত-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থা।

প্রচণ্ড বলশালী ব্যাটারি সহযোগে কতিপয় অভিনব সত্যের আবিষ্ক্রিয়া হইল বটে, কিন্তু তাহার পর পাঁচ বৎসরাবধি কোন বিশেষ হিতকরী আবিষ্ক্রিয়া

হয় নাই। ডাক্তর বস্টক্ প্রণীত গালভানীয় তড়িতের ইতিবৃত্ত পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি অনুমান করেন যে ব্যাটারির সাহায্যে আবিষ্ক্রিয়ার শেষ হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখেন যে, আমরা ব্যাটারির চরমোন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছি। তাহা হইতে অধুনা আর কোন বিশেষ সত্যের আবিষ্ক্রিয়া সম্ভবপর নহে। ইহা ১৮১৮ খৃঃ অব্দে লিখিত হয় এবং তৎপর বৎসরেই তাড়িত-চৌম্বকত্বের আবিষ্কার দ্বারা তাড়িততত্ত্বাকাশে একটী অভিনব জ্যোতির আবির্ভাব হইল। তাড়িত তরলের সহিত চৌম্বকত্বের যে অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে তাহা পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিকদিগের পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু উহারা একই পদার্থ কি না তাহা তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদের এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে ফ্রাঙ্ক্‌লিন্ ও তাঁহার সম সাময়িক তড়িতবেত্তাগণ তাড়িত ব্যাটারির নিয়োগে কতিপয় ইস্পাত সলাকা মধ্যে চুম্বকের গুণ প্রদান করেন। এবং তাড়িত ব্যাটারি সাহায্যে যে চুম্বকের দিক-নির্দ্দেশক ধর্ম্মের বিনাশ অথবা তাহার বিপর্য্যয় সাধন করা যাইতে পারে তাহাও তাঁহাদিগের পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তড়িত ও চৌম্বকত্ব যে একই, অথবা একই প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র, তাহা কোন রূপ উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিতে ইতি-পূর্ব্বে কেহই সক্ষম হয়েন নাই।

কোপন্‌হেগেন্ নিবাসী সুবিজ্ঞ অধ্যাপক আর্‌ষ্টেড্ ঐ শেষোক্ত সত্যটী আবিষ্কার করেন। তদ্দ্বারা মানবজাতির একটী মহোপকার সাধিত হইয়াছে। ঐ আবিষ্কারের সহিত তাড়িত-বার্ত্তাবহের অঙ্কুরপাত হইল। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রচারিত করেন। তাহাতে তিনি তড়িত ও চৌম্বকত্বের প্রকৃতিগত একতা স্থাপন করণে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। তন্মধ্যে একস্থলে লিখিত থাকে যে, "গ্যালভানীয় তাড়িত ঘর্ষণোত্তেজিত তাড়িতাপেক্ষা গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করে, এবং গ্যালভানীয়-তাড়িতাপেক্ষা আবার চুম্বকশক্তি অধিকতর গূঢ় বা অলক্ষিতভাবে অবস্থিতি করে। তজ্জন্য চুম্বক শলাকা গ্যালভানীয় তাড়িতের আয়ত্তাধীনে নীত হইলে তাহার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে কিনা তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিৎ।" এই পরীক্ষাটী সহজেই সাধিত হইতে পারিত। তাড়িত-শ্রোত বিশিষ্ট কোন ব্যাটারির তারোপরি একটী চুম্বক শলাকা ধারণ করিলেই, তাহার দিক নির্দ্দেশক শক্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে কি না তাহা একেবারেই লক্ষিত হইত। কিন্তু আর্‌ষ্টেড্ নিজে অথবা তাঁহার প্রস্তাবনার অনুসরণে অন্য কোন তাড়িতবেত্তা বহুকালাবধি তাহার চেষ্টা করেন নাই, অথবা যদিও করিয়া থাকেন তাহার

কোন উল্লেখ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। পরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ উক্ত প্রস্তাবনার ১২ বৎসর পরে আর্‌ষ্টেড্ স্বয়ংই তাঁহার প্রস্তাবিত পরীক্ষা কার্য্যে পরিণত করেন। একটী চুম্বক শলাকা তাড়িত প্রবাহের দিকে ধারণ করিয়া দেখিলেন যে পরিচালক তারই চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত তাড়িত যে কোন পরিচালক দ্বারাই প্রবাহিত হউক না কেন, তাহাতে সমফলই লক্ষিত হইবে অর্থাৎ তাড়িত কোন ধাতুর তার দ্বারাই হউক অথবা কোন তরল পদার্থ মধ্যেই হউক প্রবাহিত হইলে তন্নিকটধৃত চুম্বক দণ্ডের সম বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে; অর্থাৎ তাহাতে চুম্বক শলাকা স্বধর্ম্মানুসারে নিয়ত উত্তর দিক নির্দ্দেশ না করিয়া তাড়িত প্রবাহযুক্ত তারের নিম্নে ধৃত হইলে ঠিক উত্তর হইতে বামদিকে এবং তাহার উপরে ধৃত হইলে দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায়।

উক্ত মহতী আবিষ্ক্রিয়া প্রচারিত হইবামাত্রই আগ্রহাতিশয় সহকারে তৎ পরীক্ষা পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তাহাতে উত্তরোত্তর তাড়িত বিজ্ঞানের এই অভিনব শাখার নবনব পল্লব অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। ফরাসী বিজ্ঞান-সভার বিখ্যাত অধ্যাপকদ্বয় আপে এবং এরাগো আবিষ্কার করেন যে পরিচালক তারকে কুন্তলাকারে জড়িত করতঃ তন্মধ্যে তাড়িত প্রবাহ প্রয়োগ করিলে ঐ তারের চৌম্বকত্ব অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড সমূহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে অধ্যাপক আর্‌ষ্টেডের আবিষ্ক্রিয়া যে বৎসর প্রচারিত হয় সেই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে এরাগো ফরাসীস্ বিজ্ঞান সভায় তাঁহা কর্ত্তৃক আর একটী অভিনব আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ প্রেরণ করেন;—যে তাড়িত-প্রবাহের লৌহ এবং ইস্পাত মধ্যে চুম্বক ধর্ম্ম প্রদান করিবার ক্ষমতা আছে। কোন লৌহ অথবা ইস্পাতদণ্ডের গাত্রে একটী সুদীর্ঘ তার জড়িত করিয়া তাহার দুই প্রান্ত একটী ব্যাটারির, প্রান্তদ্বয় সহিত সংলগ্ন করিবা মাত্র ঐ দণ্ড চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া অপর লৌহ বা ইস্পাতকে আকর্ষণ করে। সার. হাম্‌ফ্রে. ডেভিও স্বয়ং উক্ত আবিষ্কার সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাড়িত-প্রবাহের ঐ ধর্ম্ম লক্ষ্য করেন।

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা সমূহের দ্বারা আবিষ্কৃত হইল যে, তার-কুণ্ডল তাড়িত-প্রবাহ যুক্ত হইলে সর্ব্ব বিষয়ে চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, এবং তাড়িত-প্রবাহ রহিত হইলে তন্মুহূর্ত্তেই উক্ত ধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকে। আবার কুণ্ডল মধ্যে একখণ্ড লৌহ-দণ্ড স্থাপন করিয়া কুণ্ডলকে তাড়িত-স্রোত যুক্ত করিলে তাহার চুম্বক-ধর্ম্ম অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এবং ঐ লৌহ-দণ্ড ও চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দণ্ডটী বিশুদ্ধ এবং কোন কোমল লৌহ-নির্ম্মিত হইলে, কুন্তল মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ নিবৃত্ত হইলেই উহারও চুম্বক-ধর্ম্ম এককালীন তিরোহিত হইবে। কুণ্ডলের

পাক্ বা ফেরগুলি পরস্পরের যত সন্নিকটে বা গাত্রে জড়িত হইবে তাড়িত-প্রবাহ প্রদানে তাহার চুম্বকধর্ম্ম ততই প্রবলভাবে প্রকাশ পাইবে। কিন্তু কুণ্ডল উক্তরূপে জড়িত হইলে ফের সমূহ পরস্পর গাত্র সংলগ্ন থাকায় তন্মধ্যস্থ তাড়িত ফের হইতে ফেরে পার্শ্বভাবে সঞ্চালিত হইতে পারে, অর্থাৎ তাড়িত পূর্ব্ববৎ কুণ্ডল-তারের এক প্রান্ত দ্বারা প্রবেশ করিয়া একাদিক্রমে এক দিকেই প্রবাহমান হওতঃ অপর প্রান্ত দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্যাটারির অপর প্রান্তে প্রবেশ করিবে না। তন্নিবাকরণ জন্য সমস্ত কুণ্ডল-তারের গাত্র কোন অপরিচালক পদার্থ দ্বারা উত্তমরূপে মণ্ডিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ ভার্নিস্ ব্যবহৃত হয়। তৎপরে রেশম অথবা তুলার সূতা সমস্ত তারের গাত্রে উত্তমরূপে জড়িত হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা কুণ্ডলের ফের সমূহ আর পরস্পরের গাত্র সংস্পর্শে আসিবে না। এতদ্দ্বারা তাড়িত-চুম্বকের বল ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। অর্থাৎ কোন লৌহ-দণ্ডের গাত্রে উত্তমরূপ মণ্ডিত তারের প্রথমে এক ফের জড়াইয়া তাহার উপর আর এক ফের, এইরূপে ক্রমিক যত অধিক ফের উপর্য্যুপরি জড়াইবে তন্মধ্যস্থ তাড়িত-স্রোতের ততই বলাধিক্য হইবে, সুতরাং লৌহ দণ্ডের চুম্বক ধর্ম্মও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ তাড়িত-চুম্বকের আকর্ষণে ২, ৩ মণের অধিক পরিমাপক দ্রব্যের উত্থান দেখা গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাড়িত স্রোতের নিবৃত্তি মাত্রেই এবম্প্রকার প্রভূত বলের অংশিষ্ট আর কিছুমাত্রও অনুভূত হইবে না।

এতদপরে সংক্রামক কুণ্ডলের—Induction or Intensity Coils-আবিষ্ক্রিয়া হয়। ঘর্ষণোত্তেজিত-তাড়িত-সংক্রামণ কাহাকে বলে, এবং তাহার ধর্ম্ম ও কার্য্য কিরূপ তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে গ্যালভানীয় তাড়িত-স্রোত-সংক্রামণ, এবং তাহা হইতে সংক্রামণ কুণ্ডলের আবিষ্ক্রিয়া হইল।

তাড়িত-স্রোত বিশিষ্ট কোন তারের সন্নিহিত অপর একটী তার স্থাপিত করিলে তন্মধ্যেও তাড়িত-স্রোত উপসংক্রামিত হয়, অর্থাৎ একটী সুদীর্ঘ-তার লইয়া তাহার প্রান্তদ্বয় ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন করিলেই তার মধ্যে তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সেই তারের সন্নিকটে অথচ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে অপর একটী তার স্থাপন করিবা মাত্র তন্মধ্যেও তাড়িত-স্রোতের সত্ত্বা অনুভূত হইবে। দ্বিতীয় তারের সহিত ব্যাটারির অথবা প্রথম তারের কোনরূপ সংস্রব নাই, অথচ তাড়িত-স্রোত-যুক্ত প্রথম তারের কেবল মাত্র সন্নিহিত স্থাপন জন্যই দ্বিতীয় তার মধ্যে তাড়িত-স্রোতোদ্ভূত হইতেছে। এবম্প্রকারে জনিত তাড়িত-স্রোতকে সং-

ক্রামিত স্রোত—Induced current-কহে। এবং সেই কার্য্যকে তাড়িত স্রোত—সংক্রামণ কহে। এবং ব্যাটারি সংযুক্ত তার মধ্যস্থ তাড়িতকে ব্যাটারি স্রোত অথবা আদ্য-স্রোত কহে—Battery or Primary current. সংক্রামিত এবং ব্যাটারি তাড়িত-প্রবাহের মধ্যে এই প্রভেদ লক্ষিত হয় যে, যাবৎ ব্যাটারির প্রান্তদ্বয়ের সহিত কোন তারের সংযোগ থাকিবে তাবৎ ঐ তার মধ্যে আদ্য বা ব্যাটারি স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে, কিন্তু সংক্রামিত স্রোত ক্ষণস্থায়ী মাত্র, অর্থাৎ আদ্য স্রোতের নিকটে অপর একটী তার ধারণ করিবামাত্রই তন্মধ্যে সংক্রামিত স্রোত প্রবাহিত হইবে, কিন্তু তৎপরক্ষণেই তাহা তিরোহিত হইবে, তাহার কোন কার্য্যই লক্ষিত হইবে না। কিন্তু যদ্যপি, আদ্য-স্রোতের বিচ্ছেদ সম্পাদন করতঃ, অর্থাৎ আদ্য স্রোতাধার তারের এক প্রান্ত ব্যাটারি বিযুক্ত করিয়া পুনরায় ব্যাটারি সংযুক্ত করতঃ আদ্য স্রোতচক্র সম্পূর্ণ করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সংক্রামিত স্রোত অধিকতর বেগে পুনরাগমন করিবে। কিন্তু আবার ক্ষণৈক পরেই তিরোহিত হইবে। এইরূপে যদ্যপি আদ্য স্রোতচক্রের একবার বিচ্ছেদ আবার সম্পূর্ণতা পুনঃ পুনঃ অতি সত্বরে সাধন করা যায়, তাহা হইলে সংক্রামিত-স্রোতের অসদ্ভাব ও পুনরাবির্ভাব পুনঃ পুনঃ এরূপ সত্বরে সংসাধিত হইবে যে তাহাতে সংক্রামিত স্রোত একাদিক্রমে ও অবিচ্ছেদে প্রবাহিত বলিয়া উপলব্ধি হইবে।

উপরোক্ত কতিপয় আবিষ্কার অবলম্বনে সংক্রামণ-কুণ্ডলের আবিষ্কার হইল। পারিস নিবাসী রুম্‌কুর্ফ কর্ত্তৃক উক্ত যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে উহার একরূপ আবিষ্কর্ত্তা বলিলেও হয়। ঐ যন্ত্রটীর গঠন এইরূপ:—৪ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ৩, ৪ ইঞ্চ ব্যাস পরিমিত একটী কাগজের চোঙ্গা প্রস্তুত করতঃ তাহার গাত্রে সরু তাম্র তার (রেশম বা সুতা দ্বারা সমস্ত গাত্র মণ্ডিত) দুই তিন থাক উপর্য্যুপরি জড়িত থাকে। এবং ঐ চোঙ্গার মধ্যে তাহার দৈর্ঘ্য পরিমিত শতাবধি লৌহ তার পুঞ্জ স্থাপিত থাকে। এইরূপে যন্ত্রের প্রথমাংশটী প্রস্তুত হয়। ইহাকে আদ্য-কুণ্ডল কহে—Primary Coil—। ঐ আদ্য কুণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমিত এবং তাহার ব্যাসাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ ব্যাস পরিমিত ঐরূপ আর একটী কাগজের চোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে আদ্য কুণ্ডলকে স্থাপন করিবে। তৎপরে আদ্য-কুণ্ডলের তারাপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলাকার সুদীর্ঘ তাম্রতার লইয়া বিচ্ছেদক রেশম অথবা তুলার সূতা দ্বারা পূর্ব্ববৎ তাহারও সমস্ত গাত্র মণ্ডিত করতঃ ঐ দ্বিতীয় চোঙ্গার গাত্রে অন্ততঃ ৪, ৫ ফের উপর্য্যুপরি জড়াইবে। এক্ষণে যন্ত্রের দ্বিতীয় অঙ্গটী প্রস্তুত হইল। ইহাকে নৈমিত্তিক কুণ্ডল কহে—Secondary Coil। আদ্য কুণ্ডলের তার-

প্রান্তদ্বয় ব্যাটারি সংযুক্ত থাকে, এবং নৈমিত্তিক কুণ্ডলের তার প্রান্তদ্বয় কিয়ৎ পরিমাণ তারের সহিত বাহির করা থাকে। তদ্দ্বারা পরীক্ষাসমূহ সংসাধিত হয়। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে আদ্য তাড়িতস্রোত-চক্র সম্পূর্ণ হইবা মাত্রই একবার নৈমিত্তিক কুণ্ডলে সংক্রামিত তাড়িত-স্রোতের উদ্রেক হইবে, তৎপর-ক্ষণেই আদ্য-স্রোত সত্তেও ঐ সংক্রামিত স্রোত নিবৃত্ত হইবে। এরূপাবস্থায় যন্ত্রটী অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে। ইহার আর একটী অঙ্গ আছে, তদ্দ্বারা আদ্য-স্রোত-চক্র ক্রমিক অতি দ্রুতবেগে এক-বার ভঙ্গ ও পরক্ষণেই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা নৈমিত্তিক কুণ্ডল মধ্যে সংক্রামিত স্রোত একাদিক্রমেই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং এই তৃতীয় অঙ্গটী সংক্রামণ-কুণ্ডল যন্ত্রের একটী প্রধানাঙ্গ বলিতে হইবে। ইহা ব্যাটারির সহিত আদ্য-কুণ্ডলের সংস্পর্শ বিচ্ছেদ করে বলিয়া ইহাকে সংস্পর্শ-ভেদক কহে। এইরূপে আদ্য কুণ্ডল, নৈমিত্তিক কুণ্ডল এবং সংস্পর্শ-ভেদক, এই তিন অঙ্গের যোগে সংক্রামণ কুণ্ডল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন সামান্য ব্যাটারির তাড়িত-বল এই যন্ত্রযোগে অদ্ভুত পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভলটীয় তাড়িত তত্ত্বালোচনা সম্বন্ধে একটী পরম হিতকরী যন্ত্র এই সময়ে আবিষ্কৃত হয়। ইহাকে গ্যালভানোমিত যন্ত্র কহে। এতদ্দ্বারা গ্যালভানীয় ব্যাটারি জনিত অতি অল্পমাত্র তাড়িত পথ, পরিমিত হইয়া থাকে। তাহার সত্তা উপায়ান্তর দ্বারা উপলব্ধি হয় না। দিগ-দর্শন যন্ত্রের ন্যায় ক্রম-বিনাস্ত এক খণ্ড বৃত্তাকার কাগজ খণ্ডের কেন্দ্র স্থানে উর্দ্ধাধঃ ভাবে একটী শুচ্যগ্র দণ্ড স্থাপন করতঃ তাহার অগ্র ভাগোপরি একটী চুম্বক শলাকার মধ্যদেশ শিথিল ভাবে স্থাপিত থাকে। তাহাতে শলাকা যৎ-সামান্য মাত্র বল সহযোগে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে। কিন্তু উহা নিজ ধর্ম্মানু-সারে সততই উত্তর ও দক্ষিণ দিকাভিমুখে এবং শলাকার সহিত সমান্তরাল ভাবে একটী তার-কুণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কোন ব্যাটারীর তাড়িত-বল পরীক্ষা কালীন অর্থাৎ ব্যাটারি মধ্যে তাড়িতের উদ্রেক হইয়াছে কি না অথবা কি পরি-মাণেই হইয়াছে জানিতে ইচ্ছা হইলে ঐ তার কুণ্ডলের প্রান্তদ্বয় ঐ ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। তাহাতে কুণ্ডল মধ্যে তাড়িত-স্রোতের সমাগম হেতু চুম্বক-শলাকা উত্তর দক্ষিণ দিকাভিমুখ হইতে সরিয়া যাইবে, কুণ্ড-লের উর্দ্ধ ও অধঃদেশের সহিত আর সমান্তরাল ভাবে থাকিবে না। শলাকা নিম্নস্থ কাগজ—চক্র দৃষ্টে অনুভূত হইবে উহা কয় ক্রম সরিয়াছে। সুতরাং তাহাতে ব্যাটারির আপেক্ষিক তাড়িত-বল ও জানা যায়।

গ্যালভানোমিতি যন্ত্রের আবিষ্কারের পর কতিপয় বৈজ্ঞানিক দুরান্তরে বার্ত্তাব-

জন্য উহার উপযোগিতা কল্পনা করেন। তদবধি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অনেকানেক তত্ত্ববেত্তা কর্ত্তৃক বিবিধাকারের তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। ক্রমে বিবিধ সংস্করণের পর এক্ষণে দুইটী গ্যালভানোমিতি যন্ত্রের চুম্বক শলাকার বিবিধ পার্শ্বিক হেলন দ্বারা দূরান্তরে নিমেষ মধ্যে সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরিত হইতেছে। দূরন্তরে বার্ত্তাবহন জন্য তাড়িত নিয়োগের কল্পনা এই যে নূতন হইল এমত নহে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেনিভা নিবাসী লিসার্জ্ সাহেব সর্ব্ব প্রথম ঘর্ষণোত্তেজিত তাড়িতের সাহায্যে উহার প্রবর্ত্তনা করেন। ভাষার অক্ষরের সংখ্যানুসারে তিনি ২৬টী তার দুইটী দূরবর্ত্তী স্থান মধ্যে স্থাপন করেন। প্রত্যেক তারের প্রান্তদ্বয়ে একটী করিয়া লঘু বর্ত্তুল-তাড়িতমিতি যন্ত্র সন্নিবেশিত থাকে। এক একটী যন্ত্র এক একটী অক্ষর বোধক। অর্থাৎ উক্ত যন্ত্রবাশীর একদিক হইতে ক্রমান্বয়ে সমস্ত গুলির, ভাষার আদ্যাক্ষর হইতে শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত নাম ধার্য্য করিলেন। প্রথম যন্ত্রটী এ. বোধক দ্বিতীয়টী বি. বোধক এইরূপে শেষটী জেড. বোধক। পূর্ব্বোক্ত এক স্থান হইতে অপরটীতে কোন সংবাদ প্রেরণ কালীন ঐ লঘু-বর্ত্তুল-তাড়িতমিতি যন্ত্রের ধাতুর দণ্ডোপরি একটী লিডেন বোতল যুক্ত হইত। তাহাতে ঐ মুক্ত তাড়িত সেই যন্ত্র সংযুক্ত তার মধ্যদিয়া ধাবিত হইয়া দ্বিতীয় স্থানটীতে উপস্থিত হইত; তথায় সেই তারের প্রান্তস্থ বর্ত্তুল-যন্ত্রটী ঐ তাড়িত প্রভাবে কার্য্যকারী হইবে। তদ্দৃষ্টে কোন্ অক্ষরটী প্রেরিত হইল তাহা একেবারে লক্ষিত হইত। এইরূপে সংবাদের প্রতি বাক্যের অক্ষরগুলি ক্রমান্বয়ে প্রেরিত হইত। কিন্তু উক্ত উপায়ে সংবাদ প্রেরণ কার্য্যতঃ অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া সাধারণত প্রচলিত হয় নাই। যে হেতু প্রত্যেক অক্ষরের জন্য স্বতন্ত্র একটী করিয়া তার দুইটী স্থান মধ্যে বিস্তারিত করা, এবং তাহার উভয় প্রান্তে একটী করিয়া তাড়িতমিতি যন্ত্র স্থাপন, সহজ ব্যাপার নহে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লোমণ্ড সাহেব উক্ত প্রথাটীকে অনেকাংশে সহজ করিয়া আনিয়া কেবল মাত্র একটী তার সহযোগে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সমস্ত অক্ষর প্রকাশক একটী যন্ত্র প্রস্তুত করেন।

অধ্যাপক আর্‌মষ্টেড্ কর্ত্তৃক তাড়িত-চুম্বকত্বের আবিষ্ক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে আঁপে গ্যাল্‌ভানীয় তাড়িত স্রোত সহযোগে চুম্বক শলাকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রকাশক স্পন্দন দ্বারা এক স্থানের সংবাদ অন্য স্থানে প্রেরণ করিবার কল্পনা করেন। কিন্তু তাহাতে প্রত্যেক সঙ্কেত বা অক্ষর প্রকাশ জন্য এক একটী করিয়া স্বতন্ত্র তার ব্যবহৃত হয়। তজ্জন্য তাঁহার ঐ আবিষ্কার অবলম্বন করিয়া একটী অভিনব যন্ত্র রচনা করেন। তাহাতে তিনি অনেক অসুবিধার নিরাকরণ করিয়াছিলেন। তদপরে

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০ দুই শত প্রকারের তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র রচিত হয়, কিন্তু তৎ সমস্ত গুলিই কোন না কোন প্রকারে বিশেষ অসুবিধা জনক বলিয়া কোনটিই কার্য্যতঃ পরিগৃহীত হয় নাই। উক্ত খৃষ্টাব্দে কুক্ সাহেব ও অধ্যাপক হুইট্‌ষ্টোন্ এই দুই মহাত্মার সমবেত উদ্যোগে যে যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হয় তাহাই এক্ষণে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে এক স্থানের তাড়িত-স্রোত একটী মাত্র ধাতব তার সহযোগে স্থানান্তরে যাইয়া তত্রস্থ তার-কুণ্ডল পরিবেষ্টিত লম্ব ও শিথিল ভাবে স্থাপিত একটী চুম্বক শলাকার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বিক বিবিধ স্পন্দন দ্বারা সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাতেই এক স্থানের সংবাদ অন্য স্থানে প্রেরিত হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত তাড়িত পরীক্ষাবলীর সমালোচনা করিয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তর ফ্যারাডে সিদ্ধান্ত করেন যে, যেরূপ তাড়িত-প্রবাহ সহযোগে চুম্বকের উৎপত্তি হইয়া থাকে তদ্রূপ চুম্বক-বল দ্বারাও তাড়িত স্রোতের আবির্ভাব হইতে পারে। তাড়িত সংক্রামণ কুণ্ডল ও গ্যালভানোমিতি যন্ত্রের সাহায্যে তিনি উক্ত অনুমানটী পরীক্ষা সিদ্ধ করেন। একটী স্তম্ভাকার ফাঁপা কাষ্ঠের চোঙ্গার গাত্রে সুদীর্ঘ তার দুই তিন ফের উপর্য্যুপরি জড়াইয়া তাহার প্রান্তদ্বয় একটী গ্যালভানোমিতি যন্ত্র সংযুক্ত করিয়া দেন। তৎপরে একটী প্রবল চুম্বক-দণ্ড লইয়া উক্ত স্তম্ভাকার চোঙ্গার মধ্যে স্থাপন করেন। তদ্দ্বারা গ্যালভানোমিতি যন্ত্রের চুম্বক শলাকার কোন স্পন্দন লক্ষিত হইল না। কিন্তু উক্ত দণ্ডটী সত্বরে বাহির করিবা মাত্রই ঐ চুম্বকশলাকার স্পন্দন দৃষ্ট হইল। আরও চুম্বকদণ্ড স্তম্ভ মধ্যে সত্বর প্রবেশ কালীন ও গ্যালভানোমিতি যন্ত্রস্থ চুম্বক শলাকার উক্ত রূপ স্পন্দন দৃষ্ট হইল।

ঐ সময়ে এরাগো নামক জনৈক ফরাসী তত্ত্ববেত্তা একটী বিশেষ অভিনব তাড়িতকার্য্য প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখেন যে একটী তাম্র চাকতিকে একটী চুম্বক-শলাকার সন্নিকটে ঘূর্ণীত করিলে, ঐ চুম্বক-শলাকা স্পন্দিত হয়। এরাগোর এই আবিষ্ক্রিয়াটী অবলম্বন করিয়া ফ্যারাডে এতৎ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তৎ সমস্তের ফল স্বরূপ তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, কোন ধাতব পদার্থ একটী চুম্বকের প্রান্তদ্বয়ের সন্নিহিত ঘূর্ণিত হইলে তাড়িত প্রবাহের উদ্রেক হইয়া থাকে। অধিকন্তু তিনি আরও পরীক্ষাসিদ্ধ করেন যে কোন চুম্বকের উভয় প্রান্তদ্বয়ের সন্নিকটে ধাতব চাকতির পরিবর্ত্তে তাম্র তার কুণ্ডল জড়িত একটী লৌহ-দণ্ড ঘূর্ণীত হইলে, প্রবল তাড়িত স্রোতোদ্ভব হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকারে চৌম্বকীয়-তাড়িত যন্ত্র নামক একটী অভিনব বলশালী যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া হইল। ঐ যন্ত্রোদ্ভূত তাড়িত

স্রোত বহুসংখ্যক ফলক-বিশিষ্ট প্রচণ্ড বলশালী গ্যালভানীব ব্যাটারি জনিত তাড়িত-বল অথবা ঘর্ষণোত্তেজিত প্রখর তাড়িত-বলের সহিত সমতুল্য। ঐ যন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতি অল্পব্যয় ও পরিশ্রমে নির্ম্মিত হয়।

এক্ষণে তাড়িতোদ্ভাবনার একটী অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইল। তাড়িত চৌম্বকত্ব আবিষ্কারের পর বৎসর ডাক্তার সিশবেক্ বিবিধ পরীক্ষার পর নির্ণয় করেন যে অর্দ্ধবৃত্তাকার দুইটী বিভিন্ন প্রকারের ধাতব ফলক লইয়া, (আনটিমনি এবং বিস্‌মথ্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট) তাহাদের উভয় প্রান্তদ্বয় অর্থাৎ এক প্রকার ধাতুর এক প্রান্ত অপর ধাতুর এক প্রান্ত সহিত এবং অপর দুই প্রান্ত ও পরস্পর সংযুক্ত করিয়া জুড়িয়া দিয়া একটী যোড়ের মুখ শীতল রাখিয়া অপরটী উত্তপ্ত করিলে, তাড়িত প্রবাহের উদ্ভাবন হয়। সেই তাড়িত-স্রোত উত্তপ্ত দিক হইতে শীতল দিগভিমুখে ধাতব চক্র মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে।

এতদপরে মোবিলি ও মিলনি সাহেবদ্বয় বহুসংখ্যক বিস্‌মথ ও এনটিমনি ফলকের সংযোজনা দ্বারা তাপোদ্ভূত তাড়িত-যন্ত্র রচনা করেন। ফলতঃ অপরাপর তাড়িত ব্যাটারির সহিত উক্ত যন্ত্রটীও অনেকাংশে সমতুল্য। ক্রমে উহা বিবিধাকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় এবং পরিশ্রম সহকারে অল্প মাত্র তাড়িত স্রোত উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য উক্ত রূপ ব্যাটারি এতাবৎ বিশেষ কোন উপকারে আইসে নাই।

কতিপয় তত্ত্ববিদের মতে উক্ত রূপ তেজোদ্ভূত তাড়িতই এই পৃথিবীর চুম্বক ধর্ম্ম সত্ত্বার একটী কারণ। পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেকাংশ যে সময় সূর্য্যরশ্মী দ্বারা উত্তপ্ত হয়, তাহার অপরাংশ সমস্ত অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। উত্তপ্ত অংশ হইতে তেজোদ্ভূত তাড়িত-স্রোত প্রতিনিয়তই ভূমধ্যে পৃথিবী বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এবং তন্নিমিত্তই পৃথিবীর কেন্দ্রদ্বয় চুম্বক ধর্ম্ম যুক্ত।

গ্যালভানীব ব্যাটারি সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে প্রত্যেক ব্যাটারির তিনটী মাত্র প্রধান উপকরণ, (১) লবণ, ক্ষার বা অম্লাক্ত জল, (২) তন্মধ্যে নিমজ্জিত দুইটী ধাতব ফলক, (৩) ব্যাটারি প্রান্তস্থ দুইটী যোজক তার।

দ্বিতীয় উপকরণ অর্থাৎ ধাতব ফলক দ্বয়ের মধ্যে একটী অপরাপেক্ষা যত অধিক রাসায়নিক বিয়োগ পরায়ণ হইবে, অর্থাৎ প্রথম উপকরণ সংস্পর্শে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অপর ফলকাপেক্ষা যত অধিক ক্ষয়িত হইবে, সেই পরিমাণে ব্যাটারিরও বলাধিক্য হইবে। দস্তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর এবং প্লাটিনম্ সর্ব্ব ধাতু অপেক্ষা অল্প রাসায়নিক বিয়োগপরায়ণ; সুতরাং ব্যাটারির দ্বিতীয় উপকরণ এক খণ্ড দস্তা ও এক খণ্ড প্লাটিনম্

হইলে ব্যাটারির যত বলাধিকা হইবে দস্তা ও তাম্র অথবা অন্য কোন ধাতুর যোগে তাদৃশ হইবে না। অল্প ব্যয় সাধ্য জন্যই দস্তা ও তাম্রই প্রায় ব্যবহৃত হয়। তাম্র ফলক সংযুক্ত যোজক তার মধ্যে যৌগিক তাড়িত প্রবাহিত হয়।

ঐ তারের প্রান্তকে ব্যাটারির যৌগিক কেন্দ্র বা প্রান্ত কহে এবং ঐ তাম্রফলককে বিয়োগিক ফলক কহে। আর দস্তার ফলক সংযুক্ত যোজক তার মধ্যে বিয়োগিক তাড়িত প্রবাহিত হয়। ঐ তারের প্রান্তকে ব্যাটারির বিয়োগিক কেন্দ্র বা প্রান্ত কহে, এবং ঐ দস্তার ফলককে যৌগিক ফলক কহে। ব্যাটারির যৌগিক প্রান্ত বিয়োগিক ফলক সংযুক্ত এবং বিয়োগিক প্রান্ত যৌগিক ফলক সংযুক্ত।

তাড়িত ব্যাটারির সাহায্যে কতিপয় লবণাক্ত যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ সাধিত হইয়া থাকে। ইংরাজী 'ইউ' অক্ষরাকার একটী কাচের ফাঁপা চোঙ্গা লইয়া, তাহাকে লবণ-দ্রব-সালফেট অব সোডিয়ম—(উত্তম রূপ লবণ-মিশ্রিত জল), পূর্ণ করিবে। লবণ স্বভাবতঃ সমক্ষারাম্ল-সলফিউরিক এসিড এবং সোডা এই দুই উপাদানীভূত পদার্থ নির্ম্মিত। তাড়িত বল দ্বারা ইহাদের বিশ্লেষণ এই রূপে সংসাধিত হইয়া থাকে; উক্ত চোঙ্গাস্থ লবণদ্রবের সহিত কিঞ্চিৎ ভায়োলেটের আরক-টিংচার অব ভাইওলেটস্ (ইহা বর্ণ) মিশ্রিত করিয়া দিবে। এক্ষণে একটী ব্যাটারির যৌগিক ও বিয়োগিক প্রান্তদ্বয় ঐ চোঙ্গার দুই পদ মধ্যে কিয়ৎক্ষণ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে লক্ষিত হইবে যে ঐ চোঙ্গার যে পদ মধ্যে যৌগিক প্রান্ত আছে তন্মধ্যস্থ দ্রব লোহিত বর্ণ ও বিয়োগিক প্রান্ত সংলগ্ন দ্রব পীতবর্ণ হইয়া যাইবে। ভায়ওলেটের আরক অম্ল সংশ্রবে লোহিত ও ক্ষার বা সোডা সংস্পর্শে পীতবর্ণ ধারণ করে। তাহাতেই স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে জলস্থ লবণ সমূহের উপাদানীভূত পদার্থদ্বয় অম্ল ও সোডা বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রথমটী যৌগিক ও দ্বিতীয়টী বিয়োগিক প্রান্তাভিমুখে গিয়া জমিবে।

পূর্ব্বোক্ত রূপে তুঁতিয়ার দ্রব (তুঁতিয়া, মহাদ্রাবক সালফিউরিক এসিড এবং তাম্র)ও জল, হইতে উহার অম্লাংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া যৌগিক প্রান্তে এবং ধাতবাংশ তাম্রকণা সমস্ত বিয়োগিক প্রান্তে গিয়া সংলগ্ন হয়।

কাষ্টিকির দ্রব (কাষ্টিকি, নাইট্রিক এসিড ও রৌপ্য) এবং জল হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া উহার অম্লাংশ যৌগিক, ও রৌপ্য বিয়োগিক প্রান্তে গিয়া সংযুক্ত হয়।

মিশ্র লাবণিক পদার্থের উক্তরূপ বিশ্লেষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কতিপয় তত্ত্ববিৎ একটী অভিনব হিতকরী আবিষ্কার করেন;—

১। তাড়িত-প্রবাহের সাহায্যে অল্প ব্যয় ও পরিশ্রম সহকারে টাকা, সিকি, ইত্যাদি, ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি অথবা থে

কোন পদার্থের ধাতব প্রতিকৃতি প্রস্তুত করণ।

২। তাড়িতের সাহায্যে গিল্‌টি করা; অর্থাৎ কোন ধাতব পদার্থোপরি স্বর্ণ স্তর স্থাপন করা। রৌপ্য স্তরও স্থাপিত হইবে।

৩। পুস্তকাদিতে যে সমস্ত চিত্র মুদ্রিত হইয়া থাকে তৎ সমস্তের প্রতিকৃতি অগ্রে কাষ্ঠ বা ধাতব ফলকোপরি চিত্রিত করিয়া খোদিতে হয় তাহার পর সেইটী মুদ্রিত হইয়া থাকে। খোদা ব্যাপারটী সহজ নহে। তাড়িত বল প্রয়োগ দ্বারা উক্ত কার্য্যের সমাধা।

১। মুদ্রা বা অন্য কোন পদার্থের প্রতিরূপ লইতে হইলে, প্রথমে মম বা তদ্রূপ অন্য কোন পদার্থ দ্বারা তাহার একটী ছাঁচ লইতে হইবে। সেই ছাঁচের সোজা দিক ফাঁপা বা নিম্ন হইবে; অর্থাৎ আসল পদার্থের যে যে স্থান উচ্চ, যেমন নাসিকা ওষ্ঠ, কর্ণ, চক্ষু, বা কোন অক্ষর, সেই সেই স্থান ছাঁচে নিম্ন বা গর্ত্তরূপ হইবে। এবং তদ্বিপরীত নিম্ন স্থান সমস্ত ছাঁচে উর্দ্ধ ভাবে থাকিবে ঐ ছাঁচের সোজা দিকের গাত্র সমস্ত একটী বুরুষে করিয়া কোন পরিচালক পদার্থ গ্রাফিট, বা শীশার গুঁড়া দ্বারা উত্তম রূপে আবৃত করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা তাম্র দ্বারা প্রতিকৃতি লওয়া যাইতে পারে। তাম্র দ্বারা হইলে, একটী মৃন্ময় বা কাচ পাত্রকে তুঁতিয়া দ্রব পূর্ণ করিবে। পরে একটী ব্যাটারির বিয়োগিক প্রান্তে ঐ ছাঁচটী সংলগ্ন করিয়া তাহাকে উক্ত দ্রব নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে এবং ঐ ব্যাটারির যৌগিক প্রান্তে এক খণ্ড তাম্রফলক সংযুক্ত করিয়া তাহাকে ঐ দ্রবে নিমগ্ন করিবে। এমন অবস্থায় তাড়িত স্রোত উক্ত দ্রব মধ্যে সঞ্চালন কালীন তুঁতিয়াকে বিশ্লিষ্ট করিবে। তাহাতে তুঁতিয়ার অম্লাংশ যৌগিক প্রান্তাভিমুখে গিয়া জমিবে এবং বিয়োগিক প্রান্তে, অর্থাৎ সেই প্রান্তস্থ ছাঁচের গাত্রে তাম্রকণা সমস্ত গিয়া দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইতে থাকিবে। এ প্রকারে অল্প বা দীর্ঘ কাল রাখিয়া ঐ ছাঁচের গাত্রে ইচ্ছানুরূপ পাতলা বা পুরু তাম্রস্তর স্থাপন করা যায়। উক্ত দ্রবস্থ তাম্রকণা সমস্ত ক্রমে ছাঁচোপরি লাগিয়া নিঃশেষিত না হয় তন্নিমিত্ত যৌগিক প্রান্তে একখণ্ড তাম্র ফলক সংযুক্ত থাকে। উপযুক্ত কালবাদে ঐ ছাঁচকে তুলিয়া লইয়া মম সমস্ত তুলিয়া পরিষ্কার করিলে দৃষ্ট হইবে যে ছাঁচানুরূপ একটী উত্তম তাম্র প্রতি-কৃতি রচিত হইয়াছে।

২। গিলডিং প্রকরণও প্রায় ঐ রূপ। যে ধাতব পাত্র বা দ্রব্যের গাত্রে স্বর্ণ স্তর স্থাপন করিতে হইবে, তাহাকে কেবল উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া লইয়া ব্যাটারির বিয়োগিক প্রান্তে সংলগ্ন করত স্বর্ণদ্রবে নিমগ্ন করিবে এবং যৌগিক প্রান্তে এক খণ্ড স্বর্ণ বাঁধিয়া তাহাকেও ঐ দ্রবে কিছুক্ষণ নিমগ্ন রাখিলে পূর্ব্বোক্ত ধাতব পাত্রটী স্বর্ণ মণ্ডিত হইবে। রৌপ্য ধরাইতে হইলে উক্ত রূপ প্রকরণেই হই-

যে, কেবল সুবর্ণ দ্রবের পরিবর্ত্তে রৌপ্য দ্রবের আবশ্যক এবং যৌগিক প্রান্তে রৌপ্য খণ্ড থাকিবে।

৩। খোদকের কার্য্যটী নিম্নলিখিত রূপে তাড়িত বলের সাহায্যে সম্পাদিত হইতে পারে।

এক খণ্ড ধাতব ফলকোপরি মমের একটী পাতলা স্তর স্থাপন করিবে। তৎপরে কোন সূচাগ্র যন্ত্র দ্বারা তদুপরি অভীষ্ট চিত্র কার্য্যটী সমাধা করিবে। ঐ চিত্রানুরূপ খোদিতে হইলে তাহার যে যে স্থান উচ্চ রাখিতে হইবে সেই সেই স্থানের মম তুলিয়া ফেলিয়া ধাতব ফলকের গাত্র বাহির করিয়া দিবে। নিম্ন স্থান সমস্ত সুতরাং মমাবৃত থাকিবে। এক্ষণে ঐ ফলককে ব্যাটারির বিয়োগিক প্রান্তে সংযুক্ত করিয়া তুঁতিয়া দ্রবে নিমগ্ন করিয়া যৌগিক প্রান্তে এক খণ্ড তাম্র সংলগ্ন করিয়া ঐ দ্রব মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে। ক্রমে ফলকের মম বিরহিত স্থান সমূহে তাম্রকণা গিয়া সংযুক্ত হইতে থাকিবে। মমের উপরে কোন কার্য্যই হইবে না। মমস্তরের উচ্চতা প্রমাণ মম শূন্য স্থান সমূহে তাম্রস্তর ধরিলে ফলককে তুলিয়া লইয়া মমগুলি বিনষ্ট করিয়া পরিষ্কার করিবে। এই প্রকরণের আনুসঙ্গিক কতগুলি অসুবিধা আছে। তন্নিবন্ধন এইটী এতাবৎ কার্য্যত বিশেষ উপকারে আইসে নাই। ক্রমে অধিকতর সংস্কারের পর যে এতদ্দারা বহুল পরিমাণে অর্থ ও পরিশ্রমের লাঘব হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দে সেণ্ট পিটার্সবর্গ নিবাসী জ্যাকোবি এবং ঐ বৎসরেই লিভরপুল নিবাসী স্পেন্সর, এই দুই পদার্থবিদ পরস্পরের অপরিজ্ঞাত ভাবে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের আবিষ্কার করেন। কিন্তু উঁহার পূর্ব্ব বৎসর, অর্থাৎ ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ডি. লা. নামক জনৈক ফরাসীস্ পণ্ডিত উক্ত আবিষ্কারের সূত্রপাত করিয়া যান।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাড়িতোদ্ভাবনের একটী অভিনব উপায় অবিষ্কৃত হয়। নিউক্যাসেলের অন্তঃপাতি সেজহিল্ নামক এক গ্রাম মধ্যে একটী বাষ্পীয় যন্ত্র স্থাপিত ছিল। ঐ যন্ত্রের হাঁড়ির গাত্রে এক স্থানে একটী ক্ষুদ্রায়তন ছিদ্র থাকায় তন্মধ্য দিয়া হাঁড়ির অন্তর্গত বাষ্প বেগে নির্গত হইত। একদা ঐ যন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক ঘটনা ক্রমে তাঁহার এক হস্ত হাঁড়ির আরক-কপাটে স্থাপন করিয়া অপর হস্ত ঐ নির্গমনশীল বাষ্প সংস্পর্শে আনিবা মাত্র যুগপৎ প্রখর জ্যোতির আবির্ভাব হইতে দেখিলেন এবং প্রবল তাড়িত সংক্ষেপ প্রাপ্ত হইলেন। এই অপরিজ্ঞাত ব্যাপারে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন। এবং ক্রমে দেখিলেন যে হাঁড়ির গাত্রের যে কোন স্থান স্পর্শ করিয়া অপর হস্ত ঐ বাষ্প সংলগ্ন করিলেই পূর্ব্ববৎ ফলোৎপত্তি হয়।

নিউক্যাসেল্ নিবাসী সার উইলিয়ম্

আমষ্ট্রং পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই, তাহার তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। এবং তৎসঙ্গে বিবিধ পরীক্ষাও সংসাধন করেন। তৎ সমস্তের ফল স্বরূপ তিনি একটী যন্ত্র রচনা করিলেন। বাষ্পীয় যন্ত্রস্থ হাঁড়ির আকার একটী মধ্যমাকৃতি ধাতব পাত্র চারিটী বিচ্ছেদক বা কাচের পায়ার উপর সন্নিবেশিত করিয়া একটী বাষ্পীয়-তাড়িত যন্ত্র প্রস্তুত করেন তদ্বারা বিবিধ পরীক্ষা সংসাধনান্তে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে বাষ্পস্থ তাড়িত যৌগিক, এবং হাঁড়ির গাত্র বিস্তৃত তাড়িত বিয়োগিক। ঐ যন্ত্রের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ও প্রবল তাড়িত উদ্ভাবিত হয়।

এবম্প্রকারোদ্ভূত তাড়িত সম্বন্ধে বিবিধ মত প্রকটিত হয়। তৎকালীন কতিপয় তাড়িতবেত্তার মতে উষ্ণ বাষ্প মাত্রই অন্যবিধ পদার্থাপেক্ষা অধিকতর তাড়িত ধারণক্ষম। এবং আর্ম্‌ষ্ট্রং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রটীর কার্য্যকারিত্ব। কিন্তু ডাক্তার মহোদয় ফ্যারাডে কর্ত্তৃক কতিপয় সুনিপুন পরীক্ষা দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন হইয়াছে। তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে হাঁড়ির অন্তর্গত বাষ্পস্থ জল রেণু সমূহ ক্ষুদ্রায়তন ছিদ্র দিয়া বেগে নির্গমন কালীন ছিদ্রের চতুঃপার্শ্বস্থ হাঁড়ির গাত্রের সহিত ঘর্ষিত হইয়া তাড়িত উৎপত্তি করে। বাষ্পের পরিবর্ত্তে তিনি পেষিত বায়ু ও কতিপয় গ্যাস্‌কে ক্ষুদ্রায়তন ছিদ্র দিয়া বেগে নির্গত করিয়া সম ফল প্রাপ্ত হন। বায়ু অথবা গ্যাস সমূহ আর্দ্র অর্থাৎ জলকণা বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। উহারা পরিশুষ্ক হইলে হইবে না।

শেষোক্ত আবিষ্কারের পর হইতে এতাবৎ তাড়িত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন অভিনব সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই।

বঙ্গীয় কবি,

(হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র।)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে হেম বাবু বল, তেজ, ও গাম্ভীর্য্য সম্বন্ধে নবীন বাবু অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ তাহা কতক দেখাইয়াছি। পরে যখন বৃত্রসংহার ও পলাশীর যুদ্ধ কাব্যদ্বয় বিস্তৃত ভাবে সমালোচিত হইবে, তখন এইটী আরও সুন্দররূপে প্রতীয়মান হইবে। কোন জীবিত ব্যক্তির পুস্তক অনেক সময়ে মুক্তভাবে সমালোচনা করা কঠিন হইয়া উঠে! কখন কখন সত্যের অনুরোধে, অনেক অপ্রিয় কথা বলা আবশ্যক হয়। একটী কথা আছে,——

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন
ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
নানৃতঞ্চ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃ
সনাতনঃ। (মনু)

কিন্তু এই বচনটি সমালোচকদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে খাটে না। কেন না কোন লেখা সম্বন্ধে "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্," অপ্রিয় সত্য বলিবে না, এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে কোন মতেই প্রকৃত সমালোচনা করা হয় না। সমালোচক যেখানে গুণ দেখিবেন সেই স্থানেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিবেন, তাহার প্রতি পাঠকবর্গের যাহাতে দৃষ্টি পড়ে তাহার চেষ্টা করিবেন; এবং যেখানে দোষ দেখিবেন তাহা স্পষ্ট ও অভ্রান্ত ভাষায় নিন্দা করিবেন, এবং পাঠকের মনেও যাহাতে তাহার প্রতি যথোচিত ঘৃণার উদ্রেক হয় তাহার নিমিত্ত যত্ন করিবেন। এই প্রকার কর্ত্তব্যসাধনে তিনি, কেহ রুষ্ট বা তুষ্ট হইলে, ভ্রূক্ষেপ করিবেন না।

রুচি ও নীতি সম্বন্ধে নবীন বাবুর কবিতা হেম বাবুর অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম নবীন বাবুর কবিতার নীতি ও রুচি তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইবে কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা উত্তরোত্তর কলুষিত হইতেছে। ১ম ভাগ অবকাশরঞ্জিনীতে দুষিত রুচি ও প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়, তাঁহার পরবর্ত্তী কোন কোন কবিতাতে তাহা পূর্ণ—প্রকটিত হইয়াছে। "ভারতী" যেমন "মেঘনাদ বধ কাব্য" রচয়িতা মাইকেল কবি নহেন, অথবা ক্ষুদ্র কবি, ইহা প্রমাণ করিতে আয়াস পাইয়াছেন আমরা তেমনি নবীন বাবু কবি নহেন ইহা প্রমাণ করিতে বসি নাই। আমরা মনে করি নবীন বাবু কবি, বিশেষ প্রতিভাশালী কবি। নবীন বাবুর এই কবিত্বশক্তি আছে বলিয়াই, তাঁহার লেখার বক্ষ্যমান গুরুতর দোষ সকল বিশেষ রূপে দেখাইয়া দেওয়া এবং তাঁহার লেখার যে সকল গুণ আছে তাহা হইতে, তাঁহার লেখার দোষ স্বতন্ত্র করা আবশ্যক।

নবীন বাবুর কবিতা মধ্যে মধ্যে এরূপই সুরুচি-বিরুদ্ধ যে তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করাতে, ও তাহার কলুষিত চিত্র অনাবৃত-ভাবে প্রকাশ করাতে, হয়ত কোন কোন সুরুচি পাঠক আমাদিগের উপর বিরক্ত হইতে পারেন—আমরাও এই কার্য্যে অনিচ্ছার সহিত প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু প্রথমতঃ আমরা যখন নবীন বাবুর লেখাতে এই গুরুতর দোষ আরোপ করিতেছি, তখন তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ না করিলে, আমাদিগের উপর গ্রন্থকার ন্যায়তঃ বিরক্ত হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ অনেকে নবীন বাবুর পুস্তকের দুই এক স্থান পড়িয়া ইহার সাধারণ প্রবৃত্তি না জানিয়া বালক বালিকাদিগের হস্তে এই পুস্তক দিতে পারেন; আমরা ভরসা করি যদি তাঁহাদের

এই প্রস্তাব নয়নগোচর হয় তাহা হইলে তাঁহারা অপরিণত সন্তানদিগের নির্ম্মল কল্পনা নবীন বাবুর কুরুচি-প্রণোদিত লেখা পড়িয়া কলুষিত হইতে দিবেন না। সেই নিমিত্ত তাঁহার রচনা হইতে কয়েক স্থান আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। নবীন বাবু তাঁহার 'জুমিয়া-জীবন' নামক অসভ্য জুমিয়াদিগের সুখপরম্পরা আলোচনা করিয়া, সর্ব্বশেষ শ্লোকে চূড়ান্ত বর্ণনার স্বরূপ লিখিলেন——

ইচ্ছা হয়, হায়, ওই জুমিয়ার সনে
বিনিময় করি এই বাঙ্গালী জীবন,
শুয়ে ওই ধরাতলে, লয়ে প্রিয়া বক্ষঃস্থলে
লভি স্বর্গসুখ—ওই জুমিয়া জীবন

এই শ্লোকের প্রথমে নবীন বাবু লিখিলেন।

"ইচ্ছা হয়, হায়, ওই জুমিয়ার সনে
বিনিময় করি এই বাঙ্গালী জীবন।"

অধীন সভ্যতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন অসভ্যতা গ্রহণ করিতে যদি কবি ইচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে নিন্দা করি না; বরঞ্চ তাঁহাতে মনুষ্যত্ব আছে এই মনে করি। কিন্তু কবি যখন স্বাধীনতা, সরলতা ইত্যাদি জুমিয়া জীবনে যাহা কিছু ভাল আছে তাহা একে একে আলোচনা করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়া ফেলিলেন।

"শুয়ে ওই ধরাতলে,
ল'য়ে প্রিয়া বক্ষঃস্থলে
লভি স্বর্গসুখ,—ওই জুমিয়া জীবন।"

তখন আর কবির রুচি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কি বলিব? এই স্থানে কবির মনে স্বর্গসুখের ধারণা কি, তাহা পাঠক মনে করিয়া দেখুন। যদি হিন্দুদিগের স্বর্গের বর্ণনা ভার, এই সুরুচি ও সাধুদর্শী কবির হস্তে পড়িত, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা স্বর্গের এক অপূর্ব্ব চিত্র দেখিতাম——তাহা হইলে আমাদের আর, মহম্মদের সুলোচনা সহবাস সারভূত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ স্বর্গ-সুখের নিন্দা করিবার অধিকার থাকিত না। কবি, জুমিয়াগণের সুখের পূর্ণ বিকাশ দেখাইতে, সুরা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। সুরা না হইলে ইন্দ্রিয়-সুখের পূর্ণ আবির্ভাব হইবে কেন? সেই জন্য কবি, উল্লিখিত শ্লোকের কিছু পূর্ব্বেই, বলিয়া রাখিয়াছেন,—

প্রিয়াকর বিনিঃসৃত সুরা করি পান,
ওই ক্ষুদ্র মঞ্চে সুখে করিয়া শয়ন,
কাটে কাল মন সুখে
প্রেয়সী লইয়া বুকে,
অকৃত্রিম ভালবাসা জুমিয়া জীবন।

জুমিয়া সুরাপান করিয়াছে, ক্ষুদ্রমঞ্চে শয়ন করিয়াছে, প্রেয়সীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে "অকৃত্রিম ভালবাসা জুমিয়া জীবন"——অকৃত্রিম ভালবাসার আর বাকি থাকিল কি? কবি সুরাপান মাত্রেই বিশেষ কিছু মুগ্ধকর আছে বোধ করেন, অথবা কেবল "প্রিয়াকর বিনিঃসৃত সুরা" মুগ্ধকর বিবেচনা করিতেছেন, তাহা আমরা বিচার করিতে পারিতেছি না; তবে তাঁহার মতে সুরাপানের

ইন্দ্রিয় সুখ যে নিন্দনীয় নহে, বরঞ্চ ইচ্ছনীয় তাহা এ স্থানে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ, তিনি এই কবিতাতে জুমিয় দিগের মুগ্ধকর রীত নীতি বর্ণনা করিতেছেন। কবি তাঁহার পুস্তকের মধ্যে মধ্যে সুরার অতিরিক্ত ব্যবহার করিয়াছেন; যথা,——

দাও মোরে সুরাপাত্র ওই বিষবারি
* * * *
সুরা পাত্র, হায়! কত সন্তাপসংহারী
* * * *
কি পিপাসা আন সুরা আন বিষ ছুরি

(স্বপ্ন—উন্মত্ততা
অবকাশরঞ্জিনী ২য় ভাগ)

"ঢাল সুরা ঢাল গো আবার
ঢাল গো আবার, ঢাল পুনর্ব্বার,
দিব আজি সুখ সাগরে সাঁতার
ঢাল সুরা ঢাল ঢাল গো আবার"
(বুড়মঙ্গল অবকাশ রঞ্জিনী ১ম ভাগ)

"ঢাল সুরা স্বর্ণপাত্রে ঢাল পুনর্ব্বার"
(পলাসীর যুদ্ধ ৩ সর্গ, ১০ শ্লোক)

কিন্তু এই কয়েক স্থানে কোন দোষ দেখি না। স্বপ্ন—উন্মত্ততা"তে কবি প্রেম জনিত একটী উন্মত্ততা-সূচক মোহ স্বপ্ন বর্ণনা করিতেছেন, এবং উল্লিখিত ভাব গুলি কল্পিত উন্মত্ত ব্যক্তির কথা। আর বিষ ও ছুরি একত্রে উল্লেখ করায়, সুরা যে নিতান্ত সুখময় বস্তু তাহা অনুভব হইতেছে না। অন্য দুই স্থানেও কবির মতামত প্রকাশ পাইতেছে না। 'ক্লিওপেট্রা'তে সুরার অধিক ব্যয় হইয়াছে কিন্তু ক্লিওপেট্রার কথা পরে।

আমরা আবার কবির রুচি সম্বন্ধে কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"সুবর্ণ দর্পণ সম, অতি সমুজ্জ্বল,
শোভে অর্দ্ধ অনাবৃত চারু বক্ষঃস্থল"

পলাশীর যুদ্ধের এক স্থানে আমরা দেখি,—যুদ্ধের পূর্ব্ব রাত্রে, ক্লাইব, কল্য যে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন সেই বিষয়, একাকী তরুতলে বসিয়া গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন। হৃদয়ে কত আশা, কত ভয় সঞ্চার হইতেছে। তাঁহার মন অবশেষে অস্থির হইয়া উঠিল—তিনি আসন পরিত্যাগ করিয়া পদচালনা করিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে, চিন্তা-অবসন্ন মনে ও পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিয়া, নেত্র নিমীলিত করিলেন। অকস্মাৎ চারিদিক স্বর্গীয় সৌরভ-রাশিতে ভাসিয়া গেল তরল সঙ্গীতময় কোমল কুসুমবাদ্য বাজিতে লাগিল, গগণ প্রাঙ্গনে অপূর্ব্ব আলোকরাশি প্রতিভাত হইল, এবং সেই আলোকরাশি গগণ হইতে আস্তে আস্তে নিম্নে নামিতে লাগিল। অমনি——

সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্ম্মণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।
যুবতীর শুভ্রকান্তি, নয়ন নীলিমা,
রঞ্জিত ত্রিদিব রাগে অলক্ত অধর

শ্বেতাঙ্গ মজ্জিত শ্বেত উজ্জ্বল বসনে
খেলিছে বিজলি, রত্ন অমল প্রবরে,

তুচ্ছ করি মণি মুক্তা পার্থিব রতনে
ঝলিছে নক্ষত্রবাজী চরণ অঞ্চলে।
বেশ ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মত,
স্বর্গীয় শোভায় কিন্তু উজ্জ্বল সতত।

এ গুলি অবশ্য অতি সুন্দর, কিন্তু তার পর কবি লিখিলেন,—

অর্দ্ধ অনাবৃত পীন পূর্ণ পয়োধর ;
তুঁষার উরস,———

কবির রুচির চিরাভ্যস্ত দোষ কোথায় যাইবে? কবি অসভ্য জুমিয়াদিগের "অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু বক্ষঃস্থল" যেমন বর্ণনা করিলেন, ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীরও সৌন্দর্য্য বর্ণনা সেই প্রকার করিতে হইবেক। কবি বলিতে পারেন, অগ্রে যখন বলা হইয়াছে, "বেশ ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মত," তখন "অর্দ্ধ অনাবৃত বলাতে কি দোষ হইল? প্রথমতঃ, ইংলণ্ডীয় ললনা সকল সময়ই, অথবা সকল ইংলণ্ডীয় ললনাই, উরস অর্দ্ধ অনাবৃত করিয়া অন্যের সম্মুখে বহির্গত হয়েন এমন নহে। দ্বিতীয়তঃ যদি যথার্থই এই প্রকার বেশ সকল সময়ে ইংলণ্ডীয়া রমণীদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলেও ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী মানবীদিগের অপেক্ষা একটু অধিকতর লজ্জাশীলা হইলে দোষ ছিল না। তৃতীয়তঃ যদি তিনি নিতান্তই অতিলালিত বালিকার ন্যায় নবীন বাবুর ইচ্ছার অবাধ্য হইয়া, কথঞ্চিৎ লজ্জাহীন পরিচ্ছদে অর্দ্ধ অনাবৃত হইয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা হইলেও নবীন বাবু যে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ ভূষা দ্বারা চিত্রিত করিতে বাধ্য ছিলেন, তাহা আমাদিগের বোধ হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, শরীর অনাবৃত রাখিবার দেবতাদিগের চিরন্তন অধিকার আছে। আমরা অনেক সময় চিত্রে স্বর্গীয় জীবদিগকে বস্ত্র হীন দেখি বটে, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু নবীন বাবু এ স্থানে পরিচ্ছদে কোন আপত্তি করেন নাই, কেবল পূর্ণ পরিচ্ছদে তাঁহার আপত্তি দেখিতে পাইতেছি আশ্চর্য্য। ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীও নবীন বাবুর নিকটে অব্যাহতি পান নাই—তাঁহাকে তাঁহার "পীন পূর্ণ পয়োধর" "অর্দ্ধ অনাবৃত" করিয়া, নবীন বাবুর কল্পনা দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, নবীন বাবুর তুষ্টিসাধন করিতে হইয়াছে। আদিরস প্রিয় কালিদাস ও কুশের সমক্ষে, অযোধ্যার অধিদেবতাকে এ প্রকার "অর্দ্ধ অনাবৃত" করিয়া আনয়ন করেন নাই—তিনি কেবল মাত্র——তাঁহাকে "প্রবাসস্থ কলত্রবেশা" বলিয়া ক্ষান্ত ছিলেন *,

কবি পলাশীর যুদ্ধের আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,——

পুরাইতে পাপাশক্ত নবাবের মন
নাচে অর্দ্ধ বিবসনা শতেক সুন্দরী

* অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে
শয্যাগৃহে সুপ্ত জনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থ কলত্র বেশাম্
অদৃষ্ট পূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥ ৪
রঘুবংশম্ ষোড়শঃ সর্গঃ

যখন ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীকে নবীন বাবুর নিকট লজ্জাহীনা হইতে হইয়াছিল, তখন সৌন্দর্য্য-ব্যবসায়িনী নর্ত্তকীদিগের যে অর্দ্ধ বিবসনা হইতে হইবেক, তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। কিন্তু আমরা ভাবিয়াছিলাম, কবি তাহাদিগকে অর্দ্ধ বিবসনা রাখিয়া নিবস্ত হইবেন, এবং আশা করিয়াছিলাম, তাহাদের সম্বন্ধে বর্ণনার আর কোন অত্যাচার হইবে না। কিন্তু আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইল। কারণ পরে (১০ শ্লোকে) দেখি যে "বিবসনার পূর্ব্বে অর্দ্ধ শব্দটী কবি লোপ করিয়াছেন তিনি তাহাদিগকে আধখানা কাপড় হইতেও বঞ্চিত করিলেন। নর্ত্তকীদিগের বড়ই বিগ্রহ। কিন্তু কবি তাহাদের লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন। তাহারা সুরাপান করতঃ মোহান্ধ হইয়া গিয়াছে —— সুতরাং নবাবের ও নবীন বাবুর ও পাঠকের সমক্ষে একবারে বিবসনা হইয়া আসিবার তাহাদিগের কি আপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাঠক, পড়িবার সময় সুরাপান করতঃ মোহান্ধ হইয়া লজ্জাহীন হন নাই—এবং পাপাসক্ত নবাবের বিবসনা সুন্দরীদিগের দেহের অনাবৃত সৌন্দর্য্য, নবীন বাবুর সহিত, দেখিতে ইচ্ছুক হইবেন ভরসা করা যায় না। আমরা শ্লোকটী তুলিয়া দিলাম——

ঢাল সুধা স্বর্ণপাত্রে, ঢাল পুনর্ব্বার,
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান;
খাও ঢাল, ঢাল খাও, প্রেমপারাবার
উথলিবে, লজ্জাদীপ হইবে নির্ব্বাণ;
বিবসনা লো সুন্দরি! সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে২ নবাবের কাছে?
যাও তবে সুধা হাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনী সম বেণী দুলিতেছে পাছে;
চলুক চলুক নাচ, টলুক চরণ,
উড়ুক কামের ধ্বজা,—কালি হবে রণ।"

৩য় সর্গ—

কবি ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে সিরাজদ্দৌলা হয়ত অনঙ্গবাণে অবশ হইয়াছে, ইহা অনুমান করিয়া সব নর্ত্তকী-বারাঙ্গনাদিগকে আকর্ণ টানিয়া কটাক্ষবাণ সন্ধান করিতে পরামর্শ দিয়া, সুরা ঢালিতে অনুরোধ করিলেন। পরে বলিয়া দিলেন ইহাতে কামানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, "প্রেমপারাবার" উছলিয়া উঠিবে (এখানে কবি প্রেম ও কাম এই দুই শব্দের কোন প্রভেদ দেখিলেন না), আর লজ্জাদীপ নির্ব্বাণ হইবে। চতুর্থ এবং পঞ্চম চরণের ব্যবধানে, বোধ হয় কবি অনুমান করিয়াছেন যে নর্ত্তকীদিগের সুরাপান হেতু লজ্জাদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। সেই নিমিত্তই কবির কলুষিত কল্পনা যথেচ্ছাচারময়ী হইয়া আরম্ভ করিল,—

"বিবসনা লো সুন্দরি সুরাপাত্র করে" ইত্যাদি। এই শ্লোকের শেষ চরণে— নিতান্ত লজ্জাহীনতা প্রকাশ হইয়াছে—

"যাই"—(অবকাশ রঞ্জিনী, ২ ভাগ।) —এই কবিতাটী পাওয়া বোধ হয়, এক

জন রজনীর শেষভাগে বিদেশে যাইবার নিমিত্ত প্রেয়সীর নিকট বিদায় লইতেছে, প্রিয়তমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, হয়ত জীবনে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না, এই মনে করিয়া প্রণয়ী তাহার প্রণয়িণীর সহিত যে সকল সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করিতেছেন। একবার করিয়া "যাই" বলিতেছেন, আর একটী সুখ দুঃখের কথা বলিতেছেন। কবি নানা প্রকার কবিত্বময় সুখের বর্ণনা করিয়া, প্রণয়ী এবং প্রণয়িণীর শরীর-সম্মিলন কালের ইন্দ্রিয়সুখ বর্ণনা করা আবশ্যক ও উচিত বিবেচনা করিয়াছেন।

যাই,--

সেই সুখ,—কবে কার, নয়নে নয়ন,
থেকে থেকে মুখে মুখ, অধরে অধর
মদালস চারি চক্ষু স্থির সম্মিলন,
নয়নে নয়নে কথা,--সঙ্গীত সুন্দর

এইটী বোধ হয় বিদায় রাত্রির পূর্ব্বের কোন রাত্রির সম্মিলনের বর্ণনা। এই প্রেমিকযুগলের ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ কালে যে শারীরিক উল্লাস হইয়াছিল, ও কি প্রকারে তাহাদিগের চারি চক্ষু পাশব প্রবৃত্তি জনিত-রসে ঢুলু ঢুলু করিয়াছিল মদালস হইয়াছিল—তাহা অব্যক্ত রাখিলে লজ্জা ও সৎ প্রবৃত্তি উভয়ই রক্ষা হইত। এই "অকৃত্রিম প্রণয়ের" শারীরিক নৈশ অভিনয় দেখাইবার নিমিত্ত কোন সুরুচি গ্রন্থকার যবনিকা তুলিতেন না। আবার,

"যাই.—
হায় রে, সুখের দিন সুখের শর্ব্বরী
পশিল, প্রেয়সি! ওই স্মৃতির সাগরে
অনন্ত বিচ্ছেদ শিখা ওই ভয়ঙ্করী,
হইতেছে প্রজ্জ্বলিত পূরব অম্বরে।"

এই রাত্রি—পোহাইলে, পূর্ব্ব অম্বরে, প্রভাতে অরুণোদয়ের সহিত, প্রণয়ীর অনন্ত বিচ্ছেদ শিখা প্রজ্জ্বলিত হইবে। "অনন্ত বিচ্ছেদ-শিখা"—এই বিচ্ছেদানল কখন নির্ব্বাণ হইবে না—পুনর্ব্বার আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই—কেন? আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম প্রণয়ী রোমিওর ন্যায় কোন অপরাধ করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত চির নির্ব্বাসনরূপ রাজদণ্ড হইয়াছে। কিন্তু অপরাধ, রাজদণ্ড ইত্যাদির অন্য কোন স্থানে আভাস পাওয়া যায় না। তার পরে মনে করিলাম, তা নয়, হয়ত এ প্রণয়ী যুবা ভারতের গৌরবময় ভূতকালের কোন রাজপুত সেনা—বুঝি দুরাত্মা যবনেরা পঙ্গপালের মত আসিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে—কল্য যুদ্ধ হইবে, জয়ের কোন আশা নাই—কিন্তু রাজপুত কখন মৃত্যুকে ভয় করে নাই—মনুষ্যত্বের নিমিত্ত, স্বজাতীর গৌরবের নিমিত্ত, ভয়াবহ থার্ম্মপলি পথে সংস্থিত বীর চূড়ামণি লিওনিডাসের ন্যায়, নিশ্চিত-মরণ যুদ্ধে কল্য আপনাকে বলিদান দিবে—তাহারি নিমিত্ত তাহার প্রাণাধিকা প্রেয়সীর নিকট চিরকালের তরে বিদায় লইতেছে। কিন্তু পরে যুদ্ধের একটি কথাও

পাইলাম না—বীরপুরুষের স্বজাতীয় গৌরবের একটি কথাও নয়ন-গোচর হইল না। সমুদায় কবিতাই বালিকার ক্রন্দনের ন্যায়—ছোট মেয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির, মা বাপ, "বাছা মা আমার" বলিয়া কত করিয়া বুঝাইতেছে, কিন্তু সে কোন মতে শুনিতেছে না, আছড়াইয়া কাঁদিতেছে, কেবল বলিতেছে আমি কেমন করিয়া যাইব। কবিতার আর এক স্থানে দেখি,——

হায় রে নিশীথে সেই শঙ্কিত অন্তরে,
চুম্বন রোদন প্রতি রোদন, চুম্বন;
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা অস্ফুটিতস্বরে
প্রাণ পূর্ণ সম্ভাষণ, প্রতিসম্ভাষণ—

"সেই শঙ্কিত অন্তরে"——শঙ্কিত কেন? সেই চুম্বন এবং প্রতিচুম্বনের সময় প্রণয়ীর অন্তরে শঙ্কার সঞ্চার কেন? মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। এত ক্ষণ যাহা বুঝিতে পারি নাই শেষ পরে তাহা হয়ত বুঝিলাম—এখানে নায়ক পাপিষ্ঠ; নায়িকা ধর্ম্মচ্যুতা ও পরাধীনা। নির্জ্জন নিশীথে মুগ্ধা ও স্নেহশীলা নায়িকার সহিত পাপময় সম্মিলনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। কবির কবিতা "জ্যোৎস্না" ময়ী নায়িকা "জ্যোৎস্নারূপিনী," নায়িকার চত্বর "জ্যোৎস্নাস্নাত রজত-প্রাঙ্গন" তথাচ উল্লিখিত শ্লোকের সুখময় সম্মিলন কালে জ্যোৎস্নার উল্লেখ নাই। এটি অনবধান বশতঃ তাহা বোধ হয় না। কবি ইচ্ছা বশতঃই রজনীকে পাপানুকূল অন্ধকার আবরণে আবৃত করিয়াছেন। সেই ঘোরা, অন্ধকারময়ী রজনীতে, দুই জনে অস্ফুটিতস্বরে পাপময় সম্ভাষণে কথোপকথন করিতেছে। কাল-নিশীথে নায়কী ম্যাক্‌বেথ এবং তাহার ততোধিক পাপিষ্ঠা পত্নী রিপু বিশেষের উত্তেজনে হিতাহিতজ্ঞানে অন্ধ হইয়া, আতিথ্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, অনুতাপের ঘোর নরক-যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া, মহাভয়ানক নর হত্যা ও রাজ হত্যা ও অতিথি হত্যা সংসাধন করিল। এই নায়ক নায়িকাও, যেন অনুভব হয়, সেই নিশীথে রিপু-বিশেষের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, লোক-লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, পরিবারের চিরকলঙ্ক উপেক্ষা করিয়া, পবিত্র স্ত্রী-লোকের যে প্রাণস্বরূপ ধর্ম্ম তাহা উভয়ে যুক্তি করিয়া, হত্যা করিল। হত্যা করিবার সময় ম্যাক্‌বেথ ও তাহার পত্নী যেমন শঙ্কিত অন্তরে তাহাদিগের পাপময় চিন্তা অস্ফুটিত-স্বরে প্রকাশ করিয়াছিল এই পাপরত প্রেমিক যুগল তাহাই করিল। তবে ম্যাক্‌বেথের যখন পাপ-কার্য্য সমাধা হইল তখন তাহার পাপানভ্যস্ত চিত্তে অনুতাপের তীব্র অনল প্রবেশ করিল। কিন্তু এই নায়কের অনুতাপের কোনই চিহ্ন নাই। বরং পরে সে বলিতেছে যে মিলনের সকল ঘটনা গুলিই স্বপ্নবৎ বিলীন হইয়া যাইবেক, কিন্তু সে যে তাহার প্রণয়িনীর অধর-মদিরা পান করিয়াছে তাহা কখন ভুলিতে পারিবে না——তাহা তরলবিদ্যুৎবৎ অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং যাব

জীবন ধমনীর শোণিতে প্রবাহিত হইবে।

"যাই——

তার সব স্বপ্ন কিন্তু অধরে অধরে
যে মদিরা, প্রেমময়ি করিয়াছি পান,
তরল বিদ্যুৎমত পশি'ছে অন্তরে
শোণিতে শোণিতে তাহা রবে বিদ্যমান"

কি সুরুচি! প্রেমের কি উচ্চ আদর্শ, নীতির কি বিশুদ্ধ বিকাশ। "জুলিয়া জীবনে" কবির নিকট যেমন পাশব ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ স্বর্গ-সুখরূপে প্রতীয়মান হইল, তেমনি এখানে কবি নায়ককে বলাইলেন যে, তাহার নিকট সবই স্বপ্নবৎ হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই অধর মদিরা—যাহা সুখে পীত হইয়াছে—তাহা তিনি কখন ভুলিতে পারেন না। প্রণয়ের গভীর সাগর মন্থন করিয়া যে অমৃত—উঠিল তাহা এখানে অধরে বঙ্কিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি বলিতে পারেন ইহাতে দোষ কি—যখন কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস অধরকে "রতি স্বর্ব্বস্ব" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন* কিন্তু তিনি অধরকে রতি স্বর্ব্বস্ব বলিয়াছেন প্রণয় স্বর্ব্বস্ব বলেন নাই, আর কালিদাস যদিও মহাকবি, কিন্তু যিনি দেবদেবীর বর্ণনা করিতে এমনি অশ্লীল ভাবের অবতারণা করিয়াছেন যে সেই কারণে তাঁহার একখানি পুস্তকের অর্দ্ধাধিক লুপ্তপ্রায় হইয়াগিয়াছে, তিনি কখন রুচির আদর্শ হইতে পারেন না।*

"চিত্র"—একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী রমণীর আলেখ্যযুক্ত মূর্ত্তি কবির নয়নে বিভাসিত হইল। সুনীল গগণে পূর্ণিমার শারদশশী, সলিল শয্যায় সরস সরোজিনী, ভাদ্রমাসের পূর্ণ সলিলা ভাগীরথী সুখস্বপ্নদৃষ্ট নন্দনকাননের অপ্সরা কাহারও সহিত সে চারু চিত্রের তুলনা হয় না। তাহা দেখিলে মুগ্ধদৃষ্টি হইয়া অনিমিক্ লোচনে তাহার প্রতি তাকাইয়া থাকিতে হয়—ইচ্ছা করিলেও চক্ষু ফিরাইতে

* দুষ্মন্ত ভ্রমরোদ্বেজিতা শকুন্তলাকে অন্তরাল হইতে সস্পৃহ অবলোকন করিয়া বলিলেন

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥

*"কুমার সম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্ব্বত্র অনুশীলন আছে, অবশিষ্ট দশসর্গ একবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন অপ্রচলিত যে ওই দশসর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া অনেকে অবগত নহেন। এই দশসর্গ, কালিদাসের অলোকিক কবিত্ব শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, যে এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে তাহার হেতু এই বোধ হয় অষ্টম সর্গে হরগৌরীর বিহার বর্ণনা আছে। তাহা অত্যন্ত অশ্লীল"— ইত্যাদি "জগৎপিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া লোকে কুমার সম্ভবের শেষ দশ সর্গের রহিত করিয়াছে। আলঙ্কারিকেরাও কুমার সম্ভবের হরগৌরী বিহার বর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত ও অত্যন্ত দুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন" (শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরচিত প্রস্তাব।)

পারা যায় না—চিত্রিতের-মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়—মন সেই মাধুরীময়ী মূর্ত্তির সহিত মিশাইয়া যায়। এত দূর বেশ; কিন্তু কবির রুচি এপ্রকার বর্ণনাতে যেন বোধ হয় তুষ্টিলাভ করিতে পারে না। তার পর কবি বলিতেছেন

বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পড়েছে বামা কুসুমেষুশরে
কুসুম শয়নে; কিন্তু কুসুমে কি পারে
নিবাইতে যে অনল জ্ব'লছে অন্তরে?

আমরা বুঝিতে পারিলাম রমণী কুসুম শয্যায় শয়ানা। কেবল শুদ্ধমাত্র তাহা নহে—আর বুঝিতে হইবে বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি ঢলিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কি কারণে তাহা আমরা ঠিক স্থির করিতে পারি নাই—বিরহেতে, অথবা শরীরের ভার বশতঃ অথবা রতিপতি-শরাঘাতে, অথবা এই তিনটি কারণ একত্রীভূত হওয়ায় এই সুন্দরী এই প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। রমণী ঢলিয়া পড়িয়াছেন তাহার শেষোক্ত দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কবি কেমন সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, রমণী কুসুমেষু শরে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, অর্থাৎ মদন-লালসা-বহ্নি—পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাসনা—তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। সেই শীতল সুকোমল কুসুম-শয্যাতেও এই পাশবতাপ শমিত হইতেছে না। কেমন বিশুদ্ধ ভাব! পাঠকদিগকে দেখাইবার কেমন উপযোগী আলেখ্য!

সুগোল সুবর্ণনিভ চারুভুজোপরে
শোভে পূর্ণ বিকসিত—বদন কমল,
(রূপের কমল মরি, কাম-সরোবরে),
ভাস্কর বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল।

এই ললনার পূর্ণ বিকসিত বদনকমল সুগোল কনককান্তি মোহন বাহুযুগলোপরি কেমন শোভা পাইতেছে—মরি! তাহা বাসনা সরসীতে সৌন্দর্য্যের শতদলের ন্যায় টলমল করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? এই বদন-কমলের নলিনীনাথ কই? এই বাসনাতপ্ত যোষার বাসনা চরিতার্থ করিবার সামগ্রী কই? নবীন বাবুর মস্তিষ্কে, স্তরে স্তরে নিহিতা, সুরুচি বাহিনী চিন্তাগুলি পুনরাবৃত্তি করিতে, এবং কোথায় বা এরূপ ব্যাখ্যা করিতে লজ্জা বোধ হয়। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে কুরুচির চিন্তাগুলি আরও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা যাইত। তার পরের শ্লোকে,——

পয়োধর থর
বিশ্রামিছে অযতনে কাব্যের উপর,—
পুণ্যবান্ কবি—কাব্য পুণ্যের আকর।

তৎপরে,

বিনোদ বদন চন্দ্র, বিনোদ নয়ন
পল্লবে আচ্ছন্ন, পাঠে স্থির সন্নিবেশ';
অতুল—বিনোদতম—ত্রিদিবমোহন,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস আবেশ।

নয়ন, পল্লবে আচ্ছন্ন থাকিয়া কি প্রকারে, পাঠে স্থির সন্নিবেশ থাকিল, তাহা বুঝা যায় না। কবির ভাব, বোধহয়, নয়ন

আচ্ছন্ন প্রায়। সে কথা যাউক। কবি একবার ৪র্থ শ্লোকে "কুসুমেষু শর" ৫ম শ্লোকে "কাম-সরোবর" উল্লেখ করিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেন যে এই রমণীর "অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস-আবেশের" আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার ঠিক অর্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গে মদন-লালসার হাব ভাব প্রকাশ পাইতেছে, অথবা সেই অঙ্গনার প্রত্যেক অঙ্গই অনঙ্গের রঙ্গ-ভূমি-স্বরূপ—তাহা দেখিবামাত্র দর্শকের মনে মনোজের সঞ্চার হয়, ইহার মধ্যে যে অর্থই ঠিক হউক, এই সুন্দরী কামিনীকে নিতান্ত বিলাসিনী, নিতান্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত পশুর ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার পর আবার,——

সুনীল বসন
বিকাশিছে তলে তলে কনকলহরী

ইহার অর্থ কি? পলাশীর যুদ্ধে বর্ণিত "পাপাসক্ত নবাবের" নর্ত্তকীদিগের অনুকরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কাঞ্চন সদৃশদেহের মাধুরী লহরী নীলাম্বর তলে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কি সুরুচি! সকল দেশেই লজ্জা যাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছে কবির কল্পনা তাহা নিজের এবং পাঠকের দৃষ্টির বিচরণভূমি করা উচিত বিবেচনা করিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয় সম্ভোগ-লালায়িতা রূপসীর পাশব-প্রবৃত্তি-উত্তেজক চিত্র বারবিলাসিনীর গৃহের উপযোগী—যাহাদিগের অঙ্গের পাশব বাসনা উত্তেজিত করিয়া ঘৃণিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহাদিগের কক্ষ-প্রাচীরের ভূষণ হইতে পারে, কিন্তু ইহা ভদ্রলোকের পাঠ্য পুস্তকে কেন?

কবির প্রেম-বর্ণনা স্থানে স্থানে বিচিত্র প্রেমোন্মাদিনী নামক কবিতাতে প্রেমিকার চিত্র নিম্ন লিখিত শ্লোকে অঙ্কিত হইয়াছে

মুক্তকেশী
প্রসারিয়া দুই ভুজ উন্মাদিনী প্রায়
আসিছে ছুটিয়া যেন গ্রাসিতে আমায়
সচঞ্চল শ্বেতাঞ্চল
করিতেছে দলমল
পশ্চাতে চিকুর সনে,—কামের কেতন
সচঞ্চল সৌদামিনী আসিছে যেমন।—

এই স্থানে,—প্রেমের কি মোহিনী মূর্ত্তি! কল্পনার কি চমৎকারিণীস্ফূর্ত্তি! মনে কর তোমার প্রণয়িনী দুই বাহু প্রসারণ করিয়া "আসিছে ছুটিতে যেন গ্রাসিতে" তোমায়। তাহাকে তুমি প্রণয়িনী, না রাক্ষসী বিবেচনা করিবে—তুমি তখন ভয়ে বিহ্বল হইবে, না প্রেমে দ্রবীভূত হইবে—তখন তোমার গ্রাসোদ্যতা প্রণয়িনীর করাল কবল হইতে রক্ষা পাইবার চিন্তা করিবে, না তাহার ভীষণ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে তৎপর হইবে? বস্তুতঃ কবি এখানে দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থকে এক মনে করিয়াছেন—প্রেম এবং কাম।

অবকাশরঞ্জিনীর আর একটি মাত্র

কবিতা আলোচনা করিব তাহা "অপ্রকৃত স্বপ্ন"। নামটি পড়িয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম প্রকৃত পক্ষে ইহা স্বপ্ন মাত্র নহে—অর্থাৎ ইহা রূপক বর্ণনা—মনুষ্যহৃদয়ের কোন ব্যাপার অথবা বাহ্যিক জগতের কোন ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই রূপক কি তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না কবি বলিতেছেন

স্বপনের যবনিকা হলো উদ্ঘাটন
দেখিলাম দিব্য এক আনন্দ ভুবন

একবার ভাবিলাম এই আনন্দ ভুবন হয়ত আমেরিকা।

যুগলরমণী মূর্ত্তি বিজলির প্রায়
প্রবেশিল রঙ্গ ভূমে

এই যুগলমূর্ত্তি হয়ত স্বাধীনতা ও সুখ। সুশ্যামল জ্যোতিপূর্ণ কোন ভাগ্যবান একটি বুঝি আমেরিকানদিগের সুস্থির সাহস।—যুগল রমণী মূর্ত্তি মধ্যে তরুণীর সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,—

কৌলিন্য কালিমা কিন্তু পড়িয়া তথায়,
বিধাতার নিদারুণ হৃদয় জ্বালায়

এইটি ভাবিলাম হয়ত কুলজাত দাসত্ব প্রথা লক্ষ করিতেছে। যুগল রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া কবির স্মৃতির দ্বার খুলিয়াছিল তাহাতে ভাবিলাম কবি বুঝি ভারতের পুরাকালীন গৌরবের বিষয় স্মরণ করিতেছেন। তরুণীকে "পুণ্যফল" বলাতে মনে করিলাম হয়ত সুখ (তরুণী রমণী) বর্ত্তমান আমেরিকদিগের যে সকল পূর্ব্ব পুরুষ ইংলণ্ডের অত্যাচার হেতু আমেরিকাতে আসিয়া প্রথম অধিনিবেশ করেন তাহাদিগেরই পুণ্যের ফল কিন্তু দেখিলাম যে এই প্রকার বা অন্য কোন প্রকার রূপক ব্যাখ্যায় কবিতার অধিকাংশস্থানেরই সার্থকতা হয় না। সুতরাং অবশেষে মনে করিতে হইল অপ্রকৃত স্বপ্নের অর্থ এই যে—বর্ণিত বিষয় গুলি যদিও কবিতাতে স্বপ্নমাত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তথাচ পাঠক তাহাদিগকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মনে করিবেন। যদি ইহার অর্থ এই হয় তাহা হইলে কবিতাটীর স্থূল অর্থ বুঝা যায়—তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হয় কবি কোন ভদ্রলোকের বাটিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী ও দুহিতার নিকট পরিচিত হন।

এই দুই রমণী উভয়েই সুন্দরী কিন্তু তরুণীকে দেখিয়া তাঁহার মন কিছু অস্থির হইয়াছিল এই ঘটনাটি—কবিত্বপল্লবিত ভাষায় তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। বিশুদ্ধ রুচি অনুসারে এইটি লিখিত হইলে আমরা ইহা কোন দোষের বিবেচনা করিতাম না। যদিও কবিতারচয়িতাকেই এই কবিতার স্বপ্নদর্শক বলিয়া বোধ হয়, তথাচ আমরা এই বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকাতে স্বপ্নদর্শককে আগন্তুক ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিব। কবিতার ভাবে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তরুণী বিবাহিতা কবি তাঁহাকে স্বকীয় নামে স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় দিয়া, "নবীনা বলিয়া উল্লেখ না করিলেই

ভাল হইত। কবি অন্য কবিতাতে ও দুই এক স্থানে যেখানে স্ত্রীলোকের সংস্রব আছে সেখানে আপন নায়িকার সন্দেহ জনক ব্যবহার করিয়াছেন। এই প্রকার করিয়া কবিত্বের কি সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয় তাহা বুঝিনা। কবি অথবা আগন্তুক ব্যক্তি প্রবীণা রমণীকে দেখিলেন, অমনি তাঁহার পরলোকগতা জননীর মমতাপূর্ণ বদন মনে পড়িল, এবং নীরবে নয়ননীর নিপতিত হইল। এই স্থানে কবির ভাব অতি পবিত্র। কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি এই মাতৃশোকে কাতর হইয়া কি করিলেন?

শোকেতে কাতর হয়ে নবীনার পানে দেখিলাম—

আর যেমন নবীনাকে দেখিলেন অমনি অশ্রুবিন্দু বাষ্পীভূত হইল, তিনি দুঃখিনী মায়ের কথা সত্বরে সব ভুলিয়া গিয়া, "রূপবতী নবদুর্গার পেশোয়াজ কাঁচলি বসন ভূষণ সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে ব্যস্ত হইলেন। মরি! মাতৃশোকের কি দুর্দ্দমনীয় বেগ। তার পর সেই তরুণীকে কেমন দেখিলেন?

নবীন প্রণয়বশে নয়ন চপল
হাসিছে, হাসিতে পূর্ণ অধর যুগল

কবি প্রথমতঃ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই তরুণী বিবাহে অসুখানলে জ্বলিতেছেন, এই বোধ হইতেছে। তার পর "নবীন প্রণয়বশে" অর্থাৎ নব জাত প্রেম হেতু, নয়ন অস্থির হইল, হাসিতে অধরযুগল পূর্ণ হইয়া যাইল। যদি তাহাই সম্ভব হয়, সদ্যঃপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তি এই নবীন প্রণয় রহস্য কি প্রকারে জানিলেন। আবার এখানে নবীন বাবু সনাম প্রবেশ করাইয়াছেন, কিন্তু তাহার সার্থকতা দেখিনা আবার,

চারিচক্ষু মুহূর্ত্তেক হইল মিলন
আবেশে সে পদ্মনেত্র মুদিল তখন

আগন্তুক ব্যক্তির চক্ষুর সহিত তরুণীর চক্ষু যেমন মুহূর্ত্তেকের জন্য মিলিত হইল অমনি তরুণীর পদ্মনেত্র আবেশে নিমীলিত হইল—লজ্জাতে নহে, নম্রতাতে নহে, আবেশে নিমীলিত হইল। তার পর,

চলিলা নবীনা গর্ব্বে যৌবনে মাতিয়া
চলে যথা তরঙ্গিনী নাচিয়া নাচিয়া,

মরি! ভদ্রপরিবারের সম্মানার্হা কন্যার কি সুরুচি-সঙ্গত বর্ণনা। নবদুর্গা সদৃশী কন্যাটী নবযৌবনের গর্ব্বে বড়ই উন্মত্তা হইয়াছেন—এমন কি চলিতে হইলে ও নর্ত্তকীর ন্যায় না নাচিয়া নাচিয়া যাইতে পারেন না। ইহার পূর্ব্বে তাহাকে সরলা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার নয়ন সরল, দৃষ্টি সরল হাঁসি সরল এই সরলতাময়ী তরুণীর এত যৌবন-গর্ব্ব কি প্রকারে সম্ভব, যাহাতে তিনি একবারে মাতিয়া যাইতে পারেন। ইহাঁর জননীকে লজ্জাশীলা বলিয়া বর্ণনা করা হইল।

"লাজে অবনত মুখ অঞ্চলে আবরি"

কিন্তু এই নবযৌবনা, যাঁহার লজ্জার অধিক আবশ্যক, যাঁহার লজ্জা অধিক

স্বাভাবিক, তিনি কবির মতে যৌবন মদোন্মাদা—যৌবনের অহঙ্কারে উন্মাদিনী অর্থাৎ দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্যা। যদি এই কবিতাতে যথার্থই কোন পরিবারকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের মতে সেই পরিবারের সহিত বড়ই অযথা বর্ণনা ও স্বাধীনতা লওয়া হইয়াছে। এই কবিতাটী কবিত্ব বিষয়েও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ইহা নিতান্ত শিশুর লেখার ন্যায়। যুবতীর জননীকে দেখিয়া কবির বোধ হইল, যেন জনকতনয়াকে ধনুক ভাঙ্গিয়া, সভাতে আনয়ন করা হইল। বোধ হয় কবির জ্ঞান আছে, জনক দুহিতার যখন বিবাহ হয় তখন তাঁহার যুবতীর মাতা হইবার বয়স হইয়াছিল, তবে দুরদৃষ্ট ক্রমে এত দিন বর জুটিয়া উঠে নাই। রমণীদ্বয় বজ্রত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন, বসুন্ধরা "ঝিল্লিরবে" তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিলেন। ঝিল্লিরবের সম্ভাষণের মধুরতা বোধ হয় কবিদিগেরই অনুভবনীয়।

চলিছেন মহাগতি সম্মুখে সবার
পত্নীভাবে প্রবীনায় দেখি বার বার।

স্বামী স্ত্রীকে বারম্বার পত্নীভাবে দেখিতেছেন তাহারও কোন বিশেষ কবিত্ব দেখা যায় না। সংক্ষেপে এই কবিতাটীর কোন বিশেষ গুণ নাই দোষ অনেক। এইটী মুদ্রাঙ্কন করিবার ইচ্ছা কবি কেন দমন করিতে পারেন নাই বুঝা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে আরও অনেক স্থানে কবির কুরুচির প্রমাণ দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা করিলে নবীন বাবুর পুস্তকের নিন্দিত অংশ সকল এক স্থানে রাশীকৃত করা হয়। সেই নিমিত্ত কবির রুচির বিষয় কে... "ক্লিওপেট্রার" প্রতি একবার ... করিব।

ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে লাটীন ভাষায় ১৬ খানি, ইংরাজিতে ৬ খানি ইটালীয় ভাষায় অন্যূন ৪ খানি নাটক লেখা হইয়াছে।* কিন্তু কেবল কবিচূড়ামণি সেক্ষপিয়রই মৈশরী রাজ্ঞীর গুণ এবং দোষ যথাযথ চিত্রিত করিয়াছেন। এবং পাপের সহিত সহানুভূতি না করিয়া পাঠকের হৃদয় করুণ-রসে আর্দ্র করিয়াছেন, করণে (Corneille) ক্লিওপেট্রাকে রমণী-ভূষণ সর্ব্বগুণে ভূষিত করিয়া একটী হাস্যজনক বিকৃতি করিয়াছেন। ড্রাইডেনের ক্লিওপেট্রা ঐতিহাসিক ক্লিওপেট্রা নহে। ফ্লেচারও তাঁহার False one নামক নাটকে ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তাহাদিগের ক্লিওপেট্রা যতই সতী সাধ্বী হউক না কেন তাহা ইতিহাসের ক্লিওপেট্রা নহে, তাহা সেক্সপীয়রের ক্লিওপেট্রা নহে। কিন্তু নবীন বাবুর ক্লিওপেট্রাতে আমরা অপূর্ব্ব কাণ্ড দেখি; তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা গুলি স্বীকার করিতেছেন। কেবল দুই এক স্থানে "তুষার উরস" ইত্যাদি সামান্য স্বাধী-

* See the Chapter on Cleopatra in "The Characteristi cs of Women" by Mrs. Jameson.

নতা লইয়াছেন।* তিনি ইতিহাসের স্থূল বৃত্তান্ত গুলি স্বীকার করিয়াও যে কি প্রকারে তাহার রূপে মোহিত হইয়া প্রেমে দ্রবিত হইয়াছেন তাহা আমরা বুঝি না। নবীন বাবু ক্লিওপেট্রার কোন দোষ দিতে চাহেন না—তিনি বলিতে চাহেন সকলই অবস্থার দোষ। তিনি তাহার গ্রন্থের ভূমিকাতে বলিতেছেন "যাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করি, তাহার অবস্থায় পড়িলে কয়জন পৃথিবীতে পুণ্যবান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারি?" একথাটী অতি উচ্চনীতি ও উদার দয়াধর্ম্মের কথা, তাহা নিশ্চয়। একজন মানবহৃদয়জ্ঞ গ্রন্থকারও বলিয়াছেন,† ঈশাও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি পাপ পুণ্যের প্রভেদ নাই, তাই বলিয়া কি আমরা যাহাই করিব তাহাই অবস্থার উপর, প্রলোভনের উপর চাপাইয়া দিয়া নিজে মুক্ত হইতে পারি? তুল্য অবস্থাতে এক ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য ব্যক্তি কি উচ্চচরিত্র থাকে না।

একজন মৃত্যুভয়ে অভিভূত হইয়া সম্মুখে নিজের স্ত্রী কন্যার অপমান দেখিবে, একটী অঙ্গুলিও উত্তোলন করিবে না, অন্য একজন সেই অবস্থাতে নিজের শেষ শোণিত বিন্দু দিয়াও সহধর্ম্মিণীর ও দুহিতার মান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। সম্মুখে জগন্মোহিনী সুন্দরী রমণী—তাহাকে দেখিয়া শরীর তাড়িত-স্পৃষ্টবৎ হইয়াছে ক্ষমতা সীমাহীন—ইচ্ছা রোধ করিবার কেহই নাই—সেই অবস্থায় একজন সামান্য ব্যক্তি কি করে আর দিগ্বিজয়ী সিপিও কি করিয়াছিলেন ইহা বিশেষরূপে বিবেচ্য। শত্রুগণ বন্দী করিল, নানা প্রকারে পীড়ন করিল, সন্ধি করিবার নিমিত্ত বন্দীকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিল, বলিয়া দিল যদি সন্ধি না হয় তাহা হইলে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং মরিতে হইবে—এই স্থানে, সামান্য ব্যক্তি কি করে আর রেগিউলস্ কি করিয়াছেন, ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।—ধূমাবৃত যুদ্ধক্ষেত্রে শরীর নিদারুণ আঘাতে কাতর, দ্রুতবেগে শোণিত ক্ষরিত হইতেছে, পিপাসায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে—সেই সময় স্বহস্তধৃত অপীত বারিপাত্র প্রতি আর একজন হতভাগ্য আহত সেনা সলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এই অবস্থায় সামান্য ব্যক্তি কি করিবে আর

* Cleopatra was not fair. So Shakespeare gives her a tawny front. Strictly speaking she was not even handsome. All traditional records agree in stating that Cleopatra was not handsome, lineally handsome (Ch. and M. Clarke), Burton in his Anatomy of melancholy says something to the same effect.

† If you take temptations into account, who is to say that he is better than his neighbour "The Vanity fair" by Thackeray.

ফিলিপ সিড্‌নি কি করিলেন ইহাও সবিশেষ বিচার্য্য। কিন্তু তুমি বলিতে পার এই প্রকার ব্যক্তি সংসারে কয়টী? তোমার নিজের পরিবারের মধ্যেই কি এক অবস্থাতে দুই জন ব্যক্তিকে স্বতন্ত্ররূপ কার্য্য করিতে দেখিতে পাও না? যে অবস্থায় তুমি পড়িয়া অটল অবিচলিত থাকিলে, তোমার সহোদর সেই অবস্থাতে পাপপঙ্কে ডুবিল। যে অবস্থাতে তুমি অকুণ্ঠিত চিত্তে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবে, হয়ত তোমার পরিবারস্থ লোক এক একটা মুদ্রা ব্যয় করিতে, হৃদয়ের শোণিত নিঃসৃত হইল মনে করিবে। মনুষ্যের কার্য্য কেবল মাত্র বাহ্যিক অবস্থা গুণে নিরূপিত হয় না, আন্তরিক অবস্থার উপরও নির্ভর করে; আর আন্তরিক অবস্থা সকলের সমান নহে।

প্রলোভনের শক্তি ও মনুষ্য-হৃদয়ের দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া আমরা সকল সময় মুক্ত হইতে পারিনা। এক প্রকার অর্থে সকল দুষ্ক্রিয়াই দুর্ব্বলতা—নীতির দুর্ব্বলতা। সেই নিমিত্ত চাতুরীময়ী বিশ্বাসঘাতিনী স্বামী-স্বাধীনতা-নাশিনী ড্যালিলা (Dalilah) যখন দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া আপনার মহা পাপের অপনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন নীতি-বিশুদ্ধ মিল্টন উদার চরিত্র স্যামসনের মুখে বলিয়াছেন

> Weakness is thy excuse
> And I believe it; weakness to resist
> Philistine gold; if weakness may excuse,
> What murderer, what traitor, parricide,
> Incestuous, sacrilegious, but may plead it?
> *All wickedness is weakness:* that plea, therefore,
> With God or man, will gain thee no remission.

নবীন বাবুর আর এক যুক্তি, শিক্ষা। হইতে পারে ক্লিওপেট্রার দূষিত চরিত্র অধিকতঃ শিক্ষার ফল। সেই জন্য তুমি তাহার নিমিত্ত দুঃখিত হইতে পার, তাহার সেই শোচনীয় অবস্থার নিমিত্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পার, কিন্তু তাহাতে "মোহিত" হইবে কি বলিয়া? অনেক বারাঙ্গনা আছে যাহাদের অবস্থার নিমিত্ত আমরা হৃদয়ের সহিত দুঃখিত হইতে পারি, কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে আমরা তাহাদের "রূপে মোহিত" হইলাম, "প্রেমে দ্রবিত" হইলাম সেই মুহূর্ত্তে বুঝিতে হইবে, আমাদের অধঃপতন হইয়াছে বা শীঘ্র হইবে। "অভাগিনী ক্লিওপেট্রা সংসারের ঘোরতর ঝটিকায়, তাহার বিশালতম তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল বলিয়া কেনইবা পাপিনী হইল?" অবশ্য! ক্লিওপেট্রার কিছুমাত্র দোষ ছিল না। ক্লিওপেট্রা সতী সাধ্বী সরলা পবিত্রা। ক্লিওপেট্রা যে পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছিল, তাহাতে ক্লিওপেট্রার কিছুই দোষ নাই, সকলই বিধাতার দোষ। চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব না করিতে করিতে ভ্রাতাকে হত্যা করিল,

স্থান সেই—ক্লিওপেট্রা পাপিষ্ঠা নহে *। পম্পী ও সীজর ও আন্টনী †, ইহাদিগের মধ্যে যখন যাহার অদৃষ্ট চক্র উদ্ধগামী ছিল, তখনই তাহার নিকট যে ক্লিওপেট্রা ইচ্ছা করিয়া, গণনা করিয়া, আগ্রহ সহকারে আত্ম-শরীর ও ধর্ম্ম বারম্বার বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার নিমিত্ত সে পাপিষ্ঠা নহে;—যে ভীতি-প্রকম্পিতা, দেবমন্দিরাশ্রিতা ভগিনী আরসিনোকে পাপমন মুগ্ধ আণ্টনি দ্বারা হত্যা করাইয়াছিল তোমরা তাহার নিমিত্ত তাহাকে পাপিষ্ঠা বলিতে পারিবে না। কারণ নবীন বাবু বলিতেছেন ক্লিওপেট্রা 'পাপিনী' নহে। নবীন বাবু আক্ষেপ করিয়াছেন "ভারতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে এরূপ একটী রত্নও নাই"। হতভাগ্য ভারত! হতভাগ্য ভারতীয় সাহিত্য! হতভাগ্য কালিদাস—হতভাগ্য বাল্মিকী—হতভাগ্য ব্যাস—হতভাগ্য ভবভূতি! তুচ্ছ মাঘ, তুচ্ছ শ্রীহর্ষ, তুচ্ছ বাণভট্ট!—তোমাদিগের লেখনী গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র—। তোমরা ক্লিওপেট্রা সদৃশী লাবণ্যবতী কুলটাকে কবিত্ব-ভূষণে অলঙ্কৃত করিতে পার নাই—কুলটা-রাজ্ঞীর ("Queen of Harlots") "রূপে মোহিত" "প্রেমে দ্রবিত" হইতে পার নাই—তোমাদিগের জন্মই বৃথা। যে অপূর্ব্ব রত্ন তোমাদের একত্রীভূত ক্ষমতায় ভারত-সাহিত্য-ভাণ্ডারে আনয়ন করিতে পার নাই, তাহা ভারত কবিকুলতিলক সুরুচি কবি ভারতীয় সাহিত্যে আনিয়াছেন।

"ক্লিওপেট্রা" বিষয়ক কালীপ্রসন্ন বাবুর "ক্লিওপেট্রা অথবা কামিনী-কলঙ্ক" নামক একটী প্রস্তাব আমরা পড়িয়াছি। তাহার নীতি আর নবীন বাবুর রচনার নীতি—উভয় মধ্যে কত প্রভেদ। উভয়ই কৃতবিদ্য, উভয়ই বঙ্গের সুপরিচিত গ্রন্থকার। কিন্তু এক জনের গ্রন্থের নীতি কেমন উচ্চ কেমন নির্ম্মল, অন্য জনের পুস্তকের নীতি কত নীচ, কত আবিল। এক জন কেমন, সেক্সপীয়রের ন্যায় ক্লিওপেট্রার সাড়ম্বর মানসিক ও শারীরিক গুণপণা সমূহ নয়ন-গোচর করিয়াও, তাহার প্রেমলীলায় মুগ্ধ না হইয়া, ক্লিওপেট্রার ক্ষুদ্রতা নীচাশয়তা ও পৈশাচী প্রবৃত্তি সুন্দররূপ চিত্রিত করিয়াছেন; আর এক জন কেমন তাহার পাপময় "রূপে মোহিত" তাহার চাতুরীময় "প্রেমে দ্রবিত," এবং তাহার পাপ পরম্পরা-বিকৃত জীবনের প্রতি "আন্তরিক সহানুভূতি" প্রকাশ করিয়াছেন।

* "In the fourth year of their joint reign Cleopatra murdered her brother * *. If, we may believe the extant authorities Antony was even prevailed upon to order her sister Arsinoe, who had taken sanctuary in the temple of Diana at Ephesus, to be ... to death."

(Ch. Knight.) Life of Antony.

ক্লিওপেট্রার কলঙ্ক দূরপণেয়। "সহস্রযুগ ব্যাপিয়া অশ্রু বর্ষণ করিলেও তাহা ধুইয়া যাইবে না; কাব্যশাস্ত্র শত চেষ্টা করিলেও তাহাকে একটী কমনীয় মূর্ত্তি দিতে পারিবে না"। নবীন বাবু বলিতেছেন "ক্লিওপেট্রার প্রেম পুরোহিতের মন্ত্রে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল না——" ক্লিওপেট্রার প্রেম! সে প্রেম এমনি যে যখন আণ্টনি ক্লিওপেট্রার মৃত্যুবার্ত্তার মিথ্যাবাদ শুনিয়া স্বকীয় বক্ষঃস্থলে তরবারির আঘাত করিলেন এবং সেই আহত ও রক্ত প্লাবিত দেহে ক্লিওপেট্রার নিভৃত নিকেতনের দ্বারদেশে আনীত হইলেন "প্রেমিকা" তখনও পরিণাম সচিন্তা ও ক্ষতি লাভ গণনা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে সম্মত হইলেন না। মনুষ্যের প্রাণেও কি ইহা সহ্য হয়? আমাদিগের কথা অসন্দিগ্ধ-চিত্তে বলিতে পারি যে এই অপ্রতিম শোচনীয় ঘটনা যখন স্মরণ করি এবং আণ্টনির ভূতপূর্ব্ব রাজলীলার সহিত যখন তাঁহার তদানীন্তন দুরবস্থাকে মনে মনে একত্র করিয়া দেখি তখন শুধু ক্লিওপেট্রা অথবা কামিনী কুলকে কেন সমুদায় মানব জাতিকে আমরা অন্তরের সহিত ধিক্কার দি এবং মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হই।

আমরা নবীন বাবুর রচনার রুচি, প্রবৃত্তি ও নীতি সম্বন্ধে যে সমালোচন করিলাম হয়ত তাহা অতি তীব্র হইল। কিন্তু আমাদের যাহা দৃঢ় বিশ্বাস তাহাই মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলাম আমরা প্রতিযোগী কবি নহি, নবীন বাবুর কবিতার যশে বিদ্বেষ বশতঃ বা অন্য কোন কারণে এই সকল কথা বলিলাম না। নবীন বাবু যে এক জন প্রকৃত কবি আমরা তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছি এবং পরে তাঁহার কবিতার সৌন্দর্য্যময় স্থান সকল যথা সাধ্য দেখাইয়া দিব। স্পেনসার যাহা কবিশ্রেণী-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন * আমরা নবীন বাবুর কবিতা সম্বন্ধে প্রায় তাহাই বলি। তাঁহার কবিতাতে অনেক সৌন্দর্য্য অনেক কমনীয় ভাব আছে, আক্ষেপের বিষয় যে, যে স্বর্গীয় ক্ষমতা, ধর্ম্ম ও সততাকে বিভূষিত করিবার নিমিত্ত ভূলোকে প্রেরিত হইল, তাহা দুষ্ক্রিয়া ও পাপকে মোহিনী-শক্তি দিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হইল। ধর্ম্মযাচকের ন্যায় নবীন বাবুর প্রতি আমাদের উপদেশ দিবার কোন আবশ্যক নাই। তবে গ্রন্থকারগণ যখন কোন স্বরচিত পুস্তক সাধারণে প্রকাশ করেন, তখন সেই সকল গ্রন্থের ফলাফলের নিমিত্ত, তাঁহারা সাধারণের নিকট সম্পূর্ণ দায়ী।

---

* Their poems "were sprinkled with some pretty *flowers* of their natural device, which have good grace and comeliness into them, in which it is great pity to see abused to the *gracing* of wilderness and vice, which with good usage would serve to adorn beautify virtue. "The Ireland." Spenser

নবীন বাবু একজন প্রতিভাশালী কবি ; তাহাতে ঈদৃশী রুচি ও প্রবৃত্তি সাধারণ পাঠক-মণ্ডলীর পক্ষে কত দূর অমঙ্গলময়ী ও কুফল-প্রসবিনী তাহা বলা যায় না। যদি এই দোষ সামান্য হইত যদি ইহা ভয়ানক না হইত তাহা হইলে বলিতে পারা যাইত, অজস্র গুণ বর্ত্তমানে একটী দোষ ধর্ত্তব্য নহে।

একোহি দোষো গুণ-সন্নিপাতে।
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥

কিন্তু তিনি তাঁহার কলঙ্ক স্বরূপ যে গরলময়ী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সুকুমার-মতি অপরিণত-বুদ্ধি বালকবৃন্দের মন বিষাক্ত করিতেছে, এক মাত্র বঙ্গ-ভাষাধিকারিণী রমণীদিগের নিৰ্ম্মল ও ও পবিত্র চিত্তে ব্যাধি-বীজ রোপিত করিতেছে, এবং তাঁহাকে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-ভূমিতে অপবিত্র কবিতা রচনায় পথ প্রদর্শক করিয়াছে। রমণীর কুসুম-বিকীরিত মনোহর উদ্যানে যে বিষম কালভুজঙ্গ লুকায়িত ভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে তাহা অতীব ভয়াবহ। সকলেই জানেন——

মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ।

শেষ বক্তব্য যদি এই আমাদিগের এই দীন প্রস্তাব, সৌভাগ্য ক্রমে নবীন বাবুর নয়ন-গোচর হয়, তাহা হইলে আমাদের এই বিনীত অনুরোধ, যে তিনি সুরুচি, সুপ্রবৃত্তি ও সুনীতি বিরুদ্ধে কবিতা লিখিয়া তাঁহার দেবদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার অবমাননা না করেন। আমরা ইহার পরের প্রস্তাবে নবীন বাবুর কবিতার আবিল নৈতিক বায়ু পরিত্যাগ করিয়া হেম বাবুর কবিতার বিশুদ্ধানিল সেবন করিব।

ক্রমশঃ—

শ্রীরোধেন্দু চক্রবর্ত্তী।

——00——

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলী।

সময় নিশীথ।

(রাধিকা ললিতা ইত্যাদি সখীগণের বাসর বিরচন।)

রাধিকা।——সখীরে।——
বাসরত বিরচিত ভেল!
ম-কাননমে হরি কই আয়ল ?
প্রহর বিগত ভেয়ল
ম আয়র!

অই বুঝি—(ত্রস্তে কুঞ্জদ্বারে গমন)
নহে সখী!——
চতুরানিল ছলত মোহে!——
(প্রত্যাখ্যান)
(ললিতাকে কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া)
রব সখী!—ঠিক্ এহি বধুঁয়া আয়ল!
অই শুন!—(ত্রস্তে কুঞ্জ-দ্বারে গমন)

হঃ——(দীর্ঘ নিশ্বাস)—নহে সখী!
মলয়ানিল দোলনে মাধবী বল্লরী
ঝরত হিম-কণা মৃদু মধুবিমে!
(দীর্ঘ নিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান)
আশা-কুহকিনী শান্দ গগণে
চাতকী ভুলায়ত জলদে দেখাই!
বুঝি বা
মিছা প্রলোভনে ভুললু সজনী।
আয়ব কহি হবি মিছা ভুলায়ল।
আয়ব না যদি তবে কাহে কহল?—
(উৎসুক চিত্তে কুঞ্জ দ্বারের দিকে দৃষ্টি ও উৎসুক কর্ণে শব্দ লক্ষ্য করণ;—মস্তকোপরি বকুল বৃক্ষে কোকিলের কুহু ধ্বনি।—)
আঃ—বাজ গিরক তুয়া মুখে।—
(কুসুম স্তবক ছুড়িয়া মারণ,—কোকিলের পলায়ন,—রাধিকা প্রভৃতি সকলের হাস্য।)
ললিতা।——পাকড়িতে পারি যদি কহি
দিন দধিয়া পিলায়ব——
রাধিকা।—(মুখে হাত দিয়া ললিতাকে নিবারণ করিয়া।)
চুপ —বঁধু বুঝি আয়ল।—
(ললিতার মুখ পানে চাহিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ)
অই।—নহে সখী।—(দীর্ঘ নিশ্বাস)
(সকলের হাস্য, রাধিকা অপ্রতিভ
হইয়া ঈষদ হাসিয়া কুসুম-
শয্যায় শয়ন।)
বিসখা।—সখী সব এক কাম কিয় কহি
নিচয় মাধব আয়ব আবহি!

সব সখী মেলি নীরব রহবি
নাহি বাতায়বি কহি
মান করি যেন রহ পড়ি রাই!—
মাধব আইলে নীরব রহবি
পেখব চতুর কি কিয়ে।
সাবধান রাধে নট নাহি কিয়বি
মিনতি করত তোহে!
(রাধিকা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকন; সখীগণ নীরব;—কিছুক্ষণ পরে বিসখা নিঃশব্দে কুঞ্জের দ্বারের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দ্রুত পদে কুসুম শয্যার রাধিকার এক পার্শ্বে উপবেশন।)
রাধিকা।——ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিয়া
বিসখার গলদেশ বেষ্টন করিয়া।)
অব আইলিত বনোয়ারী!—
(সকলের হাস্য;—রাধিকা অপ্রতিভ
হইয়া সলাজে মুখ ফিরাইয়া শয়ন)
ললিতা।——দ্বিতীয় প্রহর বিগত ভেয়ল
বিসখে কহ কাঁহে
হরি এসা আজি বিলম করত?——
(সকলের উৎসুক-চিত্তে কুঞ্জের দ্বারের দিকে দৃষ্টি,—রাধিকার গাত্রোত্থান;—
বৃন্দার প্রবেশ)
রাধিকার।—বৃন্দে!—আয়লি তুহি?—
(দীর্ঘ নিশ্বাস)
মাধব আলয়ত নাহি।—
আয়ব বলি হরি কহল?—কি মিছাই
তুহি ভুলায়লি মোহে?
অব কই সে বুঝব তাহে?
বৃন্দা।—গোঠে ভাজি হরি

ঈষদ হাসই নয়নমে কহল
আঙ্গুলে করই সঙ্কেত!
আয়ব বলি ঠিক্ কবল সঙ্কেত!
আয়ল না কাঁহে কইসে কহব?
সকল বা না বনোয়ারী।—
(বিসখার দিকে দৃষ্টি করিয়া গোপনে ঈষদ হাসিয়া)
নন্দ যশোমতি বলাই দুলার
রাখল বা আঁখে আঁখে।
শকব না আনে বুঝ সেই পাকে!
মিছা জাগরণে কি ফল ফলব
ঘরে ফিরি চল যাই!
আজি নাহি ভেল কালি দরশন
পুন পাবি তাবে বাই।——
(সখীগণের প্রতি গোপনে ইঙ্গিত করিয়া গমনোদ্যত)
রাধিকা।——(নিবারণ করিয়া)
অলপ রহবি আয়ব বনোয়ারী
অধীর না ভেয়বি হম্ শুননু বাঁশরী!—
(বৃন্দার হাস্য)
তুঁ' হাসতু কাঁহে?
বাঁশরী শুনলু কহতাহি ঠিক
প্রহর না অতীত ভেল
কাননমে হবি নিচয় পঁহুছল
কুঞ্জমে আয়ব অব!
অই- ঠিক!—বধুঁয়া আয়ল!—
(ত্রস্তে কুঞ্জ-দ্বারে গমন)
নহে সখী!——
"ার চুম্বনে বিভোর ভেয়ই
ত্যজি বকুল প্রসূন!——
" করত প্রত্যাখ্যান
ও কুসুম-শয্যায় শয়ন;—বৃন্দার হাস্য)
ললিতা।—(ত্রস্তে রাধিকার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিয়া কুসুম মণ্ডিত তালপত্রের দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে) বৃন্দে—তু' করত কা?
হের হেব।———
যেন হিমকর-করে কমল বিগলিত
ভেল!——
(রাধিকা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন।)
বৃন্দা।—হম্ বৃন্দাবন ত্যজি ভাগব!—
কবইতে পিরীতী নিষেধ করলু
তবত না শুনলি বাত।
নিষেধ না মানলি আপনি মরলি
অনল মে ডারই হাত।—
তপত ক্ষীর হেরি সবুর না সহল
অব অত পুড়ল গাল!
ব্যাজের বিধান নাহি নিলি রাধে
বেয়াধি ভইল যব।
বোগ বাড়ায়ই প্রলয় করলি
ঔষধি যাচত অব।—
শিশু ভাতি হম্ বাছুরা মে জ্যোতি
কামনা কিয়নু ভাল।
অসাধ্য সাধনে গতব খোয়ায়নু
মরইলে ফুরব এ জ্বালা!
আয়বত হবি এসা কাহে ভেয়লি
তিলেক না সহে কি ব্যাজ?
মরবি না প্যারি, যায়ব যাঁহা হবি
(বা)—যমুনামে মরব আজ!—
(শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রস্থান।)

(পট পরিবর্ত্তন।—কুঞ্জের দ্বার।)

(রতি কামদেবের আবির্ভাব।)

রতি।—মোর কিরে।—কর কৃপা হেন কি আর!—

হের প্রাণেশ্বর
শরদেন্দু-বিমলিন তব ফুলশরে!—

কামদেব।—(চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া।)

হের প্রিয়ে কোথা হরি!—
নিমগ্ন নিদ্রাসাগরে চন্দ্রাবলী পাশে।
এক কাজ করি এস!—

(রতির কবরী হইতে দুইটী রক্তিমবর্ণ পারিজাত উন্মোচন করিয়া।)

মন্দার কুসুমশরে রক্তিম বরণ
হ'য়েছিল যেই প্রিয়ে—এই সেই ফুল!—
যার আঁখে যেইকালে ছোঁয়াবে এ ফুল
দিব্য চক্ষে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে
যারে ভালবাসে তারে যথা যেই ভাবে!—
পসি কুঞ্জমাঝে তুমি ব্রজাঙ্গনা বেসে
ছোঁয়াও এ ফুল প্রিয়ে রাধিকার আঁখে!—
চন্দ্রাবলী পাশে যথা নিদ্রামগ্ন হরি
যাই আমি প্রাণেশ্বরী!—
ছোঁয়াব এ ফুল তার আঁখে।
এইমাত্র বনদেবী ত্রিশূলের ফুল
ছোঁয়ায়ে নয়নে তার
হ'য়েছেন অন্তর্ধান!—ক'রেছেন মনে
নিদ্রাভঙ্গে তাঁর অবশ্য পড়িবে আঁখি
'চন্দ্রার বদনে ফুল্ল অমল কমলে'—
যাই প্রিয়ে আমি
ছোঁয়াই এ ফুল আগে মাধবের আঁখে!—
অঙ্কিত রাধার চিত্র মাধব অন্তরে
অন্তরে নিরখি চিত্র জাগিবেন হরি
হইবেন ব্যাকুলিত।—আসিবেন ছুটি
রাধিকা কুঞ্জ কাননে!
দুর্জ্জয় মানে রহিবেন রাধা
সাধিবেন বনমালী!—নয়নের বারি
চরণ অলক্তে মিসি ভিজাবে পৃথিবী!—

রতি।—ব্রজবালা বেশে নাথ পসি কুঞ্জে তবে!—

কামদেব।—এস তবে প্রাণেশ্বরী!—

(উভয়ের অন্তর্ধান।)

(পট পরিবর্ত্তন।—পূর্ব্ব দৃশ্য।)

(সখীগণ-পরিবেষ্টিতা রাধিকা কুসুম-শয্যায় শায়িতা।)

ললিতা।—(ব্যজন করিতে করিতে)

অধীর না হৈয়বি রাই
অলপয়ে কুঞ্জে আয়ব কানাই!—

রাধিকা।—সখীরে!——

ফুলের শয়নে জ্বলন জ্বলতু
সহন আর না যায়!
বিছার জ্বলনে জ্বলতু হৃদয়
কইসে ধৈরয রয়?—
মদন গরল মলয় সমীরে
পসিছে নাসায় মোর
ফুল-ফণিহার-বিষম-দংশ—

অঙেয় ভূষণ আঙার যৈসন
শয়ন শূলের পারা।
(সখীরে!) বধুয়া বিরহে বিদরত হিয়া
ভয়নু গেয়ান হারা।
(উঃ-) হিয়ার ভিতরে তুষের অনল
ধিকি ধিকি ধিকি জলে!
আন সখী জল—ঢাল—নিবারণ
পেখি যদি ভয় জলে!

(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ;—ব্রজাঙ্গনা বেশে রতির প্রবেশ)

বিসখা।—(রতির হস্তে ফুল দেখিয়া)
লবঙ্গলতে!—দেহি মোহে পেখব!—
(গ্রহণ)
এ ফুল পায়লি কাঁহা?
নয়ন-প্রীতিকর সুরভে প্রমোদিত
নিকুঞ্জ কানন ভেয়ল!
তু' এ ফুল পায়লি কাঁহা?—

রতি।—এক যাদুকরী মোহে দিয়ল!
পরশিলে নয়নে প্রিয়জনে পেখব
রহইবে যব যেই ঠাঁই!
দরপণে যেসা নয়নমে তৈসন
পিরয়র বিম্ব সই!

রাধিকা।—(উৎসুক চিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া)
দেহি মোহে!—বিসখে দেহি মোহে!
—দেখব!—

(বিসখা ঈষদ্ হাসিয়া হস্ত অন্তর করণ ;—রাধিকা ঈষদ্ হাসিয়া দুই হস্ত কাড়িয়া লওন ;—চক্ষে ফুল স্পর্শ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ হস্ত ছাড়িয়া দেওন ;—অন্যান্য সকলে একে একে আগ্রহের সহিত ফুল লইয়া চক্ষে স্পর্শ করণ)

উঃ—নয়নমে জ্বলনু কি আগ?—

(চক্ষু মুদিত করিয়া শয়ন)

বিসখা।—চন্দ্রাবলী কুঞ্জমে বনোয়ারী?

ললিতা।—চন্দ্রাবলী কোলমে বনোয়ারী!

রাধিকা।—(গাত্রোত্থান করিয়া)
সখীয়া—লে মোর আঁখ উখাড়ি।
হাম অনধ ভেয়ব!—পেখব না পৃথী!

(পুনরায় শয়ন,—ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)

সখীরে।———
চুন নিরখি দধিয়া ভাবনু
গাল পুড়লু এবে!
(হম্) অভাগা পতঙ্গ অনল নিরখি
ঝাঁপ দিয়নু তাতে!
(হম্) শবলা হরিণী কিরাত-সঙ্গীতে
মোহিত ভইয়ে হায়
আইনু আগই!—তীর-প্রহারে
অবত পরাণ যায়!
পীরিতি মগনে জনম কাটানু
হায়রে রতন আশে
রতন বদলে গরল উঠল
হমার কপাল-দোষে
পীরিতি ব্যাপার পীরিতি ব্যাভার
করনু পীরিতি যাগ
পীরিতি বরত পীরিতি তীরথ
পীরিতি সাধনা সার!
মান লাজ ভয় আহুতি করুণু
পীরিতী কি হোমে বৃথা!

(কাঁদিতে কাঁদিতে)

বাকি এক সই দেখি যদি হয়
এ ব্রত সমাধা!
(সখীরে)—আর কাহে তবে? বেয়াজে কি কায!
বাসর শয়নে সাজাওরে চিতা!—
(উড়নার দ্বারা চক্ষু পুছন,—কিয়ৎ কাল সকলে নিস্তব্ধ)

বিসখা।—হরি অব্ আয়ত কুঞ্জমে!—

রাধিকা।—সখী সাবধান!—খাড়াও দুয়ারে যেন কুঞ্জে হমার
চন্দ্রাবলী বঁধু পসইতে নারে!
(গাত্রোত্থান)

(পট-পরিবর্ত্তন কুঞ্জ দ্বার।)

(শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে প্রবেশোদ্যত)

ললিতা।—(হাত ধরিয়া নিবারণ করিয়া)
এক বাত শুন ভালা কহি
তু' যায়তু কাঁহা?——

শ্রীকৃষ্ণ।—কাঁহে?——
রাই দরশনে কুঞ্জমে যায়ব সখিয়া!—

বিসখা।—(দ্বার অবরোধ করিয়া)
কার ভাগ আজি পরসন ভৈয়ল?
(শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের ফুলমালা ধরিয়া)
কে এ ভাগবতী?—

শ্রীকৃষ্ণ।—(অপ্রতিভ হইয়া মাল্য উন্মোচন করিয়া)
আপনি গাঁথই পরলু
গোঠমে রাখালক সাথ!

ললিতা।—(শ্রীকৃষ্ণের মাল্য গ্রহণ করিয়া)
দেহি মোহে!—পেখব
তু' গাঁথলি কইসন!
(ঘ্রাণ লওন)
ভালা—গোঠমে গাঁথলি?——
গাঁথলিত ভালা!——
এ চন্দন কুঙ্কুমে কাঁহা অভিষেক ভেল?

শ্রীকৃষ্ণ।—বিসখে—দ্বার ছোড় দেহ যাই!—

বিসখা।—ভালা যায়বিত!
তু' অধীব ভেয়তু কাহে?
প্রহর না অতীত ভেল
কুঞ্জমে আয়ল না রাই!
তু' আবহি অধীব ভেয়তু!

শ্রীকৃষ্ণ।—(সন্তুষ্ট হইয়া)
প্রহর না অতীত ভেল?—
আঃ!—ভুল ভইল হমার!—
হম বুঝয়লু নিশি বুঝি অবসান ভেল!

ললিতা।—ভুললি তুহু হরি—ভুলায়লি তাহে!
নেউটি যা' পুনঃ—
সে বুঝি রোয়ত তোহার বিরহে!
(হাস্য)

বিসখা।—(ঈষদ্ হাঁসিতে হাঁসিতে)
রসিকা সে বড় বুঝনু বনোয়ারী
তু' মদন তরুবর
ফুল ফুটাই আজি ছোড়ল তোহারি!—
নীল ললাটমে শোভত সুন্দর
সিঁদুরক রেখা!
(যেন)—নীল গগনমে সিঁদুরিয়া মেঘ
অপরূপ দিয়ল দেখা!
সুরয সম তাহে ভালে উজ-

নীলে নীলে মিলি মালুম না ভেয়ত
কাজরকি রাগ!—

শ্রীকৃষ্ণ।—বেঙগ ত্যাজল বিসখে!
দ্বার ছোড়ি দেহ পসব কুঞ্জমে।—

ললিতা।—সে আশা ত্যজ বনোয়াবী
আজি বিপিনমে হুকুম ভেয়ল জারি—
ছাড় বিনা তোহে ছোড়ইতে নারি!

বিসখা।—অপরূপ শোভত কুঞ্জবিহারী
তাম্বুল-বাগে বিরঞ্জিত মঞ্জুল
কপোল তোহারি!
তাহে দন্ত প্রহরণে মদন মহারণে
লাগল আঘাত!
যেন নীল অম্বরে চন্দ্র বিখণ্ডিত
ভেয়ই শোভত!

শ্রীকৃষ্ণ।—সখীরে!—রহস কিয়তু বৃথা!
ত্বরিত গমনে গিরলু ভূতলে
বাধই মালতী ডালে!
আছাড় খাইয়া নিশান ভেয়ল
রহস করতু কাঁহে?
রঙ ত্যজিয়ে দ্বার ছোড়ল
করত মিনতি তোহে
পলকে কলপ গেয়ান ভেয়ত
আর না পরাণে সহে!—

বিসখা।—ভালা বুঝালি মোহে
কপট যইসন বুঝালি তৈসন
বলিহারি হরি তোহে!
চতুরক খেল মালুম ভেয়ল
আর ক'দিন রহে?
পুবণ ভেয়ল গৃহত জাগল
চোর পড়ল ধরা!
হরি ছোড়হে চাতুরী
পড় না যায় যোড়া
আকাশ পাতাল ফারাক ভেয়ল
ফুঁ দিয়া মিলাবে বঁধু
গেরুয়া বসন মাথায় বাঁধিলে
হরি হে না হোয় সাধু।

ললিতা।—এলি কাঁহে হিঁয়া পরেরি
বঁধুয়া
কি কাজ পরেরি পাশ?
আপন যেজন নারে কি সেজন
মিটাতে তোহার আশ?
পরের মধুতে কি মিঠা আছে হে
পরেরি সাধতু কাহে?
পরেরি গাছেরি ফল পেখিলে
মুখ খুজাত কিহে?
বালিকা সেজন বুঝলু আভাসে
ঠকালি তাই হে তাহে;
হমরা ভইলে কইসে আয়তি
পেখতু কালিয়া তোহে!
হৃদের ভিতরে কুলুপ লাগায়ে
আটক কিয়তু তোহে!
বঁধুহে বুঝতু তু'কেসা চতুর
বালিকা ভুলান নহে!—

(বৃন্দার প্রবেশ।)

বৃন্দা।—খুঁজিয়া খুঁজিয়া বিকল ভয়মু
স্মরণ মরত্ত ধরা!
পাখা ভইল নাকি হে নাগর
তাই কি নাযায় ধরা?
ভালা পড়লি অবাক করলি
অমরি চিকণ কাল!
খড়ি লেয়ই গুরুক জিতলি
পড়ুয়া তু'বড় ভাল!—

শ্রীকৃষ্ণ।—(বৃন্দার হস্ত ধরিয়া)

আকাশ ভাঙিয়া মুড়মে গিরল
উপায় কহি দে মোহে !
বিরহ দহনে দহতু জীবন
দূতী মিনতি তোহে !
আজি কি কুখনে বাড়ালু চরণ
গিরল বজর মুড়ে !
মিছা বিপাকে ভরট ভেয়লু
মিছা নাকহি তোরে !
হরিতাল শশী পেখনু বুঝিবা
তাহি গিরনু ফেরে !
মিছা কলঙ্কে জড়িত ভেয়নু
ঠিক কহতু তোরে !—
(হস্ত পরিত্যাগ।)

বৃন্দা।—মীন ধরিতে গিয়লি নাগর
পাঁক লাগল গায়ে !
জলে নামলি বসন তিতল
শুখা রহব কাহে ?
সুরয উদল কুয়াশা গয়িল
মালুম ভইল এবে !
আঁখ মুদই আঁধার করিলে
রজনী ভয়হে কবে ?
চাঁদেরে লইয়া তুহি চললি,
আঁধার নাহোও তাহে !
(হাঁসিয়া)
কাঁশার ব্যাপারি হায়রে কপাল
জহরি ভুলাতে চাহে !

শ্রীকৃষ্ণ।—কুঞ্জে রহস করবি পিছে !
(হস্ত ধরিয়া)
সপথ করিয়া কহতু তুহারে
জীবন গয়িল মোর !
জীবন গয়িলে কিফল ঔষধে ?
আবহি উপায় কর কর !
যা তুই রাধার কাছে——
হাত ধরিয়া করতু মিনতি
রহস করবি পিছে !
(বংশী বাজাইতে ইঙ্গিত করিয়া হাস্য করতঃ কুঞ্জে প্রস্থান।)

ললিতা।—(শ্রীকৃষ্ণকে বংশী বাজাইতে উদ্যত দেখিয়া বংশী ধরিয়া)
রবি হে বঁধুয়া না বাজাবি বাঁশী
হুকুম ভয়িল কড়া।
জোর করিলে জুলুম ভইব
দ্বার হতে থাবি তাড়া !
শরম না হোয়ও নিলাজ নাগর
লাগাতে বাঁশীতে তান !
এক কাণকাটা সামুলিয়া ফিরে
রাখিতে আপন মান !
মাঝ হাট দিয়া ফিরে অবহেলে
দুই কাণ কাটা যার !
বঁধুহে বুঝলু তাই হে তোহারি
না পর শরম আর !—

শ্রীকৃষ্ণ।—হেন নিরদয়া কাহে ?
নয়নের জলে ভিজেনা কি মন
না হোয়ও করুণা কিহে ?
(সখীরে)——
পাথরত ঘামে এদুঃখ হেরিয়ে
ঘামেনাকি তোর মন ?
দয়ার দুয়ারে ফিরে যে ভিকারী
শুনা নাহি কহি দীন !
(সখীরে)——
অভাগার ভালে ঘটল তা আজি
কপালে সকলি কি—
কিনি রাখ তবে কৃপা ক—
দেহ দ্বার ক—

ললিতা।—(হাসিতে হাসিতে)

দ্বার ছোড়া মূলে বেচবি আপনা
আকিঞ্চ সুলভ বড়।
এক চোটে দর পড়ি গেল বঁধু
বুঝিনা অরথ তার!
সাহুকারি নাই বুঝলু কে তাই
নতুবা এমন কাঁহে?
লাখদাব সহ চাজাবির কাজ
কি জানি কি যায় হয়ে।
ব্যাপারের লোভে মূল সহ যাবে
নাগর নহিছে তাহে।
কপাল ঠুকিয়ে সাহসি যে হোয়
সেতি যেন কিনে তোহে!
আদার ব্যাপারি হমবা বঁধুয়া
জাহাজ ছোঁয়ব কাঁহে?

(শ্রীকৃষ্ণ অধীর হইয়া উপবেশন)

বিসথা।——স্বপদে বঁধুয়া যব আছলি
দুখ দিয়লি যত্ত!
বিপদে বঁধুয়া অবত গিরলি
শোধ নিয়ব তত!
সম্পদের কালে তু' হতে বঁধুয়া
উপকার নাহি ভেল!
কোন উপকারে উপকাব চাহ
কহিতে লাজ না এল?
আঁখি থরশরে বিঁধি জর জর
গোপিকা বধিয়া ফিব!
যমুনাকি কুলে চুরি কিয়ে বাশ
কদম শিখরে চড়!
আশা দিয়ে বঁধু করহে নিরাশ
বঁধু হে তু' বড় সাধু!
...ডয়লি ধরা বুঝয়ল প্যারী
...কথায় শুধু!—

ললিতা।—কাড়ি লব ধড়া কাড়ি লব চূড়া
কাড়ি লব তোর বাঁশী!
কুঞ্জ হতে মোরা দিব তাড়াইয়া
তোয় হে ব্রজের শশী!
পরি পীত ধড়া শিরে বাঁধি চূড়া
যায়ব যমুনা-তটে!
নীপতরু তলে হমরাই হেলে
খাড়াব ত্রিভঙ্গ ঠাটে!
বাজায়ব বাশী হমরাই নাচি
কভু রাধা রাধা স্বরে!
যমুনা-জীবন বহাব উজান
মোহন" বাশরী তারে!
মদনক বাণ সন সন সন
ছুটব রনধ দিয়ে!
বঁধুহে সে বাণ কি দিয়ে নিবার
পেখব হমবা তাহে!

শ্রীকৃষ্ণ।—ব্রজ হতে সবে ভাগাবি হমারে
যুকতি কিয়ল ভাল!
গোপিকায় সাধি জনম অবধি
এহি ভইল ফল!
একে ভেল আব কপাল হমার
সকলি করম দোষ!
দেহ দ্বার ছড়ি জনমের মত
যাব মিটাইয়া আশ!——

(পট পরিবর্ত্তন—পূর্ব্ব দৃশ্য)

(রাধিকা কুসুম-শয্যায় উপবিষ্টা, সম্মুখে বৃন্দা।)

রাধিকা।—যে মাটি খাবার খাহু একবার
আবার তা খাক কাঁহে?

পীরিতি কি সাধ মিটল হমার
আব না মজিল তাহে।
পীরীতি সমাধি করয়লু যদি
মিছা অনুরোধ কাঁহে?
(বিসখার প্রবেশ)
মোর অনুরোধ রাখ সব সখী
পূরণ সমাধি যাহে!
কাটল বকুল তাল তমাল
কুঞ্জ কাননে যত!
রাশি রাশি লয়ে (এ)—বাসর শয়নে
সাজাও মনের মত!
লবঙ্গ মাধবী যে আছে বল্লবী
ছিঁড় একে একে সবে!
কর অভিষেক বাসর চিতায়
বেয়াজে কি ফল এবে?
(ললিতার প্রবেশ)
সব সখী মিলি গাঁথি ফুলমালা
তাতে অভিষেক কিয়!
(হম) দীরঘ নিশাসে চিতা জ্বালাইয়া
ভসম কিয়ব দেহ!—
(সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)
ললিতা।—(সই)—কুঞ্জের দুয়ারে ভি-
খারির মত
দাঁড়ায়ে কেশব রায়।
(তার) মুখ পেখিলে কি কব, সখীয়া
পষাণ গলিয়া যায়!
(তার) নয়নক নীর তিতি বনছায়
তিতল বসন পীত!
করে ধরি ধরি হার মানল
রাধে করহ হিত।

(সেযে) বুঝলে না বুঝে কাঁদি ভেল
সারা
ভইল পাগল পারা।
আর কাঁহে রাধে ভইল বহুত
থাক মেনে দেহ ক্ষমা!—
বৃন্দা।——রাধে!——
বুঝালে নাবুঝ এবড় বিপদ
অবোধ তু' বড় রাই!
গিয়া নাহি দিম আবহিও আছে
বুঝল মানিনী তাই!
(তুই) প্রেম পাঠশালে কালি ছিলি পড়ু
আজি কি আচার্য্য ভেলি?
অবহেল মোহে অবাক লো প্যারী
ভাবইতে হব কালি!
তাতে থড়ি এতি দিগুলিত রাই
আবহি বহুত বাঁকি!
(তু') পীরতিপুঁথির ভূমিকা নিরখি
আবহি বুঝলি কি?
মান লাজ রাগ যমুনা-জীবনে
আগে সমাপিতে হোয়!
আগে মাটি খাই পরে মাটি ভই
পারীতির পড়ু ভয়!—
(শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জে প্রবেশ করিতে দিবার
নিমিত্ত বিসখার প্রতি ইঙ্গিতঃ—
খার প্রস্থান।)
রাধে।
বড় যোহি হোয় সেহি সব সন
বড় গাছ
বেশী জল যা

(শ্রীকৃষ্ণ বিসখা ইত্যাদির প্রবেশঃ—
রাধিকা মুখ ফিরাইয়া অধোমুখে।)

বড় মহাজন সহে লোকসান
যাঁড়ী তা সহিতে নারে!
মহাদেব বিনা হলাহল পান
আর কে করিতে পারে?
চুমকক পাশে লোহা যদি বহে
চুমক চুমক কিয়ে!
মলয়মে বাসে অধম কুঠার
সেও লো চন্দন হোয়ে।
(যদি) গুণিজন কাছে গুণহীন রহে
সেহ তার গুণ পায়!
(রাধে) আপনার জন দোষী যদি হয়
শোধিয়া লইতে হয়!
খণি হতে রাই রতন নিয়লে
নিখাদ নাহিক পায়!
আক হ'তে রাই বাছি নিলে রস
তাই পিক্তে গুড় হোয়!—
(শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া)
দেখ দেখ রাই চোরের মতন
ঠাকুর কানাই ডরে!
মুখে বাক নাই আহা মরে যাই
নীর নয়নমে ঝরে!
কভু ধরা পানে কভু তোর পানে
যেন ডরে ডরে চায়।
মুখ তুলি রাধে দেখ একবার
(দেখি) মান তোর কাঁহা রয়?
শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ছাড়িয়া দেওন)
যাড় হস্তে)

ভুলয়লু যদি ঘাটি ভইল
কাণে ধরি দেহ নাড়া!—
ভুল যদি হোয় বুঝাইয়া দেহ
এ রাগ উচিত নহে!
গালি দুটা দেহ না হোয় প্রহারো
নীরব রহলি কাঁহে?—
(জানু পাতিয়া রাধিকার চরণ-মূলে
উপবেশন।)
বিসখা।—ডাণ্ডবক ঘরে সকলি সম্ভবে
তাম মেকি চলি যায়!
ডাণ্ডবক ঘরে ঝুঁটা হোয় সাঁচা
গিলিটিও খাটি হোয়!
রাজা কিয়ে লুট দিগ্বিজয় নাম
বড় ঘরে সব সয়!
রাজার ঝিয়ারি যা কিয়ে মানায়
চূড়া ঠেকে অহি পায়!—
শ্রীকৃষ্ণ।—(দুই হস্তে রাধিকার চরণ
ধারণ করতঃ)
রাধে!—দেহি চরণ মোহে!—
তোহে যদি সাধি বিকল ভেয়লু
দেখি সাধই তাহে!
—দেহি চরণ মোহে!—
তরুণ-তপন-বরণ চরণ
মুনির মানস মোহে!
(বারেক)—দেহি চরণ মোহে!—
(তাহে)—রতন কিঙ্কিনী মধুর ঝঙ্কারে
ধমনী সহিত মোর!
(আবার)—ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে উথরে মদন
উছরে ধমনী তার!
রাধে সদয়া ভেয়ল—ভাবিনা
উপায় পেখিনা আর!—

(রাধিকার মুখপানে উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া)
এ—বিবস বদন কাঁহে!—
আমরি আমরি পেখল বিমুখে
নীল নলীন ঝরে।
(হমার)—চূড়া তিতিয়া উরশ তিতল
মাণিক ঝরত করে!
এ—মদন পীড়িতে ভারতহি কিবে
নাম তহি সুরধনী?
(হম্) কমণ্ডলু ভরি রাখব যতনে
ভেয়ই কমল যোনি!
(হম) মুড পাতিয়া জটায় ভরিয়া
গঙ্গাধর ভেব।
(হম) জহ্নু ভইয়া পান করিয়া
দেহের ভিতরে থোব।
(হম) সাধনে সদয় নাভেব কদাপি
না দিব কাহারো ছোড়ি।
রাধে কি কর নিবার নিবার
বেগ সহিতে নারি।—
(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)
রাধে!—এতোর উচিত নয়।
মিছা কলহে ঘরের গুমর
ফাঁক ভইয়া যায়!
লাজে হইতে পরে শুনিয়া
রহস কিয়ত্ তায়।
অইলো গগণে অচল চাঁদিমা
মধুর হাঁসত হায়!
(তোর) মান হেরিয়ে হায়লো মানিনী
মান ভাঙিলে যায়!
স্থির যামিনী!—স্থির যমুনা
দেখলো দাঁড়ায়ে অই!
(তোর) মান হেরিয়ে অবাক ভইলু
মান ভাঙ্গলো রাই!

(তোর) মান হেরিয়ে আছেলো দাঁড়ায়ে
মান ভাঙিলে যাব।
(তোর) ঘরের গুমার সাগর সমীপে—
রহস করিয়ে কব।
রসিক ভ্রমরা ফুলের বাজারে
ঢোল বাজায়ে ফেরে।
কোকিল মহলে রহস বাড়ল
ফুকারি ফুকারি মরে!
মলয় অনিল সময় পায়ল
শেল বহত গায়!
মান ভাঙ্গলো সত্বরা মানিনী
পরাণ হমার যায়।
দিন পাইয়া না মানে পাগলা
ঘন হাণে ফুলবাণ!
মুখ-সুধাদানে বিমুখ যদি লো
পদ সুধা কিয় দান!
(চরণ চুম্বন)
রাধে।—তবু নিদয়া কাঁহে?
কি পাপে এপাপী?—যদিওবা পাপী
সে পাপ কইসে রহে?
সবব তিরথ পদ তোহার
সে পদ হমার করে।
(তোর)—রূপ ধেয়ানে পবীত এদেহে
পাপ পশিতে নারে!
রাধে—মুখ তুলিয়া চাহ।—
(তোর) মান অনলে স্মর গরলে
ভসম ভইল দেহ!
—মুখ তুলিয়া চাহ!—
রাধে—মুখ তুলিয়া চাহ!—
মদন পাগর হাণে ফুলশর
কি করি উপায় কহ?

—মুখ তুলিয়া চাহ!—

রাধে—মুখ তুলিয়া চাহ! -

(না হোয়)—স্মর গরল হর চরণ

শিরে হমার দেহ!—

(মস্তকে ধারণ, সেই অবসরে বাদিকা

. ণ সরাইয়া লওন:—শ্রীকৃষ্ণ দাড়াইয়া

...)

'ধে জনমের মত

মুখ তুলিয়া চাহ!

াই বারে একবার শুধু

মুখ তুলিয়া চাহ!

— —

(পট পরিবর্ত্তন—কুঞ্জদ্বার।)

(বাত কানাদেবের নৃত্য গীত করিতে

করিতে প্রবেশ)

ভৈরব। কাওয়ালী।

(কাম)—ভইলহি ভোব উদাত সুবয

পূরব অম্বরে ও।

(রতি)—সরসীর শয়নে শোয়ল কুমুদিনী

বিরহ বিকারে ও।

,,——বৈঠল ভ্রমর নবফুল্ল কমল

পীযূষ আগারে ও।

(কাম)—সুর কর কীরিট শোভিত সুন্দর

গোবর্দ্ধন-শেখরে ও।

(রতি)—গয়িল রজনী তাজ ব্রজবাসিনী

নিকুঞ্জ-বাসরে ও।

,,——সম্বর কুসুমশর চল অব যাই

নন্দন বাসরে ও।

(উভয়ের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন।)

—oo—

কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা।

কবিদিগের অসাধারণ কর্ম্মকে কাব্য বলা যায়। কবেঃ কর্ম্ম কাব্যং। পাণিনি ৫ ... ১২৩ সূত্র। কবিশব্দের ... কাব্য কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অতএব প্রথমত কবি-শব্দের অর্থ বলা যাইতেছে। কবু অর্থাৎ কবৃ ধাতুই প্রত্যয় করিয়া কবি শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। কবৃ ধাতুর অর্থ বর্ণনা। সুতরাং যে ব্যক্তি বর্ণনা করে বা করিতে পারে তাহাকেই কবি কহা যায়। বর্ণনা শব্দে বর্ণ দ্বারা বস্তুর স্বরূপ বা অবস্থা প্রকাশ করা বুঝায়। বর্ণ শব্দের দুইটি অর্থ। প্রথম শ্বেত পীত রক্ত নীল কৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রঙ্গ। দ্বিতীয় অর্থ ক খ গ ঘ, অ আ ই ঈ প্রভৃতি অক্ষর। অতএব বর্ণনা শব্দের শ্বেত পীতাদি বিবিধ রঙ্গ ফলাইয়া অর্থাৎ চিত্র করিয়া যেরূপ কোন বস্তুর স্বরূপ বা অবস্থা প্রকাশ করা বুঝায় সেইরূপ রাম রাবণ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতি বর্ণাবলী প্রয়োগ দ্বারা কোন পদার্থের প্রকৃতি ও অবস্থা বিবরণ করা-কেও—বুঝাইয়া থাকে। ইহার প্রমাণার্থ

নাগানন্দ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক হইতে একটি প্রস্তাব উদ্ধৃত হইতেছে যথা :—

নায়কঃ। নায়িকায়া মুখমুন্নময্য সশান প্রিয়ে বৃথৈব ত্বমস্মাভিঃ কুসুমাকরোদ্যান-কুতূহলিভিঃ খেদিতা। কুতঃ

এতত্তে ভ্রূলতোদ্ভাসি পাটলাধরপল্লবং। মুখং নন্দনমুদ্যানমতোঽন্যৎ কেবলংবনং॥

চেটী। সস্মিতং বিদূষকং নির্দ্দিশ্য। সুদংতুএ ভট্টিদারিআং কহং বণ্ণেদি। অজ্জ উণঅহং তুমং বণ্ণেমি।

বিদূ। সহর্ষং। ভোদি জীবাবিদোম্হি। তা করেহু ভোদী প্রসাদং। জেণএসো মং পুণোবি ণভণাদি। জহা তুমং ঈদসো তাদিসো কবিলমংকড়াআরোত্তি।

চেটী। অজ্জ তুমং মএ বিবাহজাগরণে নিদ্দাঅমাণ নিমীলিত্থ অচ্ছো সোহণো দট্ঠো। তাতহ এব্ব চিট্ঠ জেণ বণ্ণেমি।

বিদূ। তথা করোতি।

চেটী। স্বগতং। জাব এসো নিমীলিঅ অচ্ছো চিট্ঠদি তাব নীলুবসানুআরিণা তমাল পত্তবরসেন মুহং কালী করইস্সং। উত্থায় তমালপল্লবং নিষ্পীড্য বিদূষকস্য মুখং কালী করোতি।

নায়কো নায়িকা চ বিদূষকং পশ্যতঃ। নায়কঃ। বয়স্য ধন্যঃ ত্বমসি। যোঽস্মাসু তিষ্ঠৎসু ভবানেবং বর্ণ্যতে॥ ইতি।

জীমূতবাহন তাঁহার প্রিয়তমা মলয়বতীর মুখ উত্তোলন করিয়া বলিতেছেন, প্রেয়সি অনর্থক আমরা এই কুসুমাকর নামক উপবনে তোমাকে আনিয়া পরিশ্রান্তা করিলাম। কেন না। আনন্দজনক তোমার মুখমণ্ডলই দিব্য উদ্যান; তোমার ভ্রূযুগল সেই উদ্যানের লতা, তোমার আরক্ত ওষ্ঠাধর তাহার কোমল পল্লব। এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল উদ্যান, তাহা কেবল কণ্টকাকীর্ণ বন মাত্র। এই কথা শুনিয়া চেড়ী ঈষদহাস্য করিয়া বিদূষকের প্রতি বলিল। শুনিলে মহারাজ আমাদের রাজকন্যার কেমন বর্ণনা করিলেন। হে আর্য্য আমারও ইচ্ছা যে আমি তোমাকে বর্ণনা করি। বিদূষক। হর্ষের সহিত। তুমি আমাকে বাঁচাইলে। তবে আমার প্রতি প্রসন্না হও। যেন এই জীমূতবাহন আমাকে আর কখন না বলে যে তুমি এমন তুমি তেমন তুমি কটাবর্ণের মর্কটের মত।

চেড়ী। বাসর জাগরণের রাত্রে তোমাকে আমি ঘুমাইতে দেখিয়াছিলাম তখন চক্ষু মুদ্রিত থাকাতে তোমাকে সুন্দর দেখা গিয়াছিল, অতএব তুমি সেই রূপ নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাক আমি তোমাকে বর্ণনা করি।

বিদূষক। নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিল।

চেড়ী। আত্মগত। যখন এ চক্ষু বুদিয়া আছে তখন নীলের মত তমাল পত্রের রস দিয়া ইহার মুখ কাল রঙ্গ করিয়া দি। এই বলিয়া উঠিল এবং বিদূষকের মুখে তমাল পত্রের রস লাগাইয়া দিল।

জীমূতবাহন ও মলয়বতী বিদূষককে দেখিতে লাগিলেন। জীমূতবাহন কহিলেন বয়স্য তুমিই ধন্য। যে হেতু আ-

মরা থাকিতেও তুমিই চেড়ী কর্ত্তৃক এইরূপে বর্ণিত হইলে।

এই সকল স্থলে রঙ্গ দ্বারা চিত্রিত করা এবং শব্দ প্রয়োগ দ্বারা প্রশংসা করা, এই দুইটী অর্থ বর্ণ ধাতুতে বুঝাইতেছে। যখন বর্ণনাশব্দে প্রাগুক্ত দুইটি অর্থ বোধ হয় তখন কবৃ ধাতুতেও ঐ দুই অর্থ বুঝাইতে পারে। যে হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কবৃ ধাতুর অর্থ, বর্ণনা করা। কিন্তু রঙ্গ ফলাইয়া চিত্রকরণ অর্থে কুত্রাপি কবৃ ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। কখগঘ প্রভৃতি বর্ণ দ্বারা বস্তুর গুণকীর্ত্তণ করাই কবৃ ধাতুর প্রসিদ্ধ অর্থ। যদিও উক্ত প্রসিদ্ধি অনুসারে কবৃ ধাতুতে উভয়বিধ বর্ণনা না বুঝাইয়া শব্দ-প্রয়োগ দ্বারা বর্ণনাই কেবল বুঝাইয়া থাকে, তথাপি ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা চিত্রকরণ রূপ—অর্থও ঐ ধাতুতে উপস্থিত হয়। কাব্য-প্রকাশপ্রণেতা মম্মটভট্ট কর্ত্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা

"অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়ন্ত্রিতে সংযোগাদ্যৈরবাচ্যার্থধীকৃদ্ব্যাপৃতিরঞ্জনং।"

সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি কারণবশতঃ নানার্থক শব্দের একটি অর্থ বাচ্য হইলেও ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে অপরাপর অর্থের উপস্থিতি হয়। এই বাক্যের উদাহরণ যথা নৈষধীয় চরিত——

দ্বিতীয় সর্গ।

"অধিগত্য জগত্যধীশ্বরাদথমুক্তিং-
পুরুষোত্তমাত্ততঃ।
বচসামপি গোচরো ন যঃ সতমানন্দ-
মবিন্দত দ্বিজঃ।"

এই কবিতাতে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ এই দুই অর্থের উপস্থিতি হয়। বাচ্যার্থ যথা সেই দ্বিজ অর্থাৎ হংসপক্ষী, জগতের অধীশ্বর এবং পুরুষের মধ্যে উত্তম নল রাজা হইতে মোচন লাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যঙ্গার্থ। সেই ব্রাহ্মণ, জগতের অধীশ্বর এবং পুরুষের মধ্যে উত্তম সেই বিষ্ণু হইতে মুক্তি অর্থাৎ অপবর্গ লাভ করিয়া বাক্যের অগোচর আনন্দ অনুভব করিয়াছিল।

যে স্থলে এইরূপে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত দুইটী অর্থ উপস্থিত হয়, সে স্থলে অন্বয়বোধের নিমিত্তে ঐ দুই অর্থের উপমান উপমেয় ভাব সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বাচ্যার্থ উপমেয় রূপে ও ব্যাঙ্গ্যার্থ উপমান রূপে প্রতিভাত হয় কাব্য প্রকাশকার ইহা বলিয়াছেন, যথা। "বাক্যস্য অসম্বন্ধার্থাভিধায়কত্বং মাপ্রসাঙ্ক্ষীদিত্যপ্রাকরণিক প্রাকরণিকয়োরুপমানোপমেয়ভাবঃ কল্পনীয়ঃ" ইতি।

একটি বাক্যে যদি অসম্বদ্ধ দুইটি অর্থ উপস্থিত হয় তবে তাহা উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায় বোধ হইতে পারে, অতএব অপ্রাকরণিক ও প্রাকরণিক দুই অর্থে সাদৃশ্য সম্বন্ধ কল্পনা করা আবশ্যক। এই জন্যে পূর্ব্বোক্ত নৈষধীয় চরিতের কবিতাতেও উপস্থিত অর্থদ্বয়ের উপমানোপমেয়ভাব সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া অন্বয় করা গিয়া থাকে, যথা। কোন দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ

সে রূপ জগদীশ্বর পুরুষোত্তম অর্থাৎ বিষ্ণু হইতে মোক্ষ-লাভ করিয়া অনির্ব্বনীয় আনন্দ অনুভব করে সেই দ্বিজ অর্থাৎ হংস-পক্ষীও সেইরূপ জগদীশ্বর ও পুরুষোত্তম নল রাজা হইতে মোচন লাভ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিল।

এক্ষণে পুনর্ব্বার কবৃধাতু ও কবি শব্দের প্রতি মনোযোগ প্রদান করুন। শব্দ দ্বারা বস্তুর-গুণ প্রশংসাকারক ব্যক্তিই কবি শব্দের বাচ্য অর্থ। কিন্তু বর্ণ দ্বারা চিত্রকর রূপ অর্থও ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ঐ ব্যঙ্গ্যার্থকে বাচ্যার্থের উপমান কল্পনা করিয়া কবি শব্দের অর্থ বোধ করা যায়। তাহাতে এই অর্থ বোধ হয়। যেমন চিত্রকরেরা শ্বেত-পীতাদি বর্ণ দ্বারা বস্তুর গুণ প্রকাশ করিয়া দেয় সেই রূপ বর্ণাত্মক শব্দ দ্বারা যাহারা বস্তুর গুণাদি প্রকাশ করে তাহারা কবি। বাস্তবিকও চিত্রকরের সহিত কবিদিগের সৌসাদৃশ্য আছে। ইংলণ্ডীয় গুণ দোষজ্ঞেরা প্রায়ই চিত্রকর এবং কবিদিগের তুল্যতা দেখাইয়া থাকেন। সেই কবির কর্ম্মকে কাব্য বলা যায়। যদিচ শয়ন ভোজন প্রভৃতিও কবিদিগের কর্ম্ম, সুতরং কাব্য পদে কবির শয়ন ভোজনাদিও বুঝাইতে পারে, তথাপি কাব্য শব্দের ব্যুৎপত্তি-বৈচিত্র্যে কবিদিগের অসাধারণ কর্ম্মই বোধের বিষয় হইয়া থাকে। শয়ন ভোজনাদি ক্রিয়া কবিদের অসাধারণ কর্ম্ম নয়, কেন না সে-গুলি কবি ভিন্ন অপর ব্যক্তিও করিয়া থাকে। বর্ণাত্মক শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বস্তুর স্বরূপাদি প্রকাশ করাই কবিদের অসাধারণ কর্ম্ম, যেহেতু কেবল কবিরাই তাহা করিতে পারে, অন্য ব্যক্তি পারে না। এই সমস্ত যুক্তির দ্বারা লব্ধ হইতেছে যে, চিত্রকরের ন্যায় বর্ণ-বিন্যাস পূর্ব্বক কোন বস্তুর প্রকৃতি অবস্থা বা গুণ প্রকাশ করাই কাব্য শব্দের নিষ্কৃষ্ট যৌগিক অর্থ। এই যৌগিক অর্থ অবলম্বন করিলে সকলেই কবি-পদ-বাচ্য হইতে পারে, যে হেতু সকল মনুষ্যই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা মনের অভিপ্রায় কোন রূপে বর্ণনা করিয়া থাকে। এই কারণে আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা উপরোক্ত যৌগিক অর্থের কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য করিয়া কাব্যের লক্ষণ করিয়া থাকেন।

আচার্য্য দণ্ডী লক্ষণ করিয়াছেন যে "শরীরংতাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী" অভিলষিত অর্থ বিশিষ্ট যে পদাবলী অর্থাৎ বাক্য বা মহাবাক্য তাহাই কাব্যের শরীর। ইষ্ট বা অভিলষিত শব্দের অর্থ প্রিয়, অর্থাৎ প্রীতিবিশেষজনক যে অভিধেয় এবং তদভিধায়ক যে শব্দ তাহাই কাব্যের স্বরূপ। ইষ্ট শব্দ বিশেষণ দেয়ার তাৎপর্য্য এই যে, "গোরপত্যং বলীবর্দ্দো ঘাসমত্তি মুখেন সঃ" গোরুর ছেলে বয়েল সে মুখ দিয়া ঘাস খাইতেছে ইত্যাদি পদ্যকে কাব্য বলা যায় না, কেন না ঐ পদ্যের অর্থ প্রীতিজনক নহে।

এই লক্ষণ অনুসারে ভাবাচ্যুতি-প্রভৃ-

কি-দোষ-যুক্ত বাক্যও কাব্য হইতে পারে। এই আশঙ্কাতে মম্মটভট্ট অন্য প্রকার কাব্যলক্ষণ করিয়াছেন। তাহা এই—"তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃক্বাপি"।

স্পষ্টরূপে কোন অলঙ্কার থাকুক বা নাই থাকুক দোষ শূন্য অথচ গুণযুক্ত যে শব্দ এবং অর্থ তাহাই কাব্য।

এই মতে, বাক্যের যৎকিঞ্চিদ্দোষ থাকিলেও তাহা কাব্য হইতে পারে না—ইত্যাদি আপত্তি করিয়া বিশ্বনাথ কবি অন্য-প্রকার কাব্য লক্ষণ করিয়াছেন যথা——

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"

আত্মা যেরূপ শরীরকে অধিষ্টান করিয়া আছে, অষ্টবিধ রসের মধ্যে কোন রস সেইরূপে যে বাক্যে অধিষ্ঠিত থাকে। অর্থাৎ যে বাক্য শ্রবণ করিলে রস বোধ হয় তাহাই কাব্য। অন্যের লক্ষণে দোষ দেখাইয়া বিশ্বনাথ কবি এই লক্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতেও একটি দোষ লক্ষিত হইতেছে তাহা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

সকল আলঙ্কারিক পণ্ডিতেই স্বীকার করেন যে কাব্য দুই প্রকার। শ্রব্য এবং দৃশ্য। যে কাব্য শ্রবণ করিলে রসবোধ হয় তাহাকে শ্রব্য কাব্য, আর যাহা দর্শন করিলে রসবোধ হয় তাহাকে দৃশ্য কাব্য কহে। শ্রব্য কাব্য যথা রামায়ণ মহাভারত রঘুবংশ কাদম্বরী ইত্যাদি। কেন না শব্দ শ্রবণ করিয়াই ঐ সকল কাব্যের রস জানা যায়। দৃশ্য কাব্য যথা অভিজ্ঞানশকুন্তল সেক্সপীয়ারের নাটক প্রভৃতি। কেন না নটদিগের অভিনয় দর্শন করিয়া ঐ রূপ কাব্যে অর্থাৎ নাটকের রসবোধ হইয়া থাকে। বিশ্বনাথ কবিও উক্তরূপে কাব্যের ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার লক্ষণ দ্বারা নাটকগুলিকে কাব্যরূপে সংগ্রহ করা যায় না। রসব্যঞ্জক বাক্যই তাঁহার মতে কাব্য। নাটকের সর্ব্বত্র বাক্য প্রয়োগ হয় না। অনেক স্থলে নটেরা কেবল অভিনয় ক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গী নয়নজল মোচন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারাই রসবোধ জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং সেই সেই স্থলে রসব্যঞ্জক বাক্য না থাকাতে "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" এ লক্ষণের সমন্বয় হওয়া কঠিন।

কিন্তু মম্মটভট্ট বা আচার্য্য দণ্ডীর কাব্যলক্ষণকে এ দোষ স্পর্শও করিতে পারে না। তাঁহারা বাক্য অর্থাৎ পদ-সমূহের যেরূপ কাব্যত্ব স্বীকার করেন অর্থ অর্থাৎ পদার্থ সকলেরও সেইরূপ কাব্যত্ব মানিয়া থাকেন। সুতরাং নটদিগের অভিনয় ক্রিয়াগুলিও তাঁহাদের মতে কাব্য হইল। কেন না সে গুলিও বীর করুণ প্রভৃতি রসের ব্যঞ্জক পদার্থ বটে।

অর্থের কাব্যত্ব স্বীকার না করিলে আরও একটি দোষ ঘটিতে পারে। তাহা এই—প্রথমত বাল্মীকি কবি আদি কাব্য রামায়ণ সংস্কৃত ভাষাতে প্রণয়ন করিয়াছেন; পরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করেন; এক্ষণে ইংরাজী

ভাষাতেও ঐ কাব্যের অনুবাদ হইয়াছে। কেবল বাক্য অর্থাৎ শব্দ সমূহকেই যদি কাব্য বলা যায় তবে মূল রামায়ণ এবং তাহার অনুবাদগ্রন্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন এক একখানি কাব্য বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। কেন না ঐ তিন গ্রন্থ ত্রিবিধ শব্দ প্রয়োগ বা ভাষাদ্বারা রচিত। যদি ঐ তিন গ্রন্থ তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন কাব্য হয়, তবে কৃত্তিবাসকে এবং ইংরাজী অনুবাদককেও রামায়ণের কবি বলিতে হয়, কিন্তু তাহা কোন ব্যক্তিই স্বীকার করেন না।

অর্থকে কাব্য বলিলে এ দোষ ঘটে না, যে হেতু ঐ তিন গ্রন্থেরই শব্দ সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও অর্থ এক, বাল্মীকি মুনি সংস্কৃত ভাষায় যে অর্থ গাঁথিয়াছেন অনুবাদকেরাও সেই অর্থই ভাষান্তরে গ্রন্থন করিয়াছেন। সুতরাং অর্থের ঐক্য থাকাতে এক রামায়ণ শব্দে ঐ তিন গ্রন্থই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে এবং ইংরাজী বা বাঙ্গলা অনুবাদ গ্রন্থকেও বাল্মীকি মুনির কবিত্ব বলা যাইতে পারে। এই সকল যুক্তিতে অর্থেরও কাব্যত্ব মানিতে হইল। অর্থের কাব্যত্ব স্বীকার করাতে কটাক্ষবিক্ষেপ ভ্রূভঙ্গী হাস্য রোদন প্রভৃতি অভিনয় ক্রিয়ার কাব্যত্ব অব্যাহত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে অপর একটি আপত্তি হইতেছে। "কবেঃ কর্ম্ম" এই অর্থে কাব্যশব্দ ব্যুৎপন্ন হওয়াতে, যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক রসব্যঞ্জক কর্ম্মগুলি কৃত হয়, সে কর্ম্মগুলি তাহারই কবিত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যখন অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের অভিনয় ক্রিয়া হইতেছে তখন নট কর্ত্তৃক কৃত ভ্রূবিক্ষেপ প্রভৃতি ক্রিয়াও কালিদাসের কাব্যত্ব না হইয়া নটদিগের কবিত্ব বলিয়া পরিগণিত হউক। ইহার উত্তর এই যে পূর্ব্বতন নাটক-প্রণেতা কবিগণ স্বয়ংই রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া ঐ সকল অভিনয় ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন, পরে ক্রমশ কবিদিগের সম্মান ও আদর বৃদ্ধি হইলে ঐ সকল অভিনয় করিতে তাহাদের লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা নটদিগকে অভিনয়গুলি নির্জ্জনে শিখাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহার একটি প্রমাণও দেখান যাইতেছে। প্রসিদ্ধি আছে—সেক্সপীয়রের নাটকাভিনয়কালে যখন নটেরা উত্তমরূপে অভিনয় ক্রিয়া করিতে না পারিত, তখন সেক্সপীয়র আপনিই রঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইতেন এবং অভিনয় কার্য্য করিতেন। এই নিমিত্ত নটাদির ক্রিয়াকেও কবির ক্রিয়ার অনুকারিণী বলিয়া সেই সেই কবির কর্ম্মই বলা যায়। যেমন কালিদাস-কৃত 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ" এ শ্লোকটি আমরা পাঠ করিলেও তাহা কালিদাসের গ্রথিত শব্দ বলিয়া কালিদাসের কাব্য হয়। তেমনি কালিদাসাদি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অভিনয় ক্রিয়া নটেরা করিলেও তাহা কালিদাসাদিরই কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

এক্ষণে স্থির হইল যে, চমৎকারজনক অথবা রসব্যঞ্জক যে শব্দ এবং অর্থ তাহাই কাব্য।

শব্দপদে ভাষা। ভাষা দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও প্রত্যেক ভাষারই উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে। উন্নতপদের লোকেরা যাদৃশভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং যে প্রকারে শব্দ প্রয়োগ করিলে ভাষা সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ অল্পাক্ষর যুক্ত, হয় আর যেমন সম্মুখস্থিত পদার্থের প্রতিবিম্ব আরশীতে ঠিক অনুরূপ হইয়া পতিত হয়, যে যে কথা প্রযুক্ত হইলে সেইরূপে বক্তার মনোগতভাব শ্রোতার হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ সংক্রান্ত হয়, সেই ভাষাই তত্তদ্দেশে উৎকৃষ্ট। অতএব যে দেশের ভাষা দ্বারা কবি কাব্য রচনা করিবেন, সে দেশের ঐ প্রকার ভাষাই কবি কর্ত্তৃক গ্রথিত হওয়া উচিত। যে হেতু সেই ভাষাই সে দেশের সহৃদয়দিগের চমৎকার বা প্রীতি জনক। আর নীচ ব্যক্তি অথবা বালকেরা যেরূপ ভাষা বলিয়া থাকে তাহা অপকৃষ্ট। অতএব কাব্যে তাদৃশ ভাষা বর্জ্জন করা উচিত, কিন্তু কাব্যের কোন কোন অংশে অপকৃষ্ট ভাষাও অধিক চমৎকারজনক হইয়া থাকে। ততদূর বিশেষ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। যে যে স্থানে নীচভাব চমৎকারজনক হয় সে স্থানগুলি সহৃদয়েরা আপনি অনুভব করিতে পারেন, এজন্য তাহার বিবরণ করা অনাবশ্যক।

ভাষা মাত্রেরই তিন প্রকার গুণের ব্যঞ্জকতা আছে। ঐ তিন গুণকে সংস্কৃতে মাধুর্য্য ওজঃ এবং প্রসাদ বলা যায়। কোমল শব্দবিন্যাস থাকাতে যে ভাষা কর্ণে মধুর বোধ হয় তাহাই মাধুর্য্য গুণব্যঞ্জক। আদিরস করুণ রস প্রভৃতির বর্ণনা স্থলে মাধুর্য্য-ব্যঞ্জিকা ভাষা ভাল বোধ হয়। আর যে ভাষাকে, নিষ্ঠুর শব্দের প্রয়োগ থাকাতে, শ্রবণকালে তেজস্বিনী জ্ঞান হয়, সেই ভাষাকে ওজোগুণ-ব্যঞ্জিকা কহে। ওজোগুণ বীররস ভয়ানক রস প্রভৃতির অনুকূল। আর যে ভাষাতে প্রসিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ থাকাতে এবং অন্বিত পদগুলি নিকট নিকট থাকাতে অতি শীঘ্র অর্থ বোধ হইয়া যায়, সেই ভাষাকে প্রসাদগুণ-ব্যঞ্জিকা কহে। উক্ত তিনগুণের মধ্যে আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা এই প্রসাদগুণকেই উৎকৃষ্টতম বলিয়াছেন, যে হেতু এই গুণ সকল রসেরই উপযোগী। এই গুণ সত্ত্বে অপর কোন গুণ অর্থাৎ মাধুর্য্য বা ওজোগুণ না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। কেবল প্রসাদগুণ থাকিলে ভাষাকে পরিষ্কৃতা বোধ হয়, কেন না অভিপ্রায়-প্রকাশরূপ ভাষার প্রধান প্রয়োজন ইহাতে ঝটিতি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভাষার কতকগুলি কৃত্রিম শোভা আছে, সেইগুলিকে আলঙ্কারিকেরা শব্দালঙ্কার বলিয়া থাকেন। যদি এক শব্দ অথবা এক বর্ণ বহুবার উচ্চারিত হয় তবে সেই শোভা অর্থাৎ অলঙ্কার সম্পন্ন হয়। এই অলঙ্কার বহুপ্রকার হইতে পারে, কিন্তু তত বাহুল্যরূপে বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। শব্দালঙ্কার কি প্রকার হয় তাহার দুই একটি উদাহরণ দেখাইয়া দিতেছি। যথা——

পততিপততত্রে বিচলিতপত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং সকচিতনয়নং
পশ্যতি তব পন্থানং॥

অন্য প্রকার যথা

ন সমান সমান সমান সমাগম-
মাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভ।
ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমর-
চ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥

শব্দালঙ্কার সকল ভাষাতেই আছে বাঙ্গালাতে যথা।

আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপাফুলময় খোঁপায় বাধি।
হরিদ্রা জিনিয়া তনু চিকণিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।

এই রূপ মিত্রাক্ষর মিলন ইংরাজী প্রভৃতি ভাষাতেও আছে।

প্রত্যেক ভাষারই এক একটি রীতি অর্থাৎ কর্ত্তৃকর্ম্ম, প্রভৃতি পদ স্থাপনের প্রণালী আছে। যে ভাষার যে রীতি মনোহারিণী সে ভাষা সেই রীতি অনুসারেই প্রয়োগ করিতে হয়। এক ভাষার রীতি অনুসারে অপর ভাষা নিবদ্ধ হইলে কেবল শুনিতে কটু হয় এরূপ নহে অর্থ বোধেরও ব্যাঘাত হইয়া থাকে। যেমন "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহোড়ুপেনাস্মি সাগরং" এই সংস্কৃতের যদি সংস্কৃত রীতি অনুসারে বাঙ্গালা করা যায় তবে এই রূপ বাঙ্গালা হয়। পার হইতে ইচ্ছু দুস্তরকে মোহ হেতুক ভেলার দ্বারায় আমি সাগরকে। কিন্তু ঐ বাঙ্গালার অর্থ বোধ হওয়া কঠিন। এই প্রকার ইংরাজী ভাষার রীতিতে বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ভাষার রীতিতে ইংরাজী বা সংস্কৃত ভাষা বন্ধন করিলেও দুষ্ট বোধ হয়। এই রীতি ভাষার অবয়ব সংস্থানের ন্যায়। বামন কবি বলিয়াছেন এই রীতিই কাব্যের আত্মা স্বরূপ।

কোন কোন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে কাব্যের ভাষা ছন্দোময়ী হওয়া উচিত। ছন্দোময়ী ভাষা না থাকিলে তাঁহাদের মতে কাব্য হইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে অনুপ্রাস প্রভৃতি যে রূপ ভাষার অলঙ্কার সেই রূপ ছন্দও ভাষার অলঙ্কার মাত্র অর্থাৎ বৈচিত্রবিশেষ-জনক। অতএব ছন্দঃ থাকুক বা নাই থাকুক ভাষা শুদ্ধ হইলেই কাব্য হইতে পারে। কেবল মহাকাব্য রচনাতেই ছন্দের নিয়ত আবশ্যকতা আছে।

যদিও সামান্যতঃ ভাষার স্বরূপ এক প্রকার বলা হইল, তথাপি প্রকারান্তরে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করি। ভাষা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এই জন্য ইহাকে একটি স্ত্রীলোক বোধ করিতে পারা যায়। সেই স্ত্রীর নাম সরস্বতী কেন না ভাষাও সরস্বতী তুল্যার্থক শব্দ। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে ভাষার একটি গুণ আছে তাহার নাম প্রসাদগুণ, প্রসাদগুণ অতি শীঘ্র আহ্লাদ জন্মায় অতএব তাহা শুভ্র। আমরা স্থূল সংস্কারে সন্তোষজনক পদার্থমাত্রকেই শুভ্ররূপে কল্পনা করি। প্রসাদ-

র্ণ যদি শুভ্রবর্ণ হইল তবে সরস্বতী নামী সেই স্ত্রীলোকটীও শুভ্রবর্ণা। ভাল সেই স্ত্রীলোকটিকে আমরা নয়ন দ্বারা দেখিতে পাই না কেন; ইহার উত্তর এই যে তিনি মানুষী নহেন যে হাটে মাঠে ভ্রমণ করিবেন। তিনি দেবী তাঁহাকে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যায় না। যদি তপস্যা অর্থাৎ অনেক কষ্টে ধ্যান করা যায় তবে দেখিতেও পাওয়া যায়। ভাষা যদি দেবতা হইলেন তবে তিনি স্বর্গে অর্থাৎ উর্দ্ধলোকে বাস করেন। উর্দ্ধলোক পদে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অথবা কবি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের ভাষাই কাব্য রচনার উপযোগিনী। সরস্বতীদেবী উন্নত লোকের নির্ম্মল হৃদয়মণ্ডলে অবস্থান করেন অতএব তিনি শ্বেতপদ্মারূঢ়া অর্থাৎ বিমল অন্তঃকরণই তাহার শ্বেতপদ্মরূপ আসন, ঐ ভাষা যে কবির হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন তাঁহারই কণ্ঠযন্ত্র মধুর শব্দে বাজিয়া উঠে কণ্ঠে ষড়জাদি সাতটী স্বর প্রকাশ হয়। অতএব সরস্বতীদেবী পরিবাদিনী অর্থাৎ সপ্ততন্ত্রী বীণা বাজাইয়া থাকেন; এইরূপে কবিদিগের কণ্ঠকেই সরস্বতীর সপ্ততন্ত্রী বীণা কল্পনা করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত অনুপ্রাস যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কারগুলি সরস্বতীদেবীর হার বলয়াদি ভূষণ।

ভাষা প্রযোগের দ্বারা এই সংসার উৎকৃষ্টরূপে রক্ষিত হইতেছে। আমাদিগের হৃদয়ে যখন যে ইচ্ছা জন্মে ভাষা দ্বারা আমরা তাহা ব্যক্ত করি অতএব জগৎপালয়িতা পরমেশ্বর তাহাকে ভালবাসেন। পরমেশ্বরের একটি নাম বিষ্ণু। বিষ্ণু শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপক। বিষ্ণু ব্যাপ্তৌ ণু। তবে সেই সরস্বতীদেবী বিষ্ণুর প্রিয়া হইলেন। সেই বিষ্ণু অর্থাৎ পরমেশ্বরের আরও একটি ভালবাসার বস্তু আছে, সেটি ধন সম্পত্তি। যেহেতু ধন সম্পত্তি দ্বারা অনায়াসে সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে লোকস্থিতি রক্ষা সুকর হইয়াছে। সেই ধনাদি সম্পত্তির নাম লক্ষ্মী। এক্ষণে বিষ্ণুর দুইটি প্রিয়া হইলেন একটি লক্ষ্মী অপরা সরস্বতী। এক ব্যক্তির দুইজন প্রিয়তমা হইলে তাহাদিগকে সপত্নী অর্থাৎ একপতির আশ্রিতা বলা যায়। এই জন্য লক্ষ্মীদেবী ও সরস্বতীদেবী পরস্পর সপত্নী অথবা সতিন।

লৌকিক ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায় দুই সতিনে প্রায় সর্ব্বদাই কলহ হইয়া থাকে লক্ষ্মী ও সরস্বতীরও প্রায় ঐরূপ বিরোধ সর্ব্বদাই আছে। লক্ষ্মী যে স্থানে থাকে সে স্থানে সরস্বতীর অবস্থান নাই অর্থাৎ ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের ভাষাভিজ্ঞতা প্রায়ই জন্মে না। ইহার কারণ এই যে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সুখাভিলাষী হয়, কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। কষ্ট স্বীকার না করিলেও অধ্যয়নাদি দ্বারা উৎকৃষ্ট ভাষাকে উত্তমরূপে জানা যায় না।

এইরূপ সরস্বতী যেখানে থাকেন

অর্থাৎ যাঁহারা ভাষাভিজ্ঞ লোক তাঁহাদিগের আশ্রয়ে লক্ষ্মী অবস্থান করেন না। ভাষা জানিতে হইলে ধনার্জ্জন হওয়া অতি কঠিন। কিন্তু যদি কখন উক্ত সপত্নীদ্বয়ের বিরোধ ভগ্ন হয়, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ভাষাভিজ্ঞতা জন্মে আর ভাষাভিজ্ঞব্যক্তিদের ধন সম্পত্তি জন্মে তবে কত দূর আহ্লাদ হইতে পারে সহৃদয়গণ তাহা অনুভব করুন।

মহাকবি কালিদাস ও সেক্সপীয়র ভাষা-দেবীর অসাধারণ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহারা ভাষার অনুমাত্র বিশেষও দেখিতে পাইতেন। লৌকিক কথোপকথনে যাদৃশ স্বভাবের লোক, যেমন কথা বলিয়া থাকে তাহাদের সুপ্রসিদ্ধ নাটকের মধ্যে যাদৃশ স্বভাবের লোকের সেইরূপ কথাই গ্রন্থন করা হইয়াছে এবং এই কারণেই তাহারা অন্যান্য কবি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম যশোলাভ করিয়াছেন।

পৃথিবীতে বহুবিধ ভাষা প্রচলিত এবং প্রকাশ আছে তন্মধ্যে যে ভাষাতে যে কবি অধিক বুৎপত্তি লাভ করিবেন সেই ভাষাতে সেই কবি কাব্য রচনা ও গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন এবং শক্তি দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা যেরূপ কাব্য ও গ্রন্থ রচনার পক্ষে উপযোগিনী এত দূর অন্য কোন ভাষা নহে, কেন না ভাষার যত প্রকার গুণ কথিত হইল সে সকল গুণই সংস্কৃতে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষাতে যত শব্দ আছে এত শব্দ অন্য কোন ভাষাতে নাই। সকল ভাষারই অভিধান কোষে শব্দের গণনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার শব্দ সকল কখন যে গণিত হইতে পারিবে এরূপ বোধ হয় না। এই ভাষার শব্দ অনন্ত এ কথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রমাণার্থ কেবল সূর্য্যবাচক যতগুলি শব্দ আছে তাহাই দেখান যাইতেছে যথা। সূর। সূর্য্য। অর্য্যমা। আদিত্য। দ্বাদশাত্মা। দিবাকর। ভাস্কর। অহস্কর। ব্রধ্ন। প্রভাকর। বিভাকর। ভাস্বান্। বিবস্বান। সপ্তাশ্ব। হরিদশ্ব। উষ্ণরশ্মি। বিকর্ত্তন। অর্ক। মার্ত্তণ্ড। মিহির। অরুণ। পূষণ। দ্যুমণি। তরণি। মিত্র। চিত্রভানু। বিরোচন। বিভাবসু। গ্রহপতি। ত্বিষাংপতি। অহর্পতি। ভানু। হংস। সহস্রাংশু। তপন। সবিতা। রবি। শূর। ভগ। বধ্ন। পদ্মিনীবল্লভ। হরি। দিনমণি। চণ্ডাংশু। সপ্তসপ্তি। গভস্তিমান্। অংশুমালী। কাশ্যপেয়ঃ। খগঃ। ভানুমান্। লোকলোচন। পদ্মবন্ধু। জ্যোতিষ্মান্। অব্যয়। তাপন। চিত্ররথ। খমণি। দিবামণি। গভস্তিহস্ত। হেলি। পতঙ্গ। অর্চ্চিঃ। দিনপ্রাণ। বেদোদয়। কালকৃত। গ্রহরাজ। তমোনুদ। রসাধার। প্রতিদিবা। জ্যোতিঃপীথঃ। ইনঃ। কর্ম্মসাক্ষী। জগচ্চক্ষু। ত্রয়ীতপঃ। প্রদ্যোতন। খদ্যোত। লোকবান্ধব। পদ্মিনীকান্ত। অংশুহস্তঃ। পদ্মপাণি। হিরণ্যরেতাঃ। পীত। অদ্রি। অগ। হরিবাহন। অম্ব-

রীশ। ধামনিধি। হিমারাতি। গোপতি। কুঞ্জার। প্লবগ। সূনু। তমোপহ। গভস্তিমান্। এই ৭৪ টি নাম অভিধানকোষে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল নামের প্রায় প্রত্যেকেরই সংস্কৃত অর্থাৎ তত্তন্নামের অর্থ ধরিয়া সেই অর্থের অপরাপর শব্দ সংযোগ করিয়া বহুসংখ্য নাম হইতে পারে। এত হইতে পারে যে ১ ঘণ্টা কালেও সে গুলি বলিয়া উঠা যায় কি না সন্দেহ। যেমন উষ্ণরশ্মি এই নামটির রশ্মি শব্দ পরিবর্ত্তন করিলে। উষ্ণ কিরণ উষ্ণোস্র। উষ্ণময়ুখ। উষ্ণাংশু। উষ্ণ গভস্তি। উষ্ণঘৃণি। উষ্ণবৃষ্ণি। উষ্ণ ভানু। উষ্ণকর। উষ্ণমরীচি। উষ্ণদীধিতি। উষ্ণপ্রভ। উষ্ণরুক্। উষ্ণরুচি। উষ্ণত্বিট্। উষ্ণাভ। উষ্ণভাস। উষ্ণচ্ছ । উষ্ণদ্যুতি। উষ্ণদীপ্ত। উষ্ণবোচিস্। উষ্ণলোচিস্। এই বাইসটি নাম হয়। আবার উষ্ণ শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া তদ্বাচক অন্য শব্দের পর কিরণাদি শব্দ সংযোগ করিলে যতগুলি নাম হইতে পারে তাহার গণনা উষ্ণ উষ্ম নিদাঘ ঘর্ম্ম। অশীত। অসুষীম। অশিশির। অজড়। অতুষার। অশীতল। অহিম। এই ১১ টি আর পূর্ব্বোক্ত ২২ টিতে গুণন করিলে ২৪২ দুইশত বেয়াল্লিসটি কেবল উষ্ণরশ্মি শব্দের প্রতি-সংস্কৃত হয়। এইরূপ অন্যান্য শব্দেরও তুল্যার্থক অনেক নাম হইতে পারে অর্থাৎ চণ্ড খর তিগ্ম তীক্ষ্ণ প্রভৃতি নানা শব্দ কিরণাদির পূর্ব্বে লাগাইয়া দেওয়া যায়। এরূপে এক সূর্য্যের নামই অনূন ২০০০। ২৫০০ হইতে পারে। কেবল এক সূর্য্যের নামই যে এত হয় এমন নহে, অনেক পদার্থের এইরূপ ভূরি ভূরি নাম সংস্কৃতে আছে, এ জন্য এ ভাষাতে বহুবিধ শব্দালঙ্কার ও শব্দ ঘটিত কৌশল দেখান যায়।

সংস্কৃত ভাষা অন্যান্য ভাষা হইতে অনেক সংক্ষেপে বলা যায়। এই বাক্যের প্রমাণার্থ সংস্কৃত ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ করা আবশ্যক। কিন্তু বিশেষ বিবরণ বলিতে গেলে প্রকৃত প্রস্তাবের ব্যাঘাত এই হেতু কএটি সামান্য নিয়ম বলিয়া দিগ্দর্শন করান যাইতেছে।

সংস্কৃতে সন্ধি নামে একটি প্রক্রিয়া আছে। সন্ধি শব্দের অর্থ যোড়া দেওয়া। যেমন দুইখানি কাগজ যোড়া দিলে, হয় প্রথমখানির অন্ত্যভাগ না হয় দ্বিতীয়খানির পূর্ব্বভাগ কমিয়া যায় অথচ দুই খানি কাগজে একখানির ন্যায় বোধ হয়, তেমনি দুইটি পদে সন্ধি করিলে প্রথম পদের অন্ত্যভাগ অথবা শেষপদের পূর্ব্ব ভাগ কমিয়া গিয়া দুইটিতে এক শব্দবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। যথা—নদী অসৌ, নদ্যসৌ। এস্থলে সন্ধি প্রক্রিয়াতে পূর্ব্ববর্ত্তি নদী শব্দের অন্ত্যভাগ ইকারটি কমিয়া গেল। বারি ইদং বারীদং—এস্থানে অন্ত্যপদের পূর্ব্বভাগ ইকারটি পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ইকারের সহিত যোড়া লাগিয়া গুরু হইল এবং কমিয়া গেল। কাগজেরও যে স্থানে যোড়া থাকে সে স্থান গুরু অর্থাৎ ভারি হয়।

এই প্রক্রিয়া দ্বারা বর্ণগত সংক্ষেপ সম্পাদিত হইয়া থাকে অর্থাৎ নদী অসৌ বারি ইদং এরূপ প্রয়োগ করিলে চারিটি চারিটি বর্ণ উচ্চারণ করিতে হয়। সন্ধি করাতে তিন তিনটি বর্ণেই সংক্ষিপ্তরূপে বাক্যগুলি নিবদ্ধ হইল। এ প্রক্রিয়া অন্য ভাষাতে ততদূর দেখা যায় না সুতরাং তদ্ভাষাতে অপেক্ষা-কৃত বাক্য-গৌরব ঘটে।

এই ভাষায় আখ্যাত নামে অপর এক প্রক্রিয়া আছে। এই প্রক্রিয়াদ্বারা বাক্য-সমাপক ক্রিয়াপদ সকল সিদ্ধ হয়। যদিও এ প্রক্রিয়া সকল ভাষাতেই আছে তথাপি সংস্কৃতের ক্রিয়াপদ অন্যান্য ভাষার ক্রিয়াপদ অপেক্ষা অল্পাক্ষরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য ভাষায় অনেক ক্রিয়াপদ করণার্থক ধাতুর সংযোগ ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। যেমন বাঙ্গলা ভাষাতে পাক কর, গমন কর, প্রভৃতি ক্রিয়াপদ-গুলি কৃধাতুর যোগ না করিয়া পচ, গম এরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না, প্রযুক্ত হইলেও তাহাতে অর্থ বোধ হয় না, এই রূপ ইংরাজী ভাষাতেও অনেক স্থলে করণার্থক ড়ু ধাতুর প্রয়োগ না থাকিলে অর্থ বোধ হয় না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় কোন ক্রিয়াপদেই কৃ ধাতুর যোগের অপেক্ষা নাই। পচ, গচ্ছ ইত্যাদি বলিলেই কৃ-ধাতুর অর্থ বুঝাইয়া থাকে। এবং সংস্কৃতে ইচ্ছার্থে সন্, পুনঃ পুনঃ অথবা অতিশয় অর্থে যন্, তাহার ন্যায় আচরণ করিতেছে এই অর্থে ক্যঙ্, এবং তাহাকে ইচ্ছা করিতেছে এই অর্থে ক্যচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া থাকে, তাহাতে ক্রিয়াপদগুলি নিতান্ত সংক্ষেপে উক্ত হয়। যথা গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছে এত বড় অর্থে জিগংসতি বা জিগমিষতে এই চারি পাঁচটি বর্ণ মাত্র। পুনঃ পুনর্বার পাক করিতেছে এত বড় দীর্ঘ বাক্যের পরিবর্ত্তে পাপচ্যতে কিম্বা পাপক্তি। অশ্বের ন্যায় আচরণ করিতেছে এই বাক্যের স্থলে অশ্বায়তে অথবা অশ্বতি। আপনার পুত্র ইচ্ছা করিতেছে এই অর্থে পুত্রীয়তি কিম্বা পুত্রকাম্যতি।

এইরূপ সংক্ষেপে উপরোক্ত বাক্য-গুলি প্রয়োগ করা অন্য ভাষাতে উপপন্ন হয় না।

সংস্কৃতে তদ্ধিত নামে কতক প্রত্যয় আছে। তদ্ধিত প্রত্যয়, নামবাচক শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে করা গিয়া থাকে। এতাদৃশ প্রত্যয় অন্য ভাষাতেও দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেগুলি তত দীর্ঘ দীর্ঘ অর্থে হয় না, আর সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের অপেক্ষা সংখ্যাতেও অনেক ন্যূন। সংস্কৃত তদ্ধিত কত বড় দীর্ঘ অর্থ প্রকাশ করে তাহার দুই তিনটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে। ভূতপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে হইয়াছিল এক্ষণে নাই এই অর্থে চর প্রত্যয় হয়, যথা দৃষ্টচর এই শব্দে পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছিল এক্ষণে দৃষ্ট হয় না এই দীর্ঘ অর্থ বুঝায়, এবং অভূত-তদ্ভাব অর্থাৎ পূর্ব্বে হয় নাই সম্প্রতি হইতেছে এই অর্থে চ্বি হয়; যেমন

বস্ত্রং নীলীভবতি ইহার অর্থ এই যে বস্ত্রখানি পূর্ব্বে নীল বর্ণ ছিল না সম্প্রতি নীল বর্ণ হইতেছে। আরও গোষ্ঠীন শব্দে পূর্ব্বে যে স্থান গোষ্ঠ ছিল সম্প্রতি নাই সেই স্থান বুঝায়, দীন পদার্থের এতদূর অর্থ। এইরূপ নানা বিধ অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়া থাকে ইহাতেও শব্দ সকল সংক্ষিপ্ত হয়। কেন না ঐ সকল অর্থ অন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে অনেক শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়।

সংস্কৃতে সমাস নামে আর একটি প্রক্রিয়া আছে। সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ করা। অনেক পদ সংযুক্ত করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের বিভক্তি লোপ করিলে সমাস হয়। সমস্ত পদগুলি ব্যস্ত অর্থাৎ অসমস্ত পদ হইতে অনেক সংক্ষিপ্ত। যথা পুরুষের সম্বন্ধ এই অর্থে পুং-সম্বন্ধ, প্রকৃষ্ট পুরুষ, এ অর্থে প্রপুরুষ, কুম্ভের নিকট এ অর্থে উপকুম্ভ, বন হইতে নিষ্ক্রান্ত এ অর্থে নির্ব্বনঃ, বানর এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে এ অর্থে আরূঢ়-বানর ইত্যাদি।

অন্যান্য ভাষাতেও এতাদৃশ প্রক্রিয়া কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃতের ন্যায় প্রচুর অর্থে বা প্রচুর পরিমাণে নহে।

যদিও সমাস প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দগুলি কিঞ্চিৎ অবিশদ অর্থাৎ দুর্ব্বোধ হয়, তথাপি সংক্ষেপোক্তি স্থলে ইহা বিশেষ উপযোগী। এই সমাস করিয়া কবিগণ স্বল্পাক্ষরে বহুল অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আরও অনেক কারণে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য হইতে পারে কিন্তু তত্ত বিশেষ করিয়া বলা অস্মাকের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

সংস্কৃতে সংক্ষেপে যেরূপ দীর্ঘ অর্থ প্রকাশ করা যায়, দীর্ঘ বাক্যেও সেইরূপ সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করা গিয়া থাকে। যেমন সেই রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিল ও মণ্ডলেশ্বর অর্থাৎ চারিশত যোজন পরিমিত দেশের স্বামী ছিল এবং আপনার আজ্ঞাতে অন্য রাজাকে শাসন করিয়াছিল এই দীর্ঘ অর্থটী "সেই রাজা সম্রাট ছিল" এইমাত্র বলিলেই প্রকাশ করা যায়। পক্ষান্তরে চন্দ্র উঠিতেছে এই ক্ষুদ্র অর্থটি, অত্রিমুনির নয়ন হইতে উত্থিত জ্যোতিঃ উঠিতেছে এইরূপ দীর্ঘ বাক্য দ্বারা—ব্যক্ত করা গিয়াথাকে। এই উভয়বিধ উক্তিকে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা প্রৌঢ়িগুণ বলিয়াছেন যথা——

পদার্থে বাক্যবচনং বাক্যার্থেচ পদাভিধা প্রৌঢ়ির্ব্যাস-সমাসৌচ।

এই সমস্ত কৌশল থাকাতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষাকে দেব-বাণী অর্থাৎ দেবতাদিগের ভাষা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার অলৌকিক নিয়ম সকল ও দিব্য কৌশলগুলি জানিতে পারিলে এ ভাষা কখন যে, সাধারণ লোকের কথোপকথনে ব্যবহৃত হইত এরূপ বোধই হয়

না। এই নিমিত্তই হউক অথবা ঈর্ষ্যাদি বশতঃই হউক কেহ কেহ বলেন যে, সংস্কৃত ভাষা কখন লোকে প্রচলিত ছিল না কতকগুলি সুবুদ্ধি পণ্ডিত একত্র হইয়া কল্পনাশক্তি দ্বারায় নিয়ম অবধারণ পূর্ব্বক এই ভাষা গড়াইয়া তুলিয়াছেন অর্থাৎ এভাষা কৃত্রিম। এই বাক্যের দৃঢ়তার নিমিত্ত তাঁহারা আরও বলেন যে, সংস্কৃত শব্দের অর্থ নূতন কর', অতএব লোক-প্রচলিত ভাষা অপকৃষ্ট ছিল অর্থাৎ এক্ষণকার ন্যায় গাছ মাছ শব্দই তখনও মুখে বলা হইত। সকল লোকের বোধের নিমিত্তে সুধীগণ কল্পনা করিয়া শব্দ ও নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক নূতন একটি ভাষা সৃষ্টি করিলেন। সেই ভাষার নাম সংস্কৃত হইল। ইত্যাদি

এ মতটি কেবল ভ্রান্তি-বিস্ফূর্জ্জিত, কেন না সংস্কার শব্দের বা সংপূর্ব্ব কধাতুর অর্থ বিকৃতাবস্থাপন্ন পদার্থকে প্রকৃত অবস্থাতে আনয়ন করা। অমুক গৃহ সংস্কার করিল, একথা বলিলে এই বোধ হয় যে তাহার গৃহ জীর্ণ হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই গৃহকে সে পুনর্ব্বার প্রকৃতাবস্থায় আনয়ন করিল। এইরূপ অমুক অঙ্গ সংস্কার করিল ইহাতেও এই বোধ হয় যে, তাহার অঙ্গ ধূলি প্রভৃতিতে মলিন অর্থাৎ বিকৃত হইয়াছিল সেই অঙ্গকে ধূলি সকল অপনয়ন পূর্ব্বক প্রাকৃত অবস্থাপন্ন করিল। নতুবা গৃহ ভাঙ্গিয়া নূতন করিল অথবা শ্যামবর্ণ অঙ্গকে গৌরবর্ণ করিল এরূপ বোধ হয় না।

সংস্কৃত ভাষারও নামানুসারে এই বোধ হয় যে, ঐ ভাষা প্রথমত যেরূপে প্রচলিত ছিল কালান্তরে তাহার অন্যথা হওয়াতে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। পরে পণ্ডিতগণ নিয়ম অবধারণ পূর্ব্বক সেই নিয়মানুসারে তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতাবস্থায় আনিয়াছেন নতুবা উহা যে কৃত্রিম অর্থাৎ অপ্রচলিত ভাষা এরূপ বোধ হয় না।

উহা যদি কৃত্রিম ভাষা হইত তবে উহার নিয়ম সকল এতদূর জটিল হইত না, অর্থাৎ এককরূপই সর্ব্বত্র দেখা যাইত। কিন্তু প্রচলিত ভাষার অধীন হওয়াতে ঐ নিয়ম সকল অত্যন্ত জটিল হইয়াছে। ইহার উদাহরণরূপে ব্যাকরণের সামান্য একটি নিয়ম দেখান যাইতেছে। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ, কবিঃ কবী কবয়ঃ ইত্যাদি হইয়া থাকে, এটি সামান্য নিয়ম। আবার সখি শব্দের সখা সখায়ৌ সখায়ঃ ইত্যাদি রূপ হইয়া থাকে। পতি শব্দের তৃতীয়াদি বিভক্তিতে সখি শব্দবৎ রূপ হয় কিন্তু প্রথমা ও দ্বিতীয়াতে কবি শব্দবৎ হয়। আবার সমাস করিলে সর্ব্বত্রই কবি শব্দের ন্যায় পতি শব্দের রূপ হয়। পতি ও সখি শব্দের যে বিশেষ বলা হইল কোন কোন স্থলে তাহারও বৈপরীত্য আছে; যথা পতিনা নীয়মানায়াঃ, ক্লীবেচ পতিতে পত্যৌ এবং সখিনা বানরেন্দ্রেণ ইত্যাদি এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্রই নিয়মের বৈষম্য হইয়া উঠে নাই। অবশেষে "শেষোবৃদ্ধাৎ" এই একটি সূত্র

করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে বৃদ্ধ-পরম্পরা হইতে অবশিষ্ট নিয়ম সকল জানিবে। তবে লক্ষণগুলি করিবার উদ্দেশ্য এই যে বালকেরা বুঝিতে পারিবে। এই জন্যে ব্যাকরণের শেষে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বেরেষাপ্রবোক্তব্যা ভাষা বৃদ্ধানুসারতঃ। বাল ব্যুৎপত্তি-দিঙমাত্র-দর্শনার্থন্তু লক্ষণং"॥

এই সংস্কৃত ভাষা, বৃদ্ধপরম্পরার অনুকরণ পূর্ব্বক সকলেরই প্রয়োগ করা উচিত। তবে যে লক্ষণগুলি করা হইল। সে কেবল বালকদিগকে দিগ্দর্শন করাইবার নিমিত্ত।

সংস্কৃত ভাষা যদি কৃত্রিম হইত তবে সমুদায় পুংলিঙ্গ শব্দের এক প্রকার রূপ হইত, অথবা পুংলিঙ্গ অকারান্তের এক প্রকার, পুংলিঙ্গ ইকারান্তের অপর প্রকার এই প্রকারে রূপের ভেদ হইত, এক ইকারান্ত শব্দের নানা প্রকার ভেদ হইত না।

আর 'ভাষ্যতে' এই অর্থে ভাষা পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ভাষা শব্দে যাহা বলাযায় তাহাই বুঝায়। সংস্কৃত যদি প্রচলিত না থাকিত তবে তাহাকে ভাষাই বলা যাইত না।

অতএব সংস্কৃত ভাষা যে লোকে কোন কালে প্রচলিত ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আরও দেখা যাইতেছে যে, ভাষা মাত্রেই সংস্কৃত অসংস্কৃত দুইটি ভেদ আছে। গ্রন্থাদিতে যে ভাষা লিখিত হয় তাহা প্রচলিত ভাষা হইতে পবিত্র বা পরিষ্কৃত, আর লোকে প্রচলিত ভাষা তাহা অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট। ইহার প্রমাণ এই যে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়া দেখুন তাহার ভাষা কিরূপ, আর দুইজন লোকের বাঙ্গালা কথাবার্ত্তা শ্রবণ করুন, তাহার ভাষাই বা কিরূপ। অবশ্যই বোধ হইবে কথোপকথনের ভাষা অপেক্ষা ঐ গ্রন্থের ভাষা কিছু মার্জ্জিত। অতএব ঐ গ্রন্থের ভাষাকেও সংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষা বলিতে পারাযায়। কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাহার ঐরূপ দুইটি ভেদ হওয়াতে সেই ভাষার গ্রন্থস্থিত ভাষারই নাম সংস্কৃত হইয়া গেল। সুতরাং উহা এক্ষণে রূঢ় সংজ্ঞাই হইয়াছে। এজন্য অন্য ভাষাতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার নাই। এরূপেও সংস্কৃত নামটি প্রাদুর্ভূত হওয়া সম্ভব।

এই ভাষায় বহু-সঙ্খ্যক ছন্দ আছে। ছন্দগুলি যদিও কাব্যের আবশ্যকীয় অঙ্গ না হউক তথাপি উহা যে কাব্যের ভাষার বৈচিত্র্য অর্থাৎ অলঙ্কার বিশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ছন্দ সকল ভাষাতেই আছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতছন্দসঙ্খ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও সংস্কৃতছন্দ সকল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতি-মধুর। সুমতি বন্ধু কবি তাঁহার ছন্দঃশাস্ত্রে সমবর্ণবৃত্তছন্দের মধ্যে একাক্ষর পাদ হইতে ছাব্বিশ অক্ষর পাদ অর্থাৎ চারি অক্ষর হইতে ১০৪ বর্ণ পর্য্যন্ত সমবৃত্ত ছন্দ কত-

প্রকার হয় তাহার গননা করিয়াছেন। যথা ছব্বীশা সত্তসআ ত্তহসত্তায়হ সহস্রাইং। বেআলীশং লক্ষং তেবহ কোডী সমগ্‌গ্রাইং। অর্থাৎ তের কোটি বেয়াল্লিশ লক্ষ সতর হাজার সাত শত ছাব্বিশ। ১৩,৪২,১৭,৭২৬।

এতদ্ভিন্ন মাত্রাবৃত্তচ্ছন্দ, অর্দ্ধসমবৃত্তচ্ছন্দ, বিষমবৃত্তচ্ছন্দ আরও বহুপ্রকার আছে তাহা তিনি গণনা করেন নাই। সেগুলির সহিত গণিতে গেলে ছন্দকে অনন্তসংখ্যক বলিয়া বোধ হয়। সে যাহা হউক কাব্য নাটক প্রভৃতিতে যত প্রকার ছন্দ প্রচলিত দেখা যায় তাহাও দুই তিন হাজারের ন্যূন নহে।

সংস্কৃতভাষা এই সকল কারণে কাব্য রচনাতে বিশেষ উপযোগিনী। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এই ভাষায় উক্তরূপ বহুবিধ গুণ থাকিলেও তাহা আমরা জানিতে চেষ্টা করি না। ভেকগণ যেরূপ পদ্মের সন্নিকটে থাকিয়াও তাহার গুণাদি বিষয়ে অজ্ঞ, আমরা সহোদরার ন্যায় জন্মভূমি-জাতা সংস্কৃত ভাষার গুণাদি বিষয়েও ঠিক সেইরূপ।

পক্ষান্তরে মধুমক্ষিকাগণ যেরূপ দূরে থাকিলেও পদ্মের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধু সেবন করিয়া থাকে আর সেই মধু দ্বারা মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, দূরবর্ত্তি ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণ সেইরূপ সংস্কৃতের যশঃ-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া তাহার রসাস্বাদন করিতেছেন এবং তাহার সারাংশ দ্বারা উৎকৃষ্ট নূতন বিদ্যা প্রচার পূর্ব্বক স্বদেশের ভাষা সংশোধন করিতেছেন। যাহা হউক সে সকল বিষয় লইয়া অধিক আন্দোলন করা অনাবশ্যক। প্রস্তুত বিষয়ে যাহা যাহা বক্তব্য তাহাই বলা যাউক।

কাব্য মাত্রেই ভাষার উক্তি দুই প্রকার। ঐ দুই প্রকার উক্তিকে স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি কহে। স্বভাবানুসারে অর্থাৎ সরলভাবে যেরূপ ভাষা হৃদয়ে উদিত হয় তাহার উক্তিকে স্বভাবোক্তি বা সরলোক্তি বলা যায়, ইতিহাসাদির ভাষাতে প্রায়ই স্বভাবোক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না ইতিহাসে রাজাদির যে সকল চরিত্র বর্ণিত হয় তাহা আদি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত পর্য্যন্ত যথাক্রমেই সমাহিত হইয়া থাকে। যেমন রামায়ণ ও মহাভারতে রাম ও যুধিষ্ঠিরাদি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা ক্রমেই উক্ত হইয়াছে আরও যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুদিগের আধিপত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগের আধিপত্য পর্য্যন্ত ক্রমিক ঘটনাগুলি ক্রমেই বর্ণিত হইয়াছে। একটি বাক্যেও স্বভাবোক্তি বা সরলোক্তির উদাহরণ দেখান যায় যথা——

বনেষু সায়ন্তন-মল্লিকানাং বিজৃম্ভনোদ্গন্ধিষু কুট্মলেষু। প্রত্যেক-নিক্ষিপ্তপদঃ-সশব্দং সঙ্খ্যামিবৈষাং ভ্রমরশ্চকার।

সন্ধ্যাকালে বেলফুলের বাগানে কলিকাগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া যখন সৌরভ

বিস্তার করিতেছিল তখন ভ্রমরগণ আসিয়া তাহার প্রত্যেক কলিকাতেই শব্দ পূর্ব্বক পদক্ষেপ করিতে লাগিল, ইহাতে বোধ হইল যেন তাহারা এক, দুই, তিন, চারি করিয়া কলিকাগুলিকে গণনা করিয়াছিল। এই সকল স্থলে স্বভাবানুসারিণী উক্তি থাকাতে স্বভাবোক্তি বলা যায়।

স্বভাবের অনুগমন ত্যাগ করিয়া বক্রভাবে কোন কথা বলিলে বক্রোক্তি কহা যায়। যেমন নাটকাদির উক্তি। নাটকাদিতে শেষের বা মধ্যের কোন ঘটনা প্রথমে ধরিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনাগুলি উক্ত হইয়া থাকে। যেমন রত্নাবলী নাটিকায় প্রথমত যৌগন্ধরায়ণের উক্তিতে রত্নাবলীর সাগরে মজ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনাগুলি অর্থাৎ সিংহলেশ্বরের সমীপে দূত প্রেরণ, রত্নাবলী প্রার্থনা প্রভৃতি কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। আরও যেমন উত্তরচরিত নাটকে রামের রাজ্য প্রাপ্তির পর হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্রপট দর্শনের ছলে বিবাহ, বনগমন প্রভৃতি শৈশবাবস্থার ঘটনাগুলি পশ্চাৎ পশ্চাৎ বর্ণিত হইয়াছে। একবাক্যেও বক্রোক্তি দেখা যায় যথা——

অনেন পর্য্যাসয়তাশ্রুবিন্দূন্ মুক্তাফলস্থূলতমান্ স্তনেষু। প্রত্যর্পিতাঃ শত্রুবিলাসিনীনামাক্ষেপসূত্রেণ বিনৈব হারাঃ॥

এই রাজা শত্রুপত্নীদিগের হৃদয়ে মুক্তার ন্যায় স্থূল স্থূল অশ্রুবিন্দু পাতন করত গ্রন্থন-সূত্র ব্যতিরেকেই হার প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। এই রাজা শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে এতাবন্মাত্র বলিলেই কবির অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু বক্র করিয়া বলিলে চমৎকার-বিশেষ জন্মে এই হেতু কবি উক্ত ভাবটি ঘুরাইয়া বলিয়াছেন অর্থাৎ সেই রাজার শত্রুপত্নীরা বিধবা হইয়া হারাদি ভূষণ ত্যাগ পূর্ব্বক অনবরত নয়ন-জলবিন্দু-বর্ষণ দ্বারা হৃদয়মণ্ডল আর্দ্র করিয়াছিল।

অন্য প্রকার বক্রোক্তি যথা।—কোন আগন্তুক এক গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল মহাশয় এস্থানে মশা কেমন? গৃহস্থ উত্তর দিল এখানে মশা কাল কাল ক্ষুদ্রাকার ছয়খানি পা আছে দুইখানি পাখা আছে উড়িয়া বেড়ায়। আগন্তুক জিজ্ঞাসিল মশার উপদ্রব কেমন? গৃহস্থ বলিল মশা এ পর্য্যন্ত কাহারো কোন দ্রব্য অপহরণ করে নাই কাহারও বিষয় কাড়িয়া লয় নাই কোন ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিতেও পারে নাই। আগন্তুক পুনর্ব্বার বলিল, মহাশয় আমি তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি মশা কামড়ায় কেমন? গৃহস্থ উত্তর করিল, মশা প্রথমে গায়ে পড়ে, পরে শুঁড় বাড়াইয়া দংশন করে, তখন দষ্ট স্থান চুলকায় পরে কিছু কিছু জ্বালা করে। আগন্তুক শুনিয়া অবাক্ হইল আর কিছু জিজ্ঞাসিল না। পর দিবস আগন্তুক যখন প্রস্থান করে তখন একটি নদী দেখিতে পাইল, দৈবযোগে নদীর ঘাটে পূর্ব্বদিনের সেই গৃহস্থ উপস্থিত ছিল। আগন্তুক তাঁহাকে

চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় এ নদীতে জল কত। গৃহস্থ বলিল নদীর জল কখন ওজন করা হয় নাই, কি প্রকারে বলিব কত জল। আগন্তুক বলিল এ ঘাটে কত জল। গৃহস্থ বলিল অনুমান ৫০।৬০ হাজার মোন হইতে পারে। আগন্তুক বলিল পার হইতে কাপড় ভিজিবে কি না। গৃহস্থ বলিল কাপড় দেও কাপড় ভিজিবে কাঁথা দেও কাঁথা ভিজিবে যাহা দেও তাহাই ভিজিবে। আগন্তুক অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল। এই প্রস্তাবে গৃহস্থের উক্তিগুলি বক্রোক্তি। এইরূপে বক্রোক্তি নানা প্রকার হইতে পারে তাহা নির্ব্বাচন করা যায় না।

এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে বক্রোক্তিই অধিক চমৎকারিণী। এই জন্য কোন কবি বলিয়াছেন 'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতং' অর্থাৎ বক্রভাবে উক্তি কাব্যের জীবন স্বরূপ। বস্তুতঃ বক্রোক্তি কেবল কাব্যের বৈচিত্র্য মাত্র। বক্রোক্তি ব্যতিরেকে কাব্যাংশের কোন ক্ষতি নাই।

ইংলণ্ডীয় কবি ও সহৃদয়গণ বক্রোক্তির অধিক পক্ষপাতী। অনেক নবোপাখ্যান এবং কাব্য ইংরাজী ভাষাতে বক্রোক্তি-পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি কাব্যের অর্থবন্ধন বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে। কাব্যে যে সকল অর্থ বা ভাব গাঁথা যায় তাহা দুই প্রকার স্বতঃসম্ভবী ও কবি-প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ। অলঙ্কৃতই হউক আর অলঙ্কৃতই হউক যে অর্থগুলি প্রাকৃতিক ঘটনানুসারে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় সেই অর্থকে স্বতঃসম্ভবী বলে। যেমন রামায়ণ কাব্যে রামের বনবাস স্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে দশরথ রাজা কৈকেয়ীর সত্যে বদ্ধ হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও রামকে বনে যাইতে আজ্ঞা করিলেন, রাম এমনি পিতৃভক্ত ছিলেন যে পিতার আজ্ঞা এতদূর নিষ্ঠুর হইলেও ভক্তি-পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলেন এবং রাজ্যাভিষেক ত্যাগ করিয়াও বনবাসে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনাগুলি রামের সম্বন্ধে বস্তুতঃ ঘটিয়াছিল, অথবা উহার কিছুই ঘটে নাই, কেবল মহাকবি বাল্মীকি আপনার বুদ্ধি দ্বারা ঐ ঘটনাগুলি রামের সম্বন্ধে কল্পনা করিয়াছেন এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় করা যায় না। পরন্তু প্রাকৃতিক ঘটনা অনুসারে উক্ত কার্য্যগুলি রামের পক্ষে সম্ভবপর বোধ হয়। কেন না ধার্ম্মিক লোকেরা এতাদৃশ পিতৃ-আজ্ঞাও পালন করিয়া থাকেন। অতএব ঐ ভাবগুলি স্বতঃসম্ভবী।

আর প্রাকৃতিক ঘটনানুসারে যে ভাব বা অর্থ সম্ভবপর বোধ হয় না, কেবল কবির কল্পনানুসারে কথঞ্চিৎ যাহা সিদ্ধ হইতে পারে সেই অর্থকে কবিপ্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অর্থ কহে। যেমন রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে রাম উত্তালতরঙ্গ-মালা সঙ্কুল বিস্তীর্ণ অগাধ সাগর মধ্যে নল নীল প্রভৃতি বানরের দ্বারা সেতু বন্ধন করাইয়াছিলেন। এই বিষয়টি প্রাকৃত

ঘটনাতে সম্ভব বোধ হয় না, কেন না যে বানরেরা সামান্য একটি খালও বাঁধিতে পারে না তাহারা সাগর বন্ধন করিবে কি প্রকারে। পরন্তু কবি যে কল্পনা মূল করিয়া ঐ ভাব গাঁথিয়াছেন তাহাতে উহা সিদ্ধ হইতে পারে। বাল্মীকি কল্পনা করিয়াছেন যে রাম পরমেশ্বরের অবতার, আর বানরেরা দেবতার অবতার, নীল বিশ্বকর্ম্মাদেবের পুত্র। পরমেশ্বরের ও দেবতাদিগের অলৌকিক শক্তি অতএব পরমেশ্বরের অনুগ্রহে দেবতাদিগের শক্তিতে সাগর বদ্ধ হওয়া বিচিত্র কি। যিনি সাগর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কটাক্ষ করিলে সাগর শুষ্ক হইয়াও যাইতে পারে।

এই নিমিত্তে বানরের দ্বারা রামের সাগরে সেতুবন্ধন বিষয়টি কবি প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধ অর্থ হইল।

উপরোক্ত দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে ইতিবৃত্তে ও নাটকে স্বতঃসম্ভবী অর্থই বন্ধন করা কর্ত্তব্য। ইতিবৃত্তের মধ্যে যদি কোন স্থানেও প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অর্থ বর্ণিত থাকে তবে সমুদায় অংশেই ঐ রূপ অর্থের সন্দেহ উপস্থিত হয়। আর নাটকে প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অর্থ বদ্ধ হইলে তাহার অভিনয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া উঠে না। স্বতঃ-সম্ভবী অর্থও দুই প্রকার। তাত্ত্বিক ও কাল্পনিক। যে অর্থ বস্তুগত্যা ঘটিয়াছিল তাহা তাত্ত্বিক, আর যাহা ঘটে নাই অর্থ কল্পনা করিলে সম্ভব পর হইতে পারে, তাহা কাল্পনিক স্বতঃ সম্ভবী।

ইতিবৃত্তে কাল্পনিক অর্থ গ্রন্থন করা উচিত নয়, কিন্তু ইতিহাস-লেখকেরা পক্ষপাত প্রভৃতি কারণ বশতঃ কাল্পনিক অর্থও বন্ধন করিয়া থাকেন। কখন কখন এরূপ কাল্পনিক অর্থ বন্ধন করেন যে তাহা প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়।

ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে মার্সম্যান সাহেব লিখিয়াছেন আলেকজণ্ডর যখন ভারতবর্ষ আসিয়াছিলেন তখন পোরস নামক এক রাজার সঙ্গে তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ যুদ্ধে আলেকজণ্ডর জয়ী এবং পোরস পরাজিত হইয়াছিল; পরে আলেকজণ্ডরের সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পোরস যখন তাঁহার নিকটে আনীত হইলেন তখন আলেকজণ্ডর তাঁহার পৌরুষ দেখিয়া ও বীরের ন্যায় একটি বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন। এত দূর প্রীত হইলেন যে তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া ও তাঁহার রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। এই বর্ণনা কল্পিত বোধ হয়। যিনি জয়ী তিনি সন্তুষ্ট হইলেও রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়া দিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। এস্থলে বোধ হয় যে পোরসের যুদ্ধে আলেকজণ্ডর অপারগ হইয়া সন্ধি-স্থাপনার্থ তাঁহাকে আনাইয়াছিলেন এবং কিছু রাজ্য দান করিয়া সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য ইতিবৃত্ত-লেখকের পক্ষপাত বশত কল্পনা বোধ হয়।

কবি-প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অর্থের কাব্য, কাদম্বরী, হিতোপদেশ, আরব্য উপাখ্যান

প্রভৃতি। আর মহাভারত রামায়ণাদিতে স্বতঃসম্ভবী ও প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ দ্বিবিধ অর্থই নিবদ্ধ আছে।

উক্ত দুই প্রকার অর্থও প্রত্যেকে ত্রিবিধ হয়। বাচ্য লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য। অভিধান কোষে যে শব্দের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে সেই অর্থকে বাচ্যার্থ কহে, সেই বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ অন্য কোন পদার্থ বুঝাইলে লক্ষ্যার্থ কহে, আর প্রণিধান দ্বারা যে অর্থের বোধ হয় তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ কহে। যেমন কৃষ্ণকান্ত ভাদ্রমাস-শূন্য এই বলিলে কৃষ্ণকান্তের সম্বন্ধে শ্রাবণের পর মাস নাই এই একটি অর্থ বোধ হয় তাহাই বাচ্যার্থ। লক্ষ্যার্থ যথা 'ভাদ্রমাসে তাল পাকিয়া থাকে' তাল শব্দে তালফল ও কর্ণক্রিয়া অর্থাৎ বাজনার তাল উভয়ই বুঝায় এই রূপে লক্ষণা করিয়া ভাদ্রমাস পদে কর্ণক্রিয়া রূপ তাল বুঝাইলে কৃষ্ণকান্ত বাজনার তাল-জ্ঞান-রহিত এই অর্থ লক্ষ্যার্থ হইল। আর ইহার ব্যঙ্গ্যার্থ এই যে কৃষ্ণকান্তের তালজ্ঞান মাত্র নাই এমন কি ভাদ্রমাসের তালফল পর্য্যন্তও সে জানে না আর বাজনার তাল কি জানিবে। এই ব্যঙ্গ্যার্থের উৎকর্ষ ও অপকর্ষই কাব্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের হেতু। অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থ যদি উৎকৃষ্ট হয় তবেই কাব্য উৎকৃষ্ট হইল আর ব্যঙ্গ্যার্থ যদি অপকৃষ্ট হয় তবে কাব্যও অপকৃষ্ট হইল। ইহা পশ্চাৎ স্পষ্টরূপে বলা হইবে।

কাব্যের অর্থের নানাপ্রকার বৈচিত্র্য আছে সেই গুলিকে উপমা অনন্বয় প্রভৃতি অলঙ্কার কহে তাহার বিস্তার বলা অদ্যকার প্রযোজনীয় নহে।

কাব্যের সামান্য লক্ষণ এক প্রকার বলা হইল। এই লক্ষণ যে যে গ্রন্থে লক্ষিত হইবে তাহাকেই কাব্য বলা যায়। তথাপি কতকগুলি গ্রন্থের নাম করা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্টরূপে লক্ষ্য জানা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কাব্য দুই প্রকার দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্য কাব্য নাটক প্রকরণ প্রভৃতি দশপ্রকার রূপক। আর নাটিকা ত্রোটকপ্রভৃতি অষ্টাদশপ্রকার উপরূপক। সমুদায় অষ্টাবিংশতিবিধ।

শ্রব্যকাব্য বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, নবোপাখ্যান, গীতকাব্য, জীবন-চরিত, প্রহেলিকা প্রভৃতি।

কোন কোন আলঙ্কারিক প্রহেলিকা অর্থাৎ হেঁয়ালীর কাব্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন রস না থাকিলে কাব্য বলা যায় না। যেহেতু রসাত্মক বাক্যই কাব্য। তবে যে

এতাবদুক্ত্বা প্রতিযাতুকামং শিষ্যং মহর্ষে-
র্নৃপতির্নিষিধ্য।
কিংবস্তু বিদ্বন্ গুরবে প্রদেয়ং ত্বয়া কিয়দ্
বেতি তমন্বযুঙ্ক্ত॥

মহর্ষির শিষ্য এতাবন্মাত্র বলিয়া প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করিল, তখন রাজা তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পণ্ডিত আপনার গুরুকে কি

বস্তু দিতে হইবে আর সে বস্তুর পরিকল্প।

এই পদ্যটির রস ব্যতিরেকেও কাব্যত্ব দেখা যাইতেছে। সে কেবল প্রকরণের রসবত্তা থাকাতেই উপপন্ন হইতেছে।

বস্তুতঃ এরূপে রসের গন্ধ সকল কবিতাতেই রাখা যাইতে পারে অর্থাৎ প্রহেলিকাদিতেও কথঞ্চিৎ রসগন্ধ আনয়ন করা যায়। এই জন্যে প্রাচীন পণ্ডিতেরা কাব্যের রসঘটিত লক্ষণ করেন না, চমৎকারজনক অর্থ ও শব্দকেই তাঁহারা কাব্য বলেন। সুতরাং প্রহেলিকাও তাঁহাদের মতে কাব্য, কেন না প্রহেলিকার অর্থেও চমৎকার-বিশেষ জন্মে। আচার্য্য দণ্ডী স্পষ্টরূপে প্রহেলিকার কাব্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রহেলিকার অনেক উদাহরণও দর্শাইয়াছেন। অতএব প্রহেলিকাকে আমরাও কাব্য বলিলাম।

সম্প্রতি কাব্যের প্রয়োজন বলা যাইতেছে। মম্মটভট্ট বলিয়াছেন।

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।

কাব্যনির্ম্মাণ করিলে রচয়িতার যশ হয়। যদিও যশোজনক অন্যান্য অনেক কার্য্য আছে তথাপি কাব্য নির্ম্মাণের যশ সে সকল যশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কোন দাতা পৃথিবী পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন কেহ বা পরোপকারার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন, অপর ব্যক্তি সত্যের অনুরোধে রাজ্য ভ্রাতা পত্নী অবশেষে আত্মাকেও হারাইয়াছেন। কোন পণ্ডিত কুশাগ্রীয় বুদ্ধিদ্বারা অতি গহন দর্শন শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, কেহ বা অলৌকিক শব্দবিদ্যার লক্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহারা সকলেই যশস্বী। কিন্তু যে যশের প্রভাবে বাল্মীকি মুনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের সম্মুখে অদ্যাপি শিশুবৎ নৃত্য করিতেছেন আর তাঁহাদের দত্ত স্তুতি আস্বাদ পূর্ব্বক তৃপ্ত হইতেছেন, এবং যে যশঃশরীর ধারণ করত ব্যাসদেব অমরপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, যে যশের গুণে কালিদাস সরস্বতী দেবীর স্তন্য পানপূর্ব্বক চিরজীবী হইয়াছেন, আর যে যশে সেক্সপীয়র সমস্ত লোকের অন্তঃকরণে জাগরূক আছেন, সে যশ অপর কোন ব্যক্তিতে দেখা যায় না। সকল লোকেই এই যশ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। অন্ততঃ দুই চারিটি কবিতা রচনা না করিয়াছেন আমরা এমন লোক প্রায় দেখিতে পাই না।

অপর প্রয়োজন। কাব্যনির্ম্মাণ করিলে ধন সম্পত্তি জন্মে। পূর্ব্বকালে কাব্যের দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে হইলে যশের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইত অর্থাৎ কবি কাব্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যশোলিপ্সু অপর ব্যক্তির নিকট তাহা বিক্রয় করিতেন। তিনি আপনার নামে ঐ কাব্য পৃথিবীতে প্রচার করিয়াদিতেন, সুতরাং কাব্যের ক্রয় বিক্রয়কে এক প্রকার যশের ক্রয় বিক্রয়ই বলা যাইত। প্রসিদ্ধি আছে ধাবক নামক একজন কবি ছিলেন। তিনি

নাগানন্দ নাটক ও রত্নাবলী নাটিকা রচনা করেন। ধাবক কবি দরিদ্র ছিলেন, এই জন্য তিনি ঐ কাব্যদ্বয় মহারাজ শ্রীহর্ষদেবের নিকটে বিক্রয় করিলেন। শ্রীহর্ষ ঐ কাব্যদ্বয় ক্রয় পূর্ব্বক আপনার নামে প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতেই ধাবক কবি বহুল ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপে কাব্য বিক্রয় করিতে হয় না। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে স্বনামে প্রকাশিত কাব্যের দ্বারাও ধনোপার্জ্জন করা যায়। হয় পুস্তক বিক্রয় করিয়া, না হয় পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় করিয়াও প্রচুর ধন লাভ করা গিয়া থাকে।

কাব্যের অন্য প্রয়োজন পাপক্ষয়। অর্থাৎ উত্তম কাব্য দ্বারা যদি ঈশ্বরের স্তুতি করা যায় তবে তাহাতে পাপক্ষয় ও স্বর্গলাভ হয়। যাহারা ঈশ্বর স্বীকার করে তাহারা অবশ্যই বলিবে যে পরমেশ্বর প্রীত হইলে ভক্তের পাপবিনাশ পূর্ব্বক তাহাকে স্বর্গসুখ প্রদান করেন। স্তুতি-বাক্যে কোন্ ব্যক্তি প্রসন্ন না হন? স্তব করিলে শত্রুও মিত্রবৎ অনুকূল হইয়া থাকে। এই নিমিত্তে হিন্দুরা বেদাদি বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরের স্তুতি করে। মুসলমানেরা কোরাণ পাঠ পূর্ব্বক তাঁহারই আরাধনা করে। খ্রীষ্টানেরা বাইবলের কবিতা দ্বারা খ্রীষ্টের স্তব করে। ব্রাহ্মেরা উৎকৃষ্ট গীতকাব্য দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকে। রোগাদিতে অভিভূত হইলে কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বরের স্মরণ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ফলতঃ উৎকৃষ্ট কাব্য দ্বারা স্তুতি করিলে পরমেশ্বর যে প্রসন্ন হয়েন তাহাতে মতবিরোধ নাই।

প্রসিদ্ধি আছে ময়ূরভট্ট নামক এক জন কবি কুষ্ঠ-রোগ গ্রস্ত হইয়াছিলেন। অনেক চিকিৎসা করিয়াও তাঁহার ঐ রোগ দূর হইল না। পরে তিনি সূর্য্যশতক নামে একখানি কাব্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের স্তব করিলেন এবং তাহাতেই উক্ত রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। আরও একটি কিম্বদন্তী আছে—পুষ্পদন্ত নামে অপর এক গন্ধর্ব্ব ছিল, সে প্রতিদিন একজন শৈব রাজার উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া লইয়া যাইত। ঐ রাজা তাহাকে কোন রূপেই ধরিতে পারিত না। পরে রাজা একদিন পুষ্পোদ্যানে শিব নির্ম্মাল্য পুষ্প ছড়াইয়া রাখিলেন। গন্ধর্ব্ব যখন ঐ নির্ম্মাল্য চরণ দ্বারা দলন করিয়া পুষ্প চয়ন করে তখন দৈব প্রভাবে তাহার গতি শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল এবং রাজার প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইল। গন্ধর্ব্ব বুঝিলেন পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে এ বিপদ হইতে মুক্তির উপায় নাই। এই বিবেচনায় 'মহিম্নঃপারস্তে' ইত্যাদি পদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের স্তব করিলেন ও অচিরাৎ ঐ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।

অতএব কাব্য নির্ম্মাণ এবং কাব্যের জ্ঞান উভয়ই পাপক্ষয় ও পুণ্য লাভের কারণ।

কাব্যের অন্য প্রয়োজন উৎকৃষ্ট প্রীতি

লাভ। অর্থাৎ কাব্য নির্ম্মাণ করিলে অথবা কাব্য পাঠ পূর্ব্বক অর্থ বোধ করিলে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ কাব্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কতদূর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন আমরা তাহা বলিতে পারি না, আমরা স্বয়ং যদি তাদৃশ কাব্য নির্ম্মাণ করিতে পারিতাম তবে ঐ আনন্দ অনুভব করিয়া অন্যকে জানাইতেও পারিতাম। পরন্তু কাব্যের অর্থ বোধে যে আনন্দ উদিত হয় তাহা আমরা কিছু কিছু অনুভব করিতে পারি। কবিরা অমৃত নামে একটি পদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা সকল মধুর পদার্থ অপেক্ষা মধুরতম। যদি আমরা কখন অমৃতাস্বাদ করিতাম তবে অমৃত পানের আনন্দ বড় কি কাব্যরসাস্বাদের আনন্দ বড় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতাম। কাব্য বোধের আনন্দ যে অন্যান্য মধুর পদার্থ উপভোগের আনন্দ অপেক্ষা অধিক তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। যখন আমরা উৎকৃষ্ট কোন কাব্যরসে আর্দ্র হইয়া যাই, তখন কি ক্ষুধাবোধ কি পিপাসা কি শয়ন কি অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই আমাদিগের স্মরণ থাকে না। যদি কিছু মৃত্তিকা জলের মধ্যে গলিয়া লীন হইয়া যায় তবে ঐ জল শুষ্ক না করিলে যেমন সে মৃত্তিকাকে বাছিয়া লওয়া যায় না, তেমনি আমাদের অন্তঃকরণ কাব্যরসে লীন হইলে যতক্ষণ সেই রস শুষ্ক হইয়া না যায় ততক্ষণ আমরা ঐ অন্তঃকরণকে পৃথক করিয়া আনিতে পারি না।

প্রসিদ্ধি আছে এক রাজা মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। ঐ রাজার সঙ্গে একজন কবি ছিলেন। রাজা মৃগয়া করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইলেন; কিন্তু নিকটে জল না থাকাতে অনুচরগণ দূরে জলানয়নার্থ গমন করিল। ঐসময়ে রাজার পিপাসা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে রাজা শুষ্ককণ্ঠে অনবরত জল জল করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পার্শ্বচর কবি একটি কবিতা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে শুনাইলেন। সে কবিতা এই—

বক্ত্রাম্ভোজং সরস্বত্যধিবসতি সদা শোণএবাধরস্তে, বাহুঃ কাকুৎস্থবীর্য্য-স্মৃতিকরণপটুর্দক্ষিণস্তে সমুদ্রঃ। বাহিন্যঃ পার্শ্বমেতাঃ ক্ষণমপি ভবতোনৈব মুঞ্চন্ত্যভীক্ষ্ণং, স্বচ্ছেস্মিন্মানসেঽস্মিন্ কথমবনিপতে তেঽম্বুপানাভিলাষঃ॥

রাজা এই কবিতার রসাস্বাদ করত পিপাসা বিস্মৃত হইলেন। কিছুকাল পরে অনুচরগণও জল আনিল। আমরা যখন কোন দৃশ্য কাব্যের অভিনয় দর্শন করি তখন অন্তঃকরণ এমনি আর্দ্র হয়, যে নটের হাস্য দেখিলে আমাদেরও হাস্য আইসে, নটের রোদনে আমাদেরও অশ্রু জল পতিত হয়, নটের নৃত্য দেখিয়া আমাদেরও নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয়। এ সকল বিষয় অনেকেই অনুভব করিতে পারেন। অতএব কবিও কাব্য-বোদ্ধা উভয়েরই আনন্দ কাব্যের প্রয়োজন।

কাব্য জ্ঞানের দ্বার, কাব্য পর্য্যালোচনাতে ব্যবহার জানিতে পারা যায়। যেমন গ্রীস দেশের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে সেই দেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম প্রভৃতি জানা যায়। রামায়ণ মহাভারত দেখিলে প্রাচীন হিন্দুদিগের আচারাদিবিষয়ক জ্ঞান জন্মে এই রূপ রাজারা প্রজাদিগের কিরূপ শাসন করিতেন প্রজারাই বা রাজার প্রতি কি রূপ ভক্তি করিত, বিচার প্রণালী কেমন ছিল, কোন্ পাপে কেমন দণ্ডবিধি ছিল ইত্যাদি সমস্ত বিষয়, কাব্যালোচনা দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

কাব্য পর্য্যালোচনার অপর একটি ফল উপদেশ লাভ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কাব্যের তিন প্রকার অর্থ আছে। বাচ্য লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য, তন্মধ্যে ব্যঙ্গ্যার্থই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাব্যের সেই ব্যঙ্গ্যার্থই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে। যেমন রামায়ণ কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে রাম ধর্ম্মশীল ছিলেন, সকলের সঙ্গেই ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিতেন, অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইলেও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আচরণ করিতেন না ইত্যাদি। পক্ষান্তরে রাবণ অত্যন্ত উৎপথগামী ছিল, সর্ব্বদা অন্যায় আচরণ করিত, কাম ক্রোধাদির একান্ত অধীন হইয়া পরস্ত্রী পরধনাদি লুণ্ঠন করিয়া লইত ইত্যাদি। কিন্তু ঐ রাম রাবণের যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইল তখন রাবণ মৃত্যু লাভ করিল, আর রাম জয় লাভ করিলেন। এই বর্ণনাতে আমরা কি বুঝিতেছি? আমরা বুঝিতেছি এই যে, রাবণ যদি অন্যায়াচরণ ও ছলাদি করিয়া রামের প্রিয়তমা সীতাকে অপহরণ না করিত তবে রাবণ মরিত না, অথবা সীতা হরণ করিয়াও যদি বিভীষণাদি মন্ত্রিগণের সৎপরামর্শে বিনয় পূর্ব্বক রামের সীতা রামকে প্রত্যর্পণ করিত তবে রাবণ মরিত না। কিম্বা সতী স্ত্রী মন্দোদরীর মন্ত্রণা শুনিলে রাবণ মরিত না। কেবল ঐ সকল সদাচরণ না করিয়াই রাবণ মরিয়াছে। তবে আমরা তাদৃশ আচরণ করিব না তাহা হইলে আমাদিগকেও মরিতে হইবে। মরণ অপেক্ষা আর কোন্ দণ্ড অধিক? যত প্রকার দুঃখদায়ক পদার্থ আছে মরণ সকল হইতেই বড়। রামায়ণ পড়িলে এইরূপ আলোচনা আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয়। উহাই রামায়ণের ব্যঙ্গ্যার্থ, ঐ অর্থ আমাদিগকে একটি উপদেশ দান করে, সে উপদেশ এই যে রাবণের ন্যায় কদাচ আচরণ করিও না, তাহা হইলে মরিবে। পরস্ত্রী হরণ করিও না, মরিবে ইত্যাদি।

আবার রামের আচরণ ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই বোধ হয় যে রাম কেবল এক ভ্রাতার সহিত বনে ছিলেন, সহায় সম্পদ কিছুই ছিল না অথচ কি উপায়ে রাবণকে মারিলেন। জটায়ু যদি সীতার নিমিত্তে যুদ্ধ না করিত তবে কাহার মুখে রাম সীতাহরণ বার্ত্তা পাইতেন। জটায়ুর সহিত রামের পিতা যদি মিত্রতা বন্ধন না করিত তবে জটায়ুই বা সীতার জন্যে

কেন যুদ্ধ করিবে? অতএব দশরথ জটায়ুর সহিত সখ্য করিয়া ভাল করিয়াছিলেন। পশু পক্ষীর সঙ্গেও সদ্ভাব করা কর্ত্তব্য। সেই জন্যেই রাম, সীতার বার্ত্তা পাইলেন। আরও রাম যদি সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা না করিত তবে কিরূপে রাবণকে জয় করিতে পারিতেন। রাম যদি বানরদিগের সহিত সৌহার্দ্দ ও সদ্ভাব না করিতেন তবে হনুমানই বা সাগর লঙ্ঘন করিবে কেন? নীলই বা সাগর বন্ধন করিবে কেন? অতএব রাম অত্যন্ত সৎকার্য্য করিয়াছেন, যে বানরগণের সঙ্গেও তিনি ন্যায়াচরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা যদি রামের ন্যায় ব্যবহার করি তবে আমরাও কখন বিপদ হইতে রামের ন্যায় উদ্ধার লাভ করিব। এই সকল ভাব আমাদের মনে উদিত হয়। তখন আমরা এই উপদেশ পাই যে

"যান্তি ন্যায় প্রবৃত্তস্য তির্য্যঞ্চোপি
সহায়তাং। অপন্থানন্ত গচ্ছন্তং
সোদরোহপি বিমুঞ্চতি।।"

এইরূপ উপদেশই কাব্যের প্রধান ফল। সেই উপদেশ দিবার নিমিত্ত কবিরা এক জনের সম্পদ এবং অপর ব্যক্তির বিপদ বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তির সম্পদ বর্ণনা করিতে হয় তাহার সম্বন্ধে ন্যায়াচরণ বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। আর যে ব্যক্তির বিপদ বর্ণিত হয় তাহার পক্ষে পাপাচরণ বর্ণিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে ঐ কাব্য দ্বারা পাঠকগণ অসদুপদেশ পাইতে পারে। আমরা যদি কোন একটি ঘটনা জানিতে পারি তবে প্রথমেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করি যে, এ ঘটনা কি কারণে জন্মিল, এ অনুসন্ধান মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। সুতরাং আমরা এক জনের সম্পত্তি দেখিলে কি কারণে ঐ সম্পত্তি জন্মিল তাহাই পর্য্যালোচনা করি। যদি আলোচনায় স্থির হয় যে পাপাচরণই উহার মূল, তবে সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় আমরাও ঐরূপ পাপাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। আবার বিপদের কারণানুসন্ধান করিতে যদি সদাচরণকে তাহার মূল বোধ হয় তবে সদাচরণ ত্যাগ করিয়া বসি। অতএব এরূপ অসদুপদেশ না পাইতে না হয় তাহাই কাব্যে বর্ণন করা শ্রেয়স্কর।

কাব্যের এই প্রধান উদ্দেশ্য না জানিয়া কোন কোন আধুনিক কবি বিপরীত বর্ণনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ যে ব্যক্তির ছল প্রতারণাদি বর্ণিত হয় তাহারই পরিণতিতে জয় বর্ণনা করেন। আবার যে ব্যক্তিকে ধর্ম্মচারীরূপে প্রথমত বর্ণনা করেন পরিণামে তাহারই মৃত্যু বর্ণনা করিয়া থাকেন; যেমন মেঘনাদ বধ কাব্যে মেঘনাদের সচ্চরিত্র এবং লক্ষ্মণের ছল প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, অথচ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পরিণামে মেঘনাদের বধ বর্ণিত হইল। ঐরূপ বর্ণনাতে কাব্য যে অসৎকাব্য বলিয়া পরিগণিত হয় ইহা তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে ধারণা হয় না।

কবিরা কাব্য দ্বারা যে উপদেশ প্রদান

করেন তাহা সামান্য উপদেশের ন্যায় দুর্ব্বল নহে, তাঁহাদের উপদেশগুলি অন্তঃকরণে নিখাত হইয়া যায়। বৃক্ষ যেরূপ বহুদিকে বহুমূল বিস্তার পূর্ব্বক দৃঢ়তর ভাবে অবস্থান করে কাব্যের উপদেশও সেইরূপ বহুবিধ কারণ বিস্তার করিয়া হৃদয়কে অবষ্টব্ধ করিয়া রাখে।

কাব্যের উপদেশ কেমন দৃঢ় তাহা প্রদর্শনার্থ একটি প্রস্তাব উদ্ধৃত হইতেছে। পূর্ব্বকালে ভাগীরথী-তীরে পাটনা নগরে সুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার চারিটি পুত্র। পুত্রেরা কালক্রমে যৌবনারূঢ় হইয়া উৎপথে গমন করিতে লাগিল। তখন রাজা তাহাদিগের সদুপদেশ প্রদানার্থ একটি পণ্ডিত-সভা করাইলেন। সেই সভায় রাজা প্রস্তাব করিলেন যে আমার পুত্রেরা সর্ব্বদা কুকর্ম্মে আসক্ত থাকে ও অন্যায়াচরণ করিয়াই কালক্ষেপণ করে, যদি কোন পণ্ডিত তাহাদিগকে সৎপথাবলম্বী করিতে পারেন তবে আমি তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিব। বিষ্ণু শর্ম্মা নামে ঐ সভায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলিলেন আমি ছয় মাসের মধ্যে মহারাজের পুত্রদিগকে সদুপদেশ দিয়া সৎপথে আনয়ন করিব। তদনন্তর রাজা তাহাতে অনুমতি করিলে হিতোপদেশ নামক কাব্য পড়াইয়া ঐ রাজপুত্রদিগকে বিষ্ণু শর্ম্মা সুশিক্ষিত করিলেন। সেই হিতোপদেশ গ্রন্থ অদ্যাপি আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে।

কাব্যের উপদেশ এইরূপ দৃঢ়তর হয় বলিয়া ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরাও কাব্যের সাহায্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণার্থ প্রাচীন মুনিগণ প্রধান কাব্য বেদের আবিষ্কার করিয়াছেন। বেদের উপদেশ অতি গভীর ও এক এক শ্রুতিতে নানা উপদেশ ব্যক্ত হইতে পারে। এই নিমিত্ত তৎপরবর্ত্তী মুনিগণ ঐ বেদোপদিষ্ট অর্থ প্রকাশ করণার্থ ইতিহাস পুরাণ কথা ইত্যাদি নানাবিধ কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রণিধান করিয়া দেখিলে মহাভারত রামায়ণ পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি সকলই এক একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া প্রতীত হয়। মহাভারতে স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত হইয়াছে যে উহা কাব্য। রামায়ণও আদি কাব্য নামে বিখ্যাত। কাব্যের ঐরূপ উপদেশদাতৃত্ব আছে বলিয়া অনেক ধর্ম্মশাস্ত্রেও কাব্যের ছায়া অবলম্বিত হইয়াছে। মনুস্মৃতি নামক আমাদের প্রধান যে ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তাহাতে এতদূর কাব্যের ছায়া আশ্রয় করা হইয়াছে যে কোন কোন অংশে উহা কাব্য বলিয়াই বোধ হয়। এই জন্যেই বোধ হয় ঐ স্মৃতির সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাধান্য বলা হইয়াছে।

এইরূপ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ক্রাইষ্ট যখন নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কৃত করিলেন তখন ঐ ধর্ম্মের বলবত্তা ও বিস্তারের নিমিত্তে তাঁহার শিষ্যেরা বাইবল নামে একখানি কাব্য রচনা করিল। বস্তুতঃ বাইবলও সদুপদেশ-পূর্ণ একখানি কাব্য মাত্র।

মহম্মদ যখন আত্মমতানুসারে মুসলমানধর্ম্ম প্রচার করেন তখন তিনিও ঐ ধর্ম্মোপদেশক এক খানি কাব্য প্রণয়ন করেন। তাহাই কোরাণ নামে বিখ্যাত। মহম্মদ যে একজন প্রধান কবি ছিলেন তাহা ইতিবৃত্ত-লেখকগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচার হইলে তাহারও বিস্তারাদির নিমিত্তে চৈতন্যচরিতামৃত পদাবলী, পদকল্পতরু প্রভৃতি নানাবিধ কাব্য প্রণীত হইল। ঐ সকল কাব্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিল।

কবীর নামক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যখন আপনার ধর্ম্ম প্রচার করেন তখন তিনি নানাবিধ কাব্য প্রণয়ন পূর্ব্বক ঐ ধর্ম্মকে দৃঢ় করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ যে যে ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহারই মূল কাব্য। যে ধর্ম্মে যত উৎকৃষ্ট কাব্য আছে সে ধর্ম্ম তত দৃঢ় ও তত বিস্তীর্ণ। কেবল কাব্যের অলৌকিক শক্তিতেই মনুষ্যগণ একধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে যে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে তাহারও মূল কাব্য। রামমোহন রায় ঐ ধর্ম্মকে অনেকগুলি গীতকাব্য দ্বারা বদ্ধমূল করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন যে ঐ ধর্ম্মকে রূপান্তরিত করিতেছেন তাহাও কেবল কবিত্বশক্তির গুণে। আমরা শুনিয়াছি কেশবচন্দ্র সেন একজন উত্তম কবি। তিনি যখন বলিতে আরম্ভ করেন তখন অনেকের বদ্ধমূল সংস্কার ও তাঁহার কবিত্ববলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

*　*　*

দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য।

যোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"ততশ্চ কর্ম্ম-কূটানি প্রণবেন
বিনাশয়েৎ। স যোগী কর্ম্মভোগায় কাম-ব্যূহং সমাচরেৎ॥"

যোগসাধক পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ জানিতে পারিলে পর—লক্ষসংখ্যক প্রণব মন্ত্র জপ দ্বারা ঐ ইহজন্ম ও পর জন্মের কর্ম্ম কূট বিনাশ করিবেন। যদ্যপি তাহাতেও ঐ জন্ম-জন্মান্তরীণ কর্ম্ম সমূহ মনঃ হইতে অন্তরিত না হয় তবে যোগী স্বীয় ক্ষমতায় কায়ব্যূহ বিস্তার করত কর্ম্ম-কূট-জনিত পুণ্য ও পাপ বিনাশ করিয়া আত্মত্ব লাভ করিবেন। তাহা হইলে আর ইহ সংসারে জনন-মরণ-জনিত ক্লেশ ভোগ করিবেন না।

এই সময়ে যোগী প্রত্যেক চক্রে পঞ্চধা ধারণ করিবেন। যথা।

"অস্মিন্ কালে মহাযোগী পঞ্চধা
ধারণঞ্চরেৎ। যেন ভূবাদিসিদ্ধিঃ
স্যাৎ তত্ত্বভূতভয়াপহা॥"

পঞ্চধা ধারণার্থ। মহাযোগী প্রত্যেক চক্রে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে পঞ্চ পঞ্চ ক্রমে কুম্ভক করিবে। তাহাতে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতকে সিদ্ধি করিতে অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। মহাভূত সকল সিদ্ধ হইলে আর কস্মিন্ কালে ভৌতিক ভয় থাকে না। এজন্য শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

"পৃথ্যপতেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং॥"

পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি আকাশ হইতে যে যোগিবরের চিত্ত একেবারে অন্তর হইয়াছে, তাঁহার শরীর কেবল যোগাগ্নিময় হওয়ায় তিনি জরামরণাদি দ্বারা কদাচ আক্রান্ত হন না। তবে এই যোগের প্রভাবে যোগিবরের ইচ্ছা মৃত্যু বৈ অন্য রকমে মৃত্যু হয় না। ইহাকে যোগ শাস্ত্রে ভূচরী সিদ্ধি বলে। পঞ্চধা ধারণের নিয়ম—

"আধারে ঘটিকা পঞ্চ লিঙ্গস্থানে
তথৈবচ। তদূর্দ্ধং ঘটিকা পঞ্চ
নাভি-হৃন্মধ্যকে তথা॥ ভ্রূম-
ধ্যোর্দ্ধং তথা পঞ্চ ঘটিকাং ধার-
য়েৎ সুধীঃ। তথাভূরাদিনা
নষ্টো যোগীন্দ্রো নভবেৎ খলু॥"

মূলাধারে মনের সহিত জীবাত্মাকে লইয়া পঞ্চ ঘটিকা লিঙ্গমূলে, পঞ্চ ঘটিকা নাভিমূলে, পঞ্চঘটিকা হৃৎপদ্মে, পঞ্চঘটিকা কণ্ঠমূলে, পঞ্চঘটিকা ভ্রূমধ্যে, পঞ্চ ঘটিকা আজ্ঞাখ্যচক্রে যিনি বায়ু ধারণপূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিতে পারেন, তিনিই ভূচরী সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ইহার অবান্তর ফল এই হয় যে ভূচরী-সিদ্ধ যোগীর শত ব্রহ্ম পতনেও পতন হয় না। যথা—

"মেধাবী পঞ্চভূতানাং ধারণাং যঃ
সমভ্যসেৎ। শতব্রহ্মাগতেনাপি
মৃত্যুস্তস্য নবিদ্যতে॥"

ইহার পর যোগিবরের যে অবস্থা হয় তাহাকে যোগশাস্ত্রে নিষ্পত্ত্যবস্থা বলে। নিষ্পত্ত্যবস্থান্বিত হইলে যোগিবর অনাদি-কর্ম্ম-বীজ হইতে (অর্থাৎ যে কর্ম্ম প্রভাবে কত কল্প দেহরূপ পিঞ্জর ধারণ করিয়া জীব সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাহা হইতে) মুক্ত হইয়া নিরন্তর ব্রহ্ম-রসামৃত পান করিতে থাকেন। যথা।—

"ততোভ্যাসক্রমেণৈব নিষ্পত্তি-
র্যোগিনোভবেৎ। অনাদিকর্ম্ম-
বীজানি যেন তীর্ত্বামৃতং পিবেৎ॥"

এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া কেবল নিরন্তর অভ্যাসেই হয়। বিনাভ্যাসে এ অবস্থা হয় না। ইহাতে বাসনামূল অনাদি কর্ম্ম বীজ হইতে উত্তীর্ণ হওয়ায় ব্রহ্মরসামৃত পান করিতে পারা যায়। অপিচ।—

"যদা নিষ্পত্তির্ভবতি সমাধেঃ
স্বেন কর্ম্মণা। জীবন্মুক্তস্য শান্তস্য

ভবেজ্জীবস্থ যোগিনঃ॥ যদা নি-
ষ্পত্তি-সম্পন্নঃ সমাধিঃ স্বেচ্ছয়া
ভবেৎ। গৃহীত্বা চেতনাং বায়ুঃ
ক্রিয়া-শক্তিঞ্চ বেগবান॥ সর্ব্বান্
চক্রান্ বিজিত্বাতু জ্ঞান-শক্তৌ
বিলীয়তে॥"

জীবন্মুক্ত শান্ত ধীর যোগীর যখন আপন কর্ম্ম দ্বারা সমাধি নিষ্পন্ন হয় তখন সেই মহাযোগীকে নিষ্পত্তি-অবস্থান্বিত বলা যায়। নিষ্পত্ত্যবস্থা হইলে যোগিবর আপন ইচ্ছাক্রমে বেগবান্ চৈতন্যস্বরূপ বায়ু ক্রিয়া শক্তির সহিত শরীরস্থ ষট্ চক্রকে ভেদ করত বিজ্ঞান ও চৈতন্যময় পরমাত্মাতে বিলীন হয়। অর্থাৎ জীব আর পরমাত্মার ভেদ জ্ঞান থাকে না। "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান হয়। এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান যখন যোগিবরের জন্মে তখনি আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। ইহাকেই ব্রহ্মানন্দ অমৃত বলে।

"ইদানীং ক্লেশ-হানার্থং বক্তব্যং
বায়ু-সাধনং। যেন সংসারচক্রেঽ-
স্মিন্ ভোগহানির্ভবেদ্ধ্রুবং॥"

এইক্ষণ যোগীদিগের ক্লেশ নিবারণের জন্য বায়ু সাধনা যে প্রকারে করিতে হয় তাহা এক প্রকার বলা হইল। এই বায়ু সাধনা দ্বারা যোগীর সাংসারিক সকল প্রকার কর্ম্ম ভোগের অবসান হয়।

এতাবৎ পর্য্যন্ত শিবসংহিতার মতানুসারে পবনাভ্যাস যোগের তাবৎ বিষয় বলা হইল। অতঃপর, খেচরী যোগের বিষয় বলা যাইতেছে।

"রসনাং তালু-মূলে যঃ স্থাপয়িত্বা
বিচক্ষণঃ। পিবেৎ প্রাণানিলং
তস্য যোগানাং সংক্ষয়োভবেৎ॥"

জিহ্বাকে তালু-মূলে অর্থাৎ টাগরায় উঠাইয়া জিহ্বাগ্রভাগ দ্বারা—যে বায়ু শরীর হইতে বাহির হইতে না পারে অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা আবদ্ধ যে বায়ু সেই —বায়ু অনবরত পান করিলে প্রাণ বায়ু পান করা হয়। এই রূপে প্রাণ বায়ু পান করিলে যোগিবরের যোগসাধনার শেষ হয়। যে পর্য্যন্ত তাহা না হইবে সে পর্য্যন্ত যোগী যোগস ধনায় ব্রতী হইয়া থাকিবেন। নচেৎ পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যে-রূপে জিহ্বাগ্রকে তালুমূলে উঠাইয়া রাখিবে তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

এই যে যোগিবর বিধানক্রমে প্রকাশ মান তালুমূলস্থ গহ্বরের রসনা দ্বারা নিষ্পীড়িত বায়ু পান ও কুল-কুণ্ডলি-নীকে মূলাধারে চিন্তা করিতে পারেন, তিনি ষণ্মাসের মধ্যে মহাকবি হইতে পারেন। যথা,—

"রাজদন্তবিলং গাঢ়ং সংপীড্য
বিধিনাপিবেৎ। ধ্যাত্বা কুণ্ড-
লিনীং দেবীং ষণ্মাসেন কবি-
র্ভবেৎ॥ কাক-চঞ্চ্বা পিবেৎ
বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি। কুণ্ড-
লিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়-রোগস্য
শান্তয়ে॥"

সায়ং ও প্রাতঃকাল উভয় সন্ধ্যায় ক্ষয় রোগোপসমনের কারণ যে যোগী কাকী-

মুখ নাদ চক্র হইতে অর্থাৎ সহস্রার হইতে অধোগামী বায়ুমূলাধাবস্থা প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী মুখে আগত হইতেছে এই রূপ ধ্যান করতঃ টাক্রার ছিদ্র মধ্যে যে জিহ্বা ঐ বায়ু-সংলগ্ন আছে সেই জিহ্বা দ্বারা পান করেন তাঁহার ক্ষয়াদি শরীরনাশক রোগ থাকে না।

"অহর্নিশং পিবেদ্যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ। দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিস্তথা-স্যাদ্দর্শনং খলু॥"

যে যোগী অনালস্য হইয়া অহর্নিশ —সহস্রার হইতে যে বায়ু নিম্নগামী হইতেছে—সেই বায়ু কুম্ভক করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পান করেন তাঁহার দূর দৃষ্টি ও দূর শ্রবণ শক্তি জন্মে।

"ষণ্মাসমাত্রমভ্যাসং যঃ করোতি দিনে দিনে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রোগান্নাশয়তেহসৌ॥"

নিরালস্য হইয়া যে যোগী প্রতি দিন বায়ু পান করিতে পারেন। তিনি তাবৎ পাপ হইতে পরিমুক্ত হন এবং তাবৎ রোগ হইতেও নিষ্কৃতি পান।

"সম্বৎসরকৃতাভ্যাসাৎ ভৈরবো ভবতি ধ্রুবং। অনিমাদিগুণান্ লব্ধ্বা জিতভূতগণঃ স্বয়ং॥"

ঐরূপ এক বৎসরকাল অভ্যাস ক্রমে বায়ু পান করিতে পারিলে যোগ-সাধক সাক্ষাৎ ভৈরব-তুল্য ক্ষমতাবান্ হন। এবং অনিমাদি-অষ্ট-প্রকার-গুণ-সম্পন্ন হইয়া ভূত সকল জয় করিতে পারেন।

"রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি। ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধি মৃত্যু-জরাদিভিঃ॥"

জিহ্বাকে উর্দ্ধগামী করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে বায়ু পান করত ক্ষণার্দ্ধকাল তিষ্ঠিতে পারিলেও অল্প কালের মধ্যে ব্যাধি মৃত্যু জরাদি হইতে পরিমুক্ত হইবে।

"রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েৎ। ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতং॥"

প্রাণ বায়ুর সহিত জিহ্বাকে পীড্যমান করিয়া কুণ্ডলিনীকে মূলাধারে চিন্তা করিতে পারিলে মৃত্যুভয় থাকে না ইহা আমা কর্ত্তৃক সত্য সত্য উক্ত হইল।

"এবমভ্যাসযোগেন কামদেবো দ্বিতীয়কঃ। ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈব মূর্চ্ছা প্রজায়তে॥"

যে যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ু পান আর কুণ্ডলিনী চিন্তা রূপ যোগ নিয়ত ছয় মাসকাল বিধিপূর্ব্বক করিবেন, তিনি ক্ষুধা নিদ্রা তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা বিবর্জ্জিত হইয়া দ্বিতীয় কন্দর্প তুল্য হইবেন।

"অনেনৈব বিধানেন যোগেন্দ্রো-হবনীমণ্ডলে। ভবেৎ স্বচ্ছন্দচারী চ সর্ব্বাপৎপরিবর্জ্জিতঃ॥"

পূর্ব্বে বায়ু পানের ও কুণ্ডলিনী চিন্তার বিষয়ে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে সেই সেই বিধান মতে যে যোগীন্দ্র বায়ু পান ও কুণ্ডলিনী চিন্তা করিবেন, তিনি এই অবনীমণ্ডলে সকল-আপৎ-বিমুক্ত

হইয়া কামচারী হইতে পারেন। কামচারীর অর্থ—আত্মেচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্র বিনি যাতায়াত করিতে পারেন।

"নতস্য পুনরাবৃত্তি র্মোদতে স সুরৈরপি। পুণ্যপাপৈর্নলিপ্যেত চৈতদাচরণেন সঃ॥"

পূর্ব্বোক্ত যোগ সাধনা প্রভাবে যোগিবরের ইহ সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। তিনি স্বর্গলোকে আজান-সিদ্ধ দেব লোকের সহিত একত্র সহবাস করিতে পারেন। ঐহিক ও জন্মান্তরীণ পুণ্য পাপে আর লিপ্ত হন না।

পূর্ব্বে পদ্মাসনের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে এইক্ষণ প্রসঙ্গ ক্রমে আর তিন প্রকার আসন বলা যাইতেছে।

যোগশাস্ত্রে চতুরশীতি প্রকার আসন বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে অতি প্রশস্ত যে চারিটি আসন আছে এ প্রস্তাবে তাহাই লেখা যাইতেছে। পদ্মাসন ব্যতীত সিদ্ধাসন, উগ্রাসন, স্বস্তিকাসনের বিষয় বলা যাইতেছে।

সিদ্ধাসন।

"যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ। মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা॥ ঊর্দ্ধে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ। এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কং॥"

যোগ-সাধকের সিদ্ধাসন করিতে হইলে যত্নপূর্ব্বক এক পাদ-মূল দ্বারা গুহ্য দেশকে পীড়ন করতঃ অপর পাদ-মূলকে শিশ্নোপরি সংস্থাপন করিয়া অচল-চিত্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয় যোগবিৎ যোগী—ঊর্দ্ধ দৃষ্টি দ্বারা ভ্রূমধ্য দেশকে অবলোকন করিবে। আর যোগী এই আসনে সরল ভাবে উপবেশন করিবেন। শরীরের বক্রতা হইলে যোগ-সাধনার বিশেষ বিঘ্ন জন্মিবে। এতদ্ভিন্ন নির্জ্জন স্থানে এই আসনে উপবেশন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ইহাকে সিদ্ধদিগের সিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধাসন কহে।

ইহার ফল।

"যেনাভ্যাসবশাৎ শীঘ্রং যোগনিষ্পত্তিমাপ্নু যাৎ। সিদ্ধাসনং সদা সেব্যং পবনাভ্যাসিভিঃ পরং॥"

এই আসনে উপবেশন করিতে অভ্যাস করিলে—অভ্যাস বশতঃ অবিলম্বে যোগ নিষ্পত্তি হয়। পবনাভ্যাসী যোগীর পক্ষে এই আসন সকল আসন হইতে শ্রেষ্ঠ। এজন্য সর্ব্বদা সেবনীয়।

"যেন সংসারমুৎসৃজ্য লভ্যতে পরমাগতিঃ। নাতঃ পরতরং গুহ্যমাসনে বিদ্যতে ভুবি। যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদ্বিমুচ্যতে॥"

যে আসন-প্রভাবে যোগিগণ সংসারীয় পাপ পুণ্যজ সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পরমাগতি লাভ করেন, আর যে আসনের

অনুধ্যান মাত্রেই তাবৎ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, সেই আসনের তুল্য গোপনীয় আসন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

ইতি সিদ্ধাসনং।

"প্রসার্য্য চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতং। স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানূপরি শিরোন্যসেৎ॥ আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপকং। দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞকং॥ য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ। বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবং॥"

যে যোগী উগ্রাসন করিয়া যোগ সাধনা করিবেন তিনি দুই পাদকে লম্বা করতঃ পরস্পর অসংযুক্ত ভাবে রাখিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা দৃঢ়রূপে পদদ্বয় ধরিবে, পরে উভয় জানুর উপরে নিজ মস্তক রাখিবে। ইহাতে বায়ু উদ্দীপন হওয়ায় ইহাকে উগ্রাসন কহে। এই আসন দ্বারা দেহের সর্ব্ব প্রকার অবসাদ দূর হয়। পশ্চিমোত্তান সংজ্ঞার অর্থ উপুড় হওয়া। এখানে উপুড় হইয়া সাধনা করিতে বলা হইয়াছে। এই আসন দ্বারা যিনি যোগাভ্যাস করিবেন তাঁহার শরীরে পশ্চিম পথ দ্বারা বায়ু সঞ্চারিত হইতে থাকে।

ইতি উগ্রাসনং।

অথ স্বস্তিকাসনং।

"জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে। সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥"

যোগীর উভয় পাদদ্বয় জানুর ও উরুর মধ্যে সংস্থাপন করতঃ সমকায় হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইবে। ইহাকে তন্ত্রোক্ত যোগ শাস্ত্রে স্বস্তিকাসন বলে।

"অনেন বিধিনা যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ। দেহে নাক্রমতে ব্যাধি স্তস্য বায়ুশ্চ সিধ্যতি॥"

এইরূপ নিয়ম দ্বারা সুবোধ যোগী বায়ু সাধনা করিলে তাঁহার দেহে ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না; অথচ বায়ুসিদ্ধ হইতে পারেন; বায়ু-সিদ্ধ হইলে যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ কুম্ভক করিয়া কুণ্ডলিনী চিন্তা করিতে পারেন। এবং যথেচ্ছা গমনাগমনও করিতে ক্ষমবান্ হন।

"সুখাসনমিদং প্রোক্তং সর্ব্ব দুঃখপ্রণাশনং। স্বস্তিকং যোগিভির্গোপ্যং সুস্থীকরণমুত্তমং॥"

এই আসনকে যোগশাস্ত্রে সুখাসন বলে। ইহারি নাম স্বস্তিকাসন। ইহার প্রভাবে তাবৎ দুঃখ বিনষ্ট হয়। স্বস্তিকাসন করিতে পারিলে দেহ সুস্থীকৃত হয়। ইহা অতি গোপনীয়।

আর্য্যদর্শনে এ পর্য্যন্ত যোগ-সম্বন্ধে যাহা যাহা লেখা গেল অধিকাংশ শিবসংহিতা হইতে গৃহীত হইল। ইহার তাবৎ প্রকরণগুলি প্রত্যক্ষ ফলদায়ক।

উত্তর-সাধক সকল কর্ম্মের হেতু। বিশেষ তন্ত্রোক্ত ব্যাপার করিতে হইলে উত্তর-সাধক না হইলে কোন ফলদায়ক

হয় না, এ জন্য—তন্ত্রকর্ত্তা গুরূপদেশ লইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। বিজ্ঞানপ্রদাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গুরুর বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই –

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপ-হারকাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্য-সন্তাপ হারকঃ॥"

এ কালে পৃথিবীতে গুরু যত পাওয়া যায় তাহার মধ্যে অধিকাংশই শিষ্য-বিত্তাপ-হারক, সন্তাপ হারক গুরু প্রায় মেলে না।

যোগ সাধনা পক্ষে সন্তাপ হারক গুরু অপেক্ষা করে। যাহার ভাগ্যে প্রকৃত গুরু মেলে তাহার যোগ সাধনা বিফল হয় না।

যোনিমুদ্রাদি যোগ।

জীবগণের জীবন না থাকিলে দেহ যেমন অকর্ম্মণ্য ও নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ যোগীদিগের যোগ সাধনা পক্ষে মুদ্রা বন্ধন না হইলে যোগাভ্যাস কোন ফল দায়ক হয় না, এজন্য মুদ্রা বন্ধনের বিষয় বলা যাইতেছে। এই মুদ্রা বন্ধন করিবার অগ্রে যোনিমুদ্রার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করা অতীব কর্ত্তব্য। এই যোনিমুদ্রার অর্থ অনেকে জানেন না। কেহ কেহ পঞ্চ মকারকে অর্থাৎ মদ্য, মাংসাদিকে যোনিমুদ্রা বলিয়া জানেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। যোনিমুদ্রার ফল অতি মহৎ। যে সাধক যোনিমুদ্রা না জানিয়া এবং তাহার মত আচরণ না করিয়া জপ তপঃ কি যোগ সাধনা করেন তাঁহার কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। যথা তন্ত্রোক্ত শিব-বাক্য।

"মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ। শত-কোটি-জপেনৈব তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥"

এইক্ষণ গুহ্যাতি গুহ্যতম যোনিমুদ্রার বিষয় শিব সংহিতানুসারে বলা যাইতেছে। যোনিমুদ্রার ক্রিয়া শরীরের মধ্যে বায়ু-পূরণ ও আত্ম-চিন্তন। প্রথমতঃ পূরক দ্বারা বাহ্য বায়ুকে নাসারন্ধ্র দ্বারা পূরণ করিয়া সেই পূরিত বায়ুর সহিত মনকে মূলাধার পদ্মে সংস্থাপিত করিবে। গুহ্যদেশ আর লিঙ্গ স্থান অবধি স্থানকে যোনি মণ্ডল বলে। এই সময় ঐ যোনি মণ্ডলকে যোগিগণ আকুঞ্চিত করিবে। এরূপ না করিলে বায়ুর সহিত মনকে অবরুদ্ধ করিতে পারা যায় না। বায়ুর সহিত মনকে মূলাধারে আবদ্ধ করিলে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হয়। তৎপর এই সচৈতন্যা কুণ্ডলিনীকে ঐ মূলাধার হইতে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে কুণ্ডলিনীর যাতায়াতের যে পথ আছে তদ্দ্বারা অন্যান্য পদ্ম ভেদ করিয়া সাধক সহস্রারে লইয়া যাইবে; এবং তথা হইতে কুণ্ডলিনীকে পুনরায়

মূলাধারে আনয়ন করিবে। এইরূপ তিনবার কুণ্ডলিনীকে যাতায়াত করানর নাম যোনমুদ্রা। মূলাধার হইতে আ-জ্ঞাখ্য চক্র পর্য্যন্ত যে ছয়টি পদ্ম আছে সেই সকল পদ্ম গ্রন্থিযুক্ত। যোনিমুদ্রা প্রভাবে সেই সকল গ্রন্থি ভেদ ও কুল কুণ্ডলিনীর চৈতন্যোদয় হয়। কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা থাকিলে আর ঐ সকল গ্রন্থি ভেদ না হইলে যোগ যাগ ও পূজা আচ্ছা কিছুই হয় না। কেবল অর্থব্যয় ও পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে লইয়া গেলে পর যোগী কি সাধক ইহারা আর কুণ্ডলিনী সকলেই সহস্রারস্থ পরমাত্মার ভাব অবলম্বন করিবে। পরে ঐ ভাবাবলম্বী সাধক ও কুণ্ডলিনী সমাধির অপরিপক্ক হেতু পুনর্ব্বার মূলাধারে আসিবে। এই-রূপ আর সহস্রারস্থ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া তত্তৎ স্থানীয় ক্ষরিত সুধা-পান করিয়া মূলাধারে আগমন করাকেই যোনিমুদ্রা-বন্ধন বলা যায়। এতৎ প্রমাণ "আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ। গুদমেঢ্রান্তরে যোনি-স্তমাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে। ১।"

যে সময় যোনি-মণ্ডলের অধোভাগে মূলাধারে বায়ু ও মন ও জীবাত্মাকে পূরক দ্বারা আবদ্ধ করিবে সেই সময় বন্ধুক-পুষ্প সন্নিভ ও কোটী সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ ও কোটী চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে চিন্তা করিবে এবং উহার ঊর্দ্ধদেশে প্রজ্জ্বলিত পাবক-শিখার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম চৈতন্য-স্বরূপ শিব-শক্তি-সমন্বিত পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে। প্রমাণ "ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধুক সন্নিভং। সূর্য্য-কোটী-প্রতী কাশং চন্দ্র-কোটী-সুশীতলং। তস্যোর্দ্ধেতু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা। তথাপি হিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ। ২॥"

অপিচ

"গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয় ক্রমে-ণবৈ। অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দ-লক্ষণং॥ শ্বেত-রক্তং তেজসাঢ্যং সুধা-ধারাপ্রবর্ষিণং। পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলং॥ ৩॥"

পূরক দ্বারা বায়ু আর মন ও লিঙ্গত্রয় সমন্বিত জীবাত্মাকে ও কুণ্ডলিনীকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মমার্গ দিয়া—অর্থাৎ সুষুম্নান্ত র্গত যে সূক্ষ্ম পথ আছে সেই পথ দিয়া—যখন ষট্চক্র ভেদ করাইয়া সহস্রারে লইয়া যাওয়া হইবে তখন প্রত্যেক চক্রে ঐ পরমাশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে পরমা-ত্মার সহিত মিলিতা করাইয়াও ঐসকল চক্রস্থ গলিত পাটল-বর্ণ অমৃত-ধারাস্বরূপ কুলামৃত পান করাইয়া ঐ কুলকুণ্ডলিনী-কে পুনর্ব্বার মূলাধারে সংস্থাপিত করা-ইবে। এই প্রকার ক্রমান্বয়ে বারত্রয় করাইলে যোগীর পুনর্জন্ম রহিত হইয়া যায়। ইহারি নাম যোনিমুদ্রা বন্ধন।

প্রাণায়াম।

অতঃপর প্রাণায়াম দ্বারা যোগীদিগের যাহা করিতে হইবে তাহা বলা যাই-তেছে।

"পুনরেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রা যোগেন নান্যথা। সাচ প্রাণসমা খ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতং ॥ ৪ ॥"

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতং ধরণীতলে। উত্থায়চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ॥ ৫ ॥"

মাত্রা যোগক্রমে অর্থাৎ প্রাণায়াম যোগানুসারে কুণ্ডলিনীকে কুলে অর্থাৎ সহস্রার রূপ ব্রহ্মযোনিতে লইয়া গিয়া তত্রস্থ ক্ষরিত সুধাপান ও পরমাত্মার সহিত বিহার করাইয়া ধরণীতলে অর্থাৎ মূলাধারে পাতিত করাইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ক্রমে ব্রহ্মযোনিতে লইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে পান বিহার করাইয়া কুণ্ডলিনীকে তাঁহার শয়ন স্থানে আনিয়া শয়ন করাইবে। যে যোগী এই রূপে কুলকুণ্ডলিনীকে ষটচক্র ভেদ করত সহস্রারে পরমাত্মার সহিত আমোদ প্রমোদ করাইয়া পুনর্ব্বার মূলাধারে আনিতে পারেন তিনিই কৌলিক মহাসিদ্ধ পুরুষ, নতুবা চক্র করিয়া সাধারণ সুরা পান ও ভৈরবী কি অন্য কোন স্ত্রী সম্ভোগ করাকে কৌলিক বলা যায় না। তন্ত্র শাস্ত্রের যে যে স্থানে সুরা পানের বিধি আছে সে সে স্থানে উপর্য্যুক্ত সহস্রারস্থ ক্ষরিত সুধা ভিন্ন অন্যান্যসুরা পান অভিপ্রেত নহে। ইহাকেই যোনিমুদ্রা বন্ধন বলে। ইহার ফল এই "ছিন্নরূপাস্তু যে মন্ত্রাঃ কীলিতাস্তম্ভিতাশ্চ যে। দগ্ধামন্ত্রাঃ শিখাহীনামলিনাস্তু তিরস্কৃতাঃ। মন্ত্রা বালাস্তথা বৃদ্ধাঃ প্রৌঢ়া যৌবন-গর্ব্বিতাঃ। অরি-পক্ষে স্থিতা যে চ নির্ব্বীর্য্যাঃ সত্ত্ব-বর্জ্জিতাঃ। স্বরা সত্ত্বেন হীনা যে খণ্ডিতাঃশতধাঃকৃতাঃ বিধানেনতু সংযুক্তাঃ প্রভবন্তি চিরেণতু। সিদ্ধিমোক্ষপ্রদাঃ সর্ব্বে গুরুণা বিনিযোজিতাঃ। দীক্ষয়িত্বা বিধানেন অভিষিক্তা সহস্রধা। ততো মন্ত্রাধিকারার্থমেষা মুদ্রা প্রকীর্তিতা ॥ ৬ ॥"

যে সকল মন্ত্র ছিন্নরূপ অথবা কীলিত কিম্বা স্তম্ভিত অথবা দগ্ধ ও দীপ্তি-রহিত মলিন অথবা নিন্দনীয় কি কদর্য্য মন্ত্র; কি বাল্য, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, কিম্বা যৌবন গর্ব্বিত ও অরি-পক্ষ, ও নির্ব্বীর্য্য, প্রাণ-রহিত, সত্ত্বাদিগুণহীন, খণ্ডিত, চ্যুতাক্ষর, শতধা খণ্ডিত, অবিহিত-দীক্ষিত, এ প্রকার মন্ত্র বহু কালেও প্রভা-বিশিষ্ট হয় না। যোনিমুদ্রা-বন্ধন করিয়া বিধি পূর্ব্বক উপদিষ্ট হইয়া সেই মন্ত্রকে সহস্র-সংখ্যক অভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিলে ঐ রূপ দূষিত মন্ত্র দোষ পরিহার পূর্ব্বক আশু ফল-প্রদ হয়। যোনিমুদ্রা বন্ধন না করিয়া অভিষেকাদি দ্বারা কোন ফল লাভ হয় না। আর্য্য মনুষ্য মাত্রেরি যোগাদি সাধন কালে যোনিমুদ্রা বন্ধন করা অতীব কর্ত্তব্য।

অপরঞ্চ।

"গুরুহাচ সুরাপায়ী স্তেয়ীচ গুরুতল্পগঃ। এতৈঃ পাপৈর্নলিপ্যেত যোনিমুদ্রা-নিবন্ধনাৎ" ॥ ৭ ॥"

গুরু হত্যাকারী মদ্যপায়ী স্বর্ণাদি-অপহারী গুর্ব্বঙ্গনাগমনশীল ব্যক্তিও যদি

জন্মান্তরীণ শুভাদৃষ্ট প্রভাবে যোনি-মুদ্রা-বন্ধন করিতে পারেন তাহা হইলে ঐ সকল পাপ হইতে অবলীলাক্রমে মুক্ত হইতে পাবেন।

"তস্মাদভ্যাসনং নিত্যং কর্ত্তব্যং মোক্ষ কাঙ্ক্ষিভিঃ। অভ্যাসাজ্জায়তে সিদ্ধিরভ্যাসান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ৮॥"

যাঁহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদিগের পক্ষে প্রত্যহ এই মুদ্রা বন্ধনের অভ্যাস করা অতীব হিতকর। যেহেতু অভ্যাসেই সিদ্ধি ও অভ্যাসেই মুক্তি।

অন্যাচ্চ।

"বাক্-সিদ্ধিঃ কামচারিত্বং ভবেদভ্যাসযোগতঃ। যোনিমুদ্রা পরং গোপ্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ॥ ৯॥"

যোনিমুদ্রা বন্ধন প্রভাবে বাক্-সিদ্ধি ও কামচারিত্ব হয়। এ মুদ্রা অতিশয় গোপনীয়া যারে তারে এমুদ্রা দিবে না। যোনিমুদ্রা বন্ধন ফল কথন সমাপ্ত হইল। অতঃপর অন্যান্য মুদ্রা-দশকের বৃত্তান্ত সপ্রমাণ বলা যাইতেছে।

"মহামুদ্রা, মহাবন্ধো, মহাবেধশ্চ খেচরী। জালন্ধরো, মূলবন্ধো, বিপরীতকৃতিস্তথা। উড্ডানঞ্চৈব বজ্রোণি দশমং শক্তিচালনং। ইদং হি মুদ্রাদশকং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমং॥"

যোনি-মুদ্রা ব্যতীত মুদ্রা দশ প্রকার। তন্মধ্যে প্রথম মহা-মুদ্রা, দ্বিতীয় মহা-বন্ধ, তৃতীয় মহা-বেধ, চতুর্থ খেচরী, পঞ্চম জালন্ধর, ষষ্ঠ মূল বন্ধ, সপ্তম বিপরীত কৃতি, অষ্টম উড্ডান, নবম বজ্রোণি, দশম শক্তি চালন। যাবতীয় মুদ্রার মধ্যে এই দশ প্রকার মুদ্রা উত্তম হইতেও উত্তম।

যিনি যোগ সাধনা করিবেন তিনি যেন এই মুদ্রা-দশক সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া বন্ধন করিবেন। মুদ্রা-বন্ধনের দ্বারা সুপ্তা কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও ষট্-চক্রের গ্রন্থি মোচন হয়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য যে সকল ফল জন্মে তাহা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

কাষ্ঠের মধ্যে যে অগ্নি আছে তাহা কেহই দেখিতে পাননা। তবে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা অর্থাৎ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে অগ্নি নির্গত হইলে সেই অগ্নি দেখা যায়। যোগীর হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে কিম্বা মূলাধারস্থিত জীবাত্মারূপ কুণ্ডলিনীকে মুদ্রা-বন্ধনাদি না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না। পরমাত্মা কে ও কুণ্ডলিনী কে কেহই ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই ও পারিবেন না। তবে পালিত হস্তি দ্বারা যেমন আরণ্য হস্তী ধরা যায়, তদ্রূপ নিজ নিজ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানময় পরমাত্মা ও কুণ্ডলিনীকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল মুদ্রা-বন্ধন ব্যতীত উহাদিগকে দর্শন অসম্ভব।

মহা-মুদ্রা।

"মহা-মুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রেঽস্মিন্ মম বল্লভে। যাং প্রাপ্য

সিদ্ধাঃ সংসিদ্ধিং কপিলাদ্যাঃ পুরাগতাঃ ॥"

হে মদীয় প্রাণবল্লভে, এই তন্ত্রোক্ত মহা-মুদ্রা তোমার নিকটে প্রকাশ করিতেছি। যে মুদ্রার গুণে পুরাকালে কপিলাদি সিদ্ধগণেরা যোগ-সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

"অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরং। গুরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাং। সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেনবৈ। নবদ্বারাণি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি। চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রভবেদ্বায়ুসাধনং। মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গেনাভ্যসেৎ পুনঃ। প্রাণায়ামং সমংকৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ॥"

গুহ্যদেশ ও শিশ্ন এই দুয়ের মধ্যভাগকে যোনিমণ্ডল বলে, সেই যোনিমণ্ডলকে বাম পাদমূল দ্বারা সংপীড়ন করত দক্ষিণপাদ প্রসারণ করতঃ দুই হাত দিয়া ঐ পাকে ধরিবে, পরে শরীরস্থ নবদ্বারকে বশীভূত করিয়া বক্ষঃস্থলে চিবুক সংস্থাপন করিবে। পরে চৈতন্য-মার্গে অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে মনকে আবদ্ধ করিয়া কুম্ভক করিলে বায়ু ধারণার অভ্যাস জন্মিবে। এতদ্ব্যতীত বায়ু-ধারণার উপায় নাই। বায়ু ধারণ না করিতে পারিলে যোগ-সাধনা বৃথা হইয়া পড়ে। এই মুদ্রা অগ্রে বামাঙ্গে তৎপর দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিবে। ঐ উভয়াঙ্গে বায়ু সাধন কালে শক্ত্যনুসারে সমান নিয়মে প্রাণায়াম করিবে। ইহার নাম মহা মুদ্রাবন্ধন॥

মহা মুদ্রার ফল কথন।

"অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোঽপিসিধ্যতি। সর্ব্বাসামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দু-মারণং। জীবনন্তু কষায়স্য পাতকানাং বিনাশনং। সর্ব্বরোগোপশমনং জঠরাগ্নি-বিবর্দ্ধনং। বপুষঃ কান্তিমমলাং জরা-মৃত্যু-বিনাশনং। বাঞ্ছিতার্থ ফলং সৌখ্যং ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণং এতদুক্তানি সর্ব্বাণি যোগারূঢস্য যোগিনঃ। ভবেদভ্যাসতোঽবশ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"

এই মহামুদ্রা যে ব্যক্তি বিধিমত গুরুর নিকট প্রাপ্ত হন তিনি যদি মন্দ ভাগ্যও হন তথাপি তিনি নিম্নোক্ত ফল সমুদায় প্রাপ্ত হন এই মুদ্রার প্রভাবে দেহস্থ সকল নাড়ী চালিত হয়, তদ্দ্বারা আয়ুঃ স্বরূপ শুক্র স্তম্ভিত হয়। ঐ শুক্র জীবনকে আকর্ষিত করিয়া রাখে। আর, ঐ মুদ্রা প্রভাবে সকল পাপ নষ্ট হয় এবং সর্ব্ব রোগের উপশম হয়, কিম্বা কোন রোগ দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়। শরীর নির্ম্মল ও ইন্দ্রিয় সকল পরাজিত হয়। ইতি—

অপরঞ্চ।

"মুদ্রা কাম-দুঘা হ্যেষা সাধকানাং ময়োদিতা। গুপ্তাচারেণ কর্ত্তব্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ॥"

এই মহামুদ্রা কামধেনু স্বরূপ। সাধক-

গণ যাহা অভিলাষ করেন, এই মুদ্রা প্রভাবে তাহাই পাইতে পারেন। এ মুদ্রা অতি গোপনে সাধনা করিবে কিন্তু যে সে ইহার অধিকারী নহে।

এই মহামুদ্রার ফল।

ইহার পর মহাবন্ধ মুদ্রা বিষয় লেখা যাইতেছে। যথা—

"ততঃ প্রসারিতৌ পাদৌ বিন্যস্য তদুরুপরি। গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বাচাপানমূর্দ্ধগং। যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখং। বন্ধয়েদূদরেহত্যর্থং প্রাণাপানাভ্যাং যঃ সুধীঃ॥ কথিতো হয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ। নাড়ীজালরসব্যুহমূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ। উভাভ্যাং সাধয়েৎ পদভ্যাং একৈকং সুপ্রযত্নতঃ॥ ২॥"

অতঃপর যাহা করিতে হইবে তাহা বলা যাইতেছে। যোগী দক্ষিণপাদকে প্রসারিত করিয়া বাম উরুর উপর দক্ষিণ পাদ সংস্থাপিত করিবে, পরে গুহ্যদেশ ও যোনিমণ্ডলকে আকুঞ্চিত করণানন্তর উর্দ্ধগত অপান বায়ুকে নাভিস্থিত সমান বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিয়া হৃদিস্থিত প্রাণবায়ুকে ঐ বায়ুদ্বয়ের সহিত কুম্ভক দ্বারা নিতান্ত বদ্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাতে যোগীর শরীরস্থ নাড়ী সকলের রস সমূহ মস্তকোপরি উত্থিত হয়। পূর্ব্ববৎ উভয় পাদ দ্বারা অভ্যাস করিবে।

"ভবেদভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্নামধ্যসঙ্গতঃ। অনেন বপুষঃ পুষ্টিদৃঢবন্ধোঽস্থিপিঞ্জরে। সম্পূর্ণহৃদয়ো যোগী ভবত্যেতৈন যোগতঃ। বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্ব্বমীপ্সিতং।৩।"

এই মহাবেধমুদ্রা বন্ধন প্রভাবে যোগীর সুষুম্নানাড়ীছিদ্রমধ্যে কুম্ভকস্থ বায়ু উত্তমরূপে প্রবেশ হইতে পারে। তাহাতে যোগীর শরীর পুষ্টি ও অস্থি পিঞ্জরে দৃঢ় বন্ধন হয় এবং মনঃ সম্পূর্ণরূপে সন্তোষের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন যোগীর অন্যান্য অভীষ্ট ফল সমুদায় ও লাভ হয়।

ইতি মহাবন্ধমুদ্রা।

ফল-কথন।

"অপান প্রাণয়োরৈক্যং কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি। মহাবেধস্থিতো যোগী কুক্ষিমাপূর্য্য বায়ুনা॥ স্ফিচৌ সন্তাড়য়েৎ ধীমান্ বেধোঽয়ং কীর্ত্তিতোময়া॥ ৩॥

হে ত্রিভুবনকর্ত্রি যেরূপে মহাবেধমুদ্রা বন্ধন করিতে হয় তাহা বলিতেছি। যোগী সকল জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাবস্থাতে ও বাহ্য বায়ু দ্বারা উদর পরিপূর্ণ করত শরীরস্থ প্রাণ ও অপান বায়ুকে ঐক্য অর্থাৎ মিলিত করিয়া উভয় কুক্ষিকে তাড়ন করিলে মহাবেধ মুদ্রা বন্ধন করা হয়। প্রাণ ও অপান বায়ুর ঐক্য করণ গুরূপদেশসাপেক্ষ।

মহাবেধমুদ্রার

ফল কথন।

"বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা

যোগি-পুঙ্গবঃ। গ্রন্থিং সুষুম্নামার্গে ব্রহ্মগ্রন্থিং ভিনত্ত্যসৌ।”

এই মহাবেধ মুদ্রা বন্ধন দ্বারা যোগিবর সম্যক্ বেধ করিয়া শরীরস্থ বায়ু বদ্ধ করিয়া সুষুম্নামার্গস্থ যে সকল ব্রহ্মগ্রন্থি আছে অর্থাৎ অতি অভেদ্য গাঁট আছে তাহা ভেদ করিতে পারে, এতদুপায় ভিন্ন ঐ সকল গ্রন্থি ভেদ করার পথ নাই॥

“যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং সুগোপীতং। বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী॥ চক্রমধ্যস্থিতা দেবাঃ কম্পন্তি বায়ুতাড়নাৎ। কুণ্ডল্যপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে॥ মহামুদ্রা-মহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধবর্জিতৌ। তস্মাদ্যোগী প্রযত্নেন করোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ॥ এতৎত্রয়ং প্রযত্নেন চতুর্ব্বারং করোতি যঃ। ষণ্মাসাভ্যন্তরং মৃত্যুং জয়তেহত্র ন সংশয়ঃ॥”

যে যোগী সদাসর্ব্বদা এই মহাবেধমুদ্রা অতি গোপনে অভ্যাস করিবে তাঁহার জরা-মরণ-নাশিনী বায়ুসিদ্ধি লাভ হইবে। এই যোগ-প্রভাবে শরীরস্থ-বায়ু তাড়নায় ষট্‌চক্রস্থিত যাবতীয় দেবতা প্রকম্পিতা হন। এবং ইহাতে কুলকুণ্ডলিনীও সহস্রারে বিলীনা হইয়া থাকেন। উক্ত মুদ্রাদ্বয় যদি বেধ-বর্জিত হয় তাহা হইলে যোগ বিফল হইয়া যায়। এজন্য যত্ন ক্রমে মহামুদ্রা মহাবন্ধ ও মহাবেধ এই মুদ্রাত্রয় ক্রমে অভ্যাস করিবে॥

এতৎত্রয়স্য মাহাত্ম্যং সিদ্ধো জানাতি নেতরঃ। যজ্জ্ঞাত্বা সাধকাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং সম্যক্ লভন্তি চ॥

এই মুদ্রাত্রয়ের মাহাত্ম্য সিদ্ধগণই জানেন অন্যে যোগাসিদ্ধ ব্যক্তিরা জানিতে ক্ষমবান্ নহে। এই সকল মুদ্রা জানিতে পারিলে সাধকেরা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। এই মহাবেধ মুদ্রার ফল।

খেচরীমুদ্রা বন্ধন যে রূপে করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এইক্ষণ ইহার কথঞ্চিৎ ফল বলা যাইতেছে—

“সিদ্ধীনাং জননী হ্যেষা মম প্রাণাধিকাধিকে নিরন্তর-কৃতাভ্যাসাৎ পীযূষং প্রত্যহং পিবেৎ। তেন বিগ্রহ-সিদ্ধিঃ স্যাৎ মৃত্যু-মাতঙ্গ-কেশরী॥”

খেচরী মুদ্রাকে যাবতীয় যোগসিদ্ধির জননী বলা হইযাছে। হে মৎপ্রাণাধিকে যে ব্যক্তি নিরন্তর ইহার অভ্যাস বশতঃ সহস্রারস্থ কমল বিনিঃসৃত অমৃতধারা রসনা দ্বারা পান করে তাহার সমস্ত শরীর অমৃতরসে আপ্যায়িত হয়। এই খেচরী মুদ্রাবন্ধ মৃত্যুরূপ মাতঙ্গের কেশরী স্বরূপ।

অতঃপর জালন্ধর মুদ্রা—

“বধ্বা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ। বন্ধো জালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ॥ নাভিস্থো বহ্নির্জন্তুনাং সহস্র-

কমলচ্যুতং। পিবেৎ পীযূষং বিবসং তদর্থং বন্ধয়েদিমাং।”

এই জালন্ধর মুদ্রা। ইহা দেবতাদিগেরও অতি দুর্লভ। যোগীসকল যখন জালন্ধর মুদ্রাবন্ধন করিবেন তখন নিজ গলদেশের শিরা সকল গুরূপদেশ ক্রমে বন্ধন করত হৃদয়োপরি চিবুক রাখিবে। পরে নাভি-স্থিত জঠরানলে সহস্রারস্থ অমৃত-ধারা পতিত হইলে ঐ অনল তাহা পান করিয়া থাকে, এজন্য সেই সুধা অধঃপতিত না হইবার জন্য এই মুদ্রা বন্ধন করিবে। ইহাতে—অর্থাৎ কুম্ভক পূর্ব্বক জালন্ধর মুদ্রা বন্ধনে—উর্দ্ধে উল্টান জিহ্বাগ্রভাগ দ্বারা ঐ সুধা পান করিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে ঐ সুধা পান করিতে পারা যায় না। যোনিমুদ্রা স্থলে ও খেচরী মুদ্রাতে যে সুধা-পানের বিষয় বলা হইয়াছে তাহা জালন্ধর-সাপেক্ষ নহে। সেই সেই মুদ্রার গুণে সহস্রারস্থ ক্ষরিত সুধা পান করিতে পারা যায়। যিনি জালন্ধর মুদ্রাবন্ধন করিতে পারেন তিনিই সিদ্ধ যোগী।

ফল শ্রুতি।

“বন্ধেনানেন পীযূষং স্বয়ং পিবতি বুদ্ধিমান্। অমরত্বঞ্চ লভতে মোদতে নাত্র সংশয়ঃ॥”

এই মুদ্রাবন্ধন প্রভাবে বুদ্ধিমান যোগী সহস্রারস্থ ক্ষরিত অমৃত-ধারা নিজেই পান করিতে থাকেন। তাহাতে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বশরীরে ত্রিভুবনে মহানন্দে ভ্রমণ করিতে পারেন।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

বেদ-বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত।

বৈশেষিক দর্শন।

এই দর্শন প্রণেতার নাম কণাদ ও উলুক, এজন্য এই দর্শনকে কাণাদ দর্শন অথবা ঔলুক্য দর্শন কহে। ইহাতে অন্যান্য দর্শনের অনভিমত বিশেষ নামক একটী পদার্থ স্বতন্ত্র রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, এ নিমিত্ত ইহার নাম বৈশেষিক দর্শন। কাণাদ দর্শন ন্যায় দর্শনের শাখান্তর বলা যাইতে পারে। উহাতে পরমাণুবাদ স্পষ্ট উপদিষ্ট। গোতম ঐ পরমাণুবাদ সঙ্কেতে মাত্র শিখাইয়াছিলেন। বৈশেষিক সূত্রকার তাহার বাহুল্য বিস্তার করাতে “কণ-ভুক্” উপাধী প্রাপ্ত হয়েন, বাস্তব কণাদ তাঁহার নাম নহে। আকাশ পরমাণু প্রভৃতি এক একটী নিত্য দ্রব্যে এক একটী বিশেষ পদার্থ আছে। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত তাহা হইলে কখনই পরমাণু সমূহের পরস্পর বিভিন্ন-রূপতার নিশ্চয় করা যাইত না। পরমাণুর অবয়ব

নাই, সুতরাং এক পরমাণু অন্য পরমাণু হইতে বিভিন্ন তাহা নিশ্চয় করিবার উপায় নাই, এই বিশেষ পদার্থ নিত্য।

বৈশেষিক দর্শনের মতে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির নাম মুক্তি।

বৈশেষিক দর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায় আবার দুই আহ্নিকে বিভক্ত। প্রথম তিন সূত্রকে অদ্ভুত উপক্রমণিকা কহিতে হইবে। তাহাতে ধর্ম্মের লক্ষণ ও বেদের মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে। যথা—

"অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ১।
যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।২
তদ্বচনাদাম্নায়-প্রামাণ্যং॥ ৩॥'

বৈশেষিক সূত্র—

এই দর্শনের মতে ১ম সূত্রে এই— যাহা হইতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ। এক্ষণে আপত্তি এই যে বেদের প্রামাণ্য কোথায় যে, তদ্দ্বারা ধর্ম্ম সপ্রমাণ হইল। বেদ যে নির্দ্দোষ এবং নিত্য তাহা কে বলিতে পারে, বেদ যদি পুরুষ প্রণীত হয় তাহা হইলে ভ্রম প্রমাদ বিরোধ এবং অপটুত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। যেহেতু উক্ত দোষ চতুষ্টয়-রহিত পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং বেদ অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। বৈশেষিক দর্শনকার উত্তর দিতেছেন—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদ প্রমাণ। তৎপরে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত আর একটী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদে" ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বাক্য-কৃতিঃ বাক্য রচনা সা বুদ্ধি-পূর্ব্বা বক্তৃ-যথার্থ-জ্ঞান পূর্ব্বা। নদী তীরে পঞ্চ ফলানি সন্তীত্যস্মদাদিবাক্যরচনাবৎ। স্বর্গ কামো যজেত ইত্যাদৌ ইষ্টসাধনতায়াং কার্য্যতায়া বা অস্মদাদিবুদ্ধ্যগোচরত্বাৎ তেন স্বতন্ত্র-পুরুষ পূর্ব্বকত্বং বেদে সিধ্যতি।"

অর্থাৎ বেদবক্তার যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক-বাক্য রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গ কামনা করিয়া যাগ করিবে ইত্যাদি ইষ্ট উপদেশ আমার মত ব্যক্তির বুদ্ধির অগোচর, সুতরাং স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বেদ রচনা করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞানাদি দোষ বিশিষ্ট মনুষ্যেরা বেদ রচনা করিতে অসমর্থ, যেহেতু বেদের বহু সংখ্যক শাখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। অতএব এত শাখা বিশিষ্ট বেদ ভ্রান্ত দুর্ব্বল মানব কর্ত্তৃক প্রণীত হইতে পারে না। অতএব বৈশেষিক দর্শনের মতে বেদ ঈশ্বর প্রণীত এবং প্রমাণ।

তর্ক-সংগ্রহ নামে আর একখানি বৈশেষিক গ্রন্থ আছে, ইহার মতে বাক্য দুই প্রকার, লৌকিক ও বৈদিক। যাহা লোক-সাধারণে ব্যবহৃত হয় তাহাকে লৌকিক এবং যাহা কেবল বেদে ব্যবহৃত হয় তাহাকে বৈদিক বাক্য কহে। বৈদিক

বাক্য ঈশ্বরের উক্ত সুতরাং যথার্থ ও প্রমাণ।

কুসুমাঞ্জলি নামে উদয়নাচার্য্যের আর একখানি গ্রন্থ আছে। ইহার দ্বিতীয় স্তবকে লিখিত আছে যে, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেই স্বর্গে গমন করা যায়। তদ্বিষয়ের উপদেশ বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ নিত্য ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ, বেদ মহাজন-গৃহীত বলিয়া প্রমাণ। এবং বিধায় "ঈশ্বর আছেন, মানিবার প্রয়োজন নাই" এরূপ আপত্তি করিলে, তাহার উত্তর এই যে, যখন যথার্থ জ্ঞান বাহ্য করণের পরতন্ত্র, যখন সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটিতেছে এবং যখন ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য পুরুষে বিশ্বাস হইতে পারে না, তখন ঈশ্বর-প্রণীত ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে বেদের উৎপত্তি গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, সুতরাং বৈশেষিক মতে বেদ ঈশ্বর-প্রণীত ও মহাজন-গৃহীত বলিয়া প্রমাণ ও অবলম্বনীয়।

মহর্ষি কণাদ ঐ সূত্রত্রয় ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে আর কোথাই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা অথবা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন তর্ক উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টবাদ পাঠ করিলে একেবারে হৃত-বুদ্ধি হইতে হয়, তিনি ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিয়াও সৃষ্টি-কল্পে স্বয়ম্ভু পরমাত্মার কোন কার্য্য দেখান নাই। তিনি অদৃষ্টকেই মূল বলিয়াছেন যথা—"অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্ পতনমণূনাং মনসশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতং।" অর্থাৎ সৃষ্টি কল্পে অগ্নির উর্দ্ধ জ্বলন ও বায়ুর তির্য্যক্ পতন এবং পরমাণু ও মনের আদ্য ক্রিয়া অদৃষ্টের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

মহর্ষি কণাদের বচন প্রমাণ ও জগতের আদি কারণ কোন রোমীয় পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন "স্বভাবতঃ নিত্য পতনশীল পরমাণু সকলের গতিতে কথঞ্চিৎ স্বল্প বক্রতা হওয়াতেই পরস্পর-সংযুক্ত হইয়া জগতের আদি কারণ হইল।"

মহর্ষি কণাদ লিখিয়াছেন যে, পরমাণুর আদ্য কর্ম্ম অদৃষ্ট বশতঃ হয়, আর সেই আদ্য কর্ম্মের অভিঘাতে পরমাণুর সংযোগারম্ভ হয়, সুতরাং তাহাই জগতের নিমিত্ত কারণ। শঙ্করমিশ্রের টীকাও ঐ অর্থ প্রকাশ করে। যথা "আদ্যমিতি সর্গাদ্যকালীনমিত্যর্থঃ ৪।" অর্থাৎ তৎকালে অন্য কোন অভিঘাতের সম্ভাবনা নাই। অদৃষ্ট শব্দের অর্থ যাহা দৃষ্ট নহে। পরোক্ত প্রত্যয়ান্ত প্রযুক্ত বিশেষণ, কিন্তু দার্শনিক পরিভাষায় উহা বিশেষ্যরূপে নিষ্পন্ন।

আর ইহাতে চেতনাচেতন পদার্থ-নিষ্ঠ সংস্কার বা শক্তি-বিশেষকে বুঝায়, সচেতন পদার্থ-নিষ্ঠ হইলে শারীরিক ও মানসিক সংস্কার ও প্রবৃত্তি বিশেষকে বুঝায়, অচেতন পদার্থ-নিষ্ঠ হইলে ইহাতে সেই পদার্থগত শক্তি-বিশেষকে বুঝায়। দেহীর পক্ষে এই অদৃষ্ট শক্তির দ্বারা চিত্তবৃত্তি ও শারীরিক চেষ্টা সংক্রমিত হয়। যথা।—

"অদৃষ্টমপ্যর্থমদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি সুপ্তির্জনদর্শনাতিথিং।"

(শ্রীহর্ষ)

অর্থাৎ স্বপ্নকালে অদৃষ্ট বল দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থেরও দৃষ্টি হয়। যাহা হউক দেহীর পক্ষে এই অদৃষ্ট-বল পূর্ব্ব জন্মের ক্রিয়া বশতঃ প্রকটিত হয়, তন্নিমিত্ত ইহাকে কখন কখন ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ম্মও কহা যায়। মহর্ষি কণাদ যেমন অদৃষ্টকে সৃষ্টির কারণ কহিয়াছেন তদ্রূপ তাঁহার টীকাকার শঙ্করমিশ্রও সংসারকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত কহেন।

"সংসার-মূল-কারণয়ো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ পরীক্ষা।" মহর্ষি কণাদ কহেন দেহীর দেহান্তর প্রাপ্তি অদৃষ্টবশতঃ হয়, "অপ সপণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি।"

অদৃষ্টের অর্থ বস্তুত ইহাই। কিন্তু কণাদের অভিপ্রায় এই যে নৈসর্গিক কারণের মধ্যে ইহা আদিম। ইহা ঈশ্বরের প্রতিযোগী নহে, অদৃষ্ট ঈশ্বরের যন্ত্র মাত্র। তিনি আপনি যন্ত্রী, বৈশেষিক দর্শন মতে পরমাণুই অদৃষ্ট-বল। তদুত্তরে ঈশ্বরবাদী উদ্দ্যোতকর মিশ্র অদৃষ্ট-সম্বলিত পরমাণুবাদকে নিরীশ্বর-বাদ স্থির করিয়াছেন যথা।——

"যে পরমাণূং পুরুষ-কর্ম্মাধিষ্ঠিতত্বাৎ জগৎ-কারণত্বেন বর্ণয়ন্তি তান্ প্রতীদমুচ্যতে। পরমাণবঃ—প্রবর্ত্তত ইতি সততং প্রবৃত্ত্যা ভবিতব্যং অথ বিশেষাপেক্ষাঃ প্রবর্ত্তন্তে।"

অর্থাৎ যাঁহারা বলেন পুরুষ-কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্টের অধিষ্ঠানেতে পরমাণুর প্রবৃত্তি হয় তাঁহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, পরমাণুর চলন নিত্য কি প্রবৃত্তি দ্বারা হয়, কিম্বা তাহা বিশেষাপেক্ষ। যদি বল ক্ষীরাদি পদার্থ অচেতন হইলেও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়, অপত্য ভরণার্থ যেমন নবপ্রসূতির স্তনে অচেতন দুগ্ধাদির স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি হয়। উত্তর এই, যে ইহা সাধ্য-সম হওয়াতে যুক্তি-সঙ্গত কথা হইল না। অচেতন পরমাণু স্বতন্ত্র-প্রবৃত্ত হয়,—ইহা তোমার সাধ্য, এস্থলে নব প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের স্বতন্ত্র উদ্রেক দৃষ্টান্ত করিয়াছ। দুগ্ধ যদি স্বতন্ত্র উদ্রিক্ত তবে মৃতদেহেও তদ্রূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় না। কণাদ দর্শন যৎকালীন ন্যায়ের শাখান্তর, তখন ঈশ্বরাস্তিত্ব কিম্বা জগদ্রচনা বিষয়ে ঈশ্বরের কোন ক্ষমতা নাই ইহা স্পষ্টই জানা যাইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যিনি গ্রন্থারম্ভে ১।২।৩। শ্লোক দ্বারা ধর্ম্মের মূল সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন, তিনি তৎপরে আর কোথায়ও ধর্ম্ম অথবা ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ করেন নাই। সৃষ্টি কল্পে অদৃষ্ট-সম্বলিত পরমাণুকে বরঞ্চ সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়াছেন, এমন কি ১ম সূত্র হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও ঈশ্বরের নাম নাই যদিও——"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং" সূত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করমিশ্র আপনি আবার কহিয়াছেন যে তদ্বচনাৎ, এশব্দে ১ম সূত্রে লিখিত ধর্ম্মবচনাৎ বুঝাইতে পারে।

অপর পঞ্চভূতের সংজ্ঞা কর্ম্ম বিষয়ে কণাদ লিখিয়াছেন, যে "বায়ু সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাৎ দৃষ্টং লিঙ্গং নবিদ্যতে। তস্মাদাগমিকং। সংজ্ঞা-কর্ম্মত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গং।"

বৈ দং।

এই বাক্যের উপর টীকাকার কোশল পূর্ব্বক ঈশ্বরবাদ অধ্যারোপ করিয়া যুক্তিকে লিখিয়াছেন যে, "অস্মদ্বিশিষ্টানাং ঈশ্বর-মহর্ষীণাং সত্বে লিঙ্গং" ও সংজ্ঞা করণ আমাদের হইতে বিশিষ্টতর ঈশ্বর মহর্ষিগণের চিহ্ন। এ ব্যাখ্যার এক দোষ এই যে, কণাদ এক সংজ্ঞা-কর্ত্তার প্রসঙ্গ না করিয়া বহুবচনে অস্মদ্বিশিষ্টানাং প্রয়োগ পূর্ব্বক নানা সংজ্ঞা-কর্ত্তার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে ঈশ্বর-বাদের চিহ্ন মাত্রও পাওয়া যায় না। বাস্তবিক অস্মদ্বিশিষ্টানাং বহুবচন শব্দ পরম বা একক পরমেশ্বরকে কখনই বুঝাইতে পারে না।

বৈশেষিক পরমাণুবাদে অন্য প্রকার বাধাও আছে, তাহা পঞ্চীকরণের কথাতেই প্রকাশ পায় যথা——

"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা
প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াং
শৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।"

তবে কি পরমাণুর বিভাগ হইতে পারে? নাস্তিক-ত্রাস পরিব্রাজক শ্রীমদ্‌-শঙ্করাচার্য্য পরমাণুবাদের এইরূপ দোষ দেখাইয়াছেন যথা——

"সংযোগশ্চাণোরণ্বন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাদেকদেশেন বা সর্ব্বাত্মনা চেদুপচয়ানুপপত্তেরণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গো দৃষ্ট-বিপর্য্যয়-প্রসঙ্গশ্চ" ইত্যাদি—শঙ্কর দং।

অর্থাৎ দুই অণুর পরস্পর সংযোগ সর্ব্বস্বভাবে কিম্বা একদেশ রূপে সম্ভাব্য। যদি বল সর্ব্বস্বভাবে সংযোগ হইয়া থাকে তবে উপচয়ের অসম্ভব প্রসক্ত সংযোগেও অণুমাত্রত্ব এবং দৃষ্ট বিপর্য্যয়ভাব থাকিবে। কেন না কোন প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রব্যের অন্য প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযোগ হইলেই তাহা দৃষ্ট পদার্থ হয়। যদি বল অণুর একদেশভাবে সংযোগ হয়, উত্তর, তাহা হইলে অণুর সাবয়বত্ব উপপন্ন হইল।

গৌতম এবং কণাদ কেবল আত্মার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ বিষয়ে কিছুই কহেন নাই। তাঁহারা সকল আত্মাকেই নিত্য পদার্থ কহিয়াছেন। গৌত্রিক আর্য্য উপদেশানুসারে জীবাত্মাকে নিত্য কহিলে সমস্ত প্রাণীকেই স্বয়ম্ভূ বলা হইল।

অতএব বৈশেষিক দর্শনের মতে বেদ প্রমাণ এবং নিত্য। এই কাণাদ দর্শন বঙ্গদেশে অতি অল্প রূপে অধীত হইতেছে। এক্ষণে আর এ দর্শনের তত গৌরব নাই। তবে কাশ্যাদি প্রদেশে দুই চারিজন কণাদ-শিষ্য আছেন বঙ্গদেশে একটীও আছেন কি না সন্দেহ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন,
কুষ্টীয়া।

* সাম্য।

সাম্যই মানবজাতির প্রাকৃতিক অবস্থা। বৈষম্য জটিল সভ্যতার ফল। বৈষম্য দুই প্রকার অনিবার্য্য ও শুভপ্রদ এবং নিবার্য্য ও অশুভপ্রদ। গুণভেদে বা পরিশ্রমতারতম্যে যে বৈষম্য ঘটে তাহা অনিবার্য্য ও শুভপ্রদ; কিন্তু যে বৈষম্যের মূল ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ বা বংশভেদ, সে বৈষম্য নিবার্য্য ও অশুভপ্রদ। যে অবস্থায় সচ্ছন্দবনজাত ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া ও বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়াও তৃপ্তি, সে অবস্থায় পূর্ণ সাম্য সম্ভব; কিন্তু যখন লোকের মন ইহাতে পরিতৃপ্ত হয় না, এবং প্রাকৃতিক অভাব হইতে কাল্পনিক অভাব কল্পনা করিতে শিখে, তখন বৈষম্য অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যে যত পরিমাণ পরিশ্রম করে, যাহার মস্তিষ্ক যে পরিমাণ উদ্ভাবনাশীল, সেই তত পরিমাণ সুখ ভোগে অধিকারী হয়। এরূপ বৈষম্য বিনা জগতের উন্নতির আর কোন সম্ভাবনা নাই। নিবার্য্য ও অশুভপ্রদ—ধর্ম্মগত, জাতিগত, বর্ণগত ও বংশগত বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত শাক্যসিংহ ভারতে বৈরাগ্য প্রচার করেন। বৈরাগ্য বিষয়নিবৃত্তি। কিন্তু এই বৈরাগ্যধর্ম্ম প্রভাবে ভারত আজও নির্জ্জীব, নিরুদ্যম ও সদাসন্তুষ্ট। যদি বিষয়ভোগে অভিরুচি না থাকে তাহা হইলে মানুষের কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে না। আমরা যে অবস্থায় আছি, তাহাতেই যদি সন্তুষ্ট হই, তাহা হইলে অবস্থার উন্নতিসাধনে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। এই প্রবৃত্তিরাহিত্যই ভারতের জাতীয় পতনের অন্যতর কারণ। ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠাপিত বর্ণ-বৈষম্যের ন্যায় এই বৈরাগ্য ধর্ম্মেও আমাদিগের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। ব্রাহ্মণপ্রচারিত ধর্ম্মেও বৈরাগ্য উপদেশ ছিল বটে, কিন্তু সে বৈরাগ্য বর্ণ-বিশেষের অবলম্বনীয়; কিন্তু বুদ্ধ-প্রচারিত বৈরাগ্য সকলেরই অবলম্বনীয়। হিন্দুসমাজের সহিত সংঘর্ষকালে এই বিশ্বজনীন বৈরাগ্য-ভাব দমিত ছিল বলিয়াই, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম প্রচার কালে সাম্যের মোহমন্ত্রবলে ভারতের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু সেই সংঘর্ষকাল অতীত হইলে বৈরাগ্যের অভিঘাতে হিন্দু বৌদ্ধ উভয়ই অভিভূত হইয়া পড়িল। শারীরিক ও মানসিক গুরুতর পরিশ্রম উষ্ণপ্রধান দেশে নিতান্ত ক্লেশকর। শারীরিক ও মানসিক গুরুতর পরিশ্রম বিনাও কখন জাতীয় উন্নতি সম্ভবে না। বৈরাগ্য মানবজাতিকে প্রাকৃতিক অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে বলে, সুতরাং বৈরাগ্য-ধর্ম্মের আশ্রয়ে মানবজাতিকে শারীরিক ও মানসিক গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয় না। এই জন্যই নিদাঘতাপিত আলস্যপ্রিয় ভারতে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম এতদূর বদ্ধমূল হইল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপে ভারতের ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াও সাম্য প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মণধর্ম্মের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিল। এই নবধর্ম্মের প্রতিঘাতে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম-প্রচারিত ঘোরতর বর্ণ-বৈষম্য অনেক পরিমাণে শিথিলিত হইল। সাম্যের সঞ্জীবন মন্ত্রে ভারতের নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নি পুনর্ব্বার সন্ধুক্ষিত হইল। রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র সব সমান—সকলেই প্রকৃতির সন্তান, সুতরাং প্রাকৃতিক স্বত্বে সকলেরই সমান অধিকার—এই সত্যপ্রচারে ভারতীয় বৈষম্যপীড়িত শূদ্রজাতির হতাশ জীবনে আশার সঞ্চার হইল। শূদ্ররাজার বিজয়-পতাকা মৈসরপ্রাসাদে উড্ডীন হইল।

ক্রমশঃ।

* কাঁটালপাড়া বঙ্গ-দর্শন যন্ত্রে মুদ্রিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

কলিকাতা।

১২৮১ সাল।

বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস .. ২৲

১২৮২ সাল।

" চন্দ্রকুমার চৌধুরি . ২৲

১২৮৩ সাল।

" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জমিদার ২৲
" দিননাথ চক্রবর্ত্তি . ১৲
" নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲
" তারাকালি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲
" ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়
শান্তিপুর পুস্তকাগার .. ১॥০
" নৃত্যগোপাল মিত্র . ৩৲

১২৮৪ সাল।

" শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲
" কালিকৃষ্ণ প্রামাণিক . ৩৲
" রামচরণ ঘোষ ... ৩৲
" ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৩৲
" নবকিশোর দে ... ২৲
" শশীভূষণ সেট ... ৩৲
" গোপাললাল বসু ... ২৲
" জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ... ১৲
" কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
তালতলা ... ৩৲
" কেদারনাথ বসু ... ১৲
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জমিদার ৭৲
" চন্দ্রনাথ মিত্র ... ১॥০
" দ্বারকানাথ সিংহ হেড মাষ্টার ২৲
" কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
লালবাজার বেরিনীর ডিসপেন্সরি ৩৲

বাবু মোহিনী মোহন দত্ত .. ২৲
" বসন্তকুমার বর্ম্মা ৩৲
" মহেন্দ্রনাথ দাস ... ৩৲
" হিরালাল ঘোষ ... ৩৲
" হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় .. ৩৲
" ফণীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ৩৲
" ঠাকুরলাল দাস ... ১৲
" অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩।/০
" প্রিয়নাথ সেন ... ১৲
" গোবিন্দচন্দ্র মিত্র . ৩৲
" শশীভূষণ লাহিড়ী ... ১৲
" রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় .. ৩৲
" কালিচরণ মজুমদার .. ১৲
" দিননাথ চক্রবর্ত্তি .. ১৲
" রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২৲
" রাধানাথ মুখোপাধ্যায় .. ১৲
" অতুলচন্দ্র সিংহ ... ১॥০
" কেশবচন্দ্র চৌধুরি ... ১৲
" আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় ১৲
" রামধন বড়াল ... ৩৲
" রমানাথ বড়াল ... ৩৲
" জগদীশ্বর সেন গুপ্ত ... ১॥০
" অক্ষয়কুমার মিত্র ... ৩৲
" প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় .. ১৲
" ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ...
শান্তিপুর পুস্তকালয় ... ১॥০
" যাদবচন্দ্র রায় ... ॥০
" দিননাথ দাস ... ১॥০

বাবু তারকনাথ সরকার ...	১॥০
" অমূল্যচন্দ্র মিত্র ...	৩৲
" যজ্ঞেশ্বর সেন ...	৪॥০
" সনাতন দাস ..	১৲
১২৮৫ সাল।	
" সত্যকৃষ্ণ বসু ...	৩৲
" তিনকড়ী মুখোপাধ্যায়	৩৲
" লোকনাথ মৈত্র .	৩৲
" হরিনাথ বসু নাজির ...	৩৲
" শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১॥০
" নীলমণি মণ্ডল ...	১৲
" চন্দ্রকুমার চৌধুরি ...	৩৲
" কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তালতলা ...	৩৲
শ্রীমতী কল্পনাকুমারী ...	৩৲
বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ ...	৩৲
" শশীভূষণ লাহিড়ী ...	১৲
" রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়	৩৲
" গোপালচন্দ্র সুর ...	১৲
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩৲
" রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ..	৩৲
" কিশোরী মোহন রায় উকিল	৩৲
" দুর্গামোহন দাস উকিল	৩৲
" রাসবিহারি গোস্বামী ...	৩৲
" হেমেন্দ্রচন্দ্র দেব ...	৩৲
" বিপিন বিহারি আঢ্য ...	৩৲
" ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়	১৲
" রূপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৩৲
" নৃত্যগোপাল বিশ্বাস ...	৩৲
" দুর্গাচরণ রক্ষিত ...	৩৲

বাবু চুন্নিলাল জহরী ...	৩৲
" রাখালদাস দত্ত ...	৩৲
" দীননাথ মিত্র ..	৩৲
" অনাথনাথ দেব ...	২৲
" গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১॥০
" নন্দলাল দে ...	৩৲
" নীলমণি ভড় ...	৩৲
" নবীনচন্দ্র পালিত .	৩৲
" রসিকলাল বসু ...	৩৲
৺ নবদ্বীপ কুণ্ডু ...	৩৲
বাবু নন্দলাল দাস ..	৩৲
" কালিচরণ ভট্টাচার্য্য ...	৩৲
" ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
" তারকনাথ দত্ত ...	৩৲
" হরকালি ঘোষ ...	৩৲
" ফণীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়	৩৲
" যদুনাথ মল্লিক ...	৩৲
" জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ..	৩৲
" কালিপ্রসন্ন ঘোষ ...	৩৲
রাজা শ্যামাশঙ্কর রায় চৌধুরি	৩৲
বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য ..	৩৲
" ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
" নন্দলাল বসু ...	৩৲
" মাখনলাল মল্লিক ...	৩৲
" উমেশচন্দ্র মিত্র ...	৩৲
" উমাচরণ সেন ...	৩৲
" রাধামাধব চট্টোপাধ্যায়	২৲
" কুঞ্জলাল সাহা ...	৩৲
" মতিলাল চৌধুরি ...	৩৲
" অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্ট ...	৩৲

বাবু অদ্বৈতপ্রসাদ দে ... ৩৲
„ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৩৲
„ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ৩৲
„ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় . ৩৲
„ হিরালাল ঘোষ . ৩৲
„ লালমোহন ঘোষ . ৩৲
„ নিবদনাথ রায় .. ৩৲
„ যতীন্দ্রনাথ দাস . ৩৲
„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ৩৲
„ চণ্ডীচরণ ধর ... ২৲
„ হৃদয়নাথ রায় . ... ৩৲

মফঃস্বল। ১২৮১ সাল।

বাবু বেণীমাধব চক্রবর্ত্তি গোয়াড়ী ১৸৶০
„ জানকীনাথ দত্ত গোবিপুর ৵০
„ চারুচন্দ্র বসু উকিল মেহেরপুর ৵০
„ শ্যামলাল দত্ত দেক্রগড ৩।৶০
„ গোবিন্দলাল রায়
তাজহাট দিনাজপুর ... ২॥০
„ নিতাইপ্রসাদ বসু মাহিগঞ্জ ৶০
„ রামনারায়ণ রায় সাহা নগর ৵০
„ বীরেশ্বর পাড়ে কায়রা ।৵০
„ নফরচন্দ্র ভট্ট বহরমপুর ১॥০
„ রাজারাম রায় হরিহর পাড়া ৵০
„ প্রতাপচন্দ্র মৈত্র লাল গোলা ৩।৵০
„ শ্যামানাথ রায় চৌধুরি
মহাদেবপুর জঙ্গিরপুর ৩।৶০
„ মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কটক ২॥০

১২৮২ সাল।

বাবু বেণীমাধব চক্রবর্ত্তি গোয়াড়ী ১৵০
„ জানকীনাথ দত্ত গোবিপুর ৪৬৶০
„ চারুচন্দ্র বসু উকিল মেহেরপুর ৪৬৶০

বাবু বমানাথ দাস ঘোষ মণ্ডলাই ৩৲
„ শ্যামলাল দত্ত দেক্রগড় ৩।৵০
„ কৃষ্ণচন্দ্র দাস দিনাজপুর ৪৬৵০
„ ধনকুমার দাস দিনাজপুর ৩৲
বাবু গোবিন্দলাল রায় তাজহাট ৪৸৶০
„ নিতাইপ্রসাদ বসু মাহিগঞ্জ ৩।৶০
„ ভগীরথ দাস মাহিগঞ্জ ।৶০
„ মহেশচন্দ্র লাহিড়ী মাহিগঞ্জ ২॥০
„ শৈলেন্দ্রগিরি গোস্বামী „ ৵০
„ রাখালদাস অধিকারী চন্দননগর ৵০
„ বৈকুণ্ঠনাথ বরাট বহরমপুর ৪৸৵০
„ রামনারায়ণ রায় সাহানগর ৪৸৶০
রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় কাঁন্দি ১৸০
বাবু বীরেশ্বর পাড়ে কায়রা ২॥০
„ হরিমোহন বসু কমিল্লা ৩।৶০
„ কৃষ্ণরমণ গোস্বামী
যশদল গোস্বামী পাড়া ১৸১০
„ নফরচন্দ্র ভট্ট বহরমপুর ৩।৶৭
„ রাজারাম রায় হরিহর পাড়া ৩৸/০
„ মহেশনারায়ণ রায় লালবাগ ৵০
রাওযোগেন্দ্রনারায়ণরায়লালগোলা৪৸৶০
বাবু প্রতাপচন্দ্র মৈত্র লালগোলা ৩।৶০
„ শ্যামানাথ রায় চৌধুরি
মহাদেবপুর জাঙ্গিপুর ৩।৶০
„ মহিমচন্দ্র মজুমদার উকিল
মাহিগঞ্জ ... ... ৩।০
বাবু গৌরচন্দ্র রায় জমিদার
শাঁকারি বাজার ।৵১০
„ কৈলাশচন্দ্র সেন ঢাকা ১৸৶০
„ বিপিন বিহারি রায়
ঢাকা সুতক পুর ৪৸৵০

বাবু দ্বারকানাথ বসু ঢাকা ৪৸৶০
" বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়
মুর্শিদাবাদ ৪৸৵০
" আশুতোষ বসু চৌঁয়া বহরমপুর ৩৷৶০
" মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কটক ৪৸৶০

১২৮৩ সাল।

বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার
মুড়গাছা ঢাকা ২৶০
" গৌরচন্দ্ররায় জমিদার
শাঁকারি বাজার ঢাকা ৪৸৵০
" কৈলাশচন্দ্র সেন
ডে: ই: ষ্টোর ঢাকা ৶০
" বিপিন বিহারী রায়
শুভকপুর ঢাকা ৪৸৶০
" লোকনাথ চৌধুরী লক্ষীপুর ৪॥৶০
" দ্বারকানাথ বসু ঢাকা ২৶০
" আই এল সরকার
মুর্শিদাবাদ বন্ধুগণের লায়ব্রেরি ৪৸৶০
" বিপিন বিহারি মুখোপাধ্যায়
মুর্শিদাবাদ ৶০
" নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম এ
বি এল কাশ্মীর ৪৸৶০
" দয়ালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইছাপুর স্কুল গোবরডাঙ্গা ৪৷৶০
" মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কটক ৷৶০
" দ্বারকানাথ বাগ্‌চি মুঙ্গের ১॥০
" রঘুনাথ দাস মহাপাত্র
সোহাপাল স্কুল ১৸০
যুবরাজ আগড় তলা ৸০
বাবু রাধানশী রায় উকিল গোয়াড়ী ২৷৶০

বাবু রামকুমার মিত্র গোয়াড়ী ।৶০
" জানকীনাথ দত্ত গোবিপুর ৪৸৶০
" চারুচন্দ্র বসু উকিল মেহেরপুর ৪৷৶০
" দুর্গাদাস ভট্টাচা. কুলগাছি বর্দ্ধমান ৩৷৶০
" প্যারিমোহন চৌধুরি
ডাঙ্গাপাড়া ৪৸৵০
" তারাপ্রসন্ন সান্যাল
খালিসপুর কাশী .. ৩।১০
" রমানাথ দাস ঘোষ মণ্ডলাই ৩৲
" শ্যামলাল দত্ত দেরুগড় ৩৷৶০
" রজনীকান্ত চৌধুরী কাশিমপুর ২৲
" ভুবনমোহন চৌধুরী লালোর ৩৷৵০
" কৃষ্ণচন্দ্র দাস দিনাজপুর ১৶০
" গোবিন্দলাল রায়
তাজহাট দিনাজপুর . ৫৲
" নিতাইপ্রসাদ বসু মাহিগঞ্জ ৩৷৶০
" ভুবনমোহন চৌধুরী " ৪৸৶০
" ভগীরথ দাস " ৪৷৶০
" মহেশচন্দ্র লাহিড়ী " ৪৸৶০
" শৈলেন্দ্রগিরি গোস্বামী " ৪৸৵০
" হরদয়াল ঘোষ তাজহাট রংপুর ৩৶০
" রাখালদাস অধিকারি চন্দননগর ৩৷৶০
" বৈকুণ্ঠনাথ বরাট বহরমপুর ৪৷৶০
" রামনারায়ণ রায় সাহানগর ৪৸৶০
" সাধারণপুস্তকালয় ডাহাপাড়া ১৸৶০
" জগন্নাথপ্রসাদ গুড মশীপুর ৩৷৶০
" মহিমচন্দ্র মজুমদার চৌঁয়া ॥১০
" কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরামপুর ... ... ।৶০
" কৃষ্ণরমণ গোস্বামী
মদনগোস্বামী পাড়া ৸/১০

রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
বাগডাঙ্গা ৩৷৵০
বাবু নফরচন্দ্র ভট্ট বহরমপুর ৩৷৵০
" হরিকিশোর রায় শ্যামগ্রাম ২৲
" মহেশনারায়ণ রায় লালবাগ ২৸৷০
রাও যোগেন্দ্রনারায়ণরায়লালগোলা ৪৸৵০
বাবু রজনীকান্ত চৌধুরী কাশিমপুর ২৲
" শ্যামানাথ রায় চৌধুরী
মহাদেবপুর জাঙ্গিরপুর ৩৷৵০
" মহিমচন্দ্র মজুমদার উকিল
মাহিগঞ্জ ৩৷৵০
" অনাথবন্ধু রায়
কাঁকিনীয়া দিনাজপুর . ৩৷৵০
" রমণীমোহন চৌধুরী রায় বাহাদুর
ভূষভাণ্ডার ৷৵০

১২৮৪ সাল।

বাবু রামেশ্বররায় মোক্তার গোয়াড়ী ২৷৵০
" রাবনশী রায় উকিল গোয়াড়ী ৪৸৵০
" রামকুমার মিত্র গোয়াড়ী ৩৷৵০
" মৃত্যুঞ্জয় রায় উকিল গোয়াড়ী ৩৷৵০
" জানকীনাথ দত্ত গোবিপুর ৪৷০
" নীলমণি মুখোপাধ্যায় মেহেরপুর ৪৲
" চারুচন্দ্র বসু উকিল মেহেরপুর ৷৵০
" যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভবানীপুর .. ... ২৲
" উমাশঙ্কর রায় ভবানীপুর ৷৵০
৺কুমারগিরিশচন্দ্রসিংহ পাইকপাড়া ৩৷৵০
বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার
মুড়গাছা ঢাকা ৪৸৵০
" লোকনাথ চৌধুরী
লক্ষ্মীপুর আসাম ২৵০

বাবু বেণীমাধব মল্লিক
শাঁকারি বাজার ঢাকা ৪৸৵০
" মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঢাকা কলেজ ৩৲
" গৌরচন্দ্র রায় জমিদার
শাঁকারি বাজার ঢাকা ২৸৵১০
" রঘুনাথ দাস ঢাকা ৪৸৵০
" বিপিন বিহারি রায়
শুক্রাপুর ঢাকা ৷০
" আই এল সরকার
মুর্শিদাবাদ বন্ধুগণের লায়ব্রেরী ৵০
" কৃষ্ণসুন্দর রায় করিমগঞ্জ ৩৷৵০
" অন্নদাপ্রসাদ লাহিড়ি
মাহিয়ারি হুগলি ৪৸৵০
" গঙ্গাপ্রসাদ বসু হেড মাষ্টার
করটীয়া স্কুল লায়ব্রেরী ৪৸৵০
" বিপিনবিহারি সেন ভবানিপুর ১৸৵০
" নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়
এম এ বি এল কাশ্মীর ৪৸৵০
" নবীনচন্দ্র ঘোষ নেটিব ডাক্তার
কুষ্টিয়া ৩৷৵০
" দয়ালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইছাপুর স্কুল গোবরডাঙ্গা ৷০
" বেচারাম চক্রবর্ত্তী নবগ্রাম ৩৷৵০
" দ্বারকানাথ বাগচি মুঙ্গের ৪৸৵০
" তারণচন্দ্র শান্যাল
টুরাগার হিলস্ ধুবড়ি ৩৷০
" প্যারিমোহন চৌধুরি ডাঙ্গাপাড়া ৵০
" তারাপ্রসন্ন সান্যাল
খালিশপুর কাশী .. ৩৷০
" চণ্ডীচরণ মজুমদার কাশী ৩৷০

বাবু মধুসূদন সরকার কুটীগাদী ৩৸৶০
„ লোহিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তি
ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবেড়িয়া ১১৵০
„ রজনীকান্ত চৌধুরি কাশিমপুর৪৸৶০
„ ভুবনমোহন চৌধুরি লালোর ৩৸৶০
„ কিশোরীলাল সরকার এম, এ বি
এল বোয়ালিয়া ... ৪৸৶০
„ গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি দিনাজপুর৪৸৶০
„ গোবিন্দলাল রায়
তাজহাট দিনাজপুর ৪৸৶০
„ নিতাইচাঁদ বসু মাহিগঞ্জ ৩৸৶০
„ ভুবনমোহন চৌধুরি „ ৩।০
„ ভগীরথ দাস মাহিগঞ্জ ৪৸৶০
„ হরলাল ঘোষ
তাজহাট রংপুর ... ৪৸৶০
„ মহেশচন্দ্র লাহিড়ী মাহিগঞ্জ ১।৶০
„ শৈলেন্দ্রগিরি গোস্বামী
মাহিগঞ্জ রংপুর ... ৪৸৶০
„ রাখালদাস অধিকারি
চন্দননগর ... ৩।৶০
„ বৈকুণ্ঠনাথ বরাট বহরমপুর ৩৸৶০
„ রামনারায়ণ রায় সাহানগর ৩।৶০
„ সাধারণ পুস্তকালয় ডাহা পাড়া ১৵০
„ জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্ত নশীপুর ৩৸৶০
„ ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ফয়জাবাদ ... ৩৸৶০
„ রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়
কান্দি ৩৸৶০
„ মহিমচন্দ্র মজুমদার চৌঁয়া ৪৸৶০
„ কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরামপুর... ... ২৸৶০

বাবু দুর্গাচরণ কবিরত্ন আজিমগঞ্জ ৩৸৶০
„ মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়
বহরমপুর ৩৸৶০
„ হেমনাথ ঘোষ হেড মাষ্টার
মহানদ স্কুল ... ৩।৵০
„ নীলরত্ন অধিকারী
গোস্বামী দুর্গাপুর ... ১৸৶০
„ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগর ৩৸৶০
„ ত্রৈলোক্যনাথ হালদার
ফয়জাবাদ... ... ৩৸৶০
„ কামাখ্যাপ্রসাদ রায়
কুড়লগাছি ৩।৶০
„ রামযাদব ঘোষাল আওরাইল ৩৸৶০
„ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
দারজিলিং ... ৪৸৶০
„ কালিপ্রসাদ সিংহ
বর্দ্ধমান কালেকটরী ৩৸৶০
„ আনন্দমোহন বৰ্দ্ধন কুমিল্লা ৩৸৶০
„ কৃষ্ণসুন্দর রায়
জয়কাগ্রাম, করিমগঞ্জ ৩।৶০
রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরি
বাগডাঙ্গা... ... ৩৸৶০
„ নফরচন্দ্র ভট্ট বহরমপুর ৩৸৶০
„ হরিকিশোর রায় শ্যামগ্রাম ৪৵০
„ রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়
লাল গোলা ... ৩৸৶০
„ রজনীকান্ত চৌধুরি কাশিমপুর৪৸৶০
„ শ্যামানাথ রায় চৌধুরি
মহাদেবপুর জঙ্গিরপুর ৩৸৶০
„ মহিমচন্দ্র মজুমদার উকিল
মাহিগঞ্জ ৩৸৶০

হিন্দু-চিকিৎসা।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের আরোগ্যই উত্তম মূল। সুতরাং সকল শাস্ত্রাপেক্ষা চিকিৎসা শাস্ত্র যেরূপ মহদুপকারী ও প্রত্যক্ষসিদ্ধফল, সেরূপ আর কিছুই নহে। আয়ুর্ব্বেদ যথার্থই বলিয়াছেন, "ন দেশো মনুজৈর্হীনো নাস্তি লোকা নিরাময়াঃ, অতঃ সর্ব্বত্র বৈদ্যানাং সুসিদ্ধা এব বৃত্তয়ঃ।" দেশ মনুষ্য-বিহীন নহে, মনুষ্য সকলও-রোগবিহীন নহে। অতএব চিকিৎসকগণের বৃত্তি সর্ব্বত্রই সুসিদ্ধ হয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের—প্রাচীনতম সভ্য আর্য্যগণের—অমৃতফলপ্রসবিনী সংস্কৃত ভাষার প্রধান গৌরবচিহ্ণ সেই হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র। যিনি একবার মাত্র এবিষয়ের পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের—আর্য্যগণের—ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।

প্রাচীন আর্য্যগণের কি ধর্ম্ম বিষয়ে কি চিকিৎসা বিষয়ে কি অন্যান্য বিষয়ে শাস্ত্র সকল দুইভাগে বিভক্ত। বেদ ও তন্ত্র সেই দুই ভাগ। বেদ ব্রহ্মার বিরচিত, তন্ত্র শিবের প্রণীত। স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি বৈদিক মতের বিস্তারকারক; এই প্রাচীনতম চিকিৎসা শাস্ত্রও সেইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তন্ত্র হইতে বেদ প্রাচীনতম, আয়ুর্ব্বেদও বেদের অন্তর্গত, সুতরাং সেই প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তির কাল নির্দ্দেশ করা অতি সুকঠিন। আধুনিক প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বেদের উৎপত্তি কাল নির্ণয় স্থলে সকলেই সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচ্য পণ্ডিত অধ্যাপক মেক্সমূলর সাহেব খৃষ্টাব্দের ১০০০। ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদের উৎপত্তির কাল নির্দ্দেশ করেন, আবার ডাক্তার হগ বলেন খৃঃ ১৪০০। ২০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদের উৎপত্তি। আবার অন্য সম্প্রদায় আরও প্রাচীন কালে ইহার উৎপত্তির কাল স্থির করিয়াছেন। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী, সকলেই সন্দিগ্ধ-হৃদয়, কেবল ভাষাগত পার্থক্যই তাঁহাদের সময়াবধারণের একমাত্র উপায়; আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণের স্থির বিশ্বাস যে জগৎসৃষ্টির সময় বেদের উৎপত্তি। যদি সে মতের বিপরীতে আমরা কোন কথা বলি তাঁহাদের নিকট নাস্তিক বিধর্ম্মী বলিয়া তিরস্কৃত হইব। আমরা তাঁহাদের মতের উপর নির্ভর করিলে এই

উনবিংশ শতাব্দীর নব্যসম্প্রদায় অনমু-সন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্বানভিজ্ঞ বলিয়া উপহাস করিবেন, সুতরাং এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল ইহা বলা যাইতেছে যখন আর্য্যজাতি উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, যখন বেদের জ্ঞানজ্যোতিঃ আর্য্যজাতিকে আলোকিত করিতেছিল,—সেই সময়ে, সেই বৈদিককালে—আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি হয়। বেদের মত-বিস্তার-কারিণী সংহিতা সকল তৎপরে জন্মে।

হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থ-কর্ত্তা বলিয়াছেন—প্রথম বিধাতাই আয়ু র্ব্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা। সর্ব্ব বেদের সার লক্ষ শ্লোকময়ী সরল সংহিতা রচনা করিয়া ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি করেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রজাপতি দক্ষ সেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, অশ্বিনীপুত্রদ্বয় সাগ্রহে সেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। অশ্বিনীপুত্রেরা সুশিক্ষিত হইয়া ব্রহ্মার ও মহাদেবের পরস্পর বিরোধে ব্রহ্মার উর্দ্ধ মস্তক ছিন্ন হওয়ার যে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত হইয়াছিল তাহা আরোগ্য করায়, তাঁহারা উচ্চশ্রেণী দেব সমাজভুক্ত হইয়া যজ্ঞের অংশভাগী হইয়াছিলেন; দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতা-দিগের যে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত হইয়াছিল, অশ্বিনীকুমারেরা সদ্য তাহা আরোগ্য করেন। ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ, সোম হইতে নিপতিত চন্দ্রের যন্ত্রণা, পুষণের দন্তরোগ, সূর্য্যের চক্ষুরোগ, চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা রোগ, ভার্গবের অকাল জরা প্রভৃতি আরোগ্য করায়, সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় সকলের মান্য হইয়াছিলেন। যখন দ্রব্যের আশ্চর্য্য শক্তি ও শারীরিক তত্ত্ব কাহারও বিদিত ছিল না, তখন কে না এরূপ অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইবে? কে না সেই শিক্ষা লোলুপ হইবে? ইন্দ্র আয়ু-র্ব্বেদের এইরূপ মহীয়সী ক্ষমতা দৃষ্টে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; ভগবান্ ইন্দ্র বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু তখনও আয়ুর্ব্বেদের বাহুল্য প্রচার হয় নাই, তখনও আয়ুর্ব্বেদের অসাধারণ উপকার সকলে লাভ করিতে পারে নাই। এখন যেমন উচ্চ শ্রেণীর মহাত্মারা দেশের ও সমাজের উপকারের জন্য মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া থাকেন, তৎকালেও সেই-রূপ ছিল। আর্য্যবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ অর্চ্চনীয় মুনিগণ এই পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির উপকারে ও প্রত্যেক বিষয়ের উন্নতির জন্যই ব্যস্ত থাকিতেন; তাঁহারা কেবল সভা করিয়াই ও কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, যখন যে প্রস্তাব করিতেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া তবে নিরস্ত হইতেন। চরকে পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশের স্থলেও অন্যান্য বিষয়ে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে যখন রোগের প্রাদুর্ভাব হইল, মনুষ্য সকল যখন রোগের যন্ত্রণায়

পরিতাপিত হইতে লাগিল, সেই সময়ে অঙ্গিরা, যমদগ্নি প্রভৃতি মুনিগণ দয়ার্দ্র চিত্তে হিমালয়ের পার্শ্বে সমবেত হইয়া ইহার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 'ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের আরোগ্যই মূল, রোগ তাহার, মঙ্গলের এবং জীবনের নাশক,—কিসে এ রোগের শান্তি হইতে পারে?' এই প্রশ্ন হইলে সকলে স্থির করিলেন ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করাই একমাত্র উপায়। "কে ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে যাইবে?"—তৎপরে এই প্রশ্নের পর হিতৈষী মহাত্মা ভরদ্বাজ মুনিই সর্ব্ব প্রথমে 'আমাকে নিয়োগ কর' বলায়, সকলে সেই কথার অনুমোদন করিলেন। মহাত্মা ভরদ্বাজ ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়া দেবতা-পরিবেষ্টিত ইন্দ্রকে বহুবিধ স্তব করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহাকে যথা-শিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ দিলেন, মহামুনি ভরদ্বাজ আয়ুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত হইয়া মুনিগণকে তাহা শিক্ষা করাইলে আত্রেয় মুনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কোন মতে তিনি ইন্দ্রের নিকট সুশিক্ষিত হইয়া অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ও ক্ষারপাণি নামক ছয় জন মুনিতনয়কে সেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিলেন। অগ্নিবেশ বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু ছয় জনের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থকর্ত্তা হয়েন, তৎপরে ভেল প্রভৃতি পাঁচ জনেও আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সকলে স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ আত্রেয়-প্রমুখ মুনিগণের নিকট পাঠ করিলে তাঁহারা যথাযথ সূত্রিত হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা ও অনুমোদন করিলেন, দেবতারাও সেই গ্রন্থ দৃষ্টে প্রশংসা করিয়াছিলেন। অনন্তদেব আবার এক সময়ে পৃথিবী রোগপরিতপ্ত দেখিয়া মুনিকুমার বেশে আসিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রচার করেন। তিনি চরের ন্যায় আগমন করায় চরক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, এবং অগ্নিবেশ প্রভৃতির গ্রন্থ প্রতিসংস্কার করিয়া চরক প্রণয়ন করেন; চরক আজও আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়া বিখ্যাত।

আবার এক সময়ে ভগবান্ ইন্দ্র পৃথিবী রোগ-সন্তপ্ত দেখিয়া ধন্বন্তরিকে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের জন্য উপদেশ দেন। ধন্বন্তরি কাশীতে ক্ষত্রিয়কুমার ভূপতি হইয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক শিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদের প্রচার আরম্ভ করেন। সেই সময়ে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ ধন্বন্তরির অসাধারণ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিতে আজ্ঞা দিলেন। সুশ্রুত সেই আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া আরও একশত মুনিকুমারের সহিত কাশীতে গমন করিয়াছিলেন, সকলে সেই ধন্বন্তরির নিকট আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করেন, এবং সকলেই কৃতবিদ্য হয়েন। সেই ধন্বন্তরিই কাশী-রাজ ও দিবোদাস নামে বিখ্যাত। সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিকুমারেরা সকলেই গ্রন্থকার

হয়েন, তন্মধ্যে সুশ্রুতের গ্রন্থ উৎকৃষ্ট হওয়ায় তাহাই জনসমাজে সমাদৃত হয়। এইরূপে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও উন্নতি।

আয়ুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, শস্ত্র চিকিৎসা প্রধান ও ভেষজ চিকিৎসা-প্রধান। সুশ্রুত শস্ত্র-চিকিৎসা প্রধান গ্রন্থ। ইহাতে শস্ত্রের যথাযথ বর্ণন, শারীরিক তত্ত্ব, ব্যবচ্ছেদ ক্রিয়ার (Dissection) উপদেশ; অস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি প্রভৃতি শস্ত্র চিকিৎসার সুব্যবস্থা সকল বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা বলেন,—প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা গ্রন্থে শস্ত্র-চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই—তাঁহারা যদি একবার সুশ্রুত পাঠ করেন, চমৎকৃত হইবেন, সে ভ্রম সহজেই দূর হইবে। চরক প্রভৃতি ভেষজ্ চিকিৎসা-প্রধান গ্রন্থ; সুতরাং তাহাতে ভৈষজ্যের বহুবিধ উপদেশ আছে; আয়ুর্ব্বেদ ভেষজ্ সংগ্রহ কালে "তৎপুনস্ত্রিবিধং প্রোক্তং জঙ্গমৌদ্ভিদপার্থিবং" জাঙ্গম ঔদ্ভিদ ও পার্থিব এই ত্রিবিধ ঔষধের কল্পনা করিয়াছেন। মধু, দুগ্ধ, পিত্ত, বসা, মজ্জা, রক্ত, মাংস, বিষ্ঠা, মূত্র, চর্ম্ম, রেত, অস্থি, স্নায়ু, শৃঙ্গ, নখ, খুর, কেশ, লোম ও গোরোচনা জঙ্গম হইতে গ্রহণীয়। মূল, ছাল, কাষ্ঠ, ডাঁটা, আঠা, রস, কিসলয়, ক্ষার, দুগ্ধ, ফল, পুষ্প, ভস্ম, তৈল, কণ্টক, পল্লব প্রভৃতি ঔদ্ভিদ দ্রব্য। স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু, মণ্ডুর প্রভৃতি ধাতুর মল, খর্পর, দারমুষ মনঃশিলা, হরিতাল, মুক্তা, হীরক, লবণ গৈরিক, রসাঞ্জন প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তন্ত্র শিবের প্রণীত—যদিও আয়ুর্ব্বেদে ধাতু দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই বেদ-মূলক চিকিৎসায় ঔদ্ভিজ্জতত্ত্বেরই বহু আন্দোলন। তখন রাসায়নিক তত্ত্বের প্রচুরতর আন্দোলন হয় নাই। পরমমঙ্গলাকর ভগবান্ মহাদেব ঔদ্ভিজ্জ-মূলক ভেষজের বহুতর পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার গুণ প্রভৃতি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যখন তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিলেন, তখন অন্যান্য রাসায়নিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেলাগিলেন। তিনি দেখিলেন,—ঔদ্ভিজ্জমূলক চিকিৎসায় রোগের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। আমাদের সেই আয়ুর্ব্বেদের মতে বায়ু পিত্ত কফের অন্যতম বিকৃতিই সকল রোগের নিদান, তাহার পরস্পর ন্যূনাধিক্যের অংশাংশ কল্পনা, আভ্যন্তরীণ গতির বিপর্য্যয়, যান্ত্রিক অবস্থা, দেশ, কাল, বয়স প্রভৃতি বিশেষরূপে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে যতক্ষণ হৃদয়ঙ্গম না হইবে ততক্ষণ চিকিৎসক ঔষধের দ্বারা কোন উপকারই করিতে পারিবেন না। রাসায়নিক চিকিৎসা তাহা চাহে না, রোগের স্থূলতত্ত্ব জানিতে পারিলেই বিশেষ উপকার দেখাইতে পারে। আরও রাসায়নিক ঔষধ সকল চিরস্থায়ী, একবার প্রস্তুত করিলে বহুকালেও হীনবীর্য্য হয় না। আরও আয়ুর্ব্বেদে বলিয়াছেন,—"রোগাঃ সর্ব্বেঽপি মন্দেঽগ্নৌ" মন্দাগ্নি সকল রোগেরই কারণ।—বাভট

নামে একজন আয়ুর্বেদবক্তা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন,—"অজীর্ণ ব্যতীত কোন রোগ হয় না"। দন্ত পড়িতেছে, কারণ মন্দাগ্নি; যে অগ্নিতে দন্তের পোষকতা করে, তাহার অল্পতা। এইরূপ মন্দাগ্নি প্রত্যেক রোগেরই প্রধানতম কারণ। সুতরাং অগ্নিবৃদ্ধিকর ঔষধই চিকিৎসার উপযোগী। ভগবান্ মহাদেব বাহ্য অগ্নির সহিত আভ্যন্তরীণ অগ্নির তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—"তৃণারণিমণিজন্য-বহ্নিন্যায়েন" যেমন তৃণজন্য অগ্নি আশু প্রদীপ্ত হয়, কিন্তু তাহা অচিরস্থায়ী এবং লৌহ প্রভৃতি কঠিনতম বস্তু দ্রব করিবার ক্ষমতা শূন্য, যেমন কাষ্ঠজ অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াও জল প্রভৃতি সংস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়, তেমনি ঔদ্ভিজ্জ-ভেষজ-জনিত অগ্নি আশু উপকার দর্শাইয়া অচিরস্থায়ী হয়, এবং কঠিন পীড়া সমূহের নিকট মলিন হইয়া যায়। আর যেমন প্রস্তরজ অগ্নি শনৈঃ শনৈঃ প্রদীপ্ত হইয়া চিরস্থায়ী ও কঠিন-দ্রব্য দ্রব-ক্ষম হয় এবং সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে, সেইরূপ রাসায়নিক ঔষধজ অগ্নি বহুকালস্থায়ী, কঠিন পীড়া সমূহের সমূহ উপযোগী। শিব রাসায়নিক তন্ত্রের আবিষ্কারের প্রথমেই বলিয়াছেন,—"নিঃসারং বিশ্ববৃক্ষং গদবিকলবপুর্ব্যাপ্তমেবাতিতপ্তং ক্রমঃ কারুণ্যসিন্ধোঃ সকলগুণনিধেঃ সূতরাজস্য যুক্তিম্"—বিশ্বজাত ঔদ্ভিজ্জসমূহ নিঃসার, যান্ত্রিক পীড়াসমূহের অনুপযোগী, অথচ জীব সকল যান্ত্রিক পীড়ায় আভ্যন্তরীণ দুষ্টির যন্ত্রণায় কাতর, সুতরাং সকল গুণের সমুদ্র করুণা-পরিপূর্ণ পারদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলা যাইতেছে। এই কথার কতদূর সত্যতা একবার ঔদ্ভিজ্জমূলক ইংরাজি চিকিৎসার ও রাসায়নিক হিন্দু চিকিৎসার তুলনা করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। জ্বরের চিকিৎসায় কোন্ মত চিরস্থায়ী ফললাভ করে একবার নিরপেক্ষ চিত্তে তুলনা করিলেই হয়। আরও উরঃক্ষত (Consumption) প্রভৃতি কঠিন রোগে আক্রান্ত কয় জন ঔদ্ভিজ্জমূলক ইংরাজি চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, আর কয়জনই বা রাসায়নিক হিন্দুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন? এমন কি,—এখন অনেক বিচক্ষণ বহুদর্শী ডাক্তারও যান্ত্রিক পুরাতন কঠিন পীড়ায় ইংরাজি চিকিৎসা হইতে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা সমধিক ফলবতী স্বীকার করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই সকল বিবেচনায় মহাদেব রাসায়নিক তন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

তান্ত্রিকমতে পারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভেষজ; স্বভাবতঃ পারা বহুদোষসম্পন্ন এবং বিষবৎ অব্যবহার্য্য। যতক্ষণ সেই পারদের দোষ সকল সংশোধিত হইয়া ইহা গুণবিশিষ্ট না হয়, ততক্ষণ তাহার প্রয়োগ নিতান্ত দূষণীয়। অশুদ্ধ পারদে যে পরিমাণ উপকারের প্রত্যাশা তদপেক্ষা সহস্রগুণে অপকার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেলামেল (*Calamel*) যাহার শরীরে একবার প্রবেশ করিয়াছে,

তাহার জন্মের মত স্বাস্থ্য গিযাছে; যে টুকু উপকার হইয়াছিল,—তদপেক্ষা সহস্রগুণে অপকাব হইযাছে। কিন্তু কে বলিতে পাবেন,—হিন্দু বাসায়নিক পাবদ সেবনে কাহাবও অপকাব ঘটিয়াছে? তবে যদি কেহ কোন দেশীয়-চিকিৎসক প্রদত্ত পাবদ সেবনে কাহাবও অপকাব হইতে দেখিয়া থাকেন, তাহা হিন্দু-চিকিৎসা শাস্ত্রেব দোষ নহে, সেই তস্করপ্রতিম পবিত্র রসায়নশাস্ত্রেব কলঙ্ক দায়ী বঞ্চক চিকিৎসকেব দোষ। পাবদ নির্দ্দোষ হইলে বসায়নক্রিয়াব সহ কারিতায নানাবিধ ধাতু ঔদ্ভিজ্জ প্রভৃতি দ্রব্যেব মিলনে অতুল ফল দশায়। সেই পাবদেব গুণবর্ণন অতি সুকঠিন। রসায়নক্রিয়ায় পাবদর্শী মহাজ্ঞানী ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—পাবদের বাসায়নিক ক্রিয়ায় যে পীড়ার শান্তি না হয়, তাহা আব কিছুতেই আবোগ্য হইতে পাবে না, একমাত্র বসসিন্দুরেব প্রক্রিয়াই তাহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণ। যিনি পাবদের বাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পারদর্শী, তাঁহাব অমানুষী ক্ষমতা।

আবার সেই সময়েই পবীক্ষিত হইয়াছিল, তান্ত্রিক ও বৈদিক চিকিৎসার একত্র সমাবেশ সকল মঙ্গলকর। রসসিন্দুর ক্ষেতপাপড়ার রসেব সহিত দিলে আশু পিত্ত শান্তি করে, এইরূপ প্রণালীতে চিকিৎসা হইতে লাগিল, এবং সেই চিকিৎসাই আজ পর্য্যন্ত ম্লান ভাবে ভারতে বিচরণ করিতেছে। আজ সেই প্রাচীন দেশীয় চিকিৎসাব মহো ন্নতিব কাল।

এখন অনেকে বলিতে পারেন,—সন্দেহ কবিতে পাবেন, প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা যতই কেন উন্নতি লাভ করুক না, যতই কেন উৎকৃষ্ট হউক না, আধুনিক উন্নত ইংবাজি চিকিৎসাব সমকক্ষতা লাভ কবিতে পারে নাই; আমবা স্বভাবতঃই এক্ষণে বিদেশীয়েব পক্ষপাতী, একজন বিদেশীয় লোক যদি নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধিব বলে—তর্ক শক্তিব বলে—বলেন,—মনুষ্য বানব বংশসম্ভূত, আমবা অনায়াসে তাহা শ্রদ্ধা সহকাবে শুনিব, আব একজন ভবিষ্যৎ-বক্তা মুনি যদি বাবংবাব বলিয়া থাকেন, বামচন্দ্র বানবেব সাহায্য লইয়াছিলেন, তাঁহাকে—সেই শ্রদ্ধাস্পদ—প্রাচীন ভাবতবাসীর শ্রদ্ধাস্পদ—বক্তাকে বাতুল বলিয়া, কল্পনা-চতুব বলিয়া, মিথ্যাবাদী বলিয়া—ঘৃণা ও উপহাস করিব! একজন বিদেশীয় লোক যদি অন্যায় তর্ক দ্বাবা প্রতিপন্ন করেন, ঈশ্বরে ভক্তি করা ভ্রান্তিসঙ্কুল সংস্কাব, তাহা বিশ্বাস করিতে যত্ন করিব, আহ্লাদে স্বীকার করিব। আর শত জন প্রাচীন আর্য্যজাতির গৌরব স্বরূপ মুনি যদি নিজের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া শত সহস্র যুক্তি দিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ, ঈশ্বরে শ্রদ্ধা অবশ্য কর্ত্তব্য, তবে নিশ্চয়ই তিনি অশ্রদ্ধেয় বাচাল

ও হাস্যাস্পদ হইবেন! এরূপ না হইলে ভারতের সুখসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইবে কেন? এ রুচির সময়ে সহজে কে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসায়—কে সেই প্রাচীন মুনিগণের কথায়—সেই প্রাচীন ব্যবস্থায় শ্রদ্ধা করিবেন? কে নূতন আধুনিক উন্নতজাতির আবিষ্কৃত চিকিৎসার সহিত তুলনা করিয়া সেই প্রাচীন চিকিৎসার উৎকর্ষ স্বীকার করিবেন? কিন্তু বিবেচনা করিলে—নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে—স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে, ইংলণ্ডীয় চিকিৎসা এক্ষণেও প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই! এখনও অনেক উন্নতির আবশ্যক, এখনও অনেক অঙ্গসৌষ্ঠব হয় নাই! অন্য বিষয় যাক,—চিকিৎসাশাস্ত্রের মুখ্য অঙ্গ ভেষজ সংগ্রহ, তাহারই তুলনা করিয়া দেখুন,—ইংরাজি চিকিৎসায় কত অভাব! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা ভেষজ সংগ্রহ করিতে কোন বিষয়ে পরাঙ্মুখ হয় নাই, মূত্রে বিষ্ঠায় চন্দনে বিষে উদ্ভিদে পার্থিবে, প্রাণিসমূহে সকল স্থল হইতেই যখন যাহা পাইয়াছেন, অবিকৃত চিত্তে ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছেন! আর ইংলণ্ডীয় চিকিৎসার ঔদ্ভিজ্জই প্রধান অঙ্গ। যদিও হরিতাল, লৌহ, পারদ প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য পার্থিব, এবং, কডলিবার অইল (*Codliver oil*) বসা (*Lard*) প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য জাঙ্গম, কিন্তু তাহা প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসার তুলনায় যৎসামান্য! পারদের ব্যবহার করিতে—তাহার রাসায়নিক রূপান্তর করিতে—দ্রব্যান্তর-সংযোগে অবাচ্য-গুণ-বিশিষ্ট করিতে ইংরাজি চিকিৎসা কিছুমাত্র শিখে নাই! সুতরাং স্পষ্ট স্বীকার্য্য, ইংরাজি চিকিৎসা এখনও অসম্পূর্ণ। এখনও প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসার সমকক্ষতা লাভ করিবার যথেষ্ট বিলম্ব!

আমাদের ক্রমশঃ দুর্ব্বল হওয়ার কারণ কি? কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের অপচয়। বঙ্গভূমির তো কথাই নাই, যে পঞ্জাবে সে দিন রণজিৎ সিংহ ব্রিটীশ সিংহকে কম্পমান্ করিয়াছিলেন, সেই পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর—ভারতের দিন দিন অবনতি দৃষ্টে হৃদয় আঘাতিত হইবে! লাহোর এক্ষণে সংক্রামক-জ্বর-পরিতপ্ত ক্লিষ্ট মনুষ্যের আবাসভূমি! ক্রমশঃ লোকের পরমায়ুর হ্রাস হইয়াছে। শতবৎসর পূর্ব্বে যে ভারতে শত-বৎসরবয়স্ক বহুসংখ্যক লোকের জীবনের আরো ১০।১৫ বৎসর আছে বলিয়া আশা হইত, সেই ভারতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স জীবনের এক্ষণে শেষ সীমা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞানের বলে "বাল্য বিবাহ" উল্লেখ করেন। বাল্য বিবাহ কত অনিষ্ট বা ইষ্টকর তাহা এস্থলে বলিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু অপক্ক-শুক্র-শোণিত-জাত সন্তান যে অনিষ্টকর সহ-

জেই সিদ্ধান্ত হয়। আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র সুশ্রুত বলিয়াছেন,—"ঊনষোড়শ বর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং, যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ, তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।"—'পঞ্চবিংশতি বর্ষের ন্যূনবয়স্ক পুরুষের দ্বারা যদি ষোড়শ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বালিকার গর্ভ উৎপাদিত হয়, তবে সেই গর্ভ নষ্ট না পুত্র জন্মিলে অচিরজীবী, বা জীবিত থাকিলে ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য ঘটে, অতএব বালিকার গর্ভাধান অকর্ত্তব্য।' আমাদের প্রাচীন আর্য্যেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন,—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" পুত্রের জন্যই দার পরিগ্রহ; এখনকার ন্যায় কেবল মনোবৃত্তির তৃপ্তি সাধন জন্য, শরীর বিনষ্ট করিবার জন্য বিবাহ নয়, সুতরাং যাহাতে সন্তান সবল ও সুস্থকায় হয় তদ্বিষয়ে সমূহ যত্নবান্ ছিলেন, অপরিমিত শুক্রের অপচয় স্বাস্থ্যনাশের প্রধান কারণ; যাহাতে ধাতুর দৌর্ব্বল্য না ঘটে, বিকৃত শুক্রশোণিতে সন্তান না জন্মে, তদ্বিষয়ে সমূহ যত্নবান্ হইতেন। প্রাচীন-হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র—এই ভারতের প্রাচীন উন্নতির অমোঘ পরিচায়ক চিকিৎসা শাস্ত্র—বিশুদ্ধ ও বিকৃত শুক্রশোণিতের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা বলিয়াছেন। সেই সকল চিকিৎসা নিয়ম পথ্য ভারত হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় দূষিত শুক্র শোণিতের সংশোধন হয় না, তজ্জাত সন্তান চিররুগ্ন ও অল্পায়ুঃ হয়। আয়ুর্ব্বেদ বিশুদ্ধ শুক্র শোণিতের লক্ষণ স্থলে বলিয়াছেন—"স্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধুগন্ধি চ, শুক্রমিচ্ছন্তি কেচিত্তু তৈল-ক্ষৌদ্র-নিভং তথা।" 'স্ফটিকের ন্যায় বর্ণ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুর ও মধু-গন্ধবিশিষ্ট শুক্রই নির্দ্দোষ 'কেহ কেহ তৈল ও মধুর ন্যায় শুক্রকেও নির্দ্দোষ বলেন।' "শশাসৃক্প্রতিমং যচ্চ যদ্বালাক্ষারসোপমং তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ।" 'যে আর্ত্তবের বর্ণ শশকের শোণিতের ন্যায়, অথবা লাক্ষারসের তুল্য, এবং যাহা দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত না হয়, অর্থাৎ ধৌত করিলে চিহ্ন না থাকে তাহাই প্রশংসনীয়'। এইরূপ শুক্র শোণিতের রূপান্তর অশুদ্ধ শুক্র শোণিত, সেই দূষিত শুক্র শোণিত যত দিন সুচিকিৎসায় নির্দ্দোষ না হয়, তত দিন যাহাতে সন্তান না জন্মে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ থাকা উচিত। সে সময়ে সেই দূষিত শুক্র শোনিতে পুত্র জন্মাইলে পুত্র অসুস্থ ও অল্পায়ু হয় এবং পিতা মাতার শারীরিক বিশেষ ক্ষতি হয়। কিন্তু এখন কয়জন এ নিয়মের বশবর্ত্তী?

আয়ুর্ব্বেদ পুত্র জন্মাইবার পূর্ব্বে শুক্রবৃদ্ধিকারক শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তিদায়ক আহার ও আচারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ বলেনঃ—"আহারাচারচেষ্টাভি র্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ, স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ।" 'স্ত্রী পুরুষে যেরূপ আহার

আচার প্রভৃতি করে, তাহাদিগের পুত্রও তদনুরূপ হয়! সুতরাং পুত্র জন্মাইবার পূর্ব্বে দম্পতীর আয়ুর্ব্বেদের বশবর্ত্তী হইয়া চলা উচিত। পরে গর্ভদোহদ—পূর্ব্বে ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ গর্ভবতী কামিনীর শরীর পালন জন্য এক এক জন বিজ্ঞ বহুদর্শী বিদ্বান্ চিকিৎসক রাখিতেন—চিকিৎসক মহোদয় সন্তান-পুষ্টিকর জরায়ু-প্রকৃতি-সম্পাদক বল-বৃদ্ধিদায়ী গর্ভদোহদ সকলের ব্যবস্থা করিতেন, সুতরাং গর্ভিণী ও সন্তান সবল সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী হইত। চিরকালীন প্রথা, সাধারণ লোক মাত্রেই সমাজের উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের অনুকরণ করে; তৎকালেও সাধারণ লোকে তাঁহাদিগের অনুকরণ করিত, সুতরাং তাহাদের চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইত না। পূর্ব্বে প্রসূতি ও সন্তান পালন-ক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদের মতে সম্পাদিত হইত, শিশুর পানীয় স্তন্য দুগ্ধের বিশেষ পরীক্ষার পর স্তন্য দুগ্ধের সংশোধক ভেষজ সকল প্রদত্ত হইত। আয়ুর্ব্বেদ এ সকল বিষয়ে স্পষ্ট পরিষ্কার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করিলে কেন রুগ্ন সন্তানে ভারত পরিপূর্ণ হইবে?

পরে স্বাস্থ্যরক্ষা,—পূর্ব্বে লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রণালী সমস্তই ধর্ম্মের সহিত সংযোজিত ছিল, কারণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই বলে পাপ ব্যতীত রোগ হয় না। চৌর্য্য, প্রাণিহত্যা প্রভৃতিই যে পাপ তাহা নহে। অক্ষুধায় আহার, অহিত আহার, অকর্ত্তব্য করণ, অনশন প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার বিপরীত কার্য্য সমূহ পাপের কারণ। পূর্ব্বে লোকের ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, সুতরাং অনেকেই ধর্ম্মের রক্ষণোদ্দেশে পাপের ভয়ে স্বাস্থ্যহানিকর কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না; মুনিদিগের বাক্য, বেদবাক্য সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন কর্ত্তব্য, বিচার নাই, অন্যায় তর্ক নাই! আর এখন প্রত্যেক কথাতেই তর্ক, প্রত্যেক কথাতেই অবিশ্বাস! প্রাচীন মুনিগণের "কলৌ পঞ্চসহস্রাব্দে কিঞ্চিন্ন্যূনে দ্বিজর্ষভাঃ, ম্লেচ্ছানীকাঃ শ্বেতবর্ণাঃ শুভ্রবস্ত্রোপশোভিতাঃ, সম্ভবন্তি মহীপালা কলৌ বৈ বেদনিন্দকাঃ" 'কলির পঞ্চ সহস্র বৎসরের কিঞ্চিন্ন্যূনে, শ্বেতবর্ণ বস্ত্রমাত্রোপশোভী বলী ম্লেচ্ছ সমূহ নৃপতি হইবে, কলিতে বেদের নিন্দা হইবে,' প্রভৃতি ভবিষ্যৎ বাক্য প্রত্যক্ষ হইলেও প্রত্যেক পদে পদে দোষ অন্বেষণ আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়াছে। মুনিরা বলিয়াছেন, আমরা যদি বিশ্বাস করি তবে কি এই পাশ্চাত্য-সভ্যতা-অসদনুকরণ-জ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত ভারতে হাস্যাস্পদ হইব না? আমরা যদি প্রাচীন মতের পক্ষপাতী হই, তবে কি এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজে ঘৃণিত হইব না? এ সময়ে সেই প্রাচীন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আমরা রক্ষা করিতে কখনই পারিব না! পক্ষান্তে দেহ

সরস হয়,—সে সময়ে অর্থাৎ একাদশীতে অবস্থা বিবেচনায় উপবাস বা লঘুভোজন সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য জানিতেছি, তবু যদি আমরা সে নিয়মের পক্ষপাতী হই, কখনই সভ্য বলিয়া—উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব না! সুরাপান—অপরিমিত সুরাপান—অস্বাস্থ্যের প্রধান হেতু। প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেক পক্ষে, প্রত্যেক দিনে দেখিতেছি সুরা আমাদের কত অনিষ্ট করিতেছে, তথাপি আমরা কি তাহার কুহকে মোহিত হই না? আমাদের প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসা শাস্ত্র মদ্য-বিষয়ে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তথাপি কি সে কথা গ্রাহ্য হয়? প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ সুরাকে বিষের তুল্য বলিয়াছেন,—কিন্তু যদি সুরা যুক্তিযুক্ত বিধিবিহিত পান করা যায়, তাহাতে অতুল ফল লাভ হয়!—আয়ুর্ব্বেদ—মদ্য সেবনের ব্যবস্থাস্থলে বিলাসিগণের ও বিধিবিহিত বিলাসের পোষকতায় লিখিয়াছেন,—

"কুসুমিত-লতোপগূঢ়ৈঃ প্ররূঢ়-নিরন্তর-নবাঙ্কুর-নিকর-রোমাঞ্চৈ-র্মধুকর-মধুর-ঝঙ্কার-শীৎকারৈ . র্মুক্ত-কণ্ঠ-কলকণ্ঠ-কূজিতৈর্দক্ষিণ-সমীরণসমুল্লাসিতপল্লব-কর-প্রচারৈস্তরুণ-তরুভিরুপক্রান্তরতিভি-রতি-শোভনেষু ভবনোপবনেষু উষা-কিরণ-পরাজিত-তাপদোষে প্রদোষে শৃঙ্গার-সমুচিতালঙ্কৃতি-কমনীয়-কামিনী-সেবিতং ললিতললনোপনীয়মান-সুরভি-রুচির-রূপ-রসোপদংশকং নাম পরিমিত-পলার্দ্ধ মধুপানং ন সুখয়তি?"

'প্রস্ফুটিত-কুসুমিত-লতাচ্ছন্ন কোরক-নিকরে রোমাঞ্চিত ভ্রমরের মধুরঝঙ্কারে শীৎকারান্বিত মুক্তকণ্ঠ কোকিলাদি পক্ষিগণের কলধ্বনিযুক্ত দক্ষিণবাতে সমুল্লাসিত পল্লব-করান্দোলিত ক্রীড়োপযুক্ত তরুণপাদপযুক্ত মনোহর প্রমোদ উদ্যানগৃহে উষার কিরণে সুশীতল প্রদোষকালে শৃঙ্গার-সমুচিতালঙ্কৃত কমনীয় কামিনী সেবিত ললিতললনায় নীয়মান সুগন্ধি সুদৃশ্য সুরস চারিতোলা-পরিমিত সুরাপান কি সুখ জন্মায় না?'—এই প্রণালী বিলাসিগণের আনন্দ-কর অথচ স্বাস্থ্যরক্ষাকারক! আজকাল অনেক বাবু উপাধিধারী আমোদ-লোলুপ বাগানে সুরাপানে বেশ্যার কুৎসিত আমোদে মত্ত হয়েন, হয় তো তিন চারি দিন আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল সুরাই উদর পূর্ণ করিতেছে, আমোদ কত! প্রায়ই যে কয় জন একত্রে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলে একত্রে আসিতে পারেন না; কেহ রাজ-কারাগারে, কেহ চিকিৎসালয়ে, কেহ বা জল-প্রণালীর মধ্যে আমোদে মত্ত! যাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাঁহাদের মলিন বেশ, ম্লান বদন, পরস্পর মনোমালিন্য! কেন?—চারি তোলার স্থানে চারিসের, প্রদোষস্থলে অহোরাত্রেও তৃপ্তি হয় নাই, তাহার ফল! হিন্দু-চিকিৎসা শাস্ত্র বলে নাই, উপদেশ দেয় নাই—সুরাপানে কলঙ্ক

মাথ, নর-পিশাচ হও, একটি জন্তু হও! হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র বারংবার বলিয়াছে সুরা সময়ে—যথাকালে—স্বল্প-মাত্রায় পান করিতে চাহ করিও, কিন্তু সাবধান মাতাল হইও না। জন্মের মত স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিও না। পানাত্যয় পরমদ প্রভৃতি রোগের গ্রাসে পড়িও না! প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ সুরাপানের ব্যবস্থা স্থলে বলিয়াছেন পলান্ন, স্নিগ্ধ মাংস প্রভৃতির সহিত সুরাপান কর্ত্তব্য। মদ্য পানে চারি অবস্থা ঘটে, প্রথম অবস্থায় বুদ্ধি, স্মৃতি ও প্রীতি করে; পান, আহার নিদ্রার ও রতি-শক্তির বৃদ্ধি করে; পাঠে আসক্তি এবং গীত-শক্তির ও স্বরের বৃদ্ধি করে! দ্বিতীয় অবস্থায় বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি পায় না, স্মৃতি শক্তির ভ্রংশ, বাক্যের জড়তা হয়, উন্মত্তের ন্যায় আচরণ ঘটে, অশান্ত হয়, আলস্যের বশীভূত ও নিদ্রাহীনতা ঘটে। তৃতীয় অবস্থায়,—অগম্য গমন, গুরুজনের অবাধ্যতা, অভক্ষ্য ভোজন, জ্ঞানের ধ্বংস ঘটে, এবং হৃদয়স্থিত গোপনীয় কথা—অবাচ্য কথা সকল বলে। চতুর্থ অবস্থায়,—ভগ্নকাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থাতে পতিত থাকে! এই প্রথম অবস্থার সুরাপান ব্যতীত সকল অবস্থারই সুরাপানই স্বাস্থ্যের বিরোধী, সুতরাং অকর্ত্তব্য। কিন্তু এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, সুরার মোহিনী শক্তিবলে যত পান করিবে ততই পিপাসা বৃদ্ধি করিবে! এই জন্যই মুনিরা—ভবিষ্য-বক্তা আর্য্যকুলতিলক মুনিরা—সুরাপান বিধিমতে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। মনু—মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ মনু—সুরাপানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন! কিন্তু তাহা ভারতের অবনতি রাক্ষসী পাশ্চাত্য সভ্যতা শুনিতে দেয় কৈ? হিন্দু-চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যে, সুরায় উন্মাদ উৎপাদন করে। যে সুরা-পান জ্ঞানের ভ্রংশ উৎপাদন করে, তাহা পান করা—আর হিংস্র-পশু-সঙ্কুল বনে গমন করা সমান! ১

আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র—সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে উত্থান, মলমূত্রত্যাগ, মুখপ্রক্ষালন, ব্যায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা সকল সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,—অন্য কি, কি কি কাষ্ঠের দন্তকাষ্ঠ হওয়া উচিত, কাহার দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, কি কি ধাতুর কিরূপ জিহ্বা নির্লেখন (জিব ছোলা) হওয়া ব্যবস্থেয়, কাহার কাহার ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য, সকল তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ ব্যায়ামের বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন, যে টুকু ব্যায়াম করা উচিত, যে যে অবস্থায় যে যে রোগীর যে যে প্রকৃতির ব্যায়াম নিষিদ্ধ, তাহা বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছেন, আমাদের প্রাচীন আর্য্যজাতির গৌরব চিকিৎসা শাস্ত্র বলে নাই, তুমি ধনী, বেলা দশটার সময় উঠিবে, নড়িবে না, একপাও চলিবে না, অহোরাত্র শয্যায় উপাধান অবলম্বনে (তাকিয়া ঠেস দিয়া) থাকিবে। তুমি

চিরকালীন অস্বাস্থ্য-পরম্পরা বৃদ্ধির উত্তেজনা করিবে। আয়ুর্ব্বেদ প্রত্যেক ধাতুর,প্রত্যেক সময়ের,প্রত্যেক অবস্থার, ভিন্ন ভিন্ন আহার, আচার, ব্যবহার, স্নানের জল, নিদ্রা, সকল বিষয়েরই সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। বিশেষরূপে সূক্ষ্মরূপে বুঝাইয়াছেন, তোমার যাহা স্বাস্থ্যকর, অন্যের তাহা সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর, তোমার প্রকৃতি যেরূপ তুমি সেইরূপ কর, আর অন্যের প্রকৃতি যেরূপ তিনি সেইরূপ করুন। ইংরাজ—শীত প্রধান দেশীয় ইংরাজ—মদ্যমাংস ভোজনে, চা সেবনে, বল ও স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন। তুমি যদি সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হও, সেইরূপ আচার ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই জন্মের মত স্বাস্থ্য হারাইবে, নিশ্চয়ই তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল সূত্র, বায়ুর হিত ও অহিত জানিয়া তাহার সেবন ও ত্যাগের দ্বারা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ। সুতরাং ইহা সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে, আমাদের প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদের মতে যদি কেহ স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান্ থাকেন, নিশ্চয়ই তিনি স্বাস্থ্যলাভ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিতে হইলে দীর্ঘ প্রস্তাব হইয়া পড়ে, তাহাতে পাঠক মহোদয়গণের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা, সুতরাং এ আলোচনা ত্যাগ করিতে হইল, যদি কখন এ বিষয়ের ভিন্ন প্রস্তাব পাঠক মহাশয়দিগের নয়নগোচর হয়, তবেই এ সম্বন্ধে প্রাচীনতম হিন্দু চিকিৎসায় চিন্তাশক্তির পরিচয় পাইবেন।

আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র "দেশকালং বয়োবীক্ষ্য" দেশ কাল ও বয়স বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া চিকিৎসককে চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক পীড়ায় ঔদ্ভিজ্জ, ধাতু-সংঘটিত, রাসায়নিক, প্রাণ্যঙ্গজ ভেষজের কল্পনা করিয়াছেন, প্রত্যেক পীড়ার আভ্যন্তরীণ সাত্ত্বিক বাহ্যিক দৃষ্টির ভিন্ন-ভিন্ন কারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন,রোগের সমূল বিনাশের ঔষধ সকল উপদেশ দিয়াছেন, আমাদের দেশের লোকের সমস্ত অবস্থার সহিত, প্রকৃতির সহিত ঔষধ সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; সুতরাং এই দেশীয় উন্নত চিকিৎসায় এদেশের লোকের যেরূপ উপকার হইবে, বিদেশীয় নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল উন্নতোন্মুখ চিকিৎসায় কখন সে ফল, সে উপকার লাভ হইতে পারে না। এখনও অনুসন্ধান করিলে প্রত্যক্ষ হইবে, যেখানে বিদেশী চিকিৎসা প্রবেশ করে নাই, সেখানে স্বাস্থ্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল। কাবুলে স্বদেশীয় চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব, বিদেশীয় চিকিৎসা এখনও আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই, সুতরাং সেখানে আমাদের দেশের অপেক্ষা শতগুণে স্বাস্থ্যের উন্নতি।

এখন অনেকে বলেন বটে, প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা—দেশীয় চিকিৎসা—ইংরাজি চিকিৎসাপেক্ষা পুরাতন পীড়ায় অধিক ফলপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু নূতন জ্বর প্রভৃতিতে কখনই ইংরাজি চিকিৎসার সমকক্ষ নহে! স্বীকার করি,—ইংরাজি চিকিৎসা বাহ্য দৃষ্টিতে নূতন পীড়ায় আশু-ফলদায়িনী। আজ জ্বর হইল, আজই জ্বরমগ্নের সাহায্যকর ঔষধ প্রদত্ত হইতে লাগিল, কাল জ্বরের মগ্নাবস্থা পাইবা-মাত্র জ্বরবন্ধকারক অমোঘ অস্ত্র কুইনাইন (Quinine) দেওয়া হইল। জ্বর যদি তাহাতেও পাঁচ সাত দিন অপেক্ষা না করিতে পারিয়া পুনরায় আইসে, তৎপরে জ্বর মগ্ন হইলে আর জ্বর হইবে না, এবার জ্বর আরোগ্য হইল! আর রোগীর আহার যথেচ্ছা চলিতে লাগিল! প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসা—দেশীয় চিকিৎসা—তাহা পারে না। আজ জ্বর হইয়াছে,—উপবাস কর, ঔষধ নাহি। চিকিৎসক জ্বরের রসাবস্থা যতক্ষণ না যাইতেছে, আমরস যতক্ষণ না পরিপাক হইতেছে, রসপরিপাকের সাহায্যকর গোমূত্র প্রভৃতি ব্যতীত কোন ঔষধ দিতে পারেন না, ঔষধের কথা বলিলে—"ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরং।"—"জ্বরের আমাবস্থায় ঔষধ অপকার করে" বচন শুনাইতেছেন। রসক্ষয় হইল, তখন জ্বর নাশের চেষ্টা। যে জ্বর ইংরাজি চিকিৎসায় পাঁচ দিনে আরোগ্য হইত, নানা আহারীয় দ্রব্য প্রদত্ত হইত, সে জ্বর ছয় দিন—আটদিন—দশদিনে গেল, সপ্তম দিবসে মুগের কাথ ব্যবস্থা হইল; আর উপবাস!—"সর্ব্বমেব নবজ্বরী!" নূতন জ্বরী জগতের সকল দ্রব্য ত্যাগ করিবে, পথ্য—উপবাস! কে এ কথায় শ্রদ্ধা করিবে?—কে এ কথায় নির্ভর করিবে? ডাক্তারি চিকিৎসা,—আনারস খাও, কমলালেবু খাও,—লিমনেড খাও, দুগ্ধ খাও, যাহা ইচ্ছা একটু একটু খাও! রোগী দুর্ব্বল না হয় ডাক্তার বাবুর হুকুম! আর কবিরাজ মহাশয়,—দুগ্ধ,—বাপরে! নবজ্বরে দুগ্ধ বিষ! "জীর্ণে জ্বরে কফে ক্ষীণে দুগ্ধং স্যাদমৃতোপমং, তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং।" কে এ কথায়—কে এ চিকিৎসায় নির্ভর করিবে? কিন্তু দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসী, হত-ভাগ্য হিতাহিত বিবেকবিমূঢ় ভারত-বাসী যদি একবার সেই প্রাচীন ভার-তের, যখন এদেশে কেবল হিন্দুচিকিৎসার প্রাদুর্ভাব ছিল তখনকার, আর আধুনিক ইংরাজি চিকিৎসা-প্রবল ভারতের অবস্থা তুলনা করেন, নিরপেক্ষ চিত্তে পর্য্যালোচনা করেন, তবে বুঝিবেন, এই নূতন চিকিৎসার কি ভয়ানক শোচনীয় ফল ফলিতেছে! হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্র বলিয়াছে,—"দোষোঽল্পোঽহিতসম্ভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ, ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরান্"—জ্বর-দোষ সম্পূর্ণ পরিপাক না হইতেই জ্বর বন্ধ করিলে সেই অবশিষ্ট দোষ পুনরায় অহিতাচারে বৃদ্ধি পাইয়া অন্যতম ধাতুকে

আশ্রয় করতঃ বিষম জ্বর উৎপাদন করে। সেই অমূল্য বাক্য প্রত্যেক স্থলেই প্রতিপন্ন হইতেছে। একবার জ্বর যাইল, আবার একমাস না যাইতেই জ্বর! ঠিক পূর্ব্বের মত জ্বর। ডাক্তার বাবু আবার আসিলেন, আবার জ্বর-মগ্ন কারক ঔষধ, আবার অমোঘ অস্ত্র কুইনাইন (Quinine)! সবই তাই। এবার পনের দিনও গেল না, পুনবায Relapse। পুনবায জ্বব। ক্রমশঃই ঘন ঘন পুনরাক্রমণ। শেষ প্লীহা, যকৃৎ, মেহ। রোগী শয্যাশায়ী। যদি বড় ভাগ্যবান্ হয়, চিররোগী হইয়া কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল, হয় তো প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে; কিম্বা ইহ জীবন হইতে অবসর লইয়া (Relapse's) "রিল্যাপ্সের' পুনরাক্রমণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। প্রাচীন কালে যখন ভারতে হিন্দু চিকিৎসা প্রবল ছিল, তখন কে এত প্লীহা যকৃৎ দেখিয়াছেন? জ্বর হইলেই যকৃৎ-দুষ্টি প্লীহার আক্রমণ কে শুনিয়াছেন? হিন্দু চিকিৎসায় একবার জ্বর যাইত, যাহা ইচ্ছা কর জ্বর আর শীঘ্র হইবে না, জ্বরের আরোগ্যের পর রোগীর অবশ্যই অধিক বল ও ক্ষুধা হইবে, শরীর গ্লানি শূন্য স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট হইবে। দশদিন উপবাসের পর চারিদিন আহার করিলেই পূর্ব্বের বল পুনরায় অধিষ্ঠান করিত। আর ইংরাজি চিকিৎসায় উপবাস নাই,—তথাপি জ্বর, আরোগ্যের পর বল মাত্র নাই, শরীর সম্পূর্ণ অসুস্থ। অধিক দিনের কথায় কায নাই, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্যোতিঃ এই ভারতকে আলোকিত করে নাই, যখন ইংরাজি চিকিৎসা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই, তখনকার অবস্থা স্মরণ কর, অনুসন্ধান কর—এই ভারতে জ্বর, প্লীহা, উদরাময়, যকৃৎ, রক্তপিত্ত, মেহ, যক্ষ্মা, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব কত ছিল, আর এখনইবা কত?

আমি বলিতেছি না,—ইংরাজি চিকিৎসা ঔষধ হীন, যুক্তিহীন,—ডাক্তারবাবুরা যমের দূত। এই মাত্র বক্তব্য--ইংরাজি চিকিৎসা আমাদের দেশের অনুপযোগী। ইংরাজি চিকিৎসায় ভেষজ্ সংগ্রহ অসম্পূর্ণ হইলেও অনেক ফলপ্রদ ঔষধ আছে, রোগের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব জানিবার অনেক উপায় আছে, বস্তি-কর্ম্ম প্রভৃতির ব্যবহার আছে, কিন্তু তাহা শীত-প্রধান দেশীয়, সেই দেশীয় মনুষ্যের প্রকৃতিতে পরীক্ষিত, সুরামাংসাহারী মনুষ্যের উপযোগী। আমরা সমশীত-গ্রীষ্মদেশীয়, ঔদ্ভিজ্জ আমাদের ভক্ষ্য, আমাদের কিসে উপকার হইবে? আবার যদি কোন বুদ্ধিমান্ বিবেচক ডাক্তার স্বীয় মতের পরিচালনা করেন, যুক্তিপথ অবলম্বন করেন, নিশ্চয়ই তিনি অপ্রতিষ্ঠিত হইবেন! আজ পাঁচ দিন হইল, জ্বর যাইল না,—অন্য ডাক্তার ডাক, রোগীর প্রত্যেক আত্মীয়ই পরামর্শ দিবে! সুতরাং ডাক্তারের অপরাধ কি? ইংরাজি-চিকিৎসা শাস্ত্রের দোষ

কি? দুর্ভাগ্য ভারতের সময়ের দোষ! হতভাগ্য বঙ্গবাসির অদৃষ্টের দোষ!!

ইংরাজি চিকিৎসায় জ্বরে একমাত্র সুরা ও মাংসের কাথ প্রধান বলকারক উষ্ণতা দায়ক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা কি তাহা পর্য্যালোচনা করে নাই? বিশ্ব-ভেষজ-সন্ধিৎসু হিন্দুচিকিৎসক তাহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সুরাপেক্ষা শত সহস্র ভেষজের আশু ফলদায়ক গুণ থাকায়, সকল জ্বরে সকল অবস্থায় সুরার প্রয়োগ অকর্ত্তব্য বিবেচনায়, তাহা পিত্তকর হেতু পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যখন আবশ্যক বিবেচনা হইয়াছে, ব্যবস্থা দিয়াছেন। সুশ্রুত জ্বরের নানা বিধ পথ্যের কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, "কফপিত্তপরীতস্য গ্রীষ্মেঽসৃক্-পিত্তিন স্তথা, মদ্য নিত্যস্য নহিতা যবাহুস্তমুপাচরেৎ। যূষৈরম্লৈ রনম্লৈর্বা জাঙ্গলৈর্বা রসৈর্হিতৈঃ, মদ্যং পুরাণং মন্দাগ্নের্যবান্নোপহিতং হিতং।"—কফ পিত্ত-বহুল রোগীর, রক্তপিত্ত-বাহুল্যের, গ্রীষ্ম কালে মদ্যপায়ীর, মন্দাগ্নিযুক্তের যবাহু অর্থাৎ যাউ হিতকর নহে, অম্লযূষের বা অনম্লযূষের বা জাঙ্গল মাংসের রসের সহিত যবান্নযুক্ত পুরাতন মদ্য দিবে। এই বচনের দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, তাঁহারা এ বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে ক্রটি করেন নাই। আবার বিষম জ্বরের চিকিৎসায় পথ্যের স্থলে বলিয়াছেন—"তাম্রচূড়স্য মাংসেন পিবেদ্বা মদ্যমুত্তমং।"—তাম্রচূড় পক্ষীর অর্থাৎ কুঁকুড়ার মাংসের সহিত উত্তম মদ্য পানও ব্যবস্থেয়। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, যাহার যেরূপ পীড়ার অবস্থা, তাহার সেইরূপ চিকিৎসা। আয়ুর্ব্বেদ—প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র—স্থূল অনুসন্ধান করিতেন না, সকল বিষয়েরই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়াছেন। অনেক অদূরদর্শী বলেন, এক্ষণে যে সকল রোগ নূতন নূতন হইতেছে, তাহা হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের নয়ন গোচর হয় নাই, যেমত ওলাউঠা বা বিসূচিকা বা *Cholera* কলেরা। সেটি নিতান্ত ভ্রান্তি! হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্র বিসূচিকার বিশেষ বর্ণন, বিশেষ চিকিৎসা লিখিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিসূচিকার অরিষ্ট লক্ষণটি এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"যঃ শ্যাবদন্তৌষ্ঠনখোঽল্পসংজ্ঞো
"বম্যর্দ্দিতোঽভ্যন্তর-জাত-নেত্রঃ।
"ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্তসন্ধি
"র্যায়ান্নরঃ স পুনরাগমায়॥"

যাহার দন্ত ওষ্ঠ নখ শ্যামবর্ণ হয়, জ্ঞান-অল্পতা, বমন যন্ত্রণা, স্বর ভঙ্গ, সন্ধি স্থল বিমুক্তের ন্যায় হয়, সেই বিসূচিকা-পীড়িত ব্যক্তি পুনরায় আসিবার জন্য অর্থাৎ তাহার আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই আমাদের প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে—হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রে—কি না সংগ্রহ হইয়াছে? বস্তি-কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া, অরিষ্ট আসব প্রভৃতি সুরার ও পঞ্চকষায় প্রভৃতি দ্রব দ্রব্যের আরকের নানারূপ

উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে!—কিন্তু অ-গৌরবে শনৈঃশনৈঃ সেই চিকিৎসার অবনতি হইতেছে! যে দিন ভারত বিজাতীয়ের হস্তগত, সেই দিন হইতেই আর্য্যজাতির অসাধারণ উন্নতির চিহ্ন সকল ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে। কেবল হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্রের অসাধারণ উপকার, অসামান্য মাহাত্ম্য, কিছুতে একেবারে নষ্ট পাইবার নহে বলিয়াই এখনও ম্লানভাবে ভারতে বিচরণ করিতেছে! যখন মুসলমান্ ভারতে একাধিপত্য করিতেছিল,—হিন্দুর সকল বিষয়ের ধ্বংসের চেষ্টা করিত, তখনও হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্র লোপ পায় নাই, সেই হাকিমী-যাবনিক-চিকিৎসার বহুল-প্রচার কালে আয়ুর্ব্বেদের-হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের-জ্যোতিঃ চারিদিক্ আলোকিত করিত, তখনও হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্র সাধারণের অসাধারণ ও অমূল্য উপকার করিত এবং দম্ভ সহকারে দেখাইত, যে জাতি যত কেন উন্নতি লাভ করুক না, কখন আর্য্যজাতির সমতুল্যতা, সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবে না!

আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে বলি—ভারত এক্ষণে অনেকাংশে উন্নত,—প্রাচীন ভারতের অপেক্ষা সহস্রাংশে উন্নত।—পাশ্চাত্য সভ্যতা দিন দিন বিস্তারিত হইয়া এই ভারতকে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে পরিচালনা করিতেছে!—কিন্তু আমরা—হতভাগ্য আমরা—দেখিনা, আমাদের কি অবস্থা!—কি উন্নতি করিতেছি। নূতন বিষয় উদ্ভাবন দূরে থাকুক, প্রাচীন মৃতপ্রায় বিষয়ের পুনরুদ্ধার করিতেও পারি নাই, করিতেও চেষ্টিত নহি! কখন যে হইবে সে আশাও নাই! অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত, বিদেশীয় মহাত্মা—বলিতেছেন,—হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্র ভারতের প্রাচীন গৌরবের সাক্ষী। ভারত-জাত দ্রব্যে, ভারত জাত অত্যুন্নত আয়ু-বিজ্ঞানে, ভারতের সকল চিকিৎসাপেক্ষা—বিদেশীয় দ্রব্যাপেক্ষা—অনেক উপকার হইবে, তথাপি আমাদিগের চৈতন্য নাই!—গুণ পক্ষপাতী যথার্থতত্ত্ব-সন্ধিৎসু রাজা আমাদের ভূপতি,-সকল বিষয়েই সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত হিন্দু-চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ে কি কখন সাহায্য করিবেন?—কখনই নয়!—দেশীয় উন্নতি বিষয়ে মনুষ্যের যে যত্ন হয়, কখনই বিদেশীয় বিষয়ে সে যত্ন হয় না!—এটি মনুষ্যের স্বাভাবিকী বৃত্তি! সুতরাং রাজা যতই উন্নতিসন্ধিৎসু হউন না কেন, যতই জ্ঞানী হউন না কেন,—ইংরাজি-চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য যে যত্ন করিবেন, এই হতভাগ্য বঙ্গবাসীর হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য সে যত্ন করিবেন না! যতই আয়ুর্ব্বেদের—প্রাচীনতম হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের গুণ তাঁহারা জানিতে পারিবেন,—ততই ইংরাজি চিকিৎসার পুষ্টি সাধন হইবে! আজ কুর্চ্চি, কাল বেল ক্রমশঃ শনৈঃ শনৈঃ আমাদের হিন্দু-চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে

গৃহীত হইয়া ইংরাজি-চিকিৎসার উন্নতি হইবে মাত্র।

আমরা হতভাগ্য,—বিদেশীয়ের অনুকরণ করিতেই ব্যগ্র। স্পষ্ট দেখিতেছি বিদেশীয় চিকিৎসা আমাদের বহুল অপকার করিতেছে, তথাপি তাহার পক্ষপাতী! স্পষ্ট জানিতেছি,—দেশীয় চিকিৎসাই আমাদের সমূহ উপযোগী, তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ! আয়ুর্ব্বেদ অনুসন্ধান করিয়া উচ্চশ্রেণীস্থ আমি দেখিতেছি কি—আয়ুর্ব্বেদে গো-মাংসের ভক্ষণ বিধি আছে!! হা মাতঃ ভারতভূমি,—আর কি তোমার সন্তানগণের কখন প্রকৃত উন্নতি হইবে?—আর কি কখন তোমার সন্তানগণের আর্য্যনামের গৌরবে চতুর্দ্দিক্ পূরিত হইবে? রে অসৎ-অনুকরণেচ্ছা! কখন কি তুই ভারত সন্তানের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভারতে প্রকৃত মঙ্গলের পথের বিঘ্ন অন্তর করিবি?—কখন কি তোর মায়ায় ভারতসন্তানগণ আচ্ছন্ন না হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের—প্রাচীন আর্য্যগণের—কীর্ত্তিসমূহ পুনরুদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইবে? কবে আমরা প্রাচীন আর্য্যগণের উন্নতির পরাকাষ্ঠা-পরিচয়দায়ক আয়ুর্ব্বেদের যুক্তি-পরম্পরা প্রচার করিয়া ভারতে স্বাস্থ্য পুনঃসংস্থাপন করিতে যত্নবান্ হইব? কবে আমরা ভক্তিভাবে বলিব—

"আয়ুর্ব্বেদোদিতাং যুক্তিং
কুর্ব্বাণাবহিতাশ্চয়ে।
পুণ্যায়ুর্ব্বৃদ্ধি-সংযুক্তা
নীরোগাশ্চ ভবন্তি তে।"*

বঙ্গীয় কবি।

(নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র।)

"Poetry is the helpmate of virtue,
A thing divine, come from Heaven direct."

আমরা গতবারে নবীনবাবুর কবিতার রুচি ও নীতি কত নীচ ও কলুষিত তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে আমাদিগকে হেমবাবুর রচনার রুচি ও নীতি সমালোচন করিতে হইবেক। কোন কোন পাঠক আমাদিগকে বলিয়াছেন যে হেমবাবু ও নবীনবাবুকে তুলনা করিয়া সমালোচনা করা আদৌ অসঙ্গত; কেন না উভয়ের মধ্যে এত প্রভেদ, একজন অন্যজন অপেক্ষা এত শ্রেষ্ঠ যে, এই

---

* হুগলি ইনষ্টিটিউসন্ নামক সভায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কুমার রায় কবিরাজ কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

প্রকার তুলনা করাতে হেমবাবুর অপমান করা হয় মাত্র। আমরা এই কথা স্বীকার করি না।

হেমবাবুর রচনার রুচি ও নীতি সমালোচনা করা প্রীতিপ্রদ কার্য্য। তাঁহার রুচি ও নীতি অতি উচ্চ ও অতি বিশুদ্ধ। তুমি তাঁহার পুস্তক পাঠ কর, দেখিবে মনেতে কেমন উন্নতভাবের উদয় হয়—দেখিবে পাপের প্রতি বিদ্বেষ, অত্যাচারের প্রতি ক্রোধ, সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা, দুঃখীর প্রতি দয়া, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা ও পবিত্রতার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয় কি না। আমরা যাহা লিখিলাম তাহার অণুমাত্রও স্বকপোলকল্পিত নহে, আবশ্যক হইলে তাহার প্রত্যেক কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। হেমবাবুর কবিতা, কখন বা বোধ হয় ধর্ম্মমন্দিরে বেদী হইতে পঠিত হইবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে—কখন বা বোধ হয় নির্ব্বাসিত ম্যাট্‌সিনির জ্বলন্ত হৃদয়ভেদী রচনাবলির ন্যায়, ভূতগৌরব-বিস্মৃত, সুষুপ্ত, অধীন জাতিদিগকে জাগরিত করিবার অভিপ্রায়ে রচিত হইয়াছে।

সমগ্র মানব জাতির দুঃখে যাঁহার হৃদয় ব্যথিত, স্বদেশের অধোগতিতে যাঁহার নেত্রে অশ্রুনীর নির্গত, হিন্দু-মহিলার ক্রন্দন ধ্বনিতে যাঁহার হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ, তাঁহার রুচি ও নীতির মহত্ত্ব ও পবিত্রতা দেখাইবার নিমিত্ত কি প্রয়াস পাইতে হইবেক?—মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডকিরণের প্রখরতার, শারদীয় পূর্ণেন্দুর মধুরিমার, অনন্ত আকাশের বিশাল বিস্তৃতির, অভ্রভেদী হিমগিরির উচ্চতার, অথবা অতলস্পর্শ জলধির গভীরতার প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক করে না। হেমবাবুর রুচির ও নীতির উচ্চতা ও বিশুদ্ধতারও প্রমাণ হয়ত অনাবশ্যক। কিন্তু জড় জগতের ক্রিয়া এবং অবস্থা যেমন সহজে সাধারণ লোকের উপলব্ধি হয়, অন্তর্জগতের তেমন হয় না; এই কারণে এতৎ-সম্বন্ধে কিছু লেখা নিতান্ত অনাবশ্যক না হইতেও পারে।

প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়াসক্তি, পাশব পিপাসা—যাহা নবীনবাবুর অনেক প্রণয়-কবিতাতে গাঢ়-ভাবে সংস্থিত তাহা—হেমবাবুর কবিতাতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। হেমবাবু কদাচিৎ যখনই দূষিত ইন্দ্রিয়-সম্ভূত সুখের উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই তাহার প্রতি পাঠকের ঘৃণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। তিনি, নবীনবাবুর ন্যায়, ইন্দ্রিয়-সুখ বর্ণনাতে বিমোহিত হইয়া, কুত্রাপি রুচি ও নীতি একবারে জলাঞ্জলি দেন নাই। কবিতাবলির মধ্যে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "হতাশের আক্ষেপ" সম্বন্ধে কোন কোন পাঠক কিছু আপত্তি করেন। তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। এখানে নায়িকা বিবাহিতা, নায়ক সম্ভবতঃ অবিবাহিত।—শৈশব হইতে তাহাদিগের প্রণয় হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কৈশোরে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত

রজনীতে, চন্দ্রতারকাখচিত চন্দ্রাতপের নিম্নে, একত্র দুইজনে কত সময় অতি বাহিত করিয়াছিলেন, নায়ক, তাঁহার প্রমদার মধুর মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, কতবার কত সুখময়ী আশাতে বিহ্বল হইয়াছিলেন। মুগ্ধা স্নেহশীলা সরলা নায়িকা কৌমারে কতবার বলিয়াছিলেন "তুমি আমার, আমি তোমার" আমি অন্য কাহারও হইব না। তৎপরে, দুষ্ট দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া; (নায়কের উক্তি)—

'লোক লজ্জা মান ভয়ে, মাবাপ নিদয় হয়ে
আমার হৃদয় নিধি -অন্যকারে সঁপিল'

অনন্তর বিবাহের কিছুকাল পরে একদিন আবার সাক্ষাৎ হইল—কিন্তু তরুতলে চন্দ্রালোকে;—

"এইরূপে চন্দ্রোদয় গগন তারকাময়,—
নীরব মলিনমুখী ওই তরুতলে রে"

আপত্তি এই স্থানে। বিবাহিতা স্ত্রীর, অভিসারিকার ন্যায়, পর পুরুষের সহিত রাত্রিতে তরুতলে গোপনে সাক্ষাৎ। হাঁ, বিবাহিতা স্ত্রী—অন্যায়—অবিবেচনার কার্য্য। কিন্তু দেখা যাউক, এই সাক্ষাতের সময় এমন কিছু ঘটিয়াছিল কি না যাহাতে লেখক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। নায়কের উক্তি,—

সে দেখে আমার পানে,
আমি দেখি তার পানে,
চিত হারা দুই জনে বাক্য নাহি সরেরে;

কতক্ষণে অকস্মাৎ "বিধবা হয়েছি নাথ"
বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়েরে।

এই সাক্ষাতে প্রথমে উভয়েরি বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া যাইল। কতক্ষণ পরে নায়িকার এইমাত্র বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল "বিধবা হয়েছি নাথ"। ইহার অর্থ কি? এখন নায়িকার নিকট নায়ক মরিয়া যাওয়া ও বাঁচিয়া থাকা সমান; অন্যের সহিত বিবাহ হওয়াতে নায়িকা নায়ককে ইহ-জীবনের মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পরে নায়ক বর্ণনা করিতেছেন,—

বদন চুম্বন করে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে
শুনিলাম মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলে রে,
ছিলাম তোমার আমি, তুমিই আমার স্বামী'
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাইবেন তোমারে"

এখানে চুম্বন করাটি কেহ কেহ বলিবেন আর একটি অন্যায় কার্য্য। কিন্তু কি অবস্থায় চুম্বন? যখন প্রাণসারভূতা ললনা মূর্চ্ছাতে ভূতলশায়িনী। তাহার পর শীঘ্রই নায়িকার সংজ্ঞা সঞ্চার হইল। তখন তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন

"ফিরে জন্মে প্রাণনাথ পাইবেন তোমারে"

অর্থাৎ এ জন্মে নহে, এজন্মে তোমার সহিত এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ। আর একটি দ্রষ্টব্য, এই কবিতার কোন স্থানে ইন্দ্রিয়াসক্তির আভাস নাই। শারীরিক সৌন্দর্য্যের পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। তথাচ বর্ণনা কেমন উজ্জ্বল ও কেমন ভাবময়। এই প্রেম সম্পূর্ণ মানসিক। ইহাতে

বদন চুম্বন আছে কিন্তু "অধর মদিরা" পান নাই, "মদালস চারিচক্ষু" নাই, আরও নবীনবাবুর অনেক প্রিয় শব্দ নাই।

হেমবাবুর "উন্মাদিনী" দেখ। এই রমণী প্রেমনৈরাশ্যে উন্মাদিনী। ইঁহাতে কেমন গাম্ভীর্য্য, কেমন মাধুর্য্য, কেমন মাহাত্ম্য, প্রেমের কেমন উচ্চ আদর্শ, ও ইন্দ্রিয়াসক্তিবিহীনতা, রমণীহৃদয়ের কেমন মহিমা কীর্ত্তন।

✓ এক্ষণে হেমবাবুর বৃত্রসংহারের প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। যখন সুমেরু মন্দাকিনী নন্দনকানন সমেত অমরাবতী অধিকার করিয়া দানবরাজ বৃত্র দেবতাগণকে দূরীভূত করিল, দেবতাদিগের মধ্যে কেবলমাত্র কন্দর্প স্বর্গে থাকিলেন। ইহাতে সাধুদর্শী কবি অমরকুলের মধ্যে কন্দর্পকে ন্যায়তঃ সর্ব্বাপেক্ষা নীচস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কন্দর্প ইন্দ্রিয় সুখের মূর্ত্তিমান্ বিকাশ। ইন্দ্রিয় ভোগরত ব্যক্তি বা জাতি, যেখানেই ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা চরিতার্থ হইবেক সেখানেই অবস্থান করিবেক। ব্যক্তিগত বা জাতিগত মর্য্যাদার প্রতি দৃক্‌পাতও করিবে না। মহতী চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। চিরশত্রুর পদলেহন করিয়াও যদি সে আপনার ইন্দ্রিয়সুখ নিরাপদে ভোগ করিতে পারে, তাহা হইলে সে তাহাতেও আপনাকে ধন্য মনে করিবেক। ইন্দ্রিয়-সুখই তাহার সর্ব্বস্ব। তাই, যখন নৈমিষারণ্যে শচীসহচরী চপলা কন্দর্পকে ধিক্কার দিলেন, তখন আত্মমর্য্যাদাহীন কন্দর্প নির্লজ্জ-ভাষায় বলিল,

"ছাড়িয়া নন্দনবনে, কোথায় সে ত্রিভুবনে
যুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।
কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা,
না পাইব গিয়া অন্যস্থান ॥"

অন্যদিকে, গন্ধর্ব্ববালা ঐন্দ্রিলা বাসনাময়ী, কুটিলা, পরশ্রীকাতরা, যৌবন-গর্ব্বিতা; এবং দুর্জ্জয় দৈত্যপতি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ মস্তিষ্কহীন বাহুবল। সেই নিমিত্ত যখনই ঐন্দ্রিলার কোন স্বকার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবেক, তখনই তিনি তাঁহার রূপের হাট পাতিয়া বসিতেন; বিপুল পরিশ্রমে বৃত্রকে পরাজয় করিতে হইলে তাঁহার প্রধান সহায় কন্দর্প, প্রধান অস্ত্র পুষ্পবাণ। নিক্ষেপে স্বয়ং রতিপতি অপেক্ষাও তাঁহার কৌশল অধিক। এখন বলি, নীচাশয়, বিলাসময় কন্দর্প যখন স্বর্গের একেশ্বর দেবতা, এবং বাসনাময়ী, সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা, পুষ্পবাণ-নিক্ষেপ-চতুরা ঐন্দ্রিলা যখন ত্রিদিবের রাজমহিষী; এবং দুর্দ্ধর্ষ, ইন্দ্রিয়-সুখমত্ত দনুজপতি যখন স্বর্গের অধিপতি, তখনও স্বর্গের কার্য্য-পরম্পরার বর্ণনাতে হেমবাবু কেমন সুরুচির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিয়াছেন। দুইস্থানে মাত্র ঐন্দ্রিলার মোহনজাল বিস্তারের উল্লেখ হইয়াছে, দুইস্থানেই কাব্যের মূলঘটনা বিকাশের নিমিত্ত তাহার নিতান্ত আবশ্যক। ✓

প্রথমতঃ, দ্বিতীয় সর্গে। দেবতাগণ

দৈত্যকর্ত্তৃক স্বর্গচ্যুত হইয়া নিবিড় ধুমাচ্ছন্ন পাতালপুরীতে স্বর্গ আক্রমণ করা উচিত কি না এই লইয়া ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন; সেই সময়ে,

"হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দনভিতর,
পতিসহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,
দানবরমণী করিছে ক্রীড়া।
রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,'
বদন-মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া॥"

চতুর্দ্দিকেই ফুল; ফুলের মালা, ফুলের আসন, ফুলের পালঙ্ক, চারিদিকে অন্ন-ক্ষেত্রের ন্যায় ফুল-ক্ষেত্র; আর তাহা যে সে ফুল নহে, তাহা নন্দন-কুসুম—পারিজাত মন্দার প্রভৃতি। কন্দর্প স্বয়ং পুষ্প ফুটাইতেছেন। মূর্ত্তিমান্ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী সংগীত-পীযূষ বর্ষণ করিতেছে। আর,

"ভ্রমে রতিপতি সাজাইয়া বাণ,
কুসুম-ধনুতে সু-ঈষৎ টান,
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি"

আর, স্বর্গবিদ্যাধরীগণ মদনমোহনবেশে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। সংক্ষেপতঃ, সকলেই বিলাস-সরিত্তরঙ্গে ভাসিতেছে। বৃত্র ও ঐন্দ্রিলার এই নন্দন-কাননকেলি, "স্বর্গচ্যুতিতে" (Paradise Lost) আদম এবং ঈভের (Adam and Eve) সহবাস, "পালাশির যুদ্ধে" পাপাধিকৃত নবাবের শিবির-বিলাস, রেণলডস্ (Reynolds) রচিত "গূঢ়তত্ত্বে"(Mysteries) রাজ প্রাসাদে লম্পটচূড়ামণি রাজকুমারের (Prince of Wales) নর্ত্তকীগণের সহিত কৌতুক, "দুর্গেশনন্দিনীতে" উৎসবরাত্রিতে কতলুখাঁর আমোদ, "পম্পিয়াইনগরীর অবসানে" (The Last Days of Pompii) ক্রূর কামুক পণ্ডিত আর্ব্বেসিস (Arbases) কর্ত্তৃক আপিকাইতিস্-এর বিমোহন, "মেঘনাদবধকাব্যে' প্রমোদকাননে ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার ক্রীড়া, "গীত গোবিন্দের" রাসলীলা, ভারতের নায়ক-নায়িকার সম্মিলন, এবং বাইবণের ডনজুয়ান ও জুলিয়ার শয্যাগারে অভিনয়, এবং রোমিও ও জুলিয়েটের সংগীত—এই কয়েকটী বর্ণনাতে গ্রন্থকর্ত্তাদিগের রুচিগত কত প্রভেদ দেখ। আমাদিগের বিশ্বাস উল্লিখিত গ্রন্থকয়েকখানির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত গ্রন্থের, সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত স্থানেও কুনীতির অপেক্ষা নবীনবাবুর রচনার, পরিষ্কৃত—এবং তজ্জন্য অনেকের নিকট অধিকতর উপাদেয়, কুনীতি কম অনিষ্টকর ও ঘৃণার্হ নহে।

নবীনবাবু "পলাশির যুদ্ধে" নর্ত্তকী বিলাসিনীদিগকে না আনিলেও তাঁহার পুস্তকের মূলঘটনা অগ্রসর হওয়ার কোন বিঘ্ন হইত না। কিন্তু বৃত্র-সংহারের মূল ঘটনা, বৃত্রের মৃত্যু—ঐন্দ্রিলার বিলাসের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। ঐন্দ্রিলা বৃত্রকে ইন্দ্রিয়-সুখে মত্ত করিয়া, বিলাসসরিত্তরঙ্গে ডুবাইয়া, শচ্যবমাননা স্বরূপ স্বকার্য্য বৃত্রের দ্বারা সাধন করাইয়া লইল। মূঢ় বৃত্র কুহকিনী

ঐন্দ্রিলার হাব-ভাব বিলাস বিভ্রমে ডুবিল, সে যাহাই বলিল তাহাই মন্ত্র-মুগ্ধবৎ করিল, দেবরাজ মহিষীর অপমান করিল, কৈলাশশিখরে ধূর্জ্জটী ক্রোধে কম্পিত হইলেন, বৃত্রের কপাল ভাঙ্গিল। বৃত্রের নিপাতনের মূলে ঐন্দ্রিলার বিলাস। সেই বিলাসের শক্তি মাদকতা ও বিপদ বিশদরূপে চিত্র না করিলে, তাঁহার কাব্য পূর্ণাঙ্গ হইত না। এবম্বিধ বিলাস-বর্ণনাতেও, হেমবাবু তাঁহার লেখনীকে আশ্চর্য্যরূপে দমন করিয়া রাখিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, ষোড়শসর্গে। বৃত্রের আজ্ঞায়, ইন্দ্রাণীকে কেশাকর্ষণ করিয়া, নৈমিষারণ্য হইতে বন্দিনীরূপে স্বর্গে আনয়ন করা হইল। কিন্তু মহেশের ক্রোধানল ব্যোমমার্গে ত্রিশূলাকৃতি ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। বৃত্র তাহা দেখিয়া ভীত হইলেন, তাঁহার চৈতন্য হইবার উপক্রম হইল, শচীর কারাবাস মোচন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ঐন্দ্রিলার বাসনা ও পণ শচী দাসী হইয়া তাহার পদসেবা করিবেন, সেই বাসনা এখনও পূর্ণ হয় নাই; তিনি দেখিলেন তিনি যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, বৃত্র তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন। তিনি আবার জাল ফেলিলেন, আবার বৃত্রকে মুগ্ধ করিবার আয়োজন করিলেন। তাহার আদেশে রতিপতি চারু নিকুঞ্জ রচনা করিলেন।

নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন ভিতর,
চারু শোভাময় মুনি-মোহকর;
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর; থর থর থর—
মঞ্জরী দোলে।

সুগন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ কাননে
সুমন্দ মারুত আনন্দিত মনে
ঢলিয়া ঢলিয়া মধুর নিস্বনে
ছুটিছে চৌদিকে—পড়িছে সঘনে
কুসুম কোলে॥

এই মাধুরীময় নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দানবমহিষী সহাস্যে সুদর্পণে স্বকীয় সৌন্দর্য্য-রাশি নিরীক্ষণ করিয়া, দৈত্য-নাথকে জয় করিবেন স্থির করিলেন। রণশ্রান্ত বৃত্র আসিতেছেন, কন্দর্পের নিকট সমাচার পাইয়া, অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে মৃণাল-ভুজ-স্পর্শ দান করিয়া লইয়া আসিলেন—

রুণু রুণু ধ্বনি কিঙ্কিণী নূপুরে—
আগু হৈলা ধনী ধীরে ধীরে ধীরে,
অদীঘল তনু এবে দৈত্যবরে—
বাঁধি ভুজ-পাশে—চারু অঙ্গ ঝরে
শশাঙ্ক আলো।

নিকুঞ্জে প্রবেশ করিবামাত্র দৈত্য-রাজের রোমাঞ্চ হইল কবি বলিতেছেন—

প্রবেশি নিকুঞ্জে শিহরে দানব!
চারিদিকে মৃদু মধুর সুরব,—
যেন উথলিছে মাধুরী-অর্ণব
ঢলিয়া চৌদিকে!—মুকুল পল্লব,
অনঙ্গ শর।

তার পর, এই রমণী—ইয়াগো (Iago) কৌশলের সহিত বৃত্রের ক্রোধ উদ্দীপনা করিয়া দিয়া, তাহার প্রতি অন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিল।—

"দৈত্যরাণী বামা চতুর—
নিল ফুলধনু আপনার হাতে ;
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তাতে)
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাঁটু গাড়ি
(সাবাস সুন্দরি !) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎহাসি।

অব্যর্থ সন্ধান! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ পরাণ ;
ফিরিয়া দেখিল স্থিরসৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব-কামিনী
লাবণ্যরাশি॥

তখন বৃত্রের লঘু মস্তক ঘুরিতে লাগিল। আবার, সেই ঢুলু ঢুলু নয়ন, পঙ্কজ বদন—সেই বিম্বাধরের হাস্য মিশ্রিত ব্যঙ্গ। কতলুখাঁ অনেক মদ খাইয়াছে বিমলার ছুরিকা হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইবে? মহাবীর বৃত্র টলিল, ঐন্দ্রিলাকে বলিল—

"———তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র-সহচরী ;
যে বাসনা তব, তার দর্প হরি,
পুরাও মহিষি ;—ফণা চূর্ণ করি
আনো ফণিনী।"

অমনি,—

"হরষে উন্মত্ত হাসিলা ঐন্দ্রিলা ;
সুখে দৈত্যবরে আলিঙ্গন দিলা ;
চেড়ীদল সঙ্গে গরবে চলিলা
গজেন্দ্র গমনে ;—কটাক্ষে হানিলা
ঘোর দামিনী।

কেহ যেন না ভাবেন যে আমরা বাছিয়া বাছিয়া এখানে সর্ব্বোত্তম ও অতি বিশুদ্ধ স্থান গুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহার ঠিক বিপরীত। হেম-বাবুর যে সকল স্থান নীতি বা রুচি পক্ষে আপত্তিযোগ্য বোধ হইতে পারে, অর্থাৎ রুচি বা নীতি পক্ষে যে সকল স্থান দুর্ব্বল অনুমিত হইতে পারে, তাহাই এখানে, ন্যায়ের অনুরোধে, তুলিয়া দিলাম। এখন পাঠকগণ বিচার করুন, হেমবাবু এই সকল স্থানে কুরুচি বা কুনীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন কি না। আমাদিগের বিবেচনায়, তিনি বিশেষ কৌশল প্রকাশ করিয়া, উচিত স্থানে যবনিকা নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি সুরুচির সীমাবর্ত্তী হইয়াও সীমা অতিক্রম করেন নাই।

ক্লিওপ্যাট্রা যেমন মহাবীর আণ্টনিকে জয় করিয়াছিল, ঐন্দ্রিলাও বৃত্রকে সেইরূপ। অথবা ইয়াগো (Iago) যেমন প্রতাপশালী ওথেলোকেও রিপু-বিশেষ-উত্তেজিত করিয়া দিয়া, অন্ধ করিয়াছিল, আপনার বাসনা সিদ্ধ করিয়াছিল, এবং তাঁহার মৃত্যু সম্পাদন করিয়াছিল, এখানে ক্রূরা ঐন্দ্রিলাও আপনার সহিত মন্ত্রণা করিয়া, পূর্ব্বযোগে আয়োজন করতঃ, তাহার স্বামীর রিপু-বিশেষের উত্তেজন করিয়া দিয়া,

আপনার মনস্থ সফল করিয়া লইল, এবং বৃত্রের মৃত্যু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্পাদন করিল। তবে ঐন্দ্রিলা বামা, সৌন্দর্য্যাভিমানিনী, সদ্যজয়োল্লাসিতা, সুতরাং ইয়াগোর ন্যায় তাহার দৃষ্টি পরিষ্কার নহে, হৃদয় স্থির নহে, মন্ত্রণাজাল দুরাবগাহ নহে। কিন্তু উভয়েই নীচ, উভয়েই কুটিল, উভয়ই দয়াহীন, উভয়ই হন্তারক, উভয়ই চক্রান্তকারী—উভয়ই বিপুল-প্রমাদবিধায়ী।

রুচি ও নীতি সম্বন্ধে একটী কথা বক্তব্য যে, এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহাতে এমন একটী কথাও নাই যাহা পৃথক্ করিয়া তুলিয়া লিখিলে আপত্তি-যোগ্য বোধ হইতে পারে না। এই কথাটী পাঠকের সকল সময় মনে রাখা আবশ্যক। নবীনবাবু কেবল একটী আধটী অন্যায় শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া, আমরা তাঁহাকে দোষ দেই নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগের অভিযোগ তাঁহার লেখার মর্ম্ম, সাধারণ ভাব ও প্রবৃত্তি, সুরুচি ও সুনীতি বিরুদ্ধ। একটী আধটী কথা হয়ত হেমবাবুর পুস্তক হইতেও বাহির হইতে পারে, যাহা হঠাৎ দোষের বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার লেখার মর্ম্ম, সাধারণ ভাব, কত উচ্চ, কত নির্ম্মল তাহা পাঠক মনে করিয়া দেখুন।

আর একটী কথা এখানে আমাদিগের বলিয়া রাখা ভাল। আমরা নবীনবাবুর লেখার রীতি ও নীতি সম্বন্ধে যে তীক্ষ্ণ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে যেন কেহ না মনে করেন যে আমরা অতি-সাধুতা অবলম্বন করিতেছি। আমরা নারী-সৌন্দর্য্য-বর্ণনা বিরোধী নহি, অনাবৃত সৌন্দর্য্য-বর্ণনারও এক কালীন বিপক্ষ নহি। কিন্তু বিবস্ত্র সৌন্দর্য্য বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণনা করার কয়জনের ক্ষমতা আছে? নগ্ননারীদেহ প্রকাশ সাধারণতঃ অত্যন্ত আপত্তি-যোগ্য। কিন্তু আমরা আদম এবং ঈভের চিত্র দেখিয়াছি। তাহাদিগের দেহ আবরণহীন। কে বলিবে তাহা সুরুচি-বিরুদ্ধ? অন্য কেহ বলিতে পারেন, আমরা নহি। পাপশূন্যা, নিষ্কলঙ্কা ঈভের সেই পবিত্র দেহের স্বর্গীয় গৌরবময় সৌন্দর্য্য—এক দৃষ্টে দেখিয়াছি, তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, নির্ম্মেঘ চন্দ্রমার মধুরিমা, কিসলয়ের কোমলতা, নীহারবিন্দুর বিশুদ্ধতা প্রভাত পুষ্পের দেবত্ব অনুভব করিয়াছি—সেই চিত্র আপত্তিযোগ্য বোধ হয় নাই—তাহা সুরুচি; পিতা দুহিতায় লজ্জাবোধ না করিয়া, এক সঙ্গে দেখিতে পারেন। এখানে একটী ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদিগের মনে আসিল।

একদা এথেন্স নগরে প্লেটোশিষ্য সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী হাইপারাইডিস্ (Hyperides), ফ্রাইনি নাম্নী এক অভিযুক্তা নারীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি, তাঁহার প্রদর্শিতকারণ সমূহ ফলপ্রসূ হইল না দেখিয়া, সে বিষয়ে হতাশ হইলেন। তখন দৈববশাৎ

তাঁহার মনে একটী উপায় উদ্ভাবিত হইল। তিনি ফ্রাইনির গাত্রবসন ছিন্ন করিয়া তাঁহার অতীব বিচিত্র বক্ষদেশ বিচারকদিগের সম্মুখে উন্মোচন করিলেন, এবং বিচারপতিগণ তাহাকে মুক্তি দিলেন। এই নিষ্পত্তি যে সমুদয় গ্রীক জাতি অনুমোদন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে বিচারকগণ নিন্দিত স্পৃহায় প্রণোদিত হইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার বিষম ভ্রম। একজন ইতিহাস-লেখক ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অতীব মনোজ্ঞ ও অলৌকিক মাধুরীময় গঠন দেখিয়া বিচারকগণ তাহাকে অমানুষী, ও আফ্রোডাইট্ (Aphrodite) দেবীর পুরোধা ও ভবিষ্যদ্বক্ত্রী কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সভক্তিভয়োত্তেজিত হইয়া, বিশ্ব-নির্ম্মাতার সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ এই অপূর্ব্ব রচনা বিনাশ করা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। নীচপ্রবৃত্তি ব্যক্তি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীসে নীচপ্রবৃত্তি লোক ছিল না এমন নহে—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে গ্রীকগণ সৌন্দর্য্যকে বংশরক্ষানুকূল পৈশাচিক প্রলোভন স্বরূপ বিবেচনা না করিয়া তাহাতে স্বর্গীয় জ্যোতির উদ্ভাতি দেখিতেন, এবং শরীর বাহক-স্বরূপ হইয়া যে আত্মাকে অসীম ও অবিনশ্বর সৌন্দর্য্যে লইয়া যায় তাহাই মনে করিতেন*। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সৌন্দর্য্যের উচ্চ বিজ্ঞান সম্বন্ধে, সানন্দে যাহা গাইয়াছেন তাহা এই বিষয়ের সহিত সুন্দর মিলে। তাঁহারা বলিয়াছেন মানুষের আত্মা শরীর প্রাপ্ত হইয়া যখন সুরলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে আসিল, তখন স্বকীয় স্বর্গীয় আবাসের উদ্দেশে, ব্যস্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু জড় জগতের সূর্য্যের আলোকে, শীঘ্রই নির্জ্জীব হইয়া পড়িল, এবং প্রকৃত পদার্থের ছায়ামাত্র পার্থিব বস্তু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন ঈশ্বর, তাহাকে স্বর্গীয় সৎ সুন্দরভাব উপলব্ধি করাইবার নিমিত্ত, আত্মার সমীপে যৌবনের উজ্জ্বলতম মধুরিমা আনয়ন করিলেন। মনুষ্য রমণীতে এই সকল স্বর্গীয়ভাব দেখিয়া তাহার নিকট আগ্রহ সহকারে গমন করেন, এবং তাঁহার মূর্ত্তি, অঙ্গবিক্ষেপ ও প্রতিভা অনুধাবন করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করেন, কেননা যাহা সেই সৌন্দর্য্যে নিহিত আছে, যাহা সেই সৌন্দর্য্যের নিদানস্বরূপ, তাহারই সত্তা সেই সৌন্দর্য্য-দর্শনে অনুভূত হয়। †

* This anecdote has two versions which are given with all the authorities in Wagner's Edition of Alciphron vol. I p.178.

† "This agrees well with that high philosophy of beauty which the ancient writers delight in; for they said that the soul of man, embodied here on earth, went roaming up and down in quest of that other world of its own, out of which it came into this, but was soon stupified by the light of the natural sun, and unable to see

তাই বলি, নারীদেহের সৌন্দর্য্য অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ। এবং যে লেখক, বাসনাদীপ্ত কলুষিত লোচনে তাহার প্রতি তাকাইয়া, তাহা কলুষিত করেন, অথবা সেই সৌন্দর্য্য অপবিত্র প্রণয়েব সহিত সম্বন্ধ করিয়া তাহার অবমাননা করেন, তাঁহাকে, সমগ্র সমাজের একত্রীভূত ঘৃণার দ্বারা শাসন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীবোধেন্দু চক্রবর্ত্তী।

সোম-যাগের বিবরণ বা বিধি।

বেদের সময়ে দুই শ্রেণীর যজ্ঞ ছিল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, পুরো প্রভৃতি পিষ্টক আহুতি দিয়া এক প্রকার; আর সোমরস আহুতি দিয়া দ্বিতীয় প্রকার। প্রথম প্রকারের নাম "হবির্যজ্ঞ," দ্বিতীয় প্রকারের নাম "সোম-যজ্ঞ"।

হবির্যজ্ঞের পরে সোম-যজ্ঞ আবিষ্কৃত হয়। ইহার প্রমাণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবেক। অথর্ব্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষিই প্রথমে সোম-যজ্ঞ মনোনীত করেন।

হবির্যজ্ঞও অনেক প্রকার এবং সোম-যজ্ঞও অনেক প্রকার। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের প্রথম কাণ্ডে যজ্ঞসমূহের নাম আছে এবং ঐ বেদে তত্তাবতেব বিধি আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভাগে যাহা আছে তাহা কিছু বিস্পষ্ট। ফল,যজুর্ব্বেদের প্রচার সময়েই সমুদায় যজ্ঞের কার্য্যও করা আরম্ভ হয়, ঋগ্বেদের সময়ে কেবল অঙ্কুর মাত্র ছিল।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ১ কাণ্ড ষষ্ঠ প্রপাঠক, ৯ অনুবাকে যজ্ঞের নাম ও সৃষ্টির কথা আছে। যথা—

"প্রজাপতির্যজ্ঞানসৃজত। অগ্নিহোত্রং চাগ্নিষ্টোমঞ্চ পৌর্ণমাসীঞ্চোকনঞ্চামাবাস্যাংচাতিরাত্রং—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথমে যে হবির্যজ্ঞের কথা বলিয়াছি তাহা প্রধানতঃ ৭ প্রকার। যথা অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, আগ্রয়ণী, চাতুর্ম্মাস্য, পশুবন্ধ, ও সৌত্রামনী।

সোম-যজ্ঞও প্রধান কল্পে ৭ প্রকার। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম; এবং রাজ-সূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ এই সোম-যাগের মধ্যে গণ্য, কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণেরা করিতেন না।

এই সোম-যজ্ঞের অন্তঃপাতি অনেক প্রকার যাগ আছে। যত প্রকারই থাকুক, প্রথমোল্লিখিত অগ্নিষ্টোমই সকলের

any other objects than those of this world, which are shadows of real things. Therefore, the Deity sends the glory of youth before the soul, that it may avail itself of beautiful bodies as aids to its recollection of the celestial good and fair; and the man beholding such a person in the female sex runs to her, and finds the highest joy in contemplating the form, movement, and intelligence of this person, because it suggests to him the presence of that which indeed is within the beauty, and the cause of the beauty."—EMERSON's *Essay on Love.*

প্রকৃতি। সুতরাং বিশেষ বিশেষ প্রকারের অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় উক্ত হইত। সোমরস দ্বারা সাধিত হইত বলিয়া ইহাকে সোমযাগ বলিত।

এইরূপ প্রকারের সোম-যাগ আবার ৩ প্রকার। "অহীন" "সত্র" এবং "একাহ" যাহা এক দিনে সমাধা হয় তাহা "একাহ"।

২ হইতে ১২ দিন পর্য্যন্ত যজ্ঞ হইলে তাহার নাম "অহীন।"

১ পক্ষ কি বহুকাল-ব্যাপী হইলে সেই যজ্ঞের নাম "সত্র"।

সত্র আবার অনেক প্রকার "দীর্ঘ সত্র" ইত্যাদি।

সত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ পরে বলিব।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিবার সময়।

"বসন্তেঽগ্নিষ্টোমঃ।" (কাত্যায়নসূত্র) "বসন্তে জ্যোতিষ্টোমেন যজেৎ" (আপস্তম্ভ সূত্র)। সুতরাং বসন্ত কালই সোম-যাগ করিবার কাল, বসন্ত কালেই প্রচুরতর সোম পাওয়া যাইত, সুতরাং বসন্ত কালেই ঋষিরা সোম-যাগে প্রবৃত্ত হইতেন।

যোগ-যাগের দেবতা অগ্নি। অগ্নিরই স্তব করা যাইত বলিয়া অগ্নিষ্টোম (অগ্নেঃ স্তোমঃ স্তবনং ইত্যগ্নিষ্টোমঃ)। অগ্নির স্তোত্র ও পূজা করাই প্রধান উদ্দেশ্য, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বহু দেবতারও পূজা করা হইত।

এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যজ্ঞ-কার্য্যে পটু ও প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরাই নিযুক্ত হইতেন।

প্রথমে কোন পুণ্য ও লক্ষণ-যুক্ত ভূমি যজ্ঞ-ক্ষেত্রের জন্য অন্বেষণ করিয়া যজ্ঞ করা হইত। যেখানে সেখানে হইত না। পরে ক্রমে যেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় সেই স্থানই যজ্ঞের উপযুক্ত বলিয়া বিধি প্রচারিত হয়। ইহা শত-পথ ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডে দেখা যায়।

"তদ্ধহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো বার্ষ্ণ্যায় দেব-যজনং জোষয়িতুমৈম। তৎ সাত্য-যজ্ঞোঽব্রবীৎ সর্ব্বা বা ইয়ং পৃথিবী দেব-যজনং যত্র বা অস্যৈ ক্বচ যজুষৈব পরি গৃহ্য যাজয়েৎ।"

ইহার অর্থ এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যে আমরা এক সময়ে বার্ষ্ণের জন্য যজ্ঞোপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতেছিলাম, পথে সাত্যযজ্ঞের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন সকল স্থানেই যজ্ঞ হয়, তোমরা যথা ইচ্ছা, যেখানেই মন্ত্রলাভ হইবে সেই স্থানেই তোমরা বার্ষ্ণকে লইয়া যজ্ঞ কর।"

এইরূপ স্থান নিশ্চয় হইলে তথায় প্রথমতঃ একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইত। চারি সমান ৩ প্রত্যেক দিগে ১২ অরত্নি প্রমাণ। কনুই হইতে হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি মূল-পর্য্যন্ত অরত্নি শব্দের অভিধেয়। যাহাকে আমরা "মুষ্টমহাত" বলি অর্থাৎ এক হাত পূর্ণ নহে, সেই মুষ্টিবদ্ধ হস্তই অরত্নি। এই মণ্ডপটীর নাম "প্রাচীন বংশ"। ইহার চারিটী দ্বার থাকে, সুতরাং ইহাকে চতুর্দ্বার মণ্ডপও বলে। এই মণ্ডপের চারিদিক তৃণাচ্ছাদিত হয়।

উঠাইয়া সেই প্রাচীন-বংশ নামক যাগ-গৃহে পূর্ব্ব দ্বার দিয়া আনিয়া "আহবনীয়" নামক অগ্নি-কুণ্ডের দক্ষিণ দিকে এক খানি কাষ্ঠপীঠের (পিঁড়ি) উপর মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার উপর রাখা হয়। এই সময়ে একটী "অতিথ্যেষ্টি" নামক ক্ষুদ্র যাগ করা হয়। অর্থাৎ রাজা সোম গৃহে আসিয়াছেন সুতরাং যথোচিত অতিথি সৎকার করিতে হইবেক। ইহা ঠিক লৌকিক রীতিতে সম্পাদিত হয়।

পরে সোম-যাগের বিঘ্নকারী অসুর দিগের পরাভব কামনায় যজমান ৩ দিন পর্য্যন্ত "উপসদ" নামক ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে প্রাতঃ ও সায়ংকালে সোম ও বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাহুতির দ্বারা হোম করা হয়। তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুঃ সংহিতায় এই (উপসদ) যজ্ঞ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

দিনত্রয়-ব্যাপক "উপসদ" যজ্ঞের মধ্য দিনে সৌমিকী বেদি নির্ম্মাণ করা হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রাগ্বংশ শালার সম্মুখ ভাগে পাদত্রয়-পরিমিত ভূভাগ-ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে পশ্চিমে আয়ত ও বিস্তৃত। এই বেদিটীর বিতান দ্বারা উপরিভাগও চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত করা হয়। ইহার সম্মুখভাগের নাম "অংসা," আর পশ্চাৎ ভাগের নাম "শ্রোণী।" এই বেদির অংস প্রদেশের উত্তর ভাগে আয়তনে ১০ পদ পরিমিত এক বেদি রচনা করা হয়। ইহা অগ্নিহোত্র বেদীর সদৃশ। ইহার নাম উত্তর বেদী। এই বেদীর অংস প্রদেশের উত্তর ভাগে পূর্ব্ব পশ্চিম ১০ পদ আয়ত এক বেদী নির্ম্মিত হয়। ইহার আকার অগ্নিহোত্র বেদীর সদৃশ অর্থাৎ কৃশমধ্য। অনন্তর মহাবেদীর মধ্যভাগে শ্রোণী রেখা টানা হয়। মধ্য হইতে অংস পর্য্যন্ত একটি সুব্যক্ত রেখার নাম "পৃষ্ঠ্যা"। অপিচ মহাবেদির উত্তরাংশের পশ্চাৎ ভাগে ৩ পদ দূরে একটী গর্ত্ত খনন করা হয়। ইহাকে বৈদিকেরা "চাত্বালক" বলেন। এই চাত্বালক গর্ত্ত হইতে ১২ পদ দূরে অপর একটী গর্ত্ত করা হয় তাহার নাম "উৎকর"।

এই সমস্ত নির্ম্মাণের পর, অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা এই জলে "হবির্ধান" নামক দুইখানি শকট (গাড়ী) সেই উৎকর গর্ত্তে ধৌত করিয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া মহাবেদীতে আনয়ন করতঃ শ্রোণীর নিকটে রাখেন এবং সেই পৃষ্ঠ্যা নামক রেখার দক্ষিণ উত্তর পার্শ্বে একখানি শকট-মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ উত্তর ক্রমে ৩ অরত্নি এবং পশ্চিম দিগে ৯ অরত্নি পরিমিত ৪ কোণা (চতুরস্র) এবং ৪টী স্তম্ভ যুক্ত এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হয়। এই মণ্ডপের নাম "হবির্ধান মণ্ডপ।" পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ২টী দ্বার থাকে। বীরণ অর্থাৎ শর-পত্রের কট (মাদুর) দিয়া চারিদিক্ আচ্ছাদিত করা হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীরামদাস সেন।

বিশেষরূপ যোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিয়া যোগী সকল, পূর্ব্বে যে যে আসনের ও মুদ্রার বিষয় বলা হইয়াছে তদবলম্বন করতঃ, কিম্বা সামান্যাসনে উপবেশন করিয়া অগ্রে উপর্য্যুপরিভাবে নিজমেঢ্রের উপর অর্থাৎ শিশ্নের উপর বাম ও দক্ষিণ গুল্‌ফ রাখিয়া জানুসন্ধির উপর চিবুক রাখিবে। পরে পৃষ্ঠদেশ বিনমন করিবে। তৎপরে দন্তের উপর দন্ত রাখিবে কিন্তু উহা যেন অপ্রকাশ না থাকে এরূপ করিয়া নাভিদেশে বাম করের উপর দক্ষিণ করতল রাখিবে। এইরূপে অঙ্গ-সঙ্কোচ পূর্ব্বক ধ্যানে প্রবৃত্ত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।

অতঃপর সাত্বিক যোগী, পূর্ব্বে পবনাভ্যাসের যেরূপ কার্য্য বিধান বলা হইয়াছে সেই প্রকারে, ক্রমশঃ প্রাণবায়ুকে কুম্ভকের দ্বারা নিরোধ করতঃ জীবাত্মাকে নাসিকা ও ভ্রূযুগলের মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক হৃদয়-মন্দিরে বিশ্বরূপ পরমাত্মাকে সাকার কি নিরাকার ভাবে ভাবনা করিতে করিতে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল একেবারে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যাওয়ায় জ্ঞানালোক হৃদয়-মন্দির উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হওয়ায় যোগীর চক্ষু দিয়া অনবরত প্রেমধারা পড়িতে থাকে। এই প্রকারে ব্রহ্মযোগ সাধনা বিষয় মনকে অত্যন্ত আকর্ষণ করে; এ নিমিত্ত সাধুশীল যোগী ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া মনকে বিষয় হইতে অন্তরিত করিয়া হৃদয়-মধ্যে লইয়া ব্রহ্মপ্রকাশক চৈতন্য-স্বরূপ জ্যোতির সহিত সংযোগ করাইয়া একেবারে "সোঽহং" চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সিদ্ধ হইবেন। ইহাই সাত্বিক যোগীদিগের আচরিত যোগ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিমিশ্র-প্রকৃতিক ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ সত্যকে কেহ কেহ তপস্যা ও শৌচাচারকে কেহ কেহ ক্ষমা-সম প্রভাবে যোগীর হৃদয়াকাশে এমনি জ্ঞানালোক প্রভা প্রকাশ পায় যে যেন বোধ হয় কত সূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ যাঁহারা প্রথমে বৈধধ্যান-নিরত হইয়া চিত্তকে সুস্থির করিতে পারেন তাঁহাদিগেরই পরিণামে অনায়াসেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এরূপ সাক্ষাৎকার লাভ সাত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন যোগী ভিন্ন অন্যের ঘটে না, কারণ নিদারুণ বিষয়স্পৃহা তাঁহাদিগকে সদা সর্ব্বদা মোহিত করায় বিষয়-বিমোহিত ব্যক্তিরা আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে অনধিকারী। রজো ও তমোগুণাবলম্বীরা যদি জ্ঞানযোগসাধনা করেন তবে তাঁহাদিগের জ্ঞান আর কর্ম্ম উভয় ভ্রষ্ট হইয়া

থাকিতে হয়। এজন্য জ্ঞানদাতা মহেশ্বর সাত্ত্বিক-প্রকৃতি যোগীদিগের জ্ঞান-যোগ আর রাজসিক ও তামসিকদিগের কর্ম্মযোগ সাধনা করিতে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। যথা নারদ পঞ্চরাত্রি। নারদের প্রতি দৈববাণী।

অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসস্ততঃ কিং।
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসস্ততঃ কিং॥
আরাধিতো যদি হরিস্তপসস্ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসস্ততঃ কিম্॥

এই দৈববাণীর অর্থ সহজ কিন্তু ভাব অতি গভীর। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ইহা জানিবার জন্য দেবর্ষি নারদ বেদ-প্রণেতা আপন পিতা কমলযোনি ব্রহ্মার নিকটে গিয়া জানিলেন যে যে সাত্ত্বিক ও পরম শ্রদ্ধালু যোগী স্বীয় ভক্তিজ আত্মতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পরম পুরুষ নারায়ণকে স্বকীয় হৃদয়-মন্দিরে ও বাহিরে বিশুদ্ধ যোগদ্বারা সর্ব্বদা দেখিতেছেন তাঁহার আর তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে নিজ অন্তরে ও বাহিরে পরমাত্মাকে দেখিতে পাননা তাঁহাদিগেরই বা আত্মতত্ত্ব-প্রাপক তপস্যার প্রয়োজন কি? স্ব স্ব প্রকৃতিগুণে যাঁহারা নিরন্তর অন্তর্ব্বাহ্যে ভৌতিক বিষয় দর্শন করেন তাঁহারদিগের নিকটে বিশুদ্ধভক্তি ও জ্ঞান স্থান পায় না বলিয়া জ্ঞান যোগাভ্যাস করা বিফল।

আর যাঁহারা নিজ নিজ ভক্তি ও বিজ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষ হরিকে বিশেষরূপে আরাধিত করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদিগের পক্ষে অন্য কোন তপস্যার প্রয়োজন কি। আর যাঁহারা ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা হরিকে আরাধিত করিতে পারেন নাই তাঁহারা একান্ত বিষয়ী, তাঁহারা কেবল বিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহাদিগেরই বা জ্ঞানতপের প্রয়োজন কি। লোক পিতামহ পরমেষ্ঠি এইরূপ দৈববাণীর ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতএব মুক্তি লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্রহ্মে মনঃ সমাধান করা বিশুদ্ধচেতাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বাহ্য আর্জ্জবকে, কেহ কেহ দানকে, কেহ কেহ পিতৃকর্ম্মকে, কেহ কেহ স্বর্গার্থ সকাম কর্ম্মকে, কেহ বৈরাগ্যকে, কেহ কেহ গৃহস্থাশ্রমোচিত বৈধ কর্ম্মকে, কেহ কেহ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকে, কেহ কেহ মন্ত্রযোগকে, কেহ কেহ কেবল তীর্থানুসেবনকে আত্মজ্ঞান লাভের চক্ষুঃ বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। যাঁহারা এই সকল কর্ম্মমতকে অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যান তাঁহারা যথার্থ আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইয়া কেবল পুণ্য আর পাপ লাভ করতঃ অবশ হইয়া জন্ম মৃত্যুর বাধ্য হইয়া নিরন্তর সংসার-চক্রে অধিরোহণ করতঃ ঘুরিতে থাকেন। এতদ্বিষয়ে শিববাক্য যথা—

সত্যং কেচিৎ প্রশংসন্তি তপঃ শৌচং তথাপরে। ক্ষমাং কেচিৎ প্রশংসন্তি তথৈব সমমার্জ্জবং॥ ৪॥

কেচিদ্দানং প্রশংসন্তি পিতৃকর্ম্মতথা

পরে। কেচিৎ কর্ম্ম প্রশংসন্তি কেচিৎ বৈরাগ্যমুত্তমং॥ ৫॥

কেচিৎ গৃহস্থকর্ম্মাণি প্রশংসন্তি বিচক্ষণাঃ। অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম তথা কেচিৎ পরং বিদুঃ॥ ৬॥

মন্ত্রযোগং প্রশংসন্তি কেচিত্তীর্থানুসেবনং। এবং বহূনুপায়াংস্তু প্রবদন্তি হি মুক্তয়ে॥ ৭॥

এবং ব্যবসিতালোকে কৃত্যাকৃত্যবিদো জনাঃ। ব্যামোহমেব গচ্ছন্তি বিমুক্তাঃ পাপকর্ম্মভিঃ॥ ৮॥

এতন্মতাবলম্বী যোলব্ধ্বাদুরিতপুণ্যকং। ভ্রমতীত্যবশঃ সোঽত্র জন্ম মৃত্যু-পরম্পরাং॥ ৯॥

অন্যৈর্ম্মতিমতাং শ্রেষ্ঠৈ গু প্তালোকনতৎপরৈঃ। আত্মনো বহবঃ প্রোক্তা নিত্যাঃ সর্ব্বগতাস্তথা॥ ১০॥

শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান্ অপর ব্যক্তিগণ নিত্য সর্ব্বগত আত্মাকে বহুরূপবিশিষ্ট বলিযা জানেন॥ ১০॥

জ্ঞান-প্রবাহ ইত্যন্যে শূন্যং কেচিৎ পরং বিদুঃ। দ্বাবেব তত্ত্বং মন্যন্তেঽপরে প্রকৃতি পুরুষৌ॥ ১১॥

কেহ কেহ জ্ঞান-প্রবাহকে, কেহ কেহ শূন্যকে, কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষকে পরমাত্মা বলিয় জানেন॥ ১১॥

এতে চান্যেচ মুনয়ঃ সংজ্ঞাভেদাঃ পৃথক্‌বিধাঃ। শাস্ত্রেষু কথিতাহ্যেতে লোক-ব্যামোহ-কারকাঃ। ১৫॥

এতদ্বিবাদশীলানাং মতং বক্তুং ন শক্যতে। ভ্রমন্ত্যস্মিন্ জনাঃ সর্ব্বে মুক্তিমার্গ-বহিষ্কৃতাঃ॥ ১৬॥

এই সকল লোক—অর্থাৎ যাঁহাদিগের কথা উপরে বলা হইয়াছে—তাঁহারা আর অন্যান্য মুনি সকল ইহাঁরা নিজ নিজ শাস্ত্র দ্বারা যে সকল শাস্ত্র-সংজ্ঞা-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে সাধারণ লোকের মন বিশেষরূপে মোহিত করার, মহাদেব বলিতেছেন আমি সেই সকল বিবাদশীল ব্যক্তিদিগের মত বলিতে অশক্ত হইয়া এইমাত্র বলিতেছি যে ঐ সকল মত মুক্তি-পথের নিতান্ত বিরোধী প্রযুক্ত ঐ মতাবলম্বী লোকেরা নিরন্তর সংসারে যাতায়াত করিতে থাকেন। কোনরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ আত্মসাক্ষাৎকার করিতে পারেন না॥ ১৬॥

আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং তথা॥ ১৭॥

মনুষ্যের কিসে কি প্রকারে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জন্মিয়া আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে এইজন্য পরম দয়ালু জ্ঞানপ্রদাতা পরমযোগী শঙ্কর যাবতীয় আলোচনা ও তাহার বিচার করিয়া যোগশাস্ত্র প্রচার করিলেন। বিনাযোগে কেহই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও আত্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে নাই ও পারিবেন না॥ ১৭॥

এই যোগ-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া যিনি পরমাত্ম-জ্ঞান-লাভার্থ যোগ বিধি সকল আশ্রয় করিয়া যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন তিনিই ধন্য মান্য, তিনিই প্রকৃত পরমাত্মার উপাসক। যিনি স্বকীয়

জীবাত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন তিনিই পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন। "ব্যাপ্যজ্ঞানাৎব্যাপকস্যাপি সিদ্ধিঃ"। এই প্রমাণ। অতঃপর ষোড়শ যোগোপকরণ বলা যাইতেছে। হরিবংশ। প্রণব ১ অর্থভাবন ২ সত্যোক্তি ৩ প্রাবজপ ৪ পূর্ব্বস্মৃতি ৫ আচার ৬ অপানজয় ৭ ভাবী দুঃখের অনুধ্যান ৮।

যোগোপসর্গ।

(হরিবংশ।)

যোগোপসর্গ না জানিতে পারিলে যোগারম্ভ সময়ে কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে যোগী বিরক্ত অথবা ভীত হইয়া যোগ সাধনা পরিত্যাগ করিতেও পারেন; এজন্য অগ্রে সেই যোগোপসর্গ জানিতে পারিলে যোগ পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া যোগোপসর্গ লেখা যাইতেছে।

যোগীরা প্রথমতঃ চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সিদ্ধ করিতে পারিলেই দূর দর্শন দূর-শ্রবণাদি জ্ঞান অবাধে সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব যিনি সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গুণ রূপরসাদি পরিত্যাগ করতঃ সনাতন ব্রহ্ম বিষয় নিরন্তর অন্তরে চিন্তা করিতে না পারেন তাঁহার বিশুদ্ধ বৈরাগ্য উপস্থিত না হওয়ায় যোগ সিদ্ধি বিষয়ে গুরুতর বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। নবদ্বার-যুক্ত দেহ মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি কতকগুলি উপসর্গ আছে। ধীশক্তি বলে সেই উপসর্গ গুলিকে রোধ করিতে পারিলে দেহমধ্যে আশ্চর্য্য এক ব্রহ্মতেজের আবির্ভাব হয়। ঐ তেজ মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করিলে গাঢ়তর ধূমের আবির্ভাব হয়। ঐ ধূম নীল লোহিত পীত শ্বেত এবং মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ ও কপোতগ্রীবাকৃতিবর্ণ ও বিশুদ্ধ-বৈদূর্য্য-মণি পদ্মরাগমণি স্ফটিকবৎ ও নাগেন্দ্র-গাত্রোপম ইন্দ্রগোপকীট-বর্ণ চন্দ্রকিরণ-সদৃশ ও ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় নানাবর্ণ হয়। সেই বিবিধ বর্ণাত্মক ধূম মেঘের ন্যায় একেবারে গগনতল আবৃত করিয়া ফেলে। তাহাতে বোধ হয় যেন পক্ষবান পর্ব্বত উড্ডীন হইয়া গগনমণ্ডল আবৃত করিল। তাহার পর ঐ ধূম ঘনীভূত হইয়া সজল জলধরে পরিণত হইয়া ঘোরতর গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ বিকাশ করতঃ মুষলাকৃতি বারিধারা বর্ষণ করে। সেই বারিধারা সকল ভূগর্ভে প্রবেশ করে।

এইরূপে ধূমের অবসান হইলে সেই যোগিবরের মস্তক হইতে শত শত শিখা-বিশিষ্ট প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নির্গত হইতে থাকে। ঐ সময় আবার যোগীর গাত্র হইতে সহস্র সহস্র অগ্নিকণা বিনির্গত হইতে থাকে। তৎকালে বোধ হয় যেন প্রলয়াগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া দিক্‌দাহ হইতেছে। যত পরিমাণে জলধারা পতিত হইয়া ছিল তত পরিমাণে

অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকে। তৎপর পতিত জলধারা সকল প্রত্যেক অগ্নি-শিখার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি-জ্বালা শান্তি করে। এই প্রকারে উক্ত উভয়-বিধ উপসর্গের শমতা হইলে চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর হইতে থাকে। তৎপরে আবার প্রচণ্ড বায়ু উত্থিত হইয়া জল অনল প্রভৃতি মহাভূতের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ-সংজ্ঞা লাভ করে। উহার বেগ অতি প্রবল, নির্ঘোষ অতি ভয়ঙ্কর। এইরূপে ঐ জল ও অগ্নি ও বায়ু ইহারা একত্রিত হইয়া সহস্র সহস্র রূপ ধারণ করিয়া যোগীর ত্রাসোৎপাদন করে। ফলতঃ এতাবৎ বিভীষিকা সেই পরব্রহ্মেরই কার্য্য।

ইহার পর ঐ যোগীর নেত্রদ্বয় মধ্যে পরমাত্মার অবস্থান হয়। ঐ পরমাত্মা তৎকালে বিরাট ও সূক্ষ্ম নামে অভিহিত হন।

সুতরাং তৎকালে সেই যোগীই স্থূল সূক্ষ্ম ভূত প্রভৃতি সকল বস্তুর আধার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণের স্বরূপ হইয়া বিরাজ করেন। তখন যোগীর শরীরে কোন বিকার থাকে না বলিয়া তিনি যোগসিদ্ধ হন। যোগসিদ্ধ হইলে যোগীর শরীরে সুখ-দুঃখ-ভোক্তা যাবতীয় জীব প্রবিষ্ট হয়। তখন ঐ যোগীই সর্ব্বভূত-সমষ্টি হইয়া অবস্থান করেন। যোগসিদ্ধ হইলে সিদ্ধযোগী দিগের যেরূপ প্রকৃতি হয় অন্য লোক দিগের সেরূপ প্রকৃতি হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক বিকার নিবৃত্তি হইয়া আত্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্ম। ইঁহারাই জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা পরব্রহ্মকে দেখিতে পান।

পরব্রহ্ম সদত সিদ্ধ যোগীদিগের হৃদয়-মধ্যে বিরাজ করেন।

অতঃপর প্রণব মাহাত্ম্য বলা যাইতেছে।—যে প্রণব যোগিগণের পরমারাধ্য তাহারই বিষয় সংক্ষেপে বলা যাউক। প্রণবার্থ ওঁকার ঐ ওঙ্কারি পরমব্রহ্ম। ওঙ্কার বিশুদ্ধ চৈতন্যের সহিত জীবগণের অন্তরে বিচরণ করিতেছেন। বেদে বলা হইয়াছে "ওম্" শব্দে ও পরব্রহ্মে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, উহা নিত্য, সর্ব্ব-বর্ণ-প্রকাশক বায়ুস্বরূপ, এবং ঐ ওঙ্কারই বৈখরীরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। যদিচ ওঙ্কার অরূপী, তথাপি নানাপ্রকার ধাতুর সহিত জীবগণের দেহে মিলিত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া ইঁনি বৈখরীরূপী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ঐ ওঙ্কাররূপী ব্রহ্ম সূক্ষ্ম ভাবে সর্ব্ব জীবে আছেন, কিন্তু কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন। ইঁহার ইচ্ছা স্বতন্ত্র। যে সকল বিশুদ্ধস্বভাব দাক্ষমনীষী সাত্ত্বিক লোক পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হন, আর যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদ পাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারাই প্রথমে ঐ ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মকে নিরন্তর অনুধ্যান করিয়া থাকেন। অকার, উকার, মকার, আর চন্দ্রবিন্দু—এই

বর্ণচতুষ্টয়ের যোগে ওঁ এইশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অকারার্থ সত্ত্ব, উকারার্থ রজঃ, মকারার্থ তমঃ, চন্দ্রবিন্দুর অর্থ পরব্রহ্ম—অর্থাৎ অকার উকারে মিশ্রিত হইলে ও হয়, ঐ ও মকারে যোগ হইলে ওম হয়; ঐ ওম্ ঁ চন্দ্রবিন্দুতে যোগ হইলে ওঁম্ হয়। যখন সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ঁ চন্দ্রবিন্দুতে অর্থাৎ পরমাত্মায় মিলিত হয় তখন ওঁকার হয়। ওঁকারের এই সমন্বয়। অপর অকারার্থ বিষ্ণু, উকারার্থ ব্রহ্মা, মকারার্থ মহাদেব—এই অংশত্রয় যখন চন্দ্রবিন্দুতে—পরমাত্মাতে—লয় হয় তখন ওঙ্কার বোধক হয়। ওঙ্কারি পরম পুরুষ। ঐ পরম পুরুষের বৈখরীরূপ ওঙ্কার। ওঙ্কারি যোগীদিগের পরমারাধ্য।

অতঃপর তামসিক বিঘ্নের বিষয় বলা যাইতেছে। এই তামসিক বিঘ্ন সচরাচার ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে বিঘ্নগুলি জানা থাকিলে ভয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে।

পূর্ব্বে যে সকল বিঘ্নের কথা বলা হইয়াছে সে সকল রাজসিক বিঘ্ন। এবিঘ্ন সচরাচর ঘটে না। স্থান ও ব্যক্তি-বিশেষে তাবৎ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বিঘ্ন দ্বারা সাধককে পরীক্ষা করা হয়। মঙ্গলকার্য্য মাত্রেই যেমন বিঘ্ন আছে তেমনি তাহার প্রতীকারো মহাদেব করিয়া দিয়াছেন। তবে যে বিঘ্নউপস্থিত হয়, সেটি উত্তরসাধকের দোষেই ঘটে। এ সকল কার্য্যের উত্তরসাধক সিদ্ধ হইলে কিম্বা কার্য্যদক্ষ হইলে বিঘ্ন হইতে পারে না। বিঘ্নই সকল অনর্থের মূল।

প্রথম যোগানুষ্ঠান কালে বিবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া যোগীদিগের অন্তরে ভয় উৎপন্ন হয়। কখন বোধ হয় যেন অগাধ সলিলে নিমজ্জিত হইলাম; আবার ক্ষণ পরে বোধ হয় যেন অত্যুষ্ণ ও অতি শীতল তরঙ্গমালায় আচ্ছন্ন হওয়া গেল। কখন বোধ হয় যেন মহাবহ্নি নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে; কখন বোধ হয় যেন নদীতীর ভগ্ন হইয়া নদী-মধ্যে পড়িয়া গেলেম উঠিবার সামর্থ্য নাই।

কখন বোধ হয় যেন জলমগ্নহেতু প্রবল শীতে শরীরপাত হইয়া গেল; কখন বোধহয় যেন অন্ন বস্ত্রের সংস্থান রহিত হইয়া পড়িলাম, কখন বোধ হয় যেন গভীর গর্ত্ত মধ্যে পতিত হওয়াতে সর্ব্ব দিক্ হইতে শুভ্র জলরাশি বেগে মস্তকে নিপতিত হইতেছে। কখন বোধ হয় যেন বিদ্যুতাকার শুভ্র ও পীতবর্ণ দ্যুতিমান্ জ্যোতিঃ মস্তকাচ্ছন্ন করিতেছে।

যোগ সাধন সময়ে ইত্যাকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। যিনি এই সকল বিভীষিকা তুচ্ছ বোধ করিয়া স্বকার্য্য সাধনে ক্ষমবান হন তিনি ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারেন।

যোগী যদি রজঃ ও তমোময় বিকার-সম্ভূত পার্থিব ঐশ্বর্য্যে অভিভূত হন, তবে যোগাসন হইতে তাঁহার অধঃপতন

নিশ্চয়ই হইবে। আর যদি ঐ সকল বিঘ্ন তৃণ বোধ করিয়া অটল ভাবে যোগাসনে বসিয়া যোগ সাধনা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যোগসিদ্ধ হইতে পারেন। সিদ্ধ হইলে বিকার নাশ ও সমাধি সাধন হেতু যোগী সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতে থাকেন। যাবৎ দেহপাত না হয় তাবৎ তিনি দিব্যরূপী পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া দিব্য সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন। পরে দেহপাত হইলে একেবারে কৈবল্য লাভ নিবন্ধন সর্ব্ব-প্রধানরূপে অন্তর্যামী হইয়া উঠেন।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম

স্বপ্ন।

চেতনাবস্থায় যেরূপ সময়ে সময়ে মনুষ্যের মনে নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ চিন্তার উদয় হয়, স্বপ্নও সেইরূপ নিদ্রা-কালীন মানসিক চিন্তা। নিদ্রাকালে আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গণ একরূপ অচেতনপ্রায় হয়। বস্তুতঃ তখন দৈহিক যন্ত্র সকল বিশ্রাম করিতে থাকে। সুতরাং আমাদিগের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পেশী সকল নিস্তব্ধভাব অবলম্বন করাতে, মস্তিষ্কের জ্ঞানপ্রদীপ উদ্দীপ্ত হয় না। জাগ্রতাবস্থায় কোন অসঙ্গত বা ভ্রমাত্মক চিন্তার সঞ্চার হইলে আমরা তদ্দণ্ডেই ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সেই ভ্রম নিরাকরণ করি। নিদ্রা-বস্থায় সেরূপ হইবার উপায় নাই। তৎকালে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় কর্তৃক মানসিক চিন্তার গতি সংযত হয় না। চক্ষুতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘ্রাণে-ন্দ্রিয়েরও শক্তি থাকে না, এবং শ্রবণ স্বাদ গ্রহণ দুষ্কর হইয়া উঠে। স্পর্শ-জ্ঞানেরও হ্রাস হয়, ফলে আমাদের অনুভব-শক্তি তৎকালে একেবারেই অসাড় হইয়া পড়ে। সচেতন অবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল প্রভূত মানসিক চিন্তার উদ্ভব হয় ইন্দ্রিয়গণই সেই সকলের গতিবিধান করে। অতএব নিদ্রাকালে সেই সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অভাবে চিন্তার যদৃচ্ছাগতি হইবে তাহা বিচিত্র কি?

স্বপ্নের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমতঃ নিদ্রা ও চেতনাবস্থার কার্য্য-কলাপের তুলনা করা উচিত। জাগ্রতা-বস্থায় আমাদের মনে যে সকল চিন্তা স্বতঃই উদিত হয় সে সকলকে মানসাধারাত্মক চিন্তা কহা যাইতে পারে। কোন দ্রব্য বা ব্যক্তি নেত্র দিয়া না দেখিলেও মানস-চক্ষুতে দেখিতে পাই। কখন বা শব্দের কারণ অভাবেও আমরা শব্দ শুনিতে পাই। মুখে কোন দ্রব্যই নাই অথচ স্বাদের অনুভব হয়। কোন গন্ধ-দ্রব্য সম্মুখে না থাকিলেও সময়ে সময়ে গন্ধ পাওয়া যায়। দেহ হইতে পা ছিন্ন

হইয়াছে, তথাপি সেই ছিন্ন পদে বেদনা বোধ হয়। এরূপ অনুভব একটিও অমূলক বা অলীক নহে। দ্রব্যের সাক্ষাৎ স্পর্শে যেরূপ অনুভব হয়, দ্রব্যের অভাবেও সেইরূপ করিয়া থাকে। ঈদৃশ জ্ঞান কখন কখন এতই উত্তেজিত হয় যে তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে পরাভূত করিয়া প্রলাপ রূপ ধারণ করে। কিন্তু মানুষ সুস্থ থাকিলে যেরূপ জ্ঞান বা চিন্তার উদয় হউক না কেন তদ্দণ্ডেই উহার কারণ অনুসন্ধান হইয়া থাকে। ইহা মনুষ্যের প্রকৃতিগত ভাব। এমন অবস্থায় ইন্দ্রিয় না থাকিলে সকল অনুসন্ধান-চেষ্টাই বিফল হইত; এবং মানসাধারাত্মক চিন্তা বলিয়া সত্য বিশ্বাস জন্মিত। সচেতন ব্যক্তির মনে ছিন্ন অঙ্গুলীতে বেদনার অনুভব হইলে সে তৎক্ষণাৎ সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অঙ্গুলী না দেখাতে মনে করে, সে বেদনা মিথ্যা। কেহ কোন দুর্গন্ধময় স্থান দিয়া চলিয়া গেলে স্থানান্তরে যাইয়াও তাহার নাসা হইতে সেই দুর্গন্ধ দূর হয় না। দ্রব্য আহারের পর মুখ প্রক্ষালন করিলেও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উহার স্বাদ পাওয়া যায়। কোন সুগন্ধ দ্রব্য হাতে মাখিয়া তাহা ধৌত করিয়া ফেলিলেও, অনেক মুহূর্ত্তের পর পর্য্যন্ত সেই দ্রব্যের সৌগন্ধ্য আঘ্রাত হইতে পারে। যদি এরূপ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ আমাদের সেই সেই দ্রব্যের অভাব না দেখাইয়া দিত, তাহা হইলে সেই সকল জ্ঞান দ্রব্যের সাক্ষাৎ-স্পর্শ-জনিত বলিয়া প্রত্যয় হইত। প্রলাপ-কালে মানসিক ভ্রান্তি এতই প্রবল হয় যে ইন্দ্রিয়গণ কিছুতেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। সেইরূপ স্বপ্নাবস্থায়ও ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক কোন সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে না, যেহেতু তৎকালে ইন্দ্রিয়গণ অসাড়তা লাভ করিয়া থাকে।

বাহ্যিক কোন বস্তুর সংস্পর্শ ব্যতীত ও মানসাধারাত্মক চিন্তা সম্ভবিতে পারে বলিয়াই স্বপ্নের যাহা কিছু মূল সূত্র পাওয়া যায়। নিদ্রাকালে আমাদের তাবৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়। কেবল একমাত্র জ্ঞানাধার মস্তিষ্কই অভ্যন্তর হইতে কার্য্য করিতে থাকে। অনুভব-সাধক যন্ত্রের মধ্যে একটী উত্তেজিত হইলে তদ্দ্বারা অপর একটীরও উত্তেজনা হয়। ফলতঃ উহারা সকলেই পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। সুতরাং কি জাগ্রতে কি নিদ্রিতাবস্থাতে, উভয়কালেই মানসাত্মক চিন্তা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। নিদ্রাবস্থায় আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পথ সকল এককালে বন্ধ হয় না। নিদ্রিতেরাও কখন কখন বাহ্যিক শব্দ শুনিতে পায়। কিন্তু সে আংশিক মাত্র। প্রচণ্ড আলোক চক্ষে পড়িলেও কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্পর্শ-জ্ঞানও একবারে অসাড় হয় না। ইহারাই নিদ্রাকালীন বিবিধ চিন্তার মূল। তখন শীতল কর স্পর্শ

হইলে বোধ হয় যেন কোন মৃতদেহ হস্তে ধরিয়াছি। বাতায়নের খট খট শব্দ শুনিলে ঝড় বা যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কথিত আছে যে কোন সম্ভ্রান্তা স্ত্রী এক দিবস নিদ্রাবশে এই স্বপ্ন দেখেন যেন তাঁহার ভৃত্য তাঁহার প্রাণবধ করিতে আসিতেছে। তিনি ভয়-বিহ্বল হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখেন যে ভৃত্য সত্য সত্যই ছুরিকা হস্তে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে ইহা স্পষ্টই বোধ হইবে যে হয় পদসঞ্চার না হয় তৎকর্ত্তৃক দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দ তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে। এরূপ শব্দ অপর কেহ শুনিলে, হয়তঃ অন্যরূপ স্বপ্ন হইত। কিন্তু গৃহস্বামিনীর মনে ভৃত্যের তাদৃশী দুরভিসন্ধির ভাব সতত জাগরূক ছিল বলিয়া, তিনি উক্তরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন। বস্তুতঃ আপনার ও অপরের স্বপ্নের ভাব গতি দেখিলে আপাততঃ ইহাই স্থির হইবে যে, কোন না কোন চিন্তা উত্তেজিত না হইলে নিদ্রাবশে স্বপ্ন হয় না। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র তাঁহাদের এক্ষণে সে ভ্রম দূর করা উচিত। জাগ্রতাবস্থায় অসম্ভাবিত চিন্তার উদয় হইলে, আমরা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা মনকে প্রবোধ দিতে পারি, নিদ্রায় সেরূপ হইবার উপায় নাই। চৈতন্য সত্বে যদি কোন দাহ্যমান বস্তুর গন্ধ পাই, তবে সেই দণ্ডেই উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। নিদ্রাবস্থায় সেরূপ আঘ্রাণ পাইলে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য অভাবে, অন্য প্রকার চিন্তায় মন আকুল হয়। বোধ হয় যেন গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে, নচেৎ আমরা কোন ধূমগৃহে পড়িয়া আছি। সচেতন অবস্থায় শীতল বায়ু শরীরে লাগিলে যে দিক্ হইতে বাতাস আসিতেছে, তদভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। নিদ্রার সময় শক্তি না থাকাতে আমাদের মনে অন্য ভাবের উদয় হয়। বোধ হয় যেন আমরা কোন নির্জ্জন প্রান্তরে আছি এবং আমাদের অনাবৃত গাত্রে করকাভিঘাত ও শিলা পতন হইতেছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমরা গভীর চিন্তায় মগ্ন হই। ইহাকেই স্বপ্ন বলে।

নিদ্রাকালীন অচেতনপ্রায় ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা স্নায়ুর উৎপত্তিস্থলে কোন চিন্তার সূত্রপাত হইতে পারে। একটী স্নায়ুস্থল উত্তেজিত হইলে অন্য স্থলের সহিত যোগ থাকাতে তাহাদেরও উত্তেজনা হয়। অতএব স্বপ্ন কখন সম্বদ্ধ কখন বা অসম্বদ্ধ হইবে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। চিন্তা সকল যদি নিয়মিত রূপে ও অব্যাঘাতে পরস্পরের অনুগমন করে তাহা হইলে স্বপ্ন কখনই অসংলগ্ন হয় না। চেতনাবস্থায় যেরূপ নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তির কখন কখন অভাবনীয় চিন্তার উদয় হয়, নিদ্রিতেরও চিন্তা সেই প্রণালীর অনুকরণ করে। অন্য অন্য চিন্তা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী চিন্তার বাধা জন্মাইলেই উহা

অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে। সেইজন্য আমরা নিদ্রাবশে কখন কখন চমকিত হই। ইহা কেনা জানেন যে আমরা স্বপ্নে এক স্থানে বিচরণ করিতে করিতে সহসা অন্য জনপদে উপস্থিত হই। এক ব্যক্তির মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহাতে অন্যরূপ দেখিতে পাই। কিন্তু চেতনাবস্থায় আমাদের এরূপ অলীক চিন্তার উদয় হইলে আমরা প্রতিক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা সে সকল ভ্রম নিবারণ করি। পড়িতে বসিয়া যদি কখন অন্য দেশের বিবরণে মন একান্ত আকৃষ্ট হয় যে আমরা যেন সেই দেশেই আছি এমনি বোধ জন্মে, তাহা হইলে পাঠ-গৃহ ও তত্রত্য দ্রব্যসামগ্রীর উপরে দৃষ্টিপাত মাত্র চিত্ত নিজ কর্ম্মে ফিরিয়া আইসে। নিদ্রাকালীন চিন্তার এরূপ গতিরোধ করা সহজ নহে। সে সময় ভ্রম নিরাকরণের কোন উপায়ই থাকে না। সুতরাং যাহা মনে হয় তাহাই কিছুক্ষণ চলিতে থাকে। যদি পাঠকেরা তদবস্থায় প্রকৃত ভ ব অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহারা কিছুকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করুন। তখন বুঝিতে পারিবেন যে বহির্দ্রব্যের দ্বারা মানসিক চিন্তার কীদৃশ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হয়।

শারীরিক কার্য্যকলাপ জন্য স্বপ্নের যে তারতম্য হয়, তাহার অজীর্ণ দোষ ঘটিলেই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রস-নির্গমনের হ্রাস বৃদ্ধিতেও স্বপ্নের আধিক্য হয়। মেডুসা নামক জাহাজের নাবিকেরা পিপাসায় মৃতপ্রায় হওয়াতে অনবরত ছায়া-বিশিষ্ট বনস্থলী ও স্রোতস্বতী নদীর স্বপ্ন দেখিত। আর নিদ্রাবস্থায় মাতার স্তনে দুগ্ধের সমাগম হইলে, পুত্র স্তন পান করিতেছে বলিয়া ভ্রম জন্মে।

অতএব যদি দৈহিক ক্রিয়া-কলাপের জন্য স্বপ্ন হওয়া সত্য হয়, যদি ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রাবস্থায় নিস্তেজ হইয়াও স্বপ্নের সূত্রপাত করিয়া থাকে, যদি এক চিন্তা হইতে মন অন্য চিন্তায় ধাবিত হইতে পারে, তাহা হইলে গাঢ় নিদ্রাতেও যে স্বপ্ন হইবে তাহা বিচিত্র নহে। নিদ্রাকালে মস্তিষ্কের কার্য্য যে এককালে বন্ধ হয় না, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। অনেকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হন বলিয়া আপনাপন স্বপ্নের কথা স্মরণ করিতে পারেন না যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বপ্ন দেখেন নাই বলিলে সে কথা কখনই প্রত্যয়-স্থল নহে। কারণ যদি স্মরণ অভাবে স্বপ্নের অভাব বুঝাইত, তাহা হইলে যে সকল লোক স্বপ্নাবস্থায় সঞ্চরণ ও অভাবনীয় কার্য্য সাধন করে তাহাদের কথাতেও বিশ্বাস করিতে হইত। কিন্তু স্বপ্নসঞ্চারীর মনে নিদ্রাবস্থার কোন ঘটনারই স্মরণ থাকে না। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্বপ্ন-বিস্মৃতি নিঃস্বপ্নতার চিহ্ন নহে। সার ইলিয়ম

হামিল্‌টন্‌ সাহেব, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে নিদ্রাকালে সময়ে জাগরিত হইলে বহুবিধ স্বপ্নের সূত্র পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

সে ঘোর নিশিতে।

সে ঘোর নিশিতে কুরু-রণ-স্থলে
একাকী পড়িয়া ছিলাম ভূতলে;
শ্রান্ত কলেবর দীর্ঘ-পর্য্যটনে
অবসন্ন আঁখি তন্দ্রা-পরশনে;
ধূ ধূ করে সুধু বালির সাগর,
হু হু করে বায়ু তাহার উপর;
আঁধার আকাশ কালিমা আঁকা
চন্দ্রমা তারকা জলদে ঢাকা;
অরধ চেতনে অরধ স্বপনে
ছিলাম পড়িয়া বালুকা-শয়নে।
"কে তুমি এখানে?" গভীর ঝঙ্কারে
উঠিল শবদ মরুর মাঝারে।
"জীব ধন্য তুমি ভারত ভিতরে
"সুকৃতির ফল পাবে জন্মান্তরে;
"দারুণ পিপাসা হও অগ্রসর,
"দেহি দেহি রক্ত খুলরে খর্পর।
"কত বর্ষ আজ হইল অতীত,
"নাহি আস্বাদিনু নরের শোণিত,
"দীর্ণ কর বুক চূর্ণ কর শির,
"ভগ্ন কর গ্রীবা দেওরে রুধির।"
ভৈরব ঝঙ্কারে বিকট শবদে
উঠিল চীৎকার "দেদে দেদে দেদে।"
ব্যাকুল হৃদয়ে উঠিনু শিহরি
চকিত দাঁড়ায়ে চৌদিকে নেহারি;
শূন্য মরুভূমি গাঢ় অন্ধকার,
শশ্মান-আকৃতি পড়ি চারিধার,
মধ্যস্থল হ'তে ভৈরব শবদে
উঠিছে চীৎকার "দে রুধির দে।"
ত্যজি মরুস্থল কম্পিত চরণে
চলিনু পশ্চিমে ভয়াকুল মনে।
ভয়ে ফেলি পদ, ভয়ে ফিরে চাই,
সে বিকট রব শুনিবারে পাই।
সহসা অদূরে আলোক-মণ্ডল
ভাতিল উজলি কুরু-রণ স্থল!
মণ্ডল মাঝারে রমণী যুবতী,
অপূর্ব্ব সে রূপ দেবী প্রতিকৃতি!
ছুটিনু উল্লাসে নিকটে তাহার;
বিস্মিত নয়নে নিরখি আকার—
নহে সে অনল, বরাঙ্গের দ্যুতি—
অতুল রূপসী রমণী যুবতী,
বদন-মণ্ডলে ভকতির রেখা,
ভিতির ধারণা অঙ্গে অঙ্গে লেখা;
নব-বিকসিত সরোজের দল,
বদনে দু' আঁখি করে ঢল ঢল,
সহাস-বদনা বিকচ-নয়না,
বিপুল যৌবনে অধীরা আপনা;
জানু পাতি ভূমে বদ্ধাঞ্জলি করি
জিজ্ঞাসিনু তায় পুরে অগ্রসরি,—

"কে রমণী তুমি এ শশ্মান-দেশে
"চলেছ নিশিতে এ অতুল বেশে?
"কি নাম তোমার কোথা নিকেতন,
"একাকিনী কেন শশ্মানে ভ্রমণ,
"মানবী কি দেবী, কি বাসনা ধর,
"কোন্ ভাগ্যবানে করুণা বিতর,
"প্রাণি-শূন্য দেশে কিবা অভিলাষ,
"পাবে নাকি তাহা সাধিতে এ দাস?"
কহিল রমণী হাসিতে হাসিতে
"তুই কি পারিবি সে সাধ সাধিতে
"অলসের শিশু বঙ্গের সন্তান?
"অত্যন্ত অসার তোদের পরাণ,
"আহার বিহার স্বধুই বাসনা,
"তুই কি জানিবি গভীর সাধনা?
"চিনিতে নারিলি আমি কোন্ জন,
"দুঃখ হয় ভাবি তোদেরি জীবন,
"রমণীর মত তোদের পরাণ,
"আশা অভিলাষ বিঘত প্রমাণ।
"না জানি কেমনে থাকিস্ সকলে
"অন্ন আচ্ছাদন জীবব্রতে ভুলে!
"কত যে গভীর প্রাণের পিপাসা,
"কত যে অনন্ত পুরুষের আশা,
"না বুঝিলি কেহ-বাঙ্গালি-জীবনে!
"না ভাবিলি কেহ মুহূর্ত্তেও মনে!
"দেখ্ চেয়ে ওই পশ্চিম প্রদেশে
"হাসে আমেরিকা কি অপূর্ব্ব বেশে!
"ক্ষুদ্র দ্বীপখণ্ড ইংলণ্ড যে দেশ
"হের আজ তার কি মধুর বেশ!
"বুদ্ধিজীবী তোরা, আছে সূক্ষ্ম জ্ঞান,
"না পার শিখিতে দেখিয়া প্রমাণ?
"ভবের অধম ধরার কলঙ্ক
"তোর জন্মভূমি পরাধীনা বঙ্গ!
"তোর কেন হেন অভিলাষ করা
"নরাধম তোরা জীয়ন্তেও মরা!
"হও অপসৃত নিজ দেশে যাও
"কুরুক্ষেত্রে কেন কলঙ্ক ছড়াও?"
"জননি" বলিয়া চরণের তলে
লুটায়ে পড়িনু তিতি অশ্রু জলে;
"বলে দাও মাতঃ করুণা বিতরি
"এ ঘোর কলঙ্ক কেমনে পাসরি?
"জন্ম ভূমে নাহি ফিরে যাব আর,
"অসম্পূর্ণ রাখি আদেশ তোমার;
"ভবের ঘৃণিত ধরার কলঙ্ক
"জানি মাতঃ মোর অভাগিনী বঙ্গ।
"এবে দয়া করি বলে দাও মাতঃ।
"কিসে সে কলঙ্ক হবে অপনীত?
"সত্য বটে আমি বঙ্গের সন্তান,
"কিন্তু এই ক্ষোভে সদা কাঁদে প্রাণ;
"ভ্রমি সেই দুঃখে ভগ্ন-দুর্গ-মূলে,
"যমুনা জাহ্নবী নর্ম্মদার কূলে।
"কি করুণ ধ্বনি শুনিনু শ্রবণে
"বহিছে তথায় পবনের স্বনে!
"অবশেষে আমি শ্রান্ত কলেবরে
"ছিলাম পড়িয়া কুরুক্ষেত্র'পরে।
"অকস্মাৎ মাতঃ! ভীষণ শবদে
"উঠিল নিনাদ 'দে রুধির দে'
"কি যে ভয়ঙ্কর জননি! সে ধ্বনি,
"এখনো আমার কাঁপিছে পরাণী;
"করুণা বিতরি বল মা জননি
"এ নির্জ্জন দেশে কাহার সে ধ্বনি?
"কি তৃষ্ণা তাহার, কি রুধির চায়,
"কুরু রণ-ভূমি কোন বাসনায়?

" বল আর মাতঃ ছল পরিহরি
" এ অতুল বেশে কে তুমি অমরী?"
হাসিয়া রমণী কহিল তখন--
" অঙ্গে মাটি মাখি করগে শয়ন
" বীরের শশ্মান কুরু-রণ-স্থল ;
" (ইহার পরশে নির্জীবেরো বল।)
" নয়ন মুদিয়া রহ কিছুক্ষণ
" দেখিতে পাইবে আমি কোন জন ;
" বুঝিতে পারিবে সে শবদ কার,
" ঘুচিবে তোমার চিত্তের বিকার।"
সহসা রমণী অদৃশ্য হইল
পুনঃ কুরুক্ষেত্র আঁধারে ডুবিল ;
গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা চারিধার ;
বিস্ময়ে সভয়ে ফিরিনু আবার ;
অঙ্গেতে মৃত্তিকা করিয়া লেপন,
কুরু-রণস্থলে করিনু শয়ন ;
কত আশা ভয় জাগিল অন্তরে,
হায়রে পড়িয়া সে ঘোর প্রান্তরে ;
অবসন্ন তনু বিষম চিন্তায়,
মুদিল নয়ন শ্রমজ নিদ্রায়,
অদ্ভুত স্বপন হেরিনু তখন,
আলোকে উজ্জ্বল বিশাল তোরণ ;
সেই জ্যোতির্ম্ময়ী সুমন্দ চরণে
অতুল শোভায় প্রবেশে তোরণে।
ছুটিনু উল্লাসে পশ্চাতে তাঁহার
প্রবেশিতে সেই তোরণের দ্বার ;
জ্বলিয়া উঠিল তোরণ-অনল।
ঝলসিল অঙ্গ হইনু বিকল ;
কাতরে ডাকিনু অমর বালায়
নাহি নিরখিনু কিন্তু আর তাঁয়।
চাহিয়া দেখিনু তোরণ—উপরে
" স্বাধীনতা" লিখা অনল-অক্ষরে।
দপ্ দপ্ জ্বলে তোরণের আল
কভু ক্ষীণ শিখা কখন উজ্জ্বল !
দেখিতে দেখিতে নাট্যশালা মত
সে অনল-পট হ'ল অপসৃত।
নূতন তোরণ তেমতি উজ্জ্বল
দেখিনু বিস্ময়ে অঙ্গেতে অনল !
দেখিনু এ বার এ তোরণ-চূড়ে
" জাতি-সাম্য" লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে।
আবার সে পট হ'ল অপসৃত
নূতন তোরণ পুনঃ প্রকটিত ;
তেমতি উজ্জ্বল তেমতি শিখরে
"দৃঢ়ব্রত" লেখা অনল অক্ষরে ;
এতোরণ পুনঃ সরিল আবার
অন্যপট পুনঃ হল আবিষ্কার !
উজ্জ্বল অনলে বিশাল অক্ষরে
" একতা" রয়েছে লেখা চারিধারে।
অন্য পট নাহি হইল বর্দ্ধন
বিস্মিত নয়নে দেখি কতক্ষণ। .
আবার ভীষণ গভীর ঝঙ্কারে
শুনিনু পশ্চাতে " দে রুধির দে"—
" দীর্ণ কর বুক চূর্ণ কর শির,
" ভগ্ন কর গ্রীবা দাওরে রুধির,
" উগ্র পিপাশায় কাতর পরাণ,
" কর ওহে নর রুধির প্রদান ;
" কুরু-অধিষ্ঠাত্রী আমি রণ-কালী,
" সদ্য ছিন্ন শির মম প্রিয় ডালি,
" দারুণ পিপাসা, হও অগ্রসর,
" দেহি সেই রক্ত খুলরে খর্পর"।
সভয়ে ফিরিয়া পশ্চাতে নিরখি

ঘোর অন্ধকারে মগ্ন চারি দিক্!
মধ্যস্থল হ'তে বিকট শবদে
উঠিছে নিনাদ " দেদে দেদে দেদে"
" কোথায় জননি অমর-বাসিকে!"
ডাকিয়া ফিরিনু তোরণের দিকে।
নাহি সে তোরণ শূন্য চারি ধার
হু হু করে সুধু গভীর আঁধার!
ত্রাসে নিদ্রা ত্যজি উঠিয়া বসিনু,
প্রভাতের আলো চৌদিকে হেরিনু!!

প্রমীলা ও ইন্দুবালা।

বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে মেঘনাদবধ কাব্য ও বৃত্রসংহার অমূল্য রত্ন। এই দুই কাব্য মধ্যে কোন্ খানি শ্রেষ্ঠ তাহা সমালোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এই কাব্য-কানন হইতে আজ দুইটী মাত্র কুসুম তুলিয়া একের পার্শ্বে অন্যকে রাখিয়া দেখিব। রাবণের পুত্র মেঘনাদ, তাঁহার প্রিয়তম ভার্য্যা প্রমীলা। প্রমীলা দানব-কন্যা এবং রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ রাবণের পুত্রবধূ। ইন্দ্রজিত বীর, প্রমীলা বীরাঙ্গনা। ইন্দ্রজিতের হৃদয় বীররসে পরিপূর্ণ, প্রমীলা সেই হৃদয়ের প্রিয় প্রতিমা। প্রমীলার হৃদয়ও বীরভাবাপন্ন, চন্দ্রের ন্যায় তেজ ধারণ করিয়া শান্ত ও জ্যোতির্ম্ময়, ইন্দ্রজিতের বীরত্বে পৌরুষ ভাব আছে, প্রতিফলিত তেজে—প্রমীলাতে—সে পৌরুষভাবের বিকাশ নাই। ইন্দ্রজিতের তেজে দাহকতা আছে, কিন্তু সেই তীব্রত্ব প্রমীলার তেজে নাই। যুদ্ধে একের আনন্দ, অন্যের উৎসাহ (আনন্দ ইন্দ্রজিতের, উৎসাহ প্রমীলার)। বীর পুরুষ না হইলে প্রমীলার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে কি না সন্দেহ। বীরাঙ্গনা-প্রমীলা-হৃদয়ে বীররসের সহিত প্রগাঢ় স্নেহরস মিশ্রিত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব ভাব হইয়াছে।

সেই স্নেহ সমুদ্রের ন্যায় গভীর হইয়াও, কর্ত্তব্য-পথে যাইতে বাধা দেয় না। বীরাঙ্গনা সমরভীরু পতিকে ভাল বাসিতে পারেন না। স্নেহ ও বীরত্ব যুগপৎ মনুষ্য-হৃদয়ে সচরাচর সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুইটী একত্র সন্নিবেশিত হইয়া যে হৃদয় নির্ম্মিত, তাহার তুলনা কোথায়? তীব্র হীরক-খণ্ড স্বতঃ সুন্দর বটে, কিন্তু স্বর্ণ সহযোগে আরও মনোহর। বীরাঙ্গনা শত্রু-হস্ত হইতে পতিকে উদ্ধার করিতে পারেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করিতে পারেন, সকল অবস্থাতে সহবর্ত্তিনী। আবার যুদ্ধ শেষে বিশ্রামে স্নেহময়ী, স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়ের দ্বার বিমুক্ত করিয়া, প্রাণাধিক পতিকে সলিলে ভাসাইয়া শান্তি দান করিতে পারেন। স্নেহময়ী বীরাঙ্গনা বীর-পুরুষের উপযুক্তা পত্নী। ইন্দ্রজিতের যোগ্যা পত্নী প্রমীলা। প্রেমিকা বীরনারী, কবির স্বপ্নময় সৃষ্টির অদ্ভুত সন্নিবেশ। ইন্দ্রজিত প্রমোদ-উদ্যানে প্রমীলার সহবাস-সুখে সমর-শেষে সময়

অতিবাহিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার ধাত্রীবেশধারিণী—"মাধব রমণী" সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং বীববাহুব মৃত্যুসংবাদ শুনাইলেন।

প্রথমে ইন্দ্রজিৎ কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, পরমুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

"ছিঁড়িল কুসুমদাম রোষে, মহাবলী
মেঘনাদ, ফেলাইলা কনক বলয়
দূরে,——"

কবির কল্পনাব মাধুরী দেখ। বীব ইন্দ্রজিৎ কুসুম-আভবণে অলঙ্কৃত। কুসুম প্রেমিকের উপাস্য, কুসুম কবির দেবতা, কুসুম যোগীর হৃদয়ের ধন, কুসুম বীরের হৃদয়ে স্থান পায় না। যেই প্রেমিকেব ভাব বীরভাবে আবৃত হইল, তখনই কুসুমের মাধুর্য্য হৃদয় হইতে দূর হইল। কোমল-প্রাণ কুসুম অমনি বিচ্যুত হইল। সুবক্তিম কুসুম প্রেমিকের আনন্দ দেখিয়া হৃদয়ে দুলিয়া হাসে, কুসুম বীরবসের উদয়ে, উত্তপ্ত হৃদয়ের তেজে মলিন হয়। তাই ইন্দ্রজিতেব কুসুমহার অসহনীয় হইল। বীর এবং প্রেমিকের প্রভেদ একটী মাত্র কার্য্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আবার কিছু পরে ইন্দ্রজিত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—

"হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামা-দল মাঝে,
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিত"।

এই বলিয়া যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত বীর-সাজে সজ্জিত হইলেন, বীর-অলঙ্কারে বীরতনু ভূষিত করিলেন, যুদ্ধে যাইবেন—এমন সময়ে স্নেহময়ী বীরপত্নী প্রমীলা আসিয়া প্রাণপ্রিয় পতির হস্ত ধরিয়া কাঁদিলেন

"কোথা প্রাণ-সখে,
বাখি এদাসীরে কহ, চলিলে আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী"।

বীরবর মেঘনাদ স্নেহপূর্ণ বাক্যে, প্রাণ-প্রতিমা প্রমীলাকে সান্ত্বনা করিয়া, চলিয়া যাইলেন। প্রমীলা নিষেধ কবিলেন না, বাধা দিলেন না, আবার প্রমীলাতে দুই ভাবের বিকাশ দেখ। প্রেমময়ী বিবহভয়ে কাতরা, তাই বিরহের উল্লেখ করিলেন। সেই প্রমোদ-কাননের আভরণে অলঙ্কৃতা, সেই প্রমোদ-গৃহের সুখে বিশুদ্ধা প্রমীলার চক্ষুতে যে জল আসিল তাহা প্রণয়ের উচ্ছ্বাস মাত্র। যেই ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা শুনিলেন, নীরবে ইন্দ্রজিতকে বিদায় দিলেন। এখানেও ইন্দ্রজিতের বীর-ভাবের বিকাশ পৌরুষ, প্রমীলার শান্তও মধুর। ইন্দ্রজিত কুসুমহার ছিঁড়িলেন "হেথা আমি বামা দল মাঝে" মনে পড়িল। কিন্তু প্রমীলার বিরহ-শঙ্কার শোক বীর-ভাবের উদয়ে উপশমিত হইল। গম্ভীর-মূর্ত্তি বীরাঙ্গনা, সাশ্রুবদনে অথচ স্থির ভাবে, স্বামীকে বিদায় দিলেন।

আবার এদিকে, বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড়, তাঁহার কোমল-প্রাণা প্রণয়িনী ইন্দুবালা,

দানব-রক্ষক বৃত্রের কুল-উজ্জ্বলকারিণী, অমূল্য রত্ন। রুদ্রপীড় বীর, রণোৎসাহের প্রবল ঝটিকা প্রতি নিয়ত তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত; যুবক বীর্য্য-সর্ব্বস্ব-প্রাণ। কিন্তু ইন্দুবালা বীরাঙ্গনা নহেন। যুদ্ধ-বার্ত্তা শ্রবণ করিলে তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়, দয়ার উদ্রেক হয়, তাঁহার হৃদয় করুণায় গলিয়া যায়। স্নেহময়ী প্রেম বিহ্বলা ইন্দুবালা, যুদ্ধ-সজ্জা দেখিলে, অশ্রুসিক্ত হইয়া, শতবার প্রাণাধিক পতিকে বাধা দেন। আপনার অমঙ্গল—আশঙ্কায় ভীত হন, অন্যের অমঙ্গলে ব্যথিত ও অশ্রুসিক্তা হন। আপনার শুভ চিন্তা করেন, অপরের সুখে দুঃখে কোমল হৃদয় ঢালিয়া সহানুভূতি প্রদান করেন। সরলতা, কোমলতা, স্নেহ, দয়া, ভালবাসা বিনির্ম্মিত অপূর্ব্ব চারুছাট ইন্দুবালা আশঙ্কায় সতত আকুলা। জীবন-নিধনে ব্যথিতা—পতি যুদ্ধে বহু-সংখ্যক প্রাণিনাশ করিয়া আসিলে, তিনি কাঁদিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করেন। জীবন-সর্ব্বস্ব পতিকে পাইয়া আনন্দ পান, কিন্তু তাঁহার পতির হস্তে অন্য রমণীর বৈধব্য ঘটিয়াছে ভাবিয়া কাঁদিতে থাকেন। পরে দুঃখ-কাতরা ইন্দুবালা বলেন—

"পুত্র-শোকাতুরা আহা মাতার রোদন,
সখিরে, বিদরে হিয়া, বিদরে লো প্রাণ
স্বামি-হীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন;
ভগিনীর খেদ স্বর ভ্রাতার বিয়োগে!
হায়, সখি! বল তোরা—বল কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া।"

ইন্দুবালা আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে শান্তি দিতে চান। দুঃখের অশ্রু সহিতে পারেন না।

প্রেমময়ী ইন্দুবালা পতিগত-প্রাণা, প্রাণেশকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতে চাহেন। এক মুহূর্ত্ত চক্ষের বাহিরে যাইলে মৃতপ্রায় হইয়া থাকেন। স্বর্গীয় ভালবাসা ঢালিয়া পতিকে ডুবাইয়া দেন। তাঁহার জীবন, মন, শরীর সকলই পতিময়। তাঁহার জীবন ভাল-বাসার নির্ঝরিণী, সকল সময়ে ঝর ঝর করিয়া শান্ত শীতল স্নেহবারি ঝরিতেছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, নিত্য সমান ভাবে ঝরিতেছে। যদি সেই স্নেহে বাধা পাইল, তাহা হইলে উন্মত্ত বেগবতী নদীর ন্যায়, সম্মুখস্থ বাধা সকল অতিক্রম করিয়া, কল কল নাদে উন্মত্ততাতে অনন্ত-স্নেহ-সাগরাভিমুখে ছুটিতে থাকে। যে সময়ে প্রবল বেগে স্নেহ-বারি বহিল, তখন সংসার ভুলিয়া, আপনি তাহাতে নিমগ্ন হইলেন, এবং স্নেহ-পাত্রকে ডুবাইলেন। সেই স্নেহ-উৎসময় হৃদয়ে সকলই স্বর্গীয় সামগ্রী।

বীরাঙ্গনা স্নেহময়ী প্রমীলা যুদ্ধগামী ইন্দ্রজিতকে কিরূপে বিদায় দিয়াছেন তাহা দেখিয়াছি। এইক্ষণে কোমল-প্রাণা স্নেহ-প্রবল-হৃদয়া ইন্দুবালা কি

প্রকারে প্রাণপতি রুদ্রপীড়কে বিদায় দিয়াছিলেন তাহা দেখিব।

কোমল কুসুমময়ী ইন্দুবালা কল্পতরু-ছায়াতে বসিয়া সহচরীদিগের প্রমুখাৎ যুদ্ধ সংবাদ শুনিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি শ্বেত-পুষ্পমালায় ভূষিতা, শ্বেত শিলা-খণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া কেমন স্বর্গীয়ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। পর-দুঃখে বিসৃষ্ট অশ্রুবিন্দুই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। সেই সময় যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রুদ্রপীড় প্রাণ-প্রিয়ার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন।

"দূর হতে দেখি পতি, উঠিলা শিহরি
ছুটিলা উতলা হয়ে ইন্দুবালা বামা।"

প্রাণ সর্ব্বস্ব পতিকে স্নেহভরে জড়াইয়া ব্যাকুল ভাবে বলিলেন—'

"হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ!
রণ-সাজে কেন পুনঃ সাজালে সুতনু।"
"খোল প্রভু রণ সাজ না পারি সহিতে
————কি নিষ্ঠুর হায় তুমি!"

বিহ্বলা বালা প্রাণাধিককে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না; অশ্রুসিক্ত নয়ন পতির পানে তুলিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীর পুরুষের হৃদয় স্নেহে গলিয়াও অটল, প্রতিজ্ঞা-পালনে স্থির। রুদ্রপীড় পত্নীর প্রেমে মুগ্ধ হইলেন; অশ্রু-পূর্ণ হইলেন ও স্নেহময় অশ্রুসিক্ত মুখে তরুণীকে স্নেহভরে চুম্বন করিলেন। শেষে কর্ত্তব্য-পথে যাইবার নিমিত্ত বিদায় চাহিলেন, এবং বিদায় হইলেন। ইন্দুবালা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, কোমল কুসুমহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, শীতল ছায়া সহিতে পারিলেন না, ব্যথিত হৃদয়ে রোদন-শীলা ইন্দুবালা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"আকুল সবলা বালা ব্যথিত চঞ্চল,
থাকিতে নারিলা স্থির স্নিগ্ধ শিলাতলে,
স্নিগ্ধ কুসুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি
তরু ছায়া ত্যজি, গৃহে করিলা প্রবেশ।"

ইন্দ্রজিত কুসুমহার ছিঁড়িলেন এক-ভাবে আর ইন্দুবালা ছিঁড়িলেন অন্য ভাবে। কার্য্য এক, কিন্তু কারণের বিভিন্নতা আছে। কবির কল্পনা সম্ভূত চিত্র সুন্দর, কিন্তু চিত্রের সন্নিবেশে আরও সুন্দর হয়। ইন্দুবালার কুসুমে এত বিরাগ কেন? বিরহ-কাতরা, কুসুম-হার পীড়িত বক্ষে ধারণ করিতে পারি-লেন না; সুতরাং ইন্দুবালা ফুলহার বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রমীলা বীরাঙ্গনা ও স্নেহময়ী, ইন্দুবালা বীর-পত্নী, কিন্তু বীরাঙ্গনা নহেন। প্রেমময়ী সবলা বালা প্রিয়তমের বিপদে রোদন করিতে পারেন; বিচ্ছেদে মরিতে পারেন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারেন না। সুতরাং গৃহে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন তাঁহার কার্য্য। প্রমীলা স্নেহের আধিক্যে হৃদয়-বেগ সহিতে পারেন না। কি শত্রু-শিবির কি যুদ্ধ-ক্ষেত্র সকল স্থানেই বীরবালা উন্মাদিনীর ন্যায় প্রবেশ করিয়া প্রণয়ীকে হৃদয়ে ধারণ করেন।

ইন্দ্রজিত শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন

বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রমীলা ব্যগ্র হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ক্রমে বিলম্ব হইতে লাগিল, দানব-কন্যা চঞ্চলা হইতে লাগিলেন। পতিকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইল, লঙ্কাপুরে যাইবেন স্থির করিলেন। সখীগণ নিষেধ করিল, কারণ লঙ্কা সেই সময় শত্রু-পরিবেষ্টিত। বীরাঙ্গনা নিষেধ শুনিলেন না, গর্ব্বিতা ক্রোধে উত্তর দিলেন।

"———পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি"
বাহিরায় যবে নদী জলধি উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষ কুল বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে।
পশিব লঙ্কায় আজি, নিজ ভুজবলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি"।

বীরাঙ্গনা এই বলিয়া বীর সাজে সাজিয়া সখীদিগকে সঙ্গে লইয়া শত্রুর হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া গভীর নিশাতে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। প্রমীলার সাহস ও পতিভক্তি দেখিয়া শত্রু, মিত্র, সকলেই ধন্য ধন্য করিল। প্রমীলার বীরত্বে বীরশ্রেষ্ঠ রামও ভীত হইয়াছিলেন। বীরবর ইন্দ্রজিত চির-স্নেহময়ী প্রমীলাকে ঘোর নিশীথকালে রণ-সাজে সজ্জিত দেখিয়া হাসিয়া কৌতুকে বলিলেন—

" রক্তবীজে বধি বুঝি এবে বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে ? যদি আজ্ঞা কর
পড়ি পদতলে তবে, চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে !"

কবি সেই সময় কি সুন্দর বীরত্বময় স্নেহে প্রমীলাকে চিত্রিত করিয়াছেন। পাঠক চেষ্টা করিলেও সেই মূর্ত্তি ভুলিতে পারিবেন না। সকল সময়েই সেই চিত্র অন্তরে জাগিবে।

এদিকে বিরহ-কাতর স্নেহ-প্রাণা ইন্দুবালা স্বামী যুদ্ধে গিয়াছেন, সেই চিন্তায় অস্থির, কিছুতেই অস্থির হৃদয় স্থির করিতে পারিলেন না। পতির মঙ্গল কামনায় অশিব নাশক মহাদেবকে পূজা করিয়া তাঁহার স্থানে পতির মঙ্গলের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিবেন স্থির করিলেন।

" পতি-গত প্রাণা সতী ভাবিলা তখন,
করিবে শিবের পূজা পতির মঙ্গল
কামনা করিয়া চিতে, লোভি শুভ বর,
নিবারিবে চিন্তাবেগ শান্তির সলিলে।"

সখীদিগকে সঙ্গে করিয়া শুদ্ধমতি সাধ্বী, বিধিমত পূজাগারে যাইয়া, মঙ্গল-ময় স্বয়ম্ভুকে পূজা করিতে লাগিলেন। দৈব-বিপাকে মহাদেবের মস্তকের উপর মঙ্গল ঘট ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিল্বপত্র মস্তক-চ্যুত হইল, তাহা দেখিয়া ধর্ম্মভীতা সাধ্বী—ইন্দুবালা শিহরিয়া উঠিলেন। পতির অকুশল ভাবিয়া,

" দর দর দুনয়নে ঝরিল সলিল,
শিহরিল শীর্ণতনু ; "হে শম্ভু" বলিয়া
ভূতলে পড়িলা বামা পতিমুখ স্মরি।"

সখীরা ত্বরায় তাঁহাকে দেবালয় হইতে

বাহিরে আনিল। রতি আসিয়া নানা-মত সান্ত্বনা করিলেন। শেষে অপেক্ষা-কৃত ধীর হইলেন।

ইন্দুপ্রিয়া শচীর সহানুভূতি পাইয়া অশ্রুজল মুছাইলেন। শচী শক্রর রমণী, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই; তাঁহার পদতলে বালিকার ন্যায় বসিয়া স্বর্গের এবং দেবতা দিগের বিষয় শুনিতে লাগিলেন।

"প্রভাতের শশী, চারু ইন্দুবালা
শচীপদতলে, বসি কুতূহলে
হেরিছে শচীর বিমল বদন,
শুনিছে কৌতুকে বালিকা যেমন
ইন্দ্রাণীর মৃদুমধুর বাণী"।

এদিকে ইন্দ্রজিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিবেন সেই আশায় আশান্বিত। জননীর পদে প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে আসিলেন, সঙ্গে প্রমীলা।

মাতার করে প্রিয় পত্নীকে সমর্পণ করিয়া যাইলেন। যজ্ঞ গৃহে অন্যায় যুদ্ধে লক্ষ্মণের হস্তে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হইল। লঙ্কা শোকে হাহাকার করিতে লাগিল। প্রমীলা বীরাঙ্গনা স্বামীর মৃত্যুতে কাঁদিলেন, অস্থির হইলেন, তথাপি শোক সহিয়া মৃতপতির সহিত জ্বলন্ত অনলে পুড়িয়া মরিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিলেন। আয়োজন হইল, আত্মীয় বন্ধু মেঘনাদেরমৃতদেহ সিন্ধুতীরে লইয়াগেল। অগুরুচন্দন, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, রাশি ২ কুসুম, সমুদ্র-তটে লইয়া গেলেন; প্রমীলা বীরাঙ্গনা, বীরসাজে সাজিয়া চিতারোহণ করিবার জন্য সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

উতরি সাগর তীরে রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দন কক্ষে ঘৃত ভারে ভারে।"

পবিত্র জলে স্নান করিয়া পট্ট বস্ত্র পরিধান করিলেন, পবিত্র কুসুমমালা গলে দোলাইলেন, অশ্রুময় চক্ষে উদ্দেশে গুরুজনের পদে প্রণাম করিলেন।

সখীদিগকে মধুর বচনে সম্ভাষণ করিলেন, অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন। গম্ভীর মূর্ত্তি, অকম্পিত, অটল, জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। পতির পবিত্র পদযুগল ধারণ করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। আত্মা অনন্ত স্বর্গে স্বর্গীয় নারীদিগের সহিত অনন্তকাল বিরাজ করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তি মাত্র সংসারে থাকে, কীর্ত্তিই থাকিল। এই পবিত্র সহমরণ দেখিয়া স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবের আশীর্ব্বাদ-ধ্বনিতে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিময় হইল। অপূর্ব্ব চিত্র ও অপূর্ব্ব প্রণয়! অপূর্ব্ব বীরত্ব!

" করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র-অশ্রুনীরে,
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।"

প্রমীলার ও ইন্দ্রজিতের জীবন অভিনয় ফুরাইল, আমরাও দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলাম। প্রমীলা বীরনারী,

মৃত্যুতেও সাহস এবং বীরত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

অন্যদিকে আবার, বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় দেবতার সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করিতেছিলেন। আকাশ প্রশংসার ধ্বনিতে কম্পিত। পরিশেষে ইন্দ্রের হস্তে রুদ্রপীড় প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। দেবাসুর, শচী, চপলা সকলেই শোকাকুল হইলেন, তাঁহার মৃত্যুতে—

"উঠিল সমর-ক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি,
আকুল দনুজ-দল, বক্ষ ভিজাইয়া জল
পড়িতে লাগিল স্রোতে ভাসায়ে নয়ন
নীরব অমর-দল বিষণ্ণ বদন।
উঠিল সে কোলাহল ক্রন্দন-কল্লোলে
কনক সুমেরু শিরে, নেত্র-যুগ ধীরে ২
শচীর শোকাশ্রু-ধারা বহিতে লাগিল
সহসা বিবর্ণ তনু চপলা কাঁপিল"।

হটাৎ অস্ফুট স্বরে চপলা সেই রুদ্র-পীড়ের নাম উচ্চারণ করিলেন, অমনি সেই শব্দ কর্ণে যাইতে না যাইতে পতি-প্রাণা ইন্দুবালা শচীর ক্রোড়ে শেষ শয্যায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন, কবি কাঁদিয়া গাইলেন—

"শুকাইল ইন্দুবালা নিদাঘের ফুল
হায়রে সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি,
লুকাইল নিদ্রাকোলে ফুটিবেনা আর
ছিন্ন যেন শচী-কোলে, লাবণ্যের হার।'

✓ভালবাসায় যে আত্মায় আত্মায় সংযোগ তাহাতে পার্থিব গ্রন্থি নাই।

এ জগতে এবং জগতান্তরে দুই সেই এক, সুতরাং একের বিয়োগে অন্যেরও বিয়োগ। তাই ইন্দুবালার আত্মা, সেই শান্তি-নিকেতনে, চির মঙ্গল-ময় রাজ্যে, স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসিয়া ভাসিয়া, স্বর্গীয় জ্যোতিতে আভান্বিত হইয়া, মৃত পতির আত্মাতে লীন হইয়া দুইয়ে একটী উজ্জ্বল তারকা রূপে সৃষ্টির অনন্ত আকাশে বিরাজ করিতে লাগিল। প্রেমের পবিত্র চিত্র,—ইন্দুবালার মৃত্যুতেও ভাল-বাসা!

প্রমীলা ও ইন্দুবালা উভয়েই বীর-জায়া; কিন্তু একে যাহা আছে, অন্যে তাহা নাই। প্রমীলা স্নেহ ও বীরভাবে গর্ব্বিতা, ইন্দুবালায় সবই স্নেহ, সবই মমতা। একজনের হৃদয়, গ্রীষ্মের প্রদোষের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, শীতোষ্ণ মধুর। অন্যের হৃদয় শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় তীব্রতা-শূন্য পূর্ণ-মধুর। প্রমীলার হৃদয়ে তীব্র উজ্জ্বলতা আছে, তাহা স্থির মধুরতায় বিভাসিত। কিন্তু ইন্দুবালা কোমলপ্রাণা, আশঙ্কাময় প্রণয়ের উদার মানসিকতায় উজ্জ্বল। ভারতীয় কবিগণ আদর্শ রমণীর চিত্র আঁকিতে অসাধারণ পারদর্শী। সীতা শকুন্তলা এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি জীবিত চিত্রবৎ আজিও ভারতে বিরাজিত। কিন্তু সীতা-চরিত্রে যাহা আছে তাহা শকুন্তলায় কিম্বা দ্রৌপদীতে নাই। আবার দ্রৌপদীতে যাহা আছে তাহা অন্য চরিত্রে নাই। স্নেহ, দয়া, লজ্জা প্রণয় ও ধর্ম্ম সকল চরিত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, বীরত্ব সহজ-সাধ্য নহে।

কোমলতার সার সামগ্রীতে সীতা-চিত্র উজ্জ্বল, তাহাতে তীব্রতার রেখাও নাই। রাম-প্রেমমুগ্ধা সীতা, রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও শতবার রাম নাম করিয়া আত্ম-বিস্মৃতা হইয়াছেন, অভিমান কি অবিনয় অনুমাত্র নাই। দ্রৌপদী ভাল বাসার তীব্র অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও, গর্ব্বিতা, আত্ম-বিস্মৃতা হইতে পারেন নাই। অভিমানে গর্ব্বিতা সাধ্বী প্রণয়-পাত্রের নাম মুখে আনিতে আপনাকে অপমানিতা জ্ঞান করেন। মহাভারত বা কালিদাসের শকুন্তলার সহিত সীতার সাদৃশ্য নাই। বিনয়ে তিনিও সীতার নিকট পরাজিতা। এই তিন চরিত্রে যেমন মিল নাই, তেমনি প্রমীলা ও ইন্দুবালা বিভিন্ন-প্রকৃতি। একে যাহা আছে অপরে তাহা অপ্রাপ্য। উভয় চরিত্রের এত প্রভেদ কেন, জিজ্ঞাস্য। কবির ইচ্ছা-সৃষ্টি বলিলে, কবির মাহাত্ম্য কমিয়া গেল। সুকবির কল্পনা হৃদ্‌-বিজ্ঞানের অধীন। তাঁহার কার্য্য কাল্পনিক হইয়াও প্রকৃত। তন্নিমিত্ত উভয় চরিত্রের সামঞ্জস্যের এত অভাব কেন, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব। দুই জনের স্বামীই বীর, তবে একে কেন বীর-ভাব স্ফুটিত হইল, এবং অন্যে কেবল স্নেহের উৎকর্ষ সাধিত হইল। ইন্দ্রজিৎ বীর; কিন্তু তাঁহার বীরত্বের পরিচয়ে এবং রুদ্রপীড়ের বীরত্বের পরিচয়ে প্রভেদ আছে। রাবণের আক্রোশ দেবতাদিগের উপর, অহঙ্কার হইতে ঈর্ষা হইতে উৎপন্ন নহে। রাবণের প্রধান সেনাপতি ইন্দ্রজিৎ, অহঙ্কারী, পিতার অহঙ্কারী পুত্র। ইন্দ্রজিৎ দেব-শত্রু বটেন, কিন্তু তাঁহার শত্রুতায় স্থায়ী প্রতিজ্ঞা নাই। আজ ইন্দ্রকে জয় করিলেন দেখাইবার নিমিত্ত, যে ইন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার যুদ্ধ-কৌশল অধিক। কাল কালপরিমেতা সূর্য্যকে বন্দী করিলেন, দেখাইবার নিমিত্ত যে সময়ে অসময়ে নিয়তি-চক্রের গতিকে বাধা দিয়া তাহাকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী করিতে পারেন।

কিন্তু বৃত্রের দেবাক্রোশ অহঙ্কার ও ঈর্ষা জনিত। রুদ্রপীড় বৃত্রের প্রধান সেনা-পতি। বৃত্র দেবরাজ ইন্দ্রকে পদতলে রাখিলে, অমরাবতী নিজের হইবে, দেব নির্যাতন করিয়া দেবতার মস্তকে পদা-ঘাত করিয়া, বিক্রমবান্ স্বর্গ-রাজ্যে সিংহাসন স্থাপন করিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। তাই তাঁহার দেব-বৈরীভাবে স্থির আসক্তি আছে। লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী দস্যুর ন্যায় দুই এক দিনের যুদ্ধে ইচ্ছা নাই। ইন্দ্রজিৎ চির-যুদ্ধ-জয়ী, ইন্দ্রকে জয় করিয়াই ইন্দ্রজিৎ নাম গ্রহণ করিলেন। জগতে প্রচার ইন্দ্রজিৎ অদমনীয় বীর। তাঁহার গৌরবের হ্রাস, তাঁহার গৌরবের বাধক কিছুতেই নাই। প্রমীলা বুঝিলেন যে তাঁহার চিরন্তন জয়ী পতির প্রাণের আশঙ্কা নাই, তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ে সাহস অধিক। কিন্তু রুদ্রপীড়ের অবস্থা অন্যরূপ। তিনি বীরের ন্যায় পিতার

কার্য্য উদ্ধার করিতেছেন, কখন দেবতারা জয়ী কখন দৈত্যেরা জয়ী। তিনি বীর বটেন, কিন্তু জয় সর্ব্বদা তাঁহার অনুচর নহে। আর দেবতারা অমর, দৈত্যগণ মর। তাহাতেই ইন্দুবালার হৃদয়ে আশঙ্কা সম্ভব। এদিকে প্রমীলা জানেন যে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সমাপন করিলে, তাঁহার পতির কিছুতেই বিপদ নাই, তাহাতেও প্রমীলার আর এক সাহস। অন্য দিকে ইন্দুবালা দেখিতেছেন যে, দেবসেনা একবার জয়লাভ করিতেছেন, দৈত্য-সেনা অন্যবার। চিরস্থায়ী জয় কোন পক্ষেই নাই। তিনি জানেন বটে যে তাঁহার পতি বীর, অসাধারণ বীর, কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণ অজেয় সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ অসঙ্গত নহে। সহজেই তাঁহার মন আশঙ্কাময়। প্রমীলার ও ইন্দুবালার এই প্রভেদ বাহ্যিক-অবস্থাগত।

প্রমীলাতে যে প্রণয়, ইন্দুবালাতেও সেই প্রণয়; কিন্তু একের প্রণয় অন্যের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কোমলতর। প্রমীলা প্রমোদ-উদ্যানে বাসন্তীর নিকট নিজের দুঃখের গীত গাইতেছেন। তাঁহার মন নিজ ভিন্ন পরকীয় দুঃখে কাতর নহে। প্রমীলা যে পরের দুঃখে দ্রবীভূত হইতে পারেননা তাহা নহে; কিন্তু কখন পরের দুঃখের কথা মনে স্থান দেন নাই।

প্রমীলার হৃদয়ে আপন ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই। রাবণ-বংশ প্রায় ধ্বংস হইয়াছে। পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বিয়োগে কাতরা রমণীর রোদনে লঙ্কা হাহাকার করিতেছে, তথাপি প্রমীলা তাহাতে অনুমাত্র ব্যথিতা নহেন। লঙ্কার অবস্থা একবারও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। আপনার আত্মীয় বন্ধুর মৃত্যুতে তাঁহার নয়নে স্নেহের অশ্রু দেখা দেয় নাই।

শচীর সহিত ইন্দুবালার আচরণ কি দেব ভাব-পূর্ণ। শচীর অপমানে ইন্দুবালা লজ্জিতা, কিসে শচীর মন ভাল থাকিবে, কিসে তাঁহাকে শান্তি ও সুখ দিতে পরিবেন সেই চিন্তায় নিজ দুঃখ শত বার ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সীতার বিষয়ে একটিমাত্র কথা প্রমীলার মুখে নাই। তাঁহার দুঃখে এক মুহূর্ত্ত প্রমীলার মন আর্দ্র হয় নাই। লঙ্কায় যাইয়াও সীতাকে চিন্তা করেন নাই। প্রমীলার প্রণয়ে স্বার্থপরতা এবং বিলাসিকতা আছে। কিন্তু ইন্দুবালার ভালবাসা উদারতাময় ও ইন্দ্রিয়পরতা-বিহীন।

প্রমোদ-উদ্যানে প্রমীলাকে এবং কল্পতরুচ্ছায়ায় ইন্দুবালাকে এক সঙ্গে তুলনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে কাহার হৃদয় স্বার্থময় ও কাহার হৃদয় উদরতাময়। ইন্দুবালার স্নেহ যে স্বার্থশূন্য তাহার সুন্দর পরিচয় অন্যস্থানেও আছে। রুদ্রপীড় যুদ্ধে উন্মত্ত, শচী প্রভৃতি দেব-চক্ষে সেই যুদ্ধ দেখিতে পাইতেছেন।

কোমল-প্রাণা ইন্দুবালা তাঁহাদিগের নিকট বসিয়া অশ্রু-বিমোচন করিতে-ছেন এবং মধ্যে মধ্যে ভীতকণ্ঠে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

সেই চিত্র দেখ,—

"পদতলে ইন্দুবালা মলিন-বদনী
শীর্ণালস-কলেবর, অস্ফুট কুসুম থর
মধ্যাহ্নের সূর্য্য-তাপে বিবস বদন
নিশ্চল, অলস, অর্দ্ধ-মুদিত নয়ন।"

যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহল শুনিয়া—

"জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি,
কে পড়িলা রণস্থলে
কোন রামা-হৃদি-জন
আবার হৃদয়নাথ মাতিল আমার,
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিলরে সুখের সংসার"

এই কয়েকটী কথায় ইন্দুবালার বিশ্বব্যাপী স্নেহের পরিচয় দিতেছে। ভালবাসা ও দয়ার মূর্ত্তিমান্ প্রকাশ ইন্দুবালা—সংসারে দুর্ল্লভ। প্রমীলা-চরিত্র ইন্দুবালার স্বর্গীয় চরিত্রের সহিত তুলনীয় নহে।

ইন্দুবালা দেবকন্যা। প্রমীলা মানবী। কবি বাছিয়া বাছিয়া সমুদয় কোমল সামগ্রী দিয়া ইন্দুবালাকে চিত্রিত করিয়াছেন। বালকের পবিত্র হাসা, স্বর্গের সুধাময় সঙ্গীত, যুবতীর উন্মত্ত প্রেম, মাতার অপূর্ব্ব স্নেহ, এই সকল উপকরণে জ্যোৎস্নাময়ী ইন্দুবালা নির্ম্মিত। ইন্দুবালা স্মৃতির পরম আদরের দ্রব্য, চিন্তার সুখময়ী মূর্ত্তি। ইচ্ছা করিয়া, শত বার দূরে সরাইয়া দিলেও স্মৃতি মুহূর্ত্তে আনিয়া দিবে। বিস্মৃতি দূরে লইতে পারে না। আবার বলি ইন্দুবালা জগতে অপ্রাপণীয়া। কবির কল্পনা ভিন্ন এই প্রকার রমণী কচিৎ দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়। কবির সঙ্গীতে জগৎ মুগ্ধবৎ, এবং কবির চিত্রে বিশ্ব প্রত্যক্ষবৎ। যাহা নাই তাহা দেখা যায়, যাহা আছে, তাহা হৃদয়ময় ও চক্ষুময় হইয়া থাকে, সুতরাং এই চিত্র জগতের শিক্ষাস্থল। কল্পনা-সম্ভূত আদর্শ রমণীকে অনুকরণ করিলে সংসারে আদর্শ রমণী হইতে পারে।

কবি ও উপন্যাসলেখক জগতের শিক্ষাগুরু। তাঁহাদিগের নির্জ্জন-প্রসূত চিন্তাতে যত উপকার হইতে পারে এমন কিছুতেই হয় না। তাঁহারা নির্জ্জনে যে ছবি চিত্র করিয়া জগতে পাঠাইয়া দেন, দুর্ব্বল মনুষ্য তাহাতে শিক্ষা পায়। ধর্ম্ম-প্রচারককে দীর্ঘ বৎসরে উপদেশ দিয়া যাহা যাহা করিতে হয়, কবি সেই কার্য্য অল্পসময়ে করিতে পারেন। ধর্ম্ম হইতে নীতি শিক্ষা এবং কবিতা হইতে নীতি শিক্ষার এই প্রভেদ।

প্রমীলার ও ইন্দুবালার চরিত্রের তুলনায় সমালোচনা হইতে পারে না। এই দুই চিত্রে কত দূর—তাহা এক সঙ্গে ধরিলে বুঝিতে পারা যায়। দূর হইতে ভ্রমণশীল পথিকের চক্ষে দুইটীই সুন্দর। চিন্তাশীলের চক্ষে তারতম্য আছে। ইঁহারা কাব্যের প্রধান নায়িকা নহেন। কাব্যে ইঁহাদিগের কার্য্য অল্পই আছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে চরিত্র প্রস্ফুটিত হইতে পারেনা। সমুদয়

কার্য্যেরই সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম না করিলে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তবে প্রমীলার ও ইন্দুবালার চরিত্র যতদূর বুঝিতে এবং জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এই দুই নারী কাব্যের কি কোন উপন্যাসের প্রধান নায়িকা হইলে, কিরূপ হইতেন তাহা কতক অনুমান করিতে পারা যায়।

প্রমীলা বীরাঙ্গণা এবং পতি-প্রেম-মুগ্ধা। কিন্তু যদি কোন কাব্যের প্রধান নায়িকা হইয়া প্রণয়-পাত্রের ভাল বাসায় নিরাশ হইতেন, তাহা হইলে নিরাশ প্রণয়ের যন্ত্রণায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন না।

অভিমানিনী হৃদয়বেগ সহিয়া এবং তাহা গোপন করিয়া আত্মাভিমানে জ্বলিয়া যান, বিনয়ের পরিবর্ত্তে অহঙ্কার দেখান। ঘৃণায়, অপমানে, প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন। তবে যে আপনার হৃদয়ময় ভালবাসা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যান তাহা নহে। প্রণয়ের প্রতি-যোগিনী থাকিলে তাহাকে বঞ্চিতা করিতে ছল বল উভয়ই দেখাইতে প্রমীলা কুণ্ঠিতা হইতেন না। ইন্দুবালা সেই অবস্থায় পতিত হইলে কি করেন? ইন্দুবালা আপনার প্রেম লইয়া সতত মুগ্ধা, প্রণয়ীকে ভালবাসা দান করিয়াই সুখী। নৈরাশ্য মনে স্থান দিতে পারেন না। কারণ প্রণয়ীর প্রতি বিশ্বাস হারাইলে আপনাকে ও তাহাকে নীচ করিতে হয়। সুতরাং তাঁহা পারেন না। ভালবাসায় নিরাশ হইলে আপনার অসীম ভালবাসা প্রতিনিয়ত নীরব ভাষায় স্নেহপূর্ণ রোদনে প্রকাশ করেন। অভিমান নাই, গর্ব্ব নাই, জীবনে মরণে সেই স্নেহ, সেই প্রেম। আত্মময় ভালবাসা অনন্তকাল সমান—বিন্দুমাত্র, অস্নেহ দেখাইতে জানেন না। শেষ মুহূর্ত্তে পবিত্র ভালবাসা লইয়া ইহ জগৎ হইতে স্বর্গে যান। এবং পরলোকেও তাহা লইয়া বিহ্বলা। ইন্দুবালা এতই প্রেমবিমুগ্ধা যে, প্রণয়ীর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও তাহা জগতে গোপন করিয়া, পরলোকের শান্তিময় হাসি হাসিয়া যান। সেই সময়ও কোমলতা ও রমণীর প্রেম। মৃত্যুর মুহূর্ত্তে স্নেহ-ভরে চুম্বন করিতে পারেন। ইন্দুবালা সকল অবস্থায় সম্পূর্ণ স্নেহ-প্রতিমা। প্রতিদানে ভালবাসা সকলেই দিতে পারে। কিন্তু নৈরাশ্যের ঘোর যাতনা সহিয়া, অভিমান—গর্ব্ব—ভুলিয়া যে ভালবাসিতে পারে, সেই সম্পূর্ণ ভাল-বাসার প্রতিকৃতি।

ইন্দুবালা ও প্রমীলায় কত প্রভেদ তাহা সহজেই অনুমেয়। চিন্তাশীল পাঠক উভয় চরিত্র চিন্তার সহিত আলো-চনা করিলে অবশ্যই বুঝিবেন দেবী ও মানবীতে কত প্রকৃতিগত বিভিন্নতা। তবে প্রমীলা উচ্চ স্থানে গর্ব্বিতা রাজ্ঞীর ন্যায় বিরাজ করিতে পারেন। পাপীর দৃষ্টিতে তাঁহার চরিত্র দূষিত হইবার

নহে, চক্ষুর সেই গর্ব্বিত দৃষ্টিতে তিনি পাপীকে নিক্ষেপ করিতে জানেন।

মেঘনাদ-বধ কাব্যের কবি তাঁহার আদর্শ চরিত্র প্রমীলাকে নির্দ্দোষ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি পবিত্র প্রেম অঙ্কিত করিতে দুই এক স্থানে ইন্দ্রিয়-সুখের কথা বলিয়াছেন। আত্মাতে আত্মাতে যে প্রণয় তাহাই প্রণয়ের পবিত্র আদর্শ। ভালবাসায় আত্মার সম্মিলন মাত্র, তাহা ইন্দ্রিয়ময় হইলেই তাহার মাহাত্ম্য হ্রাস করিয়া ফেলে। সুতরাং প্রমীলার স্নেহে যে সকল স্থানে ইন্দ্রিয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই থানেই উচ্চতা কমিয়া গিয়াছে। কাব্যের সেই সকল অংশ তুলিয়া প্রমীলার মুখে শুনাইতাম, কিন্তু কবির দোষ কীর্ত্তন এই সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। রত্নাকর হইতে অমৃত ও বিষ উভয়ই পাওয়া গিয়াছিল। এই কাব্যে অনেক রত্ন আছে। সুতরাং দোষ খুঁজিয়া বাহির করা অসুখ-জনক কার্য্য।

বৃত্রসংহার সন্ধান করিলে ইন্দুবালার চরিত্রে দোষের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলই নির্ম্মল, সকলই প্রীতিকর। কবি নির্দ্দোষ তুলিকায় ইন্দুবালায় আঁকিয়াছেন। এমন পবিত্র ভাব এমন বিশুদ্ধ চিন্তা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রধান প্রধান কোন কোন কবি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যেখানেই কবিত্বের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, সেই স্থানেই সাংসারিক ইন্দ্রিয়-সুখের উল্লেখ করিয়াছেন। কি প্রণয়-বর্ণনা কি সৌন্দর্য্য-বর্ণনা সমুদয়ই প্রায়ই ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রাবল্যে পরিপূরিত। কিন্তু বৃত্রসংহারের কবি সেই ব্যাধিমুক্ত ও উচ্চস্থানীয়। তাঁহার লেখনী বিশুদ্ধ ও পবিত্র। এই প্রস্তাব সমাপ্তিতে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র।

শ্রীনক্ষত্র নাথ দেব।

নীতি ও কবিত্ব।

"Oh! weep for the hour
When to Eveleen's bower
The Lord of the valley with false vows came;
The moon hid her light
From the heavens that night,
And wept behind the clouds o'er the maiden's shame."

THOMAS MOORE.

প্রথম যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়, তখন তাহা সাহিত্যানুরাগী পাঠকমণ্ডলী কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। সেই সময় আমরা ভরসা করিয়াছিলাম যে ইহা স্থায়ী হইয়া দিন দিন বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু কালের স্রোতে সে সকল আশা ভাসিয়া

গেল। বঙ্গদর্শন সহসা অন্তর্হিত হইল। সংসারে ভাল দ্রব্য বিরল, তাহার বিনাশ শোচনীয়; সুতরাং বঙ্গদর্শনের অকাল মৃত্যু সহৃদয় পাঠকের মনে বাজিল।

ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গদর্শনে" প্রায়ই অতি উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর দ্রব্য থাকিত। তাহাতে অনেক শিক্ষাস্থল, জ্ঞানগর্ভ, উপদেশপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। "বিষবৃক্ষ" প্রথম বঙ্গদর্শনেই বাহির হয়। তাহার জ্যোতির্ম্ময়ী সূর্য্যমুখী, স্নেহপ্রাণভূতা কুন্দনন্দিনী এবং হাস্যমুখী, রহস্যপ্রিয়া কমলমণিকে কখন ভুলিতে পারা যায় না। মনুষ্য-জীবন অদ্য আছে, কল্য নাই সত্য; কিন্তু কীর্ত্তি অমর। যে মস্তিষ্ক হইতে এ সকল বিচিত্র ছবি নির্গত হইয়াছে, কালে তাহা নিশ্চয় ধূলিতে মিশাইয়া যাইবে, কিন্তু তাহার সহিত সেই চিত্রগুলি মিশাইয়া যাইবে না, এবং চিত্রকরের কীর্ত্তিও লোপ হইবে না। যে বঙ্গদর্শন এ সকল চিত্রের আধার, সকলেই তাহার গৌরব স্বীকার করিবে। কিন্তু সেই বঙ্গদর্শনের

* * * * *
* * * * *

কবিতা বা উপন্যাস প্রীতিকর লঘু পাঠ, সেইজন্য অনেক সময় অন্য গুলি পরিহার করিয়া পাঠকগণ তাহাই পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুকুমারমতি বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, সকলেই কবিতা পাঠ করিতে উৎসুক। অমৃত সকলের নিকটই আদরের দ্রব্য। কিন্তু যদি তাহার সহিত গোপনীয় ভাবে বিষমিশ্রিত থাকে, তাহা আশু অনিষ্টকর না হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে সেই বিষাক্ত অমৃত প্রাণনাশ করিবেই করিবে।

অমিশ্রিত বিষ পানের যন্ত্রণা অল্পক্ষণ থাকে, অতি শীঘ্রই মৃত্যু হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অজানিত বিষ শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিলে, শেষে মৃত্যু যন্ত্রণা অসহনীয় হয়। গরলময় কবিতা পাঠে হৃদয় ক্রমে ক্রমে দূষিত হইয়া যায়, ক্রমশঃ বিষময়ী চিন্তা অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যকে কুপথে লইয়া যায়।

আধুনিক অনেক কবির রুচি অপূর্ব্ব। নরনারী প্রেম ব্যতীত আর কিছু লিখিবার দ্রব্য যে জগতে আছে, তাহা তাঁহাদের সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারে না। অপবিত্র ও কুরুচি সম্পন্ন ভাষায়, অপবিত্র ও নীচ-প্রবৃত্তি প্রণয় গাইয়া, আপনাদিগের মহিমা প্রকাশ করা অনেক মহাপুরুষদিগের ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। পাপ-পরিণত কবিত্ব সাধুজনহৃদয়ে নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক। পাপময় প্রণয়ের যে মাদক সুখ তাহা অনুভব করার সৌভাগ্য সাধুব্যক্তিগণের অদৃষ্টে হয় নাই বলিয়া, বোধ হয় তাঁহারা ঈর্ষ্যাবশতঃ পাপাত্মক কবিতার বিরোধী।

হতভাগ্য বঙ্গবাসী আপনার হিত চিন্তা করে না, সুতরাং কিসে জাতীয়-জীবন উন্নত হইবে তাহার আশু চিন্তা না করিলে আশ্চর্য্যের তত বিষয় নহে।

কিন্তু আপনার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র অথবা ভগ্নী যে সকল পুস্তক বা পত্রিকা পাঠ করেন, তাহার প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি না রাখা অতীব আশ্চর্য্য ও নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। সন ১২৮৫ সালের ফাল্গুন মাসের বঙ্গদর্শন, * * * * * * দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমাদিগের চক্ষে পড়িয়াছে। তাহাতে একটী কবিতা আছে, নাম "প্রত্যাখ্যান"। সেইটীর বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। সংক্ষেপে, তাহার মর্ম্ম এই—একজন পুরুষ অতি অল্প বয়সে একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং বিদায়কালে তাহাকে "অন্ধকারে আলিঙ্গন" করিয়া চলিয়া যাইল, কিন্তু নারীটী তাহাকে ভালবাসে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার সাহস হয় না। সুতরাং বিদেশে থাকিয়া মন বড়ই প্রণয়িনীর স্মৃতি-যন্ত্রণাতে দগ্ধ হইতে লাগিল। অতঃপর এই স্ত্রীলোকটীকে ভুলিয়া যাইবার নিমিত্ত নৈরাশ্যের যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য, পুরুষটী নানা প্রকার পাপে রত হইল। যখন তাহার মন "পাপারণ্য" হইল, অর্থাৎ পাপে ভরিয়া উঠিল, তখন পথে আবার উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। সেই সাক্ষাৎ "নিশীথে", তাহাতে তাহারা উভয়কে পরস্পর ভাল বাসে, এই কথা অনেক কাঁদিয়া ফুঁপিয়া বলিল, এবং আবার আলিঙ্গন করিল। এইবারকার আলিঙ্গনের বিস্তৃত অশ্লীল বর্ণনা। ইহার পরে দুইজনের আবার এক দিন সাক্ষাৎ হইল। তখন স্ত্রী-লোকটী পুরুষটীকে ঘৃণা করিতেছে, তদ্দত্ত মালা ফিরাইয়া চাহিতেছে। পুরুষটী পা ধরিয়া কান্না কাটি করিতেছে ও ক্ষমা চাহিতেছে। স্ত্রীলোকটী ক্ষমা করিল না এবং মালা ফিরাইয়া লইয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেল। পুরুষটী "চীৎকার করিয়া" "প্রাণেশ্বরি—প্রাণ, কি অপরাধে বল এই প্রত্যাখ্যান" ইত্যাদি কবিত্বময় কথা বলিয়া মাটীতে পড়িয়া মরিয়া গেল, এবং যেখানে মরিয়াছিল সেখানে একটী সমাধি প্রস্তুত করা হইল।

এখন, এই কবিতাতে পুষ্পহার কি তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। পরিণীতা ভার্য্যা, স্বামী দুরাচার হইলেও, তাঁহার নিকট বরমাল্য ফিরাইয়া লইয়া, বিবাহের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, চলিয়া যাইতে পারেন না। যত অসুখ হউক না কেন, তাহা সহিয়া তাঁহার থাকিতে হয়। সুতরাং তাহার কিছু ফিরাইয়া লইবার ক্ষমতা নাই। এ প্রত্যাখ্যান অন্যরূপ প্রণয়ের তাহা সহজেই মনে হইতে পারে। "প্রত্যাখ্যানমুখী বামা" যে পরিণীতা পত্নী নহেন, তাহা বুঝিতে কাহারও ভুল হয় না। যুবক যুবতী কুমার কুমারী তাহা প্রকাশ নাই। সে যাহা হউক এইটী নিশ্চয় যে ঐ প্রণয়ের মূলে ধর্ম্ম ও নীতি দূষিত হইয়াছে, এবং সম্ভব যে ধর্ম্ম ও নীতিকে পরিণামে

গোপনে হত্যা করা হইয়াছে। নতুবা "অন্ধকারে সঙ্কুচিতে দিলে আলিঙ্গন" এ কথা কেন? বিবাহিতা স্নেহময়ী পত্নী, পতির বিদেশ গমন কালে, বিরহ-বিহ্বলা—আলিঙ্গন দিতে সঙ্কুচিত হইবেন কেন? তাঁহার সে আলিঙ্গন পবিত্র তাহাতে ভয় এবং সঙ্কোচ কি? পতি পত্নীর সম্বন্ধ ধর্ম্মময়। তাহা সকল সময়ই সঙ্কোচ ও ভয় শূন্য। "অন্ধকারে আলিঙ্গন" অপবিত্র ও দুরভিসন্ধিযুক্ত হইলেই সঙ্কোচ ও ভয় উপস্থিত হয়। যেখানে ধর্ম্মের স্বর্গীয় আলোক নাই, সেখানে সকল কার্য্যই "অন্ধকারে" ও সঙ্কুচিত ভাবে। উপাংশু-হত্যাকারীর মৃত্যুময় আলিঙ্গন "অন্ধকারে" ও "সঙ্কুচিতে।" দস্যুর কার্য্য "অন্ধকারে, সঙ্কুচিতে;" এবং গৃহস্থ-গৃহে তস্করের অপেক্ষা হেয় ও ভয়ানক লম্পটের আলিঙ্গন "অন্ধকারে ও সঙ্কুচিতে।" ঘৃণিত ও ভয়ানক পাপিষ্ঠের লালসা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত অন্ধকারের আবশ্যক। সেক্ষপিয়র বলিয়াছেন শিলানির্ম্মিত প্রাচীরও প্রণয়ীর গতিকে বাধা দিতে পারে না *। "প্রত্যাখ্যানে" আমরা দেখিতেছি অন্ধকারে প্রণয়ের বাধা দিতে পারে না।

"ধর্ম্মে প্রেম কি দিব্য নয়ন,
অন্ধকারে দেখে থাকে যথা প্রিয়জন।"

প্রেমের দিব্য নয়ন, স্বর্গীয় দৃষ্টি, অন্ধকারেও তাহার প্রিয়জনকে দেখিতে পায়; এই স্বর্গীয় দৃষ্টির প্রভাবেই বোধ হয় নায়ক পার্শ্বস্থিত মাতার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া, "অন্ধকারে সঙ্কুচিতভাবে" অবিবাহিতা নারীকে আলিঙ্গন করিতে পারে; এই স্বর্গীয় দৃষ্টির প্রভাবে, বোধ হয় লম্পট অন্ধকার রাত্রিতে কুলটার শয্যা খুঁজিয়া লইতে পারে—এই সকল কথা লিখিতে আমাদিগের লেখনী লজ্জাতে অচল হইয়া আইসে, ঘৃণা ও ক্রোধে হৃদয় অস্থির হয়। এই প্রকার ভাষা, এই এই প্রকার চিন্তাকে আমরা কি বলিব? ইহা স্বর্গের অবমাননা, ইহা ঈশ্বরের অবমাননা। ইংরাজিতে ইহাকে স্যাক্রিলেজ্ (sacrilege) এবং ব্লাস্ফিমি (blasphemy) বলা যাইতে পারে।

"প্রাণাধিকে! ক্ষমা কর; ক্ষম সম্বোধন", "প্রাণাধিকে" এই সম্বোধনের নিমিত্ত ক্ষমা চাহিবার আবশ্যক কি? আপনার স্বাধীন ইচ্ছায় পাপকণ্ঠে অযথা সম্বোধন করিয়া মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতেই বোধ হয় ক্ষমা চাহিবার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রিয় সম্বোধন পরিবারের মধ্যে প্রায় সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কি পিতা পুত্রের নিকট, মাতা কন্যার নিকট, স্বামী স্ত্রীর নিকট, ক্ষমা প্রর্থনা করিয়া থাকেন? নায়কের অপরাধ-সম্বন্ধে সতর্ক হইলে ভাল ছিল; তাহা হইলে এ কলুষিত কবিতা কেহ দেখিতে পাইত না।

---

* "With love's light wings did I o'er perch these walls
For stony limits cannot hold love out."
ROMEO AND JULIET.

নায়ক নায়িকাকে বলিতেছে,

"দয়াময়ি! দারুণ নিরাশা
দ্বাদশ বৎসর বক্ষে করিয়া বহন,
কত পাপে ডুবাইতে করেছি যতন।"

প্রণয়ের প্রিয় পুত্তলিকা ভুলিবার নিমিত্ত "কত পাপে," অর্থাৎ নরকে, কি নিমগ্ন হওয়া আবশ্যক? প্রণয়ের নৈরাশ্যের শান্তি কি নরকে? হতাশ প্রণয় ভুলিবার নিমিত্ত কি নিত্য নিত্য নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি, এবং সতীর সতীত্ব নাশ করিতে হইবেক? এইটী "বঙ্গদর্শনের "প্রত্যাখ্যান" কবির উপদেশ। প্রণয়ে লোকে পুণ্যাত্মা হইবে। প্রণয় স্বর্গে লইবার উপকরণ। মনুষ্য স্বজাতির প্রণয়ে মাতৃভূমির উপকার করিবে, পরিবারিক প্রণয়ে আপনাকে উচ্চ করিবে, বিবাহের প্রণয়ে ধর্ম্মজ্ঞান দৃঢ় করিবে। সমুদায় মহৎ কার্য্যের মূলই প্রণয়। প্রণয় মনুষ্যকে নরকের ঘৃণিত কীট করিয়া ফেলিবে এ কোন্ জ্ঞানীর কথা? পাপাত্মক প্রণয়ই মনুষ্যকে নরকে লইয়া যায়, মনুষ্যের আত্মাকে "কত পাপে ডুবাইয়া" দেয়—

কবির আবল্যময়ী কবিতা মানব-হৃদয়ের আনন্দ। কবির সঙ্গীত নীতিপূর্ণ হইবে, অন্ততঃ কখন নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না, কবি জগতের সুনীতি-শিক্ষক, কবি দেশের ত্রাণকর্ত্তা। কিন্তু হায় অদ্য সেই কবিতা কোথায়?—কোথায় সেই কবিত্ব যাহা আমাদিগের জীবন, যাহা আমাদিগের গতি, যাহা উন্নতি, যাহা কার্য্যের কেন্দ্রীভূত অগ্নি; যাহা অন্ধকার-পথের নক্ষত্র। সেই কবিত্ব অদ্য বঙ্গদেশে কোথায়, যাহা জাতীয় নৈরাশ্যের ক্রন্দন-ধ্বনি, যাহা জাতীয় আশার গীতি, যাহা ভূতকালের ইতিহাস, যাহা ভবিষ্যতের দৈববাণী *—যাহা ধর্ম্মের বল, স্বদেশানু-রাগের নির্ঝর, কুনীতির সহায়, পবিত্র প্রণয়ের গৌরব, নিপীড়িতের আশ্বাস, সাধুর আনন্দ, মনুষ্যত্বের বিকাশ, দেব-ভাবের আবির্ভাব—সেই কবিত্ব অদ্য বঙ্গদেশে নির্ব্বাসিতপ্রায়, অথবা নীরব। এখন সাময়িক পত্রিকা, বাহক হইয়া দূষিত কবিত্বের বিপদ্জনক বিষ বঙ্গীয় পাঠকগণের হৃদয়ে আনিয়া দিতেছে। সেই কলুষিত বিষ আমরা অথবা অন্য পাঠকগণ, এই মহার্ঘ সময়ে, অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া গৃহে আনিতেছি বা আনিতেছেন। অধঃপতিত সমাজ, হতভাগ্য বঙ্গবাসী, আপনার ও পরিবারের মঙ্গলচিন্তা না করিয়া যে সর্ব্বনাশকর কুনীতির বীজ গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপণ করিতেছে, তাহার বিষাক্ত ফল ভবিষ্যতে কি ভয়ানক না হইতে পারে?

প্রণয়ের গীত মাত্রই কি অপবিত্র? আমরা তাহা বলি না। ভারতীয় মহা-কবি, যে প্রণয়ের গীত গাইয়া জগৎ মুগ্ধ ও স্তব্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে গীত

* See Mazzini "Thoughts addressed to the Poets of the nineteenth century." Life and Writings of Joseph Mazzini vol. I, p. 139. et sequel.

সংসারে অতুলনীয়। কালীদাস গিয়াছেন, তাঁহার মধুর ও বিশুদ্ধ শকুন্তলা আজিও জীবিতা। কালের অনন্ত প্রহারে তাঁহার নির্ম্মল কীর্ত্তি ভগ্ন হইয়া যাইবে না। কত বিদেশীয় কবি, কত কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ, তাঁহার শকুন্তলা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কোথায় ভারতবর্ষ, আর কোথায় জর্ম্মনি। জর্ম্মনি হইতে শকুন্তলাকে দেখিয়া গেটে (Goethe) মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রণয়-গীতি স্বর্গীয় ভাবে গাইলে কেনই না আদরণীয় হইবে।

ভারতবর্ষে, যাহার ধমনীতে একবিন্দুমাত্রও আর্য্য-শোণিত আছে তাহারই নিকট বাল্মীকির সীতা স্নেহের সহিত পূজনীয়া। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সীতা কবির মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইলেন, তাঁহার দুঃখে কোন্ হিন্দু অশ্রু বর্ষণ না করেন, তাঁহার স্নেহে কোন্ হিন্দু দ্রবীভূত না হন, তাঁহার পবিত্রতায় কোন্ হিন্দু বিশুদ্ধ না হন? বিদেশীয় সেক্ষপিয়র আজি নাই, কিন্তু তাঁহার পবিত্র রোমিও জুলিয়েট, কালের অনন্ত গগনে জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্ররূপে আলোক দান করিতেছে। প্রণয় কি স্বর্গীয় সামগ্রী নহে? ইতালীয় বিখ্যাত কবি দান্তে (Dante) কি স্বর্গীয় প্রণয়-গীত গাইয়াছেন! তাঁহার জীবন ও গ্রন্থের, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদায়ের, নায়িকা বিত্রীচ (Beatrice)। তাঁহাকে পরিহার করিয়া দান্তের জীবন এবং কাব্য বৃথা। তিনি তাঁহার আবাধ্য প্রতিমা সম্বন্ধে ডিভাইনা কমেডিয়া (Divina Commedia) নামক অতুলনীয় মহাকাব্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা কোন রমণী সম্বন্ধে অন্য কেহ কখন বলেন নাই। সেই নিমিত্ত বুঝি কার্লাইল (Carlyle)* তাঁহাকে সেক্ষপিয়রের প্রায় সমতুল্য স্থান দিয়াছেন। দান্তে বার্জ্জিলের (Virgil) পরলোকগত আত্মার সমভিব্যাহারে নরকদর্শন করিলেন। কিন্তু স্বর্গ পরিদর্শন কালে তাঁহার প্রণয়পাত্রী বিত্রীচ তাঁহার নেত্রী†। ইহাতে আমরা কি বুঝিলাম? বুঝিলাম, রমণীর পবিত্র প্রেম স্বর্গে লইয়া যাইবার যোগ্যদ্রব্য। কবির নিকট অন্য লোক মনুষ্য, বিত্রীচ (Beatrice) দেবী, সুতরাং দেবতার সহায্যেই স্বর্গদর্শন সঙ্গত। এই প্রণয়ের মহত্ব ভাষাহীন কবিত্ব।

একে বঙ্গভূমি পতিত, তাহার উপর নীচাশয় কবির অত্যাচার, ইহা অসহনীয়। দূষিত প্রণয়গীত পরিহার করিয়া, কিসে মাতৃভূমি উন্নত হইবে, কিসে ভাই ভগিনী উচ্চ জ্ঞান পাইবে, কিসে তাহাদিগের স্বাধীন চিন্তা করিতে ক্ষমতা হইবে, এই সকল বিষয় নীতিপূর্ণ উচ্চ

* See Carlyle's "Lectures on Heroworship," Lec. on Dante.

† See Carey's Translation of Dante's Works, Mrs. Jameson's "Loves of the Poets," Chap, on Dante; and its criticism by Prof. Wilson in his Collected works.

ভাষায় লিখিলে কি ক্ষতি আছে? মাতৃভূমি বঙ্গদেশ ক্রমে কুসন্তানের অত্যাচারে আরও নীচগামী হইতে চলিল। ইহা অবশ্য সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তরে দারুণ যন্ত্রণা-প্রদ। হতভাগ্য বঙ্গসুত, বিজাতীয় পদাঘাত, সতত নীরবে, মস্তকে পাতিয়া লইয়া দাসত্বে জীবন বাঁধিয়া চাতুরী ও তোষামোদে কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আবার দলিত মস্তক উচ্চ করিয়া সামাজিক ও নৈতিক আচার বিরুদ্ধ প্রণয়গীত গাইতে কি লজ্জা বোধ করে না? এ প্রকৃতির লেখকসকলকে সমাজ শাসন করিবে ইহা প্রত্যাশিত। ইহারা ক্রমে প্রশ্রয় পাইয়া পাপলিপ্ত কবিতারূপ বিষাক্ত ছুরিকা নিদ্রিত সমাজের বক্ষে প্রবেশ করাইতেছে, তবু যে কেন সমাজ এ বিষয় জাগ্রত হইয়া দৃষ্ট করিতেছে না তাহা বুঝিতে পারি না।

আর এক কথা। আমাদিগের দেশের শিক্ষিতা নারীর মধ্যে অনেকেরই বাঙ্গালা ভাষা একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং তাঁহারা অবকাশকালে, বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকা প্রভৃতি পড়িয়া থাকেন। সেই সকল সরল বালার নির্দ্দোষ চিন্তা যাহাতে কলুষিত হয়, এমন পদ্য কি গদ্য মুদ্রিত করা কখন উচিত নহে। এ বিষয়ে সমাজের দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

“প্রত্যাখ্যান” কবিতার ছত্রে ছত্রে যে সকল দূষিত ভাব প্রতীয়মান হইতেছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে দেখাইতে পারিলাম না। কারণ সেই লজ্জাহীন কবিতার প্রতি কথার সমালোচনা করিয়া, অর্থমর্ম্ম ও উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে চিত্র করিতে আমাদিগের লজ্জা বোধ হয়। কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায়, লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হইবে, নীতি বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এমন কোন ব্যবস্থা নাই। নায়কের সুখে ইন্দ্রিয়সুখের বর্ণনাকালে, “প্রত্যাখ্যান” লেখক, * * * * * * ন্যায় নানাবিধ জঘন্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। * ইহাতে মনে একটী যন্ত্রণাজনক সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহা কতদূর সঙ্গত পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাহা এই—হয়ত ইহা কোন প্রত্যাখ্যানকারিণী নারীর দৃষ্টিতে পড়িবার নিমিত্ত সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। হয়ত কোন অবলা, দীর্ঘকাল অনুসৃত হইয়া, অজ্ঞানান্ধ হৃদয়ে, কোন পরপুরুষকে, আপনার সহিত পাপপূর্ণ চরম স্বাধীনতা লইতে দিয়াছিল, এক মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় বহুকালের রক্ষিত অমূল্য ধন হারাইয়াছিল। তৎপরে তাহার চৈতন্য উদয় হইলে, বুঝিতে পারিল নরাধম নায়ক কৌশল করিয়া সুবিধা পাইয়া, তাহাকে ভুলাইয়া ধর্ম্মচ্যুতা করিয়াছে। তখন নায়কের প্রতি ঘৃণা হইল। সেই কারণে, পূর্ব্বে ভালবাসার যে নিদর্শন

দিয়াছিল সেই সমুদায় দ্রব্যগুলি ফিরাইয়া লইয়া।—

" স্থির কণ্ঠে কহিলা কামিনী
"সব তীব্র অনুতাপ কিন্তু যেন আর
ঘৃণিত বদন পুনঃ না দেখি তোমার"।

তৎপরে পুরুষটী বোধ হয় রমণীটীকে আবার কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু নিষ্ফল হয়, ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যাত হয় এবং তাহার পত্রাদি অপঠিত অবস্থায় ঘৃণার সহিত পুনঃ প্রেরিত হয়। অবশেষে সেই আদর্শ পুরুষটী, বঙ্গদর্শনে তাহার প্রার্থনা কবিতাকারে মুদ্রিত হইলে, স্ত্রীলোকটীর নয়নে পড়িতে পারে এই বিবেচনা করিয়া,এই "অন্ধকারযুক্ত" ইঙ্গিতময় কবিতা বঙ্গদর্শনে পাঠাইল।

অথবা আর এক সন্দেহ হইতে পারে। হয়ত কোন মহিলা একজন পুরুষকে বিশুদ্ধ ভাবে, ভ্রাতার ন্যায়, ভাল বাসিতেন,এবং আপনার অভিভাবকের জ্ঞাতসারে, সরল মনে দ্রব্যজাত উপহার দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বামী এবং অন্যান্য আত্মীয়জন কোন দোষের বিষয় বিবেচনা করেন নাই। পরে পুরুষটী কোন বিস্ময়কর ও ঘৃণিত প্রস্তাব করাতে ভদ্র-মহিলা রোষ-মিশ্রিত ঘৃণার সহিত তাঁহাকে, প্রত্যাখ্যান করিলেন, উপহার বস্তু ফিরাইয়া লইলেন, এবং পরিবারের সকলকে এই ব্যক্তি ঘৃণার পাত্র তাহা বলিয়া দিয়া সেই পরিবারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ করিবার বা পত্রাদি লিখিবার পথ রোধ করিয়া দিলেন। তাহার পর, সেই পাষণ্ড নৈরাশ্যে, ক্রোধে, ঘৃণায় জর্জ্জরীভূত হইয়া, কাপুরুষের ন্যায় আপনাকে শাসন-ভয়ের বহির্ভূত রাখিয়া, এই সাঙ্কেতিক কবিতা লিখিয়া সেই সাধু পরিবারকে অপমান করিতেছে। আমরা যাহা লিখিলাম তাহা সন্দেহ মাত্র, তাহা আমাদিগের আশঙ্কা মাত্র। হয়ত আমরা অতি সূক্ষ্মদর্শন করিতে গিয়া, মনে অমূলক আশঙ্কা স্থান দিতেছি। যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের আশঙ্কা যথার্থই অমূলক, তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইব, এবং অজ্ঞাত "প্রত্যাখ্যান" লেখকের উদ্দেশে, এই কবিতার অর্থ ব্যক্তিগত হইতে পারে এই সন্দেহ করার নিমিত্ত, (অন্য যাহা কিছু বলিয়াছি তাহার নিমিত্ত নহে), আমরা বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

কিন্তু এখন কথা এই আমরা এতৎসম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা প্রকৃত ঘটনা হইবার যদি বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা থাকে, যদি সম্ভাবনার ছায়া মাত্রও থাকে তাহা হইলে কোন সম্ভ্রান্ত পত্রিকায় এই প্রকার কবিতা মুদ্রিত করা উচিত কি না? আর, এই " প্রত্যাখ্যানের " রচনাও অতি নিকৃষ্ট। কোন চরণে মিল আছে, কোন চরণে মিল নাই, যতিভঙ্গ পদে পদে, কল্পনা-লহরী ও "চুম্বনের গোলাপবৃষ্টি" "বিজুলির খেলা"

"ক্ষুদ্রতটীনীতে" পর্য্যবসিত। ইহা অতি সামান্য ও অভ্যস্ত ব্যক্তির লেখা তাহার সন্দেহ নাই। সে কথা যাউক, কারণ যদি এই কবিতা লালিত্য সম্বন্ধেও অত্যুৎকৃষ্ট হইত, তাহা হইলেও ইহা কোন পাঠ্য পত্রিকায় স্থান পাইবার যোগ্য হইত না। "প্রত্যাখান" লেখক কে তাহা আমরা জানিনা। তিনি যে বর্ত্তমান বঙ্গদর্শনের একজন কবি তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। * * * * * * আমরা "বঙ্গদর্শন" সম্পাদককে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি যেন পুনর্ব্বার এইপ্রকার দূষিত কবিতা প্রকাশিত না করেন। * * * * * * * * দূষিত লেখা বা তদ্রূপ রচনা আর যেন আমাদিগের নেত্রগোচর না হয়। এই কবিতা যদি কবির প্রথম উদ্যম হয় তাহা হইলে শীঘ্রই তাঁহার লেখনী ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ করুন। আর বিষময়ী লিখিয়া বিষময় ফলোৎপাদন করিবার আবশ্যক নাই।

বঙ্গীয় সাময়িকতা পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট আমাদিগের সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা এই প্রকার গরলময়ী কবিতা আপন আপন পত্রিকায় স্থান দিয়া, নির্ম্মল চিত্ত কলুষিত না করেন। তাঁহাদিগেব পত্রিকা ভদ্র পরিবার মধ্যে পঠিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা আমাদিগের এই মিনতিটী রাখিলে, সাধু সমাজ নিশ্চয়ই তাহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইবেন, বঙ্গবাসিগণ নিঃশঙ্কচিত্তে বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা আপনাদিগের অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন। আমরা বহুদিন হইতে বিশেষ রূপে দেখিয়া আসিতেছি যে ক্রমেই দুরাচার নীচাত্মা লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতেই এই অপ্রীতিজনক প্রবন্ধ লিখিতে হইল।

শ্রীপ্রভাতরবি ভাদুড়ি

বেদ-বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত।

সাংখ্যদর্শন।

এই দর্শনকারের নাম মহর্ষি কপিল। কিন্তু কপিল নামে অনেক মহর্ষি ছিলেন, তন্মধ্যে সাংখ্য-প্রণেতা কে তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মার পুত্র কপিলের প্রসঙ্গ আছে। তিনিও সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রণায়করূপে কবিতা বিখ্যাত। আবার কপিল নামে বিষ্ণুর অবতার আছেন, আর সেই কপিল সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রণেতা এমন বর্ণনাও আছে। রামায়ণে ঐ কপিলের প্রসঙ্গে কথিত আছে, যে সগর রাজার ষষ্ঠি সহস্র পুত্র তাঁহারি কোপানলে ভস্মীভূত

হয়; ভাগবতে এই আখ্যায়িকাতে সংশয় প্রকাশ আছে, কেন না এমত বহুল-প্রাণি-সংহার সত্ত্বগুণপ্রধান বিষ্ণু-অবতারও সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রণেতার উপযুক্ত নহে।

বৌদ্ধদিগের ইতিহাসেও কপিল মুনির প্রসঙ্গ আছে। তাঁহারা কহেন ইক্ষ্বাকু বংশে ইক্ষ্বাকু বিরোধক নামে এক রাজা হয়েন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল, তিনি প্রথমা মহিষীর পরলোক হওয়াতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। সেই দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তানকে রাজ্য দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় প্রথম পক্ষের কুমারগণকে নির্ব্বাসিত করেন। নির্ব্বাসিত রাজকুমারেরা সহোদরা পাঁচটী ভগিনীকেও সঙ্গে লইয়া আইসেন; এবং বহুদিনের পর কপিল মুনির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হয়েন। ঐ কপিল মুনি তাৎকালিক বোধিসত্ত্ব ছিলেন এবং পরে গোতম বুদ্ধ হইয়া ছিলেন। কপিলের আদেশানুসারে রাজকুমারেরা অগ্রজা ভগিনীটীকে পরিবর্জ্জন করিয়া অনুজা চতুষ্টয়াকে চারি ভ্রাতা বিবাহ করেন এবং ঐ স্থানের নাম কপিলাবস্তু নগর রাখেন। পরে ঐ নগরে তাঁহাদের বংশে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ শাক্য মুনি জন্মগ্রহণ করেন। যিনি শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ।

সাংখ্য-শাস্ত্র-রচক কপিলের এইরূপ নানা পরিচয় পাওয়া যায়, বোধ হয় শেষোক্ত কপিল সাংখ্য-শাস্ত্র-লেখক হইবেন! যাহা হউক, ইনি স্পষ্টতঃ অনীশ্বরবাদী; তজ্জন্যই তাঁহার প্রণীত দর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শন কহে। মহর্ষি কপিল নাস্তিক হইলেও বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না।

কাপিল সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ৯২।৯৪ সূত্রকে তামস সূত্র কহে, কেন না তথায় বিশ্বসৃক্ পরমাত্মার অস্তিত্বাভাব। যথা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ উভয়থাপ্যসৎকরত্বং।"

কপিলের মতে প্রবৃত্তি-পরবশ হইলে কোন পুরুষ যথার্থ মুক্তাত্ম হইতে পারেন না, এ কারণ পুরুষের কর্তৃত্ব নাই তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র। তিনি আরো কহেন প্রবৃত্তি ব্যতীত পুরুষের কার্য্য অসম্ভব, অতএব প্রবৃত্তি-পরবশ না হইলে পুরুষ জগৎ স্রষ্টা হইতে পারেন না। কিন্তু প্রবৃত্তি-পরবশ হইলে তাঁহার বন্ধ নিশ্চয় ও মোক্ষের হানি হয়, সুতরাং শক্তিরও হানি, কেন না বদ্ধাত্মার দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভু। প্রবৃত্তি থাকিলে শক্তি থাকে না, শক্তিমান্ মুক্তাত্ম হইলে প্রবৃত্তি থাকে না, অতএব সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের ইচ্ছা হইলেও শক্তি থাকে না, শক্তি থাকিলেও ইচ্ছা হয় না।

সাংখ্যদর্শন যদিও নিরীশ্বরবাদে পরিপূর্ণ, তথাপি ইহার গুণ-গৌরব পুরাণ ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কথিত আছে "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং ফলং।"

কপিলের মতে কেবল বিজ্ঞান দ্বারা

সাংসারিক ত্রিতাপের মোচন সম্ভাব্য, সেই বিশ্রাম লাভের তিন উপায়—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি এবং শব্দ। তাঁহার মতে পঞ্চবিংশতি পদার্থ বিজিজ্ঞাস্য। আদ্য পদার্থ প্রকৃতি, অন্ত্য পদার্থ পুরুষ। প্রকৃতির লক্ষণ—গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই নিত্য। তদ্ভিন্ন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ত্রয়োবিংশতি পদার্থ—যথা মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি। বোধ হয় মহর্ষি কপিলের মত গ্রহণ করিয়া মৎস্য পুরাণে প্রকৃতির সৃষ্টি-ক্রিয়া ও গুণরাশি লিখিত হইয়াছে।

পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থে কেবল বঙ্গানুবাদ মৎস্য পুরাণ ৩য় অধ্যায় হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থায় অবস্থানের নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতেই প্রজা-সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতি বিকৃতি-প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই মহত্তত্ত্ব ইহলোক মহান্ এই নামে বিখ্যাত আছে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি। অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে বুদ্ধির অনুগত পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং কর্ম্মের অনুগত পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধীন্দ্রিয় যথা শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা;—কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা হস্ত পাদ পায়ু উপস্থ ও বাক্। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বুদ্ধীন্দ্রিয়ের। আর উৎসর্গ, আনন্দ, আদান, গতি ও আলাপ—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের। মন একাদশ ইন্দ্রিয় ও উভয়াত্মক। ইহাতে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সমুদয় গুণই আছে। মন সিসৃক্ষা হেতু প্রেরিত হইয়া সৃষ্টিকে বিকৃত করে। শব্দতন্মাত্র বিকৃত হইয়া শব্দ-গুণাত্মক হইয়া আকাশের সৃষ্টি হয়, আকাশ বিকৃত হইয়া শব্দ-স্পর্শ-গুণাত্মক বায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, স্পর্শ-তন্মাত্র বায়ু বিকৃত হইয়া শব্দ স্পর্শ ও রূপ—এই ত্রিগুণাত্মক তেজের সৃষ্টি হয়, তেজ বিকৃত হইয়া শব্দ স্পর্শ রূপ রস এই চতুর্গুণাত্মক জল উৎপন্ন হয়, এই জল জলতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হওয়াতে ইহার রস গুণই অধিকাংশ। গন্ধ-তন্মাত্র হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পঞ্চ-গুণময়ী ভূমির উৎপত্তি হয়, উক্ত তত্ত্ব সমুদায়ের মধ্যে পুরুষ পঞ্চবিংশ হইতেছেন। এই পুরুষ স্বাধীন নহেন। মৎস্য পুং ৩য় অং অবিকল সাংখ্য দর্শন।

সাংখ্য-দর্শন-লেখক মহর্ষি কপিল তাঁহার দর্শনে বেদ-বিষয়ে কোন তর্ক উপস্থিত করেন নাই, পূর্ব্বেই তিনি বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না। তিনি জ্ঞান-বলে জানিতেন অদ্য বর্ণাশ্রম-বিরোধী হইয়া বেদ অমান্য করিলে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। তাই অতীব কাতর ভাবে লিখিলেন যে মুক্ত কিম্বা বদ্ধ কোন ব্যক্তি এমন গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না। অতএব উহা অপৌরুষেয়। যথা "ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ। মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ"।

অতএব সাংখ্যদর্শনমতে বেদ অপৌরুষেয় ও প্রমাণ।

এক্ষণে সাংখ্যদর্শন সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মহর্ষি কপিল মুক্ত কণ্ঠে তারস্বরে স্বতন্ত্র প্রকৃতিকেই জগৎস্রষ্ট্রী কহিয়া পুরুষের অধিষ্ঠান নগণ্য করিয়াছেন। যথা—

"প্রকৃতি র্বাস্তবী পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ। অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনাযোদাহবৎ। অচেতনত্বেপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য। কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্ব্বা কালাদেঃ প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ। নিত্যত্বেপি নাত্মনঃ যোগ্যত্বাভাবাৎ। সর্ব্বত্র কার্য্য দর্শনাৎ বিভুত্বং। সাং সূত্র।

অর্থাৎ প্রকৃতিই বাস্তবিক কারণ, পুরুষের কারণত্ব অধ্যাসমাত্র। প্রকৃতিসংযোগ হইলেও পুরুষের কারণত্ব নাই, যেমন অগ্নিসংযোগে লৌহের দাহিকা শক্তি হয়না; তদ্রূপ প্রকৃতি অচেতন হইলেও তৎকার্য্যে কোন বাধা নাই, যেমন দুগ্ধ আপনি দধ্যাকারে পরিণত হয়। প্রকৃতিই আদ্য উপাদান, অন্য সকলের কার্য্যরূপ বর্ণনা শ্রুত হইয়াছে। পুরুষ নিত্য বটেন, কিন্তু ক্ষমতাহীন হওয়াতে কোন কার্য্যকারী নহেন। প্রকৃতির কার্য্য সর্ব্বত্র আছে তন্নিমিত্ত প্রকৃতির বিভুত্ব।

বেদান্ত দর্শন প্রণেতাও ঠিক্ এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তবে কপিল স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন বাদরায়ণ কৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যথা—

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীর প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামজোঽন্যঃ॥"

অর্থাৎ এক অজ সংযুক্ত হইয়া লোহিত কৃষ্ণ শুক্ল এবং বহুল সরূপ প্রজা উৎপাদিকা এক অজাকে ভোগ করেন, অন্য অজ ভুক্তভোগ্যা অজাকে ত্যাগ করেন। এস্থলে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা অজা শব্দে সত্ব-রজ-স্তমো গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতিকেই বুঝায়, এবং তদ্দ্বারা জগৎ-সৃষ্টি সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি কপিল প্রকৃতিকে সর্ব্ব মূলের মূলে অমূল মূল কহিয়াছেন। তিনি মীমাংসা করিয়াছেন আত্মা (পুরুষ) নিত্য শুদ্ধ এবং মুক্ত, তাঁহাতে বিকার মাত্র নাই, তবে তিনি কিরূপে অচেতন জড়পদার্থের উপাদান হইতে পারেন? নিত্য মুক্ত আত্মার কি বিকার সম্ভবে? আর যদিও বিকার সম্ভবে তবে কি তাহা হইতে অচেতন জড় পদার্থের সম্ভব হইতে পারে? জগৎকে আত্মজাত কহিলে এই বলা হয় যে শুদ্ধের পরিণামে অশুদ্ধ উৎপন্ন হইল। সুতরাং সৃষ্টির দ্বারা কারণের অপকর্ষ প্রাপ্তি হইল। উত্তম বীজ হইতে উৎপন্ন তরুর কখন শাখা পল্লব হীনশ্রী ও ফল অপকৃষ্ট হইতে পারে? সচেতন পদার্থ হইতে কি অচেতন বস্তু উৎপন্ন হয়? বরঞ্চ অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে, প্রমাণ দংশ মশকাদি।

এ সূত্রের মীমাংসায় পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যও পরাস্ত হইয়াছেন। যদিও তিনি সমুদায় স্বীকার না করুন তথাপি ইহার মূলের পৃষ্ঠপূবক হইয়াছেন, যথা "যতঃক্ষীরবৎ দ্রব্য-স্বভাব-বিশেষাদুপপদ্যতে যথাহি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধি-হিম-ভাবেন পরিণমতেঽনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি" শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ আত্মার স্বয়ং কর্তৃত্ব দুগ্ধবৎ দ্রব্য-স্বভাব-বিশেষ বশতঃ উপপন্ন হয়, সংসারের মধ্যে যেমন দুগ্ধ বাহ্য সাধন উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং হিম এবং দধিরূপে পরিণত হয়, আত্মার কর্তৃত্বও তদ্রূপ। কপিলের মত ও শঙ্করের অদ্বৈত মত উভয়ই একপ্রকার।

কপিল কহেন প্রকৃতির কার্য্যের তাৎপর্য্য পুরুষের মুক্তি সঙ্কল্প। যথা—

"বিমুক্ত মোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য প্রধান-সৃষ্টিঃ পরার্থং।

স্বতোপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্র-কুঙ্কুম বহনবৎ নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ।" সাংখ্য কাং।

অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য বিমুক্ত মোক্ষার্থ অথবা আত্মার্থ, প্রকৃতির সৃষ্টি পরার্থ, প্রকৃতি আপনি ভোক্তা নহেন, উষ্ট্র যেমন কুঙ্কুম বহন করে, চরিতার্থ হইলে নর্ত্তকীর নিবৃত্তির ন্যায় প্রকৃতির নিবৃত্তি। বিমুক্ত বিবিক্ত আত্মা সংসারে ভোগে নিবৃত্ত হওয়াতে প্রকৃতির সৃষ্টি-নিবৃত্তি, অপর সূত্রে ইহা অপেক্ষাও বিশদরূপে অর্থ স্ফুটিত করিয়াছেন যথা—

"পুরুষার্থং করণোদ্ভবোপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ। ধেনুবৎবৎসায়, বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য। পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য" ॥ ৫৭ সাং কাং।

অর্থাৎ প্রকৃতি অচেতন হইয়াও অভ্যাস বশতঃ আত্ম-কার্য্য সম্পন্ন করেন। চৈতন্য না থাকিলেও কার্য্যশক্তি আছে, যেমন বৎসার্থ গাভীর দুগ্ধ ক্ষরণ হইয়া থাকে, স্রোতস্বতী যেমন মানবের হিতার্থে নিয়গা হয়, তদ্রূপ পুরুষের নিঃশ্রেয়সার্থ প্রকৃতি জগৎস্রষ্ট্রী হয়েন।

তাঁহার মতে প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। পুরুষের কার্য্য-তৎপরতা সম্ভবে না। প্রকৃতির কার্য্য অহঙ্কারে ক্রিয়া-তৎপরতা সম্ভবে, পুরুষে সম্ভবে না, যথা "অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ।" শঙ্কর অবিদ্যার আরোপ করেন; কিন্তু মহর্ষি কপিল অযুক্ত উপদেশ দানে কাতর হইয়া লিখিয়াছেন যে জগৎ অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টি, এবং পুরুষ নিঃসঙ্গ। অতএব নিঃসঙ্গ পুরুষ জগৎ-স্রষ্টা হইতে পারেন না। যথা "না বিদ্যাযোগো নিঃসঙ্গস্য। তদ্যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বং।"

বস্তুতঃ সাংখ্যদর্শন পুরুষের কোন কার্য্য স্বীকার করেন না। পুরুষ নিত্য-মুক্ত কার্য্যকরি-প্রবৃত্তি-পরবশ নহেন। শরীর ও মন যাহা প্রবৃত্তি স্থান—তাহার সহিতও তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ নাই। শরীর এবং মনের সহিত পুরুষের যে নৈমিত্তিক সম্বন্ধ

তৎপ্রযুক্ত—তিনি ক্রিয়াবানুরূপে প্রতীয়মান হয়েন, যেমন জবা-কুসুম-সংযোগে নির্ম্মল স্ফটিক রক্তবর্ণ বোধহয়। শারীরিক এবং মানসিক কার্য্যেতে পুরুষ আসক্ত কিম্বা বদ্ধ হয়েন না, ক্ষণকালমাত্র মনের সন্নিহিত, সেই কারণ আসক্তি এবং বন্ধনের আভাস, কিন্তু প্রবৃত্ত্যাদি মনের বিকারমাত্র—পুরুষের নহে।

যথা "কুসুমাৎ মণিঃ। তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি। ন কর্ম্মণান্যধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানম্।" সাং কাং।

আর এই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত যে সঙ্গাভাস হয় তাহা পদ্মপত্রগত-জলতুল্য যথার্থ সঙ্গ নহে এবং সে সঙ্গাভাস নিত্য নহে।

যথা "শ্রুতি-স্মৃতিষু পদ্মপত্রস্থজলেনেব পদ্মপত্রস্যাসঙ্গতায়াঃ পুরুষসঙ্গতায়াং দৃষ্টান্ততাশ্রবণাচ্চ।"

সাংখ্যমতে পুরুষ সাক্ষী, কেবল মধ্যস্থ, দ্রষ্টা, এবং অকর্ত্তা।

গুণ সমূহের কর্ত্তৃত্ব আছে, সাক্ষীর প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছুই নাই। পুরুষ উদাসীন মাত্র, গুণেরই কর্ত্তৃত্ব, পুরুষের কর্ত্তৃত্বাভাস। গুণের কর্ত্তৃত্ব প্রযুক্ত পুরুষের কর্ত্তৃত্বাভাস হয়।

যথা "তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ। গুণাঃ এব কর্ত্তারঃ প্রবর্ত্তন্তে। সাক্ষী ন প্রবর্ত্ততে নাপি নিবর্ত্ততে এব।" সাং কাং।

মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে উপদেশ করিয়াছেন যে ঈশ্বর অসিদ্ধ। যদি ঈশ্বর থাকেন তবে বদ্ধ বা মুক্তের অন্যতর হইবেন। যদি মুক্ত হয়েন তবে রাগাদি-প্রবৃত্তি-রহিত সুতরাং কার্য্যাক্ষম, যদি তাঁহাতে রাগাদি প্রবৃত্তি থাকে তবে তিনি মুক্তাত্মা নহেন, বদ্ধাত্মা। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন-শক্তি হইতে পারেন না। তবে শাস্ত্রের মধ্যে যে ঈশ্বর-বাচক শব্দ আছে তাহা কেবল চাটূক্তি মাত্র, অর্থাৎ মুক্তাত্মার প্রশংসা; অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাদি জন্য দেবতার উপাসনা মাত্র।

যথা "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা।

সিদ্ধস্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হরাদেরেবানিত্যেশ্বরস্যাভিমানাদিমতোপি গৌণনিত্যত্বাদিমত্বান্নিতাত্বাদ্যুপাসা পরা।" সাং কাং।

এক্ষণে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে ঈশ্বরের অভাবে বেদ কি প্রকারে হইতে পারে, ইহার উত্তরে কপিল মীমাংসা করিয়াছেন যে বেদ-বাক্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হওয়াতে আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় প্রমাণ।

মহর্ষি কপিল উপদেশ করিয়াছেন যে বিজ্ঞানই অপবর্গের অমোঘ উপায়; কিন্তু রাগ দ্বেষাদি চিত্ত-বিকার বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তন্নিমিত্ত ধ্যান অবলম্বন করিয়া রাগ দ্বেষের দমন এবং মনের শান্তি ও বিজ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত

হইতে হয়। পরে ধ্যানের অর্থ করিয়াছেন যে ধ্যান চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ ধ্যায়ের অতিরিক্ত বৃত্তি নিরোধ, তাহা বিশেষ প্রকারে উপবেশন নিশ্বাস প্রশ্বাস দমন ও জাতীয় ধর্ম্মরক্ষা এবং বৈরাগ্য দ্বারা সম্ভবে। যথা "রাগোপহর্তির্ধ্যানং, জ্ঞান-প্রতিবন্ধকো যো বিষয়োপরাগশ্চিত্তস্য তদুপঘাতহেতুর্ধ্যানং বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ।

ধ্যেয়াতিরিক্ত-বৃত্তি-নিরোধ-রূপেণ সম্প্রজ্ঞাতযোগেন তৎসিদ্ধির্ধ্যানস্য নিষ্পত্তি-জ্ঞানাখ্য-ফলোপধানরূপা ভবতি। ধারণাসন-স্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ। নিরোধশ্ছর্দ্দি-বিধারণাভ্যাং। স্থিরসুখমাসনং। স্বকর্ম্ম স্বাশ্রম-বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানং। বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ।" সাং কাং।

সংসার এবং সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ অসার এবং মিথ্যা—মহর্ষি কপিলের এই সার কথা, বাস্তবিক কথাও যথার্থ তাহাই তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া যে সকল সূত্র গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন তাহার আনুপূর্ব্বিক সূত্রগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ—কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।

আবশ্যকেন কর্ম্মণৈব ফলনিষ্পত্তিসম্ভবাৎ।

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লৌকবৎ।—লৌকিকেশ্বরবদিতরথা। পারিভাষিকো বা।

সংসার সত্ত্বেপি চেদীশ্বরস্তর্হি সর্ব্বাদিপুরুষে পারিভাষামাত্রমস্মাকমিব ভবতামপি স্যাৎ।

নরাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ।

তদ্যোগেপি ন নিত্যমুক্তঃ। রাগস্তু উৎকটেচ্ছা। প্রধান-শক্তি-যোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ। সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যং।

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।

ঈশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তি।

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য।"

পঞ্চম অধ্যায়

সাং দং

অর্থাৎ ফল-নিষ্পত্তি ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দ্বারা হয় না, তাহা কর্ম্মদ্বারা হয়, আবশ্যক কর্ম্মদ্বারা। ঈশ্বরের যদি কার্য্য-শক্তি থাকে তবে অভিপ্রায়ও থাকিবে, কিন্তু অভিপ্রায় তাৎপর্য্য থাকিলে তিনি সাংসারিক ঈশ্বর হইবেন, সাংসারিক ঈশ্বর অজ্ঞানের বিড়ম্বনার্থ কেবল পরিভাষা মাত্র। রাগ-বিরহে সৃষ্টি সম্ভবে না; কিন্তু রাগ থাকিলে নিত্য মুক্তত্বের হানি হয়। রাগের অর্থ উৎকট ইচ্ছা, ঈশ্বরে যদি উৎকটেচ্ছা সম্ভবে তবে তিনি আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত হইলেন। তাঁহার সত্তা আছে বলিয়া যদি তাঁহাকে ঈশ্বর বল তবে সকল পদার্থকেই ঈশ্বর কহিতে হইবে। অতএব প্রমাণাভাবে ঈশ্বর সিদ্ধি হইল না। ঈশ্বর বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নাই। অনুমান প্রমাণও

সম্ভবেনা, কেন না সম্বন্ধাভাব। এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রকৃতিই সিদ্ধ হয়।

সাংখ্য-দর্শন-কার কপিল আপন মত স্পষ্ট-রূপে বিবৃত করিয়া এইরূপে জগৎকে দেখাইয়াছেন। এই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি এবং পুরুষবাদ লইয়াই পুরাণ-রচকেরা স্ব স্ব পুরাণে দেব-দেবীর কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতি ও পুরুষকে দেবতা স্থির করিয়া প্রকৃতিকে জগন্মাতা ও পুরুষকে জগৎপিতা স্থির করিলেন। কেবল শিব-পুরাণরচক স্পষ্টতঃ পুরুষকে উদাসীন বলিয়া গিয়াছেন যথা।—

"ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থবিদঃ প্রভো"

পরে মহাকবি কালিদাসও তাঁহার কুমার-সম্ভব কাব্যে লিখিলেন—

"ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীম।
তদ্দর্শিনমুদাসীন ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ॥"

২-য়-অং-

এইরূপে প্রকৃতি এবং পুরুষকে পিতা মাতা কল্পনা করিয়া জগতের স্রষ্টা স্রষ্ট্রী পদে অভিষিক্ত করিলেন, শৈবেরা মহাদেবকে জগৎকর্ত্তা পুরুষ ও পার্ব্বতীকে জগৎকর্ত্রী প্রকৃতি সাজাইলেন।

অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবতকার সেই উদাসীন পুরুষকে কৃষ্ণ ও গোপ-কন্যা রাধিকাকে প্রকৃতি সাজাইয়া ভারতরঙ্গ ভূমে অবতীর্ণ হইলেন।

শৈবগণ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতকার বিশেষ কৌশলে আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এমন কি উহাতে দর্শনের পরিসীমা ও কাব্যের উচ্চতর প্রাণ একাধারে সম্মিলিত থাকায় রাধা কৃষ্ণের অপবিত্র মধুবেশ হয়। কিন্তু সাংখ্য দর্শন মতে ঐ প্রণয় অপবিত্র না হইয়া আরো প্রগাঢ় ভাব প্রকাশ করে কেন না সাংখ্যদর্শন মতে জগৎ দ্বৈপ্রকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরে আসক্ত, যেমন পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে স্ফটিকপাত্রে জবাকুসুমের আভা যদ্রূপ; কিন্তু যৎকালে ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের বিচ্ছেদ তখনই জীবের মুক্তি। ইহা অতীব প্রগাঢ় বিষয়, সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞানপথাতীত, তাই ভাগবতকার দর্শন ও কাব্য একত্র মিলাইয়া পুরুষকেই স্বীয় কাব্য মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও প্রকৃতিকে রাধা সাজাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের আসক্তি বাল্যলীলায় এবং এতদুভয়ের যে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ জীবের মুক্তি তাহাও দেখাইলেন, সাংখ্যদর্শন মতে ইহাদিগের মিলনই দুঃখের মূল, তাই কবি অপবিত্র করিয়া রাধা কৃষ্ণের লীলা দেখাইলেন। বস্তুতঃ প্রমাণ আত্মার ইতিহাস, প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন, পরে বিচ্ছেদ, পরে মুক্তি।

পুরাণ-রচকেরা প্রায়ই ঈশ্বরকে মানব-অবতার কল্পনা করিয়া মৎস্য কূর্ম্মাদি দশ অবতার লিখিয়া গিয়াছেন। এবং এক এক অবতারে এক একটীর বিশেষ [illegible] দেখাইয়াছেন। যৎকালে প্রলয়-পয়োধি-জলে সমস্ত বিশ্বপ্লাবিত ছিল

তখন দেব উদ্ধার নিমিত্ত বিষ্ণুর মৎস্যাবতার পরিকল্পিত হইয়াছে, যাহাহউক, মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, "গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমানস্ত ত্রযং ব্রহ্ম বিজিজ্ঞিরে একাদেবা স্রয়োভাগা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।"

দেখা যাইতেছে পূর্ব্বোক্ত গুণের ক্ষোভ কেবল সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের ক্ষোভ মাত্র আর তাহা হইতেই ত্রিদেবের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ গুণ প্রকৃতি ও পুরুষের সংসক্তাবস্থা। বিচ্ছেদ হওয়াতেই সৃষ্টি-কামনা এবং তাহা হইতেই পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হইয়াছে। পরে (সাধকাকানাং হিতার্থায় ব্রাহ্মণেরূপ-কল্পনা) বচন রচনা করিয়া ভারত-বঙ্গ ভূমিতে দেব-লীলার অভিনয় আরম্ভ করিলেন। এই সাংখ্য দর্শন কার যদিও স্পষ্টতঃ ঈশ্বরাস্তিত্বে সন্দিগ্ধমনা, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কপিলের মহিমা অনেক সেশ্বরবাদীরাও মুক্তকণ্ঠে গাইয়াছেন। তুলসীদাসের উক্তি—

"আদিদেব প্রভু দীন দয়ালা।
জঠর ধরউ জেহি কপিল কৃপালা।
সাংখ্য শাস্ত্র জিন প্রগট বাখানা।
তত্ব বিচার নিপুণ ভগবানা॥"

মহর্ষি কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্য ভগবান্ পতঞ্জলি কর্ত্তৃক পরিশোধিত হয় পতঞ্জলির দর্শনের নাম পাতঞ্জল দর্শন। পরে এই দর্শণের মত বিবৃত করিব।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন

বোয়ালিয়া।

অতীত ও বর্ত্তমান ভারত।

অতীতের সহিত তুলনায় আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মনৈতিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা, বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণানুসন্ধান ও তদপনোদনের উপায় চিন্তন—এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। এই কয়টী গুরুতর বিষয় একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নিঃশেষিতরূপে সমালোচিত ও পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইতে পারে না। তথাপি যতদূর সাধ্য আমি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিব।

আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা কি, তাহার কারণই বা কি, এবং তদপনোদনের উপায়ই বা কি? জানি এ প্রশ্নের উত্তরে নানা প্রকার মতভেদ আছে কিন্তু মতভেদ আছে বলিয়া আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে নিজের মত বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

মানব সমাজে সভ্যতা ও উন্নতির ক্রম পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সাম্য মানব জাতির আদিম অবস্থা, বৈষম্য সভ্যতার ফল। আদিম অবস্থায় যখন প্রত্যেক মনুষ্যই প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত মৃগয়া প্রভৃতি

একইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবন ধারণ করিত, তখন তাহাদের মধ্যে যে কোন বৈষম্য ছিল না ইহা বলা বাহুল্য। পরে যখন মানব জীবনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যানুষ্ঠান সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে লাগিল তখন হইতে বৈষম্যের সূত্র আরম্ভ হইল। কার্য্য সকলের স্বাতন্ত্র্য হইতে কার্য্য-কারক দিগের স্বাতন্ত্র্য আরম্ভ হইল। স্পেন্সর প্রভৃতি দার্শনিকেরা সভ্যতা ও কার্য্য সকলের স্বতন্ত্রীকরণ একই অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন যেমন নিম্নতর জীবের জীবনী ক্রিয়া সকল সর্ব্বশরীরে সমভাবে ব্যাপ্ত থাকে, আর সেই ক্রিয়া সকল শরীরের স্থান বিশেষে যত সীমাবদ্ধ হইতে থাকে ততই জীব নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উঠে; তেমনই মানব জীবনের ক্রিয়া সকল যতই বিভক্ত হইয়া ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষে আবদ্ধ হইতে থাকে ততই মানবের উন্নতি, ততই সভ্যতার বৃদ্ধি। ফলতঃ কার্য্য সকলের স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন মানব জাতির উন্নতি অসম্ভব। এবং এই স্বাতন্ত্র্য হইতে কার্য-কারক দিগের যে স্বাতন্ত্র্য তাহাও অপরিহার্য্য। কিন্তু যখন এই স্বাতন্ত্র্য কার্য্যসকলের বিভিন্নতা রূপ কারণ অতিক্রম করে বা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইয়া অন্যাকার ধারণ করে তখনই তাহা হইতে বৈষম্যের উৎপত্তি হয়। এই বৈষম্যই নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে সভ্যতা স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। যেমন উচ্চতম জীবে জীবনী ক্রিয়া সকল স্থান বিশেষে বিভক্ত হইয়া সকলই এক উদ্দেশে পরস্পরের সহায় স্বরূপ হইয়া কার্য্য করে, একটী প্রতিকূলে দাঁড়াইলে হয়ত সমস্ত জীবনী শক্তি লুপ্ত হয়, সেইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য-কারক একই উদ্দেশে পরস্পরের সহায় হইয়া কার্য্য না করিলে উন্নতির জীবন লুপ্ত হয়। বস্তুতঃ কার্য্যকারকদিগের পরস্পর-সহকারিতার অভাবেই সমাজে নানাপ্রকার অশুভকর বৈষম্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই বৈষম্য হইতেই জাতির পতন হয়। ভারতেও সেই কারণে নানাবিধ বৈষম্য ঘটিয়াছে। সেই বিবিধ বৈষম্য হইতেই ভারতের পতন!

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে সেই বিবিধ বৈষম্য কি কি।

উত্তর—বর্ণ-বৈষম্য, জাতিবৈষম্য ধর্ম্মবৈষম্য, পরিচ্ছদবৈষম্য ভাষাবৈষম্য, শাসনবৈষম্য, ধন বৈষম্য ও স্ত্রী পুরুষ বৈষম্য।

তন্মধ্যে বর্ণ-বৈষম্যই ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের প্রথম ও প্রধান কারণ। যখন প্রাচীন আর্য্যেরা সিন্ধু পার হইয়া সপ্তনদবিধৌত প্রদেশে অসংখ্য অনার্য্য শত্রুর সম্মুখীন হন, তখন কার্য্য সৌকর্য্যার্থে তাঁহারা আপনাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যাঁহাদিগের উপর ব্রহ্মণাবিভাগ অর্পিত হয় তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হয়েন; যাঁহাদিগের

উপর সমরবিভাগ অর্পিত হয় তাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে আখ্যাত হয়েন; এবং যাঁহাদিগের উপর বাণিজ্যবিভাগ অর্পিত হয় তাঁহারা বৈশ্য নামে আখ্যাত হয়েন। যদি বৈশ্যেরা পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন যে সাময়িক প্রয়োজনানুসারে বাণিজ্য বিভাগের ভার গ্রহণ করার অপরাধে তাঁহাদিগকে চিরকাল বর্ণদ্বয়ের দাসত্ব করিতে হইবে এবং যদি ক্ষত্রিয়েরা জানিতে পারিতেন যে সমরক্ষেত্রে নামিয়া নিজ রুধির ব্যয়ে ও শত্রু নিপাত করার অপরাধে তাঁহাদিগকে চিরকাল ব্রাহ্মণদিগের অধঃস্থ থাকিতে হইবে তাহা হইলে তাঁহারা কখনই এরূপ শ্রমবিভাগে সম্মত হইতেন না। নিশ্চয়ই এই কার্য্যবিভাগ লইয়া প্রথমেই তাঁহাদিগের মধ্যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইত। তৎকালে এরূপ শ্রেণীবিভাগ পুরুষানুক্রমিক বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই। যাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি বলবতী ও যাঁহাদিগের বুদ্ধি সূক্ষ্মার্থদর্শিনী—তাঁহাদিগের উপর মন্ত্রণাবিভাগ ন্যস্ত হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ কোন চিরন্তন নিয়ম সংস্থাপিত হয় নাই যে অন্য বিভাগের লোক চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইয়া মন্ত্রণাবিভাগে আসিতে ইচ্ছা করিলে তথায় আসিতে পারিবে না; অথবা আদি ব্রাহ্মণগণের পুত্র পৌত্রাদিগণকে চিন্তাশক্তিহীন ও স্থূলবুদ্ধি হইলেও প্রথম শ্রেণীতে রাখিতেই হইবে। এরূপ [illegible] নিয়ম ব্রাহ্মণদিগের কূটমন্ত্রণাজালের পরিণত ফল। এইরূপে আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণবৈষম্য প্রয়োজনীয়, সাময়িক ও শুভপ্রদ হইতে কালে অপ্রয়োজনীয়, চিরন্তন ও অশুভপ্রদ হইয়া উঠিল। এইরূপে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধিকৌশলে আর্য্যজাতি রোমের পেট্রিসীয় ও প্লীবীয় শ্রেণীদ্বয়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বর্ণে বিভক্ত হইলেন। ক্রমে বিজয়ের গতিতে একটী অনার্য্য জাতি আসিয়া এই আর্য্য স্রোতস্বিনীর সহিত মিলিত হইল। মিলিত হইল বটে, কিন্তু ইহা পূর্ণ মিলন নহে; গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ন্যায় এই সঙ্গমের শ্বেত-কৃষ্ণ রেখা অদ্যাপিও বিলীন হইল না। আর্য্যজাতি পরাজিত আদিমনিবাসীদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে রাজনৈতিক বা সামাজিক সাম্য প্রদান করিলেন না। ইহাদিগকে শূদ্র বা দাস আখ্যা দিয়া একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপর ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব ততদূর খাটে নাই কারণ এই তিন বর্ণই একজাতি-সম্ভূত, এবং এই তিন বর্ণই ভারতের বিজেতা। সুতরাং ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কিঞ্চিৎ মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে হইত। কিন্তু শূদ্রদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সেরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল না। শূদ্রেরা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণদিগের দাসরূপে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইল। সেই সময় হইতেই আর্য্যক্ষেত্রে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল।

এই আর্য্য-উপনিবেশের সহিত আমেরিকায় ইংরাজোপনিবেশ ও ইংলণ্ডে সাক্ষণ ও নর্ম্মান্ উপনিবেশের অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। আমেরিকায় ইংরাজেরা ভারতীয় আর্য্যদিগের ন্যায় মহত্ব প্রকাশ করিয়া বিজিতদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা আদিম নিবাসীদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বিজিত জাতি বৈষম্যপীড়িত হইলে ক্রমেই অবনতি-সোপানে নামিতে থাকে, এবং সেই অবনমন-কালে প্রক্ষেপ্তা বিজয়ী জাতিকেও সঙ্গে সঙ্গে নামাইতে থাকে। বিজিতদিগের সংখ্যাবল অধিক, সুতরাং ক্রমে তাহারা অল্পসংখ্যক বিজয়ীকে আপনাদিগের অধঃপতনের সঙ্গী করিয়া লইতে সমর্থ হয়। আমেরিক ইংরাজেরা তাঁহাদিগের আসুরিক ঘাতকতার গুণে এই বিশ্বজনীন অবনতির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। জাতীয় বৈষম্যের বীজ রোপিত হয় নাই বলিয়াই ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের আজ এত উন্নতি! জগতে সকল দেশ অপেক্ষা এই দেশে উন্নতির গতি ক্ষিপ্রতর। আবার দেখ! আঙ্গল্ ও সাক্ষণেরা আসিয়া যখন শ্বেতদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন, তাঁহাদিগের নির্যাতনে আদিম নিবাসী ব্রিটনেরা উচ্ছিন্ন বা সুদূর পার্ব্বত্য-প্রদেশে অপসারিত হইল। আঙ্গল্ ও সাক্ষণেরা বৈষম্য-বিষের সংক্রামণ হইতে রক্ষা পাইল। এই নবীন জাতি ক্রমেই উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় আর একটী বলবত্তর জাতি আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইল। বিজয়ী নর্ম্মাণেরা আঙ্গলো সাক্ষণদিগকে বিজিত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দাসরূপে পরিণত করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগকে অগত্যা সঞ্জীবনীশক্তিবিশিষ্ট উন্নতিশীল আঙ্গলো-সাক্ষণ জাতির সহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতায় মিশিয়া যাইতে হইল। আঙ্গলোসাক্ষণ ও নর্ম্মান্ জাতির এরূপ একীভাব হইয়াছে যে, কখন যে তাঁহাদিগের মধ্যে বৈষম্য ছিল, এরূপ বোধ হয় না। এই একীভাবের পরিণাম ইংলণ্ডের বর্ত্তমান উন্নতি। এই সাম্যের বলে ইংলণ্ড ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের মধ্যে সিংহপ্রতিম। এই সাম্যের প্রসাদে ইংলণ্ড এতদূর বিজয়শীল!

আর সেই সাম্যের অভাবেই ভারতের আজ এই দুর্দ্দশা! আর্য্যজাতি যে ঔদার্য্য দেখাইয়া বিজিত শূদ্রদিগকে সমূলে উৎসাদিত না করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই ঔদার্য্যের বশীভূত হইয়া যদি তাহাদিগকে পূর্ণ সাম্য প্রদান করিতেন, তাহা হইলে আমরা আজ ভারতের অন্য মূর্ত্তি দেখিতাম। তাহা হইলে আমাদিগকে আজ ভারতবক্ষোপরি বৈদেশিক ধ্বজস্তম্ভ নিখাত, ও ভারতগগনে বৈদেশিক পতাকা উড্ডীন দেখিতে

হইত না। তাহা হইলে ইতিহাসও এই মর্ম্মন্তুদ বার্ত্তা বহন করিত না যে অল্পসংখ্যক যবন সেনা ভারত-হৃদয়ে আসিয়া অসংখ্য হিন্দুসেনাকে মোহমুগ্ধ করিয়া ভারতসিংহাসন অধিকার করিল।

তদাপরিজ্ঞাত জগতের অধীশ্বরী রোমনগরী প্রথমে সাম্যের মোহিনী শক্তি অনুভব করিতে পারেন নাই। এই জন্য পেট্রিসীয় ও প্লীবীয় এবং নাগরিক ও অনাগরিক এই দুই প্রকার বৈষম্যে তাঁহার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ জর্জ্জরিত ছিল। পেট্রিসীয় ও প্লীবীয় দিগের মধ্যে প্রথমে এরূপ বিদ্বেষভাব ছিল, যে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে ছাড়িতেন না। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ই প্রবল, সুতরাং পরস্পর কেহই কাহারও উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেন না। অবিরাম পরস্পর সংঘর্ষে ক্রমে এই দুই সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য অপনীত হইল। রোমের তেজঃপ্রতিভা অধিকতর প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আভ্যন্তরীণ বৈষম্য ঘুচিল বটে, কিন্তু বহিশ্চর বৈষম্যে রোম শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রহিলেন। বিজিত ইতালীয় প্রদেশ সকলকে রোম প্রথমে সমনাগরিকত্বের স্বত্ব প্রদান করেন নাই। সেই জন্য তখন বিজিত ইতালীয় প্রদেশ সকল সুবিধা পাইলেই রোমের প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত হইত। মহাবীর হানিবল যখন আল্‌প্‌স পর্ব্বত উত্তরণ করিয়া ইতালীক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত ত্রিশ সহস্র মাত্র সৈন্য ছিল। তিনি সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই প্রবলপরাক্রান্ত রোমনগরীর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার কি আশা ও কি সাহস ছিল? তিনি জানিতেন যে রোম বিজিত ইতালীয় প্রদেশ সকলকে সমনাগরিকতা প্রদান করেন নাই। এই জন্য ইতালীয় প্রদেশ সকল মনে মনে রোমের বিরুদ্ধে চটিয়া আছে, তাঁহার সৈন্য উপস্থিত হইলেই তাহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। হানিবলের সৈন্যসংখ্যা ইতালীক্ষেত্রে এত বাড়িয়া ছিল, যে কানিসমরে তিনি একলক্ষ রোমীয় সেনার সম্মুখীন হইয়া ইহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। রোম ইহার পর আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, ও ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইতালীয় প্রদেশকে সমনাগরিকত্ব প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমেই রোমের বলবীর্য্য বাড়িতে লাগিল। শেষে রোম পৃথ্বীশ্বরী হইয়া উঠিলেন।

বুদ্ধিদোষে ও প্রবৃত্তিবলে আর্য্যেরা কোন কালেই বৈষম্যের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। তাহার পরিণাম অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ। আর্য্যদিগের অন্তর্বিপ্লবের অনেক পরিচয় সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। যখন ব্রাহ্মণেরা অতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন, ব্রাহ্মণদিগের তাহা অসহ্য

হইল। ব্রাহ্মণবীর পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়-রুধিরে পিতৃতর্পণ করিয়া তবে এ ক্রোধ শমিত করেন।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃপৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াংপ্রভুঃ
সামন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান্।

সেই অবধি ক্ষত্রিয় সংখ্যা ভারতে এতদূর কমিয়া গিয়াছে যে ব্রাহ্মণ-সংখ্যার সহিত তুলনায় ইহা গণনীয়ের মধ্যেই নহে। ব্রাহ্মণদিগের বৈষম্যপ্রবণতার প্রধান অন্তরায়স্বরূপ ক্ষত্রিয়বর্গের ধ্বংসের পর ব্রাহ্মণেরা আরও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। শূদ্রদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা শাস্ত্রকর্ত্তা, সুতরাং নূতন নূতন শাস্ত্র করিয়া শূদ্রের দাসত্ব-শৃঙ্খল আরও কসিতে লাগিলেন। ব্যবস্থা হইল শূদ্রকে ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে; অথচ শূদ্র অস্পৃশ্য; শূদ্রের জল অব্যবহার্য্য। নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়; কোন উচ্চসুখে তাহার অধিকার নাই; বেদাদি শাস্ত্রে তাহার অধিকার নাই, অথচ সে শাস্ত্রের শাসনে তাহাকে চলিতে হইবে। তাহার ইহকাল ও পরকালের একমাত্র গতি ব্রাহ্মণ। তাহার যথা সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান না করিলে তাহার পরকালে গতি নাই, অথচ যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের দান গ্রহণ করিবেন তিনি পতিত হইবেন। সুতরাং শূদ্র দান করিতে ইচ্ছুক হইলেও, তাহার পক্ষে গ্রহীতা ব্রাহ্মণ মিলা কঠিন হইত।

শূদ্রদিগের উপর প্রভুত্ব বাড়াইবার জন্য ব্রাহ্মণেরা—ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদের উপর উপনিষদ্, আরণ্যকের উপর আরণ্যক, সূত্রের উপর সূত্র, তার উপর ভাষ্য, তার টীকা, তার টীকা, তার ভাষ্য—করিয়া অসংখ্য বৈদিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থে ভারত সাহিত্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শনাদি প্রকৃত বিদ্যার আলোচনা ভারত হইতে বিলুপ্ত হইল। শূদ্রদিগের জন্য যে শুদ্ধ কঠিন ধর্ম্মশাসন প্রতিষ্ঠাপিত হইল এরূপ নহে। তাহাদিগের উপর কঠোরতর দণ্ডবিধি সংস্থাপিত হইল। আমরা ভারতবাসীদিগের উপর ইংরাজদিগের পক্ষপাত ও অত্যাচার দেখিয়া কুপিত হই। কিন্তু ইংরাজদিগের প্রশংসায় আমাদিগকে অবশ্য বলিতে হইবে যে এ পক্ষপাত বা অত্যাচার ইংরাজদিগের দণ্ডবিধির দোষে নহে, ব্যবস্থাপক সভার মলীমসী লেখনীর ফল নহে, ইহা সেই দণ্ডবিধির প্রয়োগকর্ত্তা কতিপয় অজাতশ্মশ্রু উষ্ণশোণিত বিজয়দর্পী শ্বেত-যুবকের প্রয়োগদোষে। ইংরাজদিগের দণ্ডবিধিতে শ্বেতকৃষ্ণ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই; ইহা ইংরাজদিগের ভারতশাসনের একটী প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ব্যবস্থাপক-সমাজ কর্ত্তৃক প্রণীত দণ্ডবিধি কিরূপ? ইহা আমূল পক্ষপাতদোষে দূষিত। মনুপ্রণীত দণ্ডবিধি পাঠ করিতে করিতে আমাদিগের

মুখ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অকীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা উপস্থিত হয়।

আবার সেই ভীষণ দণ্ডবিধির প্রয়োগকর্ত্তা কে? প্রণেতা প্রয়োগকর্ত্তা নহেন। ব্রাহ্মণ দণ্ডবিধাতা হইলে, ইচ্ছা করিলে দণ্ডের লাঘব বা মাপ করিতে পারিতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ইচ্ছা হইলেও ব্রাহ্মণের দণ্ডবিধির অন্যথাকরণ করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণের গৃহে অকালমৃত্যু ঘটিল, ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজদ্বারে তারস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন "মহারাজ! আপনার রাজ্যে নিশ্চয়ই কোন শূদ্র মুনিব্রত অবলম্বন করিয়াছে, সেই পাপেই আমার শিশুসন্তানটী মরিয়াছে"। ব্রাহ্মণের ক্রন্দনে রাজা স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি বন উপবন সমস্ত খুঁজিয়া দেখিলেন এক নিবিড় বনে একজন শূদ্র প্রগাঢ় তপস্যায় নিমগ্ন আছে। অমনি তাঁহার শাণিত অসি সেই শূদ্র তপোধনের মস্তক দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিল। শূদ্রের মস্তক ত এইরূপে কথায় কথায় কাটা পড়িত; কিন্তু ব্রাহ্মণের কেশ স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? ব্রাহ্মণ কোন অপরাধেই শীর্ষচ্ছেদ্য নহেন। ব্রাহ্মণ স্ত্রীহত্যা, নরহত্যা, শিশুহত্যা প্রভৃতি যাহাই করুন্ না কেন, নির্ব্বাসন তাঁহার চরম দণ্ড।

এইত গেল রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক শাসন। সামাজিক শাসন ইহা অপেক্ষা কোনমতে ম্লান নহে। ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণে বিবাহ করিতে পারিবেন; ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণেতর বর্ণত্রয়ে বিবাহ করিতে পারিবেন; বৈশ্য নিম্নতর দ্বিবর্ণে বিবাহ করিতে পারিবেন; কিন্তু শূদ্রকে কেবল নিজ বর্ণ হইতেই ভার্য্যা মনোনীত করিতে হইবে। শূদ্র ব্রাহ্মণকন্যাতে অভিগমন করিলে শীর্ষচ্ছেদ্য হইবে, এবং তাহাদিগের সঙ্গমের ফলস্বরূপ অপত্য অস্পৃশ্য শূদ্র অপেক্ষাও ঘৃণিত চণ্ডাল হইবে। শূদ্র অস্পৃশ্য বটে, কিন্তু চণ্ডালের আবার ছায়াপর্য্যন্তও অস্পৃশ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য শূদ্রকন্যাতে অভিগমন করিলে তাঁহারা যে কেবল দণ্ড হইতেই নিষ্কৃতি পাইবেন এরূপ নহে, তাঁহাদিগের সঙ্গমের ফলস্বরূপ অপত্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইবে। ব্রাহ্মণের অন্নজল সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু তিনি কাহারও অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। শূদ্রের অন্নজল গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভক্ষণে শূদ্রের ঐহিক বিশুদ্ধি ও পারলৌকিক মুক্তি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে এই বর্ণগত বৈষম্য বর্ত্তমান ভারতে বিদ্যমান আছে কিনা। ইংরাজ শাসনের অধীনে বর্ণগত রাজনৈতিক বৈষম্য অপনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বৈষম্য প্রবলতর রূপে বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে অনুলোম বিবাহ থাকায় নিম্নবর্ণস্থ কন্যার উচ্চবর্ণের স্বামী লাভের আশা

ছিল, কিন্তু এক্ষণে উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্ন বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইবেন। অন্নগ্রহণ সম্বন্ধেও সেইরূপ কঠোরতা অদ্যাপি বর্ত্তমান। ধর্ম্ম শাসনও সেইরূপ কঠোর রহিয়াছে। সেই যাগযজ্ঞ, সেই মন্ত্র, সেই দানধ্যান সেই দক্ষিণা, সেই প্রায়শ্চিত্ত। আমরা পরিবার বিশেষের কথা বলিতেছি না, কিন্তু ভারতবর্ষীয় হিন্দুজাতিসাধারণের কথা বলিতেছি। ব্রাহ্মণেরা এইরূপে অন্য বর্ণকে আপনাদিগের কূট উপধর্ম্মজালে আচ্ছন্ন করিতে গিয়া আপনারাও তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা প্রথমে যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা ও মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা যাগযজ্ঞের উপকারিতা বা মন্ত্রের শক্তি বিশ্বাস করিতেন এরূপ বোধ হয় না। সূক্ষ্মদর্শী চার্ব্বাক সত্যই বলিয়াছেন যে ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণাদির লোভেই যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আদি ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বুদ্ধিমান্ ছিলেন তাহাতে কোন-প্রকার উপধর্ম্মে তাঁহাদিগের যে বিশ্বাস থাকিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। হীন বর্ণের মূর্খতার সুবিধা লওয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হীনবর্ণের সর্ব্বনাশের জন্য তাঁহারা যে উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন, কালে তাঁহাদিগের বংশধরগণ সেই উপধর্ম্ম-জালে জড়িত হইলেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণ তাঁহাদিগের অন্তর্নিহিত গূঢ় অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া, স্বার্থ সাধনোদ্দেশে পিতৃগণ-প্রবর্ত্তিত সেই উপধর্ম্মকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিলেন। অন্যান্য বর্ণের ন্যায় তাঁহারাও সেই উপধর্ম্মের ঘোরতর গোঁড়া হইয়া উঠিলেন, অন্ধ বিশ্বাসে ও পূর্ব্বপুরুষগণের অন্ধ অনুসরণে ক্রমে তাঁহাদিগের বুদ্ধি ভ্রংশ হইতে লাগিল। 'কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কোন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না। যুক্তিহীন সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হানি হয়,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

দেবগুরু পণ্ডিতশিরোমণি বৃহস্পতির এই অমূল্য উপদেশ তাঁহারা ক্রমেই ভুলিয়া গেলেন। কালে বৃহস্পতির বংশধরেরা গণ্ডমূর্খ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ঘোর অজ্ঞানতিমির সমস্ত ভারত আচ্ছন্ন করিল। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা এই জন্য তদুৎপীড়িত শূদ্র জাতি অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয়। ইঁহারা পাণ্ডিত্যাভিমানী, অথচ চূড়ান্ত মূর্খ। ইঁহাদের পাণ্ডিত্য শাস্ত্রের গথমুখস্থ রাখায়, অথচ ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সে শাস্ত্র কখন চক্ষে দেখেন নাই। যে দেবভাষায় সে শাস্ত্র রচিত, অনেকে সে দেবভাষার বর্ণমালা পর্য্যন্তও কখন নয়নগোচর করেন নাই। যাঁহাদিগের সে ভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, এবং সে শাস্ত্রেও কিঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগেরও শব্দজ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান নাই। শাস্ত্রকারেরা, কি উদ্দেশে সেই

সকল শাস্ত্র করিয়াছেন, সে সকল শাস্ত্র সঙ্গত কি না, এখনকার কালের উপযোগী কি না, এ সকল বিচার করিবার শক্তি তাঁহাদিগের নাই। শূদ্রেরা দেখিবার অধিকার নাই বলিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ব্রাহ্মণেরা যে দিকে যাইতে বলিতেছেন, সেই দিকেই যাইতেছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পিতৃপুরুষগণ খানায় পড়িতে বলিয়াছেন বলিয়া উন্মীলিত নয়নে খানায় গিয়া পড়িতেছেন।

এই বর্ণ-বৈষম্য এক্ষণে এত বাড়িয়াছে যে ভাবিতে গেলে ভয় হয়। খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টানকে দেখিলে ও মুষলমাণের মুষলমানকে দেখিলে যেরূপ আনন্দ হয়, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকে ও শূদ্রের শূদ্রকে দেখিলে সেরূপ আনন্দ হয় না। বঙ্গে ব্রাহ্মণ—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী প্রভৃতি কয় প্রধান ভাগে বিভক্ত, সেই কয় প্রধান ভাগের ভিতর আবার কুলীন, ভঙ্গকুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ প্রভৃতি এত অবান্তর ভেদ জন্মিয়াছে যে সে সকলের সংখ্যা করা সহজ নহে। এক একটী ভাগ এক একটী স্বতন্ত্র জাতি, এক একটী অবান্তর ভাগ এক একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী ইহারা পরস্পরের সহিত আদান প্রদান বা পরস্পরের অন্নগ্রহণ করেন না। কুলীন বিনা দক্ষিণায় ভঙ্গকুলীন বা বংশজের অন্ন গ্রহণ করিবেন না, বিপুল অর্থ বিনা তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবেন না। শ্রোত্রিয়, বংশজ বা ভঙ্গকুলীন অর্থব্যয়েও সহজে কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না। যদি কোন কুলীন দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তদীয় কন্যাকে বংশজের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি সবংশে কৌলীন্যচ্যুত হইবেন। এতদ্ভিন্নও শূদ্রযাজনা ও যাবনিক সংস্রবে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পীরআলি ও গোব্রাহ্মণাদি অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ জন্মিয়াছে। ইহাঁদিগের পরস্পরের ভিতর হিন্দু মুসলমান পার্থক্য বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন পাশ্চত্য ও দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদিগের ভিতরও অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রস্তাব-বাহুল্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ হইতে বিরত থাকিতে হইল। আবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এত প্রাদেশিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছে যে একজন কাশ্মীরী বা পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ প্রাণান্তেও কখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান বা তাঁহার অন্নগ্রহণ করিবেন না। এইরূপে দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, ভোজপুরী, কনোজী, বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা স্বতন্ত্র জাতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা পরস্পরকে বিধর্ম্মীর ন্যায় ঘৃণা করেন। এই গৃহ-বিচ্ছেদ হইতেই ব্রাহ্মণদিগের বর্ণপ্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে। যে স্বশ্রেণীহিতৈষিতা শক্তি প্রভাবে ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে চতুর্ব্বর্ণের উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যে স্বশ্রেণীহিতৈষিতা বলে ইহাঁরা দিগন্তব্যাপী প্রবল-প্রতাপ বৌদ্ধধর্ম্মেরও মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেই স্বশ্রেণীহিতৈষিতা

এক্ষণে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে।

এক্ষণে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ সংখ্যায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বর্ণের সহিত তুলনায় নগণ্য মাত্র। সুতরাং তাঁহাদিগের বিষয় লইয়া সবিশেষ আন্দোলন অনাবশ্যক। তবে ইঁহারাও বর্ণ-বৈষম্য দোষে উৎপীড়িত ও উৎপীড়ক। ক্ষত্রিয়দিগকে আজও সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুতা স্বীকার করিতে হয়। রাজ্যশাসন ভার তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত ছিল বলিয়া পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এ দাসত্ব তত ক্লেশকর বোধ হইত না। এক্ষণে তাঁহারা পূর্ব্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তথাপি পূর্ব্ব দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের এক সান্ত্বনা-স্থল আছে। তাঁহারা এখনও বৈশ্য ও শূদ্রের উপর আধিপত্য করিতেছেন। তাঁহারা যেমন পদদলিত হইতেছেন, তেমনই পদদলিত করিতেছেন।

বৈশ্যদিগের অবস্থা ক্ষত্রিয়দিগের অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। বঙ্গের সুবর্ণবণিক্ দিগের সামাজিক অবস্থা এতদিন শূদ্রদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিল। আজ কালমাত্র ইঁহারা বৈশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। এতদিন ইঁহারা অন্ততঃ 'মততঃ অস্পৃশ্য-চণ্ডাল-সম ছিলেন। লক্ষ্মীর বরপুত্র বলিয়া ইঁহারা ব্রাহ্মণদিগের কৃপার-পাত্র ছিলেন মাত্র। অন্যান্য প্রদেশের বৈশ্যদিগেরও সামাজিক অবস্থা সম্পূর্ণ সুখপ্রদ নহে।

আমরা এক্ষণে হিন্দুসমাজের প্রাণভূত অথচ অত্যন্ত অবহেলিত শেষ শাখায় উপনীত হইলাম। আমরা শূদ্রবর্ণকে হিন্দুসমাজের প্রাণভূত বলিলাম, কারণ শূদ্রেরা সংখ্যায় আর্য্য বর্ণত্রয় অপেক্ষা অনেক অধিক। বিজিত ও বিজয়ী জাতির মধ্যে এরূপ সংখ্যাবৈলক্ষণ্য ঘটিবেই ঘটিবে। যদি ইংরাজেরা কখন ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া ভারতবাসীদিগের সহিত মিশিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বা তাঁহাদিগের ভবিষ্য বংশধরগণের সংখ্যা ভারতের বিজিত অধিবাসিদিগের সংখ্যা অপেক্ষা চিরকালই ন্যূন থাকিবে।

এই শূদ্রদিগের মধ্যে আবার এত সাম্প্রদায়িকতা জন্মিয়াছে, যে এক একটী সম্প্রদায়কে এক একটী স্বতন্ত্র বর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উচ্চশ্রেণীর শূদ্র ও নিম্নশ্রেণীর শূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র পার্থক্য বর্ত্তমান। আর্য্য ও অনার্য্য বর্ণ সংমিশ্রণে যে সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদিগের অবস্থা বিজিত শূদ্রগণের অপেক্ষা বড় অধিক ভাল নহে। সঙ্করবর্ণে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইতেছে বটে, তথাপি ইঁহারা আর্য্যবর্ণত্রয়ের অনৌদার্য্য বশতঃ উক্ত বর্ণত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে অগত্যা শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর্য্যজাতির পরস্পর মিশ্রণে যে সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বোক্ত বর্ণসঙ্করের অবস্থা অপেক্ষা

অনেক উচ্চ। যাহাহউক সঙ্করবর্ণ, সৎ-শূদ্র অন্ত্যজ শূদ্র ও তাহাদিগের শাখা প্রশাখা লইয়া শূদ্রবর্ণ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান বা অন্ন গ্রহণাদি প্রচলিত নাই।

এইরূপে হিন্দুসমাজ অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পরস্পর-মমতাশূন্য বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও জাতীয়-ভাব-বিরহিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জেতার হস্তে পতিত হইতেছে। মোগল, পাঠান, তুর্কী, দিনেমার,—পর্টুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাশি, ইংরাজ—ক্রমেই এই বিকলাঙ্গ অস্থিবিচ্ছিন্ন ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যতদিন এক অঙ্গে বেদনা লাগিলে অন্যান্য অঙ্গে তাড়িত বেগে সমবেদনা উপস্থিত না হইবে, যতদিন বর্ণমধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ উঠিয়া না যাইবে, ততদিন হিন্দুজাতির বৈদেশিক অধীনতা হইতে রক্ষা নাই। ইংরাজ যায় রুষ আসিবে, রুষ যায় জার্ম্মান্ আসিবে, জার্ম্মান্ যায় ফরাশি আসিবে, এইরূপে অনন্ত বিজয়-প্লাবনে ভারত-বক্ষ আপ্লুত হইবে।

ভারতের অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ **ধর্ম্ম-বৈষম্য**। যখন আর্য্যজাতি ইরিণ বা ঈরাণ দেশ হইতে আসিয়া প্রথমে ভারত বিজয় করেন, তখন উহাঁরা বুদ্ধিবলে দেখিতে পান যে বিজিতদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিলে তাহাদিগের উপর চিরকাল আধিপত্য করিতে পারিবেন না। বিজিতদিগকে স্বধর্ম্মে আনিয়াছিলেন বলিয়াই রাজনৈতিক প্রভুতার বিলোপেও বিজিত শূদ্রগণের উপর ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মনৈতিক প্রভুতা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই ধর্ম্মনৈতিক একীভাবের নিমিত্তই আর্য্য ও অনার্য্যে জেতা ও বিজিত ভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কখন যে আর্য্যেরা শূদ্রদিগকে বিজিত করিয়াছিলেন এ ঐতিহাসিক স্মৃতি পর্য্যন্তও শূদ্র সাধারণের মন হইতে তিরোহিত হইয়াছে। অশিক্ষিত শূদ্রেরা আজও বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না যে তাহাদিগের এ দুর্গতির প্রধান কারণ আর্য্য ব্রাহ্মণ। তাহারা জানে ব্রাহ্মণ তাহাদিগের পারত্রিক মুক্তি দাতা। তাহাদিগের পারত্রিক মুক্তিদাতা ব্রাহ্মণ কখন তাহাদিগের ঐহিক সুখের হন্তা হইতে পারেন শূদ্রসাধারণ ইহা মনে করিতেও পাপ মনে করে। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের এই সূক্ষ্ম দর্শনের ফল আরও কতদিন ভোগ করিবেন তাহারও ইয়ত্তা নাই।

ভারতে আর্য্যদিগের ন্যায় আর কোন বিজেত্রী জাতি বিজিতদিগকে আমূল স্বধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। এই জন্য মুষলমান রাজত্বকাল দীর্ঘকাল ভারতে স্থায়ী হয় নাই। মুষলমাণেরা আংশিক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগের রাজত্ব সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী হইয়াছিল। মোগল

রাজবংশ হিন্দুজাতির প্রতি ধর্ম্মনৈতিক উদারতা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন বলিয়াই মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি এত উজ্জ্বল বিভা ধারণ করিয়াছিল।

নব্য ভারত ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে এক্ষণে জাতীয় জীবন উপলব্ধি করিতেছেন কিন্তু ধর্ম্মনৈতিক একতা ভিন্ন জাতীয় জীবন অঙ্গহীন। আমি যতই কেন উদার হইনা, মুষলমাণ খ্রীষ্টীয়ান্ য়িহুদীকে একটু দূরে রাখিব। সেইরূপ খ্রীষ্টীয়ান্ মুষলমাণ য়িহুদী যতই উদার হউন না, বিধর্ম্মী বা পুত্তলিকোপাসক বলিয়া হিন্দু তাঁহার ঘৃণার পাত্র বা শোচ্য। অন্নজলাদিগ্রহণ ও অন্নদান প্রদান ব্যতীত কখনই সম-সামাজিকতা জন্মে না। সম-সামাজিকতা ব্যতীতও জাতীয় জীবন দৃঢ় হয় না। ধর্ম্মনৈতিক একতা ব্যতীতও এই সম-সামাজিকতা কখনই সম্ভবে না। সুতরাং ভারতের জাতীয় একতা বন্ধনের জন্য ধর্ম্মনৈতিক একতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভারতের অধঃপতনের তৃতীয় কারণ জাতিবৈষম্য। এ জাতিবৈষম্য জেতৃ-বিজিত-জাতি-বৈষম্য বা বর্ণবৈষম্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা ভৌগোলিক বা প্রাদেশিক জাতীয়তা। প্রদেশভেদে ভারত-বাসিগণের পরস্পবের প্রতি জাতীয় বিদ্বেষ ইহার প্রতিপাদ্য। এই ভৌগোলিক সাম্প্রদায়িকতা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখনই এই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি। তখন ইহা অনিবার্য্য ও কতকটা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে এই অনিবার্য্য ও প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক বিভাগ অতি ঘোরতর জাতীয় ভাবে পরিণত হইল। এক আর্য্য জাতি, ও এক অনার্য্য জাতি এই সকল বিভিন্ন ২ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ হইয়া ক্রমে আপনাদিগের প্রকাণ্ড জাতীয় ভাব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রী বা পঞ্জাবী প্রভৃতি আর্য্য বাঙ্গালী উড়িয়া প্রভৃতি আর্য্যকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বিভিন্ন-দেশীয় অনার্য্যদিগের মধ্যেও এইরূপ বিজাতীয় ভাব। এই প্রাদেশিক জাতীয় ভাব ক্রমে জাতীয় শত্রুতায় পরিণত হইল। এই প্রাদেশিক জাতীয় শত্রুতা হইতেই আর্য্যজাতির যবন-হস্তে পতন হয়। এই শত্রুতা থাকিতে আমাদিগের ভারতীয় জাতীয় মাহাত্ম্য কখনই হইবে না। রোমীয় রাজ-তন্ত্রের সময় ইতালীতে এই প্রাদেশিক জাতীয় বিদ্বেষ ছিল, এই জন্য তখন রোমের তেজঃ-প্রতিভা ততদূর বিকাশ পায় নাই। রোমীয় সাধারণতন্ত্রের সময় এই প্রাদেশিক জাতীয় বিদ্বেষ বিলুপ্ত হয়, এইজন্য এই সময়ে রোমের এত প্রতাপ, এত মাহাত্ম্য! রোমীয় সাম্রাজ্যের সময়ও এরূপ প্রাদেশিকতা ছিল না, রোমীয় সাম্রাজ্যেরও গৌরবের ইয়ত্তা ছিল না। রোম-সাম্রাজ্যের পতনের পর আবার ইতালী এই প্রাদেশিক জাতীয়

সাম্প্রদায়িকতায় ছিন্ন ভিন্ন হইল। তাহার পরিণাম বৈদেশিক অধীনতা। ম্যাট্‌সিনি ও তৎ-সহচরবৃন্দকে এই প্রাদেশিক জাতীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসংখ্য লেখনীসমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সেই মহতী উদ্দীপনা শক্তি প্রভাবে ইতালীয় প্রদেশ সকল যখন আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা পীডমণ্টরাজ ভিক্‌টর ইমানুয়েলের অধীনে একটী সমবেত ইতালীয় জাতিরূপে পরিণত হইলেন। অমনি তাঁহাদিগের পায়ের শৃঙ্খল খুলিল। গ্যারীবল্‌ডী সমবেত ইতালীয় সেনা লইয়া বিজয়ী অষ্ট্রিয়দিগকে বিজিত করিয়া তুষরাশির ন্যায় তাহাদিগকে ইতালীক্ষেত্র হইতে উড়াইয়া দিলেন। এইরূপ যখন জার্ম্মানী কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিকরাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন ফ্রান্সের পদাঘাতে মধ্যে মধ্যে জার্ম্মান্‌দিগের মস্তক চূর্ণীকৃত হইত। প্রথম নেপোলিয়নের সময় তাঁহাদিগের দুর্গতির আর পরিসীমা ছিল না। তৃতীয় নেপোলিয়নেরও ভয়ে জার্ম্মাণেরা কম্পিত হইতেন। স্বদেশহিতৈষী বিস্মাক তাঁহাদিগের জাতীয় অবনতির কারণ বুঝিলেন। জাতীয় একতা সম্পাদনে তিনি প্রাণ পণ করিলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় বিচ্ছিন্ন জার্ম্মান্ প্রদেশ সকল প্রুসিয়ার রাজার অধীনে একটী প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত হইল। সমবেত জার্ম্মান্ সাম্রাজ্যের প্রতাপ অচিরকাল মধ্যে বিজয়ী ফ্রান্সে অনুভূত হইল। সিডান্ রণক্ষেত্রে ফরাশি-সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন সমবেত জার্ম্মান্ সেনার পদানত হইলেন। অবরুদ্ধ পারিস ছয়মাস আত্মরক্ষার পর বিজয়ী জার্ম্মান্ সেনার নিকট আপনার দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন, এবং সুবর্ণরাশির বিনিময়ে অবরুদ্ধ ফরাসিগণ প্রাণ ভিক্ষা পাইলেন। ইতিহাস এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ, কিন্তু আর নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সকলেই বুঝিবেন যে এই প্রাদেশিক জাতীয় সাম্প্রদায়িকতার পরিহার ব্যতীত ভারতের জাতীয় একতাবন্ধনের কোন আশা নাই। এই প্রাদেশিক জাতীয় ভাবের নিরাকরণের তিনটী প্রধান অন্তরায় আছে। পরিচ্ছদ-বৈষম্য, ভাষাবৈষম্য, ও শাসনবৈষম্য। সুতরাং এ তিনটী বৈষম্যকেই আমরা ভারতের অধঃপতনের কারণ বলিয়া ধরিব।

ভারতের অধঃপতনের চতুর্থ কারণ **পরিচ্ছদবৈষম্য**। পরিচ্ছদের একতা ভিন্ন কখন মমত্বজ্ঞান হয় না। একজন সাহেব যদি আমাদের পরমহিতৈষী হন, তথাপি তাঁহাকে দেখিলেই কেমন পর ২ বলিয়া বোধ হইবে। একজন বাঙ্গালী যদি আমার পরম শত্রু হয়, তথাপি তাহাকে দেখিলেই, যেন কেমন আপন আপন বলিয়া বোধ হইবে। এই পরিচ্ছদসাম্য-প্রিয়তা হইতেই আমরা একজন দেশীয়কে বৈদেশিক-পরিচ্ছদে আবৃত

দেখিলে সহিতে পারি না। পরিচ্ছদ-সাম্য জাতীয় জীবনের প্রথম লক্ষণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ভারতেব ন্যায় পরিচ্ছদ-বৈষম্য আর কোন দেশে দেখা যায না। সমস্ত ইউরোপে প্রায় একই রকম পরিচ্ছদ। কিন্তু এক ভারতে অসংখ্য বিভিন্ন পরিচ্ছদ। একজন ভারতবাসী বিদেশে যাউন তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়া চিনিবাব কোন লক্ষণ নাই। তাঁহাকে বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, কি মহারাষ্ট্রী বলিয়া চিনিতে হইবে। গুরু-গোবিন্দ পরিচ্ছদ-সাম্যের মোহিনী শক্তি বুঝিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি খালসা মাত্রকেই এক বর্ণেব এক রকম পরিচ্ছদে আবৃত করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারত-বাসী যদি একটী প্রকাণ্ড জাতীয় জীবনেব প্রার্থী হন, তাহা হইলে সর্ব্ব-প্রথমে তাঁহাদিগকে জাতীয় জীবনেব প্রথম লক্ষণ পরিচ্ছদ-সাম্য অবলম্বন করিতে হইবে।

ভারতেব অধঃপতনের পঞ্চম কারণ ভাষা-বৈষম্য। ভিন্ন ২ ভাষা কথন-শীল ব্যক্তিগণেব মধ্যে কখন জাতীয় সহানুভূতি হইতে পারে না। ইংরাজ কখন ফরাশিকে একজাতি বলিয়া মনে করিতে পারেন না; সেইরূপ বাঙ্গালী কখন মহারাষ্ট্রীকে এক জাতি বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। মহারাষ্ট্রীয়ও বঙ্গে আসিয়া একটী বিভিন্ন জাতির সহিত মিশিত হইতেছি বলিয়া মনে করিবেন। ভাষাবৈষম্য নিমিত্তই বাঙ্গালী ও মহা-রাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে কখনই জাতীয় সহানু-ভূতি জন্মে নাই। এই জন্যই আমাদিগকে বর্গীর হঙ্গাম পোহাইতে হইয়াছিল। আবার যদি মহারাষ্ট্র-প্রতাপ কখন পুনরুদিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে হয়ত সেই হঙ্গাম আবার পোহাইতে হইবে। এইরূপ তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, গুজরাটী, ভোজপুরী, মাড়ওয়ারী, পঞ্জাবী, গুরুমুখী, হিন্দি, উর্দ্দু, পারশী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী, ইংরাজী প্রভৃতি অসংখ্য ভাষা যে দেশে প্রচলিত সে দেশের জাতীয় একতা বড় সহজ ব্যাপার নহে। প্রত্যেক-ভাষা-কথনশীল জাতির স্বতন্ত্র জাত্যভিমান আপনিই হইয়া পড়ে। এই সাম্প্রদায়িক জাত্যভিমান হইতে পরস্পর বিদ্বেষ অতিশয় বাড়িয়া উঠে। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজ রাজনীতির কৌশলে এই ভাষাগত ভেদ দিন দিন আরও বাড়িতেছে। যে সকল প্রাদেশিক ভাষা এখনও পুষ্টাবয়ব হয় নাই, অথচ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে কোন প্রধান ভাষার সহিত তাহার অনেক ঐক্য আছে, তখন অপুষ্ট ভাষাকে অঙ্কুরে বিদলিত করিয়া সেই পুষ্ট মূল ভাষাকে তৎস্থানে সন্নিবেশিত করাই জাতীয় হিতাকাঙ্ক্ষী গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদেব দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ স্থলে আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিপরীত নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এইরূপ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি (Decentralization

policy) আর কিছু দিন চলিলে ভারত অচিরকাল মধ্যে অসংখ্য বিভিন্নভাষাবলম্বী জাতিতে পরিণত হইবে। ভাষা সংখ্যা যত বাড়িতে থাকিবে ততই ভারতের একীকরণ কার্য্য সুদূর-পরাহত হইবে। এইরূপে প্রাদেশিক বিদ্বেষানল যতই প্রজ্বলিত হইবে, ততই বৈদেশিক শৃঙ্খল কঠিনতর হইয়া আসিবে। ভাষাবৈষম্যে যে কেবল প্রাদেশিক বিদ্বেষানল অধিকতর প্রজ্বলিত হয় এরূপ নহে, ইহাতে এক প্রদেশের উন্নতিতে প্রদেশান্তরের উন্নতি হয় না। তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল বঙ্গভাষা। বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতর পরিমার্জ্জনার সহিত বাঙ্গালীর ভাষাও অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও পুষ্টাবয়ব হইতেছে। ইহার সহিত তুলনায় ভারতীয় অন্যান্য ভাষা দিন দিন অধিকতর হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে। যদি বাঙ্গালা ভাষা সমস্ত ভারতবাসীর ভাষা হইত, তাহা হইলে আজ ভারতের কি সৌভাগ্য হইত! কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আশা করিতেছি না যে সমস্ত ভারতবাসীই বঙ্গভাষাকে ভারতীয় জাতীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিবেন। প্রার্থনীয় হইলেও সে আশা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। যাহা হউক যে ভাষাই ভারতীয় জাতীয় ভাষা হউক না কেন, ইহা স্থির যে এরূপ একটী জাতীয় সাধারণ ভাষা ব্যতীত ভারতের সমীকরণ অসম্ভব। যাঁহারা ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে মাতাইয়া ভারত মাতাইলাম বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন তাঁহারা নিতান্ত অন্ধ। কারণ বৈদেশিক ভাষায় কখন একটী জাতিকে মাতান যাইতে পারে না। বৈদেশিক ভাষা সমাজের অধস্তল স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য বৈদেশিক ভাষায় বক্তৃতাদি সমাজের অধস্তলকে উদ্দীপিত করিতে পারে না। ইহা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর কয়েকজন মাত্রকে চালিত করিয়া থাকে। সে কয়েকজন অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয়। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে টাউনহল প্রভৃতিতে যে সকল সভা হয়, তাহাতে কতিপয় অজাতশ্মশ্রু যুবক ব্যতীত জাতি সাধারণ সমবেত হন না। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রকাশ্য সভা সকলে যে অসংখ্য লোক সমবেত হয় উহার প্রধান কারণ স্বদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা। স্বদেশীয় ভাষার উদ্দীপনাশক্তি অতি চমৎকার! ইহা মৃতদেহেও জীবন সঞ্চার করে, নির্ব্বাণপ্রায় বীর্য্যবহ্নিকে সন্ধুক্ষিত করে। তথাপি যাঁহারা বলিবেন যে ইংরাজী ভারতের জাতীয় ভাষা হইবেক, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহাদিগের মতের পরিপোষক কোন পূর্ব্ব নিদর্শন আছে কি না? আমরা ত ইতিহাসে ইহার অনুরূপ একটী দৃষ্টান্তও পাই না। রোম ত অসংখ্য রাজ্যকে পরাজিত করিয়া নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমীয় ভাষা কোন্ বিজিতদেশের মাতৃভাষাকে তাড়িত করিয়া তৎস্থান

অধিকার করিয়াছিল? বিজিত দেশ সকলের ভাষানিচয় রোমীয় ভাষা দ্বারা কেবল মার্জ্জিত ও পুষ্টাবয়ব হইয়াছিল মাত্র। এইরূপ নর্ম্মান্‌জাতি যখন আঙ্গ্‌লোসাক্সণদিগকে বিজিত করিয়া ইংলণ্ডে নর্ম্মান্‌ জাতির আধিপত্য স্থাপন করিলেন, তখন আইন আদালত সব ফ্রাঙ্কো-নর্ম্মান্‌ ভাষায় চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু আঙ্গ্‌লো-সাক্ষণ ভাষাই ইংলণ্ডের মাতৃভাষা রহিয়া গেল, কেবল বিজেত্রী জাতির ভাষা দ্বারা পুষ্টাবয়ব হইল মাত্র। আমরা ঘরের মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। যে আর্য্যজাতি প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, যাঁহারা বিজিত অনার্য্যজাতির সহিত অনেক বিষয়েই একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনার্য্য ভাষাকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দেবভাষাসম অনুপম সংস্কৃত ভাষাকে ভারতীয় জাতীয় ভাষা করিতে পারেন নাই, দেশীয় বা প্রাকৃত ভাষাই জাতীয় ভাষা রহিল। কেবল সংস্কৃতের সহিত সংমিশ্রণে সংঘর্ষণে পরিপুষ্ট ও অধিকতর সুললিত হইল মাত্র। আর্য্যেরা বিজিত জাতির ভাষাকে যে শুদ্ধ বিদূরিত করিতে পারিলেন না এরূপ নহে, তাঁহারা সেই প্রাকৃত ভাষাকে আদর করিয়া সংস্কৃত নাটকাদিতে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সেইরূপ মুষলমানেরা ভারতে সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াও পারস্যভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা করিতে পারেন নাই। প্রতিগৃহে পারস্য ভাষার চর্চ্চা; প্রতি আদালত ও প্রতি বিদ্যালয়ে পারস্য ভাষার আলোচনা; তথাপি পারস্যভাষা কিছুতেই ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইল না। শেষে একটা সামঞ্জস্য হইল; পারস্য ভাষার সংমিশ্রণে জাতীয় ভাষা হিন্দি কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া হিন্দু মুষলমাণ উভয়ের উপযোগী একটী মিশ্র ভাষা রূপে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য যে এই ভাষার নাম উর্দ্দু। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে *আর্য্যজাতি বা মুষলমাণ* জাতি ইংরাজদিগের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে ভারতে রাজ্য করেন নাই। তাঁহারা ভারতের অধিবাসী হইয়া ভারতের শাসন করিয়াছিলেন, সুতরাং ভারতের বিজিত অধিবাসিদিগের সহিত তাঁহাদিগের অনেক পারিবারিক ও সামাজিক সংমিশ্রণ হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা আপনাপন ভাষা দ্বারা দেশীয় ভাষাকে বিদূরিত করিতে পারেন নাই।' ইংরাজেরা আমাদিগের সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তাঁহাদিগের সহিত আমাদের আফিস আদালত ও বিদ্যালয়াদিতে যাহা দেখা শুনা হয়। তবে তাঁহাদিগের ভাষা আমাদিগের (Lingua Franca) জাতীয় ভাষা হইবে কিরূপে? তবে এক উপায় আছে। ইংরাজেরা যদি এরূপ আইন জারী করেন যে—আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভারতে যে কেহ ইংরাজী ভিন্ন আর যে কোন ভাষায়

কথাবার্ত্তা কহিবে, তাহাকে দণ্ডবিধির কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে একদিন ইংরাজী আমাদের জাতীয় ভাষা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইংরাজেরা এরূপ অস্বাভাবিক আইনজারি করিতে সক্ষম হইলেও করিবেন না; কারণ এরূপ আইনজারি করা যত সহজ, এরূপ আইন কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। রুসিয়া যে পোলণ্ড স্থলে এরূপ অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহার কারণ বিজিতদিগের সংখ্যার অল্পতা। কিন্তু বিজিত ভারতবাসিগণের সহিত তুলনায় বিজয়ী ইংরাজ কয় জন? সমস্ত ভারতবাসী ইংরাজী গ্রহণে প্রস্তুত হইলেও পঞ্চবিংশকোটী ভারতবাসীকে ইংরাজী শিখায় এরূপ লোক কই?

ভারতের জাতীয় অধঃপতনের ষষ্ঠ কারণ শাসনবৈষম্য। ভারত প্রকৃত প্রস্তাবে কখনই এক শাসনের অধীন হয় নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখা যায় যে ভারত কতকগুলি ক্ষুদ্র ২ রাজ্যে সতত সংবিভক্ত। আর্য্যদিগের ভারতবিজয়ের পূর্ব্বেও ভারতের এই দশা ছিল। এই জন্যই অতি অল্পসংখ্যক আর্য্য যোদ্ধা সেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ২ শূদ্ররাজ্যকে এক একটী করিয়া পরাস্ত করিয়া প্রথমে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে, পরে সমস্ত ভারতে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। কিন্তু ভারত-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পর আর্য্যেরাও বিজিত অনার্য্যদিগের ভ্রমে পতিত হইলেন। ইহাঁরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সংবিভক্ত হইয়া ভারত শাসন করিতে লাগিলেন। এক এক জন রাজচক্রবর্ত্তী এই সকল ক্ষুদ্র রাজমণ্ডলীর আধিনেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইতেন বটে, কিন্তু সে অধিনেতৃত্ব নাম মাত্র। আভ্যন্তরীণ ও বহিশ্চর সকল বিষয়েই তাঁহারা সম্রাট্ হইতে স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদিগকে কেবল সেই মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীকে সম্রাট্ বলিয়া মানিতে হইত ও প্রয়োজন মত তাঁহাকে অর্থ ও সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে হইল। ইংরাজসিংহের সহিত ভারতীয় মিত্ররাজগণের যে সম্বন্ধ আছে, এবং ফিউডালতন্ত্রের ফিউডাল সামন্তগণের মণ্ডলেশ্বরের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল, ইহাঁদিগের সহিত সেই রাজ-চক্রবর্ত্তীরও সেই সম্বন্ধ ছিল।

এইরূপে ভারতের জাতীয় সহানুভূতি সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ হইতে থাকিল। জাতীয় সহানুভূতির স্থানে প্রাদেশিক বিদ্বেষানল প্রবলতর হইয়া উঠিল। আর্য্যজাতির অদ্ভুত স্বজাতি প্রেমিকতা ও আর্য্যধর্ম্মের অবিচলিত স্বসম্প্রদায়-হিতৈষণা নিবন্ধন এই বিদ্বেষ ভাব সহস্র সহস্র বৎসর ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অন্তর্নিগূহিত ছিল, কালে সেই স্ফুলিঙ্গ প্রকাণ্ড বহ্নিরূপে পরিণত হইল। শেষে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পরস্পরের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায়

পৃথুরাজের পতন তাহার চরম দৃষ্টান্ত স্থল। পৃথুরাজের রাজত্বকালে যখন অন্তর্বিচ্ছেদে ভারতবক্ষঃ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, তখনই যবনসেনা সিন্ধু পার হইতে সাহস করিয়াছিল। আবার মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় যখন ভারত অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, তখনই আমেদ সা আবদালী যবনসেনা সহ আবার সিন্ধু পার হইয়া পাণিপথ রণক্ষেত্রে সমবেত হিন্দু ও মুসলমান সেনাকে পরাস্ত করিল। সেই পরাজয়ের ব্যবহিত ফল ইংরাজ কর্তৃক ভারতাধিকার। এক্ষণে যদিও ইংরাজ-সিংহ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সলিমান হইতে অমরাবতী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক সীমায় আবদ্ধ সমস্ত ভারতে অভূতপূর্ব্ব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তথাপি এখনও অনেক ক্ষুদ্ররাজ্য মিত্র বা করদ রাজ্যরূপে বিভিন্ন শাসনাধীন রহিয়াছে। আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এরূপ অবস্থা প্রার্থনীয় মনে করি না। সমস্ত ভারত যদি কখন একজাতীয় শাসনের অধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অগ্রে তাঁহাদিগকে এক প্রবল বৈদেশিক শাসনসমিতির অধীনে আসিয়া সেই মহান্ জাতীয় ভাব শিক্ষা করিতে হইবে। যখন সেই মহান্ জাতীয় ভাব আমাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে নিহিত হইবে, তখন সিদ্ধি আপনা হইতেই আমাদের করতলস্থ হইবে। এখন যদি ইংরাজ জাতি তাঁহাদিগের জাতীয় মহত্ত্ব গুণে আমাদিগকে তাঁহাদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে আমরা এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য লইয়া কি করি? আজ সিন্ধিয়া আসিয়া বলিবেন 'এ বিপুল ভারতে আমার অপেক্ষা বাহুবল কাহার অধিক? আমি ভিন্ন ইহার সম্রাট্ হইবার উপযুক্ত আর কে? যদি প্রতিবাদ কর ত আমার সুশিক্ষিত সেনা তোমাদিগের রুধিরে ভারতবক্ষঃ প্লাবিত করিবে। নেপাল, ভুটান, কাশ্মীর, বিকানীয়ার, জয়পুর, ভুপাল, উদয়পুর, হোল্কার, বরোদা, মহীসুর নিজাম, ত্রিবাঙ্কুর, ক্রমে ক্রমে ইহাঁরা সকলেই আমাদের নিকট তাঁহাদের বলবীর্য্য খ্যাপন করিবেন। আমরা এ ছত্রিশ কোটী দেবতার কাহাকে মনোনীত করিব? আমরা কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে সাহস করিব না। সুতরাং তাঁহারা আপন আপন আধিপত্য সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত ঘোরতর গৃহানল প্রজ্বলিত করিবেন। সেই সময় হয় ত রুষিয়া সুযোগ পাইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া আবার শত শত বৎসরের জন্য ভারতের সৌভাগ্যতপন তমসাচ্ছন্ন করিবে। সুতরাং রাজ্যতন্ত্রের মূল ছিন্ন করিয়া নিম্নোচ্চকে এক সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া, ভারতক্ষেত্রকে ভবিষ্য প্রকাণ্ড সাধারণতন্ত্রের বীজধারণোযোগী করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয় আমাদের হস্তবহির্ভূত, সুতরাং এ বিষয়ে কোন আন্দোলন করা

আমাদের অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। আমাদের নিজের বিষযে কথা কহিবার আমাদের অধিকার নাই।

ভারতের অধঃপতনের সপ্তম কারণ ধনবৈষম্য। এই বৈষম্য যে, কেবল ভারতের দুরদৃষ্টের ফল এরূপ নহে। সকল দেশই এই বৈষম্যে অল্প বিস্তর প্রপীড়িত। যে দেশে যখন এই বৈষম্যের পরিমাণ পূর্ণ হয় তখনই এক একটী বিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধ ফরাশি-বিপ্লব ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইএর সময়ে এই বৈষম্যে ফরাশি জাতির যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। অন্নাভাব-প্রপীড়িত প্রজার শেষ গ্রাস কাড়িয়া লইয়া, তাহাদিগকে পেষকে পেষণ করিয়া, শোষকে শোষণ করিয়া, দাহকে দাহন করিয়া যে অর্থরাশি সংগৃহীত হইত, তাহা রাজ-প্রণয়পাত্রী বারাঙ্গনা-গণের অঙ্গাভরণে ব্যয়িত হইত। উচ্চ-শ্রেণী রাজানুগৃহীত ও রাজপ্রসাদ ভোগী বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও তাঁহারা রাজকর হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কৃষক-বহুল নিম্নশ্রেণীই কেবল করভারে প্রপীড়িত। প্রজারা এতদূর নিঃস্ব ও করপ্রদানে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল, যে কর আদায়ের সৌকর্য্য বিধানের নিমিত্ত রাজাকে নাবিক-দাসত্ব, কাঁশিকাঠ, ও পীড়ন-যন্ত্র প্রভৃতিও অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। একদিকে প্রজাসাধারণ দারিদ্র্য অনাহার পীড়া ও নিষ্ঠুর দণ্ডবিধির তাড়নে মৃত-প্রায়;—অন্যদিকে রাজগণের চিন্তাশূন্য উদ্যানকেলি, বনবিহার, নৃত্যগীত, ও বারাঙ্গনাদিগের সহিত হাস্য-পরিহাসাদি ধারাবাহিক প্রমোদ-লহরী। পাপের ভরা পূর্ণ হইবামাত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ফ্রান্সে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে যেরূপ ভীষণ ধনবৈষম্য ঘটিয়াছিল, আমাদের দেশে আজও ততদূর ঘটে নাই বটে, আজও পাপের ভরা পূর্ণ হয় নাই সত্য, কিন্তু যে যে কারণ সত্বে সেই ভরা পূর্ণ হইবে, সে কারণ এখানেও বর্ত্তমান। সমাজ ও আইনের যেরূপ ব্যবস্থা তাহাতে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এই ঘোরতর ধনবৈষম্য কখন যে অপনীত হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। এই স্থানে যে উচ্চশ্রেণীর উল্লেখ করা হইল তাহা ধনি মাত্রেরই উপলক্ষণ, এবং যে নিম্ন শ্রেণীর উল্লেখ করা হইল তাহা দরিদ্র মাত্রেরই উপলক্ষণ। বর্ণবৈষম্যে ভারতে যে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী সংগঠিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ পার্থক্য। ধনী ও নির্ধন—জগতে এ প্রভেদ থাকিবে না, বা থাকা উচিত নয় এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। যিনি পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন তিনি আজীবন সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করুন্ তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র বা পৌত্র সমাজের কিছুই করিল না অথচ সেই পুত্র বা পৌত্র পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে পিতা বা পিতামহার্জ্জিত ধনভোগ

করিবেন আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না। যত দিন না শ্রমোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ জন্মের দৈবঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া অপক্ষপাতী ন্যায়ের তুলাদণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, যতদিন না অযত্ন-লব্ধ দ্রব্যজাতের উপর সাধারণ অধিকার প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, তত দিন জগতের ভারভূত অলস শ্রেণীর জগৎ হইতে তিরোভাবের সম্ভাবনা নাই। কি অধিকারে ধনীর পুত্র বা জমিদার-তনয় বিনা পরিশ্রমে অন্যোপার্জ্জিত ধন বা অন্য লব্ধ বিষয় গ্রহণ করিবেন? সেই ধনে বা সেই বিষয়ে তাঁহাদিগেরও যেমন অধিকার, সমাজ সাধারণেরও সেইরূপ অধিকার। সংসারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহারা নয় পিতৃসম্পত্তির কিঞ্চিদংশ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সমস্ত লইবার কে? একজন দৈবক্রমে এক ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন। পিতৃবিয়োগের পর প্রাপ্তবয়স্ক হইবামাত্র তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেন। তাঁহার প্রণয়পাত্রী বারাঙ্গনা বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইতে লাগিল। তাঁহার চতুরশ্ব যানের তাড়িত সম্পেষণে অনেক দীন দুঃখী হতপ্রাণ বা বিকলাঙ্গ। তাঁহার নির্ম্মম শোষণে প্রজাবৃন্দ হৃত-সর্ব্বস্ব! তিনি সমাজের কি করিয়াছেন যে সমাজ তাঁহার জন্য এত সহ্য করিবে? আর নিমে গোয়ালা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ চাষার ঘরে জন্মিয়াছে। সে ভূমিকর্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ উদরপূর্ত্তি করিতে প্রস্তুত আছে। তথাপি সে যে সামান্য টাকার জন্য কর্ষণোপযোগী হাল-হেতেল কিনিতে অক্ষম, তাহার জন্য কি সমাজ একটুও ভাবিবেন না? কে ভাবিবে? উচ্চ-শ্রেণীর ভাবিতে গেলে স্বার্থহানি হয়, সুতরাং উচ্চশ্রেণী কখনই ভাবিবেন না। আমাদের শাসনসমিতিও লক্ষ্মীর বরপুত্র, সুতরাং বৈষম্যের নিদান। উচ্চশ্রেণীর পরিরক্ষণে তাঁহাদেরও স্বার্থ আছে; কারণ কোন প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইলে উচ্চশ্রেণীর সমূহ ক্ষতি; সুতরাং উচ্চশ্রেণী সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবেন। বিপ্লবের গতিরোধক বলিয়া উচ্চশ্রেণীর অধিকার-নিচয় শাসনসমিতি কঠোর বিধি-পরম্পরা দ্বারা পরিরক্ষিত করিতে-ছেন। যখন শাসন সমিতি ও উচ্চশ্রেণী পরস্পর-সম্বদ্ধ হইয়া নিম্নশ্রেণীর প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন, তখন নিম্নশ্রেণীর উঠিবার আর আশা কই? সংখ্যা-গণনায় নিম্নশ্রেণী উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা অসংখ্যগুণ অধিক। সুতরাং সেই নিম্নশ্রেণী এরূপ অবনত থাকিতে ভারতের গৌরবের আর কি আশা? আমরা আবার বলিব যে সেই নিম্নশ্রেণী অধঃপতিত থাকিতে ভারতের কোন আশা নাই। যাঁহারা সেই নিম্নশ্রেণীকে তুলিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল উচ্চ-শ্রেণীর সাহায্যে ভারতের গৌরব-রবির পুনরুদয় দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

ভারতের জাতীয় অবনতির অষ্টম ও চরম কারণ **স্ত্রীপুরুষ-বৈষম্য।** এই স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য যে আজ প্রচলিত হইয়াছে বা শুদ্ধ আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে এরূপ নহে। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই অল্প বিস্তর পরিণামে সকল দেশেই চলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা অতি প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ ও মনু সংহিতা প্রভৃতিতেও ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখিতে পাই। সেই ঋগ্বেদের সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষে ব্রাহ্মণ শূদ্র পার্থক্য বিদ্যমান। মনুষ্যে ২ সমানাধিকার-বিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মনুষ্যজাতি। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের তুল্যাধিকারশালিনী। সাম্য-তত্ত্বের এই মূল সত্য সেই পুরাকাল হইতেই অস্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সাম্য-তত্ত্বের এই মূল মত প্রতিবাদীরা এই বলিয়া চিরকাল খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন, যে প্রকৃতি স্ত্রীজাতিকে যখন পুরুষজাতি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিতে ও শারীরিক বলে হীন করিয়াছেন, তখন সকল বিষয়ে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির সমান হইবে কিরূপে? এই যুক্তি আপাততঃ অখণ্ডনীয় বোধ হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা নিতান্ত অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। স্ত্রীজাতির শারীরিক গঠন কোন কোন বিষয়ে পুরুষজাতির অপেক্ষা বিভিন্ন তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীজাতি যে সাধারণ-পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে পুরুষজাতির সমকক্ষ নহেন, ইহা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে অসভ্য সমাজে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান শারীরিক পরিশ্রম করে। পাহাড়ী বা জঙ্গলী স্ত্রীরা পুরুষের সঙ্গে সমানে কাঠ কাটে, মাটী খোঁড়ে, বোঝা বয়। তাহাদের স্নায়বীয় বল পুরুষ-গণের অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন নহে। দীন দুঃখীর ঘরের স্ত্রীলোকেরাও বহু-পরিশ্রম সাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগেরও স্নায়বীয় বল নিতান্ত কম নহে। তবে যে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর ললনাগণ দিন দিন ননীর পুত্তলী হইতেছেন, তাহার কারণ অস্বাভাবিক পরিশ্রমবিরতি। পুরুষে পরম্পরায় শারীরিক পরিশ্রম হইতে বিরত হইলে পুরুষজাতিরও এইরূপ স্নায়বীয় অবনতি ঘটিতে পারে ও ঘটিয়াও থাকে। উচ্চশ্রেণীর পুরুষদিগের সহিত তুলনায় পাহাড়ী স্ত্রীলোকদিগের স্নায়বীয় পরিণতি অনেক অধিক। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে শারীরিক বৃত্তির পরিপুষ্টিও অন্যান্য বৃত্তির পরি-পুষ্টির ন্যায় চর্চ্চা-সাপেক্ষ। তুমি স্ত্রী-লোকদিগকে পুরুষদিগের ন্যায় সমান শারীরিক পরিশ্রমে নিয়োগ কর, কালে তাহারা প্রায় পুরুষদিগের সমান সবল হইয়া উঠিবে।

বুদ্ধিবৃত্তিতে যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির ন্যূন নহেন, তাহা আমেরিকায় একরূপ

পরীক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকায় ব্যবহার বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পাদি সকল বিদ্যায় স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির সমকক্ষতা করিতেছেন। তথায় স্ত্রীজাতি জজ্, মাজিষ্ট্রেট, বারিষ্টার, অধ্যাপক, চিকিৎসক—এই সকল মহোচ্চ পদে অভিষিক্ত হইয়া তাহার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। কোন বিষয়ে যে তাঁহারা ন্যূন একথা বলিতে আর কাহারও সাহস নাই। স্ত্রীজাতি যে শুদ্ধ এই উচ্চ পদগুলিতে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন এমন নহে, আমেরিকায় সামান্য পোষ্ট মাষ্টারী হইতে সকল কার্য্যেই স্ত্রীলোকের সমান প্রতিযোগিতা।

হৃদ্বৃত্তির পরিপুষ্টিবিষয়ে যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির ন্যূন নহেন বরং শ্রেষ্ঠ, এবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্য অপ্রাকৃতিক ও সাম্যনীতি-বিগর্হিত।

তর্কের অনুরোধে যদি আমরা স্বীকার করি যে সম্পূর্ণ সমান অবস্থায় রাখিয়া দেখা গেল যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির সমকক্ষ নহেন; যখন সমকক্ষ নহেন তখন সমান অধিকার পাইবেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি যে সমকক্ষ না হইলে সমান অধিকার পাইবার যোগ্য নহে, এ নীতি পূর্ব্বকালের পাশব নীতি, ইহা সাম্যনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। বলবান্ হইলেই দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন করিতে হইবে, দুর্ব্বলের প্রাকৃতিক স্বত্ব কাড়িয়া লইতে হইবে, বিদ্বান্ হইলেই মূর্খের বিদ্বেষী হইতে হইবে, বা ধনী হইলেই নির্ধনের উৎপীড়ক হইতে হইবে—এরূপ নিয়ম আর উনবিংশ শতাব্দীতে নীতি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। এরূপ নীতি এখন উঠিয়া গিয়াছে বলিয়াই দুর্ব্বল ও প্রপীড়িত ভারতবাসী ইংরাজকৃত অত্যাচারের নালিশ ইংরাজেরই নিকট করিতে যান। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা ভারতবাসী ইংরাজের নিকট সদ্বিচারের সম্ভাবনা না দেখিতে পাইলে, কাঁদিয়া বিলাতের মাটী পর্য্যন্ত ভিজাইয়া থাকি। ভারতবাসী জানেন যে ইংরাজ সাধারণ সাম্যবাদী, সুতরাং একজন ইংরাজ অবিচার করিতে পারেন, কিন্তু ইংরাজজাতি কখন অবিচার করিতে পারেন না। এই জন্যই তাঁহাদের এত সভা! এই জন্যই তাঁহাদের এত আবেদন!

আচ্ছা! তাঁহারা যখন একটী ভিন্ন জাতির সাম্যনীতির ফলভোগী হইতে আপনারা ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আপন গৃহে সেই নীতি প্রয়োগ করিবেন না কেন? অগ্রেই গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধা স্ত্রী কন্যাগণকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত না করিয়া অপরকে নিজের পায়ের শৃঙ্খল উন্মুক্ত করিতে বলা বিড়ম্বনামাত্র! ইংরাজেরা ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীকে রাজনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ

রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভারতের পুরুষগণ যে সেই বিংশতি কোটীর অর্দ্ধেককে ঘোরতর সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার কি হইবে? তাঁহারা গৃহে সেই ঘোরতর দাসত্বপ্রথার পরিপোষক হইয়া কোন্ মুখে ইংরাজদিগের নিকট আপনাদিগের শৃঙ্খল-মোচন ভিক্ষা করেন? তাঁহারা স্ত্রী জাতিকে যে দুর্গতিতে রাখিয়াছেন সহস্র রাজনৈতিক শৃঙ্খলেও তাঁহাদিগের তাদৃশ দুর্গতি হইবে না!

দাসদিগের যে অধিকার আছে, ভারতীয় নারীজাতির সে অধিকার নাই। 'দাসেরা বাহিরে যাইতে পারে, ভারতের নারীর নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে যাইবার অধিকার নাই। দাসেরা নিজ নিজ উদরান্ন আপনারা উপার্জ্জন করিতে পারে, ভারতের নারীর কোনপ্রকার উপার্জ্জনে অধিকার নাই। দাসেরা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায় অধিকারী, অধিক কি প্রাচীন রোমে উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের সন্তানগণের শিক্ষার ভার প্রধানতঃ দাসদিগের উপর ন্যস্ত থাকিত, কিন্তু ভারতীয় ললনাগণ সে শিক্ষায় অধিকারিণী নহেন। দাস নিজ মনোমত ভার্য্যা মনোনীত করিতে পারে, কিন্তু ভারতললনার চিরজীবনের সহচর নির্ব্বাচনে অধিকার নাই; নির্ব্বাচনশক্তি পরিপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহার মতামত উপেক্ষা করিয়া তাহাকে এক অপরীক্ষিত যুবকের হস্তে সমর্পণ করা হয়। স্ত্রী থাকিতেও পুরুষ সহস্রবার বিবাহ করিতে পারিবেন, কিন্তু ভারত-ললনা বিধবা হইলেও তাহার পুনর্ব্বিবাহে অধিকার নাই। পুত্র পিতার সমস্ত ধনে অধিকারী, কিন্তু দুঃখিনী কন্যার তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। পুত্র কন্যার অবর্ত্তমানে মৃত স্ত্রীর স্ত্রীধনে স্বামীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব, কিন্তু অপুত্রক স্বামীর মৃত্যুতেও স্বামি-ধনে স্ত্রীর জীবন-স্বত্ব মাত্র। একরূপ স্থলে স্ত্রীর স্ত্রীধন লইয়া স্বামী যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু মৃতপতির সম্পত্তির দান বিক্রয়ে স্ত্রীর কোনও অধিকার নাই। নিজের গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে সে সম্পত্তির ব্যয় করিবার তাঁহার অধিকার নাই।* তিনি যদি অতুল সম্পত্তির অধীশ্বরের ভার্য্যা হন, তথাপি তিনি একাশন বই করিতে পারিবেন না;† ইচ্ছা হইলেও একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে পারিতে পারিবেন না;‡ যে পর্য্যঙ্কে তিনি স্বামীর সহিত শয়ন করিতেন, সে পর্য্যঙ্কে বৈধব্যদশায় শয়ন করিলে স্বামীকে পাতিত করিবেন;§ যে গন্ধদ্রব্যের ব্যবহারে তিনি আশৈ-

* স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃস্মৃতঃ।
নাপহারং স্ত্রিয়ঃকুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন॥
স্মৃতি।

† একাহারঃসদা কার্য্যঃ ন দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চন।
স্মৃতি।

‡ উপভোগোঽপি ন সূক্ষ্মবস্ত্রপরিধানাদিনা।
দায়ভাগ।

§ পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্।

শব অভ্যন্ত তাহা তিনি স্পর্শও করিতে পারিবেন না; * অধিক কি একটী সামান্য পান খাইতে ইচ্ছা হইলেও তাঁহার খাইবার অধিকার নাই †। বিধবা স্ত্রীর পক্ষে ত এই ব্যবস্থা, এ দিকে মৃতপত্নীক পতির পক্ষে সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত। তিনি যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন, যত ইচ্ছা খাইতে পারেন, যেমন ইচ্ছা পরিতে পারেন, যেমন ইচ্ছা বিহার করিতে পারেন, কিছুতেই শাস্ত্রের আপত্তি নাই।

পুরুষ অষ্টাদশ বা একবিংশ বৎসর অতিক্রম করিলে সকল বিষয়েই স্বাধীন হইবেন; কিন্তু রমণীর স্বাধীনতা কোন কালেই নাই। তাঁহাকে কন্যাকালে পিতার, পরিণয়ের পর স্বামীর, স্বামীর অবর্ত্তমানে পুত্রের, পুত্রাভাবে পতিকুল বা পিতৃকুলের যে কোন অভিভাবকের শাসনাধীনে থাকিতে হইবে। ‡ পুরুষ সতত নির্ম্মুক্ত থাকিবেন, কিন্তু রমণীর বাহিরে যাইলেই চরিত্র কলঙ্কিত হইবে।

জগতের যাবতীয় উচ্চ পদে পুরুষের অধিকার, কিন্তু রমণীর অধিকার সামান্য পরিচারিকার কার্য্যে। দাসীবৃত্তি রমণীর গৌরবের জিনিস। গৃহকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারিলেই তিনি সকলের আদরণীয় হইবেন। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য-প্রণালী বহ্নিপুরাণে অতি সংক্ষেপে সুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। 'তিনি প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিয়া পতি দেবতাকে নমস্কার করিয়া গৃহতল ও প্রাঙ্গণদেশ গোময় বা জল দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া ও অন্যান্য গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্নান করিতে যাইবেন; স্নান করিয়া আসিয়া আবার তাঁহাকে পতির চরণে প্রণিপাত করিতে হইবে; তাহার পর অন্যান্য গৃহ-দেবতার পূজা সমাপন পূর্ব্বক অবশিষ্ট গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পতিকে ভোজন করাইতে হইবে; পতির আহারান্তে উপস্থিত অতিথি-দিগকে ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ উদরপূর্ত্তি করিতে হইবে।' * ইউরোপ বা আমেরিকায় সামান্য দাসের অবস্থাও ইহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। অধিক কি মহর্ষি ব্যাস নিজ-কৃত সংহিতায় স্ত্রীকে দাসী বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছে। ভার্য্যা

---

* গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ।

† তাম্বুলং বিধবাস্ত্রীণাং
যতিনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র গোমাংস-সদৃশং ধ্রুবম্।
ব্র, বৈ ২৭ অ।

‡ বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ
পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে
ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতা। মনু॥

*সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং স্বয়ম্।
প্রাঙ্গনে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা॥
গৃহকৃত্যঞ্চ কৃত্বাচ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিংনত্বা পূজয়েদ্ গৃহদেবতাম্॥
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বাহ্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথিং পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সুখং সতী॥

দাসীর ন্যায় সতত স্বামীর আদেশের অনুবর্ত্তন করিবেন। * দাম্পত্য জীবনের অতি কষ্টকর অঙ্গ যে সন্তান পরিপালন, পুরুষজাতির অপূর্ব্ব কৌশলে তাহা স্ত্রীর হস্তেই অর্পিত আছে। মনুও এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সন্তানের উৎপাদন ও পরিপালন—এ দুইই স্ত্রীর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। †

স্ত্রী যে শুদ্ধ স্বামীর দাসী ও সন্তানের ধাত্রী এরূপ নহে, তিনি শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনগণেরও পরিচারিকা। কণ্বমুনি পতিগৃহে গমনকালে শকুন্তলাকে যে সকল নৈতিক উপদেশ প্রদান করেন তাহার মধ্যে গুরুজনদিগকে সেবাকরিবে‡ এইটীই সর্ব্বপ্রধান। স্ত্রীর অধীনতা যে শুদ্ধ দেহেতেই পর্য্যবসিত হয় এরূপ নহে, তিনি মানসিক ও হৃদ্বৃত্তিবিষয়ক স্বাতন্ত্র্যেও বঞ্চিত। তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে বলিবে সে কার্য্য করিবার তাঁহার অধিকার নাই। স্বামীর যাহাতে অভিরুচি তাঁহাকে তাহাই করিতে হইবে। ‖ পৃথক্ যজ্ঞ, পৃথক্ ব্রত, বা পৃথক্ উপাসনা করিবার তাঁহার অধিকার নাই। * স্বামীর বাক্যানুরূপ কার্য্য করাই তাঁহার সনাতন ধর্ম্ম। †

যে শৃঙ্খল স্ত্রীর মত না লইয়া তাঁহার অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহার পায় পরাণ হইয়াছে সে শৃঙ্খল এ জীবনে আর ভাঙ্গিবার তাঁহার অধিকার নাই। সমাজ যে পতি তাঁহার স্কন্ধে চাপাইবেন, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ অযোগ্য ও সম্পূর্ণ অপ্রিয় হইলেও কায়মনোবাক্যে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইবে। সে পতির উপাসনায় তিনি স্বর্গে প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন। ‡

শাস্ত্রে কয়েকটী গুরুতর স্থলে স্ত্রীপক্ষে সে বন্ধন ছেদনের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর বর্ত্তমান সমাজে সে শৃঙ্খল সকল অবস্থাতেই অভেদ্য। উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুরুষ যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, শাস্ত্র ও সমাজ তাঁহার অনুমোদন না করুন্, তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইবেন না। কিন্তু অভাগিনী নারীর পক্ষে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি নারীর একবার পদস্খলন হয়, অমনি শাস্ত্র জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিবেন ব্যভিচারিণীকে নির্ব্বাসিত কর। ব্যভিচারিণীর কথা দূরে থাকুক অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীও তৎক্ষণাৎ পরিত্যজ্যা ও

---

*দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃসদা ভবেৎ॥

† উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহংলোকযাত্রায়াঃপ্রত্যক্ষংস্ত্রীনিবন্ধনম্॥

‡ শুশ্রূষস্ব গুরূন্। শকুন্তলা।

‖ যত্র যত্র রুচির্ভর্ত্তুস্তত্র প্রেমবতী সদা।
কাশীখণ্ড।

---

* নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো
ন ব্রতং নাপ্যুপাসনম্। বিষ্ণুসংহিতা।

† স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষঃ ধর্ম্ম সনাতনঃ।

‡ পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।
বি, সং।

নির্ব্বাস্যা। * সামাজিক শাসন শাস্ত্রীয় শাসন অপেক্ষা ন্যূন নহে।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বৎসরে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বৎসরে, কন্যামাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বৎসরে, কিন্তু অপ্রিয়-বাদিনী হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যজ্যা; † স্ত্রী সুরাপী চিররুগ্না ধূর্ত্তা অর্থনাশিনী ও পুরুষদ্বেষিণী হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। ‡ কিন্তু এই সকল পরিত্যক্তা রমণী কি উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন-স্পৃহা কিরূপে চরিতার্থ করিবেন শাস্ত্রে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থায় এক মাত্র বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা ভিন্ন তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই।

শাস্ত্রের শাসন অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান সমাজ শাসন কঠোরতর। শাস্ত্র বৈষম্য-দূষিত হইলেও স্থানে স্থানে স্ত্রী-জাতির প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছেন। কথায় কথায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যান্তর পরিগ্রহের অনুমতি করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব ও চিররুগ্ন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন।* শাস্ত্র যেমন এক দিকে স্বামীর মরণে বা অদর্শনে নারীকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ স্বামী বহুদিন নিরুদ্দেশ হইলে, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে, বা মরিলে স্ত্রীকেও অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। † কিন্তু আমাদের পৈশাচিক সমাজ কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দেন নাই। স্বামী একবার বিবাহ করিয়া গিয়া চিরকাল নিরুদ্দেশ থাকুন, স্ত্রীকে চিরকালই স্বামীর শয্যা রক্ষা করিতে হইবে। স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করুন, স্ত্রীকে হয় চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন *করিয়া থাকিতে হইবে; অথবা প্রবৃত্তি* ও ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে স্বামি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। স্বামী চির-রুগ্ন হউক,

---

* নির্ব্বাস্যাঃ ব্যভিচারিণ্যঃ
প্রতিকূলাস্তথৈবচ। যাজ্ঞবল্ক্য।

† বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥
মনু।

‡ মদ্যপাঽসত্যবৃত্তাচ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নীচ সর্ব্বদা॥
মনু।

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥
যাজ্ঞবল্ক্য।

* সতু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা
দাসো দীর্ঘাময়োঽপিবা।
উঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাবরণভূষণা॥
পরাশর ভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধু ধৃত
কাত্যায়ন-বচন।

† নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতেপতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
পরাশর-সংহিতা।

স্ত্রীকে আশৈশব স্বামীর সেই রুগ্ন শয্যায় বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইবে। স্বামী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হউন, তথাপি তাঁহার অব্যাহতি নাই। তাঁহাকে আজীবন অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমাজের তুষ্টিবিধান কবিতে হইবে। এরূপ কঠোর সমাজশাসন কখনই সম্পূর্ণ প্রতিপালিত হইতে পারে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তুমি যতই কেন কঠোর নিয়ম কর না, প্রকৃতি আপনাব হৃত স্বত্ব দখল করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। এই সংঘর্ষের পরিণাম ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, ও বেশ্যা সংখ্যার বৃদ্ধি।

শাস্ত্রে বিবাহ নানাপ্রকার ছিল। পুরুষজাতি যেমন আপনার মনোমত পত্নী বাছিয়া লইতে পারিতেন, স্ত্রীজাতিও এক পদ্ধতি অনুসারে সেইরূপ আপনার মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। শাস্ত্রের এই কারুণ্যবলেই পতিপরায়ণা শকুন্তলা ব্যভিচারিণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন নাই।

শাস্ত্রে নানাপ্রকার পুত্র স্বীকৃত হইত; এই জন্য ভ্রূণহত্যার আবশ্যকতা হইত না। বর্ত্তমান সমাজে প্রণয়-সঙ্গমের উত্তেজক কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। অথচ প্রণয়-সঙ্গমোৎপন্ন সন্ততি সমাজে গৃহীত হইবার ব্যবস্থা নাই। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই আমরা পঞ্চ পাণ্ডবের নাম শুনিতে পাই। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই আমরা বীরচূড়ামণি কর্ণের গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পাই। বর্ত্তমান সমাজের কঠোর শাসনে অসংখ্য রমণীকে হয় এই দুরপণেয় ভ্রূণহত্যাপাপে নিমগ্ন হইয়া সমাজের দাসীত্ব করিতে হইতেছে; অথবা দুর্নিবার মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। সেই ভ্রূণহত্যা ও সেই বেশ্যাবৃত্তির জন্য সমাজ দায়ী। কেন না সমাজ স্খলিতপদ রমণীর জন্য উপায়ান্তর রাখেন নাই। সমাজ যাহাদিগকে পাপীয়সী বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহারা কখন আপন ইচ্ছায় ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে বা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহে না।

স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতির অত্যাচারেব আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমরা পাঠকবৃন্দকে সেই তালিকা দ্বারা আর আক্রান্ত করিতে চাহি না।

আমরা যে কয়প্রকার বৈষম্যের উল্লেখ করিলাম ভারতের অস্থিচর্ম্ম সেই সকল বৈষম্যে জর্জ্জরিত। ইউরোপীয় সমাজেও এই কয়েকটী বৈষম্যের কোন কোনটী কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু এরূপ বিশ্বজনীন বিবিধ বৈষম্য আর কোন দেশেই দেখা যায় না। এত বিভিন্ন বর্ণ, এত বিভিন্ন ধর্ম্ম, এত বিভিন্ন জাতি, এত বিভিন্ন পরিচ্ছদ, এত বিভিন্ন ভাষা, এত বিভিন্ন শাসন,

এত স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য আর কোন দেশেই দেখা যায় না। এত বৈষম্য যে দেশে বর্ত্তমান সে দেশের একতা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই সকল বৈষম্য বিদূরিত না করিয়া যাঁহারা ভারতে রাজনৈতিক একতা সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। অগ্রে সামাজিক একতা, পরে রাজনৈতিক একতা। অগ্রে সমস্ত ভারতবাসী আপনাদিগকে এক সমাজ-ভুক্ত বলিয়া মনে করুন্, পরে রাজ-নৈতিক একতা আপনিই আসিবে, কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। গৃহে বিচ্ছেদ থাকিতে বাহিরে জয় কথন হয় নাই, কথন হইবেও না। যত দিন না ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুষলমান—এক প্রকাণ্ড ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইতেছে; যত দিন না হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধু হইতে প্রাচ্য সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত এক স্বরে ও এক ভাষায় পরস্পরের দুঃখ ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন,—যত দিন না ধনী নির্ধন ভেদ ভুলিয়া সমস্ত ভারতবাসী আপনাদিগের দাসত্বে মর্ম্মপীড়িত হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে-ছেন,—যত দিন না সমস্ত ভারতবাসী এক ধর্ম্মভাবে উদ্দীপিত হইতেছেন; যত দিন না স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য-জনিত সামাজিক কুরীতি এবং স্ত্রী জাতির অবরোধবন্ধন, অধীনতা ও অজ্ঞানরাশি ভারতগগণ হইতে বিদূরিত হইতেছে,—যত দিন না সমস্ত ভারতবাসী এক শাসনের অধীন হইয়া এক দাসত্ব-শৃঙ্খলের মর্ম্মন্তুদ আঘাতে এক সহানু-ভূতিসূত্রে গ্রথিত হইতেছেন,—যতদিন না একটী ভারতবাসীর কেশস্পর্শ করিলে ভারতবাসিমাত্রেরই শিরে বেদনা লাগি-তেছে,—যত দিন না একটী ভারতবাসীর হৃদয়ে আঘাত লাগিলে তাড়িত বেগে ভারতবাসিমাত্রেরই হৃদয়-তন্ত্রী ক্রন্দন-স্বরে বাজিয়া উঠিতেছে, যত দিন না আমরা জননী মাতৃভূমির অনুরোধে ইতিহাসের স্মৃতি মুছিয়া সহস্র সিরাজ কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যবন-দিগকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে শিখিতেছি,—যত দিন না আমরা বৌদ্ধ, জৈন, য়িহুদী, খ্রীষ্টান ভেদ ভুলিয়া এক জননীর সন্তান বলিয়া ভারত-বাসিমাত্রকেই প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে শিখিতেছি,—যত দিন না রাজা জমিদার ধনগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রজাসাধারণের সহিত মিশিতেছেন,—যত দিন না সুশিক্ষিত ভারতযুবক জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া অশিক্ষিত প্রজাসাধারণের সহিত মিলিয়া তাহা-দিগের নিদারুণ দুঃখবিমোচনের চেষ্টা করিতেছেন,—যত দিন না কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায় দেশাচাররূপী রাক্ষসের করাল গ্রাস হইতে নারীজাতির উদ্ধার সাধন করিতেছেন,—ততদিন ভারতের চিরস্থায়ী ও বিশ্বজনীন মঙ্গলের আশা নাই।

যাঁহারা এরূপ মূলস্পর্শী সংস্কার অসম্ভব বলিয়া মনে করেন তাঁহাদিগের সম্মুখে

আজ আমি তিনটী প্রকাণ্ড বিপ্লবের চিত্র ধারণ করিব। বলা বাহুল্য যে প্রথমটী **বৌদ্ধবিপ্লব**, দ্বিতীয়টী **শিখ-বিপ্লব**, ও তৃতীয়টী **বৈষ্ণব-বিপ্লব**। যে বৈষম্যবিষে ভারতদেহ জর্জ্জরিত রহিয়াছে, তাহার আমূল বিশোধন এই তিন বিপ্লবেরই লক্ষ্য ছিল। তিনটীই এই অভীষ্টসাধনে আশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিল। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনটীর একটীও অধিক দিন ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ রহিল না।

প্রথম বিপ্লবের অধিনেতা—ভারতের প্রথম সাম্যাবতার—কপিল বস্তু নগরের রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র অনন্তকীর্ত্তি শাক্যসিংহ। ইনি খৃষ্টীয় শকের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সমস্ত ভারত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রপীড়নে বিষণ্ন, ব্যস্ত ও শঙ্কিত হইল; যখন বিপ্রেতর বর্ণ দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ-প্রচারিত ধর্ম্মের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসাধ্য সাধন চেষ্টা, আর তাহার লঙ্ঘনেও তাঁহাদিগের পারত্রিক মুক্তির কোন আশা নাই; তখন তাঁহারা এ বিপদে তাঁহাদিগকে কে উদ্ধার করিবে এই ভাবনায় আকুল হইলেন। এমন সময় বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া দিগন্ত-প্রসারী রবে তাঁহাদিগকে বলিয়া উঠিলেন 'ভ্রাতৃগণ! ভয় নাই, আমি তোদিগকে এই ভীষণ বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিব। মৎপ্রচারিত ধর্ম্মের বীজমন্ত্র সাম্য। এই মন্ত্রবলে বর্ণবৈষম্য উঠিয়া যাইবে; ব্রাহ্মণ-শূদ্র পার্থক্য থাকিবে না। এই ধর্ম্মের সাধনায় পাপী তাপী, দীন দরিদ্র, রাজা প্রজা সকলেই মুক্তিলাভ করিবে। এ ধর্ম্মের মতে যাগযজ্ঞ মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা। তোমরা সকলে বৈষম্যদুষ্ট ব্রাহ্মণ্য উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, শান্তি পাইবে'। তিনি মুখে প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি অশেষগুণশালিনী, পরমরূপবতী যুবতী ভার্য্যা ও একমাত্র শিশু সন্তান এবং রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপীনধারী হইয়া আত্মত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্তে ভারত আলোড়িত হইল। ভারতের মৃতদেহে আবার জীবন সঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ-প্রপীড়িত বিপ্রেতর বর্ণ দলে দলে এই নব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ শূদ্রবর্ণের ইহা প্রধান আশ্রয়স্থল হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মোহিনী শক্তি বলে স্ত্রীজাতিও ঘোরতর অবনতি-গহ্বর হইতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিল। এই নব ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদিগের সমান অধিকার প্রদত্ত হইল। বেদিতে বসিয়া বৌদ্ধ প্রচারিকাগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। মঠধারী, শ্রাবক ও গৃহস্থ।

প্রথম শ্রেণী মঠে থাকিয়া উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষা দ্বারা কথঞ্চিৎ জঠরানল নিবারণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভের নিমিত্ত ধ্যান ধারণায় রত থাকিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণী সংসারী লোকদিগকে প্রকাশ্যস্থলে ধর্ম্মনীতি, নীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। অবশিষ্ট লোক সংসারী হইয়া বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। প্রথম দুই সম্মানের পদে স্ত্রীজাতির পুরুষজাতির সহিত সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমরা বৌদ্ধ মঠধারী ও বৌদ্ধ মঠধারিণী, এবং বৌদ্ধ শ্রমণ ও বৌদ্ধ শ্রমণা যুগবৎ শুনিতে পাই। এইরূপ ঐ সকল উচ্চ পদে শূদ্রদিগেরও অন্যান্য উচ্চবর্ণের সহিত সমান অধিকার ছিল। অধিক কি বুদ্ধদেব তাঁহার অসংখ্য শিষ্যবর্গের মধ্যে শূদ্র উপালিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভাল বাসিতেন। বিপ্রেতর বর্ণের ও স্ত্রীজাতির এই উন্নতিতে ভারত অপুর্ব্ব জীবনী শক্তি প্রাপ্ত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকাল ভারতের গৌরবের অদ্বিতীয় যুগ। যে সহস্র বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিল, সেই সহস্র বৎসরই ভারতের প্রকৃত গৌরবের সময়। যদি ভারত কখন এক শাসনের অধীন হইয়া থাকে ত সে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগধরাজ অশোকের সময়। অশোকের সময়ই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। যদি, ভারতের কীর্ত্তিস্তম্ভ কখন সুদূর প্রাচ্যে, সুদূর প্রতীচ্যে, সুদূর উদীচ্যে, সুদূর দক্ষিণে নিখাত হইয়া থাকে, ত সে বৌদ্ধ অশোকের সময়ে। চীন, সিংহল, মিসর আফ্গানিস্থান—অদ্যাপিও বৌদ্ধ নরপতি অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ বক্ষে ধারণ করিতেছে! ভারতীয় নরপতিবৃন্দ যদি কখন বৈদেশিক নরপতিবৃন্দের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকেন, ত তাহা এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালেই। প্রবল-পরাক্রমশালী আন্তিয়োকস্, টলেমি, আন্তিগোনাস প্রভৃতি যবন নরপতিগণ মগধের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শূদ্র রাজবৃন্দের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে শ্লাঘ্য মনে করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য, অশোক, মহেন্দ্র প্রভৃতি নরপতিবৃন্দের যশোরাশি, ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া নানাদেশ ধবলিত করিয়াছে। যদি কখন ভারত হইতে ধর্ম্মপ্রচারকগণ নানাদেশ গমনপূর্ব্বক নানাজাতিকে ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন, তবে সে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে। চীন তিব্বত, মোঙ্গলিয়া জাপান, শ্যাম সিংহল, অধিক কি সুদূর সাইবীরিয়া ও লাপলাণ্ড পর্য্যন্তও—ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারক দিগের মোহিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া অদ্যাপিও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বুদ্ধপ্রচারিত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যে ভারতে সেই ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাব সে ভারতে

সে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বহুদিন বিলুপ্ত হই-য়াছে। সে দীপালোক বিনা আজ ভারত অন্ধকার! সে দীপালোক নিভা-ইয়া বৈষম্য-পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আবার সমস্ত ভারত তমাসচ্ছন্ন করিয়াছে। আবার বিপ্রেতর বর্ণ ও স্ত্রীজাতি কঠিন দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রতিক্রিয়ায় সেই শৃঙ্খল এখন কঠিনতর হইয়াছে! ভারতের উন্নতি-স্রোতে এখন প্রবলতর ভাঁটা পড়িয়াছে!

খ্রীষ্টদেব ছয় শত বৎসর পরে যে অমূল্য সাম্যনীতি প্রচার করিয়া রোম সাম্রাজ্যের দাসত্ব-প্রপীড়িত ইউরোপে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব সেই সাম্যনীতি প্রচার করিয়া ভারতের সমীকরণ করিয়াছিলেন। আজ ভারতে সে সাম্যনীতি প্রচারিত থাকিলে ভারত আজ ইউরোপের সমকক্ষ হইতে পারিত। কিন্তু কি পাপে ভারত আজ সেই অমূল্য ধনে বঞ্চিত? কোন্ পাপে বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বৈদেশিক খ্রীষ্টানের নিকট নীতি শিক্ষা করিতে হয়? বুদ্ধধর্ম্মে মিলে না, এমন কোন্ নীতি খৃষ্টধর্ম্মে বিদ্যমান? আজ ভারতীয় যুবককে কমতের নিকট পজেটিব ধর্ম্ম শিখিতে যাইতে হইবে কেন? পজেটিব ধর্ম্মের মূল সূত্র বৌদ্ধধর্ম্মেও নিহিত আছে। তবে এ অমূল্য ধর্ম্মের ভারতে কেন বিলয় হইল? এ গুরুতর বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা যাউক।

কমতের ন্যায় বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব লইয়া কোন তর্ক তুলেন নাই বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে জগতের কোন চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই। সাংখ্যের ন্যায় বুদ্ধের মতেও প্রকৃতি স্বয়ংসৃষ্ট। বুদ্ধ যে পরলোক স্বীকার করিয়াছেন তাহার নাম জন্মান্তর। সেই পুনর্জ্জন্মরূপ পরলোকের উচ্ছেদসাধন করারই নাম মুক্তি। সেই মুক্তিলাভ করাই বৌদ্ধ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা একপ্রকার নিরীশ্বর ও পরলোকবিদ্বেষী। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম্ম পৃথিবীর লোক-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের শান্তি নিকেতন। এইরূপ বিশ্বজনীন অস্তিত্ব সত্ত্বেও কে বলিবেন যে বৌদ্ধ ধর্ম্মে ঈশ্বর ও পরলোক নাই বলিয়াই ইহা ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইল না? সুতরাং ইহার ধ্বংসের কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

বিদায়।

"শুধু চিত্ত ভেঙ্গে গেল, শুধু প্রাণ দগ্ধ হ'ল,
আশার একটী কক্ষ হল না পূরণ।"

* * * * * *

"জ্বলন্ত চিতায় যবে, এই দেহ দগ্ধ হবে,
বিদারিয়া বক্ষঃস্থল কর দরশন।
অবাধ্য চিত্তের সহ, যুদ্ধ করি অহরহ,
কত অস্ত্রাঘাত তাহে হয়েছে পতন,
কত সহেছি বেদন।"

১

এত দিনে হৃদয়ের অশান্ত সাগরে
যে অনন্ত বীচিলালা করিত গর্জ্জন
কাঁপাইয়া প্রকৃতিরে—হতাশ অন্তরে;
সহসা সে রুদ্র মূর্ত্তি প্রশান্ত কেমন!

২

একটী তারকা আহা অনন্ত আকাশে
হয়েছিল অভাগার দিক্-দরশন;
কিন্তু রে সে তারাটীও তিমিরের গ্রাসে
সহসা পড়িল হায় আঁধারি গগন।

৩

একাকী তরণী'পরি অভাগা নাবিক—
নিরুপায়—ভেসেছিনু তরঙ্গের দোলে;
সে তিমির ভেদ করি বিদ্যুৎ ক্ষণিক
খেলিল কেমন ওই জলধর-কোলে!

৪

আরও অন্ধকারাবৃত হইল প্রকৃতি—
পড়িল অমনি বজ্র ভয়ঙ্কর নাদে—
কেন না এ দৃশ্যে বল, উপজিবে ভীতি
অসহায় নর মনে—পূরিত বিষাদে?

৫

স্বভাবের মত্ত ভাব দেখিয়া তখনি
জীবনের আশে মোর দিনু বিসর্জ্জন।
ভাবিনু অগাধজলে এ ক্ষুদ্র তরণী
দেখিতে দেখিতে মোর হবে নিমগন।

৬

কিন্তু সেই বারিরাশি সুস্থির হইল;—
যদিও সে ধ্রুবতারা ডুবেছে আমার,
তথাপি নিরাশ মনে আশা সঞ্চারিল—
হয় ত পারিব যেতে জলধির পার।

৭

একবার হৃদয়ের বিষাদের গান
শুনাইব উচ্চৈঃস্বরে জগতে ডাকিয়া,
সে সঙ্গীতে একবার কাঁদিবে পরাণ,
পড়িবে শোকের অশ্রু উরস বহিয়া।

৮

একটী নক্ষত্র আহা শ্যাম জলধরে
উজ্জ্বলিত, প্রকাশিত সুন্দর যেমন—
একটী গোলাপ আহা পত্রের ভিতরে—
অর্দ্ধ-লুক্কায়িত—বথা নয়নরঞ্জন—

৯

বিস্তৃত সরসীমাঝে একই নলিনী
গরবে সুহাস হাসি বিরাজে যেমন—
ছিল রে তেমনি মম হৃদি-সোহাগিনী
বাঞ্ছা এক অপরূপ স্বর্গীয় কেমন।

১০

সে বাঞ্ছার পবিত্রতা বুঝিবে ক জন?
তাহার মহত্ত্ব বল বর্ণিব কেমনে?
বুঝে নাই কেহ—আর বুঝাতে কখন
পারিব না—সে সময় গত এ জীবনে।

১১

জীবনের দুঃখময় আঁধার গগনে
সে তারাটী কি আভা যে দিত রে ঢালিয়া,
সে কুসুম-বাসে আহা সংসার-কাননে,
কত সুখে উছলিত অভাগার হিয়া!

১২

সে নলিনী বুকে ধরি হৃদি-সরোবর
থাকিত রে চিরদিন কি শোভা শোভিত!
কোথা রে সে সব শোভা? কেন রে অন্তর
তার লাগি দিবানিশি এত লালায়িত?

১৩

না না না—উন্মত্ত মন হওনা অধীর—
গিয়াছে, যা, সে কথায় কিবা প্রয়োজন?
কেন রে নয়ন তবু বরষিস্ নীর?
হায় রে মানব-মন দুর্দ্দম এমন!

১৪

আশৈশব দেখিয়াছি যে সব দর্শনে
চলিলাম আজি আমি ছাড়ি সে সকল;
প্রিয়জন-অনুরোধ যে কঠিন মনে
গলা'তে নারিল, গ্রুবে নয়নের জল

১৫

পারে কি কখন বল, গলা'তে তাহারে?
কাজ নাই হৃদি মোর হউক কঠিন।
ছিল ত কোমল মন—তখন সংসারে
সহিয়াছি; সহিতেছি, সব চিরদিন।

১৬

সেই কোমলতা তরে—তবে কেন আর?
হৃদয় কঠিন হ'ক—শিলাবদ্ধ মন।
কামনা পূরণ করি ফিরিতে আবার
পারি যদি, কোমলতা চাহিব তখন।

১৭

কোথায় জনক মোর—স্নেহের আধার,
অভাগার এ সময়ে রহিলে কোথায়?
উদ্দেশে চরণে তব করি নমস্কার,
* * * চলিল আজি ছাড়িয়া তোমায়।

১৮

জানি দেব ও হৃদয়ে আমার কারণে
কি অনন্ত স্নেহ সদা আছে গো সঞ্চিত!
জানি গো ইহাও পিতঃ! মম অদর্শনে
সে ভাণ্ডার কখন না কমিবে নিশ্চিত।

১৯

জনমিনু শুধু, পিতঃ! কাঁদাতে তোমারে,
অশেষ যাতনা পেলে আমার কারণ;
মনে মনে কিন্তু চির-ভক্তি-পুষ্পহারে
সদাই পূজিব তব পবিত্র চরণ।

২০

অভাগার স্নেহময়ী জননী কোথায়?
একবার এ সময়ে দেও দরশন—
আহা হা! অস্থির মন পাগলের প্রায়,
কোথায় জননী তোর, কে করে সান্ত্বন?

২১

সযতনে যে লতাটী মানস-উদ্যানে
রোপেছিনু, স্নেহনীর সিঞ্চিয়া, জননি!
যার মূলে, ছিনু সদা ব্যাকুল পরাণে
দেখিতে যে লতাটীরে ফুল-সুশোভিনী—

২২

মলয়-হিল্লোলে লতা দুলিয়া দুলিয়া
ভেবেছিনু কত শোভা বিকাশ করিবে!
লতিকার কুসুমের সৌরভ পাইয়া
ভেবেছিনু মন তব কতই হাসিবে!

২৩

প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে সেই লতা আজি
শুকাইছে, হয় ত গো বাঁচিবে না আর;
হাসিছে কতই লতা ফুলদলে সাজি—
এ লতাটী বৃক্ষচ্যুতা পতিতা আমার।

২৪

হায় রে নিদয় বিধি কি বাদ সাধিলি!
অকস্মাৎ ভীম বজ্র হইল পতন—
কি দোষে রে অবিচারে আমায় মারিলি
হৃদি, মন, স্নেহ, আশা, করি উৎপাটন!

২৫

সকলি ত্যজিয়া আজি বহুদূর দেশে
চলিনু একাকী আমি—বিদায় লইয়া
সবারি সকাশে; কিন্তু কি হইবে শেষে
ভাবিলে হৃদয় মোর উঠে যে কাঁপিয়া!

২৬

হয় ত জলধিবক্ষে—প্রশান্ত—অতল—
চিরদিন মত্ত আমি করিব শয়ন—
ভাবিলে এ কথা মন হয় রে চঞ্চল—
দেখিতে পাবনা আর প্রিয় পরিজন!

২৭

ঘোর কুজ্ঝটিকা হিম যথায় নিয়ত—
অনন্ত তুষার যথা চির বর্ত্তমান—
অন্নাভাবে দীনজন যথায় সতত
অসহায়—অযতনে—তেয়াগিছে প্রাণ,

২৮

হায় রে সে দূরদেশে—অসহায় পুরে—
হয় ত বিপদে পড়ি অস্থির হইয়া
চাহিব সহায় কারো কাঁদি ঘুরে ঘুরে,
দেখিবে না কেহ মোরে বারেকো চাহিয়া।

২৯

হয় ত মরিব তথা;—প্রিয়জনগণে
স্মরিয়া, কাঁদিব কত মরণ সময়ে;
দেখিতে তাদের আর পাবনা নয়নে।
যাইবার কালে মাতঃ কহি সবিনয়ে

৩০

অভাগার এ প্রার্থনা কর গো পূরণ,—
হতভাগা—প্রাণশূন্য—অবোধ পাগল
ভাবি অপরাধ মাতঃ করিও মার্জ্জন।
কে বুঝিবে কেন প্রাণ হয়েছে বিকল?

৩১

আর এক ভিক্ষা মাতঃ—বঙ্গের রমণী
দুঃখিনী অবলা তারে ক'র গো সান্ত্বন;
কে না জানে বঙ্গনারী প্রেমকাঙ্গালিনী?
স্বামীই তাহার আহা এক মাত্র ধন।

৩২

সে ধনে বঞ্চিত হ'য়ে দুঃখিনী আমার
এ দীর্ঘ সময় হায় কেমনে যাপিবে?
নয়নের জল মাতঃ মুছিও তাহার,
সান্ত্বনা করিও যবে অধীরা হইবে।

৩৩

মাতৃহীনা—স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা রমণী
রহিল তোমার কাছে দেখিও তাহারে—
আমার জননী তুমি তাহারও জননী—
দিও স্থান তারে, তব, স্নেহের আগারে।

৩৪

যেমন অশান্ত মনে কাঁদিতে কাঁদিতে
বিদায় লইয়া আজি চলিনু জননি!
তব আশীর্ব্বাদে মাতঃ হাসিতে হাসিতে
বসি যেন পদতলে—প্রশান্ত তেমনি।

৩৫

অপরাধ ক্ষমা কর অভাগা বলিয়া—
এই শেষ ভিক্ষা যাচি সবারি সকাশে,
ভুলি যাও দোষরাশি; স্বদেশ ত্যজিয়া
বহু দুঃখে চলিলাম দুঃখ-শান্তি-আশে।

৩৬

ফেলিয়া তোমারে মম হৃদি-কাঙ্গালিনি!
চলিলাম দূর দেশে তোমায় ছাড়িয়া—
বঙ্গনারী-হৃদে জ্বলে চন্দ্রালোক জিনি
যেই মণি, দেখ যেন না যায় নিভিয়া।

৩৭

তোমারে সঙ্গিনী করি সংসার-কাননে
ভ্রমিতে হইবে সখি! চিরদিন মত।
কাঁদিতে কাঁদিতে আজি চলিনু ললনে!
এসেও কাঁদিতে যেন না হয় নিয়ত।

৩৮

স্মরিলে তোমার কথা উঠে উথলিয়া
হৃদয়, নয়ন হয় অশ্রুপূর্ণ মরি;
এখনি যে প্রিয়তমে যাইব চলিয়া,
সুখে থেক—ধর্ম্মে থেক—আশীর্ব্বাদ করি।

৩৯

পিতামাতা রহিলেন মনের যাতনে,
তাঁদের অবশ কভু হ'ও না রমণি!
সুখ-চন্দ্র উদিবে না জীবন-গগনে—
"বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"

৪০

হৃদয় কঠিন কর—মুছহ নয়ন,
কিছুক্ষণ পরে মোরে দেখিতে পাবে না;
পাষাণে হৃদয় দেখ করেছি বন্ধন,
এ মন স্নেহকে আজি আশ্রয় দিবে না।

৪১

এত দিন সুখ-চন্দ্র অন্ধকারে, ঘোর,
গুপ্ত ছিল; আজি আহা হল প্রকাশিত—
ভেবেছিনু এ দুঃখের নাই বুঝি ওর!
এ চন্দ্রের হেন জ্যোতিঃ আগে কে জানিত?

৪২

এ চন্দ্র-আলোকে পথ দেখিতে দেখিতে
চলিলাম বহুদূরে—জানিতেছি মনে
এ চন্দ্রে সামান্য মেঘে নারিবে ঢাকিতে,
কৌমুদী ঢালিবে চন্দ্র অম্লান বদনে।

৪৩

ধন্য বিধি, এ চন্দ্রে যে করিল সৃজন,
অভাগার অমানিশি নাশিতে অচিরে,—
সুধাপূর্ণ যেন ইহা থাকে অনুক্ষণ,
পাপ-রাহু যেন নাহি পর্শে এ শশিরে।

৪৪

একটী বাসনা মোর হইল সফল
এতদিনে; কত লোকে এ বাসনা তরে
কহিয়াছে কত মোরে ভাবিয়া পাগল—
কাহারো মনের ভাব বুঝে না অপরে।

৪৫

চঞ্চল দেখিয়া মোরে সকলে কহিত
আমা দিয়া পৃথিবীর কোন উপকার
এ জনমে কভু নাহি হবে সম্পাদিত;
হাসিত সবাই মোরে—হাসিত সংসার।

৪৬

সেই চঞ্চলতা যেই ঝটিকা হইতে
সম্ভাবিত—কয় জন মানব-মাঝারে
চকিত না হয়ে বল স্থির দাঁড়াইতে
সে ঝটিকা-বেগে, বল, কয় জন পারে?

৪৭

দেখাব সকলে হৃদে আছে কত বল,
জগতের কোন হিত করিতে সাধন
রয়েছি জীবিত আজো—কিবা অমঙ্গল
করিবে, দেখিয়া মোরে, দূরে পলায়ন।

৪৮

দেখাব তখন মনে আছে কত বল,
অবাক্ হইয়া সবে পূজিবে এ মনে;
দেখাব তখন হৃদে ছিল কি সম্বল;
না ক'মে, বেড়েছে কত সংসারের রণে।

৪৯

বুঝাব তখন লোকে, উন্মত্ত হৃদয়
ভাবিয়া যে মনে তারা হেলিত তখন;
সে মনমাঝারে কিবা সৌন্দর্য্য উদয়—
সে সৌন্দর্য্য কতদূর লোক-বিমোহন।

৫০

চলিলাম আজি আমি কাঁদিতে কাঁদিতে
এ রোদন প্রতিশোধ অন্তর তুলিবে;
প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা জ্বলিছে হৃদিতে,
দহিবে হৃদয়ে আর না হয় নিভিবে।

৫১

যতই যাতনা কেন প্রতিজ্ঞা পালন
করিতে, ভুগিতে হ'ক, সব সে সকল।
অবাক্ হইয়া লোক দেখিবে তখন—
অসাধ্য সাধন করে হৃদয়ের বল।

৫২

আর যদি অভাগার দৈব বিড়ম্বনে—
চির-ভাগ্যহীন আমি—না পারি পালিতে
এ প্রতিজ্ঞা—ছিঁড়ি হৃদি জলধি জীবনে
ফেলিব—সে অক্ষমতা নারিব সহিতে।

৫৩

দৈবশক্তি, আজি মোরে কর বলবান্,
দুর্জ্জয় উৎসাহে মনে কর উৎসাহিত,
তেজঃ-তীব্র-মদিরায় উন্মত্ত পরাণ
কর দেবি—আশা যেন পূরে গো নিশ্চিত।

৫৪

জনক জননী দোঁহে কাঁদায়ে যেমন
যাইতেছি, মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া
পারি যেন পুনঃ সুখী করিতে তেমন,
এ ক্ষমতা দাও দেবি দাসেরে চাহিয়া।

৫৫

বহু আশে যাইতেছি বহু দূর দেশে,
আসিয়া সমাজ পানে ফিরিয়া চাহিব;
হয় ত দারুণ দুঃখ ভুঞ্জিব অশেষ,
নয় ত অনন্ত দুঃখ বিনাশ করিব।* *

* কোন বঙ্গীয় যুবক ইংলণ্ড গমন উদ্দেশে কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এই কবিতাটী রচনা করিয়া যান।

আস্তিকতা।

ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া মনুষ্যের উন্নতি না অবনতি হইবার সম্ভাবনা? আস্তিকতা জগতের মঙ্গল না অমঙ্গলকর?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি পাঠকবর্গকে জানাইতে ইচ্ছা করি যে আমি আস্তিক নহি—অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন কি না এতদ্বিষয়ে আমার অদ্যাপি সন্দেহ দূর হয় নাই। ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার পক্ষে তাঁহার অস্তিত্বে ও নাস্তিত্বে কোন প্রভেদ নাই, কারণ আমি অদ্যাপি তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমন কোন প্রমাণ পাই নাই যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পাবে। সুতরাং আমি নাস্তিক নহি বটে, কিন্তু আস্তিকও নহি।

যদি এই পরিদৃশ্যমান জগতের কেহ স্রষ্টা থাকেন এবং সেই স্রষ্টা যদি সর্ব্বমঙ্গলময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হন, তাহা হইলে আস্তিকতা অবশ্যই শুভকর। কিন্তু যদি জগতের কেহ স্রষ্টা না থাকেন, অথবা ঈশ্বর শব্দে আমরা যে সমুদায় গুণ বুঝি, সেই সকল গুণ সেই পরিমাণে যদি এই স্রষ্টাতে না থাকে—অর্থাৎ যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনাত্মক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আস্তিকতাকে জগতের শুভকর না অশুভকর বলিব?—আমার বিবেচনায় ঈশ্বরে বিশ্বাস জগতের উন্নতির এক বিশেষ কারণ।

এই স্থলে কোন ধর্ম্ম-বিদ্বেষী পাঠক হয় ত সাশ্চর্য্যে বলিবেন—'কি, ধর্ম্মে পৃথিবীর উপকার হইল! যে ধর্ম্মের নামে মনুষ্য মনুষ্যকে পশুর মত হত্যা করিল, যে ধর্ম্মের নামে মনুষ্য মনুষ্যকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিল, সেই ধর্ম্মের দ্বারা পৃথিবীর অবনতি ও অমঙ্গল না হইয়া উন্নতি ও মঙ্গল হইল?' আমি স্বীকার করিতেছি যে ধর্ম্মের নামে জগতে বহু বার বহু অমঙ্গল ঘটিয়াছে, বহুবার পৃথিবী শোণিতপ্রবাহে প্লাবিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের নামে মনুষ্য যাহা ইচ্ছা করিয়াছে বলিয়া কি ধর্ম্ম তাহার জন্য দায়ী হইবে? আমার নাম করিয়া যদি কেহ কোন ঘৃণিত কর্ম্ম করে, আমি কি তাহার জন্য দণ্ডার্হ হইব? অপরের কুকর্ম্মের জন্য যদি আমি দণ্ডার্হ না হই, তবে ধর্ম্ম তাহার জন্য কোনক্রমেই অপরাধী হইতে পারে না। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা অগ্রে স্থির কর, তাহার পর ইচ্ছা হয় ধর্ম্মকে অপরাধী করিও। পৃথিবীতে শান্তি বিস্তার করা, এবং মনুষ্যের হৃদয়কে পাপশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করতঃ ক্রমশঃ ঈশ্বরাভিমুখে আকৃষ্ট করিয়া পরকালে সুখভাগী করা এই মাত্র ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। যাঁহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পৃথিবীকে জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে এই

কথা স্বীকার করিবেন। যদি পুনরায় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর—'তবে তোমরা ধর্ম্মের নামে এত অত্যাচার করিলে কেন?' তাঁহারা উত্তর করিবেন—'আমরা যে সকল নরাধমদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি তাহারা নাস্তিক অথবা সত্য-ধর্ম্ম-দ্বেষী; তাহাদের হৃদয় পাপ পূর্ণ, সুতরাং তাহারা পরলোক নষ্ট করিয়া ইহলোকের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছিল। তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আমরা জগতের মঙ্গল সাধন করিয়াছি।' তাঁহাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্য—পরিণামে পৃথিবীতে সত্যের, সুতরাং শান্তির আবির্ভাব। অতএব যাঁহারা ধর্ম্মের পতাকা লইয়া সমাজ হইতে শান্তিকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতেও ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য শান্তির বিস্তার। তবে ধর্ম্মকে দোষী করিব কেন? কি কারণে ধর্ম্মের নিন্দা করিব? মনুষ্য-অন্তরে স্বভাব কর্ত্তৃক স্বাধীনতা বীজ রোপিত হইয়াছে, কিন্তু এই স্বাধীনতা হইতে মনুষ্যের দুষ্ট প্রবৃত্তি বশতঃ কত বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। সে দোষ কি স্বাধীনতার? মনুষ্যের নির্ম্মাতা যদি কেহ থাকেন ইচ্ছা হয় তাঁহার নিন্দা কর। যিনি* অমৃত-ভাণ্ডে গরল মিশ্রিত করিয়াছেন, হইতে পারে তিনি নির্ম্মাণ-কুশল অথবা মঙ্গলময় নহেন; দোষ দিতে হয় তাঁহার দোষ দেও।

কিন্তু এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যদি অমৃতের সহিত গরল মিশ্রিত হইল তবে সে অমৃতে আর প্রয়োজন কি? সে অমৃত-ভাণ্ড বিনষ্ট করা কি বিধেয় নহে? আমি এই তর্কের যাথার্থ্য স্বীকার করিলাম। যদি অমৃত তাহার স্বাভাবিক গুণ হারাইয়া বিপরীত গুণ ধারণ করে, তাহা হইলে সে অমৃতে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গলের কোন আশা নাই। সুতরাং তাহাকে নষ্ট করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। কিন্তু নষ্ট করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করা উচিত। যখন তুমি সেই গরল-মিশ্রিত অমৃত-ভাণ্ডকে বিনষ্ট করিতে চাহ, তখন তোমার একটু ভাবিয়া দেখা উচিত যে নষ্ট করিবার অপেক্ষা অন্য কোন সদুপায় আছে কি না; গরল-দূষিত অমৃতকে পুনরায় তাহার স্বাভাবিক অমৃতত্ব প্রদান করিতে পারা যায় কি না। যদি পারা যায়, তাহা হইলে যাহাতে তাহা সাধ্য হইতে পারে সেই চেষ্টা পাওয়াই তোমার উচিত। আমি পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছি যে ধর্ম্মের নামে জগতে বহু অত্যাচার, বহু অমঙ্গল ঘটিয়াছে। সেই সকল অত্যাচার ও অমঙ্গলের সহিত পৃথিবীর কি পরিমাণে মঙ্গল সাধন হইয়াছে তাহা এক্ষণে বলিবার প্রয়োজন নাই। তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম যে ধর্ম্মের দ্বারা জগতের কোন মঙ্গল হয় নাই;

* যদি ঈশ্বর না থাকিলেন তবে ধর্ম্ম কি?—সত্য বটে, কিন্তু আমি ধর্ম্মকে সামাজিক বন্ধনমাত্র বিবেচনা করি।

বরং অবিচ্ছিন্ন অমঙ্গল ও অপকারে মনুষ্য সমাজ দগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার বিশ্বাস এই যে সমাজ হইতে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ধর্ম্ম হইতে যে সকল অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তৎসমুদায় নিবারণ করিয়া, ধর্ম্ম যে সকল শুভ ফল প্রদানক্ষম সেই সেই শুভ ফলের দ্বারা যাহাতে সমাজ চরিতার্থ হইতে পারে, অর্থাৎ ধর্ম্মের যে যথার্থ উদ্দেশ্য তাহা যাহাতে সাধিত হইতে পারে, সেই বিষয়ে সকলেরই যত্নশীল হওয়া বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পৃথিবীতে শান্তি বিস্তার করা ও মনুষ্য হৃদয়কে পাপমুক্ত করিয়া ক্রমশঃ উন্নত করা ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই এই উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিবেন। সুতরাং ধর্ম্ম যদি এই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয় তাহা হইলে ইহা যে সমাজের মহা হিতকর তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের সহিত যে গরল মিশ্রিত আছে যদি ধর্ম্মকে সেই গরল-বিমুক্ত করিতে পারা যায় তাহা হইলে অবশ্যই পৃথিবীতে অমৃতের ফল ফলিবে। কিন্তু এক্ষণে দেখা উচিত যে এই অমৃতকে গরল-বিমুক্ত করা সম্ভব কি না, এবং কিরূপেই বা তাহা সাধ্য হইতে পারে।

যাবতীয় ধর্ম্ম তিনটী মহাদোষে কলঙ্কিত—কুসংস্কার, চিন্তার স্বাধীনতা অপহরণ, ও অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ এবং অত্যাচার। ধর্ম্মের দ্বারা যত কিছু অমঙ্গল ঘটিয়াছে সমস্তই এই তিন কারণ-সমুদ্ভূত। যে ধর্ম্ম যত অল্প পরিমাণে কুসংস্কারযুক্ত, যত অল্প পরিমাণে চিন্তার স্বাধীনতা লোপকরে, এবং যত অল্প পরিমাণে অন্য ধর্ম্মকে বিদ্বেষ-চক্ষুতে দেখে, সে ধর্ম্ম ততই জগতের শুভকর—ততই প্রশংসনীয়। কোন না কোন কালে ধর্ম্মমাত্রই এই তিন কারণে কলঙ্কিত ছিল, এবং বোধ হয় অদ্যাপি কোন ধর্ম্মই এ বিষয়ে একেবারে নির্দ্দোষী নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মের সহিত ইহাদের যে কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে এমন নহে; এবং চিরকালই যে ধর্ম্মমাত্রই এই তিন কলঙ্ক-চিহ্ন ধারণ করিবে তাহাও নহে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয়ে অনেক আশার সঞ্চার হয়—ভবিষ্যতের উপর অনেকটা ভরসা করিতে সাহস হয়। প্রটেস্‌টাণ্ট্ খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই কথা সপ্রমাণ করিতেছে। অবশ্য এস্থলে আমি প্রটেস্‌টাণ্ট ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলিতেছি। পুরাকালের প্রটেস্‌টাণ্টগণ অপর ধর্ম্মের অত্যাচার ও বিদ্বেষে নিতান্ত নিরপরাধী ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সে ভাব আর নাই। উনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার প্রভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম এক নূতন মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। অন্ধকারময়

বঙ্গ ভূমিতে হঠাৎ এমন পূর্ণ চন্দ্রোদয় হইবে ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। ঈশ্বর আছেন কি না তাহা আমি জানি না বটে, কিন্তু যতবার আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিয়াছি ততই আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে—ততই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ভবিষ্যতে মনুষ্য-সমাজের নূতন উন্নতির এক অভূতপূর্ব্ব ভিত্তি নির্ম্মাণ হইয়াছে। হইতে পারে আমার এই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক ও কল্পনাপ্রসূত; কিন্তু এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা অদ্ভুত। সুতরাং যে দুই ধর্ম্মের উল্লেখ করিলাম ইহাদের অবস্থা দর্শনে মনে এরূপ সাহস হয় যে এক্ষণে ধর্ম্ম যে সকল কলঙ্কে কলঙ্কিত রহিয়াছে, সময়ক্রমে তাহা তিরোহিত হইবে এবং ধর্ম্মের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইবে। কিরূপে ইহা সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের মানসিক উন্নতি এই শুভ ফলের একমাত্র উপায়।

আমি বলিয়াছি যে লোকের মানসিক উন্নতি ধর্ম্মের উন্নতির এক মাত্র উপায়। সমাজ যে পরিমাণে উন্নত হইবে ধর্ম্মও সেই পরিমাণে বিশুদ্ধ হইবে। ইহার অধিক নহে অল্পও নহে। সমাজ যখন উৎকর্ষের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে যখন নৈতিক শাসন একমাত্র অলঙ্ঘ্য শাসন হইবে, তখন ধর্ম্মও বিশুদ্ধির চরমাবস্থাতে পদার্পণ করিবে। কিন্তু সমাজের এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন থাকিবে না—তখন ধর্ম্ম না থাকিলেও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। পৃথিবীর এরূপ অবস্থা যে নিতান্ত কাল্পনিক তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কালক্রমে এরূপ হইলেও হইতে পারে। তর্ক-স্থলে আমি স্বীকার করিব যে এরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এক্ষণে-এক মহা গোল উপস্থিত হইল। ধর্ম্ম যখন বিশুদ্ধ হইবে তখন ধর্ম্মের প্রয়োজন থাকিবে না; ধর্ম্মের যখন প্রয়োজন, তখন ধর্ম্ম বিশুদ্ধ নহে। ইহার ঔষধ কি? নিম্নে আমি এতৎসম্বন্ধে যথা-সাধ্য কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা পাইব।

সমাজ যত উন্নত হইতে থাকে ততই তাহার ভবিষৎ উন্নতির জন্য নূতন নূতন অভাব আবিষ্কৃত হয়। প্রথম অবস্থায় যেরূপ শাসনে তাহার উন্নতি সাধন হইয়াছিল, কিঞ্চিৎ উন্নতাবস্থায় তাহাতে তাহার মঙ্গল না হইয়া বিশেষ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। পুনশ্চ, উন্নতাবস্থায় যদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধন হয়, প্রথমাবস্থায় তাহা অবনতির কারণ, অথবা উন্নতিরোধক হইয়া উঠে। * ইংলণ্ডের অধিবাসীরা এক্ষণে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে, জুলুজাতির পক্ষে

* Mill, Rep. Govt.

সেরূপ স্বাধীনতা বিষবৃক্ষ স্বরূপ হইবে। যখন কোন সমাজ ঘোর-অসভ্যতা-কূপে মগ্ন থাকে,তখন ইংলণ্ডের অষ্টম হেনৃরির ন্যায় নরপতি তাহার উপযুক্ত শাসন-কর্ত্তা,—তুর্কির, অথবা তদপেক্ষা কঠোর-তর, শাসন-প্রণালী তাহার ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্ম-শাসনও রাজ-শাসনের ন্যায় অত্যন্ত কঠোর হওয়া আবশ্যক। যে জন-সমাজে মনুষ্যের এমন অবস্থা, সেখানে চিন্তার স্বাধীনতাকে—অবশ্য লোপ করিবে না ; কারণ তাহা হইলে ভবিষ্যতে বিশেষ অমঙ্গলের সম্ভাবনা, কিন্তু তাহাকে কোন মতেই উৎসাহ দেওয়া বিধেয় নহে। কঠোর রাজশাসন, কঠোর ধর্ম্ম শাসন সে জাতির পক্ষে পরম হিতকর। কিন্তু যে ধর্ম্মের শাসন-প্রণালী কঠোর, সাধারণতঃ সে ধর্ম্মকে কেহ প্রশংসা করে না। বস্তুতঃ সে ধর্ম্ম প্রশংসা-ভাজন হইবার উপযুক্তও নহে ; অস-ভ্যতারূপ বিকারের ইহা বিষ-বটিকা মাত্র। কিন্তু তথাপি এরূপ ধর্ম্ম-শাসন অবস্থাভেদে প্রয়োজনীয়। পুনশ্চ অস-ভ্যাবস্থায় ধর্ম্ম মাত্রেরই কিয়ৎ পরিমাণে অন্য ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষ থাকা আব-শ্যক। আপনার ধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং অপর ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষ-রাহিত্য সভ্য জাতির পক্ষে সম্ভব বটে, কিন্তু অসভ্য জাতির পক্ষে সম্ভব নহে। তাহারা হয় আপন ধর্ম্মকে ভক্তি করিবে এবং অন্য ধর্ম্মকে ঘৃণা করিবে, না হয় কোন ধর্ম্মেই তাহাদের সমুচিত আস্থা থাকিবে না। ধর্ম্মের তৃতীয় কলঙ্ক কুসংস্কার—অবশ্য কোন অবস্থাতেই মনুষ্যের হিতকর নহে। কিন্তু যে জাতির ধর্ম্ম কুসংস্কারে পরিপূর্ণ,তাহাদের অজ্ঞতাই তাহার কারণ। যত দিন পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে বিদ্যার সম্যক্ উন্নতি না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাহাদের মন অবশ্যই কুসংস্কারের অধীন থাকিবে। যাহা হউক এ কথা এক্ষণে স্বীকার করিতে হইবে যে ঘোর অসভ্য জাতির মধ্যে তাহাদের অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল থাকায় কিয়ৎ পরিমাণে অমঙ্গল হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। পরে সেই জাতি সভ্যতার উৎকর্ষ লাভ করিলে তাহাদের ধর্ম্মও উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি সে অবস্থায় ধর্ম্মে তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। কৃত্রিম ধর্ম্ম-শাসন অপেক্ষা অকৃত্রিম নৈতিক শাসন তখন বলবান্ ও অলঙ্ঘ্য হয়। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী অবস্থাতে সভ্যতায় তাহারা যত উন্নত হয়, ধর্ম্মেও সেই পরিমাণে হয়, অথচ ধর্ম্মের আবশ্যক থাকে। কারণ নৈতিক শাসন তাহাদের মধ্যে তখন পর্য্যন্ত তত প্রবল হইতে পারে না, যে ধর্ম্ম-শাসনের সাহায্য-প্রার্থী না হইয়া কার্য্য সমাধা করিতে পারে। রাজ-শাসন অবিকল এইরূপ। সমাজ যত উন্নত হয়, আইন ততই বিশুদ্ধ হয়, অথচ আইনের প্রয়োজন

বহুকাল পর্য্যন্ত সমান থাকে এবং কোন কালেই বোধ হয়, এককালে তিরোহিত হয় না। এস্থলে আইনের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-শাসন শব্দ ব্যবহার করিলে কিছু-মাত্র ক্ষতি নাই। অতএব সমাজ উৎকর্ষের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মের প্রয়োজন না থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত সমাজ সে অবস্থা প্রাপ্ত না হয় তত দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিশুদ্ধ না হইলেও মনুষ্যের মহোপ-কারী। অবশ্য আমি এমন কথা বলি-তেছি না যে সকল প্রকার ধর্ম্মই সকল অবস্থায় বাঞ্ছনীয়। এবং ইহাও বলি না যে পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম্ম আছে, যাহার কোন না কোন শিক্ষার দোষে সমাজের বহু অমঙ্গল হইতেছে না। তবে আমি এই কথা বলিতে চাহি যে ধর্ম্ম যৎপরোনাস্তি বিশুদ্ধ হইল না বলিয়া যদি তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহ, তাহা হইলে সেই কারণ বশতঃ রাজ-শাসনকেও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত। কল্পনা-প্রসূত সভ্যতার চরম অবস্থা ব্যতীত সকল অবস্থাতেই যেমন আইনের প্রয়োজন, সেইরূপ ধর্ম্মেরও প্রয়োজন। বিশেষতঃ অসভ্য অবস্থায় সমাজ মধ্যে মূর্খতা, উৎপীড়ন, অত্যাচার ও কুসংস্কারের এত প্রাদুর্ভাব, যে সে অবস্থাতে ধর্ম্মজাত অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গলের অংশ রাশি পরিমাণে অধিক।

যাঁহারা ধর্ম্মের উপকারিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বোধ হয় এমন কথা বলিবেন না যে ধর্ম্ম হইতে কোন প্রকার মঙ্গল উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মের অত্যাচার কুসংস্কার ইত্যাদি কলঙ্ক তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিদ্বেষের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ উপকার হয় বটে কিন্তু অমঙ্গলের ভাগ বিস্তর অধিক। আমি এই সংস্কারের যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। আমি বলিয়াছি যে সকল কলঙ্কের দ্বারা ধর্ম্ম চিরকাল কলঙ্কিত হইয়া আসিতেছে তাহাদের সহিত ধর্ম্মের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই, যে এই সকল কলঙ্ক সভ্য-তার বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ দূর হয়,—এবং তাহারা এক কালে দূরীভূত না হইলেও ধর্ম্মশাসন দ্বারা সমাজ বিস্তর উপকৃত হয়। ধর্ম্ম হইতে কি কি শুভ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি নিম্নে আমি কয়েকটীর নির্দ্দেশ করিব।

মনুষ্যের দুষ্ট প্রবৃত্তি সকল দমন করি-বার তিন উপায়। ধর্ম্ম-ভয়, সমাজ-ভয় ও রাজ-ভয়। এই তিন ভয়ের-মধ্যে রাজভয় সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। যাহা ধর্ম্ম-ভয়ে সিদ্ধ না হয় তাহা সমাজ-ভয়ে সিদ্ধ হয়, যাহা সমাজভয়ে সিদ্ধ না হয়, তাহা রাজভয়ে সিদ্ধ হয়। কিন্তু ধর্ম্মভয়ের অপেক্ষা যদিচ সমাজ-ভয় ও রাজভয় অধিক বলবান্, তথাপি প্রত্যেক বিষয়ে এই দুই শাসন প্রয়োগ করিতে

হইলে সামাজিক কার্য্য-প্রণালী কখনই সুচারুরূপে চলিতে পারে না। সমাজের মধ্যে এমন কোন শাসন থাকা আবশ্যক যাহা অনুক্ষণ ও স্বতই প্রয়োজিত হয়। আমি যে তিন শাসনের কথা বলিলাম তন্মধ্যে শুদ্ধ ধর্ম্ম-শাসন এই লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং ধর্ম্ম-শাসন না থাকিলে পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজ কখনই সুচারুরূপে চলিতে পারে না। ধর্ম্ম হইতে এই প্রথম উপকার। দ্বিতীয়তঃ, লোকের আভ্যন্তরিক উন্নতি পক্ষে ধর্ম্ম এক প্রধান সহায়। যিনি প্রতিদিন কিয়ৎকাল ঈশ্বর-চিন্তায় ক্ষেপণ করেন, তাঁহার মন সর্ব্বদাই উন্নত। যেমন হিমাচলের গগনস্পর্শী শৃঙ্গ সকল অধঃস্থ মেঘ ও কুজ্ঝটিকা-রাশি ভেদ করিয়া উপরিস্থিত পরিলঘু পবনরাজ্যে দেহ বিস্তার করিয়া আছে, সেই রূপ ভক্তের হৃদয় পৃথিবীর শোক দুঃখ অত্যাচার ও প্রলোভন রাশিকে পশ্চাতে রাখিয়া অনুক্ষণ উর্দ্ধ দিকে পরিধাবিত হয়। বস্তুতঃ ঈশ্বর-চিন্তায় মন যে এক প্রকার অমানুষিক ভাব ধারণ করে, অন্য কোন চিন্তায় তাহা সিদ্ধ হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ। তৃতীয়তঃ ধর্ম্ম যেমন দুষ্ট প্রবৃত্তিকে দমন করে, সেই রূপ সুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকিলে মনুষ্যের যেমন সৎকার্য্যে আসক্তি জন্মে, অন্য কোন উপায় দ্বারা জন সাধারণের পক্ষে তদ্রূপ কদাচ সম্ভব হইতে পারে না।

আমি এত ক্ষণ ধর্ম্ম-সম্ভূত যে যে মঙ্গলের কথা বলিতে ছিলাম তৎ সমুদয় সমাজের সকল অবস্থাতেই উপলব্ধ হইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মজাত আর এক প্রকার মঙ্গল আছে যাহা অসভ্য জাতিদের পক্ষে বিশেষ শুভকর। ঘোর অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য-সমাজে পাশব বলের একাধিপত্য। তখন পাশব বল ব্যতীত অন্য কোন বল মনুষ্যকে শাসনে রাখিতে পারে না, কারণ তখন মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ অতি অল্পই। এ অবস্থায় মনুষ্য ধর্ম্মের দ্বারা প্রথমে নৈতিক বলের শাসনে আনীত হয় (২)। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্মের দ্বারাই পৃথিবীর সভ্যতার প্রথম সূত্রপাত হয়। যে কোন জাতির সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিবে তাহাতেই এই কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, কারণ সকল দেশেই ধর্ম্ম-শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক বিদ্যার প্রথম উন্নতি সাধন হইয়াছে—সকল দেশেই ধর্ম্ম-প্রবন্ধ হইতে সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে।

আস্তিকতা সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু বলিবার ছিল বলিয়াছি। আমি পুনরায় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে আমি আস্তিক নহি, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আস্তিকতা সমাজের শাসন ও উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়; সুতরাং যাহাতে বিশুদ্ধ আস্তিকতার বিস্তার হয় তদ্বিষয়ে সকলের চেষ্টা পাওয়া উচিত।

(2) Guizot. Hit. of civil.

পাতঞ্জল দর্শন

অথবা

যোগ শাস্ত্র।

এই দর্শনকারের কোন পরিচয়ই কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যৎকালে সাংখ্য শাস্ত্র প্রচার দ্বারা মহর্ষি কপিল সমস্ত ব্রহ্মভূমিকে নিরীশ্বরবাদী করিতেছিলেন, তখন অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই ইহার আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি দেখিলেন সমস্ত মানব ক্রিয়া কাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক্য মতাবলম্বন করিতেছে এবং বেদ বিরোধী হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে তখনই এই দর্শন শাস্ত্র রচনা করেন, এবং নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রতিযোগী দর্শন বলিয়া সেশ্বর সাংখ্য নামে এই দর্শনের নাম করণ করেন।

এই দর্শনে যোগের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিবৃত থাকায় ইহার অপর নাম যোগ শাস্ত্র। ইহা বেদের বিষয়ে কিছুই বলে নাই। কেবল বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ রক্ষা করিলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা হয়, এবং বেদ যখন মান্য তখন তদুপদেশে চলা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য এই মাত্র বলিয়াছে। মহর্ষি এই রূপ ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা—"ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ„ অর্থাৎ অবিদ্যামূলক যে ক্লেশ এবং কর্ম্মফল পরিপাকের আধার যে সংস্কারাত্মক বাসনা সমূহ, তাহা হইতে নির্লিপ্ত পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। তাঁহার মতে ঈশ্বরে নিত্য কালই সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ রহিয়াছে, তাহাতে সাধনের অপেক্ষা নাই।

"তস্য চ তথাবিধম্ ঐশ্বর্য্যম্
অনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ"

ঈশ্বর সম্বন্ধে পতঞ্জলির মনোগত অভিপ্রায় এই যে সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ জীবাত্মাকেই বহন করিতে সক্ষম, পরমাত্মাকে স্পর্শও করিতে পারে না। মহর্ষি পতঞ্জলি, সকলের গুরু এক জন পরম পুরুষ আছেন ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ
কালেনানবচ্ছেদাৎ।"

ফলতঃ যত জন দার্শনিক পণ্ডিত, দর্শনে আপন মত ব্যক্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনিই কেবল সবল ভাবে ঈশ্বর-অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তিনি যোগ-শব্দের অর্থ করেন যে

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" পরে নিশ্বাস-রোধ এবং অঙ্গন্যাসের যে সকল সূত্র আছে তাহা অতি বিশদ রূপে স্ফুটিত হইয়াছে। যোগবলে যোগী আপনাকে এমত লঘু করিতে পারেন যে, অক্লেশে নভোমণ্ডলে পর্য্যটন করিয়া জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এবং নন্দন কানন বৈকুণ্ঠ-ধাম প্রভৃতি মনের বাঞ্ছনীয় স্থানও দর্শনে সক্ষম হয়েন। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি সৌর-জগৎ-বেত্তা পণ্ডিতও বিজ্ঞান বলে কহিয়া-ছেন যে পৃথিবীর শক্তি দ্বারা আকাশস্থ গুরু দ্রব্য ধরাতলে আকর্ষিত হয়; যথা "আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে"। কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে এই আকর্ষণ-শক্তি যোগ-বলের নিকটে ও পরাস্ত হয়, যোগী কায়াকাশের সম্বন্ধ সংযমন পূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে পারেন, সুতরাং নবাবিষ্কৃত ইউরোপের নূতন সভ্য শ্বেতাঙ্গগণের বিজ্ঞান-প্রধান ব্যোম-যানও ইহার নিকটে পরাভূত হয়।

যোগীর যোগবলে অতীত ও অনাগত জ্ঞানও জন্মিয়া থাকে; যথা—"পরিণাম-ত্রয়-সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানং। পশু পক্ষ্যাদির অব্যক্ত শব্দ শুনিয়াও তাহার শব্দ সাধন ও অর্থ করিতে পারেন, যথা "শব্দার্থ-প্রত্যয়ানামিতরে-তরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূত-রুত-জ্ঞানং"। আর বার যোগী জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্ব জন্মে কোন্ জাতীয় কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন বলিতে পারেন, যথা "সংস্কার-সাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানং।" এখানে তিনি পর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া তাহার মানসিক ভাব উন্নয়নে সমর্থ হয়েন, যথা—"প্রত্যয়স্য পর-চিত্ত-জ্ঞানং।"

এই রূপে যোগী সহস্র সহস্র কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনা করিলে অবশ্যই এটী সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে কুম্ভকও প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা যে জীবাত্মাকে শরীর হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই।

বোধ হয় পূর্ব্বতন আর্য্যগণ এই রূপ যোগ সাধন করিয়াই দীর্ঘজীবী ও সবল-শরীর হইতেন।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন।

যোগ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যোগী-সকল যখন রাজ যোগ সাধনা করিবেন তখন নিম্নোক্ত নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করিয়া পরমাত্মাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া দ্বৈতজ্ঞান-শূন্য হইবেন। এক্‌দন্যথায় পরমাত্মায় দৃঢ়রূপে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারেন না ও পারিবেন না যেরূপে আত্মানাত্ম বিচার করিবেন তাহা শিবসংহিতায় বিবৃত আছে। যথা—

একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্ত-শূন্যং।
নান্যৎ কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে বস্তু সত্যং।
যদ্ভেদেঽস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনা বৈ।
জ্ঞানস্যায়ং ভাসতে নান্যথৈব॥

এক মাত্র নিত্য জ্ঞানই আদ্যন্ত-শূন্য হেতু সত্য। তদ্ভিন্ন তাবৎ বস্তুই অনিত্য হেতু অসত্য তবে যে ইহ সংসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নানা প্রকার বস্তু প্রত্যক্ষ হয় সে কেবল আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের অভাব হেতু ইন্দ্রিয়োপাধি দ্বারা এক পরমাত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শনাদি হয়। বাস্তবিক তাবতি এক চৈতন্য পদার্থ।

অভেদো ভাসতে নিত্যং বস্তু-ভেদো ন ভাসতে। দ্বিধা-ত্রিধাদিভেদোঽয়ং ভ্রমত্বে পর্য্যবস্যতি॥

ইহ সংসারে আর পরমাত্মাতে বস্তুতঃ ও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। তবে যে একধা দ্বিধা ত্রিধা অর্থাৎ আমি তুমি ও তিনি যে জ্ঞান হয় সে কেবল আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানের অভাব হেতু ভ্রম মাত্র। এই ভ্রমকে যোগ-বাশিষ্ঠে জাগ্রৎস্বপ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং বৈ মূর্ত্তামূর্ত্তং তথৈব চ।
সর্ব্বমেব জগদিদং বিবৃতং পরমাত্মনি॥

যাহা হইয়াছে ও যাহা হইবে এবং সমূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত তাবৎ বস্তুই এক পরমাত্মাতে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। যদি তাবৎ বস্তুই পরমাত্মাতে বিস্তৃত হইয়া থাকিল তবে ঐ সকল বস্তু পরমাত্মা বৈ আর কিছুই নহে। আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান হইলে ঐ সকল বস্তুর জ্ঞান থাকে না তখন তাবতি পরমাত্মাময় জ্ঞান হয়।

কল্পকৈঃ কল্পিতা বিদ্যা মিথ্যা জাতা
মৃষাত্মিকা।
এতন্মূলং জগদিদং কথং সত্যং ভবিষ্যতি॥

পরমাত্মাতে যে জগদজ্ঞান সে জ্ঞান নিতান্তই মিথ্যা, কারণ ঘট-পটাকার জগতের যিনি জননী তিনি কল্পক দ্বারা কল্পিতা হেতু মিথ্যা আর তিনি মৃষাত্মিকা; সুতরাং জননী মিথ্যা পদার্থ হইলে তদ্গর্ভজাত সন্তান সন্ততিও মিথ্যা হয় বৈ কদাচ সত্য ও সৎ হইতে পারে না। বেদান্ত শাস্ত্রে জগজ্জননীকে মায়া বলা হইয়াছে; সেই মায়া ইন্দ্রজাল বিদ্যা সদৃশী। ইন্দ্রজাল বিদ্যাতে আর ভোজ বাজীতে ইতর বিশেষ নাই।

চৈতন্য সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তু
সমাশ্রয়েৎ।

এক নিত্য চৈতন্য দেবেতে চরাচর সমস্ত জগৎ মায়া দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে। যদি সেই নিত্য চৈতন্যতে মায়া দ্বারা চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইল তবে অনিত্য জগৎ আর মায়ার আশ্রয় না লইয়া নিত্য চৈতন্য দেবেরি আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ যোগীরা তাবতের আশ্রয় পরিত্যাগ করত এক নিত্য চৈতন্যেরি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হন।

ঘটস্যাভ্যান্তরে বাহ্যে যথাকাশং প্রবর্ত্ততে।
তথাত্মাভ্যান্তরে বাহ্যে কার্য্য-বর্গেষু নিত্যশঃ॥

যেমন মহাকাশ ঘটাদির মধ্যে ও বাহিরে সদা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন তদ্রূপ পরমাত্মা কার্য্য-বর্গের অর্থাৎ জগতের ভিতরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। ইহা মায়া বিমোহিত ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। তাঁহারা, কেবল কার্য্য-বর্গকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ-যোগীরা, কার্য্য-বর্গের ভিতরে ও বাহিরে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

অসংলগ্নং যথাকাশং মিথ্যাভুতেষু পঞ্চসু।
অসংলগ্নস্তথা হ্যাত্মা কার্য্য-বর্গেষু নান্যথা॥

যেমন মহাকাশ অচিরস্থায়ী অসত্য পঞ্চ মহাভূতে অলিপ্ত ভাবে আছেন সেই রূপ পরমাত্মাও তাবৎ কার্য্যবর্গে নির্লিপ্ত হইয়া আছেন। ইহার অন্যথা হয় না।

ঈশ্বরাদি-জগৎ সর্ব্বমাত্মব্যাপ্য সমন্ততঃ।
একোঽস্তি সচ্চিদানন্দঃ পূর্ণো দ্বৈত-বিবর্জিতঃ॥

ঈশ্বরাদির অর্থ—ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতাকে বুঝায়। ইঁহারা ও জগতস্থ যাবতীয় বস্তু সকলি পরমাত্মা হইতে ব্যাপ্য; পরমাত্মা ঐ সমস্ত হইতে ব্যাপক। পরমাত্মা হইতে ব্যাপক কেহই নহে।

যস্মাৎ প্রকাশকো নাস্তি স্বপ্রকাশো ভবেত্ততঃ। স্বপ্রকাশো যতস্তস্মাদাত্ম-জ্যোতিঃস্বরূপকঃ॥

যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রকাশক পদার্থ আর কেহই নাই যিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ ও ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুকে প্রকাশ করেন তিনিই আত্মা আর জ্যোতিঃ স্বরূপ।

পরিচ্ছেদো যতো নাস্তি দেশকাল-স্বরূপতঃ। আত্মনঃ সর্ব্বথা তস্মাদাত্মপূর্ণো ভবেৎ কিল॥

যেহেতু দেশ কালাদিতে যাঁহার বস্তুতঃ পরিমাণ নাই বলিয়া তিনি পরিপূর্ণ; ইহার অন্যথা হয় না। পরমাত্মা ভিন্ন আর সকলি পরিমিত ও অনিত্য।

যস্মিন্ন বিদ্যতে নাশঃ পঞ্চভূতৈর্ম্মৃষাত্মকৈঃ। আত্মা তস্মাদ্ভবেন্নিত্যঃ তন্নাশো ন ভবেৎ খলু॥

এই বাহ্য জগৎ মিথ্যাভূত পঞ্চভূতে নির্ম্মিত প্রযুক্ত যেমন ইহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধি ও জন্ম মৃত্যু আছে ইহার ন্যায় পরমাত্মার হ্রাস, বৃদ্ধি, জন্ম ও মৃত্যু নাই। এজন্য পরমাত্মা নিত্য অবিনাশী। যদ্যপি

আত্মার সংসাররূপ উপাধির জন্ম ও মৃত্যু দেখা যাইতেছে কিন্তু তৎ স্বরূপের কোন কালে ও কোন অবস্থাতে জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।

যস্মাত্তদন্যো নাস্তীহ তস্মাদেকোস্তি সর্ব্বদা। যস্মাত্তদন্যো মিথ্যাস্যাদাত্মা সত্যো ভবেত্ততঃ॥

যেহেতু আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তু যদি না থাকিল তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে আত্মাই বিরাজমান আছেন। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। মায়াতে করে এক আত্মাকে নানা মত দেখায়।

দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্ম স্যাদিতি শ্রুতিঃ। যাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, তৎ সমুদায় অনাত্ম, মায়াময়।

বাহ্যানি সর্ব্বভূতানি বিনাশং যান্তি কালতঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে আত্মা দ্বৈত-বিবর্জ্জিতঃ॥ ১৪ ॥

মহাপ্রলয়াদি সময়ে আকাশাদি বাহ্য মায়াময়ভূত সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ পরমাত্মাতে বিলীন হইবে। কেবল বাক্‌পথাতীত দ্বৈত-বিহীন পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকিবেন।

হেয়ং সর্ব্বমিদং যস্য মায়া-বিলসিতং যতঃ। ততো ন প্রীতি-বিষয়স্তনুবিত্ত-সুখাত্মকঃ॥ ১৫ ॥

জগৎ মায়ার বিলাস প্রযুক্ত যোগী দিগের নিকট নিতান্ত হেয়। সুতরাং সুখাত্মক যে শরীর ও ধনাদি তাহাতে তাহাদিগের প্রীতি জন্মে না।

অরিমিত্রউদাসীনং ত্রিবিধং স্যাদিদং জগৎ। ব্যবহারেষু নিয়তং দৃশ্যতে নান্যথা পুনঃ।

প্রিয়াপ্রিয়াদি-ভেদস্তু বস্তুষু নিয়তং স্ফুটং। আত্মোপাধিবশাদেবং ভবেৎ পুত্রাদি নান্যথা॥ ১৬ ॥

এই জগৎ শত্রু মিত্র আর উদাসীন এই ত্রিবিধ ধর্ম্মাক্রান্ত। ইহা ব্যবহার দ্বারা নিয়ত দেখা যাইতেছে ইহার অন্যথা হয় না।

এই জগতে কেহ শত্রু কেহ মিত্র কেহ বা না শত্রু না মিত্র উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। সংসারে এই ত্রিবিধ ভাব বৈ অন্য ভাব দেখা যায় না। এতদ্ভিন্ন সংসারে যত বস্তু আছে তাহাতেও প্রিয় ও অপ্রিয়াদি ভাব ব্যক্ত হইতেছে। এমন বস্তু দেখা যায় না যে তাহাতে প্রিয়াপ্রিয় প্রভৃতি কোন ভাব নাই। সংসারের সকল বস্তুতে প্রিয়াপ্রিয় আর উদাসীন ভাব যে দেখা যায়, সেটী প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। প্রকৃতির অর্থ সত্ত্বরজস্তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা।

আত্মোপাধিবশাদেবং ভবেৎ পুত্রাদি নান্যথা। মায়া-বিলসিতং বিশ্বং জ্ঞাত্বৈব শ্রুতি-যুক্তিতঃ॥

অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং লয়ং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ॥ ১৭ ॥

উপাধির বশত্রাপন্ন হইয়া অর্থাৎ অধ্যারোপ আর অপবাদ দ্বারা এক যে আত্মা তিনি পিতা পিতামহ পুত্র ও স্ত্রী কন্যাদিরূপে প্রতীত হইতেছেন ইহার অন্যথা নাই। শ্রুতি যুক্তি দ্বারা এই

বিশ্বকে মায়ার বিলাস মাত্র জানিয়া অধ্যারোপ আর অপবাদ এতদুভয়কে লয় অর্থাৎ নষ্ট করিয়া সর্ব্ব-ব্যাপক পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করা যোগীদিগের যথার্থ কার্য্য।

নিখিলোপাধিবির্জ্জিতো যদা ভবতি যোগিনঃ। তদা বিবক্ষতেঽখণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ। ১৮।

যোগী যখন তাবৎ উপাধি জয় করেন অর্থাৎ নাম রূপাদিতে যখন জ্ঞান থাকে না তখন তিনি অখণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জন ব্রবাদ করিবেন। উপাধি জয় না করিলে ব্রবাদে অধিকারী হইতে পারা যায় না। এসম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন তাহা।—

অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যোবদেৎ। মহানরকজালেষু স তেন বিনিপাতিতঃ॥ ১৯॥

অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ অজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ যোগ সাধনা না করায় যাহার আত্মজ্ঞান জন্মে নাই এমন যে ব্যক্তি তাহাকে অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ অজ্ঞ বলা যায়। এতাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তি যদি বলেন সকলি ব্রহ্মময়। আর বৈদিক ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করেন, তাহাহইলে তাঁহাকে মহানরক জালে পড়িতে হয়।

শ্রুতি বলেন।—সোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়ং। সেই আত্মা স্বীয় ইচ্ছানুসারে তাবৎ প্রজা সৃজন করিয়াছেন। অঘ্টি-সম্বাদিনী ইচ্ছা পরমাত্মার শক্তি অর্থাৎ অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া।

পরমাত্মা যখন জগৎ সৃজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন সেই ইচ্ছা মায়া রূপে পরিণত হইয়া জগৎ সৃজন করেন। মায়াই সংসারের উপাদানও প্রসবিনী জননী।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ যোগীদিগের সম্বন্ধে মায়া ও মায়িক উপাদান ও মায়া প্রসূত সকলি অসত্য। কেবল এক পরমাত্মাই সত্য ও সৎ। অজ্ঞান-প্রভাবে এক আত্মাতে ঐ সকল জ্ঞান জন্মে। ইহা বৈদান্তিক ও শৈব মত।

আকাশাদির উৎপত্তি বিষয়ে অনেক মত আছে তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন আত্মা হইতে মূল প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মনঃ, মনঃ হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত অনুলোমে জন্মে ও বিলোমে ধ্বংস হয়। শিবসংহিতা প্রণেতা মহাযোগী মহাদেব শিবসংহিতায় ঐ বিষয় যেরূপ বলিয়াছেন তাহাই এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

যথা, পরমাত্মা হইতে নিরাকারা অবিদ্যা প্রকাশ হন সেই অবিদ্যা হইতে নিরাকার সগুণ আকাশ, আকাশ হইতে কিঞ্চিৎ বর্ণ-বিশিষ্ট বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে সলিল, সলিল হইতে ভূমি প্রভৃতি সগুণ সাকার ভূতচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়া তদ্দ্বারা স্থাবর জঙ্গম ও প্রাণি-সকল উদ্ভব হইয়া জগদাকারে পরিণত হইয়া কাল বশতঃ বিলোম ক্রমে যে যে বস্তু যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল

পুনরায় তাহাতে বিলীন হইয়া থাকে। সর্ব্ব-শেষে প্রকৃতি দেবীও পরমাত্মায় বিলীন হইলে শেষে কেবল "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মাত্র থাকেন অন্য কিছুই থাকে না।

শুদ্ধ-ব্রহ্মত্বসম্বন্ধো বিদ্যয়া সহিতো ভবেৎ। ব্রহ্মতেন সতী যাতি যতঃ আভাসতে নভঃ॥

তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ু র্বায়োরগ্নি স্ততো জলং। প্রকাশতে ততঃ পৃথ্বী কল্পনেয়ং স্থিতা সতি॥

এ সম্বন্ধে অন্য মত বলা যাইতেছে।

আকাশাদ্বায়ুরাকাশ-পবনাদগ্নিসম্ভবঃ। খ-বাতাগ্নে র্জলং ব্যোমবাতাগ্নিবারিতো মহী॥

আকাশ হইতে-বায়ু, আকাশ আর বায়ু হইতে অগ্নি, আকাশ বায়ু অগ্নি হইতে জল, আকাশ বায়ু অগ্নি জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হইতে যে জন্মিয়াছে সে তাহার গুণ লাভ করিয়াছে।

খং শব্দলক্ষণোবায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ। স্যাদ্রূপলক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণং। গন্ধলা ক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবং॥

আকাশের কেবল শব্দ গুণ, বায়ুর চঞ্চলতা ও স্পর্শ। তেজের রূপ, সলিলের রস, পৃথিবীর গন্ধ-গুণ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গুণ আছে।

স্যাদেকগুণমাকাশং দ্বিগুণো বায়ুরুচ্যতে। তথৈব ত্রিগুণং তেজো ভবন্ত্যাপশ্চতুর্গুণাঃ। শব্দস্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ। এতৎপঞ্চগুণা পৃথ্বী কল্পকৈঃ কল্পতেহধুনা॥

আকাশের একটী, বায়ুর দুইটী, তেজের তিনটী, জলের চারিটী, পৃথিবীর পাঁচটী গুণ আছে আকাশের কেবল এক মাত্র শব্দ গুণ, বায়ুর শব্দস্পর্শ, অগ্নির শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী; পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ বিদ্যমান আছে।

চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধো ঘ্রাণেন গৃহ্যতে। রসো রসনয়া স্পর্শস্ত্বচা সংগৃহ্যতে পরং॥ শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দোঽভিমতং ভাতি নান্যথা॥

পাঞ্চ-ভৌতিক দেহের যে যে স্থান ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে সেই সেই স্থানের দ্বারা তত্তৎভূতের গুণ প্রকাশ করে এজন্য তেজের দ্বারা চক্ষু নির্ম্মিত হওয়ায় চক্ষু দ্বারা রূপ গ্রহণ করা যায় চক্ষু ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা রূপ-গ্রহ হয় না। পৃথিবীর গন্ধ গুণ, তন্নিমিত্ত নাসিকায় পার্থিবগুণ অধিক থাকায় নাসিকা দ্বারা গন্ধ পাওয়া যায়; এই রূপ জিহ্বা দ্বারা রস, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ চর্ম্ম দ্বারা স্পর্শানুভব হয়। স্পর্শ গুণ অতি ব্যাপক হেতু সকল শরীরে স্পর্শজ্ঞান হয়। স্পর্শগুণ কেবল বায়ুর, চর্ম্মে বায়ুর ভাগ অধিক এজন্য যে যে স্থান চর্ম্মে নির্ম্মাণ হইয়াছে সেই সেই স্থান স্পর্শ-বোধক। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বাতেও স্পর্শ জ্ঞান হয়। কিন্তু চক্ষু কর্ণ নাসিকা

ও জিহ্বার চর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য-স্থানস্থ চর্ম্মদ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ জ্ঞান হয় না। ইহা জগৎশিল্পীর আশ্চর্য্য শিল্প-চাতুর্য্য; শরীরের সকল স্থানেই নিত্য চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন; সেই জন্য শরীরের কোন স্থান অচৈতন্য অর্থাৎ অসাড় হইয়া থাকিতে পারে না; কেবল চৈতন্যহীন মৃত শরীর অচৈতন্য হয়। সমাধি আর মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তি অবস্থায় শরীর অস্পন্দ হয় বটে; কিন্তু মৃত শরীরের ন্যায় একেবারে চৈতন্য-শূন্য হয় না। এ সকল অবস্থাতে চৈতন্য দেব শরীরের সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া কেবল সুষুম্না নাড়ী দ্বারা মস্তিষ্কে জড়বৎ বিরাজমান হন। তখনও শোণিতক্রিয়া পূর্ব্ববৎ থাকে বলিয়া মূর্চ্ছা সমাধি ও সুষুপ্তি ভঙ্গ হইলেও পূর্ব্ব স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে, মূর্চ্ছা সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থাতে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যস্থ চৈতন্য স্তম্ভিতভাবে ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত হইলেই লোকের বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়। ইহাও শরীর-নির্ম্মাতার চমৎকার কৌশল। মূর্চ্ছা আর সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্য সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া স্তম্ভিত ভাবে ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থান করায় লোকের বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়। এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া যোগাচার্য্যেরা কুম্ভক দ্বারা চৈতন্য দেবকে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে সেই চৈতন্য স্তম্ভিত হইয়া মস্তকে অধিরূঢ় হইলে আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না বলিয়া কুম্ভকাভ্যাসের উপদেশ দিয়াছেন। কুম্ভক সিদ্ধ হইলে যোগ সিদ্ধ হইতে পারে। কুম্ভকার্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যোগশাস্ত্র, প্রত্যক্ষবাদীদিগের সম্বন্ধে নিতান্ত অপ্রত্যয়কর হেতু ইদানীং প্রত্যক্ষবাদী-লোক-সমাজে অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈতন্যই বলুন আর আত্মাই বলুন এ পর্য্যন্ত তাহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই বলিয়া আর তাহার কার্য্যও দেখা যায় না। যেহেতু চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বতন্ত্ররূপে স্বীকার করা যায় না। শরীরস্থ অবিকৃতিভাবাপন্ন শোণিতের ধর্ম্ম, চেতনা। শরীরস্থ শোণিত বিকৃতিভাবাপন্ন হইলে অথবা শরীর শোণিত-শূন্য হইলে চেতনা যে থাকে না ইহা তাবতেরই স্বীকার্য্য।

অতএব রক্তই চৈতন্য তদ্ভিন্ন পৃথক-রূপ চৈতন্যের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব ইহা প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকদিগের মত।

এই মত যদি প্রত্যয়যোগ্য হয় তবে সমাধি মূর্চ্ছা সুষুপ্তি ও মেস্‌মেরিজম্ অবস্থাতে ঐ সকল অবস্থাপন্ন ব্যক্তির শরীরে রক্ত দুষিত বা রক্তের অভাব হয় না তথাপি ইহাদিগের বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয় কেন? যাহাদিগকে মেস্‌মেরিজম্ করান যায় তাহারা এমন অচৈতন্য হয় যে তাহাদিগের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিলেও তাহারা জানিতে পারে না। সমাধিস্থ ও মূর্চ্ছাগত ব্যক্তিদিগেরও এপ্রকার অবস্থা ঘটে। ভূকৈলাসে যে মহাপুরুষকে আনান হয়, প্রথমে

তাঁহার চৈতন্য করিবার জন্য বড় বড় পাকা গুল পোড়াইয়া তাঁহার গাত্র দগ্ধ করান হয়, তথাপি মহাপুরুষের চৈতন্য হয় নাই। ইহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অদ্যাপি কেহ কেহ জীবিত আছেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইল যে মানব শরীরের রক্তের সহিত স্বতন্ত্র চৈতন্য যে আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যকে আত্মা বলে। আমেরিকাতে ইহা প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণ হইয়াছে।

আমেরিকাতে মিডিয়ম ও আত্মদর্শী দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে যে আনিমল্-মাগনেটিজম্ দ্বারা যে নিদ্রা উৎপন্ন হয় সেই নিদ্রার সহিত মৃত্যুর অনেকাংশে ঐক্য আছে, অর্থাৎ মনুষ্যের মৃত্যু হইলে সেই মৃত শরীর হইতে আত্মা যেমন বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে যান তদ্রূপ উক্ত প্রকারে জাত যে নিদ্রা সেই নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির আত্মা তত্তৎকালে নিদ্রিতের শরীর হইতে বহির্গত না হইয়া স্তম্ভিত ভাবে মস্তকে অবস্থিতি করায় ঐ নিদ্রিত ব্যক্তি মৃত-শব-সদৃশ হয়। এই মাত্র বিশেষ যে তৎকালে নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রাকারকের চৈতন্যের কিয়দংশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া নিদ্রাকারকের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে।

পরলোক-গত আত্মার আবির্ভাব যাহার শরীরে হয় তাহাকে মিডিয়ম বলা যায়। প্রাচীন সমীচীন আর্য্যেরা কেবল আত্ম-চর্চ্চায় পরমায়ু শেষ করিতেন। তৎকালে যোগসাধনা—আর যজ্ঞানুষ্ঠান বৈ অন্য প্রতিমা আরাধনার প্রথা যে ছিল তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। রামায়ণে যে দুর্গোৎসবের কথা আছে তাহার অনুষ্ঠান আধুনিক দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানের ন্যায় যে ছিল এরূপ বোধ হয় না। কল্পসূত্রকার দ্বারা আধুনিক প্রতিমাদি পূজার নিয়ম সংস্থাপন হয়। বঙ্গাধিকারের সময় হইতে কল্প-সূত্রকারেরা আর্য্যধর্ম্ম-রক্ষার্থে—যে সকল উপাসনা ও কর্ম্ম কাণ্ডের পদ্ধতি প্রস্তুত করেন তাহাই অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের অবয়ব সংস্থাপন করাই কল্পসূত্রকার দিগের প্রধানোদ্দেশ্য।

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আগম, নিগম, প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র মন্থন করিয়া যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে। যথারীতি যোগাভ্যাস করিতে পারিলে অন্যান্য তাবৎ কার্য্যের ফল-লাভ হয়। বিশেষতঃ যোগই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের প্রকৃত উপায়। যোগসাধনা ব্যতীত আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভ হয় না। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। যোগ, চিকিৎসা আর জ্যোতিষ এই শাস্ত্র-ত্রয়ের ফল অব্যর্থ ও প্রত্যক্ষ হেতু বেদ নাস্তিক সমাজেও প্রামাণ্য হইয়াছে। উক্ত শাস্ত্রত্রয় বেদান্তর্গত। যদিস্যাৎ ঐ শাস্ত্রত্রয়ে প্রত্যক্ষ ফল প্রসূত না হইত তাহা-হইলে, বেদকে কেহই মান্য করিত না।

জ্যোতিষ আর চিকিৎসা শাস্ত্রের ফলাপেক্ষা যোগফল যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি গরীয়ান্। যে সকল প্রত্যক্ষ-ফলদায়ক শাস্ত্রের কথা কহা গেল ইহার কোনটিতে অন্তর্জ্জগতীয় ফলদান কবিতে পারে না। কেবল যোগ শাস্ত্রই বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতীয় ফলদান করিতে পারে। এবং সর্ব্বযাত্রীর পক্ষে অবিসম্বাদী মৃত্যুতে আর সমাধিতে যে প্রভেদ তাহা বলা যাইতেছে। মৃত্যুতে শরীরস্থ শোণিত ক্রিয়ারহিত হয় বলিয়া চৈতন্য রহিত হওয়াকে মৃত্যু বলা যায়। প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু আর শোণিত এই দুই পদার্থই চৈতন্যদেবের বাহন; এই বাহন দ্বয়ের অভাবেই চৈতন্যের অভাব হয়। সমাধি অবস্থায় উক্ত বায়ু-পঞ্চককে পবনাভ্যাস-সিদ্ধ যোগী স্বশক্তি-ক্রমে স্বীয় শরীরে আবদ্ধ করিয়া চৈতন্য দেবকে স্তম্ভিত করত কেহ কেহ ভ্রূ-মধ্যে কেহ কেহ মস্তকে সুষুম্না নাড়ী দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

এ অবস্থায় শরীর, স্পন্দন-রহিত হয় বটে, কিন্তু মৃত শরীরের মত বিশ্রী ও বিবর্ণ হয় না। মূর্চ্ছা ও মেস্‌মেরিজমেও শরীর পূর্ব্ববৎ সুদৃশ্য থাকে। যখন শরীর হইতে চৈতন্য দেব অন্তরিত হন তৎকালে মৃত দেহে প্রেতের আবির্ভাব হয় বলিয়া ঐ দেহ প্রেতাকার দেখা যায়। সমাধি-স্থান পর্য্যন্ত প্রেত, দেহাভ্যন্তরে অচৈতন্যভাবে থাকে। সমাধি হইলে প্রেত মৃত দেহ পরিত্যাগ করে। সমাধির অর্থ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে বুঝায়। তন্ত্র শাস্ত্রে শবসাধন প্রকরণ দেখ।

অতঃপর যোগাঙ্গ অভিষেকেব বিষয় লেখা যাইতেছে। যেখানে দীক্ষা সেই স্থানে অভিষেকেব অত্যাবশ্যক। তান্ত্রিকমতে যে কোন আরাধনা করিবে প্রথমে উপযুক্ত সদ্গুরুব নিকটে তাহা বৈধরূপে গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক অভিষেকে অভিষিক্ত হইবে। বিনা অভিষেকে কোন তান্ত্রিক ক্রিয়া করিলে সে ক্রিয়া বন্ধ্যাব ন্যায় নিষ্ফলা হয়। এনিমিত্ত দেব দেব মহাদেব দীক্ষা আর অভিষেকের বিষয় বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। অভিষেকার্থ মন্ত্রপূত জল দ্বারা অন্তর্ব্বাহ্যকে পবিত্র করা। যোগসাধকেরা, প্রথমে যেরূপে যোগ দীক্ষায় দীক্ষিত হইবেন তদ্রূপ অমনি ঐ দিনেই যোগাভিষেকে অভিষিক্ত হইবেন। সদ্গুরু যখনি পাওয়া যাইবে তখনি ঐ দীক্ষা গ্রহণ আর অভিষেক দ্বারা পূত হইবেন। ইহাতে কালাদি বিচার করিবে না।

ক্রমশঃ।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

হানিমান্।

আমাদের প্রিয় পাঠক, অনেক সময়, ইংরাজী বাঙ্গালাতে, অনেক প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ লোকের জীবনী পাঠ করিয়াছেন ও শুনিয়াছেন। আজ, আমরা তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে হোমিওপাথি-প্রচারক, মহাত্মা হানিমানের জীবন-চরিত্র লইয়া উপস্থিত হইতেছি। বিজ্ঞানসংক্রান্ত কথায়, সাধারণের মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা অল্প; পাছে, নীরস বোধে, পাঠক, উপেক্ষা করেন, সেই এক চিন্তা।

ভারতে—ঔষধ, ব্যাধি, চিকিৎসাদির মূলে, মহাদেবের প্রভুত্ব *; সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিতের এই অংশে দৃঢ় সংস্কার, প্রগাঢ় বিশ্বাস। সত্য ঘটনা দিয়া, হাজার কেন প্রমাণ উদাহরণ দাও না, জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়ের বাহিরে, তাঁহারা, 'পদমেকমপি' গমনে অনিচ্ছু †। আমাদের দেশের শিবের ন্যায়, হিপক্রিটিস্, ইউরোপে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনয়িতা নামে যথার্থতঃ পূজিত। হিপক্রিটিসের গ্রন্থে, বিষম ও সদৃশ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষম-বিষয়ক চিকিৎসার তাৎপর্য্য, যাহাতে উৎপত্তি, তদ্বিপরীতে শান্তি। হিপক্রিটিসের "বিষস্য বিষমৌষধং" এই উক্তি, হানিমানের পূর্ব্বে সকলেরই অলক্ষ্যপথে নিপতিত ছিল; উদারধী, সুতীক্ষ্ণ-প্রতিভাশালী মহোদয় হানিমান, তাৎকালিক চিকিৎসক-প্রমুখের অন্যতম থাকিয়াও, নিজে তদানীন্তন স্বাবলম্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা-প্রণালীতে, অহরহঃ সন্দিগ্ধ—সুতরাং ক্ষুণ্ণমনাঃ থাকিতেন।

সন্দেহ, উন্নতির অবশ্যম্ভাবী কারণ; দার্শনিকেরা, তাহার দেদীপ্যমান সাক্ষ্য। যে বৈজ্ঞানিক-ভিত্তি-প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-তত্ত্ব, আজ সমূহ জাগতিক মানবের অন্তর-মুকুরে প্রতিবিম্বিত—ভক্তি-পূজোপহার-সংগ্রহে সমর্থ, সেই সদৃশ-ব্যবস্থা-প্রকরণ, যখন অনাগত কালের ক্রোড় হইতে, প্রচ্যুত হইল, সেই দিন, সেই শুভ দিন জগতের চক্ষে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল; বহ্বায়াস-জনিত, সুষুপ্তি-সেবিত নিদ্রিতাবস্থায় আরাম, জাগরণে যেমন হৃদয়-মোহন, অজ্ঞান-যবনিকান্তর্হিত তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ অবিকল তেমন; না—তদধিক হৃদ্য। উপক্রমণিকা-অংশ দূরে রাখিয়া, আমরা, হানিমানের জীবনচরিত্রে প্রবেশ করিতেছি। খৃষ্টীয় ১৭৫৫ অব্দের ১০ই এপ্রিলে, জর্ম্মান্ 'রাজ্যের অন্তর্গত

* শ্রীভাগবতের "বাণ-যুদ্ধ," জ্বরোৎপত্তি ও তদানুষঙ্গিক ঔষধ সৃষ্টির নির্দ্দেশ, ঐ কথা প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

† চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট, হারীত, অত্রি, ধন্বন্তরি, কণাদাদি, প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উদ্ভাবক। তাঁহাদের বিশ্বাস্তও ইহা, স্বীকার্য্য নহে।

সাক্সনি প্রদেশের মেসেন নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে, হানিমানের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা, বাল্যাবস্থা হইতেই, মনের চিন্তা-শীলতা ও স্মৃতি-শক্তির তেজস্বিতায় বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সমধিক যত্নসহকারে সৎবিষয়ের সুশিক্ষা প্রদান করেন।

বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, ঐ নিয়মে শিক্ষিত হইলেন; অতঃপর খৃঃ ১৭৭৫ সালে, লিপজিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত, তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়; এখানে প্রবিষ্ট হইয়া অবধি, অক্লান্ত দক্ষতাবলে, উদ্যমপ্রিয়তার সাহচর্য্য লাভ সহজ হইল। অবশেষে, তিনি, ইংরাজীভাষা-লিখিত কয়েক খানি চিকিৎসা গ্রন্থ, জর্ম্মান্ ভাষায় অনুবাদিত করেন। জীবনের যে অংশ মানবীয় আত্মাকে, অবিবেক পথে, প্রধাবিত করে, সেই শৈশব (বাল্য), কৈশোর ও যৌবনাবস্থা কেমন মধুর ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, অসামান্য-মনীষা সম্পন্ন ভিন্ন অন্যের নিকট এ দৃষ্টান্তের প্রত্যাশা নিতান্ত অসম্ভব।

খৃষ্টের জন্মের পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে, ইউরোপে, ইদানীন্তন দার্শনিকসম্প্রদায়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে, এতাধিক হেয় আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, সময়ে সময়ে, তাঁহাদিগকেও, তাহার মর্ম্ম-পরিগ্রহে বিফল-প্রযত্ন হইতে হইত। ব্যাধি-প্রশমনের উপায়-মন্ত্র, তাঁহাদের হস্ত-তল ন্যস্ত ভ্রম-সংকুল এত অসঙ্গতি দার্শনিক মতের ন্যায়ে কি ধারাবাহিক কাল নির্ব্বিবাদে বিবাজিত রাখিতে পারে? না, অনন্ত শক্তির প্রভুত্ব আকর্ষণে অধিকারী হয়? পুরাবৃত্ত, তাহার লক্ষ লক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

কাল্পনিক ধর্ম্মের বিরূপ ভ্রূভঙ্গী, অযুক্তির অপরিস্কৃত আচ্ছাদনেও কস্মিন্‌কালে এই শতাব্দির অদ্ভুত-ক্রিয়া কৌশলময়, দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব পৌরহিত্যের উৎপীড়নে, ইউরোপ খণ্ড, এক কালে সশংকিত ছিল; ইতিবৃত্ত-পাঠকের তাহা জানিতে অবশিষ্ট নাই। তদানীন্তন ধীরেরা ভাবিতেন, হায়! পৃথিবী, কি এই রূপ দুর্দ্দিন-সমাচ্ছন্ন ঘোর অমানিশার ধ্বান্তময় নিশীথে বিলীন থাকিবে?

হিপক্রিটিস, পীড়ার প্রকৃতহেতুর মূল তত্ত্বানুসন্ধানে কালাতিরেক, নিরর্থক বলিয়া ভাবিতেন; সুতরাং, সেদিকে, তিনি, মনোনিবেশ করিতে ক্ষান্ত ছিলেন। উর্ব্বর-মস্তিষ্ক হিপক্রিটিস্ এজন্য কুৎসাপূর্ণ অভিনন্দনে আখ্যাত হইবার অযোগ্য। তিনি, স্বাস্থ্যকর পথ্যের উপকারিতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় ইতিহাসেও, পথ্যের প্রাধান্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেদীপ্যমান;—

"জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং
জ্বরান্তে লঘু ভোজনং॥" †

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের-উপক্রমণিকাকালে,

† এতদ্ব্যতিরিক্ত পথ্য-বিষয়ক এত শ্লোক বর্ত্তমান যে, তদ্দ্বারা এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে।

পথ্যেরই প্রাধান্য স্বীকার দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ, তাই বলিয়া পথ্য, চিকিৎসা-শাস্ত্রের বীজমন্ত্র নহে।

হোমিওপাথির জন্মের সহিত, হানিমানের অভেদ সম্বন্ধ। হানিমানকে ছাড়িয়া, হোমিওপাথির স্বতন্ত্র জীবন নাই। হিপক্রিটিস, এবং হানিমানের মধ্যে, পরস্পরের ঔপমিক তুলনায়, ইতিবৃত্তাংশে উভয়ের ঘটনাগত যাদৃশ সামঞ্জস্য, চরিত্র-ভাগে কোন মতেই তদপেক্ষা, ন্যূন সাম্য লক্ষিত হয় নাই।

এই অভূত-পূর্ব্ব সাদৃশ্য, জড় জগতের ঐতিহাসিক ঘটনায় দুর্লভ। হিপক্রিটিসের তুলনায়, হানিমানে, অনুধাবন-শক্তির বিদ্যমানতা, পূর্ণভাবে বিকসিত।

হিপক্রিটিসের গ্রন্থে, "যাহাতে রোগের উৎপত্তি, আবার তাহাতেই নিবৃত্তি" এই উক্তি, আকস্মিক বলিয়া অনুভূত হয়। হিপক্রিটিস্ হইতে, হানিমানের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল, ভীষণ মরুর সহিত সাদৃশ্য হইবার যোগ্য।

হিপক্রিটিস্-রোপিত বীজ, কালের করাল-স্রোতে, যে বিস্মৃতি-সাগরে ভাসিয়া যায় নাই, সে কেবল মর্ত্ত্যের সুখ-শান্তির কারণ বলিতে হইবে; চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠা হইতে, পৃষ্ঠান্তর উদ্ঘাটিত করিতে করিতে, এই উপাদেয় সত্য, হানিমানের আয়ত্ত হইয়াছিল।

অতঃপর, দুই বৎসরের পর, হানিমান্, নিয়মিতরূপে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরের চিকিৎসালয়ে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করেন; স্বাভাবিক অমায়িক স্বভাব ও আয়ত্তীকৃত বহুবিধ গবেষণার গুণে, স্বল্প কালের মধ্যেই, লিয়োপোল্ড চিকিৎসালয়ের ডাক্তার কোয়ারিনের সহিত, তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মিল।

প্রবীণ ডাক্তার, যুবক হানিমানের চিকিৎসার পারিপাট্য সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার হস্তে, চিকিৎসালয়ের ভার অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

কোয়ারিনের এই অনুগ্রহ লাভ, হানিমানের চিন্তাতীত ঘটনা। হানিমান্, স্বীয় মনীষিতার ফল, জীবনের প্রথমাবস্থা হইতে, সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, ইহা অনল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। উৎসাহিত অন্তরে হানিমান্ ক্রমশঃ লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলেন।

সেই উদ্যমের নিকট, হতাশার কালিমাময় মূর্ত্তি, নিমেষ-মাত্রের জন্যও, প্রতিবন্ধকতাচরণে সাহসী হয় নাই। অনধিক কাল পরে, তাঁহাকে হার্ম্মনষ্টাটে থাকিতে হয়। ট্রান্‌স্যালভ্যানিয়ার শাসনকর্ত্তা, ব্যারন্ ভন্ ব্রুক্যান্‌টাইলের গৃহ-চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে, তাঁহাকে যুগপৎ তত্ত্বাবধায়কতা এবং পুস্তকাধ্যক্ষের কার্য্যভার সম্পাদন করিতে হয়। এক বৎসর অতীত না হইতেই, চিকিৎসা-শাস্ত্রের পারদর্শিতা-পরিচায়ক এম্, ডি, উপাধি লাভ করিলেন।

অনন্তর, স্যাক্‌স্‌নির অন্তর্ব্বর্ত্তী

ম্যানুসকিং, ড্রেস, ও ম্যাগ্‌ডেবর্গ প্রভৃতি স্থানে, তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া যায়। এখন তিনি, লিপ্‌জিগে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এইখানে হানিমানের প্রীতিপ্রদ জীবনীতে প্রবেশ করিতেছি, এখন হইতেই তিনি চিকিৎসা-সংক্রান্ত জার্ম্মানির তাবৎ সাহিত্য আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, অক্লান্ত উদ্যমে ভর দিয়া, যতই ঔষধ এবং রোগ এতদুভয়ের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, ততই অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়া উঠিল। তৎকালে, অবলম্বিত চিকিৎসা-প্রণালীতে, হানিমানের উত্তরোত্তর অবিশ্বাসের—সংশয়ের কত প্রাদুর্ভাব! পূর্ব্ব-মতের কত পরিবর্ত্তন! ভাবিতে গেলে, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।

রোগ ও ঔষধের পূর্ব্বাপরবর্ত্তী অব্যবহিত কারণ-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন; ফল, তাদৃশ সন্তোষকর না হউক, হানিমান্ নিরস্ত থাকিবার লোক ছিলেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী ডাক্তারগণের গ্রন্থ সমালোচনে, একটা সাধারণ-নিয়ম-প্রাপ্তি সম্ভাবনা বটে, কিন্তু নিশ্চিতির অভাব। অগত্যা, বাধ্য হইয়া, হানিমানকে, নিজ জীবনে পরীক্ষারম্ভ করিতে হয় *। পরিশেষে, যখন কুইনাইন-ভক্ষণে জ্বরোৎপত্তি, প্রত্যক্ষ হয়, হানিমান্, আর তখন সন্দিগ্ধভাবে নিরুৎসাহে রহিলেন না।

তিনি অন্যান্য বিশুদ্ধ ঔষধকে, ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে রোগীর উপর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; এমন অবস্থায়, তখন তিনি, দণ্ডায়মান, যাহা তাঁহার পূর্ব্বাশ্রিত চিকিৎসা-প্রণালী ত্যাগ করায়। জগতের হিতকামনা সঙ্কল্পে, বদ্ধ-পরিকর যিনি, অল্প বিশ্বাসে, তাঁহার লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অল্প। বিফল প্রযত্নে, মানুষকে উন্নতির অভিমুখীন করে। হানিমান্, যদিচ প্রত্যেক সমীক্ষণ ও পরীক্ষাতে, কৃতার্থ হইতে না পারুন, অকৃতার্থতা, তাঁহার মধ্য দিয়া, জগতের উপকারের কারণ হইয়াছে।

রসায়ন ও খনিজ-পদার্থতত্ত্বে এই সময়ে, হানিমানের মন, আকৃষ্ট হয়। ইংরাজী, ফরাসি, ইটালীয় ও অন্যান্য ভাষা লিখিত সাময়িক পত্রিকা-পাঠে, এই সময়ে তিনি প্রবৃত্ত হন। বৈদেশিক ভাষা হইতে, অভিনব মহত্তম রহস্য সংগ্রহ করিয়া, মাতৃভাষাকে মনের সাধে বিজ্ঞান-সাজে সাজাইতে লাগিলেন।

নিয়ম-বিশেষের সাহায্যে, প্রাচীন প্রথার, পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া, ভিন্ন প্রকারে পারদ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র, [যাহা 'মার্কিউরিয়স্ সোলিউবিলিস্ হানিমানি' তাঁহার স্বনাম-খ্যাত এই অভিধেয়ে আখ্যাত হয়;] আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত করণ, সুপ্রথিত হানিমানীয় মদ্য পরীক্ষক (Hahnemanean wine-test) প্রভৃতিতে, ইউরোপের ডাক্তার-শ্রেণীর মধ্যে তদানীং তাঁহাকে

* কুইনাইন সুস্থ শরীরে সেবন করিতে করিতে জ্বর হওয়াতে, সদৃশব্যবস্থাতত্ত্বের ভিত্তির মূল, দৃঢ় হইল বলিয়া তিনি প্রতীতি করেন।

সম্যক্ প্রকারে, প্রতিপত্তিশালী করিয়া তুলে।

ঠিক্ এই সময়ে, হানিমান্ কর্তৃক ভৈষজ্য-তত্ত্ব (Materia Medica.) অনুবাদিত হইতে আরম্ভ হয়। স্কটলণ্ড দেশীয় এই মহাগ্রন্থ হইতে, জর্ম্মন-দেশীয় সংস্কারকের বিস্তর সাহায্যের প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। কলেন-লিখিত সিঙ্কোনা পর্য্যায়-নিবারকের (ফেব্রিফিউজের) গুণাগুণ ব্যাখ্যানে, হানিমানের চিত্ততোষ জন্মে নাই। কলেনের এই বিষম ভ্রম সত্বেও, তিনি, স্বসমকালিকদিগের মধ্যে, এক জন সর্ব্বজনপ্রিয়, গণ্য চিকিৎসক নামে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছেন। "পর্য্যায়-জ্বরে, সিঙ্কোনা, নিরূপিত কালে, নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের নির্দ্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগে, ফলোপধায়ক"; হানিমান্, পরীক্ষা দ্বারা তাহার খণ্ডন করেন; যুক্তি-প্রদর্শনোদ্দেশে উক্ত হইয়াছে, পালা জ্বরের প্রকার ভেদ, এত বর্ত্তমান, যাহাতে কলেনের কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মান্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। সিঙ্কোনার প্রভাব, সেই রূপে ব্যাধির নিকট, সুদূর-পরাহত।

হানিমানের আপাত-প্রতীত ঔদ্ধত্য-বোধক, প্রকৃত পক্ষে সাহসিক উক্তি, হানিমানকে, বহু কালের শুভৈষি-মিত্র-স্নেহচ্যুত করে। বন্ধু, শত্রুভাব ধারণে অকুণ্ঠিত—সুতরাং, ঘোর তর্ক-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হানিমান্, উত্তর-যোগ্য প্রশ্নেরই প্রত্যুত্তর-সমাধানের দায়িত্ব অনুভব করিতেন। বিপক্ষেরা, হানিমান-প্রদত্ত অদ্ভুত যুক্তির অমোঘ বাণে পরাস্ত, বিপর্য্যস্ত, শেষে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া যাইত।

'হোমিওপাথিয়া' নামক নূতন চিকিৎসা পদ্ধতির জন্ম দিবস, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রীক্ ভাষা হইতে, এই অভিনব অভিধেয়ের উৎপত্তি হইয়াছে *।

ম, না, রায়।

[ক্রমশঃ।]

* হোমিওপাথির আবিষ্ক্রিয়া-সম্বন্ধে, একটী আখ্যান শুনা যায়, পাঠকের অবগতির নিমিত্ত, আমরা, এই খানে নিম্নে সংক্ষেপে তাহার সার মর্ম্ম প্রকটন করিয়া দিতেছি:—

হানিমান্, একদা স্বীয় কোনও আত্মীয়ের চিকিৎসা-ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন; ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগেও, হৃদয়-বন্ধুর বিয়োগ হইল দেখিয়া, হানিমানের অন্তরে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তিনি, একেই ত পূর্ব্ব হইতে, সন্দিগ্ধাবস্থায় দিন যাপন করিতেছিলেন, তাহার উপর, আবার মিত্র-বিচ্ছেদ; শুদ্ধ তাই কেন, ঔষধের সত্যতা-বিষয়ে অশ্রদ্ধা! হানিমান্ ভ্রমপূর্ণ পুস্তক ছিন্ন করিয়া, নদী-জলে নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এমন সময়, কোন কোন ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, যে উত্তর দেন, আমরা, তাহারই ভাব সংগ্রহ করিয়া আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। এই ব্যাপারের পর, হানিমানের সত্যানুসন্ধান আরম্ভ হয়।

তত্ত্বদর্শন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র প্রণীত; প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১।৹ টাকা।—পুস্তকখানি অদ্বৈতবাদের মতপরিপোষক। এক সময়ে অদ্বৈত বাদে ভারত পরিব্যাপ্ত ছিল। সে কাল এখন অতীত। অতীত কালের সঙ্গে সঙ্গে, যুক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া, অদ্বৈতবাদও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তাহার আবার পুনরাহ্বান কেন? এই পুস্তক খানির জন্মের কথা এই, গ্রন্থকার, কোন সময়ে উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়া, যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া, ১২৩ পৃষ্ঠাকারের এক পুস্তক লিখিয়াছেন।—দুরারোগ্য, মৃত্যু-কল্প রোগে, নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে, গ্রন্থ-কারের কোন্ প্রকার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল, পুস্তক-পাঠে তাহার প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট। তিনি, বিজ্ঞাপন-মধ্যে, আত্ম-কথায়, এই অংশের উল্লেখে দুই এক পঙ্‌ক্তিও লেখনী-চালনা করেন নাই। কাযেই, সমালোচক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ-সংগ্রহ-বিরহে, পুস্তকের লিখন-ভাবে, এই পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কথায়, তাঁহার বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদ, প্রকৃত প্রস্তাবে সুসংস্কৃত আকারে দূষণাবহ কি না, সে বিচারের পূর্ব্বে, অদ্বৈত-বাদ ধারণা করিবার আধার কে, দেখা আবশ্যক। অদ্বৈতবাদ, অতি উচ্চ দরের লোক, প্রত্যাশা করেন। ধর্ম্ম জগতের এক দিকে জড়োপাসনা, পৌত্তলিক পূজা, একেশ্বরের সম্মাননা, ধ্রুববাদের আন্দোলন চলিতেছে, ইহার ভিতর আবার অদ্বৈতবাদ!

অদ্বৈতবাদ, নাস্তিকতার প্রকার-ভেদ মাত্র। "সোঽহং" কয়জনে বলিতে পারেন? ঈশ্বর মান্য করা হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আবার সত্য যে, প্রত্যেক মনুষ্যই ঈশ্বর। এখন আমরা এই অদ্বৈতবাদের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কোথায় অবস্থিত হই, দেখা যাউক। বেদান্ত সূত্রকে অনেকে, অদ্বৈতবাদের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর তীর্থস্বামী, বেদান্তসূত্রের সার আকর্ষণে "পঞ্চদশী" নির্ম্মাণ করিয়াছেন; দ্বৈতবাদের ব্যাখ্যায়, এই পঞ্চদশী পূর্ণ। শঙ্করাচার্য্যের শারীরিক ভাষ্য, অদ্বৈতবাদ স্থাপনের পক্ষপাতী। শঙ্করা-চার্য্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন, নতুবা বেদান্তকে অদ্বৈত-বাদ কেন বলিবেন? বেদান্ত-সূত্র শ্রুতির অনুগত। সেই শ্রুতি (বেদ) স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেনঃ—

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
(ঋগ্বেদ, ১ মণ্ডল, ২২ অধ্যায়, ১৬৪ সূত্র, ২০ শ্লোক।)

(দুই সুন্দর পক্ষী, প্রণয়ে মিলিত হইয়া, বন্ধু ভাবে, এক বৃক্ষআশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; একজন, সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতেছেন, অপর নিরাহার থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন।)

এখানকার এই দুই পক্ষী, জীবাত্মা আর পরমাত্মা। দ্বৈতবাদের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ।

গ্রন্থকার পীড়ার সময়, যে দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন, সেই সকল দৃশ্য অন্যান্য পীড়িতেরা কেন না দেখিতে পায়? না পাইবার সদুত্তর কি? পীড়া-কালের স্মৃতি অবলম্বনে, যে প্রস্তাবের উৎপত্তি, তাহাতে যে অনেক অসঙ্গত অনুভূত হইবে, সহজেই অনুমেয়; আমরা পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না বলিয়া আক্ষেপ হইতেছে! সম্ভবতঃ, পীড়া কালের পূর্ব্বেও, তাঁহার অদ্বৈতবাদে আস্থা ছিল। সেই আলোচনার বলে রুগ্ন অবস্থাতে কল্পনাও সত্যরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ভাষা, সকল স্থলে পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিতে পারে নাই। ২য় পৃষ্ঠায় গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন; "তখন অদ্বৈতবাদ আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদ জ্ঞান অপনীত হওয়াতে আমি ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া পড়িলাম।"—ঈশ্বরের স্বরূপ কি? গ্রন্থকারের এটী ধারণায়, না কল্পনার কথা? এইরূপ অস্পষ্ট জটিল অংশ, ভূরি ভূরি পুস্তক-মধ্যে বিরাজ করিতেছে। "———আমি মহাশোকে মগ্ন হইয়া হৃদয়-মধ্যে বহুতর বিলাপ করিতেছি এমত সময় পূর্ব্বকার সেই তিনটী জ্যোতিঃ-প্রবাহ সেই বহ্নি-পারাবার হইতে আমাকে পুনশ্চ আকর্ষণ পূর্ব্বক তথা হইতে উত্থিত করিয়া অতি দূরবর্ত্তি ব্যোমতলে নিক্ষেপ করিল।"—এটী অবিকল প্রলাপের অবস্থা। ঐ ৯ম পৃষ্ঠার শেষে উচ্চ ধরণের দার্শনিক ভাবের কথা হইতে লেখা একেবারে পুরাণের বর্ণনায় সমাগত। "ব্রহ্মা, রুদ্র, বায়ু, বরুণ, সপ্তর্ষি-মণ্ডল তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ইত্যাদি।" সংক্ষিপ্ত সমালোচন, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলে, অনায়াসে প্রদর্শিত হইতে পারিত, পুস্তক খানির অপকৃষ্ট ভাগ পরিমাণে এত অধিক যে, তাহার সমস্ত উল্লেখ, এক-প্রকার অসাধ্য।

গ্রন্থকার মহোদয় বলিতেছেন, "তাঁহারা (অদ্বৈতবাদীরা) এই ধরিত্রীর সমস্ত প্রাণিবর্গকে আপন আত্মার সহিত অভেদ জ্ঞান করিয়া উদার স্বভাবে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করত মানবলীলা সম্বরণ করেন।" যেন অদ্বৈতবাদী এক

শ্রেণী লোক আবহমান কাল রহিয়াছে, লিখন-ভঙ্গীতে বুঝাইয়া দেয়। লেখকের বর্ণাশুদ্ধি, পুনরুক্তি অথবা ভাবগত ভ্রমোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, বলিতে কি, যদি আমরা পুস্তক খানির ভ্রম উদ্ধৃত করি, আর্য্যদর্শনের এক ফর্ম্মা পূর্ণ হইয়া যাইবে। অল্পবিষয়ের গ্রন্থ, অথচ ইহা অপেক্ষা নানাপ্রকার বহুল ভ্রান্তির সত্ত্বাতেও, আমরা দুই একটী বাঙ্নিষ্পত্তি দ্বারা সমালোচন শেষ করিয়া দিতাম। যদি পূর্ণবাবু, নিজের বিদ্যোন্নতি প্রচার জন্য পুস্তক প্রচার করিয়া থাকেন, তবে তাহার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য নাই; সাধারণ হিতার্থ হইলে তৎসম্বন্ধেই বা আর কি বলিব? সভ্যগণ, ইত্যাদি সম্বোধনে, লেখক মহাত্মা, পরিশিষ্ট গ্রন্থের কূটার্থের নিরুক্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাদিগকে বাধিত রাখিয়াছেন।

শ্রী ম, না, রায়।

জার্ম্মান্ বালিকাজীবন ও জার্ম্মান্ গৃহ।

সমস্ত ইউরোপীয় জাতির মধ্যে জার্ম্মান্‌দিগের সহিতই আমাদিগের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। সুতরাং জর্ম্মান্‌দিগের রীতি নীতি ও সামাজিক পদ্ধতি জানিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। সেই ঔৎসুক্য অংশতঃ চরিতার্থ করিবার জন্য অদ্য জার্ম্মান্ বালিকা-জীবন ও জর্ম্মান্ গৃহ বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বালিকা বিধাতার সৃষ্টির একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। ইহার সরল স্বচ্ছ মুখকান্তিতে যেন স্বর্গীয় ভাব প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। ইহাকে দেখিলে যেন স্বর্গের পরী বলিয়া বোধ হয়। ইহাকে দেখিলে দুর্ব্বৃত্তেরও মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। পিতার শ্রান্তিহারিণী, মাতার আনন্দদায়িনী, সমাজের বন্ধন-স্বরূপিণী বালিকা—যে দেশেরই হউক সকলেরই স্নেহের সামগ্রী। ভারতীয় বালিকার অন্তর্জীবনের এখন ঘোর প্রলয়কাল উপস্থিত। এই সময়ে বৈদেশিক বালিকাগণের অন্তর্জীবনের চিত্র প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করা ভারতীয় বালিকাগণের ও তদভিভাবক-গণের বিশেষ কর্ত্তব্য।

জার্ম্মাণীতে প্রথম হইতেই বালিকা-গণের চরিত্র গঠিত করিতে চেষ্টা করা হয়। তিন চারি বৎসর বয়সের সময় সকালে বিকালে বালিকারা "শিশু-বিদ্যালয়ে" প্রেরিত হয় বটে, কিন্তু সে সকল বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শুদ্ধ পুস্তক পাঠ করিতে শিখান নয়। এই সকল বিদ্যালয়ে এক এক জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত থাকেন। গ্রামের বা পল্লীর কোন সম্ভ্রান্তা প্রবীণা রমণী পতিবিয়োগে

উপায়হীনা হইলে ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করার অপমান হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকেই এই পদ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই প্রবীণা রমণী সর্ব্ব-প্রথমে নানাপ্রকারে বালিকাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তজ্জন্য বালিকাদিগের মনোরঞ্জনার্থ নানাবিধ খেলনা ও ক্রীড়া-পুত্তলী লইয়া তাহা-দিগের সহিত খেলা করেন, ও তাহারা নির্ব্বিবাদে যাহাতে পরস্পরের সহিত খেলা করে কোমল শাসনে তাহার বন্দোবস্ত করেন। এইরূপে বালিকারা অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের অবস্থাকে অতি সুখপ্রদ বলিয়া মনে করিতে থাকে। বাটী হইতে বিদ্যালয়ে গমন ও তথা হইতে বাটীতে প্রত্যাগমনও তাহাদিগের স্বাস্থ্যের পরিবর্দ্ধক। সুতরাং যাতায়াতেও তাহারা ক্রমে সুখানুভব করিতে থাকে। ক্রমে তাহাদিগের মন সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হইলে ও স্মৃতি ধারণক্ষম হইলে তাহা-দিগকে বর্ণমালা পড়িতে ও ঈশ্বরস্তোত্র মুখস্থ করিতে শিখান হয়। ক্রমে তাহারা যেমন বড় হইতে থাকে. তাহারা পড়িতে, গান করিতে, ও ছোট ছোট কবিতা আওড়াইতে, ও তাহাদিগের ক্রীড়া-পুত্তলীদিগকে পরিচ্ছদ পরাইতে শিখে।

আমরা যে বালিকাগণের জীবনচিত্র প্রদান করিতেছি তাহারা মধ্যবিত্ত লোকের কন্যা। ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, সৈনিক, বণিক্ ও রাজকর্ম্মচারী—ইঁহারাই মধ্যশ্রেণী। বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন অতি অল্প। সেই আয়ে তাঁহাদিগের সুখসচ্ছন্দতা কথঞ্চিৎ চলে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার জাঁকজমক চলিতে পারে না। কন্যারা জাঁকজমক-প্রিয় হইলে, তাহা-দিগের স্বামি-গণ অসুখী হইবে বলিয়া তাহাদিগকে আশৈশব পরি-মিতাচার শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং কন্যারা যতই কেন বিদ্যাবতী ও কলাবতী হউক না সামান্য গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা অপমান বোধ করে না। জননীর দৃষ্টান্ত তাহাদিগের প্রধান শিক্ষাস্থল। জননীকে তাহারা প্রথম প্রথম নানাপ্রকার বেশভূষায় চাকচিক্য-শালিনী ও বিবিধ কলায় অলঙ্কৃত দেখিয়াছিল, কিন্তু কালে তাঁহাকে পুরন্ধ্রী হইয়া—সকলের পরিচ্ছদ সীবন, রন্ধন, ও পরিচ্ছদ পাদুকাদির যথাস্থানে সন্নিবেশন প্রভৃতি—সমস্ত গৃহকার্য্যই করিতে হইয়াছে তাহাও তাহারা দেখিতে পায়। সুতরাং তাহারা সেই বালিকা-বয়স হইতেই আপনাদিগের কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

জার্ম্মান্ জননীরা পরিচ্ছদ-গর্ব্বকে এত ঘৃণা করেন, যে পাছে কন্যাগণের অন্তরে সেই অশুভ ভাব বদ্ধমূল হয় এই ভয়ে তাঁহারা তাহাদিগকে যথোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত করেন না। ব্রিটন বালিকার তরঙ্গায়িত কেশপাশ, স্ফীত কারুকর্ম্ম-সমুচ্ছ্বাসিত পরিচ্ছদ—জার্ম্মাণীতে দেখিতে

পাওয়া যায় না। জার্ম্মান্ বালিকাদিগের পরিচ্ছদ সাদাসিধা, কেশ পেটাকরা, এবং একটী রঞ্জিত ফিতায় আবদ্ধ তুইটী বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বমান। ছোট ছোট বালিকাগণের পরিচ্ছদ আগুলফ-লম্বিত; শীতকালে তাহাদিগের পাদদ্বয় কৃষ্ণ বস্ত্রের পাজামায় আবৃত। জার্ম্মান্ জননীরা, বালিকাগণের মুখকান্তি পরিপুষ্ট করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন না; কেবল সূর্য্যালোকে যাহাতে সেই মুখ-কুমুদিনী ম্লান না হয় এই জন্য ইহাকে মুখাবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখেন। কেশের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন। সবিশেষ পরিমার্জ্জনায় কেশ এরূপ চাকচিক্যশালী হয় যে সময়ে সময়ে ইহাকে রেশম বলিয়া ভ্রম জন্মে, এবং এরূপ পরিপুষ্ট হয় যে অনেক স্থলে ইহাকে আগুলফ-বিলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাথমিক জ্ঞানোপার্জ্জন ও ধর্ম্মোপদেশ সমাপ্ত হইলে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহাকে "নাসচুল" বা সীবন শিক্ষামন্দিরে প্রেরণ করা হয়। তথায় সে বিবিধ সূচীকার্য্য, মোজাবুনন্, কার্পেট বুনন প্রভৃতি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, তাহারা "হোহীয়ার টচ্টারস্কুল" অর্থাৎ শিক্ষা-সমাপ্তি কারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এখানে সে ফরাশি ভাষা, উদ্ভিজ্জ বিদ্যা এবং নৃত্য গীত চিত্র কর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ কলা শিক্ষা করে।

জার্ম্মাণীর ন্যায় আর কোন দেশেই যান্ত্রিক সঙ্গীতের এত চর্চ্চা দেখা যায় না। কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি ধনী কি নির্ধন—সঙ্গীতের চর্চ্চা সকলেরই দুর্দ্দমনীয় ব্যসন ও বৃত্তি। ইহা ধনীর আমোদ প্রমোদের মূল, এবং দরিদ্রের জীবিকা; কারণ সঙ্গীত-ব্যবসায়ীর জার্ম্মাণীতে বিশেষ আদর। ইংলণ্ডে প্রত্যেক শুভকার্য্যে ভোজোৎসব, জার্ম্মাণীতে প্রত্যেক শুভকার্য্যে সঙ্গীতোৎসব। জার্ম্মণীতে রাজনীতির আলোচনা অপেক্ষা, সঙ্গীতের চর্চ্চাই অধিকতর বলবতী। জার্ম্মাণীতে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশহিতৈষণা বক্তৃতায় বা তর্ক বিতর্কে পরিণত না হইয়া সঙ্গীতের সাহায্যে অভিগীত হইয়া লোকের চিত্ত হরণ করে।

জার্ম্মান্ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে শিকার করা, পাখী মারা, বা মাছ ধরা ভাল বাসেন না। তাঁহারা মাছধরাকে অতিশয় নীচ কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

বিবাহ বা খ্রীষ্টোৎসব ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল উৎসব কালে ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলারা একত্র মিশ্রিত হন বটে, কিন্তু সেও বিশেষ সংযমের সহিত। পুরুষেরা একদিকে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করেন, এবং স্ত্রীলোকেরা দল বাঁধিয়া অন্যদিকে পরস্পর আলাপ করেন। বলের (Ball) সময় স্ত্রী-পুরুষে একত্র নৃত্য করেন বটে, কিন্তু বল সমাপ্ত হইলেই যুবতী নৃত্য-সহচরের নিকট বিদায় লইয়া জননীর নিকট গমন করেন। নৃত্য-ভঙ্গের পর নৃত্য-সহচরের যুবতীর

হস্তধারণে কোন অধিকার নাই। সেরূপ করিলে তাঁহাদিগের বিশেষ নিন্দা হইবে। নৃত্য-ভঙ্গের পর যুবতীর অঙ্গুলির অগ্রভাগ মাত্র স্পর্শকরণে পুরুষের অধিকার আছে। ইহার অতিরিক্ত করিলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। নৃত্য-সহচর নৃত্য-ভঙ্গের পর এতদূর উদাসীন ভাব ধারণ করিলে কিন্তু ইংলণ্ডীয় রমণী আপনাকে বিশেষ অপমানিত মনে করেন।

জার্ম্মাণীর লোকেরা অতি সামান্য ভাবে বাস করে। তাহাদিগের অধিকাংশেরই স্বতন্ত্র গৃহ নাই। একটী বাটীর চারি পাঁচ তল। প্রত্যেক তলে এক একটী পরিবার বাস করে। বাটী-গুলি প্রকাণ্ড, এবং বাহির হইতে দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ অতি সামান্য। কার্পেটের প্রচুর ব্যবহার নাই, এই জন্য মেজে প্রায় বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। গৃহাভ্যন্তরে ইংলণ্ডের ন্যায় অতিরঞ্জিত ও স্থূল মশারি এখানে দেখা যায় না। এখানকার মশারি অতি পাতলা ও তরল বর্ণের, জার্ম্মান্ গৃহ-সামগ্রীর মধ্যে মেহাগনী কাষ্ঠের চেয়ার, টেবিল, খাট প্রভৃতিই বিশেষ দ্রষ্টব্য। জার্ম্মাণেরা কোনপ্রকারে টেবিল সাজায় না। ইংরাজ-গৃহের আয়না একটী প্রধান ভূষণ, কিন্তু জার্ম্মান্-গৃহে আয়না এত উচ্চে টাঙ্গান থাকে, যে পদাগ্রে দাঁড়াইয়াও তাহাতে মুখ দেখা যায় না। আইভীলতা ও পিয়ানো এই দুইটীই জার্ম্মান্দিগের গৃহদেবতা। এই দুইয়ের নিকটেই সমস্ত জার্ম্মান্ পরিবার নত-শির। অতিশৈত্য নিবন্ধন আইভীলতা অতি কষ্টে জার্ম্মাণীতে পরিবর্দ্ধিত হয়। এত দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই ইহার এত আদর। যদি জানালায় টবে করিয়া একটী আইভী লতা রাখিতে পারিলেন, তবেই একজন জার্ম্মান্ গর্ব্বে স্ফীত হইলেন।

অনেক সময় এরূপ ঘটে যে অনেকগুলি সঙ্গীত-চর্চ্চা-শীল পরিবার একত্র এক বাটীতে বাস করেন, এবং তাঁহারা প্রত্যহ মিলিত হইয়া ঐকতানিক বাদ্যে নিমগ্ন হন। ইহার পরিণাম এই হয় যে কর-লালিত শিশুরাও সঙ্গীতে আনন্দানুভব করিতে শিখে। অতি শৈশবেই তাহা-দিগের কণ্ঠ সঙ্গীতানুকূল হইয়া উঠে; তাহারা সঙ্গীতের মূল সূত্র শিখিবার জন্য আপনারাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

বালিকার বয়স যখন পঞ্চদশ বা ষোড়শ তখন তাহার বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হয়। তখন তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ সকল যত্নপূর্ব্বক শিখিতে হইবে, ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে হইবে, এবং সেই সকল স্বহস্তে নকল করিতে হইবে। এই সমস্ত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও তাহাকে এখন হইতে সমস্ত পরিবারের জন্য রন্ধনাদি করিতে হইবে। এসকল সত্ত্বে তাহাকে নিয়ত সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে।

জার্ম্মান্ বালিকারা রন্ধনবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী। তাহারা উদ্ভিদ ও মৎস্য

মাংসের নানাবিধ পাক ও বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারে। গ্রীষ্মকাল অতীত হইলে তাহারা উদ্ভিদ হইতে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। কারণ শীতকালে জার্ম্মাণীতে প্রায় কোন-প্রকার উদ্ভিদ পাওয়া যায় না।

জার্ম্মান্-গৃহিণী স্বামী ও পুত্রকন্যা-দিগের জন্য আহার প্রস্তুত করিতে সবিশেষ ব্যগ্র। এতদ্ভিন্ন পরিচ্ছদাদির তত্ত্বাবধারণ করা ও বাহিরে কন্যাগণের সঙ্গে গমন করা তাঁহার আর দুই প্রধান কার্য্য। কারণ জার্ম্মাণেরা অবিবাহিতা কন্যাকে একাকী কোন স্থানে যাইতে দেন না। শরৎকালে যখন শীতকালের জন্য খাদ্যদ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, সে সময়ে কাজের এত ভীড় হয় যে কোন কুলকামিনী একাকী তাহা নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাকে প্রতিবেশিনীদিগের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে প্রত্যেক বাড়ীতে সকলে মিলিয়া কাজ করায়, তাদৃশ সঙ্কট সময়েও লোকাভাব হয় না।

প্রতি বাড়ী বাড়ী যখন সকল প্রতি-বেশিনীগণের সমাবেশ হয়, তখন কাফী দিয়া সকলের সম্মান বর্দ্ধন করা হয়। কাফী খাইতে খাইতে প্রতিবেশিনীগণের পরের কথা লইয়া অনেক আন্দোলন হয়। "অমুকের স্বামী এত অল্প বেতন পায়, তথাপি তাহার স্ত্রীর পরিচ্ছদের ছটা দেখ। শুনিতে পাই তাহার স্বামী নাকি ইংরেজের নিকট ঘুস খাইয়া তাহাদিগের নিকট আমাদের গৃহছিদ্র প্রকাশ করে। ইংলণ্ড হইতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই রেজিষ্টারি চিটি তাহার নিকট আসে। তাহার মেয়েটা আবার অমুক সৈনিকপুরুষের দিকে কটাক্ষপাত করে। তাহার মাতাও শুনিতে পাই সে বিষয়ে সাহায্য করে। এ বড় লজ্জার কথা! কিন্তু তাকে কে বিবাহ করবে, কারণ সে রন্ধন কার্য্য কিছুই জানে না; কেবল পিয়ানো বাজাতে পারে; সহজ সহজ গান করতে পারে, এবং কদাকার প্রতিমূর্ত্তি আঁক্‌তে পারে।" পুরস্ত্রীগণ সমবেত হইলে এই সকল কথায় সময় কাটাইয়া থাকেন।

ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুশীলনে এতদূর তন্ময় হইয়া যায়, যে তাহার বেশভূষা বা অঙ্গসংস্কারে কোন প্রকার আস্থা থাকে না। জার্ম্মান্ বালিকারা অপরিচিত সমাজের সহিত তত মেশামিশি করে না, এই জন্য অঙ্গের অসংস্কারে বা বেশভূষার অভাবে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু তাহাদিগের জননী তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মধ্যে মধ্যে অপরিচিত সমাজেও লইয়া যান। সেই সময় জননীই তাহাদিগের অঙ্গসংস্কার ও বেশভূষা করিয়া দেন। কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় অবিবাহিতা কন্যাকে তরাইবার

এখানে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হয় না।

জার্ম্মাণীতে পাণি-গ্রহণার্থী ব্যক্তির প্রথমেই কন্যাকে সম্বোধন করিবার অধিকার নাই। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে কন্যার পিতার নিকট অনুমতি লইতে হইবে। এই অনুমতি না পাইলে তাঁহার কন্যার গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। অভদ্রলোকে সময়ে সময়ে গুপ্ত ভাবে অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে কন্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যার হৃদয় হরণ করিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে, সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। কন্যাপ্রার্থী কন্যার পিতার নিকট অনুমতি পান বটে, কিন্তু তিনি নির্জ্জনে তাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে পান না। অভিভাবকের নয়ন-সমক্ষে তাঁহাকে কন্যার সহিত কথোপ-কথন করিতে হইবে। কন্যা–পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন তাহাও তিনি বসিয়া দেখিতে পারেন। পারিবারিক ব্যবহারে কন্যার স্বভাব চরিত্র যতদূর জানা যাইতে পারে তাহা জানিবার তাঁহার অধিকার আছে। জার্ম্মান্ বরেরা কন্যার বাহ্য আকৃতিতে সম্পূর্ণ মুগ্ধ হন না। তাঁহারা কন্যার স্বভাব চরিত্র সবিশেষ বিদিত না হইয়া কখনই বৈবাহিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন না। যদি জার্ম্মান্ বর তাঁহার প্রণয়-পাত্রীকে অভীষ্ট গুণে বিভূষিত দেখেন, তবেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। তখন তাঁহারা পরস্পর অঙ্গুরীয়ক বিনিময় করেন, এবং তাঁহারা যে পরস্পর প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছেন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগের বিদিতার্থ তাহা সম্বাদপত্রে প্রচার করেন। যদি বর এই বিজ্ঞাপনের পরও সূক্ষ্ম অনু-সন্ধানে কন্যাকে দুর্ব্বিনীত বা বৃথা-গর্ব্বিত বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ভদ্রতার নিয়ম ভঙ্গ বা রাজ-বিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়াও এই বিবাহ হইতে অপসৃত হইতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর বিবাহভঙ্গ অল্পই ঘটিয়া থাকে।

একবার বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হইলে, জার্ম্মান্ দম্পতী আমরণ অবিচ্ছিন্ন থাকেন। ইহার প্রধান কারণ—জার্ম্মাণীতে জীবিকা নির্ব্বাহের কঠোরতা। অনেক-কেই অতি সামান্য অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে উন্নতির উচ্চতম সোপানে উঠিতে হয়। অনেকে প্রথম অবস্থায় বেতনস্বরূপ এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হন না। আবার যখন যুবক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাইতে আরম্ভ করেন, তখন যুবতীর পিতা মাতা হয়ত সে সময় আর কন্যাকে কিছুই সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন না। জার্ম্মাণীতে বিবাহের পর কন্যা যখন প্রথমে স্বামিগৃহে গমন করেন, তখন পিতামাতা তাঁহাকে যে শুদ্ধ তাহার প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াই নিষ্কৃতি পান, এরূপ নহে, তাঁহা-দিগকে কন্যার সংসার-করণোপযোগী

যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিতে হয় ; এতদ্ভিন্ন যতদিন জামাতা কিছু আনিতে না পারেন ততদিন তাঁহাদিগকে জামাতা ও কন্যার ভরণপোষণের জন্য নিয়মিতরূপে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে হয়। এইরূপে কন্যার সহিত বরের আর একটী গুরুতর বন্ধন বাঁধিয়া যায়। এই সকল গুরুতর দায়িত্বের জন্যই জার্ম্মান্ জননীরা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হন না। এই জন্যই তাঁহারা ইংরাজ জননীগণের ন্যায় কন্যাগণকে বিবাহযোগ্য বসনভূষণে সাজাইয়া প্রকাশ্য জনসমাজে অবতারিত করিতে চাহেন না। কারণ অবস্থা ভাল না হইলে কন্যার বিবাহে পিতামাতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। যতদিন কন্যার বিবাহ না হয়, ততদিন পিতা যে অল্প বেতন পান, তাহাতেও তাঁহার খরচপত্র একপ্রকার চলিয়া যায়। কিন্তু কন্যার বিবাহ হইলে তাহাকে সসজ্জ করিয়া পতিগৃহে পাঠাইতে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।

জার্ম্মান্ যুবতীরাও বিবাহ করিতে নিতান্ত ব্যগ্র নহেন, কারণ বৈবাহিক জীবনে তাঁহাদিগের সুখের বিশেষ আশা নাই। পিতার জীবদ্দশায় তাঁহারা পিতৃগৃহে যতদূর সুখিনী, পতিগৃহে পুত্রকন্যাবতী হইয়া অল্প আয়ে জীবন কাটাইতে তাঁহারা ততদূর সুখানুভব করেন না। পিতার মৃত্যু হইলেও জার্ম্মান্ বালিকারা আমাদের দেশের বালিকাগণের ন্যায় নিতান্ত নিরবলম্ব ও হতাশ হইয়া পড়েন না। তাঁহারা যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে পিতা ও স্বামী বিরহেও কথঞ্চিৎ স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাইতে পারেন।

কন্যা—বিবাহরাত্রি উৎসবে কাটাইবার জন্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সকলকেই নিমন্ত্রিত করেন। কন্যালয়ে বিবাহ রাত্রিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অন্যান্য নানাবিধ আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিমাত্রই সেই সময়ের উপযোগী বিবিধ যৌতুক লইয়া কন্যালয়ে আসেন ও কন্যাকে উপহার প্রদান করেন। পরদিন "কোড্ নেপোলিয়ন্" অনুসারে নির্দ্দিষ্ট রাজকর্ম্মচারী দ্বারা বরকন্যা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েন ; তাহার পর তাঁহারা আপন ইচ্ছানুসারে গির্জ্জায় গিয়া ধর্ম্মযাজকের সম্মুখে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহের শেষ অঙ্গ পূর্ণ করেন। বিবাহের পর দম্পতী কিছু দিনের জন্য দেশভ্রমণে নির্গত হন ; কিন্তু অর্থাভাবে সকলেরই অদৃষ্টে এ সুখ ঘটিয়া উঠে না। যাঁহারা দেশ ভ্রমণে নির্গত হইতে পারেন তাঁহারা বিবাহের পরই একবারে "ঘরকান্না" আরম্ভ করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জার্ম্মাণীতে সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাটী নাই। সুতরাং নবদম্পতী বিবাহের পর কোন বাটীর দুই একটী কুঠারী ভাড়া লইয়া তাঁহাদিগের নূতন জীবন আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের কোন নিন্দা নাই; কারণ ইহা

তথাকার প্রথা। এই জন্যই জার্ম্মান্ যুবকেরা অল্প আয়ে কথঞ্চিৎ জীবন যাপন করিতে পারেন। নবোঢ়া ইংরাজ যুবতীর ন্যায় জার্ম্মান্ যুবতীরা ততদূর ফুলবধূ নন, এই জন্যও তাঁহাদিগের স্বামিগণের বৈবাহিক জীবন তত ক্লেশকর বোধ হয় না। ইংরাজ রমণীরা বিবাহের পর বিলাস দ্রব্যের জন্য স্বামীকে নানামতে জ্বালাতন করিয়া থাকেন। এইজন্য ইংলণ্ডে অনেকেই বৈবাহিক জীবন অপেক্ষা অনূঢ়াবস্থাকে অধিক আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু জার্ম্মান্ যুবতীরা বৃথগার্ব্বজনিত সেই সকল বিলাসিতা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। এই জন্যই জার্ম্মাণীতে অল্পবেতনের লোকে বিবাহ করিতে ততদূর ভীত হয়েন না। এই জন্যই জার্ম্মাণীতে ইংলণ্ডের ন্যায় অনূঢ় যুবকদলের সংখ্যা অধিক নহে।

এই প্রস্তাবে জার্ম্মান্ জীবনের যে চিত্র প্রদান করা হইল, তাহা জার্ম্মান্ নগরসমূহের মধ্যশ্রেণীর লোকের। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীতে স্থানে স্থানে এই চিত্রের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা জাতি সাধারণেরই প্রতিবিম্ব। জার্ম্মান্‌দিগের সামাজিক অবস্থার সহিত প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে—এই প্রস্তাব পড়িলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। জার্ম্মাণেরা যে দেব-সেনাপতি স্কন্দ কর্ত্তৃক তাড়িত দৈত্যগণ—এই সমাজসাম্য তাহার একটী আভ্যন্তরীণ প্রমাণ।

বিলাত-যাত্রীর পত্র।

(সমুদ্র-যাত্রা।)

যে দিন (৬ই ফেব্রুয়ারী) আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছি, সে দিন হইতে আজ প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। এ দুই সপ্তাহে কত কি হইয়াছে। যে জড় শক্তি আমায় লইয়া চলিয়াছে, সে কিছু মানে না। দিন নাই, রাত্রি নাই, ক্রমাগত চলিতেছে, পৃথিবীতে আমার যাহা কিছু হৃদয়ের সামগ্রী আছে, সে সকল হইতে সবলে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্রমশঃ দূরতর আনিয়া ফেলিতেছে। একবার যে স্থির দেহে ও স্থির মস্তিষ্কে তাহাদের জন্য ভাবিব তাহার অবকাশ দেয় না। এ শারীরিক ও মানসিক আন্দোলন আমার পক্ষে অসহনীয়। এ কয় দিন যে মনের কি অবস্থায় কাটাইয়াছি তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। মনে কেবলই অন্ধকার! চিন্তায় একটী সহাস্য চক্ষু আমার দিকে দেখিতে পাই না। সকলই গম্ভীর! * *

আমরা পূর্ব্বে সামুদ্রিক পীড়ার

(Sea-Sickness) বিষয় শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা যে এত ভয়ানক তাহা আপনারা জানেন না। আমিও ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। শনিবার প্রাতে আমাদের জাহাজ ছাড়িল, রবিবার আমরা বঙ্গসাগরে পড়িলাম। এই দিন এবং সোমবার পর্য্যন্ত কোনও উপসর্গ হইল না। পরে যতই সমুদ্রের তরঙ্গ বাড়িতে লাগিল, জাহাজ যতই আন্দোলিত হইতে লাগিল, ততই উহা অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রথমে কি যেন একটা অসুখ বোধ হইতে লাগিল, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমে উহা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল।

জাহাজে পাঁচবার করিয়া খাওয়া হয়—প্রাতে ৭টার সময় চা কিম্বা কফি, ৯টার সময় প্রাতরাশ (Break-fast), ১২॥ টার সময় টিফিন, বৈকালে ৪॥ সময় ডিনার, এবং রাত্রি ৮ টার সময় চা। এতগুলি আহারের মধ্যে একটীও আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিত না। নীচে নামিতে সাহস হইত না, নামিলেই বমি হইত। উপরে একখানি লম্বা চেয়ার লইয়া শুইয়া থাকিতাম। জাহাজ যখন অত্যন্ত উঠিত ও নামিত বা এ দিক্ ও ওদিক্ হইত সেই সময় বোধ হইত যেন সমস্ত শরীর শূন্য স্তরে কে তুলিয়া ধরিতেছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন পাকস্থলী হইতে উঠিয়া সমস্ত গলায় উঠিতেছে, আর মস্তিষ্কও যেন মস্তক ছাড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। **

আফ্রিকায় পড়িয়া অবধি এডেন উপসাগর ও লোহিত সমুদ্রে প্রথম ও দ্বিতীয় দিন সমুদ্র অতি স্থির হইল। কাল বৈকাল হইতে বাতাস আরম্ভ হইয়াছে। আজ (২৩এ) সমুদ্র তরঙ্গময়। আকাশ পরিষ্কার। সহজ অপেক্ষাও একটু অধিক বাতাস হইতেছে, তাহাতেই এই ভয়ানক তরঙ্গ। উপরে ডেকের মধ্যস্থানে যেখানে সকলে বসি, মধ্যে মধ্যে এক একটী তরঙ্গ আসিয়া ডেক ভাসাইয়া দিতেছে। চেয়ার প্রভৃতি ভিজাইয়া দিতেছে। যিনি একটু ধারে বেড়াইতেছেন, তাঁহার কাপড় ভিজাইয়া দিতেছে। আবার কোন কোন তরঙ্গ গবাক্ষ দিয়া কাহারও ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানা প্রভৃতি সমস্ত ভিজাইয়া দিয়া গেল। ডেকের উপরে বেড়ান দুঃসাধ্য। বেড়াইবার সময় একরূপ এদিক্ ওদিক্ করিয়া পা ফেলিতে হয়। বেড়াইতে বেড়াইতে সমুদ্রের দিকে দেখিতে বড় সুন্দর। অসীম জলরাশি উঠিতেছে নামিতেছে ও পরস্পর সংঘর্ষে জলফেণা সকল চূর্ণিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। সমুদ্র ফেণাময়। দেখিতে আমোদ আছে। **

এই আপনাকে যে লিখিতেছি অতি কষ্টে। টেবিল নড়িতেছে, সমস্ত সেলুন নড়িতেছে, শরীর যেন কে তুলিতেছে ও ফেলিতেছে। ইহার উপর আবার জাহাজের প্রথম কর্ম্মচারী বলেন তিনি ইহাকে আরও জীবন্ত দেখিতে ইচ্ছা করেন। বস্তুতঃ এই অনন্ত জলরাশির

মধ্যে এই মহতী তরঙ্গরাশি কাটিয়া প্রতিকূল বায়ু উপেক্ষা করিয়া মানবের ক্ষমতা দেখাইতে দেখাইতে দিন ২৭৫ মাইল বেগে জাহাজ চলিতেছে। ইহাতে তাহাদের মনে গর্ব্ব হইতে পারে। আমরা যে জাহাজে আসিয়াছি ইহা পিয়ানো কোম্পানীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাহাজ। কাপ্তেনও অতি সুনিপুণ এবং অতি ভদ্রলোক। লোহিত সমুদ্রে জাহাজ চালান কিছু দুরূহ। ইহাতে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ। পরশ্ব দিবস আমরা একখানি ভগ্ন জাহাজ (Wrecked Ship) দেখিলাম, উহা চারিবৎসর চড়ায় লাগিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সারি সারি তিনটী দ্বীপ আছে। তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয়টীর মধ্য দিয়া জাহাজ যাইবার পথ। প্রথমটী ও দ্বিতীয়টীর মধ্যে পড়িয়া সে জাহাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেখিলে বিশেষ কিছু হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, একটু হেলিয়া রহিয়াছে। ঐ দিন বৈকালে যদি কোন বিপদ্ ঘটে ত জাহাজের লোকেরা কিরূপ করিবে তাহার শিক্ষা দেওয়া হইল। জাহাজে ছয় খানি বোট আছে। কোন্ খানিতে কোন্ আরোহী উঠিবে, এবং কোন কোন নাবিক তাহার ভার লইবে তাহা অগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহার পর নাবিকেরা আপন আপন বোটের নিকট গেল। আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। কাপ্তেন ও কর্ম্মচারিরা আদেশ করিতে লাগিলেন। একটী বাঁশি বাজিল, আধমিনিটের মধ্যে বোটের দড়াদড়ি খোলা হইয়া গেল। বোট কেবল দুইটী পুলি হইতে চেইনে ঝুলিতে লাগিল। আর একটী বাঁশি বাজিল, তৎক্ষণাৎ যে স্তম্ভে পুলি রহিয়াছে, তাহার হস্ত প্রসারিত হইল। বোট জাহাজ হইতে দূরে গিয়া শূন্য ভরে ঝুলিতে লাগিল। তৃতীয় বার বাঁশি বাজিল, চেইন ছাড়িয়া দিল, বোট ঘরঘর করিয়া নামিল। কিন্তু ইহাকে জলে ফেলিল না। কেবল পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল যে কত তৎপরতার সহিত তাহারা বিপদের সময় কার্য্য করিতে পারিবে। এ দৃশ্যটী দেখিতে অতি সুন্দর বোধ হইয়াছিল।

জাহাজ চালান পূর্ব্বে যত দুরূহ বোধ হইত এখন দেখিয়া শুনিয়া তত বোধ হয় না। এই কয়েকটী যন্ত্রের সাহায্যে আবশ্যকীয় সকলই করিয়া থাকে :— ১ম সেকস্টাণ্ট (Sextant), ২য় কম্পাস, ৩য় লেডিং (Leading), ৪র্থ চার্ট। প্রতিদিন সেকস্টাণ্ট দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ল্যাটিচিউড ও লঙ্গিটিউড্ স্থির করিয়া লয়। তাহার পর ম্যাপ দেখিয়া কত ডিগ্রি উত্তর বা পশ্চিমে যাইতে হইবে স্থির করিয়া কম্পাসের সাহায্যে জাহাজকে ঠিক সেই অভিমুখে চালিত করে। লেডিং দ্বারা প্রতিঘণ্টায় কত মাইল যাইতেছে তাহা স্থির করে। ইহা অতি সামান্য যন্ত্র। বায়ুতে যেরূপ ঘুড়ি ইহা জলে সেইরূপ। একটী মোটা

কাপড়ের খোলযুক্ত টুপিমত একটী জিনিষ সীসের সহিত যুড়িয়া দড়ি বাঁধিয়া ফেলিয়া দেয়। সেই দড়ি একটী নাটাইয়ে জড়ান আছে। ঐ কাপড়ের টুপি জলে পড়িলে, উহার খোলে জল গিয়া দড়ি টানিতে থাকে, এবং ঘুড়ি উড়াইবার মত নাটাই ধরিয়া থাকিলে জলের টানে নাটাই ঘুরিয়া দড়ি বাহির হইতে থাকে। সেই সময় একটী বালি ঘড়ি দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতটা দড়ি বাহির হইযা যায় দেখে। তাহা হইতে সহজ অনুপাত (Simple proportion) দ্বারা ঘণ্টায় কত যাইতেছে ঠিক করে। ল্যাটিচিউড ও লঙ্গিটিউড্ কেবল একবার দেখে। তাহার পর কোন্ দিকে ও কত বেগে জাহাজ চলিয়াছে ইহা জানিলেই ম্যাপ দেখিয়া যে কোন সময়ে বলা যাইতে পারে আমরা কোথায় আসিয়াছি। * * * *

আমাদের জাহাজ সমুদ্রের মধ্য দিয়া যাইতেছে, তীর কদাচিৎ দেখা যায়। লোহিত সমুদ্রে পড়িয়া অবধি তবু মধ্যে মধ্যে একটী একটী ছোট ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইতেছি। এসকল দ্বীপে লোক নাই। অধিকাংশই আগ্নেয় দ্বীপ। আমাদের জাহাজে কুড়ি জন আরোহী আছে। দুইটী মেম। দুই তিন জন ছাড়া আর সকলেই ভদ্র লোক। সকলেই আমাদের প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। জাহাজের কাপ্তেনের সহিত আমাদের নানা বিষয়ে কথোপকথন হইয়া থাকে। তিনিও আমাদের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইযা থাকেন।

১৫ এ ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে আমরা সুয়েজ পৌঁছিলাম। আমরা ২৬ এ প্রাতে উঠিয়া সুয়েজ নগর দেখিলাম। সুয়েজ তত বড় নগর নহে। মরুভূমির মধ্যস্থলে একটী পর্ব্বতের পদতলে লোহিত সমুদ্রের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ইংরাজদিগের একটী আধুনিক অধিবাস মাত্র। প্রাতে আলোক হইতে না হইতে আমাদের জাহাজে নিশান তুলিযা সঙ্কেত করিল। সিগ্ন্যাল (Signal) আফিসে সেই সঙ্কেত গৃহীত হইল। দশ মিনিটের মধ্যে পোষ্ট আফিস হইতে সিটি অব্ ম্যান্-চেষ্টরের নামে যত চিটিপত্র আসিয়া সুয়েজে ছিল, সমস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা ৮ টার মধ্যে নাবিকেরা জাহাজের নঙ্গর তুলিল। আমরা সুয়েজ খালে প্রবেশ করিলাম। সুয়েজ খাল, ফরাশি জাতির একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। ব্যারন্ লেসেপ অনেক উদ্যমের পর ইহাতে কৃতকার্য্য হন। ইহাতে ১৭ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকার অধিক অংশ ৫০০ ফ্রাঙ্ক করিয়া অংশে প্যারিস্ নগরে সংগৃহীত হয়। ইহাতে ইংলণ্ডের ও মিসরের অংশ আছে। সম্প্রতি ডিস্‌রেলির কৌশলে মিসরের অংশ ক্রয় করায় ইংলণ্ডের অংশই অধিক হইয়াছে। কিন্তু ইহার কার্য্যপ্রণালী ও কর্ম্মচারী সকলই ফরাশীয়। সুয়েজ (খালের আরম্ভ)

হইতে পোর্টসেড (খালের শেষ) পর্য্যন্ত ৮৬ মাইল দূর। ইহার প্রায় ত্রি-চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক হ্রদ। সুতরাং কেবল এক-চতুর্থাংশ কাটিতে হইয়াছে। ইহাতেই এত ব্যয় হইয়াছে। ইহার আয়ও যথেষ্ট। আমারা যে জাহাজে আসিয়াছি তাহার জন্য কেবল ঐ খাল দিয়া যাইবার জন্য ২৫০০০ টাকা দিতে হইয়াছে। গত ৭৭ সালে ইহার আয় ৩৪ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক হইয়াছিল। তাহার ব্যয় বাদে ৪॥ মিলিয়ন লাভ হয়। এই খাল ৫০০০ মাইল দূরত্ব কমাইয়াছে। পূর্ব্বে কেপ ঘুরিয়া আসিতে ১১৬০০ মাইল হইত। এক্ষণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে ৬৫০০ মাইল দূর। কিন্তু ইহার প্রস্থ এত অল্প, যে জাহাজ একটু এদিক্ ওদিক্ গেলেই চড়ায় লাগিয়া যায়। কোন কোন স্থানে ১৫০ ফুট, সাধারণতঃ ১০০ ফুট প্রস্থ।

যখন এই সঙ্কীর্ণ খালের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম, তখন সেই প্রথম মরুভূমির দৃশ্য দেখিলাম। দুই ধার কেবল বালুকাময় প্রান্তর, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কাঁটা গাছ, রৌদ্রে, দেখিতে ভয়ানক! এই খালের মধ্য দিয়া যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে ঝড় হয়। তাহা হইলেই বড় কষ্টকর। আমাদের সৌভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। এই খালের মধ্যে খানিক খানিক দূর এক একটী ষ্টেসন্ আছে। সেই সেই স্থল একটু প্রশস্ত; এবং দুই দিক্ হইতে জাহাজ আসিলে সেই খানেই কেবল পাশাপাশি হইয়া যাইতে পারে। এক খানি আসিয়াছে, এবং তারে খবর আসিয়াছে যে পরবর্ত্তী ষ্টেসন হইতে আর একখানি আসিতেছে, এরূপ স্থলে ষ্টেসন মাষ্টার যতক্ষণ না অপর খানি আসিবে ততক্ষণ একখানি আট্‌কাইয়া রাখিবেন। আমাদের জাহাজ একবারও চড়ায় আট্‌কায় নাই। আমাদের আগে আগে আল্‌ডিরাগো নামে একখানি জাহাজ যাইতেছিল, সেখানি তিনবার চড়ায় লাগে। এই খালে জাহাজ আট্‌কাইয়া গেলে তত ভয় নাই। তাহার কারণ জাহাজ এত আস্তে যায় যে হঠাৎ বাধা পাইলেও কিছু ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই।

যে দিন সুয়েজ খালে প্রবেশ করিলাম সেই দিন সন্ধ্যার সময় খালের ঠিক মধ্যবর্ত্তী ইস্‌মেলিয়া নামক স্থানের সম্মুখবর্ত্তী একটী খালে গিয়া আমাদের জাহাজ নঙ্গর করিল। আমরা জন কতক জাহাজের একখানি বোট লইয়া তীরে নামিলাম। ইহা মিসরের একটী নগর। এখানে খেদিবের একটী রাজ-বাটী আছে। ইয়ুরোপীয় জাতির মধ্যে কেবল ফরাশীই এখানে দেখিলাম। একটী কফি হাইসে গিয়া দেখিলাম সকলেই ফরাশী। আমাদের সঙ্গে যে সকল ইংরাজ ছিলেন, তাঁহারা কেহ ফরাশি জানিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ও কফি হাউসের ফরাশীদিগের মধ্যে যেরূপ কথাবার্ত্তা হইল তাহা অতি

আমোদ-জনক। সে সকল ভাবভঙ্গী লিখিয়া জানান যায় না। অনেক কষ্টে অনেক সঙ্কেতে তাঁহারা তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে তাঁহারা কফি, দুগ্ধ ইত্যাদি চান। সেখানে কফি খাইয়া আমরা সেই স্থানের অধিবাসিদিগের এক হোটেলে বিশ্রাম-গৃহ (Refreshment-room) পেলাম। দেখিলাম কতকগুলি গোল টেবিল ও এক একটী টেবিল ঘিরিয়া কতকগুলি চেয়ার পড়িয়া রহিয়াছে। দুই একটী টেবিল অধিকার করিয়া কতকগুলি লোক আমোদ প্রমোদ করিতেছে। লোকদিগের আকৃতি দেখিয়া য়িহুদী বলিয়া বোধ হইল। সেই ঘরের এক পার্শ্বে তিনটী য়িহুদী স্ত্রীলোক বসিয়া মধ্যে মধ্যে গান করিতেছে। তাহাদের মুখ ও নাক একটী লম্বা কিম্ভুত আবরণে আবৃত। এবং যেই এক দল উঠিয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে একজন গিয়া একখানি রেকাব তাহাদের সম্মুখে ধরিতেছে। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাতে ফেলিয়া দিতেছে। ইস্মেলিয়ায় সেই রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া রাত্রি ৯ টার সময় জাহাজে উঠিলাম। তাহার পর দিন পোর্টসেডে পঁহুছিলাম, জাহাজ সমস্ত রাত্রি নঙ্গর করিয়া রহিল। কারণ সে খালের ভিতর দিয়া রাত্রিতে জাহাজ চালায় না। পোর্টসেডও সম্পূর্ণ ফ্রেঞ্চ অধিবাস। ইংরাজী অল্প লোকেই বুঝে। রাস্তায় দুই এক জন দালাল ঘুরিতেছে, তাহারাই ইংরাজদিগের সহিত দোকানে গিয়া তাহাদের অভিপ্রায়াদি ব্যক্ত করে। দুই ঘণ্টায় যতটা পরিলাম ততটা পোর্টসেডে ঘুরিলাম। * * * প্রাতে উঠিয়া দেখি মেডিটারেনিয়ানের ভয়ানক দুরন্ত মূর্ত্তি! যে টেবিলে খাওয়া হয় তাহার উপর কাঠের ফ্রেম লাগাইয়াছে, এবং তাহার ভিতরে ভিতরে প্লেট আদি রাখিয়াছে। নতুবা জাহাজ এত আন্দোলিত হইতেছে যে টেবিলের উপর হইতে সকল ছিটকাইয়া পড়িয়া যাইবে। আমার এ কয় দিন সামুদ্রিক পীড়া ছিল না। সেই দিন আবার আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে যখন ঐ পীড়া হইয়াছিল তখন ডেকের উপর গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এখন আর ডেকের উপর বসিবার সুবিধা ছিল না। ঝড়ের ভয়ে মাথার উপর সকল পরদা তুলিয়া ফেলিয়াছে। প্রচণ্ড বাতাস ও শীত এবং তাহার উপর মধ্যে মধ্যে তরঙ্গ আসিয়া ডেক ভাসাইয়া দিতেছে। সুতরাং আমার আর ঘর ছাড়া অন্য কোনস্থানে যাইবার সুবিধা ছিল না। পোর্টসেড ছাড়িয়া অবধি টেমস নদীর মুখ পর্য্যন্ত আমাদের জাহাজ কোন স্থানে থামে নাই। মাল্টা ও জিব্রাল্টারের সম্মুখ দিয়া গিয়া ছিল বলিয়া ঐ দুই স্থানের দৃশ্য আমরা দেখিতে পাইয়াছি। জিব্রাল্টরের অতি চমৎকার দৃশ্য! এরূপ স্বাভাবিক পার্ব্বতীয় দুর্গ আমি পূর্ব্বে

কখন দেখি নাই। পর্ব্বতের ভিতর টানেল করিয়া তাহাতে দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিস্কে উপসাগরে যে আমাদের ভয়ানক ভয় ছিল সৌভাগ্য ক্রমে আমরা সেরূপ ভয়ানক কিছু পাই নাই। ইংলিশ চ্যানেলে দুইবার একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। জাহাজ চলিতেছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার রহিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেলা দুইটার সময় এরূপ কুজ্ঝটিকা হইল যে ২০ হাত দূরে আর কিছু দেখা যায় না। জাহাজ খানিক অন্ধকারে বাঁশি বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিল, পরে থামিয়া গেল। টেম্‌সনদীর মুখে গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় পঁহুছিলাম। সেখানে রাত্রিতে নঙ্গর করিয়া থাকিয়া পরদিন জোয়ারের সময় জাহাজ নদীতে প্রবেশ করিল, এবং গত শনিবার ১৩ই মার্চ্চ তারিখে বেলা ৫ টার সময় আমাদের জাহাজ আসিয়া লণ্ডন ভিক্টোরিয়া ডকে পঁহুছিল।

শ্রীমঃ—

লণ্ডন, ১৯ এ মার্চ্চ।